উপন্যাস সমগ্র

হুমায়ূন আহমেদ

পঞ্চম খণ্ড

উপন্যাস সমগ্র

৫

হুমায়ূন আহমেদ

প্রতীক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ১৯৯৮
তৃতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১০
চতুর্থ মুদ্রণ মে ২০১৭

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
নূর-ই-মোনতাকিম আলমগীর কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১, ৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ অষ্টাদশ শতকের নকশী রুমাল অবলম্বনে

মূল্য ৪৫০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978-984-8795-19-4

UPANYAS SAMAGRA (A Collection of Novels) Vol-V by Humayun Ahmed
Published by PROTIK PROKASHANA SANGSTHA.
38/2ka Banglabazar (1st floor), Dhaka-1100
Fourth Edition May 2017 Price Taka 450.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক অবসর প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ
৪৭১১৫৩৮৬, ৪৭১১৯৩১১
০১৭৪৩৯৫৫০০২, ০১৬২৬০২৪০৯০

বিকাশ পেমেন্ট
০১৭২০৩০৪০৭২, ০১৭১১৫৪২০০৭

Website **www.abosar.com, www.protikbooks.com**
Facebook www.facebook.com/AbosarProkashanaSangstha
e-mail protikbooks@yahoo.com, protikbooks@gmail.com
abosarprokashoni@yahoo.com

Online Distributor
www.rokomari.com/abosar, Phone 16297, 01519521971
www.rokomari.com/protik, Phone 16297, 01519521971
www.sorbonam.com, Phone +88 01511008877

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম খণ্ডের সূচী

সম্রাট / ১
বাসর / ৭৯
দ্বৈরথ / ১২৫
সাজঘর / ১৮৯
অন্ধকারের গান / ২৫৮
রজনী / ৩২৯
চাঁদের আলোয় কয়েকজন যুবক / ৩৭৭
জনম জনম / ৪২৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্রাট

১

জুলিয়াস নিশো একটি ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখলেন। যেন তিনি বিশাল একটা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ফাঁকা মাঠ। চারদিক ধু-ধু করছে। প্রচণ্ড শীত। হিমেল বাতাস বইছে। তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না, খুব অবাক হচ্ছেন। তিনি কোথায় এসে পড়লেন? হঠাৎ দূরে ঝনঝন করে শব্দ হল। তিনি শব্দ লক্ষ করে এগুচ্ছেন। তাঁর একটু ভয়ভয় করছে। তিনি বেশ ক'বার বললেন, 'কে ওখানে?' কেউ সাড়া দিল না, তবে একজন-কেউ শব্দ করে হেসে উঠল।

'কে ওখানে?'

'সম্রাট নিশো, আপনি এই নগরীতে কী করছেন?'

'তুমি কে?'

'আমি কেউ না। আমি আপনার এক জন বন্ধু।'

'তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'দেখতে পাচ্ছেন না, কারণ আপনার চোখ বাঁধা।'

'নিশো লক্ষ করলেন, তাই তো, তাঁর চোখ বাঁধা! তখন তাঁর মনে হল—এটা স্বপ্ন। এটা সত্যি নয়।

'সম্রাট জুলিয়াস নিশো।'

'বল।'

'আপনি পালিয়ে যান। এক্ষুনি আপনাকে হত্যা করা হবে। ঘাতকরা আসছে। তাদের পায়ের শব্দ কি আপনি পাচ্ছেন না?'

'পাচ্ছি।'

'তাহলে পালাচ্ছেন না কেন?'

জুলিয়াস নিশো পালাবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না—তাঁর পা লোহার শিকলে বাঁধা। পালাবার কোনো পথ নেই। জুলিয়াস নিশো স্বপ্নের মধ্যেই চেঁচিয়ে উঠলেন—আমার পায়ের শিকল কেটে দাও। দয়া করে আমার পায়ের শিকল কেটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাও। তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ি দেখলেন—রাত দুটো দশ। চারদিকে গভীর নিশুতি। ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

ঘামে তাঁর শরীর ভিজে গেছে। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাঠ। স্বপ্নের ঘোর তাঁর এখনো কাটে নি। এ-রকম ভয়াবহ একটি স্বপ্ন হঠাৎ করে কেন দেখলেন? কী কারণ থাকতে পারে? তিনি ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। মনে-মনে বললেন—আমার মন বিক্ষিপ্ত এবং খুব সম্ভব আমি কোনো কারণে অসহায় বোধ করছি। সেই কারণেই আমার অবচেতন মন এ-রকম একটি ভয়াবহ স্বপ্ন আমাকে দেখিয়েছে।

তিনি বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। পানি খাওয়া দরকার। পানির তৃষ্ণা হচ্ছে। অথচ জানালার পাশ থেকে সরে আসতে ইচ্ছা করছে না। বাইরে কী চমৎকার তারাভরা আকাশ। তাঁর স্বপ্নের সঙ্গে এই আকাশের কোনো মিল নেই। জুলিয়াস নিশো আবার একটি নিঃশ্বাস ফেললেন, আর ঠিক তখন দরজায় নক হল, মৃদু নক। যেন কেউ খুব আলতো করে দরজায় হাত রেখেছে।

'কে?'

'মিস্টার জুলিয়াস নিশো?'

'হ্যাঁ।'

'দরজা খুলুন। আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

'রাত-দুপুরে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার পরিচয় জানতে পারি?'

'দরজা খুলুন।'

তিনি দরজা খুললেন। যে-লোকটিকে তিনি দেখলেন, তার গায়ে সামরিক পোশাক। কাঁধের ব্যাজে দুটি আড়াআড়ি বর্শা। জুলিয়াস নিশো লোকটির পদবী ঠিক বুঝতে পারলেন না। জায়ার সেনাবাহিনীর চিহ্ন তিনি এখনো ঠিক বুঝতে পারেন না।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু কোনো উপায় নেই। আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে।'

'কোথায়?'

'আমি জানি না, কোথায়।'

জুলিয়াস নিশো ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। রাত আড়াইটায় সেনাবাহিনীর এক জন অফিসার তাঁর মতো এক জন অসুস্থ বৃদ্ধের ঘুম ভাঙিয়ে বলবে—আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে? এবং তিনি জানতেও পারবেন না, কোথায়? জুলিয়াস নিশো হালকা গলায় বললেন, 'কোথায় যেতে হবে?'

'আমি জানি না মিঃ নিশো।'

'জানলেও তুমি বলতে না। তুমি করে বলছি, কিছু মনে করছ না তো?'

'আমি কিছুই মনে করি নি।'

'সঙ্গে ব্যবহারিক জিনিসপত্র নেব?'

'কিছুই নেবার প্রয়োজন নেই, শুধু আপনার ওষুধগুলি নিয়ে নিন।'

জুলিয়াস নিশো মৃদু স্বরে বললেন, 'যে-মেয়েটি আমার দেখাশোনা করে, তার কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই। আমার মনে হয় আমি আর ফিরে আসব না। মনে হচ্ছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা ওয়ান ওয়ে জার্নি।'

'মিঃ নিশো, কারো কাছ থেকে বিদায় নেবার মতো সময় আমাদের নেই।'

'মেয়েটিকে আমি নিজ কন্যার মতো দেখেছি।'

লোকটির মুখের একটি পেশিও বদলাল না। জুলিয়াস নিশো মনে-মনে তার প্রশংসা করলেন। লোকটি ভালো সৈনিক।

'আমি যদি ওর জন্যে কোনো উপহার রেখে যাই, সেটা কি ওর হাতে পৌছবে?'

'নিশ্চয় পৌছবে।'

'তুমি কথা দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি। যা করবার তাড়াতাড়ি করুন।'

তিনি একটি খামে কয়েকটি নোট ভরলেন—খামের ওপর গোটাগোটা করে লিখলেন—"ক্যারি, যা ছিল, তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। এ-টাকায় তুমি তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুইজারল্যান্ড থেকে ঘুরে এসো। আমার বন্দিজীবনের শেষ ক'টি দিন তোমার ভালবাসায় সুস্থ হয়েছিল। পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

নোটটি তাঁর পছন্দ হল না। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। কাজেই 'ঈশ্বর' শব্দটি ব্যবহার করা ঠিক হয় নি।

অফিসারটি বলল, 'দেরি হচ্ছে। আমাদের হাতে সময় বেশি নেই।'

জুলিয়াস নিশো বললেন, 'তোমার নাম জানতে পারি?'

'আমার নাম জানার প্রয়োজন আছে কি?'

'আছে। একটি পশু অন্য একটি পশুকে নাম ধরে ডাকে না। কিন্তু এক জন মানুষ অন্য একটি মানুষকে নাম ধরে ডাকতে চায়।'

'আমার নাম মার্কটিল।'

'মার্কটিল, এই খামটি তুমি মেয়েটিকে দেবে। এখানে কিছু ইউএস ডলার আছে। এবং তুমি আমার হয়ে মেয়েটির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবে। চল, এখন যাওয়া যাক।'

'আপনি গরম কিছু পরে নিন, বাইরে প্রচণ্ড শীত।'

ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁদের প্রায় সত্তর গজের মতো হাঁটতে হল। কনকনে শীতের বাতাস বইছে। চিল ফেক্টার অনেকখানি নেমে গেছে বোধহয়। কান জমে যাচ্ছে প্রায়। তাঁর কষ্ট হতে লাগল। বয়স হয়েছে। এই বয়সে কষ্ট সহ্য হয় না। বাইরে কোনো আলো জ্বলছিল না। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। তবু তিনি বুঝতে পারলেন, প্রচুর মিলিটারির আমদানি হয়েছে। মিলিটারি আগেও ছিল, তবে এখন অনেক বেশি। তারা চলাফেরা করছে নিঃশব্দে, তবু টের পাওয়া যাচ্ছে।

মাঠের মতো ফাঁকা জায়গায় একটি আর্মি ট্র্যান্সপোর্ট হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে। হেলিকপ্টারের লেজের দিকে একটা লাল বাতি জ্বলছে-নিভছে। একচক্ষু দৈত্যের মতো লাগছে হেলিকপ্টারটিকে। নিশো হেলিকপ্টারটির কাছে এসে দাঁড়াতেই তার প্রপেলার ঘুরতে শুরু করল। নিশো অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, এই মাঠটিকেই তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন। অবশ্যি স্বপ্নের মাঠ আরো বিশাল ছিল। এবং এ-রকম অন্ধকার ছিল না। চাপা এক ধরনের আলো ছিল, যা শুধু স্বপ্নদৃশ্যেই দেখা যায়।

মার্কটিল হাত ধরে জুলিয়াস নিশোকে উঠতে সাহায্য করল। নিশো আন্তরিক ভঙ্গিতেই বললেন 'ধন্যবাদ, তুমিও কি যাচ্ছ আমার সঙ্গে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, আমি যাচ্ছি না। আপনার উপহার আমি যথাসময়ে মেয়েটিকে পৌছে দেব। শুভ যাত্রা।'

'যাত্রা কি সত্যি শুভ?'

মার্কটল কোনো উত্তর দিল না কিন্তু জুলিয়াস নিশোকে অবাক করে দিয়ে সামরিক কায়দায় একটি স্যালুট দিল। এক জন নির্বাসিত মানুষকে বিদেশি সেনাবাহিনীর এক জন অফিসার কি স্যালুট করে? করে না বোধহয়। নিশো মার্কটলের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন।

হেলিকপ্টারের ভেতর নরম আলো জ্বলছে। অন্ধকার থেকে আসার জন্যেই হয়তো এই আলোতেও সব পরিষ্কার চোখে পড়ছে। বেঁটেমতো এক লোক নিশোকে বসবার জায়গা দেখিয়ে দিল। অত্যন্ত ভদ্র ভঙ্গিতে বলল, 'আপনার কি ঠাণ্ডা লাগছে?'

'হ্যাঁ, লাগছে।'

'এই কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিন। এক্ষুনি গরম কফি দেওয়া হবে।'

'তোমাকে ধন্যবাদ।'

'আপনি তো মাঝে-মাঝে ধূমপান করেন। এই চুরুটটি টেস্ট করে দেখবেন? হাভানা চুরুট।'

'তোমাকে আবার ধন্যবাদ।'

হেলিকপ্টারের ব্লেড ঘুরতে শুরু করেছে। আকাশে উড়বে। দরজা বন্ধ করা হয়েছে। ককপিটের পাইলট বেতারে নিচু গলায় কী-সব বলছে। নিশোর গা-ঘেঁষে বেঁটে লোকটি দাঁড়িয়ে। নিশো মৃদুস্বরে বললেন, 'তোমরা কি আমাকে জেনারেল ডোফার হাতে তুলে দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন, জানতে পারি?'

'না, পারেন না। কারণ, আমি জানি না। কারণটি আপনার সরকার এবং জায়ার সরকারের জানার কথা। আমার জানার কথা নয়। আমার দায়িত্ব হচ্ছে আপনাকে ফোর্টনকে পৌছে দেওয়া।'

'জেনারেল ডোফা এখন কোথায় আছেন?'

'আলজেরিয়াতেই আছেন। দ্বিপাক্ষিক একটি চুক্তির ব্যাপারে তিনি এসেছেন। আজকের খবরের কাগজেই তো আছে। আপনাকে কি খবরের কাগজ দেওয়া হয় না?'

'না।'

'আমি আপনাকে খবরের কাগজ দিতে পারি। আমাদের এখানে "দি আলজিরিয়া মর্নিং" আছে। দেব?'

'না, দরকার নেই। কিছু জানতে ইচ্ছে করছে না।'

জুলিয়াস নিশোকে কফি দেওয়ার পরপরই হেলিকপ্টার আকাশে উড়ল। নিশো কফিতে চুমুক দিয়ে চারদিক দেখতে লাগলেন। ভেতরটা বেশ বড়। তিনি এবং বেঁটে লোকটা ছাড়া আরো তিন জন সৈন্য আছে। তারা আটোমেটিক সাব-মেশিনগান হাতে পেছনের দিকে বসে আছে। চোখে চোখ পড়তেই তারা চোখ নামিয়ে নিল।

নিশো ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। ষাট বছর বয়সের এক জন অথর্ব বৃদ্ধের জন্যে এত সতর্কতার প্রয়োজন কী? হালকা গলায় বললেন, 'তোমরা তোমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে রেখে কফি খাও। আমি পালাব না। হেলিকপ্টার থেকে পালাবার কৌশল আমার জানা নেই।'

সৈন্য তিন জন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। বেঁটে অফিসারটি বলল, 'মিঃ জুলিয়াস নিশো, আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আমি আপনার এক জন বিশেষ ভক্ত। কিন্তু........'

তিনি হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিয়ে সোহেলি ভাষায় ছোট্ট একটা কবিতা আবৃত্তি করলেন। সঙ্গে-সঙ্গেই তা ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন। কবিতাটির ভাবার্থ হচ্ছে—

"হৃদয় যখন হৃদয়কে বুঝতে না পারে তখনি ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়।"

অফিসারটি অস্বস্তিতে কপালের ঘাম মুছল। নিশো বললেন, 'তোমার নাম এখনো জানা হয় নি। তুমি আমার নাম জান। আমার অধিকার আছে তোমার নাম জানার।'

'আপনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। আপনার নাম সবাই জানে। আমি একজন অখ্যাত লেফটেন্যান্ট কর্নেল।'

'আমি কি এই অখ্যাত লেফটেন্যান্ট কর্নেলের নাম জানতে পারি?'

'স্যার, আমার নাম পেয়েরেন। হোসেন পেয়েরেন।'

'পেয়েরেন।'

'বলুন স্যার।'

'তুমি কি বলতে পার আমাকে হত্যা করা হবে কি না?'

'মৃত্যুর কথা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন।'

জুলিয়াস নিশো চাপাস্বরে হাসলেন। হাসতে-হাসতে বললেন, 'ঈশ্বর নিয়ে আমি চিন্তা করি না। আমার চিন্তা মানুষদের নিয়ে।'

পেয়েরেন চুপ করে রইল। হেলিকপ্টারের পাইলট একটি সাংকেতিক বার্তা পাঠাল—"কালো পাখি তার নীড়ে।" এই সংকেতের অর্থ হচ্ছে—সব ঠিকমতো এগুচ্ছে।

নিশো চোখ বন্ধ করে ফেললেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, 'বাতি নিভিয়ে দাও। চোখে আলো লাগছে। আমি ঘুমুবার চেষ্টা করব। কে জানে এটাই হয়তো আমার শেষ ঘুম।'

বাতি নিভিয়ে দেওয়া হল। ইঞ্জিনের একঘেয়ে হুম্ হুম্ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। চারদিকে বিপুল অন্ধকার। হেলিকপ্টার উড়ে চলেছে। আফ্রিকার চিরসবুজ অরণ্যের ওপর দিয়ে।

জুলিয়াস নিশো ঘুমুতে চেষ্টা করছেন। কালো সোহেলি আফ্রিকানদের নেতা—প্রবাদপুরুষ জুলিয়াস নিশো। মুকুটহীন সম্রাট।

২

কিছু কিছু অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ আছে, যাদের বোকার মতো দেখায়। জেনারেল ডোফা সে-রকম এক মানুষ। বিশালবপু বৃষস্কন্ধ ব্যক্তি। সামনের পাটির দাঁত অনেকখানি বের হয়ে আছে। মুখে দাড়ি-গোঁফের চিহ্নও নেই। নিচের ঠোঁট ঘেঁষে একটি গভীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষতচিহ্ন নেমে গেছে, যার জন্যে জেনারেল ডোফার মুখ সবসময় হাসি-হাসি মনে হয়।

এই লোকটির কাজকর্ম ঘড়ি-ধরা। রাত সাড়ে দশটায় ঘুমুতে যান। ভোর পাঁচটার মধ্যে জেগে ওঠেন। ছ'টা না-বাজা পর্যন্ত জগিং করেন। এই এক ঘন্টায় দশ থেকে পনের মাইল রাস্তা দৌড়ানোর পর প্রাতঃকালীন স্নান সারেন। সে একটি দর্শনীয় ব্যাপার! ঘোড়া যেভাবে দলাইমলাই করা হয় সেভাবে দু'জন মানুষ তাঁকে দলাইমলাই করতে থাকে। এর ফাঁকে-ফাঁকে বরফশীতল জল বালতি-বালতি তাঁর মাথায় ঢালা হয়। স্নানের বিশাল পর্বটি সমাধা হয় চেয়ারে বসে। বাথটাব, হট শাওয়ার বা স্টিমবাথজাতীয় আধুনিক স্নানের প্রক্রিয়া এই আফ্রিকান জেনারেলকে মোটেও আকর্ষণ করতে পারে নি।

আজ তাঁর রুটিনের ব্যতিক্রম হয়েছে। তিনি সারা রাত এক ফোঁটাও ঘুমোন নি। একটি বিশেষ খবরের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ভোর পাঁচটা সাতাশ মিনিটে তাঁর এডিসি এসে জানাল, জায়ার হেলিকপ্টার নির্বিঘ্নে ফোর্টনকে অবতরণ করেছে, এবং পূর্ব পরিকল্পনামতো জুলিয়াস নিশোর পরিচয় গোপন আছে। ফোর্টের দু' জনমাত্র ব্যক্তি এই পরিচয় জানেন, এক জন ফোর্টের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার লুম—অন্যজন কারাধ্যক্ষ মাওয়া। জেনারেল ডোফা শীতল স্বরে বললেন, 'অন্য কেউ জুলিয়াস নিশোর সংবাদ জানে না, এই সম্পর্কে তুমি কত ভাগ নিশ্চিত?'

'এক শ' ভাগ স্যার। জুলিয়াস নিশোকে তাঁর সেলে নেওয়া হয়েছে। সেই সেলের আশেপাশে কারাধ্যক্ষ মাওয়া ছাড়া আর কেউ যেতে পারবে না, এই মর্মে নির্দেশ জারি করা হয়েছে।'

'সেলটি পাহারা দিচ্ছে কারা?'

'আপনার নির্দেশমতোই ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি রেজিমেন্টের ওপর বন্দির নিরাপত্তার ভার দেওয়া হয়েছে।'

জেনারেল ডোফা উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'কৌতূহলী সৈন্যরা বন্দির পরিচয় জানতে আগ্রহী হবে। হবে না?'

'হয়তো হবে। কিন্তু স্যার, প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি রেজিমেন্টের জোয়ানদের কৌতূহল কম।'

'তা ঠিক। জুলিয়াস নিশোর শরীর কেমন?'

'একটু দুর্বল। কিন্তু শরীর ভালোই আছে।'

'তাঁর খাওয়াদাওয়া, অষুধপত্র—এ সমস্ত ব্যাপারগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তো?'

'হয়েছে। আপনার নির্দেশের কথা আমি মাওয়াকে বলেছি।'

'ভালো। কফি দিতে বল।'

ডোফা পরপর দু' কাপ কফি খেলেন। জায়ার পররাষ্ট্র দপ্তরের সচিবকে ডেকে পাঠালেন। তিনটি ছোট-ছোট চিঠি লিখলেন। জায়ারে অবস্থিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তাঁর একটি জরুরি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করবার নির্দেশ দিলেন। খানিকক্ষণ নীরবে ধূমপান করবার পর এডিসিকে আবার ডেকে পাঠালেন।

'তুমি নিশ্চয়ই জান, আজ বেলা ১০টায় জায়ার বেতার থেকে জুলিয়াস নিশোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুসংবাদ প্রচার করা হবে?'

'জানি স্যার। কিন্তু আজ দশটায় প্রচার করা হবে সেটা জানতাম না।

'এগারটায় মোরাভা বেতার থেকে এই সংবাদ প্রচার করা হবে। সেখানেই বলা হবে এই বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ও দার্শনিকের মৃত্যুতে আমি, জেনারেল ডোফা, তিন দিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছি।' এডিসি কিছু বলল না। তার মুখ ভাবলেশহীন। ডোফা বললেন, 'বেলা বারটায় একটি হেলিকপ্টার জুলিয়াস নিশোর শবাধার নিয়ে মোরাভায় পৌছবে, এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।'

'সেই শবাধারে কোনো শব থাকবে না?'

'নিশ্চয় থাকবে। তবে তা জুলিয়াস নিশোর নয়। সেই শবাধারের ঢাকনা খোলা হবে না, কাজেই কার শব সেটা নিয়ে কারোর মাথাব্যথা হবার কথা নয়। তুমি কি কিছু বলতে চাও?'

'না।'

'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু বলতে চাও। বলে ফেল।'

'স্যার, এতটা ঝামেলার কোনো দরকার ছিল কি? সরাসরি জুলিয়াস নিশোর মৃতদেহ নিয়ে গেলেই হত।'

'না, হত না। জুলিয়াস নিশো কোনো সামান্য ব্যক্তি নন। তাঁর মৃত্যুতে পৃথিবীজুড়েই একটা হৈচৈ হবার কথা। তাতে আমার কিছুই যায়-আসে না। কিন্তু আমি যেটা ভয় পাচ্ছি সেটা হচ্ছে, মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে খোদ মোরাভাতে একটা গৃহবিপ্লব শুরু হতে পারে।'

'যদি শুরু হয়, তাহলে কি আপনি দ্বিতীয় বার একটি ঘোষণা দেবেন যে, জুলিয়াস নিশো বেঁচে আছেন?'

'হ্যাঁ, দেব। কারণ সত্যি-সত্যি গৃহযুদ্ধ শুরু হলে একমাত্র নিশোই তা থামাতে পারবেন।

'তার মানে কি এই যে, জুলিয়াস নিশোর মৃত্যুদণ্ড দিতে আপনি ভয় পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, পাচ্ছি। জেনারেল ডোফা এই পৃথিবীতে দু'টি মানুষকে ভয় পায়। প্রথম জনের নাম জুলিয়াস নিশো।'

'দ্বিতীয় জন কে?'

'দ্বিতীয় জনের নাম তোমার না জানলেও চলবে। আমি আবার কফি খাব, তুমি কফি দিতে বল।'

'সাড়ে ছ'টা বাজে, আপনার ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয়েছে।'

'তোমাকে কফির ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে, সেটা কর। আমি কোনো কথাই দ্বিতীয় বার বলা পছন্দ করি না।'

ফোর্টনকের যে-সেলটিতে জুলিয়াস নিশোকে রাখা হয়েছে, তার একটি বিশেষ নাম আছে—'না-ফেরা ঘর'। এ-ঘর থেকে কেউ কখনো ফেরে না। মোরাভার খ্যাত-অখ্যাত বহু মানুষ এ-ঘরে ঢুকেছেন, কেউ বেরুতে পারেন নি। জুলিয়াস নিশোর ব্যাপারে একটি ব্যতিক্রম আছে, তিনি দশ বছর আগে এক বার ঢুকেছিলেন। পঞ্চম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনে গৃহযুদ্ধ বেধে গেল, সপ্তম দিনে জুলিয়াস নিশোকে ঘর থেকে বের করে আনতে হল গৃহযুদ্ধ থামাবার জন্যে। এর মধ্যেই মাউ উপজাতির এক-পঞ্চমাংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। এরা অত্যন্ত সাহসী মানুষ। মোরাভা সেনাবাহিনীর ওপর তারা বড় রকমের আঘাত করেই মারা গেল। সে-সময় মাউ উপজাতীয়দের মধ্যে বিদ্যুতের মতো যে-কথাটি ছড়িয়েছিল, তা হচ্ছে—"নিশোর জন্যে একটি প্রাণ দিন। তিনি আবার তা ফিরিয়ে দেবেন।" দশ বছর অনেক দীর্ঘ সময়। এই সময়ে অনেক কিছুই বদলে যায়। নিশোও বদলেছেন। সে-সময় তাঁর মাথাভর্তি চুল, চোখের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ। এখন মাথায় একগাছিও চুল নেই। ভারি চশমা ছাড়া দশ হাত দূরের মানুষটিকে চিনতে পারেন না। তবু কিছু কিছু জিনিস আছে, যা সময়ের সঙ্গে বদলায় না। যেমন স্বভাব। নিশো ঠিক আগের বারের মতোই হাসিমুখে বললেন, 'সুপ্রভাত, সুপ্রভাত।'

কারাধ্যক্ষ মাওয়া শুকনো মুখে তাকাল।

'তোমার নাম খুব সম্ভব মাওয়া। ঠিক না?'

মাওয়া মাথা নাড়ল।

'এত বিমর্ষ হয়ে আছ কেন? দশ বছর আগে তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। পুরোনো পরিচয়ের সূত্রেও একটু হাস।

মাওয়া হাসির মতো ভঙ্গি করল। নিশো বললেন, 'তোমারও দেখি বয়স হয়েছে। নিচের পাটির দাঁত পড়ে গেছে। আমার ধারণা, শুধু আমার একারই বয়স হচ্ছে। হা হা হা।'

মাওয়া শান্ত স্বরে বলল, 'আমার দুর্ভাগ্য স্যার, আবার আপনাকে এই অবস্থায় দেখলাম।'

নিশো মাওয়ার কথার কোনোরকম গুরুত্ব দিলেন না। সহজভাবেই নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চাইলেন। শুধু মুখে চাওয়া নয়, লিখিতভাবে চাওয়া। গোটাগোটা অক্ষরে লিখলেন—

- খবরের কাগজ
- ট্রানজিস্টার রেডিও (মাল্টি ব্যান্ড)
- লেখার কাগজ
- চুরুট (ভালো চুরুট)
- কফি (ইন্সট্যান্ট কফি নয়)
- জন স্টেইনবেকের—সুইট থার্ড ডে উপন্যাস।
- এ্যারেন পাউলের—কালো মানুষদের কবিতা।

মাওয়া বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, 'লেখার কাগজ, চুরুট এবং কফি ছাড়া অন্য কিছুই দেওয়া যাবে না। আপনি স্যার কিছু মনে করবেন না।'

'আমি কখনো কিছু মনে করি না। বই দুটি কি দেওয়া যাবে?'

'এই জঙ্গলে বই কোথায় পাব?'

'ঠিক আছে।'

'আপনার সেবার জন্যেও কাউকে দেওয়া যাচ্ছে না। একমাত্র আমিই আসব আপনার কাছে। দিনে এক বার আসব।'

'ভালো, তবে এমন গোমড়া মুখে আসবে না। হাসিমুখে আসবে। আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনিতেই অনেক দুঃখ-কষ্ট আছে। এর মধ্যে গোমড়া মুখ দেখতে ইচ্ছা করে না।'

যদিও মাওয়া বলেছিল, খবরের কাগজ ট্রানজিস্টার রেডিও এ-সব কিছুই দেওয়া হবে না, তবুও মাওয়া মধ্যাহ্নকালীন খবরের কিছু আগে একটি ছোট ট্রানজিস্টার নিয়ে নিশোর কাছে গেল—ভয়ার্ত স্বরে বলল, 'আপনার প্রসঙ্গে একটি খবর প্রচারিত হয়েছে সকাল এগারটায়। এখনো বোধহয় আবার বলবে।' নিশো মুচকি হেসে বললেন, 'মজার খবর নাকি?' মাওয়া কোনো জবাব দিল না।

নিশো মোরাভা বেতারের খবর শুনলেন শান্ত ভঙ্গিতে। মাঝে-মাঝে চুরুটে টান দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উত্তেজনা তাঁর আচার-আচরণে প্রকাশ পেল না।

'আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি—মোরাভার প্রিয় মানুষ জুলিয়াস লিম্বানি নিশো আজ ভোর চার ঘটিকায় আলজেরিয়াতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যবরণ করেছেন। জেনারেল ডোফা—পরলোকগত জননেতার শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে এক শোকবাণীতে জানান—জুলিয়াস লিম্বানি নিশোর মৃত্যু শুধু মোরাভার নয়, সমগ্র পৃথিবীর জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। জুলিয়াস লিম্বানি নিশোর বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান জানানোর উদ্দেশে আগামী তিন দিন রাষ্ট্রীয় শোকদিবস হিসেবে পালন করা হবে। বিদেশে অবস্থিত মোরাভার দূতাবাসগুলিতে এই উপলক্ষে শোক-বই খোলা হয়েছে। রাজধানীর প্রতিটি ভবনে পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে।'

জুলিয়াস নিশো হালকা স্বরে বললেন, 'ফোর্টনকেও কি পতাকা অর্ধনমিত?' মাওয়া হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। নিশো মাথা নিচু করে হাসলেন।

৩

অনেকক্ষণ ধরে ফোন বাজছে।

ফকনার বসে আছে পাশেই, কিন্তু রিসিভার তুলছে না। কানের পাশে ফোন বাজা একটি বিরক্তিকর ব্যাপার। কিন্তু লোকটি বিরক্ত হচ্ছে না। নির্বিকার ভঙ্গিতে সিগারেট ফুঁকছে। মাঝে-মাঝে ভুরু কোঁচকাচ্ছে, যা থেকে মনে হতে পারে কোনো-একটি বিষয় নিয়ে সে চিন্তিত।

হার্ভি ফকনার হচ্ছে সেই জাতীয় লোক, যাদের বয়স বোঝা যায় না। এর জুলফির সমস্ত চুল পাকা। বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে হতে পারে। মাঝারি আকৃতির মানুষ। রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রঙ। চোখ দু'টি অস্বাভাবিক ছোট। বিড়ালের চোখের মতো জ্বলজ্বলে। সমস্ত মুখাবয়বে একটি ছেলেমানুষি ভাব আছে, তীক্ষ্ণ চোখের কারণে যা কখনো স্পষ্ট হয় না।

টেলিফোন বেজেই যাচ্ছে। ফকনার রিসিভার এক বার তুলেই নামিয়ে রাখল। যদি ও-পক্ষের প্রয়োজন খুব বেশি হয় আবার করবে।

প্রয়োজন বেশ আছে মনে হচ্ছে। আবার টেলিফোন বাজছে। ফকনার সিগারেটে শেষ টান দিয়ে রিসিভার তুলল।

'হ্যালো।'

'হার্ভি ফকনার?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কথা বলছি।'

'আমি কি আপনার সঙ্গে একটি জরুরি বিষয় নিয়ে আলাপ করতে পারি?'

'তার আগে আপনার নাম বলুন।'

'নাম বললে আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না।'

'আমি অপরিচিত কারো সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলি না।'

ফকনার নির্বিকার ভঙ্গিতে টেলিফোন নামিয়ে রাখল। এটা প্রায় নিশ্চিত, লোকটি আবার টেলিফোন করবে। প্লাগ খুলে রাখলে কেমন হয়? ফকনার দ্বিতীয় বার সিগারেট ধরিয়ে বাথরুমে ঢুকল। দু' দিন শেভ করা হয় নি। গালভর্তি নীলচে দাড়ি। হেমিংওয়ের মতো দাড়ি রাখার একটা পরিকল্পনা ছিল। এখন মনে হচ্ছে সেটা সম্ভব নয়, গাল চুলকাচ্ছে। কিন্তু দাড়িগুলির ওপর একটি মায়া পড়ে গেছে। থাকুক না-হয় কিছুদিন, তারপর দেখা যাবে। ফকনার আয়নায় নিজের ছবির দিকে তাকাল। লোকটিকে চেনা যাচ্ছে না, যেন অপরিচিত কেউ।

টেলিফোন আবার বাজতে শুরু করেছে। বাজুক। তার এমন কোনো ঘনিষ্ঠ মানুষ নেই, যারা এ-রকম সাত-সকালে ব্যাকুল হয়ে টেলিফোন করবে। ফকনার মনে-মনে বলল, "আই হ্যাপেন্ড টু বি এ লোনলি ম্যান।" কার কবিতা যেন এটা? এ্যান্থনি স্কীলম্যান?

মনে পড়ছে না। স্মৃতিশক্তি আগের মতো নেই। বাথরুমের বেসিনে গত রাতের অভুক্ত খাবারসুদ্ধ প্লেট পড়ে আছে। দূষিত একটা গন্ধ চারদিকে। মেঝেতে তিনটি বিয়ারের খালি ক্যান। লোনলি ম্যান হবার অনেক রকম ঝামেলা।

হেল্পিং হ্যান্ডজাতীয় কাউকে পাওয়া গেলে মন্দ হত না। ঘর পরিষ্কার করে রাখত। বললেই পারকুলেটর চালু করে কফি বানিয়ে আনত। কফির কথা মনে হতেই তার কফির তৃষ্ণা হল।। ক্রীম, সুগারবিহীন 'র-কফি'। ব্রাজিলিয়ান বিন্‌স্‌ থেকে টাটকা তৈরি, যার গন্ধেই স্নায়ু সতেজ হয়ে ওঠে।

টেলিফোন এখনও বাজছে। ফকনার বিরক্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল—

'হ্যালো।'

'আমি লিজা, লিজা ব্রাউন।'

ফকনার চিনতে পারল না। মেয়েদের নাম তার মনে থাকে না।

'তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না?'

'চিনতে পারব না কেন? কেমন আছ লিজা?'

'তাহলে এমন রাগী-রাগী গলায় কথা বলছ কেন?'

'সকালবেলা ঘুম ভাঙলে আমার খুব মেজাজ খারাপ থাকে তো, তাই।'

'রাতে খুব ড্রিংক করেছ, তাই না?'

'খুব না, তিন ক্যান বিয়ার। তিন ক্যান বিয়ার খেলে একটা মৌমাছির নেশা হয়, কিন্তু আমি মৌমাছি না।'

'তুমি সবসময় এমন মজার-মজার কথা বল কেন?'

মেয়েটি খিলখিল করে হাসতে লাগল। হাসির শব্দটা চেনা। হাসি থেকে মেয়েটিকে চেনা যাচ্ছে। নর্থ অ্যাভিন্যুর পিজা পার্লারের মেয়ে। হাসি-রোগ আছে মেয়েটির। অকারণে হাসবে এবং বকবক করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গত সপ্তাহে পিজা এনে দিয়ে গিয়েছিল। অন্যদের মতো প্যাকেট নামিয়ে রেখেই চলে যায় নি। হাসিমুখে বলেছে, 'পিজা ছাড়া তুমি কিছু খাও না? প্রায়ই তোমাকে পিজা পার্লারে দেখি। তুমি নিশ্চয়ই ইটালিয়ান নও?'

'না, ইটালিয়ান নই। পিজাও খুব পছন্দ করি না। সস্তা বলে খাই। আমি একজন দরিদ্র ব্যক্তি।'

'তোমার ঘর এত নোংরা কেন?'

ফকনার হেসে ফেলল।

'হাসছ কেন? নোংরা ঘর আমার ভালো লাগে না। গা জ্বলে।'

'আমি মানুষটি খুব পরিষ্কার, কাজেই আমার ঘর নোংরা। যে-সব মানুষের ঘরদুয়ার খুব পরিষ্কার, তারা মানুষ হিসেবে নোংরা।'

'কই, আমি তো মানুষ হিসেবে ভালোই। কিন্তু আমার ঘর তো খুব পরিষ্কার, ঝকঝকে।'

'আমার থিওরি শুধু ছেলেদের জন্যেই। মেয়েদের জন্যে নয়। মেয়েদের বেলায় উল্টোটা।'

'তুমি তো খুব চালাক মানুষ!'

ফকনার মেয়েটির চেহারা মনে করতে চেষ্টা করল। চেহারা মনে পড়ছে না। তার মানে মনে রাখার মতো চেহারা নয়। সুন্দরী মেয়েদের চেহারা মনে থাকে। এই মেয়েটিকে নিয়ে সে কি কখনো বাইরে খেতে গিয়েছে? মনে হয় গিয়েছে। কারণ সে কথা বলছে অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গিতে। ফকনার মনে করতে চেষ্টা করল লিজা ব্রাউন নামের কাউকে নিয়ে সে ডেটিং-এ গিয়েছে কি না।

'হ্যালো, তুমি কথা বলছ না কেন?'

'কী বলব?'

'পিজার অর্ডার দিলে দুপুরবেলা নিয়ে আসতে পারি। আনব?'

'আনতে পার।'

'তার মানে, তোমার খুব-একটা ইচ্ছা নেই।'

'ইচ্ছা থাকবে না কেন, ইচ্ছা আছে। সুন্দরী মেয়েদের সামনে বসিয়ে পিজা খেতে আমার ভালোই লাগে।'

'আমি সুন্দরী, তোমাকে কে বলল?'

'আমার কাছে পৃথিবীর সব মেয়েকেই সুন্দরী মনে হয়। সবাইকে মনে হয় হেলেন অব ট্রয়।'

'তুমি এত মজার কথা বল কেন?'

'আমি মানুষটি মোটেই মজার নই, সে-জন্যেই বোধহয়। আচ্ছা শোন, আমি কি কখনো তোমাকে নিয়ে বাইরে খেতেটেতে গিয়েছি?'

লিজা ব্রাউন অবাক হয়ে বলল, 'তোমার মনে নেই?'

'না।'

'তার মানে, তুমি অসংখ্য মেয়েকে নিয়ে ডেটিং-এ গেছ?'

ফকনার কিছু বলল না। লিজা ব্রাউন বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি আসব দুপুরে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকনার টেলিফোন নামিয়ে বাথরুমে ঢোকামাত্র কলিংবেল বাজল। কলিংবেলের শব্দ থেকে যে এসেছে তার সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। যেমন, অল্পবয়েসী মেয়েরা খুব ঘন–ঘন বেল বাজাবে। বৃদ্ধরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বেল টিপে ধরে থাকবে, সেই সঙ্গে কড়া নাড়বে। কিন্তু এখন যে বাজাচ্ছে, তার সম্পর্কে কোনো ধারণা করা যাচ্ছে না। ফকনার দরজা খুলল। নীল স্যুট–পরা লম্বা একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বীমা কোম্পানির এজেন্টদের মতো ছিমছাম একটা ব্রীফকেস। লোকটি মেয়েলি গলায় বলল, 'ভেতরে আসতে পারি?'

'আসুন।'

'আমিই কিছুক্ষণ আগে আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম। আমার নাম জন হপার।'

'বসুন। কি ব্যাপার, বলুন।'

'আমার কিছুক্ষণ সময় লাগবে।'

'আপনাকে দশ মিনিট সময় দেওয়া হল।'

'আধ ঘন্টা দিন।'

'ঠিক আছে, আধ ঘন্টা। কফি?'

'হ্যাঁ, কফি খেতে পারি।'

জন হপার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিক দেখতে লাগল, যেন ঘরের অবস্থা থেকে এর বাসিন্দা সম্পর্কে একটা ধারণা করতে চায়।

ফকনার কফির পেয়ালা হাতে করে তার সামনে এসে বসল। ভারি গলায় বলল, 'হ্যাঁ, এবার বলুন।'

'আপনি নিশ্চয়ই জেনারেল ডোফাকে চেনেন?'

'হ্যাঁ, ভালো পরিচয় আছে। আমি তার একটি কমান্ডো গ্রুপকে ট্রেনিং দিয়েছিলাম। গ্রুপের নাম ছিল প্যান্থার।'

'জুলিয়াস নিশোর সঙ্গে কি আপনার কখনো দেখা হয়েছিল?'

'না। রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে আমার কোনো উৎসাহ নেই।'

'জেনারেল ডোফার সঙ্গে কি আপনার কোনো যোগাযোগ আছে?'

'না। আমি হচ্ছি ভাড়াটে সৈন্য। যে টাকা দেবে তার হয়ে আমি কাজ করব। কাজ শেষ হলে চলে আসব। ডোফার কমান্ডো ইউনিট তৈরি হবার পর চলে এসেছি। আর কোনো যোগাযোগ হয় নি।'

'আপনি কি গতকালের খবরের কাগজ পড়েছেন?'

'না, খবরের কাগজ আমি পড়ি না। পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে, সে সম্পর্কে আমার কোনো উৎসাহ নেই।'

'তাহলে জুলিয়াস নিশোর মৃত্যুসংবাদ আপনি জানেন না?'

'তা জানি। টিভি নিউজ দেখেছি। সিবিএস ভালো কভারেজ দিয়েছে।'

'জুলিয়াস নিশোর মৃত্যু কি আপনার কাছে খুব রহস্যময় মনে হয় না?'

'দেখুন মিঃ হপার, মৃত্যুর মধ্যে কোনো রহস্য নেই। আপনি কী বলতে চান খোলাখুলি বলুন। আমি স্পষ্ট কথা ভালবাসি।'

'আপনি কি সাউথ আফ্রিকায় একটি মিশন পরিচালনা করতে পারবেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সেটা নির্ভর করে কী পরিমাণ টাকা পাওয়া যাবে তার ওপর এবং মিশনটি কী ধরনের তার ওপর।'

'জুলিয়াস নিশোকে ফোর্টনক থেকে বের করে আনা।'

'মৃত একজন মানুষকে বের করে আনার প্রয়োজনটি ধরতে পারলাম না।'

'জুলিয়াস নিশো বেঁচে আছেন।'

ফকনার সিগারেট ধরিয়ে দীর্ঘ টান দিয়ে শুকনো গলায় বলল, 'মিঃ হুপার, আপনি কে?'

'আমি সিআইএ-র সঙ্গে আছি।'

'আমার সঙ্গে কী ধরনের কথা বলার দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়েছে?'

'মিশন সম্পর্কে যদি আপনি উৎসাহী হন, তাহলে আপনাকে শিকাগোতে নিয়ে যাবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।'

'কখন যেতে চান?'

'আমরা এখনি রওনা হতে পারি।'

'যাবেন কিসে?'

'আমি সেনাবাহিনীর একটি বিমান নিয়ে এসেছি। একটা টু-সীটার।'

'আপনি নিজেই চালাবেন?'

'হ্যাঁ। আমি একজন বৈমানিক। এক সময় বিমানবাহিনীতে ছিলাম।

'বিষয়টি খুব জরুরি মনে হচ্ছে?'

'খুবই জরুরি।'

'টাকার ব্যাপারে সিআইএ কৃপণতা করবে না বলে আশা করতে পারি।'

'টাকা কোনো সমস্যা হবে না বলেই মনে করি। মিঃ ফকনার, আপনি তৈরি হয়ে নিন।'

'আমি তৈরিই আছি। শুধু একটা নোট লিখে দরজায় রেখে যাব।'

লিজা ব্রাউন পিজার প্যাকেট নিয়ে এসে দরজায় আটকানো নোটটি পড়ল।

'লিজা, তুমি খাবারের প্যাকেটটি দরজার বাইরে রেখে যাও। দেখা হল না বলে দুঃখিত। তারপর বল, তুমি কেমন আছ? ফকনার।

পুনশ্চ : খাবারের বিল আমি এসে মিটিয়ে দেব।'

লিজা ব্রাউন বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। মেয়েটির বয়স খুবই অল্প। সাদামাঠা চেহারা। মাথার চুল ছেলেদের মতো কাটা বলেই হয়তো সমস্ত চেহারায় একধরনের মায়াকাড়া ভাব এসেছে। সে কি কিছুটা হতাশ হয়েছে? হয়তো-বা। অল্পবয়সী মেয়েরা সহজেই হতাশ হয়।

৪

ফকনার ক্রমেই বিরক্ত হচ্ছিল।

তাকে এক ঘন্টার ওপর এন্ট্রি-রুমে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এন্ট্রি-রুমটি ছোট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলো-বাতাস নেই। বসার জন্যে চামড়ার গদিওয়ালা চেয়ারগুলি নোংরা। সমস্ত মেঝেতে সিগারেটের ছাই। এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের এন্ট্রি রুমের এই অবস্থা কেন? নাকি ইচ্ছা করেই এ-রকম রাখা হয়েছে মনের ওপর চাপ ফেলবার জন্যে।

দেড় ঘন্টার মাথায় তাকে জানানো হল, জেনারেল সিমসন ব্যস্ত, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ডাক পড়বে। তাকে একজন কে এসে এক কাপ কফি দিয়ে গেল। ইন্সট্যান্ট কফি—এমন একটা গন্ধ, নাকে গেলেই বমি-বমি ভাব হয়।

জেনারেল সিমসনের অফিসের দরজা খুলল। অল্পবয়সী একটি তরুণ (সম্ভবত জেনারেলের পিএ) এসে বলল, 'মিঃ ফকনার, আপনি আসুন।' সে ফকনারকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে যে-ছোটখাটো মানুষটি বসে আছেন, তাঁকে ফকনারের মোটেই পছন্দ হল না। জেনারেল সিমসনের বয়স ষাটের কোঠায়। শরীর অশক্ত। মাথায় একগাছিও চুল নেই। মাথা নিচু করে বসে-থাকা মানুষটিকে দেখেই মনে হয় অনেক ধরনের রোগ-ব্যাধি এঁকে ধরে আছে। পিঙ্গল বর্ণের চোখ। তাকানোর ভঙ্গিতে একধরনের অবহেলা আছে, যা অন্যদের মনে হীনমন্যতা ঢুকিয়ে দেয়। জেনারেল সিমসন ভারি স্বরে বললেন, 'আপনিই ফকনার? কর্নেল ফকনার?'

'হ্যাঁ।'

'বসুন।'

ফকনার বসল। সে আশা করেছিল জেনারেল সিমসন উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করবেন। তিনি তা করলেন না, যেন ফকনার একজন ছোট পদের অধস্তন কর্মচারী। তার সঙ্গে বাড়তি সৌজন্য দেখানোর প্রয়োজন নেই।

জেনারেল সিমসন কিছুক্ষণের জন্যে একটা ফাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। টেলিফোনে কাকে যেন কী-সব বললেন। এও একধরনের চাল। চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো—তুমি অত্যন্ত নগণ্য ব্যক্তি। বসে থাক চুপচাপ। আমার কাজ শেষ হোক, তারপর দেখা যাবে।

'সেনাবাহিনী থেকে আপনাকে ডিসচার্জ করা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

ফকনার ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'কেন করা হয়েছিল তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন। যে-প্রশ্নের উত্তর জানেন, তার উত্তর আবার শোনাবার কারণ দেখি না।'

ফকনার সিগারেট ধরাল। সে তার বিরক্তি চেপে রাখতে পারছিল না। জেনারেল সিমসন বললেন, 'আমি নন-স্মোকার, তামাকের গন্ধ আমার সহ্য হয় না। দয়া করে সিগারেটটি ফেলে দিন।'

'আমি বরং পাশের ঘরে গিয়ে সিগারেট শেষ করে আসি। ইতোমধ্যে আপনার যা বলবার ঠিকঠাক করে রাখুন। লম্বা ধরনের আলাপ-পরিচয় আমার পছন্দ নয়।'

'মিঃ ফকনার, লম্বা আলাপ আমারও পছন্দ নয়। আপনি সিগারেট নিয়েই বসুন। আপনাকে কী জন্যে ডাকা হয়েছে আপনি তা জানেন, আশা করতে পারি।'

'কিছু জানি।'

'জুলিয়াস নিশোকে ফোর্টনকে আটকে রাখা হয়েছে। তাঁকে এ-মাসের ২৬ কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৭ তারিখে হত্যা করা হবে।'

'তার আগে নয় কেন?'

'এ–মাস হচ্ছে জেনারেল ডোফার জন্মমাস। জন্মমাসে আফ্রিকানরা হত্যার মতো বড় অপরাধ করে না, ওদের অনেক রকম কুসংস্কার আছে।'

'মাস তো শেষ হবে ত্রিশ তারিখে। ২৬/২৭ বলছেন কেন?'

'চান্দ্রমাসের কথা বলছি। আফ্রিকানরা চান্দ্রমাস মেনে চলে।'

'আপনি নিশ্চিত যে, ২৬/২৭ তারিখের আগে নিশোকে হত্যা করা হবে না?'

'নব্বই ভাগ নিশ্চিত। দশ ভাগ আনসারটিনিটি সবসময়ই থাকে। এখন আপনিই বলুন, জুলিয়াস নিশোকে এই সময়ের ভেতর কি উদ্ধার করা সম্ভব?'

'জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।'

'এটা একটা ছেলেমানুষি কথা, পৃথিবীতে অনেক কিছুই অসম্ভব। আমার সঙ্গে ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে কোনো কথা বলবেন না। আপনি আমাকে বলুন, এই মিশন গ্রহণ করতে আপনি রাজি আছেন?'

ফকনার লোকটিকে পছন্দ করতে শুরু করল। এ কাজের লোক। কথাবার্তার ধরন দেখেই টের পাওয়া যাচ্ছে। এবং এর সঙ্গে কথাবার্তা হওয়া উচিত সরাসরি। কথার মারপ্যাঁচ না–দেখালেও চলবে।

'বলুন, রাজি আছেন?'

'হ্যাঁ বলবার আগে সব ভালোমতো জানতে চাই।'

'আপনি সবকিছুই জানবেন। আপনার জন্যে কয়েকটি ফাইল তৈরি করা হয়েছে। এগুলি ভালো করে পড়ুন। কাল সকাল ন'টায় আপনি হ্যাঁ কিংবা না বলবেন।'

'ঠিক আছে, তা বলব।'

'অবশ্যি আপনি হ্যাঁ বললেই যে আমরা মিশনটি আপনার হাতে দেব, তেমন কোনো কথা নেই। আমরা অন্য লোকজনদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলছি।'

'ভালো। বাজার যাচাই করে নেওয়াই ভালো।'

'কর্নেল ফকনার, আপনাকে একটা কথা বলা......

'আমাকে কর্নেল বলবেন না। সেনাবাহিনী আমি অনেক আগে ছেড়ে এসেছি।'

'মিঃ ফকনার, আমি যে–জিনিসটি বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে......'

'ফাইলগুলো পড়ার আগে আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না।'

'ঠিক আছে।'

'আমি এখন তাহলে উঠি।'

'বেশ। দেখা হবে কাল ন'টায়।'

ফকনার ঘর থেকে বেরুবার আগ মুহূর্তে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। শান্ত স্বরে বলল, 'সিআইএ জুলিয়াস নিশোকে উদ্ধার করতে চাচ্ছে কেন?'

'উনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।'

'বিখ্যাত ব্যক্তিদের উদ্ধার করার মতো কোনো মহৎ আদর্শ তাদের আছে বলে আমার জানা নেই।'

'আমরা জেনারেল ডোফার পতন দেখতে চাই। মোরান্ডার সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্কের প্রয়োজন আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী প্রয়োজন?'

'মোরান্ডায় কপারের এবং মলিবডিনামের খনি আছে। পৃথিবীর বেশির ভাগ মলিবডিনাম আসে মোরান্ডা থেকে। আমরা চাই না সেই মলিবডিনাম আমাদের হাতছাড়া হয়ে অন্য ব্লকে চলে যাক।'

'আপনার ধারণা, জুলিয়াস নিশো ক্ষমতায় থাকলে মলিবডিনাম বা কপার ভিন্ন ব্লকে যাবে না?'

'সম্ভবত না। যদি যায়, তাহলে তাঁকেও সরানো হবে। কাউকে সরানো তেমন কঠিন কিছু নয়।'

ফকনার তাকিয়ে রইল। তার বেশ মজা লাগছে। আরেকটি সিগারেট ধরাবার ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু ঠিক ভরসাও হচ্ছে না। এবার হয়তো সে চেঁচিয়ে উঠবে।

'সাধারণত আমরা কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলি। এ-ক্ষেত্রে তা সম্ভব হচ্ছে না—কারণ, জেনারেল ডোফার সৈন্যবাহিনী তার খুবই অনুরক্ত। যে-কারণে নিতান্ত অনিচ্ছায় আমাদের বাইরের সাহায্য নিতে হচ্ছে। ভালো কি মন্দ, সেটা আপনার দেখার কথা নয়। আপনি দেখবেন আপনাকে যথেষ্ট টাকা দেওয়া হয়েছে কি না।'

'তাও ঠিক। আমি কি এখন যেতে পারি?'

'পারেন। এন্ট্রি-রুমে অপেক্ষা করুন, আপনাকে ফাইলপত্র দেওয়া হবে। গুড ডে মিঃ ফকনার।'

'গুড ডে।'

জেনারেল সিমসন নন-স্মোকার, সিগারেটের গন্ধ তাঁর সহ্য হয় না—কথাটা ঠিক নয়। ফকনার চলে যাবার পরপরই তিনি একটি চুরুট ধরালেন।

তাঁর হাতে লাল মলাটের একটি ফাইল। ফকনারের ওপর সিক্রেট সার্ভিসের তৈরি একটি গোপন রিপোর্ট। লাল মলাটের ফাইলের অর্থ হচ্ছে, এ একজন অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যক্তি এবং সিক্রেট সার্ভিস তার ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখছে। জেনারেল সিমসন চশমার কাঁচ পরিষ্কার করলেন এবং গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে শুরু করলেন—

এস ফকনার জুনিয়র

০ জন্ম ১৩ই নভেম্বর, ১৯৩০। সেইন্ট জোসেফ হসপিটাল। ফার্গো নর্থ ডেকোটা।

[বাবা-মা'র সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। এস ফকনার আত্মীয়স্বজন সম্পর্কিত খবরাখবর ফাইল নং কগ ৩০২। ৩১১ ল প ৩৩-এ আছে। মাইক্রো ফিল্ম কোড BCL 3443026-A2]

০ ব্লাড গ্রুপ : O পজিটিভ RH পজিটিভ।

০ সেনাবাহিনী থেকে ডিসচার্জ করা হয় ১৪ই অক্টোবর, ১৯৬৮। [ডিসচার্জের কারণ সম্পর্কিত খবরাখবরের মাইক্রো ফিল্ম কোড : BCL 3443025-A2]

০ সাউথ আফ্রিকায় সিআইএ'র পক্ষে দুটি মিশন পরিচালনা করেন। [মিশন দুটির ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট ফাইল নাম্বার কগ ৩০২/৩১১ বস ৩২-এ আছে। মাইক্রো ফিল্ম কোড BCL3443027-A2] কোনো রকম রাজনৈতিক মতাদর্শ নেই, ত কিছু উগ্র বামপন্থী বন্ধুবান্ধব আছে। [তাঁর বন্ধুবান্ধবদের ওপর একটি রিপোর্ট ফাইং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম্বার কগ ৩০২/৩১১ বস ৩৪-এ আছে। মাইক্রো ফিল্ম কোড BCL3443029-A2]

০ মোরাভায় জেনারেল ডোফার সৈন্যবাহিনীর একজন ট্রেনার হিসেবে কিছুদিন ছিলেন। [এই প্রসঙ্গে কোনো পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি হয় নি। সংগৃহীত তথ্যাবলী মাইক্রো ফিল্ম কোড: BCL 3443029-A2-তে সংরক্ষিত আছে। তথ্যাবলী খুব নির্ভরযোগ্য নয়।]

০ জুয়া খেলতে পছন্দ করেন। মদ্যপান করেন। মেয়েমানুষ ও অর্থের প্রতি অস্বাভাবিক দুর্বলতা আছে। [তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাপন পদ্ধতির ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট মাইক্রো ফিল্ম কোড BCL 3443030-A2-তে সংরক্ষিত আছে।]

জেনারেল সিমসনের চুরুট নিভে গিয়েছিল। তিনি অনেকটা সময় নিয়ে চুরুট ধরালেন এবং ফকনার প্রসঙ্গে যে-ক'টি রিপোর্ট তৈরি আছে তার সব ক'টি আনতে বললেন। তাঁর পিএ বলল, 'কফি বা অন্য কিছু কি খাবেন?'

তিনি তার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ফকনারকে কেমন লাগল তোমার?'

'তাঁর সম্পর্কে আমি জানি। উনি একজন ভয়ানক মানুষ!'

জেনারেল সিমসন মৃদু হাসলেন, তার অর্থ ঠিক বোঝা গেল না।

ফকনারকে দুটি ফাইল দেওয়া হয়েছে। ফাইল দুটি যে নিয়ে এসেছে তার বয়স খুবই অল্প। লাজুক স্বভাবের একজন। সে বলল, 'আপনি যদি চান আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি।'

'কেন?'

'ফাইলের অনেক রেফারেন্স হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন না। সেগুলি বুঝিয়ে দিতে পারি। আমার সমস্তই ভালো করে পড়া আছে।'

'আমি চেষ্টা করব নিজে-নিজে বুঝতে।'

ফকনার উঠে দাঁড়াল। তরুণ অফিসারটি অবাক হয়ে বলল, 'আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন?'

'কোনো-একটি হোটেলে। সস্তায় হোটেল কোথায় পাওয়া যাবে, আছে আশেপাশে?'

'আছে। কিন্তু আপনি তো কোনো হোটেলে যেতে পারবেন না।'

'কেন?'

'আপনার সঙ্গে যে-দুটি ফাইল আছে, সে-দুটি এই ভবনের বাইরে নেওয়া যাবে না।'

'তার মানে, আজ রাতে আমাকে এখানে থাকতে হবে?'

'হ্যাঁ। আপনার কোনো রকম অসুবিধা হবে না। আমাদের গেস্টরুমটি চমৎকার।'

'আর আমি যদি ফাইল পড়তে না চাই। যদি এই মিশন সম্পর্কে উৎসাহী না হই, তাহলে?'

'তাহলে আপনি চলে যেতে পারেন। তবে আমার মনে হয় আপনি যাবেন না। কারণ আপনি ইদানীং খুব অর্থকষ্টে আছেন।'

ফকনার ক্লান্ত স্বরে বলল, 'নিয়ে চলুন আপনার গেস্টরুমে। প্রচুর হুইস্কির ব্যবস্থা রাখবেন। মাঝে-মাঝে মাতাল হতে আমার ভালো লাগে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনার জন্যে হার্ড ড্রিংক–এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আপনার যদি বিশেষ ধরনের কোনো হুইস্কির প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকে তবে তা বলতে পারেন, ব্যবস্থা করব।'

'কারোর প্রতি আমার কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। পৃথিবীর সমস্ত মদ এবং সমস্ত নারী আমার কাছে একধরনের মনে হয়।'

৫

জুলিয়াস নিশোর ঘুম ভাঙল ভোর পাঁচটায়। তিনি অবশ্যি তা বুঝতে পারলেন না। তাঁর ঘড়িটি নষ্ট হয়ে গেছে। ঘড়ি ছাড়া এখানে সময় বোঝার অন্য কোনো উপায় নেই। মাথার অনেক ওপরে ছোট্ট একটি ভেন্টিলেটার আছে। সেখান থেকে তেমন কোনো আলো আসে না। এলেও তা ধরা যায় না, কারণ ঘরে দিন–রাত্রি দু' শ' পাওয়ারের একটি বাতি জ্বলে। তিনি বাতিটি রাতের বেলা নিভিয়ে দেবার জন্যে মাওয়াকে বলেছিলেন। মাওয়া বিনীত ভঙ্গিতে বলেছে, 'কাল থেকে বাতি রাতের বেলা জ্বলবে না।' কিন্তু ঠিকই জ্বলেছে। একই অনুরোধ দ্বিতীয় বার করতে তাঁর ইচ্ছা হয় নি।

মাওয়াকে তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। তিনি যা বলেন, সে তাতেই সঙ্গে–সঙ্গেই রাজি হয়—কিন্তু রাজি হওয়া পর্যন্তই। একটা ঘড়ির কথা বলেছিলেন, মাওয়া সঙ্গে–সঙ্গে বলেছে, 'কাল আসার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসব।' তিনি বলেছিলেন, 'আজ দেওয়া যায় না?'

'ঠিক আছে স্যার, নিয়ে আসছি। এক ঘন্টার মধ্যে আসব।'

তিনি অপেক্ষা করেছেন। সে আসে নি। মানুষ পশু না। তার চরিত্র এমন হবে কেন? ঘড়ি সে দেবে না, এটা স্পষ্ট করে প্রথম বারেই কি বলে দেওয়া যেত না?'

জুলিয়াস নিশো ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। এখন ঠাণ্ডা লাগছে। সূর্য ওপরে ওঠার সঙ্গে–সঙ্গে তাপ বাড়তে থাকবে। বাতাস থাকবে না। অসহনীয় উত্তাপ। তারপর রাতের বেলা আবার শীত নামতে শুরু করবে। সেই শীতও অসহনীয়। আসলে বয়স হয়েছে, এই বয়সে শরীর অশক্ত হয়ে পড়ে। সামান্য শীতও শরীরের হাড়ে গিয়ে বেঁধে।

নিশো বিছানা থেকে নামলেন। মাওয়াকে ধন্যবাদ দিলেন মনে–মনে, কারণ সে একটি কাজ করেছে। লেখার জন্যে টেবিল–চেয়ার দিয়েছে। সময় কাটানোর জন্যে তিনি একটি লেখায় হাত দিয়েছেন। নাম দিয়েছেন—কালো মানুষ : সাদা মানুষ। নামটি প্রথম দিন ভালো লেগেছিল, দ্বিতীয় দিনে লাগে নি। দ্বিতীয় দিনে নাম দিলেন—এক কালো মানুষ। সেই নামও এখন পছন্দ হচ্ছে না। তিনি আজ সেই নাম কেটে লিখলেন—কালো মানুষ। ছোট নামই ভালো। কিন্তু লেখা এগুচ্ছে না। তিনি ভেবে রেখেছেন খুব হালকা ধরনের একটি লেখা লিখবেন। নানান রকম রসিকতার মধ্য দিয়ে কালো মানুষের দুঃখ তুলে আনবেন। কিন্তু লেখা ভারিক্কি ধরনের হয়ে যাচ্ছে।

নিশো কলম হাতে দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। তাঁর ক্ষুধাবোধ হচ্ছে। মাওয়া কখন আসবে কে জানে! গরম এক কাপ কফি খেলে হত।

মাথায় সূক্ষ্ম যন্ত্রণাও হচ্ছে। চোখের সামনে দু' শ' পাওয়ারের বাল্ব নিয়ে ঘুমানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুশকিল। আজ আরেক বার অনুরোধ করে দেখলে কেমন হয়?

ফোর্টনকের মাঠে সম্ভবত পিটি হচ্ছে। তালে-তালে হাত-পা ফেলার শব্দ হচ্ছে। এই শব্দগুলি শুনতে ভালো লাগে। তিনি দীর্ঘ সময় মন দিয়ে শব্দগুলি শুনলেন। মনে-মনে সৈন্যদের তালে-তালে হাত-পা ফেলার দৃশ্যটি দেখতে চেষ্টা করলেন। সারি বেঁধে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পরনে খাকি হাফ-প্যান্ট। গায়ে ধবধবে সাদা গেঞ্জি। সূর্যের আলো এসে পড়েছে তাদের ঘামে-ভেজা চকচকে কালো মুখে। কালো রঙের মতো সুন্দর কি কিছু আছে?

তাঁর মাথার যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়ছে। তিনি আবার এসে বিছানায় শুলেন। হাত বাড়িয়ে একটি মোটা বই নিলেন। পড়বার জন্যে মাওয়া দিয়ে গিয়েছে। নিতান্তই বাজে বই। একটি কালো ছেলের প্রেমে পড়েছে সাদা মেয়ে। মেয়েটি ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে জঙ্গলে। মেয়ের বাবা তাকে ধরবার জন্যে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বন ঘিরে ফেলেছে। অসম্ভব সব ব্যাপার। পাতায়-পাতায় রগরগে সমস্ত বর্ণনা। মেয়েটি ছেলেটিকে চুমু না-খেয়ে সেকেন্ডও থাকতে পারছে না। এবং চুমু খাবার সময় ছেলেটির হাত চলে যাচ্ছে বিশেষ-বিশেষ জায়গায়।

নিশো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। এ-জাতীয় বই পড়বার বয়স তাঁর নেই। শারীরিক বর্ণনায় তিনি এখন আর উত্তেজনা বোধ করেন না।

মাওয়া যখন ঘরে ঢুকল, তখন নিশো ঘুমুচ্ছেন। তাঁর গা ঈষৎ উষ্ণ। রাতে ঠাণ্ডা লেগেছে। জ্বরজারি হতে পারে। তালা খোলার শব্দে তিনি জেগে উঠে স্বভাবসুলভ সতেজ গলায় বললেন, 'মাওয়া, সুপ্রভাত।'

'সুপ্রভাত মিঃ নিশো। রাতে ভালো ঘুম হয়েছে?'

'এই অবস্থাতে ভালোই বলা চলে। অবিশ্যি শেষরাতের দিকে ঠাণ্ডায় কষ্ট পেয়েছি। আরেকটি গরম কম্বলের ব্যবস্থা করা যাবে?'

'নিশ্চয়ই যাবে। আমি আজ বিকেলেই নিয়ে আসব।'

জুলিয়াস নিশো সামান্য হেসে বললেন, 'তুমি পলিটিশিয়ানদের মতো কথা বল। অনেক কিছুই নিয়ে আসার কথা বল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই আসে না।'

মাওয়া গম্ভীর গলায় বলল, 'কম্বল বিকেলের মধ্যেই পাবেন।'

'মাথার ওপরে এই বাতি—এটা কি নিভিয়ে রাখা যায়?'

'এই বাতি রাত ন'টার পর থেকে জ্বলবে না।'

মাওয়া খাবারের প্যাকেট টেবিলে সাজিয়ে রাখল। ফ্লাস্কে কফিও আছে। ভালো কফি। খাবারগুলি যত্ন করে তৈরি করা। সৈন্য বা কয়েদিদের সাধারণ খাবার নয়।

'মাওয়া, এই খাবারগুলি কে রান্না করে?'

'আমার স্ত্রী ও বড় মেয়ে।'

'চমৎকার রান্না। তাদের আমার ধন্যবাদ দিও।'

'ধন্যবাদ দেওয়া যাবে না। কারণ, আপনি যে এখানে আছেন, এটা তাদের জানানো যাবে না।'

'যখন আমি এখানে থাকব না, কিংবা এই পৃথিবীতেই থাকব না, তখন দিও। তাদের বলবে, আমি সারা জীবন খাওয়াদাওয়া নিয়ে কষ্ট করেছি, কিন্তু জীবনের শেষ দিনগুলিতে খুব ভালো খানাপিনা করেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি বলব।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাওয়া ওঠার উপক্রম করল। নিশো বললেন, 'বাইরের কী খবর? আমার মৃত্যুসংবাদ দেশবাসী কীভাবে নিয়েছে?'

'আমি জানি না কীভাবে নিয়েছে, বাইরের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। ফোর্টনক শহর থেকে অনেক দূরে।'

'তা অবশ্যি দূরে। তোমার স্ত্রী, কন্যা? ওরা খবরটা কীভাবে নিয়েছে?'

'জানি না, মিঃ নিশো। আমি আমার স্ত্রী–কন্যার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলাপ করি না। রাজনীতি মেয়েদের বিষয় নয়।'

'রাজনীতি কোথায়, তুমি কথা বলবে একটি মানুষের মৃত্যু নিয়ে!'

'আমি কথা কম বলি।'

'আমরা এমন একটি দেশে বাস করি, যেখানে কথা কম বলাটাই বড় মানবিক গুণ বলে ধরা হয়। অথচ আমি সারা জীবন স্বপ্ন দেখেছি একটি দেশের, যেখানে আমরা সবাই ইচ্ছেমতো বকবক করতে পারব।'

মাওয়া আর দাঁড়াল না। নিশো গভীর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। মাওয়া কম্বল নিয়ে এল না। দু' শ' পাওয়ারের বাতি জ্বলতেই থাকল।

৬

জেনারেল সিমসন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ফকনারের কাছ থেকে পাওয়া এ–জবাব তিনি যেন আশা করেন নি। তিনি চশমা খুলে চশমার কাচ পরিষ্কার করলেন। টেবিলে রাখা পানির গ্লাসে ছোট্ট একটি চুমুক দিয় মৃদুস্বরে বললেন, 'আপনি সত্যি–সত্যি মিশনটির ব্যাপারে আগ্রহী নন?'

'না।'

'আপনি কি সমস্ত কাগজপত্র ভালোমতো দেখেছেন?'

'দেখেছি বলেই বলছি, এটা অসম্ভব। ফোর্টনকে আক্রমণ করা মাত্রই জেনারেল ডোফার প্রেসিডেন্ট ব্যাটালিয়ানে খবর পৌছবে। এরা হেলিকপ্টার নিয়ে দশ মিনিটের ভেতরে চলে আসতে পারবে। স্থলপথে আসতে ওদের লাগবে খুব বেশি হলে দেড় ঘন্টা। ওদের রুখতে আমার দরকার পুরোপুরি একটা সৈন্যবাহিনী। আর্টিলারি সাপোর্ট।'

জেনারেল সিমসন মৃদুস্বরে বললেন, 'দেড় ঘন্টার মধ্যেই যদি কাজ সেরে আপনারা আকাশে উড়তে পারেন, তাহলে কেমন হয়?'

'কীভাবে উড়ব?'

'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তৈরি একটা পুরোনো ধরনের রানওয়ে আছে। সেখানে দেড় ঘন্টার ভেতর একটা বিমান পাঠাতে পারি।'

'রানওয়ে ফোর্টনক থেকে কত দূরে?'

'পঞ্চাশ মাইলের কম। সত্তর কিলোমিটার।'

'সম্ভব নয়। ডোফা নির্বোধ নয়। প্রথমেই সে রানওয়ে দখল করবার জন্যে সৈন্য পাঠাবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোনারেল সিমসন মৃদুস্বরে বললেন, 'আপনাকে আমি যথেষ্ট সাহসী ভেবেছিলাম।'

'আমি সাহসী। সাহসী মানেই কিন্তু নির্বোধ নয়। আচ্ছা, আমি উঠি।'

'একটু বসুন। এক মিনিট।'

ফকনার বসল। বিরক্ত ভঙ্গিতে সিগারেট ধরাল।

সিমসন কিছুই বলছেন না। শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এক মিনিট অপেক্ষা করতে বলার কারণ ধরা যাচ্ছে না।

'এক মিনিট হয়ে গেছে মিঃ সিমসন।'

সিমসন নড়েচড়ে বসলেন। ভারি গলায় বললেন, 'মিশনটি আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। আপনি না করলে অন্য কাউকে দিয়ে করাতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই, আপনি এটি পরিচালনা করুন। আপনার যত রকম সাহায্য-সহযোগিতা দরকার, আপনি সব পাবেন।

আমরা আপনাকে এবং আপনার সঙ্গী-সাথীকে রাতের বেলা ফোর্টনকের পাঁচ মাইলের ভেতর নামিয়ে দেব এবং বেবিয়ে আসবার জন্যে পুরোনো রানওয়েতে বিমান থাকবে। যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা ছাড়াও আপনার প্রাপ্য টাকার পুরোটাই আপনাকে অগ্রিম দেওয়া হবে। টাকার পরিমাণ শুনলে আপনার ভালো লাগবে।'

'কত টাকা?'

'এক মিলিয়ন ইউএস ডলার। অনেক টাকা।'

'এক মিলিয়ন ইউএস ডলার তো আমি একাই নেব। আমার সঙ্গী-সাথীরা কী পাবে?'

'ক'জন থাকবে আপনার দলে?'

'তিন জন অফিসার, পাঁচ জন এনসিও এবং পঞ্চাশ জন কমান্ডো।'

'এদের জন্যে কত চান আপনি?'

'দু' মিলিয়ন ইউএস ডলার।'

'আমি রাজি আছি।'

'আমি যে-তিন জন অফিসার নেব, তাদের একজনের নাম জনাথন। এন্ড্রু জনাথন। সে শিকাগোতে আত্মগোপন করে আছে। আপনারা তাকে খুঁজে বের করবেন এবং আমার কাছে পৌঁছে দেবেন।'

সিমসন তাকিয়ে রইলেন, কিছু বললেন না।

'আমার দ্বিতীয় অফিসার ইউটার জেলে বন্দি। তাকেও আমার কাছে পৌঁছে দেবেন।'

'তা কী করে সম্ভব! এক জন কয়েদিকে বের করে আপনার সঙ্গে দেওয়া চলে না। আপনি অদ্ভুত কথা বলছেন!'

'আমি আমার শর্তগুলির কথা বলছি। তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, আমার দলের ট্রেনিংয়ের জন্য প্রথম শ্রেণীর সুযোগ-সুবিধা আছে, এমন একটি জায়গা দরকার। গামাল হাসিম নামে আরো এক জন ব্যবসায়ীকে আমার প্রয়োজন। এবং.....

'আপনার সব প্রয়োজনের কথাই আমি শুনতে রাজি আছি কিন্তু সাজাপ্রাপ্ত এক কয়েদিকে এর জন্যে বের করে আনা যায় না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সিআইএ অনেক কিছু করতে পারে বলে শুনেছি।'

'আপনি ভুল শুনেছেন।'

'মোরাভায় আমি আমার দলবল নিয়ে এখনি নামতে পারি, যখন আমি জানব ঐ কয়েদি আমর পাশে আছে।'

'তার নাম কি?'

'বেন ওয়াটসন।'

'বেন ওয়াটসন জুনিয়র?'

'হ্যাঁ।'

'তার সঙ্গে আপনার পরিচয়ের সূত্রটি কি?'

'এই প্রশ্ন কি অবান্তর নয় জেনারেল?'

'হ্যাঁ, অবান্তর। এক জন কয়েদিকে মিশনে পাঠানো আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পক্ষেও সম্ভব নয়।'

ফকনার উঠে দাঁড়াল। শীতল স্বরে বলল, 'আমাকে যেভাবে নিয়ে এসেছেন ঠিক সেভাবে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও করবেন, এটা আশা করতে পারি নিশ্চয়ই।'

'নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন।'

জেনারেল সিমসন বেল টিপলেন এবং যান্ত্রিক স্বরে বললেন, 'আপনার সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ। আপনাকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, বিদায়ের সময় জেনারেল সিমসন উঠে দাঁড়ালেন এবং হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করলেন। কোমল স্বরে বললেন, 'ভালো থাকবেন মিঃ ফকনার।'

প্লেনে ওঠার আগে–আগে জেনারেল সিমসনের এডিসি তার হাতে একটা মোটা খাম দিয়ে বলল, 'জেনারেল আপনাকে দিয়েছেন।'

'কী আছে এর মধ্যে?'

'আমি জানি না। জেনারেল বলেছেন কাগজপত্রগুলি মন দিয়ে পড়তে।'

কাগজপত্র বিশেষ কিছু না। একটি চেক, যেখানে টাকার অঙ্ক লেখা নেই। এবং দু' লাইনের একটি নোট।

"আমি বেন ওয়াটসনের ব্যাপারে চেষ্টা করছি।"

৭

এন্ড্রু জনাথন

বয়স ৪৩।

উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি।

ওজন এক শ' পনের পাউন্ড।

চোখ : নীল বর্ণ।

চুল পিঙ্গল।

জন্মস্থান ক্যানসাস সিটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনাথন লোকটি ছোটখাটো। ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ চোখ ছাড়া তার চেহারায় অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। তাকে দেখলেই মনে হয় অ্যানিমিয়ায় ভুগছে। দুর্বল এবং অসুস্থ একটি ভাব আছে তার মধ্যে। ইদানীং সে ডান পা একটু টেনে-টেনে হাঁটছে। আর্থরাইটিসের প্রথম ইশারা হতে পারে। তাদের পরিবারের আর্থরাইটিসের ইতিহাস আছে।

লোকটি কথা বলে কম। কাজকর্ম বিশেষ কিছু করে না। থাকে ওয়াশিংটনের পশ্চিমের একটা হোটেলে। মাসে এক বার সিটি ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচ শ' ত্রিশ ডলার নিয়ে এসে হোটেলের বিল মেটায়। মাসে দু' বার যায় সিঙ্গেলস ক্লাবে, উদ্দেশ্য কোনো মেয়ের সঙ্গ পাওয়া যায় কি না। উদ্দেশ্য সফল হয় না কোনো সময়ই। মেয়েরা তেতাল্লিশ বছরের কোনো মানুষের ব্যাপারে তেমন উৎসাহ বোধ করে না। তার চেয়েও বড় কথা জনাথন নাচ জানে না। কাজেই কোনো মেয়েকে গিয়ে বলতে পারে না—তুমি কি আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ নাচবে?

অবশ্যি তার সময় সে-জন্যে যে খুব খারাপ কাটে তা নয়। সমুদ্রের পারে প্রতিদিনই সে বেশ কিছুটা সময় কাটায়। কয়েকটা বিয়ার খায়। কোনো-কোনো দিন মুভি দেখে, তারপর ফিরে আসে নিজের ঘরে। প্রতি রাতেই তার ভালো ঘুম হয়। জীবন থেকে অবসর নেওয়া একজন মানুষ, যার জীবনে তেমন কোনো উত্তেজনা নেই। উত্তেজনার প্রয়োজনও নেই।

এক দিন দুপুর আড়াইটার দিকে এই লোকটি হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। তার সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে হোটেলের বিল মিটিয়ে দিল। হোটেলের মালিক অবাক হয়ে বলল, 'অসময়ে চলে যাচ্ছেন!'

জনাথন হাসল।

'আবার আসবেন।'

'আসব। নিশ্চয় আসব।'

জনাথনের গায়ে একটি সামার কোট। মাথায় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সাদা টুপি। হাতে রেক্সিনের একটি হ্যান্ডব্যাগ। সে হেঁটে-হেঁটে গেল গ্রে হাউন্ড বাস স্টেশনে। সুটকেস বুক করল নিউ অরলিংটনের ঠিকানায়।

'ট্যাক্সি ভাড়া করে চলে গেল ফ্লাওয়ার শপে। ফুলের দোকানের ছোট্ট মেয়েটিকে বলল, 'টকটকে লাল রঙের তিন ডজন গোলাপ দিতে পার? সবচেয়ে বড় সাইজ।' মেয়েটি হেসে বলল, 'বিশেষ কোনো উৎসব বুঝি?'

'হ্যাঁ, খুব বড় উৎসব।'

'তোড়া বানিয়ে দেব?'

'দাও।'

'দাম কিন্তু অনেক পড়বে। এগুলি এসেছে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে।'

'আমি ক্যাশ পেমেন্ট করব। দামের জন্যে অসুবিধা নেই।'

'তুমি নিজেই নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ, আমি নিজেই নিয়ে যাব।'

জনাথন কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'ফুলের সঙ্গে আর কী দেওয়া যায়, বল তো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাকে দিচ্ছ?'

'তা বলা যাবে না।'

'আমার মনে হয় ফুলগুলিই যথেষ্ট। চমৎকার ফুল! আমাকে কেউ কোনোদিন এতগুলি ফুল একসঙ্গে দেয় নি।'

জনাথন চলে গেল ফলের দোকানে। এক ঝুড়ি আপেল কিনল। টকটকে লাল রঙের আপেল। বড় সুন্দর!

ফুল এবং ফলের ঝুড়ি হাতে সে বেলা চারটার দিকে সমুদ্রের পারে উপস্থিত হল। এই জায়গাটি তার খুব ভালো চেনা। গত ছ' মাসে প্রতি দিন এক বার করে এসেছে। চষে বেড়িয়েছে চারদিক। এটা কি উদ্দেশ্যমূলক ছিল? হয়তো বা। জনাথনের চোখে-মুখে এখন আর আগের আলস্য নেই। চোখ ঝকঝক করছে। ঈগল পাখির দৃষ্টি। সে এগিয়ে গেল সাউথ পয়েন্ট টার্মিনালে। বেশ কয়েকটি শখের প্রমোদতরী ভিড় করে আছে। সুন্দর-সুন্দর নাম—সুইট সিক্সটিন, দি ড্রিম, দি রেড রিবন। এরা সন্ধ্যার আগে-আগে ছেড়ে যাবে। রাত দশটা-এগারটার দিকে ফিরে আসবে।

জনাথন যে-প্রমোদতরীটির কাছে এসে দাঁড়াল, তার নাম—দি ফার ইস্ট। চমৎকার দোতলা একটি ছিমছাম জলযান। ধবধবে সাদা রঙ। নীল জলের সঙ্গে এত চমৎকার মানিয়েছে!

'এখানে কি পল ভিন্তানি আছেন?'

'কেন?'

'আমার একটু প্রয়োজন ছিল।'

'কী প্রয়োজন?'

'আমি তাঁর জন্যে কিছু উপহার নিয়ে এসেছিলাম।'

জনাথন তার উপহার দেখাল এবং বিনীত ভঙ্গিতে হাসল। মৃদুস্বরে বলল, 'একসময় তাঁর কাছ থেকে উপকার পেয়েছিলাম, সেই জন্যে আসা।'

'উপহার আমার কাছে দাও, নিয়ে যাচ্ছি। নাম কী বল। পল ভিন্তানিকে বলব।'

'আমি একজন অভাজন ব্যক্তি। নাম বললে চিনতে পারবেন না। দেখলে হয়তো চিনতে পারতেন।'

'না, তুমি যেতে পারবে না। নিরাপত্তার একটা ব্যাপার আছে।'

'আপনি আমাকে ভালো করে তল্লাশি করে দেখুন।'

'দেখাদেখির দরকার নেই। দাও, উপহারগুলি দাও। কী নাম বলব?'

'নাম বলতে হবে না। বলবেন, এক জন দরিদ্র ভক্ত।'

লোকটি ফুল এবং আপেল নিয়ে চলে গেল। জনাথন হতাশ মুখে দাঁড়িয়ে রইল নিচে। তার মনে ক্ষীণ আশা, এক্ষুনি তার ডাক পড়বে। এতগুলি চমৎকার ফুল কে দিয়েছে, কী জন্যে দিয়েছে, এটা জানার আগ্রহ সবারই হবে। পল ভিন্তানিরও হওয়া উচিত।

এবং তাই হল, জনাথনকে ভেতরে যেতে বলা হল।

পল ভিন্তানির বয়স ত্রিশের কম, কিন্তু দেখাচ্ছে চল্লিশের মতো। তার কোমর জড়িয়ে যে-মেয়েটি বসে আছে, তার বয়স সতের'র বেশি হবে না। এমন একজন রূপসী মেয়েকে দেখতে পাওয়া ভাগ্যের কথা। পল ভিন্তানি প্রচুর মদ্যপানের কারণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখ খুলে রাখতে পারছে না। কথা বলল মেয়েটি, 'এত চমৎকার গোলাপগুলি তুমি পলকে দিয়েছ?'

জনাথন বিনয়ে মাথা নিচু করে ফেলল।

'এত সুন্দর ফুল দিতে হয় প্রেমিকাকে। তোমার বোধহয় প্রেমিকা নেই।'

মেয়েটি খিলখিল করে হাসতে লাগল। সেও মনে হয় নেশাগ্রস্ত।

ভিন্তানি থেমে-থেমে বলল, 'তোমাকে চিনতে পারছি না।'

'আমার নাম জনাথন।'

'জনাথন, ফুলের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এখন যেতে পার। আর তোমার যদি কোনো আবদার থাকে, পরে এসে বলবে। কিছু-একটা তোমার মনে আছে। বিনা কারণে কেউ ফুল দেয় না। হা-হা-হা।'

ভিন্তানি হাতের ইশারা করে জনাথনকে চলে যেতে বলল। জনাথন একটু পিছিয়ে গিয়ে কেবিনের দরজা ভেজিয়ে দিল।

'ভিন্তানি, আমাকে তোমার চেনার কথা। আমার নাম এন্ড্রু জনাথন। জার্মানিতে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমাকে এত সহজে ভুলে যাওয়া ঠিক না।'

ভিন্তানির নেশা কেটে যেতে শুরু করল। মেয়েটি তাকাচ্ছে অবাক হয়ে। সে উঠে দাঁড়াবে কি দাঁড়াবে না ঠিক করে উঠতে পারছে না। জনাথন মেয়েটির দিকে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'নড়াচড়া করবে না। কোনো রকম সাড়াশব্দও করবে না। আমার সঙ্গে একটি লুগার থারটি সিক্স পিস্তল আছে। পিস্তল চালনায় আমার দক্ষতা তোমার বন্ধু মিঃ ভিন্তানি ভালোই জানেন। তাই না মিঃ ভিন্তানি?'

ভিন্তানি শুকনো গলায় বলল, 'তুমি কী চাও?'

'তেমন কিছু চাই না। আমি কিছু কোকেন এনেছি তোমার জন্য। এইটি তুমি আমার সামনে খাবে। আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখব। এটা আমার অনেক দিনের শখ।'

ভিন্তানির নেশা পুরোপুরি কেটে গেল। তার কপালে ঘাম জমতে শুরু করেছে। জনাথন তার সামার কোটের পকেট থেকে পিস্তলটি বের করল। ছোট্ট ছিমছাম একটি জিনিস।

ভিন্তানি টেনে-টেনে বলল, 'জনাথন, তুমি জীবিত অবস্থায় এখান থেকে বের হতে পারবে না।'

'তোমার মতো জীবনের প্রতি আমার মোহ নেই। বের হতে না-পারলেও ক্ষতি নেই। খেতে শুরু কর, পিস্তলের গুলি খেয়ে মরার চেয়ে কোকেন খেয়ে মরা ভালো। এতে কষ্ট কম হয় বলে আমার ধারণা।'

জনাথন তাকিয়ে আছে হাসিমুখে, যেন কিছুই হয় নি। ভিন্তানি খেতে শুরু করল। তার চোখ ঠিকরে বের হয়ে আসছে। চাপা একটা গোঁ-গোঁ শব্দ আসছে মুখ থেকে।

মেয়েটি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জনাথনের দিকে। অবিশ্বাস্য এই ঘটনাটি সে নিজের চোখের সামনেই দেখছে, তবু স্বীকার করতে পারছে না।

জনাথন বলল, 'তোমার মতো এমন রূপসী একটি মেয়ের তো খুব ভালো ছেলেবন্ধু পাওয়ার কথা! এর সঙ্গে লেপ্টে আছ কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটি জবাব দিল না। জনাথন বলল, 'কি নাম তোমার?'

'এলেনা।'

'এলেনা, তোমার বন্ধুর হয়ে গেছে, আমার ধারণা। তবু এক জন ডাক্তার দেখিয়ে নিশ্চিত হওয়া ভালো।'

এলেনা জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। জনাথন বলল, 'শুভ সন্ধ্যা, এলেনা।'

জনাথন নির্বিঘ্নে নিচে নেমে এল। কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন করল না। সে মুখে একটি বিনীত হাসি ফুটিয়ে রাখল।

তার খোঁজ পড়ল পঁয়ত্রিশ মিনিট পর। ওয়েস্ট কোস্টের মাফিয়া বস এত্তেনার বড় ছেলে পল ভিন্তানি মারা গেছে। খবর ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতো।

এন্ড্রু জনাথন মিলিয়ে গেছে হাওয়ার মতো। এত্তেনা ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে একে আমি চাই। সে এ-শহরেই আছে, এবং সে কোনো যাদুমন্ত্র জানে না।'

এত্তেনা মাফিয়াদের ক্ষমতার একটা নমুনা দেখাবার ব্যবস্থা করল। তারা নিজেদের নিজস্ব পদ্ধতিতে শহর থেকে বের হবার সমস্ত পথ সিল করে দিল। মান-সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঘের গুহায় ঢুকে কেউ বাঘের বাচ্চা মেরে যেতে পারে না। বাহাত্তর ঘন্টা পার হয়ে গেল, এন্ড্রু জনাথন ধরা পড়ল না। শিকাগো-মাফিয়াদের একটি প্রধান শাখা থেকে বিপুল সাহায্য এসে উপস্থিত হল। শহরকে বন্ধ করা হবে। চিরুনির মতো এলাকাটিতে আঁচড়ানো হবে। একটি মাছিও যেন গলে যেতে না পারে। জনাথন তো এক জন জলজ্যান্ত মানুষ।

শহরকে ঘিরে একটি কাল্পনিক বৃত্ত তৈরি করা হয়েছে। সেই বৃত্ত ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। কিন্তু জনাথনকে পাওয়া যাচ্ছে না।

পঞ্চম দিনে এত্তেনা একটি টেলিফোন কল পেল। জেনারেল সিমসন লং ডিসট্যান্স কল করেছেন। তাঁদের কথাবার্তা হল এ-রকম—

সিমসন আমাকে চিনতে পারছেন তো?

এত্তেনা পারছি। বয়স হয়েছে, স্মৃতি দুর্বল। কিন্তু আপনাকে চিনতে পারছি।

সিমসন আপনার পারিবারিক দুঃসংবাদের খবরে খুবই দুঃখিত হলাম।

এত্তেনা ধন্যবাদ। আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

সিমসন শুনলাম এন্ড্রু জনাথন এখনো ধরা পড়ে নি।

এত্তেনা : না। তবে ধরা পড়বে। সময় হয়ে এসেছে। আপনি শিকাগো শহরে একটি সুচ ফেলে রাখুন, আমি খুঁজে বের করে দেব। সেই ক্ষমতা আমার আছে। আশা করি স্বীকার করবেন।

সিমসন আমি একটি বিশেষ কারণে আপনাকে টেলিফোন করেছি।

এত্তেনা : কারণ ছাড়া আপনাদের মতো মানুষ আমাদের খোঁজ করবেন না, তা জানি। কারণটি বলুন।

সিমসন এন্ড্রু জনাথনকে আমাদের প্রয়োজন। অত্যন্ত প্রয়োজন।

এত্তেনা (নীরব)

সিমসন আপনি আপনার দলের সবাইকে উঠিয়ে নেবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভেনা (নীরব)

সিমসন এন্ড্রু জনাথনকে জীবিত অবস্থায় আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। আপনার কাছ থেকে এই গ্যারান্টি চাই!

এভেনা তা সম্ভব নয়।

সিমসন আপনি বুদ্ধিমান মানুষ বলে জানতাম।

এভেনা (নীরব)

সিমসন আপনাকে দশ মিনট সময় দিচ্ছি। দশ মিনিটের মধ্যেই আমাকে জানাবেন। হ্যাঁ কিংবা না।

জেনারেল সিমসন টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। এবং তার এক ঘন্টা পর ফকনারকে টেলিফোনে জানালেন এন্ড্রু জনাথনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। তাকে আগামী কাল ভোরে পৌঁছে দেওয়া হবে।

'খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় নি তো?'

'না, তেমন হয় নি।'

'বেন ওয়াটসন জুনিয়রকে কবে পাব?'

'বলতে পারছি না।'

'পাব তো?'

সিমসন জবাব দিলেন না। টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

৮

রাত দুটো পঁচিশ মিনিটে বেন ওয়াটসনকে ডেকে তোলা হল। কারারক্ষী বলল, 'জেল ওয়ার্ডেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, বিশেষ প্রয়োজন।' বেন ওয়াটসন গম্ভীর হয়ে রইল, কিছু বলল না।

'আপনাকে এক্ষুনি যেতে হবে।'

'তাঁর সঙ্গে আমার এমন কোনো জরুরি কথা থাকতে পারে না যে আমাকে রাত-দুপুরে তাঁর কাছে যেতে হবে।'

'আপনাকে যেতে হবে। দয়া করে তর্ক করবেন না।'

বেন ওয়াটসন উঠে পড়ল। প্রায় ছ' ফুট লম্বা একটি মানুষ। আড়াই শ'-তিন শ' পাউন্ড ওজন—যে-কারণে তাকে রোগা দেখায়। এর চোখ দুটি বড়-বড় এবং আশ্চর্য রকমের কালো। চোখের দিকে তাকালে এই মানুষটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা হওয়া খুব স্বাভাবিক। তাকে যারা ঘনিষ্ঠভাবে চেনে, তারা এই ভুল করে না।

'মিঃ বেন ওয়াটসন।'

'হ্যাঁ।'

'কফি খাবেন?'

'দুপুর-রাতে আমি কফি খাই না।'

'লম্বা একটি জার্নি করবেন। গরম কফির কথা সে-জন্যেই বলছি।'

ওয়াটসন তাকিয়ে রইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি রওনা হবেন খুব শিগ্‌গিরই।'

'কোথায়?'

'মিসিসিপি পেনিটেনশিয়ারি।'

'কারণ?'

'আমি কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আদেশে এ-কাজ করছি। স্টেট ডিপার্টমেন্টের কিছু কর্তাব্যক্তি আছেন। এঁদের এক জন আপনার সঙ্গে যাবেন।'

'আমি এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তা জানা ছিল না।'

'আমার নিজেরও জানা ছিল না। সিগারেট নিন।'

'আমি সিগারেট খাই না।'

'কফি? কফির কথা বলব?'

'এক বার তো বলেছি, রাত-দুপুরে আমি কফি খাই না।'

ওয়ার্ডেন সিগারেট ধরাল। তার চোখ কৌতূহলে চিকমিক করছে।

'মিঃ ওয়াটসন।'

'বলুন।'

'আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে আর্মার্ড গাড়িতে। মাঝপথে গাড়ি ভেঙে আপনি পালাবেন।'

'তার মানে?'

'মানে খুব সহজ, মিঃ ওয়াটসন। স্টেট ডিপার্টমেন্ট চাচ্ছে আপনি পালিয়ে একটি বিশেষ মানুষের কাছে যাবেন। কাজেই এমন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, যাতে আপনি তা করতে পারেন।'

'স্টেট ডিপার্টমেন্টের হাতে এতটা ক্ষমতা, আমার জানা ছিল না।'

'আমার নিজেরো জানা ছিল না মিঃ ওয়াটসন।'

বেন চুপ করে রইল। সে কথাবার্তা খুব কম বলে। তার ওপর তার ঘুম পাচ্ছে। ওয়ার্ডেন নিচু গলায় বলল, 'যে-লোকটির সঙ্গে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে, তার নাম তো জানতে চাইলেন না!'

'নাম অনুমান করতে পারছি—ফকনার। একমাত্র ফকনারের মাথায়ই এ-জাতীয় পরিকল্পনা খেলে।'

'উনি কি আপনার বন্ধু?'

'আমাদের দুজনারই কোনো বন্ধু নেই। তিনটা বাজছে, এখন কি আমরা রওনা হব?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

পেনিটেনশিয়ারির আর্মার্ড ভেহিকেল ছুটে চলছে হাইওয়ে ফিফটি নাইন দিয়ে। অন্ধকারে বেন ওয়াটসন বসে আছে চুপচাপ। এক জন অল্পবয়স্ক নার্ভাস ধরনের যুবক পরিকল্পনাটি তাকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছে। বেন ওয়াটসনের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না সে কিছু শুনছে। তরুণটি মৃদুস্বরে বলল, 'আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন?'

'না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি কি আবার গোড়া থেকে বলব?'

'না। আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি এখন ঘুমুব। সময় হলে আমাকে ডেকে তুলবেন।'

তরুণটি চুপ করে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেন ওয়াটসন নাক ডাকাতে লাগল। তরুণটি বিড়বিড় করে নিজের মনে কী যেন বলল। একা-একা বসে থাকতে তার কেমন জানি ভয় করছে। গাড়ির ভেতরটা বড় অন্ধকার। এখান থেকে বাইরে কী হচ্ছে, কিছুই বোঝার উপায় নেই। তার চেয়েও বড় কথা, অদ্ভুত এক মানুষ তার সহযাত্রী, যে দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। তরুণটি খুকখুক করে কাশতে লাগল।

৯

এ-ধরনের একটি বাড়ি ফকনার আশা করে নি। টিলার ওপর চমৎকার বাংলো। টালির ছাদ। পাইন গাছ দিয়ে ঘেরা বাড়ির সামনে অনেকখানি জায়গায় ফুলের বাগান করা হয়েছে। বিচিত্র বর্ণের কসমস ফুটেছে বাগানে। একটি বগেনভিলিয়া উঠে গেছে টালির ছাদে। তার পাতা নীলচে। সবকিছু মিলিয়ে একটি অদেখা স্বপ্ন।

ঠিকানা ভুল হয় নি তো? ফকনার ঠিকানা যাচাই করবার জন্যে একটি নোটবই খুলল—একটি ছেলে বেরিয়ে এল তখন। ছ'-সাত বছর বয়স। অত্যন্ত রুগ্‌ণ। এ-রকম একটি রুগ্‌ণ শিশুকে এ-বাড়িতে মানায় না। ফকনার বলল, 'হ্যালো।'

ছেলেটি তার দিকে তাকিয়েই ফিক করে হেসে ফেলল। এর মানে এ-বাড়িতে লোকজন বিশেষ আসে না। সে-কারণেই অচেনা মানুষ দেখে ছেলেটি হাসছে। ফকনার ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলল, 'কেমন আছ তুমি?'

'ভালো আছি।'

'এ-রকম চমৎকার একটি সকালে খারাপ থাকা খুব মুশকিল, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'নাম কি তোমার?'

'রবার্ট।'

'হ্যালো রবার্ট।'

'হ্যালো।'

'আমি কি আসতে পারি তোমাদের বাগানে?'

'হ্যাঁ, পার।'

'আমার নাম ফকনার।'

ফকনার ভেতরে ঢুকেই হাত বাড়িয়ে দিল—ছেলেটি এগিয়ে দিল তার ছোট্ট হাত।

'এখন থেকে আমরা দু'জন বন্ধু হলাম, কি বল রবার্ট?'

'হ্যাঁ, বন্ধু হলাম।'

'এখন বল, মিঃ রবিনসন তোমার কে হয়?'

'আমার দাদা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি সে-রকমই ভাবছিলাম। রবিনসন কি আছে?'
'আছে।'
'কী করছে?'
'ব্যায়াম করছে।'
ফকনার স্বস্তিবোধ করল। ব্যায়াম-ট্যায়াম করছে যখন, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে শরীরের প্রতি নজর আছে।
'দাদাকে ডেকে দেব?'
'আমার এমন কিছু তাড়া নেই। আমি বরং তোমার সঙ্গেই কিছুক্ষণ গল্প করি। এ-বাড়িতে তোমরা দু'জন ছাড়া আর কে থাকে?'
'আমরা দু'জনই শুধু থাকি।'
'তোমার বাবা-মা?'
'বাবা মারা গেছেন। মা'র বিয়ে হয়ে গেছে। থ্যাংক্স্ গিভিংয়ের সময় আমি মা'র কাছে যাই।'
'বাহ্, চমৎকার! খুব মজা হয়?'
'হয়। এবারে ক্রিসমাসে মা আমাদের এখানে আসবে। মা'র সঙ্গে আসবে পলিন।'
'পলিন কে?'
'পলিন আমার সৎ বোন। ভীষণ পাজি!'
'তাই নাকি?'
'হ্যাঁ। আর খুব মিথ্যাবাদী।'
'বল কী!'
'হ্যাঁ।'
'যদি আসে, তাহলে তো বড্ড মুশকিল হবে!'
'না, হবে না। ও আমার খুব বন্ধু।'
'আচ্ছা।'
'পলিন খুব ভালো মেয়ে।'
'কিন্তু একটু আগে বলেছ, সে পাজি।'
'পাজি, কিন্তু ভালো মেয়ে। মাঝে-মাঝে পাজিরাও ভালো হয়।'
ফকনার শব্দ করে হেসে উঠল। বহুদিন এমন প্রাণ খুলে সে হাসে নি।
হাসি থামতেই চোখে পড়ল, বারান্দায় গম্ভীর মুখে রবিনসন দাঁড়িয়ে আছে। রোগা লম্বা একটি মানুষ। চোখে স্টিল রিমের চশমা। সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন প্রবীণ শিক্ষক। ক্লাসে ফিলসফি বা সমাজতত্ত্ব পড়ান। ফকনার হাত নাড়ল। রবিনসন তার কোনো উত্তর দিল না। তার মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেল। যেন সে কিছু আশঙ্কা করছে।
'কেমন আছ রবিনসন?'
'ভালো।'
'তোমার নাতির সঙ্গে কথা বলছিলাম, চমৎকার ছেলে! তোমার নাতি আছে, জানতাম না।'
রবিনসন জবাব দিলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এই বাড়িটি নিজের নাকি?'
'হ্যাঁ।'
'নগদ পয়সায় কিনেছ, না মর্টগেজ্‌ড্‌।'
'মর্টগেজ্‌ড্‌।'
'এমন গম্ভীর হয়ে আছ কেন? মনে হচ্ছে আমাকে দেখে খুশি হও নি।'
'না, হই নি।'
'পুরোনো দিনের বন্ধুত্বের খাতিরে একটু সহজ হতে পার।'
'তোমার সঙ্গে আমার কখনো বন্ধুত্ব ছিল না।'
'চশমা নিয়েছ দেখছি।'
'বয়স হচ্ছে। ইন্দ্রিয় দুর্বল হচ্ছে।'
'হতাশাগ্রস্তের মতো কথা বলছ রবিনসন।'
'হতাশাগ্রস্তের মতো না। স্বাভাবিক একজন মানুষের মতোই কথা বলছি।'
'শরীর কিন্তু ভালোই আছে। এবং তুমি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবে না, সাদা চুলে তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে। আইনস্টাইনের মতো লাগছে।'
'ধন্যবাদ।'
'আমি কি নিরিবিলিতে তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে পারি?'
'পার।'
'ব্রেকফাস্ট করে আসি নি। ব্যবস্থা করা যাবে?'
'যাবে।'

ফকনার শিস দিতে লাগল। সে শিসের ভেতর কোনো-একটা গানের সুর বাজাবার চেষ্টা করছে, এবং লক্ষ করছে রবার্টকে। ছেলেটি নিজের মনে কথা বলছে এবং একা-একা হাঁটছে। হাঁটছে দুর্বলভাবে, যেন পায়ে তেমন জোর নেই। পলিও নাকি? ফকনার সিগারেট ধরাল। সিগারেট খুব বেশি খাওয়া হচ্ছে। রবিনসন গিয়েছে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করতে। এত সময় লাগাচ্ছে কেন? রাজকীয় কোনো ব্যবস্থা নাকি?

কফির কাপে চুমুক দিয়ে ফকনার হালকা গলায় বলল, 'এই বাড়ি কত টাকায় মর্টগেজ্‌ড্‌?'
'ত্রিশ হাজার ডলার।'
'কত বছরে দিতে হবে?'
'কুড়ি বছর।'
'তোমার রোজগারপাতি কি?'
'তেমন কিছু না।'
'কিছু করছ না?'
'করছি।'
'বছরে কত আসে?'
'খুবই সামান্য। বলার মতো কিছু না।'
'দুঃসময় যাচ্ছে?'
'রবিনসন জবাব দিল না। ফকনার তার স্বভাবসুলভ সহজ ভঙ্গিতে বলল, 'আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার জন্যে একটি চেক নিয়ে এসেছি। এ দিয়ে মর্টগেজের পুরো টাকাটা দেওয়া যাবে এবং কাজ শেষ হলে তুমি সমান পরিমাণ টাকা পাবে। বাকি জীবন হেসে-খেলে চলে যাবার কথা।'

রবিনসন চুপ করে রইল।

'কাজটা কী, জানতে চাও না?'

'না। কারণ আমি অবসর নিয়েছি। বাকি যে-ক'টা দিন বাঁচব, রবার্টের সঙ্গে থাকতে চাই।'

'বেঁচে থাকার জন্যেও তো টাকার প্রয়োজন। তুমি আমার জন্যে যে-ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করলে, তা দেখে মনে হয় তোমার ঝুড়ি ফুটো হয়ে গেছে।'

'ফকনার, আমি অবসর নিয়েছি।'

'মানুষ অবসর নেয় এক বারই—যখন মারা যায়। তোমাকে আমার ভীষণ দরকার।'

'কিন্তু আমার তোমাকে দরকার নেই। আমার দরকার রবার্টকে। ওর কেউ নেই। আমি ওর অভিভাবক।'

ফকনার হেসে উঠল।

'হাসছ কেন?'

'তোমার কথা শুনে। তুমি বললে, তুমি তার অভিভাবক। কপর্দকহীন এক জন অভিভাবকের ওর কোনো প্রয়োজন নেই। ওর প্রয়োজন ডলারের। ডলারের মতো বড় অভিভাবক এখনো তৈরি হয় নি।'

'আমি তোমার সঙ্গে যুক্তিতর্কে যেতে চাচ্ছি না।'

'চাচ্ছ না, কারণ তোমার কাছে তেমন কোনো যুক্তি নেই।'

'ফকনার, তুমি এখন যেতে পার।'

ফকনার উঠল না। নরম গলায় বলল, 'রবিনসন, আমার অবস্থা তোমার চেয়েও খারাপ। এই মিশনটির ওপর আমার বেঁচে থাকা নির্ভর করছে। প্ল্যানটি তোমাকে করে দিতে হবে। প্লিজ!'

'অন্য বিষয় নিয়ে কথা বল ফকনার। গান-বাজনায় তোমার কি এখনো আগের উৎসাহ আছে?'

ফকনার দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে রইল। ছোট্ট ছেলেটি দিব্যি নিজের মনে ঘুরছে। বকবক করছে। কী বলছে সে? ফকনারের ইচ্ছা হল ছেলেটির কথা শুনতে।

'ফকনার, আমার একটু কাজ আছে।'

'উঠতে বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি একটি খসড়া পরিকল্পনা করেছিলাম, সেটা একটু দেখবে?'

'না। আমি দুঃখিত ফকনার।'

ফকনার উঠে দাঁড়াল। ছোট্ট ছেলেটি বলল, 'চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, চলে যাচ্ছি।'

'আর আসবে না?'

'খুব সম্ভব না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবিনসন গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। ফকনার বলল, 'তোমার নাতিটি চমৎকার!'

'ও ছাড়া আমার কেউ নেই, আমি ছাড়া ওরও কেউ নেই।'

ফকনার হাসল। হালকা স্বরে বলল, 'একমাত্র আমারই কোনো পিছুটান নেই। একেক বার মনে হয়, এ–রকম একটা পিছুটান থাকলে বোধহয় ভালোই হত। আচ্ছা, চললাম।'

রবিনসন দেখল, লম্বা–লম্বা পা ফেলে ফকনার নেমে যাচ্ছে। ক্লান্ত মানুষের হাঁটার ভঙ্গি। হেঁটে যাচ্ছে, কিন্তু এক বারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না। এর সত্যি কোনো পিছুটান নেই। মায়া–মমতাও বোধহয় নেই। নাকি আছে?

প্রায় দশ বছর আগের একটা ঘটনা মনে পড়ল। ব্রাজিলে বড় ধরনের একটা অপারেশন। হার্ভি ফকনার দলপতি। ঠিক করা হল, আহতদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। আহতদের ফেলে আসা হবে। উপায় নেই এ ছাড়া। কিন্তু হার্ভি ফকনার একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। আহত রবিনসনকে পিঠে ঝুলিয়ে একুশ কিলোমিটার দৌড়ে ফিরে এল মূল ঘাঁটিতে।

রবিনসন আজ সারাক্ষণ ভাবছিল, ফকনার পুরোনো ঘটনাটি তুলে তার ওপর চাপ প্রয়োগ করবে। কিন্তু সে তা করে নি।

রবিনসন দেখল, ফকনার বড় রাস্তায় নেমে গেছে। এবং এই দীর্ঘ সময়ে এক বারও পেছন ফেরে নি। আশ্চর্য লোক! রবিনসন উঁচু গলায় ডাকল, 'ফকনার, ফকনার।'

ফকনার ফিরে তাকাল।

'তোমার খসড়া পরিকল্পনাটা দেখতে চাই।'

ফকনার দাঁড়িয়ে আছে। যেন রবিনসনের কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

রবিনসনের হঠাৎ দারুণ মন–খারাপ হল। সে নিশ্চিত জানে, এই মিশন থেকে সবাই বেঁচে ফিরে আসবে, শুধু সে ফিরবে না। এসব জিনিস টের পাওয়া যায়। মৃত্যু খুবই গোপনে রক্তের সঙ্গে কথা বলে। ফকনার পাহাড়ী ছাগলের মতো তরতর করে উঠে আসছে। রবার্ট অবাক হয়ে দেখছে। এক সময় সে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। শিশুরা মাঝে মাঝে অকারণেই উল্লসিত হয়।

১০

গামাল হাসিম লোকটি স্বল্পভাষী।

দুর্বল এবং কাহিল এক মানুষ। এই অস্ত্র–ব্যবসায়ীকে দেখে মনেই হয় না তিনি কোনো কাজ ঠিকভাবে শেষ করতে পারবেন।

বয়স প্রায় সত্তরের কোঠায়। কানে ভালো শুনতে না–পাওয়ার জন্যে ইদানীং তাঁকে হিয়ারিং এইড ব্যবহার করতে হচ্ছে। দু'মাস আগে বাঁ চোখে ক্যাটারেক্ট অপারেশন হয়েছে। অপারেশন ঠিকমতো হয় নি, কিংবা কিছু–একটা হয়েছে, যার জন্যে এখন তিনি বাঁ চোখে কিছুই দেখেন না। দু'–তিন সপ্তাহ ধরে ডান চোখে অসুবিধা দেখা দিয়েছে, সারাক্ষণই চোখ দিয়ে পানি পড়ে। ডাক্তারের পরামর্শে বেশিরভাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়ই তাঁকে চোখ বন্ধ করে রাখতে হয়।

তাঁর কথাবার্তা অবশ্যি খুবই পরিষ্কার। নিখুঁত আমেরিকান অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলেন। অস্ত্রের ব্যাপারে তাঁর জ্ঞানও চমৎকার।

ফকনার বলল, 'আমাকে চিনতে পারছেন তো? আগে এক বার আপনি অস্ত্র দিয়েছিলেন। এগারটি ফরাসি সাব–মেশিনগান আপনার কাছ থেকে কিনেছিলাম। এস এল টুয়েন্টি। আমার নাম ফকনার। হার্ভি ফকনার।'

'আমার স্মৃতিশক্তি ভালো। এক বার কাউকে দেখলে সাধারণত ভুলি না। এখন বলুন, কী করতে পারি আমি।'

'পঞ্চাশ জন কমান্ডোর একটি দলকে আপনি অস্ত্র সরবরাহ করবেন।'

'মিশনটি কী ধরনের?'

'ছোট মিশন, কিন্তু বড় রকমের বাধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা আছে। সম্ভাবনা সামনে রেখেই আমাদের তৈরি হতে হবে।'

'আপনি ঠিক কী চান, পরিষ্কার করে বলুন।'

'আমার দলকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ভাগে দশ জন কমান্ডো। এরা সবাই নামবে প্যারাশুটের সাহায্যে। এদেরকে সাত দিন টিকে থাকার মতো সাজসজ্জায় সজ্জিত করতে হবে।'

'বলুন, আমি শুনছি। থামবেন না।'

'প্রতিটি ভাগে থাকবে দু'টি লাইট মেশিনগান, সাতটি রাইফেল এবং একটি অ্যাসল্ট উইপন। গ্রেনেড, পিস্তলও থাকবে সবার সঙ্গেই।'

গামাল হাসিম চোখ মিটমিট করে এক বার তাকালেন। তারপর আবার চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

'আমাদের অস্ত্রগুলি, যেমন ধরুন A.K-7.62 হলে ভালো হয়।'

গামাল হাসিম শীতল গলায় বললেন, 'A.K-7.62 এবং RPD লাইট মেশিনগান—এ দু'য়ের মিলন ভালোই হবে। এদের সবচে বড় সুবিধা হচ্ছে, দু'টিতে একই গুলি ব্যবহার করা যায়।'

'ঠিক আছে, তাই করুন।'

'অ্যামুনিশান কী পরিমাণ চাই?'

'যাদের কাছে থাকবে A.K-7.62 তারা প্রত্যেকেই দশটি করে ম্যাগজিন পাবে। এ ছাড়াও থাকবে বাড়তি এক শ' রাউন্ড গুলি। সেগুলি থাকবে বেনডোলিয়ায় বেল্টে।'

'বেশ, এবার বলুন RPD লাইট মেশিনগানের জন্যে কী পরিমাণ গুলি চান?'

'প্রতিটি সাব–মেশিনগানের সঙ্গে পাঁচ রাউন্ডের চারটি কনটেইনার। এ ছাড়া তিন জন কমান্ডো যে–পরিমাণ গুলির বেল্ট নিতে পারে, সে–পরিমাণ বেল্ট।'

'আমার মনে হয়, আপনার দলে অন্তত কয়েকটি রকেট লঞ্চার থাকা দরকার।'

'ঠিকই বলেছেন। তিনটিRPG-2 রকেট লঞ্চার। প্রতিটির সঙ্গে চারটি রকেটের একটি প্যাকেট।'

'গ্রেনেড কী পরিমাণ চান?'

'সবার সঙ্গে থাকবে চারটি করে গ্রেনেড। এবং আটচল্লিশ ঘন্টার রসদ। আমেরিকান হেলমেট। আমেরিকান T-10 প্যারাশুট। দেওয়া যাবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নিশ্চয়ই দেওয়া যাবে। আমার মনে হয় অন্তত একটি ভারি অস্ত্র আপনাদের থাকা উচিত। যেমন ধরুন, জার্মানির তৈরি PINTER-301. চমৎকার জিনিস! কিংবা ফ্রেঞ্চদের তৈরি ম্যাট মাইন মিলিমিটার।'

'ভারি কিছুই নেওয়া যাবে না।'

'এটা ভারি নয়, ওজন বার পাউন্ড। বিপদে কাজে লাগবে। দু'টি অন্তত নিন।'

'ঠিক আছে, দু'টি PINTER-301.'

'আরেকটি মডেল আছে PINTER-308. এর থ্রাস্ট খুব বেশি, তবে ওজনও বেশি।'

'আপনি 301-ই দিন।'

'ঠিক আছে।'

ফকনার সিগারেট ধরাল—মৃদুস্বরে বলল, 'আপনি ধূমপান করবেন কি?'

'না।'

'কোনো রকম পানীয়? ভালো হুইস্কি আছে।'

'আমি মদ্যপান করি না। আপনার আর কী প্রয়োজন, বলুন।'

'আমার কিছু কেমিক্যাল উইপন্‌স্ দরকার।'

'কী জাতীয়?'

'যেমন ধরুন, এমন কোনো বাষ্প, যা অল্প জায়গায় কাজ করে। কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দেয় বা ঘুম পাড়িয়ে দেয়।'

'এনিথল জাতীয় বোমা দেওয়া যাবে।'

'বোমা ফাটার পর কাজ শুরু হতে কতক্ষণ লাগবে?'

'পাঁচ থেকে দশ মিনিট।'

'এত সময় নেই আমার হাতে। আরো দ্রুত কাজ করে, এমন কিছু বলুন।'

'সে-সব কেমিক্যাল উইপন্‌স্ ভয়াবহ হবে। নার্ভাস সিস্টেমে কাজ করবে। ঘুম পাড়িয়ে দেবে, কিন্তু সে-ঘুম ভাঙবে না। রাজি আছেন?'

'রাজি আছি।' ফকনার বলল, 'কাগজে লিখে নিলে হত না? আপনার হয়তো মনে থাকবে না।'

গামাল হাসিম মৃদুস্বরে বললেন, 'আমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ভালো, আপনি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। পরীক্ষা করে দেখতে চান?'

'না। আমি বিশ্বাস করছি।'

ফকনার চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানতে লাগল। গামাল হাসিম বললেন, 'এখন বলুন, কতদিনের ভেতর চান?'

'দশ দিন।'

'কী বললেন?'

'দশ দিন। অস্ত্রগুলি আমাদের ব্যবহার করতে হবে। ওদের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।'

'দশ দিনে দেওয়া সম্ভব নয়। আমার কোনো গুদামঘর নেই। আমাকে সব জিনিস জোগাড় করতে হয়।'

'কত দিনের ভেতর দিতে পারবেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমাকে দু'মাস সময় দিতে হবে। এর কমে সম্ভব নয়। আমি তো যাদুকর নই মিঃ ফকনার।'

ফকনার বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। গামাল হাসিম বললেন, 'আমি কি উঠতে পারি?'

ফকনার বলল, 'অস্ত্রের জন্যে আপনার যে-টাকা পাওনা হবে, আমি তার তিন গুণ টাকা দেব।'

'তিন গুণ কেন, দশ গুণ দিলেও লাভ হবে না। আমি তো আপনাকে বলেছি মিঃ ফকনার, আমি যাদুকর নই। আমি এখন উঠব।'

'এক মিনিট দাঁড়ান। আপনি কি জেনারেল সিমসনকে চেনেন?'

'ব্যক্তিগত পরিচয় নেই, কিন্তু তাঁকে না-চেনার কোনো কারণ নেই। তাঁকে ভালোই চিনি।'

'তিনি যদি আপনাকে বলেন, দশ দিনের ভেতর মালামাল পৌঁছে দিতে, আপনি কী করবেন? না বলবেন?'

গামাল হাসিম চুপ করে থাকলেন। ফকনার বলল, 'জেনারেল সিমসন আজ রাতের মধ্যেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।'

গামাল হাসিম শীতল স্বরে বললেন, 'আপনাদের কবে দরকার?'

'দশ দিনের ভেতর দরকার। আগে বেশ কয়েক বার বলেছি।'

'ঠিক আছে, পৌঁছানো হবে। তিন গুণ দাম দিতে হবে। পৌঁছানোর খরচ দিতে হবে।'

'দেওয়া হবে।'

'সব টাকাই দিতে হবে অগ্রিম।'

'দেওয়া হবে।'

'কাল ভোরে কি আপনি একবার আসতে পারবেন?'

'ক'টায়?'

'ভোর ছ'টায়। অস্ত্রের তালিকাটি সম্পূর্ণ করব। আপনাকে রাশিয়ান ব্যানানা রাইফেলের নমুনা দেখাব।'

'ঠিক আছে, দেখা হবে ভোর ছ'টায়।'

'শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি।'

১১

পঞ্চাশ জনকে রিক্রুট করার দায়িত্ব পড়েছে বেন ওয়াটসনের ওপর। ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল—পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে এবং বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের ভেতর হতে হবে। কিন্তু উৎসাহীদের বয়সের সীমা দেখা গেল সতের থেকে ষাটের মধ্যে এবং অনেকেরই কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই। মাত্র একুশ দিনে এদের তৈরি করাও প্রায় অসম্ভব। জগতের অসম্ভব কাজগুলির প্রতি বেন ওয়াটসনের একটা ঝোঁক আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিক্রুটমেন্ট শুরু হল সকাল থেকে। এককে জন এসে ঢোকে আর বেন তার দিকে প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো তাকিয়ে থাকে। প্রশ্ন কিছুই নয়। শুধু তাকিয়ে থাকা। যাদের পছন্দ হয়, তাদেরকে নিয়ে যায় মাঠে। সেখানে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয় এবং ড্রিল হয়। দ্বিতীয় বাছাইপর্বটি হয় সেখানে। সেটিই চূড়ান্ত বাছাই। নমুনা দেয়া যাক।

'কী নাম?'

'রিক ব্রেগার।'

'বয়স?'

'তেত্রিশ।'

'মিশনে কেন যেতে চাও?'

'টাকার জন্যে।'

'শুধুই টাকার জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'অ্যাটেনশন। লেফট রাইট, লেফট। লেফট রাইট, লেফট। কুইক মার্চ। লেফট, লেফট। লেফট, লেফট। হল্ট। অ্যাবাউট টার্ন। স্ট্যান্ড এট ইজ। শুধুই টাকার জন্যে যেতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'টাকার এত প্রয়োজন কেন?'

'ঘরে ছেলেমেয়ে আছে, স্ত্রী আছে। পছন্দমতো কাজকর্ম পাচ্ছি না। নগদ কিছু টাকা হলে ভালো হবে।'

'গুড। কোন সেকশন?'

'আর্টিলারি।'

'সিলেক্টেড। রাত আটটার মধ্যে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রিপোর্ট করবে।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

'যাবার আগে কন্ট্রাক্ট ফর্ম সই করবে। মারা গেলে টাকা কে পাবে, সে–দলিল দরকার।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'ওকে, ক্লিয়ার আউট। নেক্সট।'

'কি জন্যে যেতে চাও?'

'অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে।'

'শুধুই অ্যাডভেঞ্চার?'

'হ্যাঁ।'

'বয়স কত?'

'একুশ।'

'হবে না, তুমি যেতে পার। এটা শিশুদের কোনো ব্যাপার নয়।'

'আমাকে শিশু বলবেন না।'

বেন ওয়াটসন প্রচণ্ড একটি চড় কষিয়ে দিল। ছেলেটি প্রায় চার ফুট দূরে উল্টে পড়ল। বেন গম্ভীর গলায় বলল, 'বিদায় হও, কুইক।'

'তুমি কি আমেরিকান?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, আমি আমেরিকান নই।'

'কেন যেতে চাও?'

(উত্তর নেই)

'কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে?'

'নেই।'

'আমরা তো বলে দিয়েছি পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে, এমন সব প্রার্থীদেরই আমরা চাই।'

'আমি দ্রুত শিখতে পারি।'

'কী করবে টাকা দিয়ে?'

'ব্যবসা করব।'

'তুমি যেতে পার। তোমাকে দিয়ে হবে না। তুমি সংসারী মানুষ। সংসারী মানুষ সাহসী হয় না।'

'আমি সাহসী।'

'তা ঠিক। তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি সাহসী। কিন্তু বিপদের সময় তোমার সাহস থাকবে না। ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়বে। তুমি যেতে পার। নেক্সট।'

'লেফট রাইট। লেফট রাইট। কুইক মার্চ। ঐ বার্চ গাছ ছুঁয়ে আবার ফিরে এস। কুইক মার্চ। ডাবল। ডাবল। ভেরি গুড। হল্ট। মার্চ এগেইন লং স্টেপ। লং স্টেপ। হল্ট। বয়স কত?'

'চল্লিশ।'

'মিশনে যেতে চাও কেন?'

'টাকার জন্যে।'

'কী করবে টাকা দিয়ে?'

'জানি না স্যার। এখনো ভাবি নি।'

'ঘরে কে আছে?'

'স্ত্রী আছে।'

'মিশনে তুমি মারা যেতে পার। জান তো?'

'জানি।'

'তোমার স্ত্রী তোমাকে ছাড়তে রাজি হবে?'

'তার সঙ্গে আমার বনিবনা নেই।'

'অ্যাটেনশন। লেফট রাইট, লেফট রাইট। অ্যাবাউট টার্ন। কুইক মার্চ। ঐ বার্চ গাছ ছুঁয়ে আবার এস। আমি তোমার দম দেখতে চাই। ওকে, হল্ট। দম ভালোই আছে। আগে কোথায় ছিলে?'

'ইউএস ম্যারিন।'

'তোমার দেশের নাম কি?'

'মালদ্বীপ।'

'নাম শুনি নি।'

'আপনি না শুনলে কিছু যায়-আসে না।'

'কুইক মার্চ। হল্ট। লেফট রাইট লেফট। লেফট লেফট লেফট। হল্ট। ডবল মার্চ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেফট লেফট, লেফট। হল্ট।'

'তোমার কি নাম?'

'আবদুল জলিল।'

'মিঃ জলিল, তোমার একেবারেই দম নেই।'

'আমাকে একটা সুযোগ দিন।'

'কেন, সুযোগ দেব কেন? টাকার দরকার?'

'হ্যাঁ।'

'নিজের জন্যে?'

'না, নিজের জন্যে নয়।'

'অ্যাটেনশন। লেফট রাইট লেফট। লেফট রাইট লেফট। হল্ট। তুমি কি সাহসী?'

'হ্যাঁ।'

'কী করে বুঝলে?'

(নিশ্চুপ)

'কখনো মানুষ খুন করেছ?'

'না।'

'খুন করতে পারবে?'

(নিশ্চুপ)

'টাকাটা দিয়ে কী করবে, বলতে চাও না?'

'না।'

'ঠিক আছে, তোমাকে রিক্রুট করা হল। সন্ধে আটটার ভেতর রিপোর্ট করবে। যাও।'

পঞ্চাশ জনকে নেবার কথা, বাছাই করা হল সত্তর জনকে। বেন ওয়াটসনের ধারণা ট্রেনিংপর্বে কিছু বাদ পড়বে। আঘাতজনিত কারণে চূড়ান্ত পর্যায়ে অনেককে বাদ দিতে হবে। কয়েকটি মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়।

১২

রাত আটটা। সত্তর জন সদস্যের চুক্তিপত্রে সই করা হয়ে গেছে। এরা বসে আছে মস্ত একটি হলঘরে। সমস্ত দিনের ধকলে সবাই কিছুটা ক্লান্ত এবং উত্তেজিত। অনিশ্চয়তার একটি ব্যাপার আছে। অনিশ্চয়তা মানুষকে দুর্বল করে দেয়।

হার্ভি ফকনার ঘরে ঢুকল ন'টা পনেরয়। এর চেহারায় এমন কিছু আছে, যা দেখলে ভরসা পাওয়া যায়।

'হ্যালো, আমি ফকনার, তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো আমাকে চেন। কি, চেন না?'

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। এক জন রিক্রুট শুধু দাঁত বের করে হাসল। সম্ভবত সে চেনে।

'আমি ছোট্ট একটা বক্তৃতা দেব। কারণ, বক্তৃতার ব্যাপারটি আমার পছন্দ নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাদেরও সম্ভবত নয়। এটা অলস মানুষদের একটা শখের ব্যাপার।'

মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেল। নড়েচড়ে বসল অনেকেই।

'আগামীকাল সকাল দশটায় আমরা চলে যাব ট্রেনিং-গ্রাউন্ডে। সেই ট্রেনিং-গ্রাউন্ডটি কোথায় তা জানার দরকার নেই। যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে, ট্রেনিং দেবে কে? যিনি ট্রেনিং দেবেন তাঁর নাম এন্ড্রু জনাথন। কমান্ডো ট্রেনিং-এ তাঁর মতো যোগ্য ব্যক্তি দ্বিতীয় কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। তোমরা নিজেরাও তা বুঝতে পারবে। ট্রেনিংয়ের দ্বিতীয় পর্যায় পরিচালনা করবেন রবিনসন। তাঁর ট্রেনিং এন্ড্রু জনাথনের ট্রেনিংয়ের মতো ভয়াবহ হবার কথা নয়।

সবাই নড়েচড়ে বসল।

'আমার এরচে' বেশি কিছু বলার নেই। তোমাদের কারো কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?'

এক জন উঠে দাঁড়াল।

'বল, কি জানতে চাও।'

'মিশনটি সম্পর্কে জানতে চাই।'

'সে-সম্পর্কে যথাসময়ে জানা যাবে। জানার সময় এখনো হয় নি। আর কিছু?'

'পারিশ্রমিকের অর্ধেক শুরুতেই দেবার কথা বলা হয়েছিল।'

'শুরুতেই দেওয়া হবে। যারা ট্রেনিং শেষ করতে পারবে, তাদেরকে পারিশ্রমিকের টাকার অর্ধেক দিয়ে দেওয়া হবে। এখন নয়। আর কিছু বলার আছে?'

সবাই চুপ করে রইল।

'আজ রাতটা তোমরা নিজেদের মতো কাটাতে পার। এ-শহরে বেশ কিছু সুন্দরী মেয়ে আছে। রাত কাটানোর জন্যে এদের সঙ্গিনী হিসেবে পাবার চেষ্টা করতে পার। কিছু ভালো নাইট ক্লাবও আছে। অনেক রকম আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে সেখানে। শুধু একটা জিনিস মনে রাখবে—এখানে রিপোর্ট করতে হবে আগামীকাল সকাল আটটায়।

এক জন উঠে দাঁড়াল। বেশ উঁচু স্বরে বলল, 'যাদের আমোদ-প্রমোদে যাবার মতো টাকা নেই, তারা কী করবে?'

বেন ওয়াটসন শান্ত স্বরে বলল, 'সবার জন্যে আজ একটি বিশেষ অ্যালাউন্স-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ রাতের জন্যে সবাইকে নগদ দু' শ' ডলার করে দেওয়া হবে।'

প্রচন্ড তালি পড়ল। কয়েক জন একসঙ্গে শিস দিতে শুরু করল।

যে-অস্থিরতা ও উত্তেজনা এতক্ষণ চাপা ছিল তা কেটে যেতে শুরু করেছে। ফকনার মৃদু হাসল। ক'জন এদের ভেতর থেকে ফিরে আসবে? মনে করা যাক, সব ঘড়ির কাঁটার মতো হবে। ফোর্টনক থেকে বের করে আনা হবে নিশোকে। যথাসময়ে ওদের নেবার জন্যে আসবে ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন। তবুও ক' জন ফিরবে? আজ রাতটি কি অনেকের জন্যেই শেষ স্বাধীন রাত নয়? এটা হয়তো তারও শেষ রাত। ফকনার উঠে গিয়ে টেলিফোনের ডায়ার ঘোরাল।

'হ্যালো। লিজা ব্রাউন?'

'কে?'

'চিনতে পারছ না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিজা ইতস্তত করে বলল, 'ফকনার?'
'হ্যাঁ, ফকনার। লিজা, পার্লারে কতক্ষণ থাকবে?'
'রাত এগারটায় বন্ধ হবে।'
'তুমি কি ডিনার খেয়ে নিয়েছ?'
'না, কিছুক্ষণের মধ্যেই খাব।'
'একটা কাজ করলে কেমন হয় লিজা। কোনো-একটা ভালো রেস্টুরেন্টে যদি আমরা ডিনার খাই, তাহলে কেমন হয়?'
লিজা কিছু বলল না। ফকনার বলল, 'আজ আমার জন্মদিন।'
'তাই নাকি?'
'হ্যাঁ।'
লিজা হেসে ফেলল।
'হাসছ কেন?'
'প্রথম যেদিন তুমি আমাকে বাইরে খেতে বললে, সেদিনও বলেছিলে—আজ আমার জন্মদিন।'
'তাই বুঝি?'
'হ্যাঁ। অবশ্যি আমি সেদিনই বুঝেছিলাম, এটা মিথ্যা কথা।'
'বুঝতে পেরেছিলে?'
'হ্যাঁ। মেয়েরা অনেক জিনিস বুঝতে পারে।'
'আর কী বুঝতে পেরেছিলে?'
'বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি আমাকে বাইরে খাওয়াতে চাচ্ছ ঠিকই, কিন্তু তোমার হাতে বেশি পয়সা নেই। কাজেই তুমি আমাকে নিয়ে যাবে খুব সস্তা ধরনের কোনো জায়গায়, এবং মেনু দেখে খুব সস্তা কোনো খাবারের অর্ডার দেবে।'
'তাই দিয়েছিলাম, না?'
'হ্যাঁ। আজও কি সে-রকম হবে?'
ফকনার হেসে ফেলল, 'তোমার বুঝি খুব ভালো রেস্টুরেন্টে খেতে ইচ্ছা করে?'
'হ্যাঁ। আমার ইচ্ছা করে ফারপোতে ডিনার খেতে। সেখানে ডিনারের মাঝখানে অর্কেস্ট্রা বাজাবে আমার প্রিয় গান—ব্লু দানিয়ুব।'
'আর কি?'
'এই, আর কিছু না।'
'তুমি তৈরি থাক, আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আসছি।'
ফকনার ফারপোতে দুটি সিট রিজার্ভ করল। অর্কেস্ট্রাকে বলল, ব্লু দানিয়ুব—এই গানটি বাজাতে হবে। ফ্লাওয়ার শপে টেলিফোন করে বলল, আগামী এক মাস প্রতি দিন দু'টি করে লাল গোলাপ লিজা ব্রাউনের নামে পাঠাতে হবে। কে পাঠাচ্ছে, সে-সব কিছুই বলা যাবে না। ঠিকানা হচ্ছে ফার্গো পিজা পার্লার নর্থ অ্যাভিন্যু। লিজার বাড়ির ঠিকানা জানা থাকলে ভালো হত। ফকনারের ঠিকানা জানা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩

ট্রেনিং ক্যাম্প।
লরেনকো মারকুইস।
মোজাম্বিক, আফ্রিকা।
১৫ই ডিসেম্বর। মঙ্গলবার।
ভোর ৫–৩০।

বাহাত্তর জন সদস্য খোলা মাঠে অপেক্ষা করছে। সূর্য ওঠার অপেক্ষা। হার্ভি ফকনার তাদের প্রথম কিছু বলবে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনজাতীয় কিছু হয়তো। দলের সবার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা, তারা নিজেদের মধ্যে চাপাস্বরে কথাবার্তা বলছে। এদের দাঁড় করানো হয়েছে পাঁচটি ভাগে। বার জনের একটি রিজার্ভ দলও আছে।

তারা দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড একটি খোলা মাঠের মাঝামাঝি জায়গায়। মাঠটির চারপাশে ঘন বন। পূর্বদিক থেকে হাড়–কাঁপানো শীতল হাওয়া বইছে। সূর্য উঠে গেছে। বনের আড়ালে থাকায় তার আলো এসে এখনো পৌঁছচ্ছে না।

দলের সবাই নড়েচড়ে উঠল। তাঁবুর ভেতর থেকে হার্ভি ফকনার বের হয়ে আসছে। তার মাথায় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সাদা টুপি। রঙিন একটি হাওয়াই শার্ট। গলায় লাল রঙের স্কার্ফজাতীয় কিছু।

'কি, কেমন আছ তোমরা?'

কেউ কোনো জবাব দিল না।

'শীতের প্রকোপটা মনে হয় একটু বেশি। আফ্রিকা একটি অদ্ভুত জায়গা। দিনের বেলা প্রচণ্ড গরম, রাতে শীত, তাই না?'

'ঠিক বলেছেন স্যার।'

'আমি সবসময় ঠিকই বলি। এখন কাজের কথায় আসা যাক। তোমাদের ট্রেনিংয়ের দায়িত্বে যে–আছে, তার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। তার নাম এন্ড্রু জনাথন। জনাথন, একটু এদিকে এস। তোমার হাসিমুখ ওদের দেখিয়ে দাও।'

জনাথন এগিয়ে এল। তার মুখ হাসিমুখ নয়।

'এই ছোটখাটো মানুষটির নাম এন্ড্রু জনাথন। এর সম্পর্কে আমি কিছু বলব না। তোমরা নিজেরা আজ দিনের মধ্যেই তার সম্পর্কে জানবে। হা–হা–হা। আমার নিজের ট্রেনিংও এই লোকের কাছে। সে ছিল ইউএস ম্যারিনের RSM. এখানে যারা পুরোনো লোক আছে, তারা তাকে চিনবে। আমরা তাকে ডাকতাম ইয়েলো জাগুয়ার।'

দলটির মধ্যে চাপা ধরনের কথাবার্তা বাড়তেই থাকল। ফকনার সেদিকে কোনো কান না–দিয়ে নিজের মনেই বলতে লাগল, 'লাঞ্চের আগ পর্যন্ত হবে ড্রিল। লাঞ্চের পর অস্ত্রের ট্রেনিং। ঠিক আছে? এখন বাজছে—পাঁচটা চল্লিশ। এই ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ ভোর পাঁচটা চল্লিশে আমি তোমাদের তুলে দিচ্ছি জনাথনের হাতে। যথাসময়ে আমি আবার নিজের হাতে তোমাদের নেব। গুড লাক।'

ফকনার এগিয়ে এসে প্রত্যেকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল, দু–একটা ছোটখাটো প্রশ্নও করল, যেমন—কি, চোখ লাল কেন? রাতে ঘুম ভালো হয় নি? বাহ্‌, তোমার হাত দেখি মেয়েমানুষদের মতো নরম। এত নরম হাতে কি রাইফেল মানায়? তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে থাকা উচিত ফুল। কি, ঠিক বললাম না?

ফকনারের সঙ্গে–সঙ্গে বেন ওয়াটসন এবং রবিনসনও মাঠ ছেড়ে গেল। সূর্য উঠে এসেছে। এন্ড্রু জনাথন শুধু দাঁড়িয়ে আছে। জনাথনের কোমরে একটি লুগার টুয়েন্টিওয়ান পিস্তল। গায়ে গলাকাটা গেঞ্জি। গলায় ফুটবল রেফারিদের বাঁশি। সে বাঁশিতে তীব্র ফুঁ দিয়ে আচমকা সবাইকে চমকে দিল।

'অ্যাটেনশন। তোমাদের অনেকেরই দেখি দাড়ি–গোঁফ এবং লম্বা–লম্বা চুল। আজ দিনের মধ্যেই এ–সব বাড়তি ঝামেলা থেকে নিজেদের মুক্ত করবে। তোমাদের কারো–কারো মুখে একটু বাঁকা হাসি দেখতে পাচ্ছি। কারণ, তোমরা নিজেদের খুব শক্ত মানুষ ভাবছ এবং চোখের সামনে এক জন ছোটখাটো মানুষকে দেখছ। তবে সুখের কথা, তোমরা অনেকেই আমাকে চেন। আগে পরিচয় হয়েছে। যারা চেন না তাদের বলছি, একজন মানুষকে একটি রাইফেলের চেয়েও বড় হবার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমরা কেউ যদি আমার কথার অবাধ্যতা কর, আমি তৎক্ষণাৎ গুলি করে পথের কুকুরের মতো মারব। আমার কোমরে যে–বস্তুটি দেখছ, তার নাম লুগার টুয়েন্টিওয়ান। মানুষের মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করে না। তোমাদের চেয়েও অনেক অনেক ভালোমানুষকে আমি চোখের সামনে মরতে দেখেছি। কাজেই আমি যখন বলব, লাফ দাও—লাফ দেবে। তোমার সামনে খাদ আছে কি নেই সে–সব দেখবে না। পরিষ্কার হয়েছে?'

কেউ কোনো জবাব দিল না।

'গুলি করে মারার কথাটা আমার মনে হয় অনেকেই বিশ্বাস করছ না। তোমাদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, এখানে আইন–আদালত বলে কিছু নেই। আমি এন্ড্রু জনাথন—আমিই আইন। আমার এই ছোট পিস্তলটি হচ্ছে আদালত।'

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

'কারোর কিছু বলার আছে?'

কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

'এস, এখন আমি দেখব, তোমাদের শারীরিক ফিটনেস কোন পর্যায়ে আছে। আমি বাঁশি বাজাবার সঙ্গে–সঙ্গে দশ কদম হাঁটবে, তারপর পঞ্চাশ কদম দৌড়াবে, তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বে। সঙ্গে–সঙ্গে উঠে দাঁড়াবে। দৌড়াবে। আবার শোবে। যতক্ষণ–না আমি থামতে বলব, এটা চলতে থাকবে। শুরু করা যাক।'

তীক্ষ্ণ শব্দে হুইসেল বাজল।

সাড়ে ছ'টার মধ্যে সব এলোমেলো হয়ে যেতে শুরু করল। শুয়ে পড়বার পর উঠতে সময় লাগতে লাগল। পঞ্চাশ কদম দৌড়ে যাবার কথা। অনেকেই অল্প কিছুদূর গিয়েই বসে পড়তে শুরু করল। সবাই ঘামছে। চোখের মণি ছোট হয়ে আসছে। ঠোঁট গেছে শুকিয়ে।

জনাথন এগিয়ে গেল। কড়া গলায় বলল, 'এই যে নীলশার্ট, তুমি শুয়ে আছ কেন? উঠে দাঁড়াও।'

'আমার ওঠার ক্ষমতা নেই স্যার।'

'উঠে দাঁড়াও, নয়তো লাথি বসিয়ে ওঠাব।'

'স্যার, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'দেখা যাক, সম্ভব কি সম্ভব নয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনাথন অতিদ্রুত দু'টি গুলি করল। শুয়ে থাকা নীল শার্ট পরা লোকটির মাথায় চুল ঘেঁষে গেল একটি, অন্যটি তার চেয়ে এক ইঞ্চি উপরে। সে লাফিয়ে উঠল।

'গুড। দৌড়াও, শুয়ে পড়। আবার উঠে দাঁড়াও। হাঁট দশ কদম। দৌড়াও।'

সকাল আটটার দিকে অনেকেই বমি করতে শুরু করল। দৌড়ানোর ক্ষমতা রইল না অনেকেরই। জনাথন শীতল স্বরে বলল, 'স্কোয়াড হল্ট। নাশতার জন্যে আধ ঘন্টার ব্রেক দেওয়া হল। আধ ঘন্টা পর শুরু হবে ফুট ড্রিল। ডিসমিস। আধ ঘন্টা পর সবাইকে এখানে চাই।'

ফুট ড্রিলের ব্যাপারে জনাথনের বরাবরই দুর্বলতা আছে। সে মনে করে, দশ মিনিট ফুট ড্রিল দেখেই বলে দেওয়া যায় কে সত্যিকার সৈনিক, কে নয়। তা ছাড়া ফুট ড্রিল সৈনিকদের হুকুম তামিল করতে শেখায়। এবং একসময় তাদের রক্তে মিশে যায়, যা করতে বলা হবে তা করতে হবে। এর অন্য কোনো বিকল্প নেই।

'অ্যাটেনশন। স্ট্যান্ড এট ইজ। রাইট টার্ন। স্কোয়াড মার্চ। লেফট লেফট। লেফট লেফট। হল্ট। লেফট টার্ন স্কোয়াড মার্চ। লেফট লেফট। লেফট লেফট। হল্ট।'

আধ ঘন্টা ফুট ড্রিলের পর ছ'টি দলকে তাদের নিজেদের এনসিও'র হাতে ছেড়ে দেওয়া হল। এরা তার নিজের, নিজের দলকে দুপুর বারটা পর্যন্ত ফুট ড্রিল করাবে। জনাথন ঘুরে–ঘুরে দেখতে লাগল। কাজ ভালোই এগুচ্ছে। মাঝে–মাঝেই অবশ্যি জনাথনের উচ্চকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, 'এই যে, তোমার নাম কি?'

'পিটার স্যার।'

'শোন পিটার, তোমার বাম হাত যদি ডান পা'র সঙ্গে সমান ভাবে ওঠানামা না–করে, তাহলে বাম হাতটি টেনে ছিঁড়ে ফেলব। অবাধ্য হাতের আমার কোনো প্রয়োজন নেই। বুঝতে পারছ?'

'পারছি স্যার।'

'এই যে তুমি, সাদাগেঞ্জি, ঠিকমতো পা ফেল। তুমি নিশ্চয়ই চাও না তোমার পা টেনে ছিঁড়ে ফেলি? নাকি চাও?'

জনাথন আকাশের দিকে তাকাল। রোদের তেজ বাড়তে শুরু করেছে। ঘড়িতে বাজছে মাত্র সাড়ে দশটা। রোদ আরো বাড়বে। সে এনসিওদের ডেকে আনল।

'এখন আমরা যাব বনে। গাছপালার ভেতর কীভাবে নিঃশব্দে দ্রুত হাঁটা যায়, সেটা শেখাব। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনিং। রোজ খানিকক্ষণ এই ট্রেনিং হবে। এখন সবাই দৌড়াও আমার সঙ্গে। স্কোয়াড কুইক মার্চ।'

হাঁপাতে–হাঁপাতে দৌড়াতে শুরু করল সবাই। আকাশে গনগনে সূর্য। দেখে মনে হচ্ছে ক্লান্ত মানুষগুলো যে–কোনো সময় একে অন্যের ওপর গড়িয়ে পড়বে।

দৌড়াও, দৌড়াও। বড়–বড় স্টেপ ফেল। এতে পরিশ্রম হবে কম। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে থাক। বাই দা লেফট। বাই দা লেফট।

বিকেল চারটায় সবাই এসে দাঁড়াল তাঁবুর সামনে। এন্ড্রু জনাথনের হাতে একটি রাইফেল। তার সামনে একটি টেবিলে একটি সাব–মেশিনগান। এন্ড্রু জনাথন রাইফেল হাতে এগিয়ে এল কয়েক পা। দলের সবাই খানিকটা পিছিয়ে গেল।

'যে–রাইফেল তোমাদের দেওয়া হয়েছে, তার নাম কালাসনিকভ অ্যাসল্ট উইপন। সংক্ষেপে AK-7.62. সবাই একে আদর করে ডাকে কলা রাইফেল। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ, এর ম্যাগজিনগুলি হচ্ছে কলার মতো বাঁকানো। তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যেভাবে চেন, এই রাইফেলটিকে তার চেয়েও ভালোভাবে চিনবে। এর রেঞ্জ কম। কিন্তু দু' শ' গজ পর্যন্ত এটি অত্যন্ত নিখুঁত। এ দিয়ে একটি-একটি গুলি করা যায় আবার প্রয়োজনে প্রতি মিনিটে দু' শ' রাউন্ড করেও গুলি করা যায়। এটা হচ্ছে একটা ডিফেনসিভ উইপন।

'এখন সবাই মন দিয়ে আমার এই উপদেশ শোন। যারা পুরোনো সৈন্য, তাদের এ-উপদেশ জানা আছে, যারা নতুন, তাদের জানা নেই। তবে এ-উপদেশ সবার জন্যেই। এখন থেকে রাইফেলটি থাকবে তোমাদের সঙ্গে-সঙ্গে। বাথরুমে যাও, গোসলখানায় যাও বা ঘুমাতে যাও, রাইফেল থাকবে তোমার সঙ্গে, যতক্ষণ-না এটা তোমাদের একটি বাড়তি হাতের মতো হয়।

তোমরা নিজেদের শরীরের যেমন যত্ন নাও, রাইফেলটিকেও তেমনি যত্ন করবে। এখন তোমাদের দেখাচ্ছি এটা কী করে খুলতে হয় এবং ফিট করতে হয়।'

রাতের খাওয়া সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে শেষ হয়ে গেল। সাড়ে সাতটায় মেসের হলঘরে জনাথন দেখাল লাইট RPD মেশিনগান।

'তোমরা সবাই অস্ত্রটি ভালো করে চিনে রাখ, এর নাম RPD লাইট মেশিনগান। এটিও তৈরি হয়েছে শক্তিশালী একটি দেশে। তবে সেখানে এখন আর এর ব্যবহার নেই। পৃথিবীতে যে-ক'টি হালকা মেশিনগান আছে এটি হচ্ছে তার মধ্যে একটি। ওজন মাত্র ১৯·৩ পাউন্ড। ব্যানানা রাইফেলে যে-গুলি ব্যবহার করা হয়, এতেও সেই গুলিই ব্যবহার হয়। প্রতি মিনিটে এর সাহায্যে দু' শ' পঞ্চাশ রাউন্ড করে গুলি ছোঁড়া যায়। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় একটি অস্ত্র, এবং চমৎকার একটি জিনিস। আমাদের যে-পাঁচটি দল আছে, তাদের সঙ্গে দু'টি করে থাকবে। অর্থাৎ সর্বমোট দশটি অস্ত্র থাকবে। তবে সবাইকে এই অস্ত্র চালানো শিখতে হবে।'

রাত আটটায় মেসঘরের বাতি নিভিয়ে দেওয়া হল। শেষ হল প্রথম দিনের ট্রেনিং।

১৪

হঠাৎ করে জুলিয়াস নিশোর শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়েছে। পুরোনো সব অসুখ নতুন করে দেখা দিতে শুরু করেছে। শ্বাসকষ্ট তার একটি। কাল রাতে খুব কষ্ট হল। এত বাতাস পৃথিবীতে, অথচ তিনি তাঁর ফুসফুস ভরাবার জন্যে যথেষ্ট বাতাস যেন পাচ্ছেন না। আশেপাশে কেউ নেই যে ডেকে বলবেন—পাশে এসে বস। হাত রাখ আমার বুকে।

শেষরাতের দিকে তাঁর মনে হল মৃত্যু এগিয়ে আসছে। তিনি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনলেন। নিজেকে তিনি সাহসী মানুষ বলেই এতদিন জেনে এসেছেন। কাল সে-ভুল ভাঙল। কাল মনে হল, তিনি সাহসী নন। মৃত্যুকে সহজভাবে নিতে পারছেন না। ভয় লাগছে। তীব্র ভয়, যা মানুষকে অভিভূত করে দেয়। মাওয়া সকালে খাবার নিয়ে এসে ভীত স্বরে বলল, 'আপনার শরীর বেশ খারাপ মনে হচ্ছে।'

নিশো দুর্বল ভঙ্গিতে হাসলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রাতে ভালো ঘুম হয় নি?'

'না।'

'রাতের খাবারও মনে হয় খান নি?'

'না, খাই নি।'

মাওয়া চিন্তিত বোধ করল। এই লোকটিকে বিনা চিকিৎসায় থাকতে দেওয়া যায় না। অথচ ডাক্তার আনা মানেই বাইরের একজনকে জানানো—নিশো বেঁচে আছেন।

'ভালো কফি এনেছি, খাবেন?'

'না।'

'একটু খান, ভালো লাগবে।'

মাওয়া কাপে কফি ঢালল। নিশো বললেন, 'পৃথিবীতে সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে প্রতীক্ষা করা। মনে কর, একটি অচেনা স্টেশনে তুমি অপেক্ষা করছ ট্রেনের জন্যে। ট্রেন আসছে না। কখন আসবে তুমি জান না। নাও আসতে পারে, কিংবা কয়েক মিনিটের মধ্যে এসে পড়তে পারে। কেমন লাগবে তখন মাওয়া?'

মাওয়া জবাব দিল না।

'আমার ঠিক সে-রকম লাগছে।'

'কফি নিন।'

নিশো কফির পেয়ালা হাতে নিলেন, কিন্তু চুমুক দিলেন না। হালকা গলায় বললেন, 'অনেক দিন পর কাল রাতে একটা কবিতা লিখলাম। দীর্ঘ কবিতা। কবিতা তোমার কেমন লাগে?'

'ভালো লাগে না। সাহিত্যে আমার কোনো উৎসাহ নেই।'

'আমার ইচ্ছা করছে কবিতাটা কাউকে শোনাই। তুমি শুনবে?'

মাওয়া জবাব দিল না। চিন্তিত মুখে তাকিয়ে রইল। নিশো হাত বাড়িয়ে কবিতার খাতা নিলেন। মাওয়া লক্ষ করল, খাতা নেবার মতো সামান্য কাজেও তিনি ক্লান্ত হয়েছেন। খাতাটি নেওয়ার সময় তাঁর হাত সামান্য কাঁপছিল।

নিশো ভরাট গলায় পড়লেন—

'জোছনার ছাদ ভেঙে পাখিরা যাচ্ছে উড়ে যাক বাতাসে, বারুদ গন্ধ থাক অনুভবে।'

কবিতাটি দীর্ঘ। সেখানে বারবার বারুদের গন্ধের কথা আছে। মাওয়া কিছুই বুঝল না, বোঝার চেষ্টাও করল না।

'কেমন লাগল?'

'ভালো।'

'মাওয়া, আমি সম্ভবত একমাত্র কবি, যে কখনো প্রেমের কবিতা লেখে নি। প্রেমের মতো একটি বড় ব্যাপারকে আমি অগ্রাহ্য করেছি।'

'আপনি শুয়ে থাকুন। বেশি কথা বলাটা ঠিক হবে না।'

'এখন কেন যেন শুধু প্রেমের কবিতা লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে। কয়েক দিন ধরেই ভাবছি, একটি দীর্ঘ প্রেমের কবিতা লিখব। প্রথম লাইনটিও ভেবে রেখেছি—আমার ভোরের ট্রেন। মা বললেন—ঘুমো, তোকে ডেকে দেব ফজরের আগে। লাইনটি কেমন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভালো।'

'ছেলেটি শুয়ে থাকবে, কিন্তু ঘুমুতে পারবে না। পাশের বাড়ির কিশোরী মেয়েটির কথা শুধু ভাববে।'

'আপনি শুয়ে থাকুন, আমি সন্ধ্যাবেলা একবার আসব। চেষ্টা করব একজন ডাক্তার নিয়ে আসতে।

'সেই ডাক্তার এক জন মৃত মানুষকে বসে থাকতে দেখে অবাক হবে না তো?'

মাওয়া কিছু বলল না। নিশো বললেন, 'আমরা খুব-একটা খারাপ সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। এক জন জীবিত মানুষকে মৃত বানিয়ে রেখেছি। জেনারেল ডোফা যথেষ্ট বুদ্ধিমান, কিন্তু এই একটি কাঁচা কাজ সে করেছে।'

মাওয়া তাকিয়ে রইল।

'ঘটনাটি প্রকাশ হবে। তুমি নিজেই একদিন বলবে। তুমি না-বললেও কেউ-না-কেউ বলবে—বলবে না?'

'হয়তো বলবে।'

'একজন মানুষকে মেরে ফেলা এক কথা, কিন্তু একজন জীবিত মানুষকে মৃত বলে ঘোষণা দেওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।'

'আপনি বিশ্বাস করুন, আমি সন্ধ্যাবেলা আসব।'

'আমার মনে হয় না তুমি সন্ধ্যাবেলা আসবে। তুমি হচ্ছ একজন রাজনীতিবিদ, যারা কথা দেয় কিন্তু কথা রাখে না। তুমি অনেক বার বলেছিলে রাতে আমার মুখের ওপর এই বাতিটি জ্বালিয়ে রাখবে না, কিন্তু বাতি ঠিকই জ্বলছে।'

মাওয়া ঘর ছেড়ে চলে গেল। সন্ধ্যাবেলা সে ঠিকই এল না, তবে প্রথম বারের মতো মুখের ওপরের বাতি নিভে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। ভয়ানক অন্ধকার। নিশোর মনে হল, বাতি থাকলেই যেন ভালো হত।

১৫

ট্রেনিং ক্যাম্প।
লরেনকো মারকুইস।
২৩ *ডিসেম্বর। মঙ্গলবার।*
মোজাম্বিক, আফ্রিকা।

ট্রেনিংয়ের ধরন পাল্টেছে। এন্ড্রু জনাথনের সঙ্গে যোগ দিয়েছে রবিনসন। তার ট্রেনিং জনাথনের মতো ভয়াবহ নয়। রবিনসন কথা বলে নিচু গলায় এবং হাসিমুখে। কমান্ডোদের জন্যে এটা একটা বড় পাওনা। জনাথনকে তারা ভয় করে। ভালবাসে রবিনসনকে।

মঙ্গলবারের ভোরবেলায় রবিনসন সবাইকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তারা প্রায় চল্লিশ মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। জনাথনের বেলায় তা হত না। এই চল্লিশ মিনিট সে কাটাত ফুট ড্রিল করিয়ে।

রবিনসনের চোখে সানগ্লাস। মাথার ধবধবে সাদা চুল বাতাসে উড়ছে। তার হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা কফির মগ। সে কফিতে চুমুক দিচ্ছে এবং এক জন এক জন করে সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। তার মাথায় কোনো পরিকল্পনা আছে নিশ্চয়ই।

'কমান্ডোরা, এবার আমরা ট্রেনিংয়ের মূল পর্যায়ে এসে গেছি। তোমরা তোমাদের সামনে হার্ডবোর্ডের যে–জিনিসগুলি দেখছ, সেগুলি ফোর্টনকের আদলে তৈরি। ফটোগ্রাফ থেকে তৈরি করা হয়েছে। কাজেই মোটামুটি নিখুঁত বলা চলে। যে–সব জায়গায় সেন্ট্রি থাকে, সে–সব জায়গায় ডামি রাখা হয়েছে। রাস্তা দেখানো হয়েছে চকের গুঁড়ো দিয়ে। যে–সব জায়গায় ডাবল লাইন দেখছ, সে–সব রাস্তা একটু উঁচু। ট্রিপল লাইন মানে আরো উঁচু।

'লক্ষ করছ নিশ্চয়ই, ফোর্টনক কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। তবে সুখের বিষয়, কাঁটাতারের সঙ্গে কোনো অ্যালার্ম সিস্টেম নেই। কাজেই আমরা সহজেই কাঁটাতার কেটে ভেতরে ঢুকতে পারব। আমাদের হাতে চারটি ভিন্ন–ভিন্ন প্ল্যান আছে। প্রতিটি প্ল্যানই আমরা পরীক্ষা করব। কোন প্ল্যান নেওয়া হবে সেটা ঐ মুহূর্তেই ঠিক করা হবে। হয়তো এমন হতে পারে, সব ক'টি প্ল্যান বাতিল করে আমাদের নতুন কিছু ভাবতে হবে।......

যেমন ধর, আমরা জানি ফোর্টনকে বর্তমান সৈন্যসংখ্যা তিন শ' পঞ্চাশ। গিয়ে দেখলাম রাতারাতি সেখানে এক ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। তখন নিশ্চয়ই আমাদের তৈরি প্ল্যান খাটবে না। কী বল?'

'স্যার, সে–রকম কোনো সম্ভাবনা কি আছে?'

'থাকবে না কেন? নিশ্চয়ই আছে। কেন, ভয় লাগছে?'

কমান্ডোদের মধ্যে বেশ কয়েক জন উঁচু গলায় হেসে উঠল। এমন করাটা জনাথনের সঙ্গে সম্ভব ছিল না।

'প্রথম পরিকল্পনাটি এ–রকম—আমরা দক্ষিণ দিক থেকে আসব—এই যে দেখ, এইদিক থেকে। আট জন সেন্ট্রিকে শেষ করবার দায়িত্ব থাকবে আট জনের ওপর। কাজটি করতে হবে বেয়োনেটের সাহায্যে, কোনোক্রমেই গুলি করা যাবে না। ঠিক একই সময় দু'জন চলে যাবে কারারক্ষী মাওয়ার বাসভবনে। মাওয়া থাকে এইখানে—দোতলায়। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি আছে। সিঁড়িতে কোনো দরজা নেই। মাওয়ার বাড়ির সামনে থাকে এক জন সেন্ট্রি। তাকে সামলানোর পর এরা ঢুকবে মাওয়ার ঘরে এবং চাবি নিয়ে দ্রুত চলে আসবে এই জায়গায়। এখানে আছেন জুলিয়াস নিশো। তারা চাবি নিয়ে এখানে এসেই দেখবে, আমি সেলের সামনে অপেক্ষা করছি।'

'স্যার, যদি চাবি না–পাওয়া যায়?'

'না–পাওয়া গেলেও কোনো সমস্যা হবে না। আমাদের সঙ্গে তালা ভাঙার যন্ত্র আছে। তবে আমি সেটা ব্যবহার করতে চাই না। এতে অনেক সময় নষ্ট হবে। আমাদের হাতে এত সময় নেই।'

এবার আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়—ব্যারাকেই সব সৈন্যরা থাকবে। খুব সম্ভব ঘুমিয়ে থাকবে। আমাদের পনের জনের একটি দলের ওপর দায়িত্ব থাকবে ব্যারাক সামলানোর।'

'কিভাবে সামলানো হবে?'

'ভালোভাবেই সামলাতে হবে। আমরা পেছনে কিছু রেখে যাব না। এখন পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঁচিশ জন কমান্ডো ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের হাতে আছে আরো পঁচিশ জন। ঠিক না?'

'জ্বি স্যার।'

'এই পঁচিশ জনের দশ জন থাকবে রিজার্ভে। এদের দায়িত্ব হচ্ছে নিশোকে ঠিকমতো বের করে নিয়ে আসা।'

'বাকি পনের জনের?'

'বাকি পনের জনের দায়িত্ব ফোর্টনকে নয়। তারা সরাসরি চলে যাবে এয়ারপোর্টে। সেটা তারা দখল করবে এবং আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। তাদের দায়িত্বে থাকবে এমন একজন লোক, যার ওপর ভরসা করা চলে। বেন ওয়াটসন। বেন ওয়াটসন হচ্ছে একাই একটি ব্রিগেড। তোমরা যারা তার সঙ্গে কাজ করবে, তারাই সেটা টের পাবে। ফোর্টনকের জন্যে যেমন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে, এয়ারপোর্টের জন্যে সে-রকম কিছু তৈরি করা হয় নি। তার কারণ, বেন ওয়াটসন কোনো রকম প্ল্যানিং-এ বিশ্বাসী নয়। একেক জনের কর্মপদ্ধতি একেক রকম।......

এখন আমরা এ-জায়গা থেকে পঁচিশ গজ দূরে চলে যাব। সবাইকে আমি কাজ ভাগ করে দেব। আমি দেখাব, কী করে আসতে হবে, কোন দিক দিয়ে আসতে হবে। এবং আমরা চেষ্টা করব, কত কম সময়ে কাজটা শেষ করতে পারি সেটা দেখতে। তোমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমাদের হাতে সময় খুব কম, এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট। এর মধ্যে আমাদের কাজ শেষ করে প্লেনে উঠতে হবে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও?'

'কাঁটাতারের বেড়া কে কাটবে?'

রবিনসন হেসে ফেলল এবং হাসতে-হাসতে বলল, 'আমি। ঐ কাজটি আমি খুব ভালো করতে পারি। এস, এখন শুরু করা যাক। প্রথম প্ল্যানটি আমরা এখন দেখব। স্কোয়াড, অ্যাটেনশন। টু দা লেফট, কুইক মার্চ।

১৬

মোরান্ডা।
২৪শে ডিসেম্বর। বুধবার। সকাল ৯টা।

জেনারেল ডোফা গার্ড রেজিমেন্ট পরিদর্শনে এসেছেন। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। তাঁর সঙ্গী-সাথীরা এর কারণ বুঝতে পারছিল না। তারা শঙ্কিত বোধ করছিল।

জেনারেল ডোফা পরিদর্শনের কাজ সারলেন। প্রথাগত বক্তৃতা দিলেন— সৈন্যদের কাজ হচ্ছে দেশের আদর্শকে সামনে রাখা। দেশের প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করা ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিদর্শনের শেষে চা-চক্রের ব্যবস্থা ছিল। ডোফা চা-চক্রে রাজি হলেন না। আগের চেয়েও গম্ভীর মুখে প্রেসিডেন্ট হাউসের দিকে রওনা হলেন।

আজ ক্রিসমাস ইভ। ক্রিসমাস ইভের প্রাক্কালে তিনি সবসময়ই একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণ প্রচার হয় বেতার ও টিভিতে। আজকের ভাষণটি তৈরি হয়েছে এবং তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে কপি এসেছে। ভাষণ তাঁর পছন্দ হয় নি। বক্তৃতা-লেখককে কিছু কড়া-কড়া কথা শুনিয়েছিলেন। নতুন একটি ভাষণ তৈরি করে আনার কথা।

নতুন ভাষণটি আগেরটির চেয়েও বাজে হয়েছে। ডোফা ধমকে উঠলেন, 'এক জিনিসই তো আপনি লিখে এনেছেন। দু'-একটা শব্দ এদিক-ওদিক হয়েছে। এর বেশি কিছুই তো করা হয় নি। নতুন কিছু লিখুন।'

বক্তৃতা-লেখক বিনীতভাবে বললেন, 'কি লিখব, যদি একটু বলে দেন।'

'জুলিয়াস নিশোর কথা তো বক্তৃতায় কিছুই নেই। তাঁর কথা থাকা উচিত। তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে কি কি করা হবে তা বলা দরকার।'

'কি কি করবেন, স্যার?'

'সংগ্রহশালা করা যায়। এই জাতীয় কিছু লিখে আনুন, সব কি আমিই বলে দেব নাকি? মাউ উপজাতিদের সম্বন্ধেও কিছু লেখা উচিত। যান, নতুন করে লিখুন। আমার প্রতিটি বক্তৃতায় একই জিনিস থাকে।'

বিকেলে তিনি গেলেন প্রেসিডেন্ট রেজিমেন্ট পরিদর্শনে। এটা তাঁর হঠাৎ পরিদর্শন। আগে কিছুই ঠিক করা ছিল না। তাঁর মুখ আগের মতোই গম্ভীর। প্রেসিডেন্ট রেজিমেন্টের জেনারেল র‍্যাবি এর কারণ বুঝতে পারলেন না। কোথাও কোনো ঝামেলা হয়েছে কি? হবার তো কথা নয়। সবকিছু বেশ স্বাভাবিক। প্রেসিডেন্ট কি মাউ উপজাতিদের নিয়ে চিন্তিত? চিন্তিত হবার মতো তেমন কোনো কারণ কি সত্যি-সত্যি আছে?

মাউদের কোনো অস্ত্রবল নেই। বর্শা এবং তীর-ধনুকের কাল অনেক আগেই শেষ হয়েছে। সাহসের এ-যুগে আর দাম নেই। পরিদর্শনপর্ব ভালোভাবেই শেষ হল। জেনারেল ডোফা সৈন্যদের আনুগত্য ও দেশপ্রেমের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বিশেষ করে প্রেসিডেন্টের রেজিমেন্ট যে পৃথিবীর যে-কোনো সৈন্যবাহিনীর আদর্শস্থানীয় হতে পারে, সে-কথাও বললেন।

পরিদর্শনশেষে জেনারেল র‍্যাবির সঙ্গে তাঁর একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক বসল। সেখানেও তিনি গম্ভীর হয়ে রইলেন। সাধারণত এ-জাতীয় বৈঠকগুলিতে তিনি মজার-মজার কথা বলে আবহাওয়া হালকা করে রাখেন। আজ সে-রকম হচ্ছে না। র‍্যাবি বললেন, 'স্যার, আপনার শরীর কি ভালো আছে?'

'শরীর ভালোই।'

'আপনাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে।'

'না, চিন্তিত নই। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। সে-জন্যেই আমার আসা।'

'স্যার, বলুন।'

'ফোর্টনকে এক শ' জন কমান্ডোর একটি দল পাঠাতে হবে।'

'কখন?'

'আজই।'

জেনারেল র‍্যাবি কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। ডোফা বললেন, 'তুমি কি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও?'

'না স্যার, কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই না। এক ঘন্টার মধ্যে হেলিকপ্টারে করে কমান্ডো পাঠানো হবে। ওদের ওপর কি কোনো নির্দেশ থাকবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, কোনো নির্দেশ নয়।'

'আপনি যদি চান আমি ওদের সঙ্গে থাকতে পারি।'

'না, তুমি রাজধানীতেই থাক।'

জেনারেল র‍্যাবি ইতস্তত করে বললেন, 'ঠিক কি কারণে আপনি এটা চাচ্ছেন তা জানতে পারলে আমি সেভাবে ওদের নির্দেশ দিয়ে দিতাম।'

ডোফা দীর্ঘ সময় চুপচাপ থেকে বললেন, 'তোমাকে বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। আমি খারাপ ধরনের স্বপ্ন দেখেছি।"

'কি দেখেছেন স্বপ্নে?'

'আমার মধ্যে কিছু কুসংস্কার আছে।'

'সে তো আমাদের সবার মধ্যেই আছে। আইনস্টাইনের মধ্যেও ছিল বলে শুনেছি।'

ডোফা থেমে-থেমে বললেন, 'স্বপ্নটা দেখলাম ভোররাত্রে। যেন ফোর্টনক থেকে জুলিয়াস নিশো বের হয়ে আসছেন। তাঁর সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মাউ উপজাতীয়। তারা ছুটে আসছে রাজধানীর দিকে।' ডোফা কপালের ঘাম মুছলেন।

'জুলিয়াস নিশোকে নিয়ে আপনি চিন্তিত, সে-কারণেই এ-রকম স্বপ্ন দেখেছেন। অন্য কোনো কারণ নেই। আমি কি স্যার আপনাকে একটি পরামর্শ দিতে পারি?'

'হ্যাঁ, পার।'

'নিশোর ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখবেন না, চুকিয়ে দিন। স্বপ্নের ব্যাপারটাও ভুলে যান।'

'এ-রকম বাস্তব স্বপ্ন আমি খুব কম দেখেছি। ভোররাত্রের স্বপ্ন, তা ছাড়া এটা আমার জন্মমাস।'

'আমি স্যার ঠিক এই মুহূর্তে ফোর্টনকে কমান্ডো পাঠানো সমর্থন করি না। কমান্ডো পাঠানো মানেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমাদের যা করতে হবে, তা হচ্ছে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না-করে কাজ সারা। তবে আপনি চাইলে এক ঘন্টার ভেতর আমি এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য পাঠাতে পারি। স্যার, পাঠাব?'

ডোফা উঠে দাঁড়ালেন। ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'দরকার নেই।'

সন্ধ্যায় তিনি একটি চমৎকার ভাষণ দিলেন জাতির উদ্দেশ্যে। সেই ভাষণে জুলিয়াস নিশোর কথা এল—

'আজ আমি গভীর দুঃখের সাথে স্মরণ করছি প্রয়াত নেতা জুলিয়াস নিশোকে, যাঁর চিন্তায় ও কর্মে জাতির আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়েছে। যাঁর রচনাবলী আমাকে দিয়েছে নতুন জীবনের সন্ধান। যে-জীবন সুখ ও সমৃদ্ধির, যে-জীবন আশা ও আনন্দের।

'আমি তাঁর স্মৃতিকে চির জাগরুক রাখার জন্যে জুলিয়াস নিশো সংগ্রহশালা স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছি। তাঁর রচনাবলী যাতে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছতে পারে, সে-জন্যে সরকারী পর্যায়ে রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সরকারের তথ্য ও প্রচার দপ্তরের হাতে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস তারা সুষ্ঠুভাবে সে-দায়িত্ব পালন করবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতে গোয়েন্দা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ব্রিগেডিয়ার নুসালকের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ সময় কাটালেন। তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হল—

ডোফা মাউরা কি জুলিয়াস নিশোর মৃত্যুসংবাদ বিশ্বাস করেছে?

নুসালকে করেছে স্যার। এরা সরল প্রকৃতির মানুষ, সবকিছুই বিশ্বাস করে।

ডোফা বিশ্বাস যদি করেই থাকে, তা হলে এ-রকম ভয়াবহ একটি গুজব ছড়াল কিভাবে? কেন তাদের ধারণা হল জুলিয়াস নিশো আবার ফিরে আসবেন?

নুসালকে স্যার, মাউ হচ্ছে একটি কুসংস্কার-আচ্ছন্ন অন্ধকার উপজাতি।

ডোফা অন্ধকার উপজাতি হোক আর যা-ই হোক, এ-রকম একটি গুজবের পেছনে কোনো একটা ভিত্তি তো থাকবে?

নুসালকে আমি এ নিয়ে প্রচুর খোঁজখবর করেছি এবং এখনো করছি। গুজবের কোনো ভিত্তি পাই নি। এটা মুখে-মুখে ছড়িয়েছে। প্রচারটা হয়েছে এভাবে—মাউ জাতির চরম দুর্দিনে জুলিয়াস নিশো ফিরে আসবেন এবং জাতিকে পথ দেখাবেন। সে-দিনটি হবে মাউদের চরম সৌভাগ্যের দিন। অনেকটা পথপ্রদর্শকের মতো।

ডোফা তাই দেখছি। এরা তা গভীরভাবে বিশ্বাস করে?

নুসালকে জ্বি স্যার, করে।

ডোফা এই বিশ্বাস ভাঙানোর জন্যে আমাদের কি করা উচিত?

নুসালকে এই বিশ্বাস ভাঙানোর কোনো রকম চেষ্টা না-করাই উচিত।

ডোফা কেন?

নুসালকে যত দিন এই বিশ্বাস থাকবে তত দিন তারা চুপ করে থাকবে। তারা অপেক্ষা করবে জুলিয়াস নিশোর জন্যে।

ডোফা ভালোই বলেছ। তোমার আইডিয়া আমার পছন্দ হয়েছে।

AMARBOI.COM

রাত এগারটার দিকে তিনি ফোর্টনকের কারাধ্যক্ষ মাওয়ার সঙ্গে ওয়্যারলেসে কথা বললেন।

'কেমন আছ, মাওয়া?'

'জ্বি স্যার, ভালো। আপনার শরীর কেমন?'

'আমি ভালোই আছি।'

'আপনার বক্তৃতা শুনলাম স্যার। চমৎকার!'

'ধন্যবাদ। তোমাদের ওখানকার সব ঠিক তো?'

'সব ঠিক আছে।'

'আমাদের বন্দির খবর কি?'

'খবর ভালো স্যার। একটু অসুস্থ, তবে তেমন কিছু না।'

ডোফা ওয়্যারলেস সেট রেখে দিলেন। সেই রাতেও তাঁর ভালো ঘুম হল না।

১৭

ট্রেনিং ক্যাম্প।

লরেনকো মারকুইস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোজাম্বিক, আফ্রিকা।
২৪শে ডিসেম্বর। বুধবার।
সন্ধ্যা ৭টা।

মেসঘরে ঢুকে সবাই অবাক হল। বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। টি বোন স্টেক, বেক্‌ড্ পটেটো, লাসানিয়া এবং পর্তুগিজ রেড ওয়াইন। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! শেফ এসে বলল—টি বোন স্টেক প্রচুর আছে, কারো দরকার হলে তাকে জানালেই হবে। তবে রেড ওয়াইনের সাপ্লাই কম। নিম্নমানের কিছু হোয়াইট ওয়াইন আছে। প্রয়োজনে দেওয়া যেতে পারে।

মেসঘরে রীতিমতো হৈচৈ পড়ে গেল। সাধারণত সাড়ে সাতটার মধ্যে খাবার পর্ব শেষ হয়। আজ আটটা বেজে গেল। তবু কয়েক জনকে ব্যস্ত দেখা গেল।

শেফ এসে বলল, 'ডিনার শেষ হবার পর হার্ভি ফকনার কিছু বলবেন। সবাইকে থাকতে বলা হয়েছে।'

আগামীকাল ক্রিসমাস। সেই উপলক্ষে ছুটি এবং বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করা হবে হয়তো। শহরে নিয়ে যাওয়া হবে। আফ্রিকান মেয়েদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটানোর একটা সুযোগ হবে। মন্দ কী!

হার্ভি ফকনার মেসঘরে ঢুকল হাসিমুখে। তার স্বভাবসুলভ অন্তরঙ্গ স্বরে বলল, 'খাবার পছন্দ হয়েছে?'

'হয়েছে, হয়েছে।'

'রেড ওয়াইন কেমন ছিল?'

'অপূর্ব! তবে স্যার, পরিমাণ খুবই কম।'

'ভালো জিনিস কমই খেতে হয়। তোমাদের জন্যে একটা জরুরি খবর নিয়ে এসেছি। আমাদের ওড়বার সময় হয়েছে।'

মেসঘরে একটি নিস্তব্ধতা নেমে এল। কেউ শ্বাস ফেললেও শোনা যাবে এমন অবস্থা।

'আমরা রাত বারটায় এখান থেকে রওনা হব। এয়ারপোর্টের দিকে। পৌঁছতে লাগবে এক ঘন্টা। সেখানে আমাদের জন্যে একটা ট্র্যান্সপোর্ট বিমান অপেক্ষা করছে। ভোর সাড়ে তিনটায় আমরা পৌঁছে যাব।'

'কোথায়?'

'কোথায় যাব এটা বলার সময় এসেছে। আমরা যাচ্ছি মোরাভ্ডায়।'

মেসঘরে একটি মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। হার্ভি কথা বলা শুরু করার সঙ্গে–সঙ্গে গুঞ্জন থেমে গেল।

'অনেক বার বলা হয়েছে, তবু আরেক বার বলছি, বিমান থেকে প্যারাশুট দিয়ে জ্যাম্প করবার পর আমাদের হাতে সময় থাকবে এক ঘন্টা পঁচিশ মিনিট। এই সময়ের ভেতর কাজ শেষ করতে না–পারলে মোরাভ্ডা থেকে জীবিত অবস্থায় কেউ বের হয়ে আসতে পারব না।'

মেসঘরে কোনো শব্দ হল না।

'একটি কথা আমি সবাইকে মনে রাখতে বলছি। সেটা হচ্ছে, আমাদের বিপক্ষে যে–সেনাবাহিনী আছে তা যথেষ্টই শক্তিশালী। জেনারেল ডোফা হচ্ছেন মোরাভ্ডার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধান সামরিক প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর জেনারেল। কারো কিছু বলার আছে?'

কেউ কিছু বলল না।

'তা হলে যাত্রার প্রস্তুতি নেওয়া যাক। বন্ধুরা, শুভ যাত্রা। তৈরি হতে শুরু কর।'

রবিনসন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে একটি চিঠি লিখল পিটারকে। চিঠিটি তার পছন্দ হল না, সে আবার একটি লিখল। সেটিও পছন্দ হল না। মানসিক উত্তেজনায় এটা হচ্ছে। যা লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে তা লেখা হচ্ছে না। সে তৃতীয় চিঠিটি লিখতে শুরু করল।

প্রিয় পিটার,

তুমি কেমন আছ? আগামী কাল ক্রিসমাস। নিশ্চয়ই তোমার মা এসে গেছেন এবং তোমার দুষ্টু বোনটিও এসেছে। আমি কল্পনায় দেখছি তোমরা ক্রিসমাস ট্রি সাজাতে শুরু করছ। আহ্, যদি থাকতে পারতাম! খুব ইচ্ছা হচ্ছে ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য করি।

কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছা কখনো পূর্ণ হয় না। এই সত্যটি তুমি যত বড় হবে, ততই বুঝবে। তোমাকে একসময় কথা দিয়েছিলাম কখনো তোমাকে ছেড়ে যাব না। কিন্তু একসময় চলে গেলাম। এবং হয়তো আর ফিরব না। যদি এ-রকম কিছু হয়, দুঃখ করবে না। মানুষের জীবনটাই এ-রকম।

যখন বড় হবে, তখন তোমার মা তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবেন কিংবা তুমি নিজেই সব বুঝতে পারবে। আজ আমাকে যতটা হৃদয়হীন মনে হচ্ছে, সে-দিন হয়তো ততটা মনে হবে না। হয়তো খানিকটা ভালোও বাসবে। এই জিনিসটির অভাব আমি সারা জীবন অনুভব করেছি।

আজকের এই ক্রিসমাস ডে'র চমৎকার রাতে প্রার্থনা করছি যেন ভালবাসার অভাবে তোমাকে কখনো কষ্ট পেতে না হয়। চুমু নাও।

রবিনসন

রবিনসন চিঠি খামে ভরে ঠিকানা লিখল। এই চিঠি নিজের হাতে পোস্ট করে যেতে হবে। সবচেয়ে কাছের পোস্ট বক্স এখান থেকে প্রায় ছ' মাইল। জিপ নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু রবিনসন ঠিক করল হেঁটেই যাবে। হাতে এখনো প্রচুর সময়। বারটা বাজতে দেরি আছে।

ক্যাম্পের গেটে ফকনার দাঁড়িয়ে চুরুট টানছিল। সে ভুরু কুঁচকে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'চিঠি পোস্ট করতে। পিটারকে একটা চিঠি লিখেছি।'

'পোস্ট করার জন্য তোমাকে যেতে হবে কেন? এখানে রেখে দাও। যথাসময়ে পোস্ট হবে।'

'এটা আমি নিজেই পোস্ট করতে চাই। আমার ধারণা পিটারের কাছে এটাই হবে আমার শেষ চিঠি।'

'এ-রকম মনে হবার কারণ কি?'

'মৃত্যুর ব্যাপারটি মানুষ আগেই টের পায়।'

'তুমি শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছ। তুমি ফিরে আসবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবিনসন কোনো কথা বলল না। ফকনার বলল, 'কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। একা যেও না।'

'কেন? তোমার কি ধারণা আমি পালিয়ে যাব?'

ফকনার তার জবাব দিল না। গম্ভীর মুখে দ্বিতীয় সিগারেটটি ধরাল এবং হাত ইশারা করে বলল, 'ঐ ওকে সঙ্গে নিয়ে যাও।'

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। রাস্তা গিয়েছে বনের ভেতর দিয়ে। নির্জন রাস্তা—শীতল হাওয়া বইছে। রবিনসন মৃদু গলায় বলল, 'তোমার কি ঠাণ্ডা লাগছে?'

তাঁর সঙ্গী বলল, 'জ্বি–না স্যার।'

'আমাকে স্যার বলার দরকার নেই। নাম ধরে ডাকবে। তোমার কি নাম?'

'জলিল।'

'হাঁটতে ভালোই লাগছে, কি বল জলিল?'

'জ্বি স্যার।'

রবিনসন হঠাৎ করেই তার নাতি প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। সে কেমন একা–একা কথা বলে। একদিন দেখা গেল সে একটা কসমস ফুল তুলে এদিক–সেদিক তাকিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে। তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলেছে, খুব সুন্দর তো, তাই খেতে ইচ্ছা করে। রবিনসন রাস্তা কাঁপিয়ে হাসতে লাগল। তার সঙ্গীও হাসল।।

'একটিই নাতি আপনার?'

'হ্যাঁ। বড় চমৎকার ছেলে!'

AMARBOI.COM

১৮

২৫শে ডিসেম্বর। রাত ৩টা

প্লেন উড়ে চলছে।

ইঞ্জিনের হুম–হুম গর্জন ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই। কেবিন–লাইট জ্বলছে। কমান্ডোদের দেখা যাচ্ছে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে বসে থাকতে। প্রথম দিকে তারা নিজেদের মধ্যে মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলছিল। এখন আর বলছে না।

সময় যতই ঘনিয়ে আসেছ উত্তেজনা ততই বাড়ছে। সবার চেহারায় তার ছাপ পড়েছে। একমাত্র নির্বিঘ্নে ঘুমুচ্ছে বেন ওয়াটসন। এই একটি লোকের মধ্যেই কোনো রকম বিকার নেই।

কেবিন–লাইটের পাশেই একটি লাল বাতি জ্বলে উঠল, যার মানে, প্লেনের ক্যাপ্টেন কথা বলতে চান। ফকনার হেডফোন কানে পরে নিল।

'হ্যালো, ফকনার বলছি।'

'আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি স্যার।'

'তাই নাকি?'

'কুড়ি মিনিটের মাথায় ড্রপিং জোনে চলে আসব। আপনি সবাইকে তৈরি হতে বলুন।'

'বাইরের আবহাওয়া কেমন?'

'খুব ভালো বলা চলে না। শক্ত বাতাস বইছে।'

ফকনার ভ্রূ কোঁচকাল। ক্যাপ্টেন বলল, 'আমি কেবিনের বাতি কমিয়ে দিচ্ছি, যাতে চোখে অন্ধকার সয়ে যায়।'

'ঠিক আছে।'

প্লেনের গতি কমে আসছে। নিচেও নেমে এসেছে বেশ খানিকটা। দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। বাইরের প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটায় প্লেন এখন কেঁপে-কেঁপে উঠছে। কেবিনের ভেতরটা প্রায় অন্ধকার।

ফকনার গম্ভীর গলায় বলল, 'অস্ত্র, যন্ত্রপাতি, রসদ এবং প্যারাশুট সবাই পরীক্ষা করে নাও। তোমাদের নিজেদের পরীক্ষা শেষ হলে জনাথন পরীক্ষা করে দেখবে।'

বেন ওয়াটসন উঠে বসেছে। সে তাকিয়ে আছে। কেবিনে ঠিক এই মুহূর্তে প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা। ফকনার বলল, 'বাইরে দমকা হাওয়া আছে—কাজেই প্যারাশুট খোলার ব্যাপারে খুব সাবধান। মাটির কাছাকাছি না পৌঁছা পর্যন্ত কেউ ফিতা টানবে না, তার আগে ফিতা টানলে বাতাস ভাসিয়ে অনেক দূর নিয়ে যাবে।......

সবার আগে নামবে বেন ওয়াটসন এবং তার দল। তারা নেমে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে না, দ্রুত চলে যাবে এয়ারপোর্টে।'

সবার প্রথমে ঝাঁপ দিল ওয়াটসন। ঠাণ্ডা বাতাস বাইরে। নিচের মাটি দ্রুত কাছে এগিয়ে আসছে। আকাশভর্তি তারা। বেন ওয়াটসনের এক বার মনে হল, প্যারাশুট খোলার ফিতা না টানলে কেমন হয়? এটি একটি পুরোনো অনুভূতি। প্যারাশুট নিয়ে লাফিয়ে পড়বার পর প্রায় সবারই এটা হয়। অনেকেই শেষ পর্যন্ত ফিতা খুলতে পারে না।

বেন ওয়াটসন মাটিতে নেমেই ঘড়ি দেখল। তিনটা পঞ্চান্ন—পনের মিনিট লেট। তিনটা চল্লিশের ভেতর সবার মাটিতে পা রাখার কথা।

সে তাকাল আকাশের দিকে। একে-একে নামছে সবাই। সে গুনতে চেষ্টা করল—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ.....

১৯

২৫শে ডিসেম্বর। ভোর ৪টা।

চারদিকে অন্ধকার। সূর্য ওঠার এখনো এক ঘন্টা দশ মিনিট দেরি। এয়ারপোর্টে পৌঁছতে লাগবে কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট। বেন ওয়াটসন তার দল নিয়ে ছুটতে শুরু করল। তিরিশ কিলোমিটার—এমন কোনো দূরের পথ নয়। তারা ছোটার গতি আরো বাড়িয়ে দিল। কারো মুখেই ক্লান্তির কোনো ছাপ নেই। কোনো শব্দও উঠছে না।

বেন ওয়াটসনের মনে হল, জনাথন এদের ভালোই ট্রেনিং দিয়েছে। এয়ারপোর্টে পৌঁছে বেন ওয়াটসনের বিস্ময়ের সীমা রইল না। একটি পুরোপুরি পরিত্যক্ত জায়গা। একতলা একটি দালানে মজুরশ্রেণীর পাঁচ-ছ' জন জড়াজড়ি হয়ে ঘুমুচ্ছে। এ-ছাড়া ত্রিসীমানায় কেউ নেই। ঘরের দরজা-জানালা ভাঙা। ভাঙা জানালায় হু-হু করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাওয়া খেলছে।

লোকগুলি ঘুম ভেঙে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। বেন ওয়াটসন জিজ্ঞেস করল, 'কেউ ইংরেজি জান?'

কোনো উত্তর নেই। ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

'কেউ ইংরেজি জান না?'

ওরা নিজেদের মধ্যে বিড়বিড় করল। এদের দেখে মনে হয় না কেউ ইংরেজি জানে।

'কেউ জানে না। ?'

'স্যার, আমি জানি।'

'তুমি কে?'

'আমি স্যার একজন কন্ট্রাক্টর। এই এয়ারপোর্ট ঠিক করার কন্ট্রাক্ট নিয়েছি।'

'ভালো করেছ। এখানে কোনো পাহারা থাকে না?'

'জ্বি–না স্যার, পাহারা থাকবে কেন?'

'তাও তো কথা। রানওয়ে ঠিক আছে?'

'আছে স্যার। মোটামুটি আছে। আপনারা কারা?'

'আমরা কারা তা দিয়ে তোমাদের দরকার নেই। তোমরা গরম পানির ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'পারব স্যার।'

'পানির ব্যবস্থা কর। আর শোন, তোমাদের কেউ এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবে না। যদি আমরা বুঝতে পারি তোমাদের কোনো মতলব আছে, তা হলে সঙ্গে–সঙ্গে গুলি করা হবে। আমরা মানুষ ভালো নই।'

'কতটুকু গরম পানি করব স্যার?'

'আমার কাছে কফি বিন্‌স্ আছে। সবাই মিলে কফি খাব, কাজেই বুঝতে পারছ কতটুকু পানি লাগবে।'

'জ্বি স্যার।'

'পানি গরম হবার পরপর তুমি তোমার লোকজন নিয়ে রানওয়ে পরীক্ষা করতে যাবে। একটা ডেকোটা প্লেন নামবে। ঠিকমতো নামতে পারে যাতে, সে–ব্যবস্থা করবে। তোমাদের কাছে কিছু মালমশলা নিশ্চয়ই আছে।'

'আছে স্যার।'

'গুড, ভেরি গুড।'

বেন ওয়াটসন কফির পেয়ালা হাতে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। তার মুখ ভাবলেশহীন। এয়ারপোর্ট দখল করতে তাকে একটি গুলিও খরচ করতে হয় নি, এটা তাকে মোটেও প্রভাবিত করে নি। তাকে দেখে মনে হয়, এ–রকম হবে তা সে জানত।

শীতের ভোরবেলায় গরম কফি চমৎকার লাগছে। বেন ঘড়ি দেখল। ফোর্টনকে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০

২৫শে ডিসেম্বর। ভোর ৫–১০।

মাওয়া জেগে উঠল প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে। শব্দ কমে আসতেই সে শুনল একসঙ্গে অনেকগুলি সাব–মেশিনগান থেকে কানে তালা ধরানোর মতো আওয়াজ আসছে। সে–শব্দও থেমে গেল। আলাদা–আলাদাভাবে গুলির শব্দ হতে থাকল। কী হচ্ছে এ–সব? আবার একটি বিস্ফোরণ। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। মনে হল ফোর্টনকের সবটাই উড়ে গেছে। দরজা–জানালা সব ভেঙে গেছে নাকি? মাওয়া হতভম্ব হয়ে উঠে বসল বিছানায়, ঠিক তখনি বন্ধ দরজা কে যেন লাথি মেরে ভাঙল।

'তুমি মাওয়া?'

মূর্তির মতো মাথা নাড়ল মাওয়া।

'আমরা নিশোকে নিতে এসেছি। তুমি চাবি নিয়ে আমার সঙ্গে এস।'

'কিসের চাবি?'

'কোনো বাজে কথা বলবে না। একটি বাজে কথা বলবে গুলি করে এখানেই শেষ করে দেব।'

সাব–মেশিনগান থেকে আবার শব্দ আসছে। একটিমাত্র সাব–মেশিনগান। অনবরত ক্যাটক্যাট শব্দ। ভয়াবহ কিছু–একটা হয়ে গেছে।

মাওয়া অনুগত ছেলের মতো চাবির গোছা হাতে নিচে নেমে এল। সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল আরেক জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে। সেই লোকটি ভারি গলায় বলল, 'এই কি মাওয়া?'

'জ্বি স্যার।'

'ভালো। মাওয়া, আমি ফকনার। তোমাদের সৈন্যবাহিনীর এমন খারাপ অবস্থা, আমার ধারণা ছিল না। একদল গার্লস–গাইডও তো এর চেয়ে ভালো ডিফেন্স দিত। এইসব অপদার্থদের তো লাথি দিয়ে নদীতে ফেলে দেওয়া উচিত।'

সূর্য এখনো ওঠে নি। তবু আবছাভাবে সবকিছু দেখা যাচ্ছে। মাওয়া ভালো–মতো চারদিকে তাকানোরও সাহস পাচ্ছে না। কোথাও কোনো শব্দ হচ্ছে না। শুধু ফ্যামিলি কোয়ার্টারগুলি থেকে মেয়েদের চেঁচিয়ে কান্নার আওয়াজ আসছে। সৈন্যবাহিনীর ব্যারাক মোটামুটিভাবে একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মাওয়া সেলের তালা খুলল। সেলে ঢুকল হার্ভি ফকনার।

'সুপ্রভাত জুলিয়াস নিশো।'

নিশো কিছু বললেন না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'আপনি কেমন আছেন?'

'আমি ভালোই আছি। কিন্তু হচ্ছে কি?'

'তেমন কিছু না। আমরা আপনাকে নিতে এসেছি।'

'তোমরা কারা?'

'আমরা হচ্ছি বুনো হাঁস। আমার মনে হয় না আপনি হাঁটতে পারবেন।'

ফকনার ইশারা করতেই এক জন এসে তাঁকে পিঠে তুলে নিল। নিশো মৃদুস্বরে বললেন, 'অনেক কিছুর পিঠেই চড়েছি, মানুষের পিঠে কখনো চড়ি নি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকনার বলল, 'আপনাকে অল্প কিছু সময় কষ্ট করতে হবে মিঃ নিশো। ভোর ছ'টা পঁচিশে আমাদের উদ্ধারকারী প্লেন আসবে। এখানে এমন কিছু কি আছে, যা আপনি সঙ্গে নিতে চান?'

'না। কয়েকটি প্রেমের কবিতা লিখেছিলাম, সেগুলি আমি মাওয়াকে দিয়ে যেতে চাই।'

'মাওয়াকে দেওয়া অর্থহীন, ওকে আমি এক্ষুনি মেরে ফেলব।'

'অসম্ভব। আমার চোখের সামনে কাউকে হত্যা করতে পারবে না।'

'চোখের আড়ালেই করা হবে।'

'না না। দয়া কর।'

ফকনার হেসে ফেলল।

নিশো চোখ বন্ধ করে উচ্চৈস্বরে বললেন, 'ঈশ্বর, দয়া কর।' বলেই খেয়াল হল—তিনি একজন নাস্তিক। তবু তিনি আবারও ঈশ্বরের নাম নিলেন।

২১

২৫শে ডিসেম্বর। ভোর ৬-২০।

এয়ারপোর্টে সবাই অপেক্ষা করছে। ফকনারের হাতে সিগারেট। তার মুখ হাসি-হাসি। পঞ্চাশ জন কমান্ডোর সবাই আছে। একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। বিশ্বাস হয়েও হতে চায় না। কিন্তু এটা স্বপ্ন নয়—সত্যি। ঐ তো জুলিয়াস নিশো চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে আছেন।

ইঞ্জিনের আওয়াজ আসছে। প্লেন এসে পড়ল বোধহয়। রানওয়ে ভালো নয়, তবু প্লেনের নামতে বা উঠতে অসুবিধা হবে না। ডাকোটা প্লেনগুলি ধানখেতেও নেমে পড়তে পারে। ফকনার চেঁচিয়ে উঠল, 'স্কোয়াড, অ্যাটেনশন। গেট রেডি।'

কমান্ডোদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জাগল। হ্যাঁ, প্লেন দেখা যাচ্ছে। ডাকোটা প্লেন। ফকনারের নির্দেশে ওয়্যারলেসে প্লেনের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে।

'হ্যালো ডাকোটা। বুনো হাঁস কলিং। হ্যালো ডাকোটা, বুনো হাঁস কলিং-ওভার। হ্যালো ডাকোটা।'

প্লেনের পাইলটকে শেষ পর্যন্ত ধরা গেল। ফকনার কথা বলবার জন্যে এগিয়ে এল।

'গুড মর্নিং ডাকোটা অ্যান্ড হ্যাপি ক্রিসমাস।'

'হ্যাপি ক্রিসমাস। কর্নেল ফকনার?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার জন্যে একটি বড় রকমের দুঃসংবাদ আছে।'

'বলে ফেল।'

'আমি তোমাদের নেবার জন্যে নামছি না। কিছুক্ষণ আগেই আমাকে জানানো হয়েছে যে, নিশোকে উদ্ধারের যে-মিশন পাঠানো হয়েছে, তা বাতিল করা হয়েছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেন?'

'জেনারেল ডোফার সঙ্গে আমেরিকান সরকারের চুক্তি হয়েছে, তারা এখন ডোফাকেই রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে চায়।'

'ভালো কথা। আমাদের কি হবে?'

পাইলট সে-কথার কোনো জবাব দিল না। বিমানটি এয়ারপোর্টের ওপর দু'বার চক্কর দিয়ে দক্ষিণ দিকে উড়ে গেল।

সবাই তাকাচ্ছে, কিছু-একটা শুনতে চায় ফকনারের কাছ থেকে। কি বলা যায়? ফকনার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বন্ধুরা, চমৎকার একটি সকাল!'

রবিনসন ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'ব্যাপারটা কি?'

ফকনার জবাব দিল না। এক দলা থুথু ফেলল। পকেট থেকে সিগারেট বের করল। প্যাকেট বাড়িয়ে দিল রবিনসনের দিকে। রবিনসন বিরক্ত মুখে বলল, 'আমি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি।'

'ক্যানসারের ভয়ে?'

রবিনসন ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'কেন আজেবাজে কথা বলছ? যা জানতে চাচ্ছি তা বল।'

'কি জানতে চাচ্ছ?' ফকনার সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা তুমি যতটুকু জান, আমিও ঠিক ততটুকুই জানি। ওয়্যারলেসে কথাবার্তা যা হয়েছে, তুমি শুনেছ। তার পরেও আমাকে জিজ্ঞেস করবার অর্থ কি? এ-সব হচ্ছে মেয়েলি স্বভাব।'

'মেয়েলি স্বভাব হোক বা না-হোক, আমি পরিষ্কারভাবে জানতে চাই—তুমি কি ভাবছ?'

'এই মুহূর্তে আমি কি ভাবছি, জানতে চাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'এই মুহূর্তে আমি ভাবছি, এক কাপ গরম কফি পেলে মন্দ হয় না।'

'রসিকতা করছ?'

'না, রসিকতা করব কেন? সত্যি-সত্যি কফির পিপাসা বোধ হচ্ছে। সবার জন্য গরম কফির ব্যবস্থা কর। সেই সঙ্গে খাবারদাবার। শীতকালের নেকড়ের মতো ক্ষুধার্ত বোধ করছি।'

'এর বেশি তোমার কিছু বলার নেই?'

'আপাতত না।'

'কফি কি আমরা এই এয়ারপোর্টেই খাব?'

'মন্দ কি?'

'এ-রকম একটা খোলামেলা জায়গায়?'

'অসুবিধা কি?'

'দেখ ফকনার, তোমার বুদ্ধির ওপর আমি চিরকাল আস্থা রেখেছি। তবুও বলছি, তোমার কি মনে হয় না জেনারেল ডোফা বিমান থেকে একটা আক্রমণ চালাতে পারে?'

'মনে হয় না। ডোফার কথাবার্তা বোকার মতো, কিন্তু সে তোমার মতোই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধিমান। কাঁচা কাজ করবে না। আলাপ-আলোচনায় বসবে।'

'কিসের আলোচনা?'

'ডোফা আমাদের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে চাইবে বলে আমার ধারণা। সে আমাদের অক্ষত অবস্থায় এ-দেশ থেকে চলে যেতে দেবে, তার বদলে নিশোকে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে। হরতনের টেক্কা আমাদের হাতে।'

'তাসের কিছু-কিছু খেলায় হরতনের টেক্কা মূল্যহীন।'

'নিশো মূল্যহীন নয়। সেটা তুমি জান, আমি জানি, জেনারেল ডোফাও জানে। নিশো যতক্ষণ আমাদের হাতে আছে ততক্ষণ ভয় নেই। ব্যাটা বেঁচে আছে তো?'

'হুঁ।'

'বাঁচিয়ে রাখ। নিশো হচ্ছে আমাদের বেঁচে থাকার পাসপোর্ট। ওকে ঠিকমতো রাখ।'

দ্রুত কফির ব্যবস্থা হল। ফকনার কফির মগ হাতে শান্ত গলায় ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিল।

'বন্ধুগণ, বুঝতেই পারছ, ক্ষুদ্র একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। যারা আমাদের এই কাজে লাগিয়েছে, তাদের কাছে আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমরা ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি। পশুদের জন্য ফাঁদ একটা ভয়াবহ ব্যাপার। এক বার ফাঁদে আটকা পড়লে তারা বেরুতে পারে না।......

'সৌভাগ্যক্রমে আমরা পশু নই, মানুষ, এবং বুদ্ধিমান মানুষ। ফাঁদ কেটে বেরিয়ে আসব। আপাতত আমরা যা করব, তা হচ্ছে কভার নেব। যাতে অনুসন্ধানী বিমান আমাদের দেখতে না পায়। কারো কি এই প্রসঙ্গে বলার আছে?'

এক জন হাত তুলল। ফকনার বলল, 'কী বলার আছে?'

'আমাদের মধ্যে যাদের যাদের বাথরুম পেয়েছে, তারা কি বাথরুমের কাজটা এয়ারপোর্টে সারতে পারি? এদের এখানে ভালো বাথরুম আছে।'

সবাই হা-হা করে হেসে উঠল। হাসি আর থামতেই চায় না। ফকনার আরেকটি সিগারেট বের করতে-করতে মনে-মনে বলল, দলটা ভালো। এদের বিশ্বাস করা যায়। এদের উপর ভরসা করা যায়।

'বাথরুম সারবার জন্যে দশ মিনিট সময় দেওয়া হল। ডিসমিস।'

২২

কভার নেবার জন্য আফ্রিকার মতো দেশ হয় না। ঘন বনের দেশ। পুরো এক ডিভিশন সৈন্য ছোট্ট বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে পারে। বিমান থেকে তাদের খোঁজা অসম্ভব। জায়গায়-জায়গায় খানাখন্দ—গিরিখাত। আদর্শ কভার।

ফকনারের দল এয়ারপোর্টের উত্তরের বনে ঢুকে পড়ল। দলের কাউকেই তেমন চিন্তিত মনে হল না। অনেকেই পছন্দসই জায়গা বেছে ঘুমুবার আয়োজন করছে। দু'জনের একটা দল তাস নিয়ে বসেছে। আলো ভালো মতো ফোটে নি। তাস দেখা যাচ্ছে না। তাতে খেলায় অসুবিধা হচ্ছে না। হাই স্টেকের খেলা। দেশলাইয়ের কাঠি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে টাকার হিসাব রাখা হচ্ছে। সকলের ইন্দ্রিয় তাসে কেন্দ্রীভূত।

এ-রকম পরিস্থিতিতে যে-জাতীয় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সাধারণত থাকে, তার কিছুই নেই। সবই কেমন যেন আলগা ধরনের। সবার মধ্যে কেমন ঢিলাঢালা ভাব। যেন আফ্রিকার বনে তারা সাপ্তাহিক বনভোজনে এসেছে। কারোর চেহারায় উদ্বেগের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। শুধু বেন ওয়াটসনকে খানিকটা ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

সে বিশাল এক পিপুল গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসেছে। নিশো আছে তার পাশে। নিশোর হতভম্ব ভাব এখনো কাটে নি। এখন পর্যন্ত তিনি একটি কথাও বলেন নি। কফি দেওয়া হয়েছিল। খান নি, ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর শরীর খুবই খারাপ লাগছে। কিছুক্ষণ আগে বমি করেছেন। যেভাবে চোখ বন্ধ করে পড়ে আছেন, তাতে মনে হচ্ছে মৃত্যু আসন্ন। এখনি হয়তো হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে, কয়েক বার হেঁচকি তুলে সবরকম সমস্যার সমাধান করে দেবেন। এ নিয়েও বেন ওয়াটসনের মাথাব্যথা নেই। সে একটা লম্বা ঘাস দাঁত দিয়ে কাটছে এবং কিছুক্ষণ পরপর কাটা ঘাসের টুকরো থু করে দূরে-দূরে ফেলছে। তার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, তার মূল প্রচেষ্টা ঘাসের টুকরোটা কত দূরে ফেলা যায়।

নিশো একটা কাতর শব্দ করলেন।

বেন বিরক্ত মুখে বলল, 'কোঁ-কোঁ করবে না। কোঁ-কোঁ শব্দটা আমার খুবই অপছন্দ।'

নিশো বললেন, 'আনন্দের কোনো শব্দ করতে পারলে খুশি হতাম। তা পারছি না।'

'যখন পারছ না, তখন চুপ করে থাক।'

নিশো হেসে ফেললেন।

বেন কড়া গলায় বলল, 'হাসছ কেন?'

'মানুষের হাসি শুনে কেউ বিরক্ত হয় না, তুমি হচ্ছ কেন?'

বেন উঠে চলে গেল। নিশো কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইলেন। অসম্ভব সাহসী একদল মানুষের সঙ্গে তিনি আছেন। সাহস একটি দুর্লভ জিনিস। সেই দুর্লভ জিনিস এদের আছে। কিন্তু সাহসের সঙ্গে আদর্শের চমৎকার মিলটি এদের হয় নি। যে-কারণে তাদের এই সাহস অর্থহীন। থাকাও যা, না থাকাও তা।

তিনি জানেন, এরা ভাড়াটে সৈন্য। টাকা যার এরা তার। টাকার বিনিময়ে তাকে উদ্ধার করেছে। টাকার বিনিময়ে বিনা দ্বিধায় ডোফার হাতে তুলে দেবে। অবশ্যি তার জন্যে তিনি যে খুব দুঃখিত তা নয়। যার যা চরিত্র, সে তাই করবে। জীবনের শেষ সময়টা তিনি বিনা ঝামেলায় কাটাতে চেয়েছিলেন, তা সম্ভব হচ্ছে না। কষ্ট এই কারণেই। তিনি চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলেন, ডোফার সঙ্গে যদি দেখা হয়, তা হলে তিনি কী বলবেন। বলার মতো তেমন কোনো কথা কি সে-সময় খুঁজে পাওয়া যাবে? তার একটি প্রিয় লাইন হচ্ছে—"মাঝে-মাঝে জীবিত মানুষের চেয়ে মৃত মানুষের ক্ষমতা অনেক বেশি হয়।" এই লাইনটি বলা যায়। তবে না-বলাই ভালো। এই কথাগুলিতে একধরনের অহঙ্কার প্রকাশ পায়। জীবনের শেষভাগে এসে তিনি অহঙ্কারী সাজতে চান না। কারণ তিনি অহঙ্কারী নন। এটাও বোধহয় ঠিক হল না। তিনি অহঙ্কারী। মানুষ হিসেবে তিনি শ্রেষ্ঠ, এই অহঙ্কার তাঁর আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকটা মাছি তাঁকে বিরক্ত করছে। এটাও বেশ মজার ব্যাপার। মাছিগুলি অন্য কাউকে বিরক্ত করছে না। বারবার উড়ে এসে তাঁর মুখে বসছে। কীটপতঙ্গরা মানুষের মৃত্যুর খবর আগে টের পায়। এরাও হয়তো পেয়ে গেছে। নয়তো বেছে-বেছে তাঁর মুখের ওপরই ভন্‌ভন্‌ করবে কেন?

নিশো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। পানির পিপাসা হচ্ছে। আশেপাশে কেউ নেই, যাকে পানির কথা বলা যায়। চেঁচিয়ে কাউকে ডাকার মতো জোর তাঁর ফুসফুসে নেই। তিনি মড়ার মতো পড়ে রইলেন। তাঁর মুখের ওপর মাছি ভন্‌ভন্‌ করছে। কী কুৎসিত দৃশ্য। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে কুৎসিত দৃশ্যের পাশাপাশি একটি চমৎকার দৃশ্যও তাঁর চোখে পড়ল—পিপুল গাছের মোটা শিকড়ে একটি পাহাড়ী পাখি। ঝকঝকে সোনালি পাখা। চন্দনের দানার মতো লাল টকটকে ঠোঁট। কী নাম এই পাখির, কে জানে। পাখিটা তাঁকে কৌতূহলী চোখে দেখছে। আহ্‌, বেঁচে থাকার মধ্যে কত রকম আনন্দ। কত অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত।

'সম্রাট নিশো।'

তিনি পাখির ওপর থেকে দৃষ্টি না-ফিরিয়েই বললেন, 'আমি শুনছি।'

'আপনি কেমন বোধ করছেন?'

'এই মুহূর্তে, চমৎকার বোধ করছি।'

'শুনলাম কিছুই খান নি।'

'ইচ্ছা করছে না।'

'দয়া করে আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলুন।'

নিশো তাকালেন।

'আমার নাম ফকনার।'

'তুমি এই দলের প্রধান?'

'হ্যাঁ। আমি জানতে এসেছি আপনার কিছু লাগবে কি না।'

'কাগজ এবং কলম দিতে পার? পাখিটা দেখার পর চমৎকার একটা ভাব এসেছে। চেষ্টা করব ভাবটা ধরে রাখতে পারি কি না।'

'কবিতা লিখবেন?'

'আবেগ ধরে রাখবার জন্যে কবিতা হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম।'

'আপনার কি মনে হচ্ছে না, কাব্যচর্চার জন্যে সময়টা উপযোগী নয়?'

'না, তা মনে হচ্ছে না।'

'কাগজ-কলমের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না বলে দুঃখিত। আমি অন্য একটি ব্যাপার জানতে এসেছি।'

'কি ব্যাপার?'

'এ-দেশের লোকজন কি আপনাকে ভালবাসে?'

'মনে হয় বাসে।'

'কি করে বললেন?'

'আমি ওদের ভালবাসি। ভালবাসা এমন একটি ব্যাপার যে, যাকে ভালবাসা হয় তাকে তা ফেরত দিতে হয়। এখানে বাকি রাখা চলে না। তুমি যখনি কাউকে ভালবাসবে তখনি তা ফেরত দিতে হবে। এবং মজার ব্যাপার কি, জান? অনেক বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিমাণে ফেরত আসে। তা-ই নিয়ম।'

'কার নিয়ম?'

'প্রকৃতির নিয়ম।'

নিশো দেখলেন, ফকনার চলে যাচ্ছে। তিনি তাকালেন পাখিটির দিকে। আশ্চর্য, পাখিটা এখনো আছে, উড়ে যায় নি। তিনি মৃদুস্বরে বললেন, 'এই আয়, কাছে আয়।' পাখিটা তখন উড়ে গেল। এই ব্যাপারটাও তাঁর বেশ মজা লাগল। যতক্ষণ পাখিটাকে কাছে আসতে বলেন নি, ততক্ষণ সে কাছেই ছিল। যেই কাছে ডেকেছেন অমনি উড়ে গেছে।

'সম্রাট নিশো।'

'কে?'

'আমার নাম জনাথন—মিঃ ফকনার আপনার জন্যে কাগজ এবং কলম পাঠিয়েছেন।'

'ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

২৩

ফকনার দাঁড়িয়ে আছে ওয়্যারলেস সেটের পাশে। ওয়্যারলেস অপারেটর হচ্ছে বেঁটে এল্। যার আসল নাম অ্যালবার্ট জিরান। সে মোটেই বেঁটে নয়—প্রায় ছ' ফুটের মতো লম্বা। তার বেঁটে খেতাবের উৎস রহস্যমণ্ডিত।

বেঁটে এল্ ওয়্যারলেস সেটের নব ঘোরাচ্ছে। কম্যুনিকেশন ফ্রিকোয়েন্সির নব ঘোরাচ্ছে, যদি কিছু ধরা পড়ে। কিছুই ধরা পড়ছে না। জেনারেল ডোফা এদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন এখনো বোধ করেন নি। তবে শিগ্‌গিরই হয়তো করবেন। জেনারেল ডোফা চেষ্টা করবেন তাদের ঘিরে ফেলতে। তাঁকে অতি দ্রুত সৈন্য সমাবেশ করতে হবে। প্যারাট্রুপার নামাতে হবে হয়তো। ফোর্টনক এবং এই পরিত্যক্ত এয়ারপোর্ট ছাড়া প্যারাট্রুপার নামাবার জায়গা নেই। গাছপালায় চারদিক ঢাকা।

ওয়্যারলেস সেট বিপ-বিপ করছে। ফকনার বলল, 'বেঁটে এল্, কিছু আসছে?'

'মনে হচ্ছে। সিগন্যাল ক্লিয়ার না। প্রচুর ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ।'

'চেষ্টা করে যাও। এফ এম এ দেখবে—কিছু পাওয়া যায় কি না?'

এল্ ইশারায় চুপ করতে বলল। সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে। পরিষ্কার সিগন্যাল।

'হ্যালো হ্যালো.......ব্রিগেডিয়ার ক্রিন্তা। হ্যালো।'

'অ্যালবোর্ট জিরান।'

'মিশন ফোর্টনক? হ্যালো, ফোর্টনক?'

ফকনার এগিয়ে এল। ক্লান্ত গলায় বলল, 'ফকনার কথা বলছি—ব্রিগেডিয়ার ক্রিন্তা, সুপ্রভাত।'

'সুপ্রভাত কি না বোঝা যাচ্ছে না।'

'তোমাদের জন্যে তো সুপ্রভাত বটেই।'

ক্রিন্তা বলল, 'তা ঠিক। নিশো কোথায়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমাদের সঙ্গেই আছে।'

'আমরা তাকে ফেরত চাই।'

'ভালো কথা, ফেরত দেওয়া হবে। তার পরিবর্তে আমরা কি পাব?'

'কি চাও?'

'একটা বিমান, যা আমাদের নিয়ে যাবে। আমরা কোনো রকম ঝামেলা চাই না।'

'কেন চাও না তা বোঝার মতো বুদ্ধি আমাদের আছে।'

'তোমরা বিমান পাঠাবে এখানকার এয়ারপোর্টে। আমরা প্রথমে পরীক্ষা করে দেখব সব ঠিক আছে কি না। তোমাদের দিক থেকে দু'জনকে আমরা হোস্টেজ হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যাব। দু'জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, যেমন ধর মিনিস্টার অব ডিফেন্স।'

'হোস্টেজ নিয়ে যাবার ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না।'

'হোস্টেজ এই জন্যেই নিতে চাই, যাতে বিমান আকাশে ওঠার পর তোমরা কোনো ঝামেলা না-কর। এয়ার টু এয়ার-মিসাইল তোমাদের আছে বলে শুনেছি।'

'ঠিকই শুনেছ। তবে কথা কী জান, আমাদের সঙ্গে দরদাম করার মতো অবস্থায় তোমরা নেই বলেই মনে হয়।'

'মিনিস্টার অব ডিফেন্সকে হোস্টেজ হিসেবে দিতে না-চাও, তোমাকে পেলেও চলবে। ব্রিগেডিয়ার মন্দ কি? নিশোকে তোমাদের প্রয়োজন, এইটুকু বুঝতে পারি।'

'আমাদের যতটা প্রয়োজন বলে তুমি ভাবছ, তত প্রয়োজন কিন্তু না। যাই হোক, এই ফ্রিকোয়েন্সিতেই পরে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'কত পরে?'

'মনে হচ্ছে খুব ব্যস্ত?'

'হ্যাঁ, কিছুটা।'

'নিশো কেমন আছে?'

'এখনো টিকে আছে, বেশিক্ষণ থাকবে বলে মনে হচ্ছে না। তবে এই মুহূর্তে তাকে দেখে মোটামুটি সুখী বলেই মনে হচ্ছে—কবিতা লিখছে সম্ভবত।'

ওপাশের কথা বন্ধ হয়ে গেল। ফকনার বেঁটে এলের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, 'আমি আরেক মগ কফি খাব, ব্যবস্থা কর। জনাথনকে আসতে বল।'

জনাথন সঙ্গে-সঙ্গে উঠে এল। ফকনার জনাথনকে আড়ালে নিয়ে গেল। আড়ালের প্রয়োজনীয়তাটা জনাথন ঠিক বুঝতে পারছে না। ফকনার ফিসফাস করবার মতো লোক নয়।

'ব্যাপার কি ফকনার?'

'ব্যাপার খুবই খারাপ। ওদের ভাবভঙ্গি অন্য রকম।'

'তোমার ধারণা, আমাদের আটকে ফেলতে চাইছে?'

'তাই।'

'কি করতে বল?'

'ফোর্টনকে অফিসারশ্রেণীর কেউ-কেউ নিশ্চয়ই জীবিত আছে?'

'থাকার তো কথা। কারাপ্রধান মাওয়া জীবিত আছে বলে আমার ধারণা।'

'জীবিত থাকলে অবশ্যি তাকে আনতে হবে। কত জন তোমার লাগবে?'

'দশ জন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পনের জন নিয়ে যাও। পছন্দমতো পনের জন। এবারকার অপারেশন আগের বারের মতো হবে না। যত দূর সম্ভব ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। ওদের যোগাযোগের কেন্দ্র পুরোপুরি নষ্ট করে দিতে হবে।'

'তোমার পরিকল্পনাটা কি?'

'মজার পরিকল্পনা। জেনারেল ডোফাকে বড় ধরনের ধোঁকা দিতে চাই।'

'আমরা কি এখনি রওনা হয়ে পড়ব?'

'হ্যাঁ, রওনা হয়ে যাও। কতক্ষণ লাগবে বলে তোমার ধারণা?'

'ঘন্টা দুই।'

'তোমাকে এক ঘন্টা সময় দেওয়া হল। এক ঘন্টার ভেতর মাওয়াসহ কমপক্ষে তিন জনকে এখানে চাই। দরকার হলে আরো পাঁচ জন নিয়ে যাও।'

'তোমার পরিকল্পনাটা কী বল তো শুনি।'

'এতটা সময় নষ্ট করা কি উচিত হবে? মাত্র এক ঘন্টা সময় তোমাকে দেওয়া হয়েছে। এর দু'মিনিট তুমি নষ্ট করে ফেলেছ।'

২৪

এক ঘন্টা একুশ মিনিটের মাথায় কারারক্ষী মাওয়া, এক জন আর্টিলারির ক্যাপ্টেন, দু'জন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট এবং এক জন হাবিলদার মেজরকে নিয়ে জনাথন উপস্থিত হল। মাওয়া জীবিত হলেও গুরুতর আহত। গুলি লেগে তার বাঁ হাতের তিনটি আঙুল উড়ে গেছে। ডান পায়ের উরুতেও গুলি লেগেছে। তাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে। বাকি অফিসাররা সুস্থ, তবে তারা বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে। চোখে-মুখে দিশাহারার ভাব। অপ্রকৃতস্থ দৃষ্টি। চোখ রক্তবর্ণ।

ফকনার বলল, 'মাওয়া, কেমন আছ তুমি?'

মাওয়া জবাব দিল না। ফকনার বলল, 'তোমাদের ওপর দিয়ে সামান্য একটু ঝামেলা গিয়েছে বুঝতে পারছি। আমি দুঃখিত। তোমাদের জন্যে কফি হচ্ছে। কফি খাও, ভালো লাগবে। তোমাদের কারোর যদি ধূমপানের অভ্যাস থাকে, তা হলে চুরুট নিতে পার। ভালো চুরুট আছে।'

কেউ কোনো উত্তর দিল না। আর্টিলারি ক্যাপ্টেন একদলা থুথু ফেলল।

'তোমাদের এখানে আনার উদ্দেশ্যটা ব্যাখ্যা করা দরকার। আমি জেনারেল ডোফাকে বড় রকমের একটা ধোঁকা দিতে চাই। তোমাদের সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব হচ্ছে না। তোমরা যা করবে তা হচ্ছে, জেনারেল ডোফার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আমি যা শিখিয়ে দিই, ওয়্যারলেসে তাই তাকে বলবে। খুব বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলবে। আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রথম শ্রেণীর অভিনয় চাই।'

বলতে-বলতে ফকনার হাসল। প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট বের করল।

'তোমরা যা বলবে তা হচ্ছে.....

ফকনারের কথা শেষ হবার আগেই আর্টিলারি ক্যাপ্টেন কঠিন গলায় বলল, 'তুমি যা বলবে আমরা তাই করব, এ-রকম মনে করার কোনো কারণ আছে কি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকনার বিস্মিত ভঙ্গি করল, যেন খুবই অবাক হয়েছে।

'আমি যা বলব তুমি তা করবে না?'

'আমরা কেউ করব না।'

'বহুবচনে কথা বলছ কেন? তুমি তোমার নিজের কথা বল। যা করতে বলব তা করবে না?'

'না।'

'খুবই ভালো কথা। সাধাসাধি আমার পছন্দ না। ভয় দেখিয়ে রাজি করানোতেও আমার বিশ্বাস নেই। আমি সহজ-সরল লোক। যেহেতু তুমি আমার কোনো কাজে আসছ না, কাজেই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো যুক্তি দেখছি না'

ফকনার ঠোঁটের সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দু'পা এগিয়ে খাপ থেকে পিস্তল টেনে বের করল। তার মুখের রেখা একটুও বদলাল না। ঠোঁটের ফাঁকে যে-হাসি লেগে ছিল, সেই হাসি লেগে রইল। পরপর দু'বার গুলির শব্দ হল। শব্দ মেলাবার সঙ্গে-সঙ্গেই তার শান্ত গলা শোনা গেল, 'বেঁটে এল, ডেডবডি সরিয়ে নিয়ে যাও। আর এদের কফি দেওয়ার ব্যবস্থা কর। তোমরা যারা এখনো বেঁচে আছ, তাদের বলছি—কোনো রকম জোর-জবরদস্তি নেই। আমার কথা যারা শুনতে চাও না, তাদের শুনতে হবে না। তবে যারা শুনবে তারা ভালোমতো শুনবে এইটুকু আশা করি।'

মাওয়া ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল, 'জেনারেল ডোফাকে কি বলতে হবে?'

'বলছি। তার আগে কফিপর্ব শেষ হয়ে যাক।'

নিশো একদৃষ্টে এদের দিকে তাকিয়ে আছেন। এত দূর থেকে কথাবার্তা তিনি কিছুই শুনতে পান নি। হত্যার দৃশ্যটি শুধু দেখেছেন। এত সহজে, এত শান্ত ভঙ্গিতে মানুষ খুন করা যায়, তা তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। তিনি শব্দ করে বমি করলেন। তাঁর নাড়িভুঁড়ি যেন উঠে আসতে চাইছে। মনে-মনে বললেন, 'হে ঈশ্বর, এ কী দেখলাম!' তাঁর মনেই রইল না যে তিনি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না। স্বর্গ-নরক বিশ্বাস করেন না।

২৫

জেনারেল ডোফা বিস্মিত গলায় বললেন, 'মাওয়া, তুমি যা বলছ তা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'ফকনার মারা পড়েছে?'

'হ্যাঁ, পড়েছে।'

'আর নিশো? নিশোর কী অবস্থা?'

'মারা গেছে স্যার।'

'তোমার গলা এমন শুকনো শোনাচ্ছে কেন?'

'আমি আহত। হাঁটুতে গুলি লেগেছে। হাতের আঙুল উড়ে গেছে।'

'শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। তবে দেশের জন্যে সবাইকে কিছু-না-কিছু ত্যাগ করতে হয়। তুমি কয়েকটা আঙুল ত্যাগ করলে।'

'জ্বি স্যার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমাদের দিকের হতাহতের সংখ্যা কেমন?'

'অনেক।'

'তাতে কোনো অসুবিধা নেই। নিহতদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হবে। বিরাট ক্ষতিপূরণ। তাদের সবাইকে জাতীয় বীর ঘোষণা করা হবে।'

'ইনফ্যানট্রি লেফটেন্যান্ট নুখৃতা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। সে বীরের মতো যুদ্ধ করেছে।'

'শুনে সুখী হলাম। শোন, নিশোর মৃতদেহ কি লুকানো হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'ভালো, খুব ভালো। অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। দেশের সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব তোমার জন্যে ব্যবস্থা হবে।'

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আপনার পক্ষে কি এখানে আসা সম্ভব হবে? সৈন্যরা আপনাকে দেখতে পেলে অত্যন্ত আনন্দিত হবে। তারা বীরের মতো যুদ্ধ করেছে।'

'আমি আসব। সৈন্যরা আমার সন্তানের মতো। আমি অবশ্যই আসব। সামরিক হেলিকপ্টারে করে আসব।'

'কখন রওনা হবেন স্যার?'

'ধর দশ মিনিট। দশ মিনিটের মাথায় রওনা হচ্ছি।'

জেনারেল ডোফা রিসিভার নামিয়ে পাশে দাঁড়ানো মিলিটারি এ্যাটাচির চোখে চোখ রেখে হাসলেন। মুহূর্তের মধ্যেই হাসি সামলে নিয়ে মৃদু গলায় বললেন, 'মাওয়া মিথ্যা কথা বলছে। সাজানো কথা বলছে।'

মিলিটারি এ্যাটাচি অবাক হয়ে বলল, 'আমার কাছে কিন্তু স্যার সাজানো কথা বলে মনে হয় নি।'

'তোমার বুদ্ধি একটি গরিলার বুদ্ধির চেয়ে খুব বেশি নয় বলেই কিছু বুঝতে পারছ না। ও ধরা পড়েছে ফকনারের হাতে। ব্যাটা যা বলতে বলছে, তাই সে বলছে। বানরের মতো ভীরু একদল মানুষ নিয়ে আমার সৈন্যবাহিনী!'

মিলিটারি এ্যাটাচি এক বার ভাবল জিজ্ঞেস করে—স্যার, কি করে বুঝলেন মাওয়া মিথ্যা কথা বলছেন? কিন্তু জিজ্ঞেস করার মতো সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারল না। সে আসলেই ভীরু।

২৬

ঘড়িতে বাজছে এগারটা একুশ। রবিনসন এগিয়ে গেল ফকনারের দিকে। নরম গলায় বলল, 'ফকনার, আমি কি তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পার।'

'তোমার পরিকল্পনা আমার পছন্দ হয় নি।'

'জানি। এবং পছন্দ না-হবার কারণও জানি। আমার পরিকল্পনা বেশি সহজ। সহজ বলেই পছন্দ হয় নি। জটিল কিছু হলে তোমার পছন্দ হত।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পছন্দ না-হবার কারণ হচ্ছে, ডোফা কোনো শিশু নয়। তার আচার-আচরণ শিশুর মতো, কথাবার্তা শিশুর মতো, কিন্তু সে শিশু নয়। তুমি তা ভালো করেই জান। সে ধুরন্ধর মানুষ।'

'ধুরন্ধর মানুষরা মাঝে-মাঝে হাস্যকর ভুল করে। করে না?'

'তা করে। তবে.....

'কোনো তবে নয়। এই সুযোগ আমি নিতে চাই।'

'নিতে চাচ্ছ নাও, কিন্তু আমার পরামর্শ শোন, একটা বিকল্প ব্যবস্থা রাখ।'

'কি-রকম বিকল্প ব্যবস্থা?'

'ধর, ডোফা তোমার পরিকল্পনামতো কাজ করল না। এক দল কমাণ্ডো বিমান বোঝাই করে পাঠিয়ে দিল। তোমার ফাঁদে সে পা দিল না। যদি তাই করে, তখন আমরা কি করব?'

'কি করতে চাও?'

'আগে থেকে তৈরি থাকতে চাই।'

'বেশ, তৈরি হও। শোন রবিনসন, তোমার মাথার চুল বেশি পেকে গেছে। দড়ি দেখলেই সাপ ভাবছ।'

'তা ভাবছি। তাতে ক্ষতি তো কিছু নেই। আমি গোটা দলকে দু'ভাগে ভাগ করে দেব। এক ভাগ থাকবে ফোর্টনকে। অন্য ভাগ নিশোকে নিয়ে গ্রামে লুকিয়ে থাকবে। যদি দেখি ডোফা তোমার ফাঁদে পা দিয়েছে, একটা হেলিকপ্টার নিয়ে নিজেই নেমেছে, তখন আমরা হেলিকপ্টার দখল করে নেব। হেলিকপ্টার নিয়ে পালিয়ে যাব। আর যদি তা না হয়, তা হলে এক দল ওদের মোকাবেলা করবে, অন্য দল নিশোকে নিয়ে আরো ভেতরের দিকে পালিয়ে যাবে। কি, রাজি আছ?'

ফকনার জবাব দিল না। একদলা থুথু ফেলল। রবিনসনের পরিকল্পনা তার পছন্দ হচ্ছে না। দল দুটি ভাগে ভাগ করা মানেই ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়া।

'কি ফকনার, কথা বলছ না কেন? রাজি?'

'হ্যাঁ, রাজি।'

'গুড। ভেরি গুড। তুমি নিশোকে নিয়ে গ্রামে চলে যাও। এখানকার ব্যাপারটা আমি সামলাব।'

'আমি যাব?'

'হ্যাঁ, তুমি যাবে। পরিকল্পনার প্রথম অংশ তুমি করেছ, বাকিটা আমাকে করতে দাও। তুমি ভালো করেই জান, প্ল্যানিং-এর ব্যাপারটা আমি ভালো করি।'

'এক সময় করতে, এখন কর কি না জানি না।'

'এখনো করি। সময় নষ্ট করে লাভ নেই, রওনা হয়ে যাও।'

'দুটি দল যদি কোনো কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, তখন? একটিমাত্র ওয়্যারলেস সেট।'

'ওয়্যারলেস সেট তোমার সঙ্গেই থাকবে ফকনার। আর আমরা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, তা হলে বিচ্ছিন্নভাবেই টিকে থাকার চেষ্টা করব। চেষ্টা চালাতে হবে কত দ্রুত দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়া যায়।'

ফকনার কিছু বলছে না। বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে যাবার ইচ্ছা খুব একটা নেই।

রবিনসন বলল, 'সময় নষ্ট করছ ফকনার। রওনা হয়ে যাও।'

'কত জন সঙ্গে নেব?'

'সাত জন নাও। বাকি সব রেখে যাও।'

'বেশ, তাই হবে।'

২৭

সময় বারটা পঁচিশ।

দুটি ট্যান্সপোর্ট হেলিকপ্টার ফোর্টনকের ওপর দিয়ে চক্কর দিচ্ছে।

জেনারেল র‍্যাবি নিজেই এসেছে। তাঁর সঙ্গে এক শ' সতের জনের একটি সুসজ্জিত কমান্ডো দল। হেলিকপ্টার দু'বার নামার মতো ভঙ্গি করেও ওপরে উঠে গেল। র‍্যাবি পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না। জেনারেল ডোফার ধারণা যদি সত্যি হয়, তা হলে হেলিকপ্টার নিয়ে নামা হবে একটা বড় ধরনের বোকামি। সরাসরি বাঘের মুখে পড়ে যাওয়া। তার চেয়ে আকাশে থাকা ভালো।

ফোর্টনকের সাঁইত্রিশ মাইল উত্তরে প্যারাট্রুপার নামানো হয়েছে। ইতোমধ্যে তারা এসে পড়ুক। ব্যস্ততার কিছু নেই। জেনারেল র‍্যাবির চোখে ফিল্ড টেলিস্কোপ। ফিল্ড টেলিস্কোপে দেখা যাচ্ছে বিরান জনভূমি। এর মানেও সে বুঝতে পারছে না। র‍্যাবি হেলিকপ্টার-পাইলটের পেছনে বসে ছিল। পাইলটের কাঁধে টোকা দিয়ে বলল, 'কিছু বুঝতে পারছ?'

পাইলট মাথা না-ঘুরিয়ে বলল, 'একটা জিনিসই বুঝতে পারছি। সেটা হচ্ছে, ফোর্টনকে কেউ নেই।'

'ঘাপটি মেরে বসে আছে হয়তো।'

'তা থাকতে পারে।'

'তুমি ফায়ারিং রেঞ্জের বাইরে আছ তো?'

'তা আছি।'

দশ মিনিটের মাথায় প্যারাট্রুপাররা ফোর্টনকে ঢুকল। গ্রাউন্ড থেকে জানানো হল, 'অল ক্লিয়ার'। জেনারেল র‍্যাবিকে নিয়ে হেলিকপ্টার নেমে এল।

জেনারেল র‍্যাবি প্রথম যে-কথাটি বলল, তা হচ্ছে, 'এ তো দেখি ভয়াবহ অবস্থা! এরা করেছে কী!'

ফোর্টনক মোটামুটি একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। যেখানে-সেখানে মৃতদেহ পড়ে আছে। ফ্যামিলি কোয়ার্টারগুলি থেকে মহিলা এবং শিশুদের কান্না শোনা যাচ্ছে। জেনারেল র‍্যাবি কঠিন গলায় বলল, 'ফোর্টনকে কেউ নেই, এ-সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হবার পর আমাকে জানাও, আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব।'

'প্রতিটি ঘর দেখা হয়েছে স্যার।'

'ভালো কথা। এক শ' ভাগ অ্যালার্ট থাকতে হবে। বাঙ্কারগুলিতে পজিশন নাও।'

'নেওয়া হয়েছে স্যার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চমৎকার!'

'ফ্যামিলি কোয়ার্টারে যারা আছে, তাদের নিয়ে এস। তাদের কাছ থেকে শুনি, কী হয়েছে। আর ডেডবডিগুলির একটা ব্যবস্থা কর। ক'জন মারা গেছে, তাদের লিস্ট তৈরি করতে হবে।'

'লিস্ট করা হচ্ছে স্যার।'

'ভেরি গুড। ওয়্যারলেস অপারেটরকে বল—জেনারেল ডোফার সঙ্গে যোগাযোগ করতে, আমি কথা বলব।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'শোন, জেনারেল ডোফার সঙ্গে কথা বলার আগে আমি মাওয়ার স্ত্রী এবং কন্যার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আশা করি তারা সুস্থ আছে।'

'আমি এক্ষুনি খোঁজ নিচ্ছি স্যার।'

'প্যারাট্রুপার বাহিনীর কমান্ডার কে?'

'কর্নেল ফাতা।'

'সে কোথায়? আমার কাছে কি ইতোমধ্যেই তার রিপোর্ট করার কথা নয়?'

'স্যার, আমি ওঁকে খবর দিচ্ছি।'

জেনারেল র‍্যাবি বিরক্তিতে ভ্রূ কোঁচকাল, আর ঠিক তখনি ভয়াবহ বিস্ফোরণ হল। ফোর্টনকের গুদামঘরটি বিস্ফোরণের চাপে কয়েক ফুট শূন্যে উঠে গিয়ে প্রচণ্ড শব্দে গুঁড়িয়ে পড়ল, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে একসাথে গর্জে উঠল বেশ কিছু এলএমজি। র‍্যাবি শুধু বলল, 'কি হচ্ছে?' এর বেশি কিছু বলতে পারল না। কারণ, তার কথা শেষ হবার আগেই দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি ঘটেছে। মাথার ওপরে বিম-দেওয়া উঁচু ছাদ খুলে আসছে।

প্যারাট্রুপার দলের অধিনায়ক কর্নেল ফাতা ফোর্টনকের সর্বদক্ষিণের বাংকারে বসে অনুসন্ধানী দল কীভাবে পাঠানো হবে তা ঠিকঠাক করছিল। তার মুখে চুরুট। বিস্ফোরণের পরপর সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'খুব বড় রকমের বোকামি হয়েছে। খুবই বড় ধরনের বোকামি।

কী বোকামি হয়েছে তা বলার মতো অবসর হল না। তিন ইঞ্চি মর্টারের একটি গোলা এসে পড়ল। নিখুঁত নিশানা, যার থেকে অনুমান করা যায়, বাংকারগুলির পজিশনমতো মর্টারের গোলা ছোঁড়া হচ্ছে। প্রতিটি বাংকার আক্রান্ত হবে।

পরবর্তী কুড়ি মিনিটে যা ঘটল তার নাম—হতবুদ্ধি সৈন্যবাহিনীর রিফ্লেক্স অ্যাকশানজনিত বিশৃঙ্খলা।

ওরা ভেতর থেকে আক্রান্ত হয়েছে, এটা বুঝতে বেশ কিছু সময় নষ্ট হল। বাংকারের নিরাপদ আশ্রয়ে যারা ছিল, তারা ভেতরের দিকে গুলি করবে কি করবে না, সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করে ফেলল। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তারা ক্রল করে আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে যাবে। কিন্তু আক্রমণের কোনো কেন্দ্রবিন্দু ছিল না। তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল দূরপাল্লার জন্যে উপযুক্ত। প্রায় হাতাহাতি পর্যায়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি তাদের ছিল না। বিপক্ষ দলের জনবল সম্পর্কেও একটি ভুল ধারণা তৈরি হল, যা মানসিকভাবে তাদের কাবু করে ফেলল।

শুধু হেলিকপ্টার দুটির পাশে দাঁড়ানো দশজনের একটি ইউনিট মাথা ঠাণ্ডা রাখল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহূর্তের মধ্যে তারা দুটি লাইট মেশিনগান বসিয়ে ফেলল। যে-ভুলটা সবাই করেছে—পাগলের মতো নির্বিচারে গুলিবর্ষণ, তা তারা করল না। কভার নেবার চেষ্টা করতে লাগল।

রবিনসন তার দলের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশকে রেখেছিল হেলিকপ্টার দখলের জন্যে। তারা তা করতে পারল না। হেলিকপ্টার রক্ষীবাহিনী রবিনসনের দলকে কাছ-ঘেঁষতে দিল না। রবিনসনের দল যা করতে পারল তা হচ্ছে, রকেট লাঞ্চারের সাহায্যে দুটি হেলিকপ্টারের একটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া।

ফোর্টনকের সর্বত্রই আগুন জ্বলছে। রবিনসন হেলিকপ্টার রক্ষীবাহিনীর নজর ঢাকবার জন্যে একটি স্মোক বোম ব্যবহার করেছে। সেই ঘন কালো ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার। বাইরের বাংকারগুলি থেকে এইচএমজি'র গুলিবর্ষণের কান-ফাটানো আওয়াজ। তারা গুলি চালাচ্ছে বাইরে। যে-কোনো মুহূর্তে বাইরে থেকে আক্রমণ হবে, এটাই তাদের গুলিবর্ষণের কারণ।

হতভম্ব জেনারেল র‍্যাবি চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে ডোফার সঙ্গে যোগাযোগ করল। ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল, 'বড় রকমের ফাঁদে পড়ে গেছি স্যার।'

ডোফা শুকনো গলায় বললেন, 'কি ব্যাপার?'

'ফকনারের দল ভেতর থেকে আমাদের আক্রমণ করেছ। আশঙ্কা করছি, বাইরে থেকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিক থেকেও আক্রমণ হবে।'

'এখন কি আক্রমণ বন্ধ?'

'জ্বি। কিছুক্ষণ আগে গোলাবর্ষণ বন্ধ হয়েছে।'

'ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কি?'

'এখনো পুরো রিপোর্ট পাই নি। তবে অবস্থা বেশি ভালো না। বলা যেতে পারে খুবই খারাপ অবস্থা।'

'তুমি জেনারেল না-হয়ে একটা ছাগল হলে ভালো হত।'

'আমরা পরিস্থিতির শিকার হয়েছি।'

'পরিস্থিতি তোমার পশ্চাৎদেশ দিয়ে প্রবেশ করানো হবে।'

জেনারেল ডোফা ওয়্যারলেস রিসিভার নামিয়ে দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে রইলেন।

র‍্যাবির কাছ থেকে ক্ষয়ক্ষতির পুরো বিবরণ পাওয়ার পরপরই জেনারেল ডোফা মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠালেন। তাদের রুদ্ধদ্বার বৈঠক চলল প্রায় এক ঘন্টা। মার্কিন রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার করে না। রাষ্ট্রপ্রধানরা তাঁদের বিরাট বিপর্যয়ের সময়ও মাথা ঠাণ্ডা রাখেন। হাসিমুখে কথা বলেন।

জেনারেল ডোফাও তাই খুব ঠাণ্ডা মাথায় হাসিমুখে যে-কথাটি শেষ মুহূর্তে বললেন, তার সরল অর্থ হচ্ছে—ঈশ্বর দুটি শয়তান তৈরি করেছেন। দুটির একটি হচ্ছে, যে আদমকে গন্ধম ফল খাইয়েছে—আর অন্যটি হচ্ছে, মার্কিন সরকার।

রাষ্ট্রদূত সেই কথায় প্রাণখুলে হাসল। মধুর স্বরে বলল, 'আপনি খুবই রসিক। তবে ভয় নেই, আমরা আপনার পেছনে আছি।'

ডোফা হাসিমুখে বললেন, 'শুনে খুব আনন্দ হচ্ছে। তবে সমস্যা কি, জানেন? সমস্যা হচ্ছে, আপনারা একই সঙ্গে দু'-তিন জনের পেছনে থাকেন। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহূর্তে হয়তো-বা অন্য একজন জেনারেলের পেছনেও আছেন, আবার কে জানে হয়তো ফকনারের পেছনেও আছেন।'

'আপনি খুবই রসিক ব্যক্তি।'

'ঠিক ধরেছেন, খুবই রসিক।'

দুপুরে ডোফা তাঁর স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করে নদীতে সাঁতার কাটতে গেলেন। তার জন্যে একটি ক্যাবিনেট মিটিং করতে হল। এখন আর কোনো কিছুতেই মন বসছে না।

নদীর পাড়ে টিভি ক্যামেরাম্যান, সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যচিত্রের গাড়ি এবং বেশ ক'জন পত্রিকার ফটোগ্রাফার দাঁড়িয়ে আছে। আগামীদিনের পত্রিকায় ডোফার সাঁতারের ছবি ছাপা হবে। খবরের ধরন কী হবে, তথ্য মন্ত্রণালয় তাও জানিয়ে দেবে। ইতিমধ্যে তা লেখাও হয়ে গেছে। ফটোকপি করা হচ্ছে। ডোফার অনুমতি পেলেই সাংবাদিকদের হাতে-হাতে দিয়ে দেওয়া হবে।

উসসি নদীতে ডোফা

মহামান্য রাষ্ট্রপতি আজ হঠাৎ উসসি নদীতে সাঁতার কাটার জন্যে উপস্থিত হন। জনগণ তাঁদের প্রাণপ্রিয় প্রেসিডেন্টকে তাঁদের মাঝখানে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হন। তাঁরা তুমুল হর্ষধ্বনি দিতে থাকেন। মহামান্য প্রেসিডেন্ট নদীর পারে দণ্ডায়মান জনগণকে তাঁর সঙ্গে সাঁতারের আমন্ত্রণ জানান। এই আহ্বানে তাঁদের আনন্দের বাঁধ ভেঙে যায়। মহামান্য প্রেসিডেন্ট সাঁতার কাটতে-কাটতেই তাঁদের ব্যক্তিগত কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন এবং তাঁদের আশ্বাস দেন যে, অদূর ভবিষ্যতে উসসি নদীতে বাঁধ দেবার ব্যবস্থা সরকার করবে, যাতে প্রলয়ঙ্করী বন্যায় উসসি নদীর দু'পাশের মানুষকে আর কষ্ট না-করতে হয়।

তথ্যচিত্রের কর্মীরা বড়-বড় রিফ্লেক্টর ফিট করছে। আকাশে মেঘের আনাগোনা। সূর্য বারবার মেঘের আড়ালে চলে যাচ্ছে। ভালো ছবি তোলা খুব সহজ হবে না। টিভি ক্রুরা ক্যামেরা নিয়ে নৌকায় উঠে গেছে। অপেক্ষা করছে—কখন মহামান্য রাষ্ট্রপতি নদীতে নামবেন।

ডোফা শেষ মুহূর্তে নদীতে নামার পরিকল্পনা বাতিল করলেন। তবু সবাই নদীর পারে অপেক্ষা করতে লাগল, যদি আবার ফিরে আসেন। কিছুই বলা যায় না, আসতেও তো পারেন।

২৮

নিশো ক্ষীণস্বরে বললেন, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি, তা কি জানতে পারি?'

ফকনার হাসিমুখে বলল, 'নিশ্চয়ই জানতে পারেন। এটা কোনো গোপন সংবাদ নয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা হলে বল, কোথায় যাচ্ছি।'

'জানলে বলতাম। আমি নিজেও জানি না কোথায় যাচ্ছি। উত্তর দিকে যাচ্ছি, এইটুকু বলতে পারি।'

'তোমার পরিকল্পনা কি?'

'এই মুহূর্তে কোনো পরিকল্পনা নেই। আপনাকে নিয়ে হেলিকপ্টারে করে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা নষ্ট হয়েছে।'

'ফোর্টনকে তোমার যে-দল ছিল, সবাই কি মারা গেছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। ফিরে তো কেউ আসে নি। কেউ-কেউ বেঁচে থাকতেও পারে। বেঁচে থাকলেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।'

'তুমি ওদের কোনো খোঁজ করবারও চেষ্টা কর নি?'

'না, করি নি। কারণ এমন কোনো কথা ছিল না। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি, তারপর রওনা হয়েছি। ডোফার সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার ইচ্ছা নেই।'

'তোমরা এখন আছ মাত্র সাত জন।'

'না, আট জন। আপনিও আমাদের সঙ্গে আছেন। দয়া করে চুপ করে থাকলে আমার সুবিধা হয়। কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

নিশো চুপ করে গেলেন। দলটি অতিদ্রুত চলছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা লুকিয়ে ছিল। অন্ধকার হবার পরপর যাত্রা শুরু করেছে। বিরতিহীন যাত্রা। এখন প্রায় মধ্যরাত। এর মধ্যে এরা এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম করে নি। নিশোকে এক জন পিঠে তুলে নিয়েছে। সে আছে মাঝখানে। সেও অন্যদের মতোই সমান তালে পা ফেলছে। নিশো এক বার শুধু বললেন, 'তোমার কষ্ট হচ্ছে?'

লোকটি কর্কশ গলায় বলল, 'তুমি যখন কথা বল, তখনই শুধু কষ্ট হয়। নয়তো হয় না।'

নিশো চুপ করে গেলেন। তাঁর প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে। ঘুম পাওয়ার ধরনটা অন্য রকম। মনে হয় সমস্ত শরীর ঘুমিয়ে পড়তে চাচ্ছে। তিনি মাঝে-মাঝে ঝিমুচ্ছেন। চোখ মেলে রাখতে পারছেন না। আবার ঘুমিয়ে পড়তেও লজ্জা লাগছে।

রাত দেড়টায় ফকনার থামবার হুকুম দিল। এক ঘন্টা বিশ্রামের পর আবার যাত্রা শুরু হবে। জায়গাটা খোলামেলা। চারদিকে গভীর বন। বনের ভেতর পায়ে-চলার রাস্তা আছে। তবে গভীর রাতে কেউ চলাচল করে না। ফকনারের দলের সঙ্গে এখনো কারোর দেখা হয় নি। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। বাতাসে ঘাসপচা গন্ধ। নিশাচর পাখির ডাক এবং গাছের পাতায় বাতাসের শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই। অবশ্য ঝিঁঝির ডাক সারাক্ষণই আছে। কান সেই শব্দে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে শব্দটা এখন আর কানে আসছে না।

ওয়্যারলেস চালু করা হয়েছে। মাইক্রোওয়েভ কম্যুনিকেশন ফ্রিকোয়েন্সি বদলানো হচ্ছে। কোনো রকম সিগন্যাল ধরা পড়ছে না। ফকনারের ধারণা ছিল, সিগন্যাল আসবে। ডোফা যোগাযোগ করতে চাইবে। এবং তখন হয়তো-বা ফকনারের প্রস্তাবে সে রাজি হবে। ডোফা বুদ্ধিমান লোক, রাজি হওয়া ছাড়া তার পথ নেই।

কফি তৈরি হয়েছে। সবাই একসঙ্গে খেতে পারছে না। দুটিমাত্র মগ। দু'জন ভাগ্যবান গরম কফিতে চুমুক দিচ্ছে। অন্যরা অপেক্ষা করছে তাদের সুযোগের জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাত-পা ছড়িয়ে তারা এমনভাবে শুয়ে আছে যে মনে হচ্ছে আবার উঠে চলার শক্তি নেই। কেউ-কেউ মনে হচ্ছে ঘুমিয়েও পড়েছে। ফকনার কফির মগ হাতে নিশোর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'ঘুমুচ্ছেন নাকি?'

নিশোর তন্দ্রা ভেঙে গেল। তিনি অবশ্যি কিছু বললেন না।

'নিন, আপনার জন্যে কফি এনেছি।'

'খেতে ইচ্ছা করছে না।'

'আমরা এক্ষুনি রওনা হব। কফি খেলে আপনার চলতে সুবিধা হবে।'

'আমি তো আর চলি না, পিঠে শুয়ে থাকি।'

'পিঠে শুয়ে থাকতেও কষ্ট কম হবে। নিন, কফি নিন।'

নিশো কফি নিয়ে এক চুমুক দিয়েই হড়হড় করে বমি করে ফেললেন।

'আপনার শরীর কি বেশি খারাপ লাগছে?'

'বুঝতে পারছি না। বোধশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে আছি।'

ফকনার এগিয়ে এসে নিশোর কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠল। গা পুড়ে যাচ্ছে।

'আপনার শরীর তো মনে হচ্ছে বেশ খারাপ।'

নিশো জবাব দিলেন না। ফকনার বলল, 'এত প্রচণ্ড জ্বর কি আপনার আগে ছিল?'

'জানি না, মনে হচ্ছে মরতে বসেছি। তোমরা কি এখনি রওনা হতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে কি আর আধ ঘন্টা সময় তুমি দিতে পারবে। আমার মনে হচ্ছে আধ ঘন্টার মধ্যে আমার কিছু-একটা হয়ে যাবে। তখন নিশ্চিন্ত মনে তোমরা রওনা হতে পারবে।'

ফকনার গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনি যদি পুরোপুরি নিশ্চিত হন, তা হলে আধ ঘন্টা অপেক্ষা করা যেতে পারে। তবে মুশকিল কি জানেন, মৃত্যুর আগে যে-শ্বাসকষ্ট, সেটা শুরু হবার পর সাধারণত দু'-তিন ঘন্টা সময় পর লোকজন মারা যায়। আপনার শ্বাসকষ্ট এখনো শুরু হয় নি।'

নিশো হেসে ফেললেন। ফকনার বলল, 'দয়া করে আটচল্লিশ ঘন্টা বেঁচে থাকুন। তা হলেই হবে।'

'কি হবে?'

'এর মধ্যেই লোকজন জানতে শুরু করবে-নিশো এখনো বেঁচে আছে। বিরাট একটা চাপ ডোফার ওপর পড়বে। শুরু হবে গৃহযুদ্ধ। জেনারেলদের কেউ-কেউ যেদিকে বাতাস, সেদিকে পাল খাটাবার চেষ্টা করবে। আমরা যখন গ্রামে লুকিয়ে ছিলাম, তখনই গ্রামের বেশিরভাগ লোক জেনে গেছে আপনি বেঁচে আছেন। এইসব খবর দ্রুত ছড়ায়। কে জানে ইতোমধ্যেই হয়তো গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।'

নিশো কাতর গলায় বললেন, 'আমার কারণে হাজার-হাজার লোক মারা যাবে, এই দৃশ্য আমি দেখতে রাজি নই। তুমি হয়তো জান না, তোমরা যখন আমাকে বের করে আনলে, তখন থেকেই ঈশ্বরের কাছে আমার মৃত্যু কামনা করছি।'

'আপনি কিন্তু এক বার বলেছেন—ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না।'

'তুমি কর?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি ঈশ্বর বা মানুষ—কোনোটাই বিশ্বাস করি না।'

'বন্ধুকে বিশ্বাস কর, তাই না?'

'তা করি।'

ফকনার নিজের জন্যে আরেক পেয়ালা কফি এনে নিশোর পাশে বসতে-বসতে বলল, 'পাখিকে নিয়ে যে-কবিতাটা লিখেছিলেন, ওটা পড়ুন। শুনি, কি লিখেছেন।'

নিশো জবাব দিলেন না।

ফকনার বলল, 'পাখি, নারী, ফুল ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে কি আপনি কবিতা লিখেছেন? যেমন ধরুন বন্দুক—বন্দুক নিয়ে কখনো লিখেছেন?'

'হ্যাঁ, লিখেছি। শুনতে চাও?'

'না, পাখির কবিতাটাই পড়ুন। প্রথমে আপনার নিজের ভাষায় পড়বেন, তারপর অনুবাদ করবেন।'

নিশো নিজের ভাষায় পড়লেন না। সরাসরি অনুবাদ করলেন। ফকনার আগ্রহ নিয়ে শুনল—

"সোনালি ডানার একটি চমৎকার পাখি আমার পাশেই বসেছিল।
আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে তাকে ছুঁতে গেলাম।
ওম্নি সে উড়ে গেল।
গভীর বিষাদে আমার হৃদয় যখন আপ্লুত হল
ঠিক তখন আমি দেখি পাখির একটি ডানা
পড়ে আছে।
সোনালি এই পাখি যেখানেই যায় সেখানেই তার
কিছু অংশ রেখে যায়।"

ফকনার বলল, 'আপনার কবিতাটি চমৎকার। এখন রওনা হওয়া যাক। আধ ঘন্টা পার হয়েছে। আপনি বেঁচে আছেন। মারা যান নি।'

নিশো আবারো হেসে ফেললেন।

আবার যাত্রা শুরু হল। অসম্ভব খারাপ লাগছে তাঁর। বারবারই মনে হচ্ছে জ্ঞান হারাচ্ছেন। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে, আবার কিছুক্ষণ পর চাঁদের আলো চোখে পড়ছে। গভীর বনে চাঁদের আলো—কী অদ্ভুত দৃশ্য! তন্দ্রার মতো আসছে। এই তন্দ্রার মধ্যেও তাঁর মনে হল তিনি অসীম ভাগ্যবান—মৃত্যুর আগে তাঁর প্রিয় জন্মভূমির কিছু মায়াময় দৃশ্য দেখতে পেলেন। জেলখানার অন্ধকূপে শুয়ে থেকে মরতে হল না। যাদের জন্যে এটা সম্ভব হল তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু বড়ই ক্লান্তি লাগছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। তাঁর কেবলি মনে হচ্ছে, এক বার ঘুমিয়ে পড়লে তাঁর ঘুম আর ভাঙবে না।

'সম্রাট নিশো।'

নিশো চোখ মেললেন। 'ফক্‌ফকা' দিনের আলো চারদিকে। সূর্য অনেক দূর উঠে গেছে। তিনি বিশাল এক পিপুল গাছের নিচে শুয়ে আছেন। তাঁর সামনে ফকনার হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

'এখনো মনে হচ্ছে বেঁচে আছেন।'

'তাই তো দেখছি!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমরা এখানে পৌঁছেছি অনেক আগেই। আপনি ঘুমুচ্ছিলেন, তাই জাগাই নি। এখন দয়া করে হাতমুখ ধুয়ে কিছু খাবার খান। আপনার জন্যে সুসংবাদ আছে।'

'কী সুসংবাদ!'

'জেনারেল ডোফা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। অন্য একজন ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। নতুন জেনারেল ঘোষণা করেছেন যে নিশো বেঁচে আছেন, তাঁকে রাজধানীতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

'কোথায় পেলে খবর?'

'প্রাথমিক খবর ওয়্যারলেসে পেয়েছি। তবে নতুন জেনারেল বেতার ভাষণ দেবেন। আপনাকে ডেকে তোলার উদ্দেশ্য হচ্ছে বেতার ভাষণটি শোনানো।'

নতুন জেনারেলের নাম অ্যামিও। তিনি আবেগপূর্ণ একটি ভাষণ দিলেন, যার মূল বক্তব্য হচ্ছে, মহান নেতা নিশোকে যে-সব চক্রান্তকারী জেলখানায় আটকে রেখে তাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রচার করেছে—বিশেষ সামরিক আদালতে তাদের প্রত্যেকের বিচার হবে। জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতাকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মহান নেতা আজ দুপুরের মধ্যেই রাজধানীতে পৌঁছবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

ফকনার বলল, 'আশা করছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে হেলিকপ্টার আসবে। আমরা আমাদের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছি। হেলিকপ্টারে ডাক্তারও আসছেন। আপনি এখন কেমন বোধ করছেন, সেটা বলুন।'

'ভালো।'

'মার্কিন সরকারেরও টনক নড়েছে। তারাও যোগাযোগ করেছে। আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে একটা সি প্লেন পাঠাচ্ছে।'

ফকনার চুরুট ধরাল। আর ঠিক তখনই হেলিকপ্টারের পাখার আওয়াজ পাওয়া গেল। হেলিকপ্টার থেকে ডাক্তার এবং নার্স ছাড়াও দশ জন কমান্ডোর একটি দল নামল। ফকনার চুরুট ফেলে এগিয়ে গেল। কমান্ডো দলের প্রধান উষ্ণ গলায় বলল, 'আশা করছি আপনি কর্নেল ফকনার।'

'হ্যাঁ।'

ফকনারের আরো কিছু হয়তো বলার ইচ্ছা ছিল। সেই সুযোগ সে পেল না। কমান্ডো দলের সবার হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র একসঙ্গে গর্জে উঠল।

সম্রাট নিশো এবং ফকনারের দলের সাত জন প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মারা গেল। ডাক্তার এবং নার্সকে হত্যা করা হল তার পরপরই।

জেনারেল অ্যামিও নিশোকে রাজধানীতে আনতে চান নি। সামরিক শাসনের অবসান ঘটানো কোনো পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। তা ছাড়া আমেরিকান রাষ্ট্রদূত জেনারেল অ্যামিওকে জানিয়েছেন, মার্কিন সরকার মনে করে যে, এই দেশের জন্যে সামরিক শাসনই উত্তম। নিশোকে এই সময় হাজির করা মানেই রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করা। উন্নয়নশীল দেশের জন্যে যা অশুভ।

সন্ধ্যাবেলা সমগ্র বিশ্ববাসী জানল, শেষ মুহূর্তে কুচক্রী ডোফার অনুসারীরা নিশোকে ফোর্টনকে হত্যা করেছে।

জেনারেল অ্যামিও বেতার ও টিভি মারফত এই খবর দিতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হল। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট গভীর সমবেদনা জানিয়ে বার্তা পাঠালেন।

নিশোর নিজের রচনার কিছু অংশই তাঁর কবরের শোকগাঁথায় ব্যবহার করা হয়েছে—

"মানুষকে ঘৃণা করার অপরাধে কখনো কাউকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয় নি, অথচ মানুষকে ভালবাসার অপরাধে অতীতে অনেককেই হত্যা করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও হয়তো হবে।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসর

এখানে কিছু রহস্য আছে।

অতীন্দ্রিয় রহস্য! মাঝে-মাঝে কড়া ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। এমন কড়া যে, গা ঝিম-ঝিম করে—মাথা ধরে যায়।

জায়গাটা হচ্ছে রিং রোডের মাঝামাঝি—শ্যামলী থেকে আদাবরের দিকে যাবার ইট-বিছানো রাস্তা। আশেপাশে কোনো ফুলের গাছ নেই যে, ফুলের গন্ধ আসবে। তাছাড়া ফুলের গন্ধে গা ঝিম-ঝিম করে না। নিশ্চয়ই অন্য কোনো ব্যাপার। কোনো জটিল রহস্য।

আহসান আজ আবার গন্ধটা পাচ্ছে। গতকাল ছিল না, তার আগের দিনও ছিল না। ব্যাপারটা কী? রাত প্রায় এগারটা। আহসান চিন্তিত মুখে সিগারেট ধরাল। এ-রকম নির্জন রাস্তায় এত রাতে সিগারেট ধরিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। আশেপাশে খুব ছিনতাই হচ্ছে। দাড়ি-গোঁফ এখনো গজায় নি এমন সব ছেলেপুলেরা পেনসিল-কাটা ছুরি দেখিয়ে মানিব্যাগ নিয়ে যাচ্ছে। এ-রকম সময়ে গন্ধ-রহস্য ভেদ করার জন্যে মাঝরাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না।

আশ্চর্য, গন্ধটা হঠাৎ মিলিয়ে গেল। এই রহস্যের কোনো মানে হয়? এটা নিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করলে হয়। কিন্তু এই ব্যাপারটা আদাবরের রাস্তায় পা না-দেয়া পর্যন্ত মনে আসে না। যখন মনে আসে তখন আশেপাশে কেউ থাকে না যার সঙ্গে আলোচনা করা যায়।

আদাবরের দিক থেকে পাঁচ-টনি ট্রাক আসছে। রাস্তায় লোকজন নেই বলেই ট্রাক আসছে ঢিমে-তেতালা গতিতে। লোকজন থাকলে ঝড়ের গতিতে চলে আসত। আহসান একপাশে সরে দাঁড়াল। হেড-লাইটের আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। তাকানো যাচ্ছে না, আবার চোখ ফিরিয়েও নেওয়া যাচ্ছে না। কড়া আলোর একধরনের সম্মোহনী শক্তি আছে। শুধু পতঙ্গ না—এই আলো মানুষকেও আকৃষ্ট করে।

ট্রাকটা আহসানের ঠিক গায়ের ওপর এসে আচমকা ব্রেক কষল। ড্রাইভার দরজা খুলে অর্ধেকটা শরীর বের করে তাকে হাত ইশারা করে ডাকছে। ড্রাইভার বা দারোয়ান শ্রেণীর কেউ হাত ইশারা করে ডাকলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তবে এই ড্রাইভার

আহসানের চেনা। তার বাড়িওয়ালা করিম সাহেবের ড্রাইভার। বাড়িওয়ালার বাড়ির একতলায় থাকে। নাম—নাজিম, নিজাম কিংবা এই ধরনের কিছু। আহসানের সঙ্গে দেখা হলে লাল চোখে তাকায় এবং পান খাওয়া হলুদ দাঁত বের করে হাসে। আবার মাঝে-মাঝে না-চেনার ভঙ্গি করে।

'প্রবেসার সাব, খবর হুনছেন?'

'না। কি খবর?'

'করিম সাবের কথা কিছু হুনছেন?'

'না।'

'যায়-যায় অবস্থা। অক্সিজেন চলতাছে....

'কী হয়েছে?'

'এক্সিডেন—টেম্পোর লগে ধাক্কা—মাথা গুঁড়া। খুবই আফসোসের কথা, কি কন প্রবেসার সাব?'

আহসান কিছু বলল না। ফুলের গন্ধটা আবার পাওয়া যাচ্ছে। পেট্রল এবং ধোঁয়ার গন্ধ ছাপিয়ে মিষ্টি একটা গন্ধ। এর মানেটা কী? রহস্যটা কোথায়?

'আরিচা থনে টিরিপ আইন্যা খবর হুনলাম। মিজাজ ঠিক নাই আমার—বুঝছেন প্রবেসার সাব। দেখবার যাইতাছি।'

ড্রাইভার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। গিয়ার বদলাতে-বদলাতে বলল, 'এর নাম হালার দুনিয়া। আজিব জাগা। প্রবেসার সাব, যাই।'

এবার ট্রাক ছুটছে ঝড়ের মতো। আহসানের মনে হল একটা ভুল হয়ে গেছে—তার উচিত ছিল ড্রাইভারের সঙ্গে যাওয়া। ব্যাপারটা মনেও হয় নি। ফুলের গন্ধ সব এলোমেলো করে দিয়েছে।

করিম সাহেব লোকটিকে সে পছন্দ করে। বেঁটেখাটো মানুষ। মুখভর্তি পান। হাসিখুশি। পাশ দিয়ে গেলে জরদার চমৎকার গন্ধ পাওয়া যায়। ভদ্রলোক এমন ভঙ্গিতে পান খান যে, মনে হয় স্বর্গীয় কোনো খাদ্য চিবুচ্ছেন। তাঁকে দেখলেই পান খেতে ইচ্ছা করে।

বাড়িওয়ালারা প্রায়ই বেশ নামাজি হয়—ইনিও তাই। তাঁর গায়ে সবসময় পরিষ্কার ঝকঝকে একটা পাঞ্জাবি থাকে। মাথায় তার চেয়েও পরিষ্কার একটা টুপি। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বেশ নাদুস-নুদুস। দেখলেই মনে হয়, খুব শিগগিরই এঁর হার্ট এ্যাটাক বা মাইন্ড স্ট্রোক জাতীয় কিছু হবে। কিন্তু হয় না। তাঁর তিন জন ভাড়াটে আছে। যাদের সবার সঙ্গেই তাঁর সুসম্পর্ক। দু'জন ভাড়াটে তাঁকে চাচা ডাকে। আহসান তাঁকে কিছুই ডাকে না; তবে তিনি আকার-ইঙ্গিতে প্রায়ই বুঝিয়ে দেন যে, আহসানকে তিনি নিজের ছেলের মতো দেখেন।

ভদ্রলোকের পাঁচ মেয়ে, কোনো ছেলে নেই। বড় তিনটি মেয়ে—স্কুল-কলেজে কোথাও যায় না। সম্ভবত বিয়ের জন্যে অপেক্ষা করে। ছোট দু'টি স্কুলে যায়। আহসানের সঙ্গে দেখা হলে এই দুই স্কুল-যাত্রী মৌলানাদের মতো টেনে-টেনে বলে, 'আসসালামু আলায়কুম।' আহসান তার উত্তরে সবসময় বলে, 'কী খবর ভালো?'

এই প্রশ্নের উত্তর এরা দেয় না। গম্ভীর হয়ে থাকে। হাসেও না। মনে হয় খানিকটা বিরক্ত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিম সাহেব মাঝেমধ্যে তাকে খেতে ডাকেন। অন্য ভাড়াটেদের ডাকেন না। সে একা-একা থাকে, এই কারণেই হয়ত; কিংবা কে জানে—হয়ত তাঁর কোনো পরিকল্পনা আছে। যাঁর বড়-বড় তিনটি মেয়ে বিয়ের জন্যে অপেক্ষা করছে তাঁর পরিকল্পনা থাকা অন্যায় নয়। অবশ্যি তিনি এখন পর্যন্ত ইশারা বা ইঙ্গিতে এ বিষয়ে কিছু বলেন নি। মেয়েদের প্রসঙ্গে তিনি যা বলেন তার সারমর্ম হচ্ছে—মেয়েগুলো মহা অপদার্থ। সংসারের কিছু জানে না—কিছু বোঝে না। দিনরাত ঝগড়া করে আর টাকা জমায়।

আহসান অবাক হয়ে বলেছিল, 'টাকা জমায় মানে?'

'জমায় মানে জমায়—সঞ্চয়।'

'পায় কোথায় টাকা? আপনি দেন?'

'পাগল, আমি দিব কেন? ওরা চুরি করে। মা'র কাছ থেকে চুরি করে, মাঝে-মাঝে আমার পকেটে হাত দেয়; মহা হারামী। আগে চড়-থাপ্পড় দিতাম, এখন বড় হয়ে গেছে, চড়-থাপ্পড় দিতে পারি না। যখন মেজাজ ঠিক থাকে না—দিই। তখন তাদের মা কান্দে। এরা হইল কান্দন পার্টি। মা কান্দে, মেয়ে কান্দে। একবার কী হইল শুনেন—প্রাইভেট মাস্টার আসছে। বড় মেয়েটাকে পড়াইতাছে, হঠাৎ কারেন্ট নাই। মাস্টার হারামজাদা সুযোগ বুইঝা গায়ে হাত দিছে। বুঝেন অবস্থা। মেয়ে কোনো শব্দ করে না—ফিঁচ-ফিঁচ কইরা কান্দে। বুঝেন অবস্থা। মা যেমুন বোকা—আমার মেয়েগুলোও হইছে বোকা। বাজারের সেরা বোকা।'

কোনো বাবা নিজের মেয়েদের নিয়ে এ জাতীয় কথা বলতে পারে তা আহসানের ধারণার বাইরে ছিল। এই লোক বলে।

ভদ্রলোকের কথাবার্তার ভঙ্গি থেকে আহসানের মাঝে-মাঝে মনে হয় তাকে নিয়ে ভদ্রলোকের তেমন কোনো পরিকল্পনা নেই। থাকলে মেয়েদের সম্পর্কে এ জাতীয় কথাবার্তা বলতেন না। তাছাড়া খেতে যখন ডাকেন তখনও মেয়েরা কেউ আসে না বা উঁকি-ঝুঁকি দেয় না। তাঁর বাড়ির পর্দা প্রথাটি বেশ কঠিন। মেয়েগুলো নিউমার্কেটে যায় বোরকা পরে।

আহসানের বাসা তিনতলার ডান-দিকে। বাঁ-দিকটা খালি। দরজা-জানালা এখনো লাগানো হয় নি। আহসানের বাসাও পুরোপুরি তৈরি হয় নি। চুনকাম বাকি আছে। দরজায় রঙ লাগানো হয় নি। তিনটি রুমের একটিতে এখনো দরজা-জানালা লাগানো বাকি। সে-কারণেই ভাড়া কম—তের শ' টাকা। গ্যাস-ইলেকট্রিসিটি সবই এর মধ্যে। তবে গ্যাস লাইন এখনো বসে নি বলে এই সুবিধাটি পাওয়া যাচ্ছে না। 'ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে'—সুযোগ পেলেই করিম সাহেব এই কথা শুনিয়ে দেন—

'কয়েকটা দিন অপেক্ষা করেন। গ্যাস লাইন বসলে কত আরাম হবে দেখেন। এক পয়সা বাড়ি ভাড়া বাড়াব না। ভদ্রলোকের এক জবান। এত সস্তায় ঢাকা শহরে আর বাড়ি নাই। কী রকম আলো-হাওয়া, দেখতেছেন? ভাদ্র মাসেও ফ্যান ছাড়তে হয় না। দক্ষিণমুখী বাড়ি।'

বাড়ি দক্ষিণমুখী খুবই ঠিক কথা। আলো-হাওয়াও প্রচুর—অস্বীকার করার উপায় নেই; তবে তিনতলায় যেতে হয় বাড়িওয়ালার ঘরের ভেতর দিয়ে। বাইরে সিঁড়ি নেই। ভাড়া দেওয়ার জন্যে যে বাড়ি বানায় সে কখনো এমন অদ্ভুত ব্যবস্থা রাখে? কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিম সাহেব রেখেছেন। এবং তাঁর কথায় মনে হয় তিনি এটা রেখেছেন ইচ্ছা করেই।

'বাইরে সিঁড়ি থাকলে চুরি-চামারির সুবিধা। হুট করে চেনা-অচেনা লোক ঢুকে পড়বে। এখন সেটা পারবে না। সব থাকবে চোখে-চোখে। রাতের বেলা কলাপসেবল গেট বন্ধ করলে একেবারে নিশ্চিন্ত। দরজা-জানালা খোলা রেখে নাক ডাকিয়ে ঘুমান। কোনো অসুবিধা নাই।'

'আসতে-যেতে বার-বার বিরক্ত করতে হয় আপনাদের।'

'বিরক্ত করতে হলে করবেন। পয়সা দিচ্ছেন বিরক্ত করবেন না? মাগনা থাকলে একটা কথা ছিল। আর পরের বাড়ি মনে করেন কেন? নিজের বাড়ি মনে করবেন। একদম নিজের বাড়ি।'

করিম সাহেবের এই বাড়িটিকে নিজের বাড়ি মনে করার কোনোই কারণ আহসানের ঘটে নি। এই পরিবারের অন্য কারোর সঙ্গে তার সামান্যতম পরিচয়ও নেই। তাঁর স্ত্রীকে সে এখনো চোখে দেখে নি। অথচ সে দু'মাসের ওপর এ-বাড়িতে আছে। তাঁর বড় তিনটি মেয়ের সঙ্গে হঠাৎ-হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, তবে তখন তারা এমন চমকে ওঠে যে আহসানের নিজেরই অস্বস্তি লাগে। মেয়ে তিনটি দেখা হলেই বিদ্যুতের মতো মাথা ঘুরিয়ে নেয়। মহা বিরক্তির ব্যাপার। ছোটো দু'টি এ-রকম না করলেও রোবটের মতো গলায় বলে—'আসসালামু আলায়কুম'—সেটা আরো বিরক্তিকর। সালাম দেওয়ার অদ্ভুত কায়দা তারা কোথায় শিখেছে কে জানে।

করিম সাহেবের বারান্দায় আজ বাতি জ্বলছে। বারান্দায় সাত-আটটি চেয়ার পাতা। তাঁর বড় মেয়েটি ছোট দু'টি বোনকে নিয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে। আহসানকে দেখে এরা তিনজনই উঠে দাঁড়াল। যেন তারা আহসানের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। এই প্রথম বার ছোট মেয়ে দু'টি 'আসসালামু আলায়কুম' বলল না। বড় মেয়েটিও মাথা ঘুরিয়ে মূর্তির মতো হয়ে গেল না। আহসান কি করবে ভেবে পেল না। দাঁড়াবে খানিকক্ষণ? করিম সাহেবের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেবে নাকি সরাসরি সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাবে ওপরে? সে সবচেয়ে ছোট মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল 'তোমার আব্বা এখন কেমন আছেন?'

'জানি না।'

'দেখতে যাও নি?'

'সবাই গেছে। আমরা তিন জন শুধু আছি।'

'তোমরা যাও নি কেন?'

মেয়েটি এই প্রশ্নের জবাব দিল না। তাকাল বড় বোনের দিকে। বড় মেয়েটি বলল, 'আপনি এখানে একটু বসুন।'

মেয়েটির গলার স্বর ঠাণ্ডা এবং কোমল। উচ্চারণ স্পষ্ট। বাবার মতো আঞ্চলিক সুর নেই; যদিও একটু টেনে-টেনে কথা বলছে। তার কথা বলার মধ্যে কোনো জড়তাও নেই। তাকিয়েও আছে সরাসরি আহসানের দিকে। সুন্দর চেহারা। বেশ ফর্সা—একটা স্নিগ্ধ ভাব আছে। সম্ভবত অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছে। চোখ-মুখ ফোলা-ফোলা, সেই কারণেই কি একটা আদুরে ভাব চলে এসেছে? করিম সাহেবের কথা অনুসারে এই মেয়েটিও টাকা চুরি করে এবং নিজের ট্রাংকে গোপনে জমায়। মেয়েটিকে দেখে এটা ভাবতে বেশ কষ্ট হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমাকে বসতে বলছ?'

'জ্বি। আপনি একটু বসুন। আমাদের ভয় লাগছে।'

'কীসের ভয়?'

'বাথরুমে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন শব্দ করছে।'

'ইঁদুর-টিদুর হবে বোধ হয়।'

'জ্বি না। ইঁদুর না। অন্য কিছু।'

'অন্য কিছু কী?'

বড় মেয়েটি তার জবাব দিল না। ছোট মেয়ে দু'টি এ ওর দিকে তাকাতে লাগল। এদের কারোর নামই আহসানের জানা নেই। সবার নামই একই ধরনের। পাঁচটি একধরনের নাম মনে রাখা কষ্ট। আহসান বলল,

'চোর-টোর নাকি?'

বড় মেয়েটি বলল, 'জ্বি না, চোর না। সাদা কাপড় পরা একজন কে যেন বাথরুমে ঢুকল। আমি বাথরুমে গিয়ে দেখি কিছু নেই।'

'ভূত-প্রেত?'

মেয়েটি জবাব দিল না। আহসান বলল, 'বাবার ব্যাপারে তোমাদের মন দুর্বল হয়ে আছে, তাই এইসব দেখেছ। ঢাকা শহরে অনেক কিছুই আছে—ভূত নেই।'

'আমি এই সাদা কাপড় পরা মেয়েটাকে আগেও একদিন দেখেছি, ছাদে বসেছিল।'

'বল কী তুমি?'

মেয়ে তিনটি ভূতের ভয়েই মুখ শুকনো করে বসে আছে। বাবার অসুখের চেয়ে এই ভয়টিই বর্তমানে তাদের কাবু করেছে। ঠিক এই মুহূর্তে তারা সম্ভবত বাবার কথা ভাবছে না। আহসান বসল, ঠিক তখন সত্যি-সত্যি খট-খট শব্দ শোনা গেল ভেতর থেকে। দারুণ চমকে উঠল মেয়ে তিনটি। আহসান বলল, 'চল দেখে আসি।'

'আপনাকে কিছু দেখতে হবে না। আপনি এখানে খানিকক্ষণ বসুন। বেশিক্ষণ বসতে হবে না। জালাল মিয়া চলে আসবে।'

'জালাল মিয়া কে?'

'ট্রাকের ড্রাইভার।'

'ঠিক আছে আমি বসলাম। এত জায়গা থাকতে ভূতটা বাথরুমে গিয়ে বসে আছে কেন? এই রাত-দুপুরে গোসল করার তার কি দরকার পড়ল? বোধ হয় গরম লাগছে।'

একটি সহজ এবং সাধারণ রসিকতা। পরিস্থিতি হালকা করার জন্যে এ-রকম রসিকতা করা যেতে পারে। কিন্তু বড় মেয়েটি এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন খুব আহত হয়েছে। এই সাধারণ রসিকতাটিতে আহত হবার কী আছে? আহসান বলল,

'অন্য ভাড়াটেরা কেউ নেই?'

'জ্বি না।'

অন্য ভাড়াটেরা কেউ যে নেই এই তথ্যটি আহসানের জানা। দোতলার বাঁ-দিকের ভাড়াটে আসিক সাহেব তাঁর স্ত্রীকে দেশের বাড়িতে রেখে আসতে গিয়েছেন। ডান-দিকের ভাড়াটে বজলু সাহেব গত সপ্তাহে বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। বজলু সাহেবকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহসানের সবসময় ভালোমানুষ বলে মনে হত। কিন্তু লোকটি চলে যাবার পর জানা গেল সে বাথরুমের কমোড ভেঙে দু' টুকরা করেছে। একটি আয়না এবং রান্নাঘরের বেসিন ভেঙেছে। শোবার ঘরের জানালার সব ক'টি কাচ ভেঙেছে। এই কাজগুলো তাকে বেশ পরিশ্রম করে করতে হয়েছে বলাই বাহুল্য।

করিম সাহেব আহসানকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সব দেখালেন। তার মনে হল রাগের বদলে ভদ্রলোকের বিস্ময়টাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বার-বার বলছেন, 'এ-রকম কেন করল বলেন তো?'

'বলা মুশকিল। আপনার ওপর হয়ত রাগ আছে।'

'রাগ থাকবে কেন? আমাকে সবসময় চাচা-চাচা বলত। যাবার সময় পা ছুঁয়ে সালাম করল। আমি পনের দিনের ভাড়া নিই নাই।'

'দুনিয়ায় অনেক রকমের মানুষ আছে।'

'আমাকে ক্ষতি করিয়ে তার লাভ কি হল?'

'ক্ষতি করেছে এইটাই লাভ।'

'যদি কোনোদিন দেখা হয় আপনার সঙ্গে, তাহলে কথাটা জিজ্ঞেস করবেন? বলবেন—আমি মনে কষ্ট পেয়েছি। খুব কষ্ট।'

'দেখা হলে বলব। দেখা হবে না। এই জাতীয় লোকদের সঙ্গে দেখা হয় না।'

'তাও ঠিক। কি সমস্যায় পড়েছি বলেন তো দেখি। বাড়ি ঠিকঠাক না-করে ভাড়াও দিতে পারব না। ইংলিশ কমোড আর বেসিন ছিল। শখ করে কিনেছিলাম। আগে জানলে বাংলাদেশিটা কিনতাম।'

আহসান সিগারেট ধরাল। খালি পেটে সিগারেট টানতে ভালো লাগছে না। মুখ বন্ধ করে বারান্দায় বসে থাকাও বিরক্তিকর। বড় মেয়েটি এখন আবার কাঁদতে শুরু করেছে। কাঁদছে নিঃশব্দে। এবং খুব চেষ্টা করছে নিজেকে আড়াল করে রাখতে। ছোট মেয়ে দু'টি বোনের গা ঘেঁষে বসে আছে এবং এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে বোনের দিকে। এদের ভাব-ভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে এরাও কাঁদতে শুরু করবে। আহসানের কারণে সংকোচ বোধ করছে বলে কাঁদছে না।

রাস্তায় ট্রাকের আলো দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত জালাল মিয়া ট্রাক নিয়ে আসছে। মেয়ে তিনটি উঠে দাঁড়িয়েছে। গভীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। বড় মেয়েটি বলল, 'আপনি এখন যেতে পারেন, জালাল এসেছে।'

আহসান নিজের ঘরে চলে এল। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় মনে হল—জালাল কী খবর আনল জানা দরকার ছিল। অতি সাধারণ ভদ্রতা। কেন জানি ভদ্রতাটা করা হল না। মেয়েদের সঙ্গে আলাপে সে করিম সাহেবের প্রসঙ্গ আনে নি। এটাও অন্যায় হয়েছে। খুবই অন্যায়। এ্যাক্সিডেন্ট কীভাবে হল এইসব জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল।

দরজায় খুট-খুট শব্দে টোকা পড়ছে। আহসান দরজা খুলল, জালাল মিয়া দাঁড়িয়ে আছে।

'বিরক্ত করলাম প্রবেসার সাব।'

'না—বিরক্তের কিছু না। উনার খবর কি?'

'খবর খারাপ। মেয়েগুলিরে নিতে আসছি। রাতে আর ফিরব না। আপনারে বলে গেলাম। একটু লক্ষ রাখবেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রাখব, লক্ষ রাখব।'

'যা মুশকিলে পড়লাম ভাইজান—মেয়েগুলি খুব কানতেছে। আচ্ছা—যাই। আপনার কাছে সিগারেট আছে? থাকলে একটা দেন।'

প্যাকেটে দু'টি সিগারেট ছিল। আহসান প্যাকেটটাই হাতে তুলে দিল।

'বিপদের উপরে বিপদ—বুঝলেন প্রবেসার সাব। আমার হেল্পার ব্যাটারে কুত্তায় কামড় দিছে। পনরখান ইনজিকশন লাগে। কি সমস্যা চিন্তা করেন দেহি।'

সিগারেটের প্যাকেটটা দিয়ে দেওয়া ভুল হয়েছে। আহসানের ধারণা ছিল ড্রয়ারে একটা নতুন প্যাকেট আছে, এখন দেখা যাচ্ছে নতুন প্যাকেট নেই। পুরনো চিঠি-পত্র, একটা মোমবাতি, এক প্যাকেট নতুন দেয়াশলাই ছাড়া ড্রয়ার পুরোপুরি শূন্য। রাত বাজছে এগারটা পঁচিশ। সিগারেটের জন্যে হেঁটে-হেঁটে রাস্তার মোড় পর্যন্ত যেতে হবে। প্রায় বিশ মিনিটের পথ। যে পাগলা কুকুর ড্রাইভারের হেল্পারকে কামড়েছে সে নিশ্চয়ই এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা।

সুযোগ পেলে তাকেও কামড়াবে। পাগলা কুকুরের নিয়ম হচ্ছে সাত জনকে কামড়ানো। তারিন তাই বলত। অদ্ভুত-অদ্ভুত সব তথ্য তারিনের মাথায়। বিড়াল নাকি চোখ ফোটার আগে তার বাচ্চাকে সাত বাড়ি ঘুরিয়ে আনে। জোড় বাচ্চা রাখে না। যে বিড়ালের চারটা বাচ্চা সে একটাকে মেরে সংখ্যা বিজোড় করে ফেলে। কোত্থেকে সে এইসব যোগাড় করত কে জানে?

খিদে লেগেছে। ভাত খাবার পর একটা সিগারেট খাওয়া যাবে না—এই চিন্তাটি তাকে অস্থির করে তুলল। আকাশের অবস্থাও ভালো না। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড়-বৃষ্টির সময়। অথচ যেতে হবে ছাতা ছাড়া। প্রতি বর্ষাতেই তাকে একটি করে ছাতা কিনতে হয়। এবারের ছাতাটি সে গত সপ্তাহে কিনেছে। একদিন মাত্র ব্যবহার করেছে। তারপরই ছাতা নিখোঁজ। আরেকটি কিনতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এই বর্ষা ভিজেই কাটুক। আহসান খুলে ফেলা জুতো আবার পরতে বসল, সিগারেট না আনলেই নয়। নেশার জিনিস ফুরিয়ে গেলে খুব অস্থির লাগে।

জায়গাটার আসলেই একটা রহস্য আছে। গন্ধটা এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। সে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। যদি পাওয়া যায়। অপেক্ষাটা বিপজ্জনক—আকাশের অবস্থা বেশ খারাপ। বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে তুমুল বর্ষণ হবে। কিন্তু জায়গাটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কেন মাঝে-মাঝে চমৎকার একটা গন্ধ এ-জায়গাটায় পাওয়া যায়? কারো সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করলে হয়। আলাপের জন্যে বিষয়টি অবশ্যি খুবই তুচ্ছ। তবু মাঝে-মাঝে তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আলাপ করতে ইচ্ছে করে। চার বছর আগে তারিন ছিল। যেকোনো তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করা যেত তার সঙ্গে। চমৎকার সময় কাটত। একবার তারিন নিউমার্কেটে যাবার পথে দেখল একটা মহিষকে ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছে। সে বাসায় ফিরল দারুণ উত্তেজিত হয়ে।

'আজ একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম—মহিষকে ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছে।'

আহসান হাই তুলে বলল, 'এটা অদ্ভুত কিছু না। গরু-মহিষকে প্রায়ই ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে যায়। এরা হাঁটতে পারে না বলে এই ব্যবস্থা। তুমি যদি দেখতে একটা বাঘকে ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছে তাহলেও একটা কথা ছিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মহিষটা অসুস্থ না, খুবই সুস্থ।'

'সুস্থ হলে একে ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে যাবে কেন?'

তারিন হাসতে-হাসতে বলল, 'আমি জানি কেন নিয়ে যাচ্ছে। তুমি যদি বলতে পার তাহলে তোমার জন্যে পুরস্কার আছে।'

'কী পুরস্কার আগে বল।'

'না—আগে-ভাগে বলা যাবে না।'

'তুমি যদি একটি বিশেষ পুরস্কার আমাকে দাও তাহলে চেষ্টা করে দেখতে রাজি আছি।'

'কি অসভ্যতা করছ? ছি।'

'অসভ্যতা কি করলাম? আমি একটি বিশেষ পুরস্কারের কথা বলছি। এর বেশি তো কিছু বলি নি।'

'থাক তোমাকে কিছু বলতে হবে না।'

রাগ করে উঠে চলে যায় তারিন। সেই রাগ ভাঙাতে আহসানকে যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়। শেষ পর্যন্ত রাগ ভাঙে এবং আহসান অনুমান করতে চেষ্টা করে কেন মহিষটিকে ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছে।

'মহিষটার একটা পা ছিল খোঁড়া?'

'হল না।'

'গাড়ির নিচে পড়ে জখম হয়েছে, হাঁটতে পারছে না তাই--'

'হল না।'

'মহিষটা সম্ভবত বিয়ে করতে যাচ্ছে--'

'ফাজলামি করবে না—ঠিকমতো বল।'

'পারছি না। তুমি বলে দাও।'

'মহিষটার একটা ছোট্ট বাচ্চা আছে। বাচ্চাটা হাঁটতে পারে না বলে বাচ্চা এবং মা ঠেলাগাড়িতে করে যাচ্ছে। এই সহজ জিনিসটা বলতে পারলে না?'

'তুমি বলছ মহিষ। মহিষ হচ্ছে পুংলিঙ্গ। ম্যাসকুলিন জেন্ডার। আমি বুঝব কী করে এর একটা বাচ্চা আছে?'

'মহিষ-এর স্ত্রীলিঙ্গ কী?'

'মহিষী কিংবা মহিষিনী কিংবা মহিলা মহিষ।'

'ওমা তুমি জান না নাকি?'

'না, জানি না।'

'প্রফেসর মানুষ আর এই সাধারণ জিনিসটা তুমি জান না?'

'আমি কি বাংলার প্রফেসর নাকি যে জানব? আমি হচ্ছি যুক্তিবিদ্যার অধ্যাপক।'

'যুক্তিবিদ্যা তো তুমি আরো কম জান।'

'কী করে বুঝলে?'

'আমার সঙ্গে তো কোনো যুক্তিতেই তুমি পার না।'

অর্থহীন কথা। বলার জন্যেই কথা বলা। এর বেশি কিছু না। কিন্তু কি অপূর্ব ছিল সেই অর্থহীন কথাবার্তা। তারিন যদি আজ থাকত তাহলে নিশ্চয়ই এই হঠাৎ আসা গন্ধের রহস্য বের করে ফেলত। কোনো এক রাতে ঘুমুতে যাবার আগে কৃত্রিম একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাই তুলে বলত, 'গন্ধ–রহস্যের সমাধান হয়েছে।'

'কী সমাধান?'

'আজ বলা যাবে না ঘুম পাচ্ছে।'

'আহ্, বল না।'

'বললাম তো ঘুম পাচ্ছে।'

আরেকবার হাই তুলে এমন ভাব করত যাতে মনে হতে পারে সত্যি–সত্যি ঘুম পেয়েছে।

আহসান অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। ছোট ছোট কয়েকটি বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। রাত অনেক হয়েছে। বৃষ্টিবাদলা দেখলে দোকানপাট বন্ধ করে দোকানীরা বাড়ি চলে যাবে। মস্তান ধরনের ছেলেপুলে বোতল হাতে নিরিবিলি জায়গার খোঁজে আসবে এদিক দিয়েই। এটি মোটামুটি নির্জন অঞ্চল। ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে এ–রকম একটি ঘরে তাদের আসর বসবে।

এ–জাতীয় একটি দলের সামনে একবার আহসান পড়ে গিয়েছিল। রাত বেশি হয় নি, দশটা–সাড়ে দশটা। পাঁচ–ছ'টি ছেলের একটা দল একটি মেয়ের হাত ধরে টানতে–টানতে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটি যেতে চাচ্ছে না। ল্যাম্প–পোস্টের আলোয় মেয়েটিকে চমৎকার লাগছে। রোগা, লম্বা একটি মেয়ে, কচি মুখ। এ–সব ক্ষেত্রে কোনোরকম কথা না–বলাই বিচক্ষণতার লক্ষণ। কিন্তু আহসান, অসম্ভব সাহস দেখাল। কড়া গলায় বলল 'এ্যাই, কী ব্যাপার? কী হচ্ছে?'

দলটি থেমে গেল। মেয়েটি হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছে। যে তার হাত ধরে আছে সে চিকন গলায় বলল, 'আপনি যা ভাবছেন তা না ব্রাদার। ভদ্রঘরের মেয়ে না। ট্রিপ দেওয়া মেয়ে। জায়গায়–জায়গায় ট্রিপ দেয়। একসঙ্গে বেশি কাস্টমার দেখে ঘাবড়ে গেছে।'

বলার ভঙ্গিটি এতই কুৎসিত যে গা জ্বালা করে। কিন্তু জ্বালা করা পর্যন্তই। কিছুই করবার নেই। তবে ঐ মেয়েটি আজেবাজে ধরনের মেয়েই ছিল। কারণ আহসান দেখল মেয়েটি বেশ সহজভাবেই যাচ্ছে। তাকে আর আগের মতো টেনে–হিঁচড়ে নিতে হচ্ছে না। অল্প বয়সের এ–রকম সুশ্রী একটি মেয়ের একি দুর্দশা। মেয়েটি যেতে–যেতে একবার বলল, 'এমুন করেন ক্যান? যাইতেছি তো। সক্কাল সক্কাল ছাড়বেন কিন্তুক।'

এর উত্তরে ছেলেদের একজন কি বলল ঠিক বোঝা গেল না, তবে নিশ্চয়ই হাসির কিছু—মেয়েটি খিল–খিল করে হাসছে। অর্থহীন হাসি।

আহসান দু' প্যাকেট সিগারেট কিনল। সবকিছু বেশি–বেশি থাকাই ভালো। সিগারেটওয়ালার মুখে অসম্ভব বিরক্তি। শেষ সময়ে দু' প্যাকেট সিগারেট বিক্রি করেও তার বিরক্তি দূর হল না। টাকার ভাংতি হিসাব করছে এই জন্যেই কি বিরক্তি? নাকি তারও খিদে পেয়েছে, বাড়ি যেতে ইচ্ছা করছে; কিন্তু যেতে পারছে না, কারণ বিক্রি ভালো হয় নি। আহসান লোকটির বিরক্তি কমাবার জন্যে হালকা গলায় বলল,

'একটা পাগলা কুকুর নাকি বেরিয়েছে, জান নাকি?'

'জানি না।'

লোকটি মুখ আরো বিরস করে ফেলল। পাগলা কুকুর কেন, বাঘ বেরুলেও তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু যায়-আসে না।

আহসানের ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। একবার ঘরে ঢুকলে বেরুতে ইচ্ছে করে না, আবার বেরুলে ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করে না। অদ্ভুত অবস্থা। সকালে নাশতার কিছু নেই। নূর বেকারি খোলা। সে কলা এবং রুটি কিনল।

আজ সকালে ঘরে নাশতার কিছু ছিল না বলে, না খেয়ে কলেজে ছুটতে হয়েছে। দু'টি দেয়াশলাই কিনে টাকা দেবার সময় মনে পড়ল ড্রয়ারে পুরো এক প্যাকেট দেয়াশলাই দেখে এসেছে। কোন জিনিস আছে কোন জিনিস নেই তার কোনো হিসাব থাকছে না। যা নেই তা কেনা হচ্ছে না। যেটা আছে সেটাই কেনা হচ্ছে। হয়ত ঘরে গিয়ে দেখবে পাউরুটিও একটি পড়ে আছে।

নূর বেকারির ছেলেটিকে দেখে মনে হচ্ছে আলাপী। আহসান অন্তরঙ্গ সুর বের করল, 'একটা নাকি পাগলা কুকুর বের হয়েছে, জান কিছু?'

ছেলেটি জবাব দিল না। রাগী চোখে তাকাল। তুমি করে বলায় হয়ত রক্ত গরম হয়ে গেছে। মাস্টারি করে এই সমস্যা হয়েছে—সবাইকে ছাত্র মনে হয়।

খিদে জানান দিচ্ছে। আহসান খিদে-পেটেই সিগারেট ধরাল, ঠিক তখন হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামল। ধুম বৃষ্টি। এ-বৃষ্টি থামবে না। ধরন দেখেই বলে দেওয়া যায়—সারা রাত চলবে। দৌড়ে কোথাও দাঁড়ানোর কোনো মানে হয় না। শেষ পর্যন্ত কাকভেজা হয়েই বাসায় ফিরতে হবে। তবু বৃষ্টি নামলেই কোথাও দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। আহসান ছুটে গিয়ে দাঁড়াল মেসার্স রহমানিয়ার বারান্দায়। মাথার ওপর খানিকটা ছাদের মতো আছে। তাতে বৃষ্টি আটকাচ্ছে না। আশ্রয়ের খোঁজে আরো কিছু লোকজন এসেছে। একজন ভিখিরি, সঙ্গে ইঁদুরের বাচ্চার মতো কৃশ একটি বাচ্চা। বাচ্চাটি গভীর রাতেও জেগে আছে। চোখ বড়-বড় করে তাকাচ্ছে। একজন বুড়ো লোক যাকে প্রথম দৃষ্টিতে ভিখিরি মনে হলেও সে ভিখিরি নয়। কারণ তার হাতে একটি বাজারের থলে আছে। সেই থলের ভেতর থেকে লাউয়ের মাথা বের হয়ে আছে। ভিখিরির কাছে বাজারের থলে থাকে না। এই বুড়ো গভীর রাতে বাজার করে কোথায় ফিরছে কে জানে। একেকবার বৃষ্টির ঝাপটা আসছে আর এই বুড়ো থু করে থুথু ফেলছে।

কোণের দিকে প্রায় দেয়াল ঘেঁষে লম্বা রোগা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত ঐদিনকার সেই মেয়েটি। মেয়েটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে আলো নেই, মুখ দেখা যাচ্ছে না। মুখ দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে আবার হচ্ছেও না। থলে হাতে বুড়োটি মেয়েটির দিকে কয়েকবার তাকিয়ে ঝাঁজালোভাবে কিসব বলল। আহসান শুনতে পেল না। ভিখিরি মেয়েটি শুনল এবং হাসতে-হাসতে ভেঙে পড়ার মতো হল। ভিখিরির শিশুটি হয়ত তার মার হাসি শুনে অভ্যস্ত নয়। সে কেঁদে উঠল। ভিখিরিটির হাসি আর থামেই না। আহসানের বুকে ছোট্ট একটি ধাক্কা লাগল। তারিনের হাসির সঙ্গে এই মেয়েটির হাসির মধ্যে কোথায় যেন একটি মিল আছে। ধ্বনির মিল—যা মাথায় ঢুকে ঝন-ঝন করে বাজে। কেন জানি হাসি শুনতে ইচ্ছে করছে না। আহসান বৃষ্টি মাথায় করেই রাস্তায় নামল। আশ্চর্যের ব্যাপার, লম্বা মেয়েটিও তার সঙ্গে-সঙ্গে নেমে আসছে। আজ বোধ হয় বেচারীর ভাগ্যে কিছু জোটে নি।

একজনের সঙ্গে অন্য একজনের মিলের ব্যাপারটা বোধ হয় মনগড়া। আসলে তেমন কোনো মিল থাকে না। মিল কল্পনা করা হয়। আমরা একজনের চোখে অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজনের ছায়া দেখি। একজনের চুল অন্য একজনের চুলের কথা মনে করিয়ে দেয়। তারিনের মৃত্যুর পর–পর এই ব্যাপারে খুব ঘটত। হয়ত একটা মেয়ে রিকশা করে যাচ্ছে। হুড তোলা হয় নি, বাতাসে মেয়েটির চুল উড়ছে। সাধারণ দৃশ্য। তবু বুকের মধ্যে ধক করে উঠবে—আরে এই মেয়েটি তো তারিনের মতো। রিকশা চলে না-যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকতে হবে। বুকের কোন গহীন গোপনে ব্যথা ছলছলিয়ে উঠবে।

একবার ক্লাসে এ–রকম হল। সেকেন্ড ইয়ার অনার্স ক্লাস। এসথেটিকস পড়ানো হবে। রোল কল করা হচ্ছে। রোল ফিফটি এইট বলা মাত্র একটি মেয়ে বলল, 'প্রেজেন্ট স্যার।' আহসান হতভম্ব! আরে এর গলা তো অবিকল তারিনের গলার মতো।

আহসান সেই স্বর দ্বিতীয় বার শোনার জন্যে আবার বলল, 'রোল ফিফটি এইট।'

'প্রেজেন্ট স্যার।'

আবার শুনতে ইচ্ছে করছে। একটা রোল তিনবার ডাকা যায় না। আহসান বলল, 'রোল ফিফটি এইট তুমি এত এ্যাবসেন্ট থাক কেন?'

'স্যার, আমি তো এ্যাবসেন্ট থাকি না।'

'ও আচ্ছা। আমার ভুল হয়েছে—বস।'

মেয়েটি বসে পড়ল। সে বেশ বিব্রত বোধ করছে। তার দু' পাশের বান্ধবীরা মুখ টিপে হাসছে। একজন সম্ভবত পেনসিল দিয়ে খোঁচাও দিল। এ–কালের মেয়েগুলি ফাজিলের চূড়ান্ত। সহজ কথারও তিন রকম অর্থ করে মজা পায়।

বৃষ্টি যতটা জোরাল মনে হচ্ছিল ততটা জোরাল নয়। কুয়াশার মতো পড়ছে। বাসা পর্যন্ত যেতে মাথা সামান্য ভিজবে, এর বেশি কিছু হবে না। ঝম–ঝম বৃষ্টি হলে মন্দ হত না। অনেকদিন ধুম বৃষ্টিতে ভেজা হয় না।

মেয়েটি আসছে তার পিছনে–পিছনে। স্যান্ডেল খুলে হাতে নিয়েছে, পা ফেলছে খুব সাবধানে। এর বাড়ি বোধ হয় আশেপাশে কোথাও হবে। একা–একা যেতে ভয় পাচ্ছে বলে সঙ্গে আসছে। আসুক ক্ষতি তো কিছু নেই। এত সাবধানতায়ও কাজ দিল না। মেয়েটি পা পিছলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। অন্ধকারে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে সে যে কাদায় মাখামাখি হয়েছে এটা বোঝা যাচ্ছে। এগিয়ে এসে হাত ধরে তোলার কোনো অর্থ হয় না। আবার পাশ–কেটে চলে যেতেও খারাপ লাগে।

এই জাতীয় মেয়ের সংখ্যা শহরে দ্রুত বাড়ছে। কলেজের ইসমাইল সাহেবের ধারণা শহরটা প্রসটিটিউটের শহর হয়ে যাচ্ছে। ইসমাইল সাহেব লোকটি বেশ রসিক। যাই বলেন শুনতে ভালো লাগে।

'বুঝলেন সাহেব, ঐ–রকম একজনের পাল্লায় পড়েছিলাম। রাত দশটার মতো বাজে। আমার ভায়রার বাসায় বেড়াতে যাচ্ছি ঝিকাতলা। একটু ভেতরের দিকে। রিকশা ছেড়ে দিয়ে হাঁটছি, তখন এই মেয়েটা এসে উপস্থিত। নরম গলায় বলল,

'আজ রাতটা কি আপনি আমাকে থাকতে দিতে পারেন?'

'আমি তো বুঝতেই পারি নাই রে ভাই। কচি চেহারা, ভদ্র সাজ–পোশাক।'

'আপনি কী বললেন?'

আমি বললাম, 'কী অসুবিধা তোমার?'

জিওগ্রাফির মনসুর সাহেব চাপা হাসি হেসে বললেন, 'মা বলে ডাকলেন না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার তো আবার মেয়েদের মা ডাকার একটা প্রবণতা আছে।'

'না—মা ডাকি নি। কলেজের মেয়েগুলিকে মা বলি। বাইরে বলি না। তারপর কি হল শোনেন—আমি বললাম, কী অসুবিধা তোমার? ...সে বলল, অনেক অসুবিধা। বলেই হাসল, 'তখনই ব্যাপারটা বুঝলাম।'

'কি করলেন?'

'পাঁচটা টাকা দিলাম। টাকাটা নিল না। তখনই বুঝলাম ভালো ফ্যামিলির মেয়ে, ছ্যাঁচড়া ধরনের হলে নিত।'

মনসুর সাহেব বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'আপনার মনের অবস্থাটা তখন কী হল বলুন।'

'কী আবার হবে। কিছু হয় নি—একটু স্যাড ফিল করেছি।'

'শুধুই স্যাড আর কিছু না? একবারের জন্যেও কি মনে হয় নি এই মেয়েটির সঙ্গে কিছু সময় কাটালে কি আর এমন ক্ষতি হবে? ঘরে ফিরলে সেই তো বাসি স্ত্রী। অর্থের বিনিময়ে টাটকা একজন তরুণীর সঙ্গ—মন্দ কি?'

'কী-সব বাজে কথা বলছেন মনসুর সাহেব?'

'বাজে কথা একেবারেই বলছি না। নিতান্ত সত্যি-সত্যি কথাটা বলছি। হার্ড ট্রুথ।'

'নিজেকে দিয়ে সবাইকে বিচার করবেন না।'

'নিজেকে দিয়ে বিচার করছি না—আপনাকে দিয়েই আমি আপনাকে বিচার করছি। এই যে মেয়েগুলিকে আপনি মা মা ডাকেন, তার পিছনে কি অন্য কিছু কাজ করে না? মা বলে সহজেই একজনের পিঠে হাত রাখতে পারছেন। স্পর্শের আনন্দটুকুর জন্যে আপনি মা ডাকছেন। আমি খুব ভুল বলছি?'

ইসমাইল সাহেব স্যান্ডেল খুলে মনসুর সাহেবকে মারতে গেলেন। কেলেঙ্কারি ব্যাপার। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পর্যন্ত জিনিসটা গড়াল। প্রিন্সিপ্যাল দার্শনিকের মতো বললেন, 'মেয়েমানুষ কী জিনিস দেখলেন। সামান্য মেয়েমানুষের কথা থেকে স্যান্ডেল নিয়ে ছোটাছুটি। এই খবর বাইরে লিক হলে টিচার্স কম্যুনিটি হিসাবে আমাদের স্থান কোথায় হবে বলেন দেখি? আপনাদের মতো হাইলি এডুকেটেড লোক যদি ......

বৃষ্টি এবার বড় বড় ফোঁটায় পড়তে শুরু করেছে। আহসান তার পাউরুটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ভেজা পাউরুটি নিয়ে ঘরে ফেরার কোনো অর্থ হয় না। মেয়েটিকে পাউরুটিটা দিয়ে দিলে কেমন হয়? চিন্তাটা মাথায় আসায় আহসান অস্বস্তি বোধ করছে। হঠাৎ একটা পাউরুটি দেওয়ার কথা তার মনে হল কেন? কেন সে পাউরুটি দিতে চাচ্ছে?

মেয়েটি অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে কী যেন খুঁজছে। তার মধ্যে এক-ধরনের ব্যাকুলতা। কিছু বলবে না বলবে না ভেবেও আহসান বলল, 'কি খুঁজছ?' বলেই সে নিজে চমকে উঠল। সে কি খুঁজছে না খুঁজছে তা নিয়ে আহসানের মাথাব্যথা কেন?

মেয়েটি খোঁজা বন্ধ করে আহসানকে দেখছে। জায়গাটা অন্ধকার, সে নিশ্চয়ই কিছু দেখতে পাচ্ছে না। মেয়েটি নিচু গলায় বলল, 'আমার স্যান্ডেল খুঁজতেছি।'

'তুমি কি এই দিকে থাক?'

'না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কোথায় থাক?'

মেয়েটি জবাব দিল না। ধুম বৃষ্টি চলছে। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। কিন্তু সে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যাতে মনে হতে পারে সে অপেক্ষা করছে মেয়েটির জন্যে।

'স্যান্ডেল পাওয়া গেছে?'

'না।'

'নাম কি তোমার?'

'রেবা।'

এটা নিশ্চয়ই ছদ্মনাম। আসল নাম অন্য কিছু। ঠিক নামটি এরা কখনো বলে না।

'এটা তোমার ঠিক নাম?'

'না।'

আহসান পা বাড়াল। আশ্চর্য মেয়েটিও আসছে। আহসান থমকে দাঁড়িয়ে গেল। শীতল গলায় বলল, 'আমার সঙ্গে-সঙ্গে আসছ কেন?'

মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু আবার হাঁটতে শুরু করল, আহসানের পাশে পাশে আসছে। দু' জন মানুষ পাশাপাশি হাঁটছে অথচ কেউ কোনো কথা বলছে না। জায়গায়-জায়গায় পানি জমে আছে। পা পড়তেই ছপ-ছপ শব্দ হচ্ছে। চারদিকে ব্যাঙ ডাকছে। জায়গাটা পুরোপুরি গ্রামের মতো হয়ে গেছে। ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে নিকষ অন্ধকার। তারিনকে নিয়ে একবার ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আঠারবাড়ি স্টেশন থেকে হেঁটে-হেঁটে কুতুবপুর যেতে হয়েছিল। কি ফুর্তি তার। আহসান বার বার বলছিল, 'হাত ধরে হাঁট, পিছলে পড়বে।'

তারিন হাসতে-হাসতে বলেছে, 'পিছলে পড়লে একা পড়ব। তোমার হাত ধরে থাকলে তুমিও পড়বে। দু' জন পড়লে লাভ কি বল?' তার কথা শেষ হবার আগেই আহসান নিজে পিছলে পড়ল। তারিনের হাসি আর থামেই না।

'আহ কী করছ? লোকজন জড়ো হবে।'

'হোক জড়ো। হাসার সময় হাসব। কাঁদার সময় কাঁদব।'

সত্যি-সত্যি। তারিনের হাসিতে লোকজন এসে পড়ল। তারা কিছুতেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে যেতে দেবে না। তারিন যাবেই। শেষ পর্যন্ত একদল লোক সঙ্গে নিয়ে রওনা হতে হল। একজন একটি ছাতা ধরে থাকল তারিনের মাথায়। একটা টর্চ-লাইটও যোগাড় হয়েছিল। টর্চ-লাইটধারী আগে-আগে আলো ফেলতে লাগল। তারিনের আনন্দ পুরোপুরি মাঠে মারা গেল। এইসব যেন অন্য কোনো জন্মের কথা। এই জন্মের নয়। এই জন্মে লম্বা রোগা একটি মেয়ে তার সঙ্গে-সঙ্গে আসছে। তার একহাতে একটিমাত্র স্যান্ডেল অন্য স্যান্ডেলটি সে খুঁজে পায় নি। হয়ত দিনের বেলা গিয়ে খুঁজবে। সেইজন্যেই এটি সে সঙ্গে করে আনছে।

'এই মেয়ে?'

'হুঁ।'

'তুমি আমার সঙ্গে-সঙ্গে আসছ কেন? স্টপ। আসবে না। যত বাজে ঝামেলা। বাড়ি যাও।'

এই জাতীয় মেয়েরা কত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকে কে জানে। এরা কি একা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাই বাড়ি ফেরে, না কেউ এসে নিয়ে যায়? হয়ত বাড়ি থেকে কেউ এসে নিয়ে যায়। কিংবা কোনো রিকশাওয়ালার সঙ্গে ঠিকঠাক করা থাকে। এরা এসে বাড়ি নিয়ে যায়। আজ ঝড়-বৃষ্টির জন্যে কেউ আসে নি।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। এখন আর পিছনে-পিছনে আসছে না। মেয়েটি একা-একা কোথায় যাবে? আহসান ঠাণ্ডা গলায় বলল,

'বাড়ি চলে যাও। আমার পিছনে-পিছনে এসে লাভ হবে না। বাড়ি যেতে পারবে না একা-একা?'

মেয়েটি জবাব দিল না।

'বাসা কোথায় তোমার?'

'কল্যাণপুর।'

'রিকশা এখন পাবে না। যাবে কীভাবে?'

মেয়েটি উল্টোদিকে ফিরে হাঁটতে শুরু করল।

'এ্যাই শোন। এ্যাই।'

মেয়েটি ফিরল না। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। যাক যেখানে ইচ্ছে। আহসান হাঁটতে শুরু করল। ঠাণ্ডায় গা কাঁপছে, নির্ঘাৎ জ্বর আসবে। বাড়ির গেট পর্যন্ত এসে একবার পিছনে তাকাল।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বিদ্যুতের আলোয় দেখা যাচ্ছে মেয়েটি রাস্তার একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সে হয়ত ভাবছে এই লোকটি আবার তাকে ডাকতে আসবে। কিংবা একা-একা ফিরে যেতে সে ভয় পাচ্ছে।

আহসান তাকে সত্যি-সত্যি ডাকল। কেন ডাকল তা সে নিজেই জানে না। এই মেয়েটির গলার স্বর তারিনের মতো শুধু এই কারণে, নাকি সে ঝড়-বৃষ্টির রাতে নারী কামনা করছে?

তারিনের শাড়ি মেয়েটিকে পরতে দেওয়া উচিত হয় নি। খুব অন্যায় হয়েছে। অন্যায়ের ব্যাপারটা অনেকটা চেইন রি-একশনের মতো। একটি অন্যায় করলেই পর-পর অনেকগুলো করতে হয়।

মেয়েটি বৃষ্টিতে ভিজছিল, এত রাতে কোথায় কীভাবে যাবে, শুধু এই ভেবেই কি আহসান তাকে ডেকেছে? তার অবচেতন মনে কি অন্য কিছু লুকিয়ে আছে? থাকাটাই কী স্বাভাবিক নয়? এই নির্জন বাড়ি, বৃষ্টির রাত, সুশ্রী চেহারার একটি মেয়ে, আহসানের মাথা ধরে গেল।

'ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পড়েছিলে, যাবার জায়গা নেই এই-জন্যেই তোমাকে এনেছি। অন্য কিছু নয়।'

মেয়েটি কিছু বলল না। কিন্তু আহসানের মনে হল মেয়েটি ঠোঁটের ফাঁকে একটু যেন হাসল। আহসানের কথা ঠিক বিশ্বাস করল না। শুধু কি এই মেয়ে? আহসান নিজেও কী নিজের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে? তারিনের হালকা সবুজ শাড়িতে মেয়েটিকে সত্যি-সত্যি চমৎকার লাগছে। কত বয়স হবে মেয়েটির? আঠার, উনিশ নাকি তার চেয়েও কম? তারুণ্যের আভা চোখে-মুখে। চোখের কোলে অবশ্যি কালি পড়েছে। তাতে আরো চমৎকার লাগছে। মেয়েটি কী মনে করে মাথায় ঘোমটা তুলে দিল। এটা সে কেন করল কে জানে। এখন বউ-বউ একটা ভাব মেয়েটির মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে এসেছে। বউ মানেই তো কোমল একটা ব্যাপার। স্বপ্ন এবং কল্পনা মেশানো ছবি।

আহসান বলল, 'আমি এখন ভাত খাব। তুমি কি খাবে?'

'না।'

'খেতে চাইলে খেতে পার। রাতে খেয়েছ কিছু?'

'না।'

'তাহলে খাবে না কেন?'

মেয়েটি কিছু বলল না। আহসানের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল। ভালো লাগল দেখতে। কিন্তু এই হাসি তৈরি হাসি। মানুষ ভোলানো হাসি। যেকোনো পুরুষের কাছে গিয়েই এই মেয়ে এমন সুন্দর করে হাসে। তা-ই নিয়ম।

'তুমি এমন ঠোঁট টিপে হাসছ কেন?'

'মেয়েটি জবাব দিল না। কৌতূহলী চোখে চারদিকে দেখতে লাগল। তার দৃষ্টি আটকে গেল পড়ার টেবিলে রাখা চীনামাটির পুতুলটির ওপর। তারিনের পুতুল। বিয়ের পর সে অল্প যে-সব জিনিস বাবার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে এটি তার একটি। তারিনের খুব শখের জিনিস।

ভাত-তরকারি ঠাণ্ডায় প্রায় জমে যাবার মতো হয়ে আছে। আহসান কেরোসিনের চুলা ধরাল। গরম না-করে কিছু মুখে দেওয়া যাবে না। মেয়েটি পিছনে-পিছনে এসেছে, দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

'এই বাড়িতে আর কেউ থাকে না?'

প্রশ্নটি সে করল এমনভাবে যেন জবাবের জন্যে তার কোনো আগ্রহ নেই। আহসান ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'না।'

'রান্না করে কে?'

'একটা কাজের মেয়ে আছে। সে রান্না করে দিয়ে যায়। আমি এখানে শুধু রাতে খাই। দিনে বাইরে খাই। হোটেল-টোটেলে খেয়ে নিই।'

এতগুলো কথা মেয়েটিকে বলার দরকার ছিল কি কোনো? কোনোই দরকার ছিল না। কিন্তু তবু সে বলেছে। কেন বলল?

পেটে খিদে থাকলে এস খাও।

মেয়েটি এল। তার সম্ভবত প্রচুর খিদে ছিল। খুব আগ্রহ করে খেতে লাগল। খাবার সময়টায় একবারও আহসানের দিকে তাকাল না। এখনো মাথায় ঘোমটা।

'তোমার কি যেন নাম?'

'পারুল।'

'আগে তো বলেছিলে রেবা? কোনটা তোমার আসল নাম?'

'পারুল।'

'শোন পারুল, তুমি সকাল হলেই এখান থেকে চলে যাবে এবং আর কোনোদিন আসবে না।'

'আচ্ছা।'

'রোজই কি তুমি রাতে বের হও?'

'না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার বাসায় কে–কে আছে?'

'মেয়েটি জবাব দিল না।'

'এই যে আজ রাতে বাসায় ফিরলে না। বাসার লোকজন চিন্তা করবে না?'

'না।'

'বাসায় তোমার কে–কে আছে?'

মেয়েটি জবাব দিল না। একবার শুধু মুখ তুলে তাকাল।

'সংসার আছে? অর্থাৎ স্বামী পুত্র কন্যা—এরা কেউ?'

মেয়েটি উত্তর না দিয়ে থালা হাতে উঠে পড়ল। তার খাওয়া হয়ে গেছে। আহসান বলল, 'থালা–বাসন ধোয়ার দরকার নেই। সকালে রহিমার মা এসে ধোবে। রেখে দাও ওখানে।'

মেয়েটি রাখল না। অনেকখানি সময় নিয়ে নিজের প্লেট পরিষ্কার করল।

'বললাম না এগুলো ধোয়ার দরকার নেই। রেখে দাও। এস আমার সঙ্গে। ঘুমুবার জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

মেয়েটি উঠে এল।

'এই ঘরে শোবে। মশারি–টশারি সবই আছে। তোমার যদি আগে ঘুম ভাঙে আমাকে ডাকবে। আমি গেট খুলে দেব। বাসায় চলে যাবে।'

'আচ্ছা।'

'দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়।'

মেয়েটি অবাক হয়ে বলল, 'আপনার আর কিছু লাগবে না?'

'না লাগবে না। তুমি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ কর। নিচে ছিটকিনি আছে। আহ দেরি করছ কেন ছিটকিনি লাগাও।'

'আপনি কি আমার উপর রাগ করলেন?'

'না, রাগ করি নি। রাগের কোনো ব্যাপার না। ছিটকিনি দাও। সকালে উঠে চলে যাবে।'

ছিটকিনি পড়ার শব্দ হল।

জালাল মিয়া ট্রাক নিয়ে এসেছে মনে হচ্ছে। একটু আগে ট্রাকের শব্দ পাওয়া গিয়েছিল এখন কোলাপসিবল গেটের তালা খোলার শব্দ আসছে।

করিম সাহেব নিজে এই তালাটি রাত দশটার দিকে লাগিয়ে দেন। সব ভাড়াটেদের কাছে এর একটা চাবি আছে। দশটার পর এলে নিজেদের চাবিতে গেট খুলতে হয়।

জালাল মিয়া একা আসে নি আরো লোকজন এসেছে। কান্না–কাটির কোনোরকম আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে করিম সাহেব এখনো টিকে আছেন। নিচে একবার যাওয়া উচিত কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না। বৃষ্টি কমে আসছে। বাতাসের বেগও কমছে। ঘটাং–ঘটাং করে জানালার একটা পাট এতক্ষণ নড়ছিল। এখন আর নড়ছে না।

পরপর তিনটি সিগারেট শেষ করে আহসান ঘুমুতে গেল। তার ধারণা ছিল—ঘুম আসবে না, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হবে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার শোয়ামাত্রই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। রোদে ঝলমল করছে চারদিক। ঘড়িতে বাজছে ন'টা। চমৎকার সকাল। মন ভালো করে দেবার মতো চমৎকার।

আশ্চর্যের ব্যাপার মেয়েটি তাকে কিছু না বলেই চলে গেছে। বিছানা পরিপাটি করে গোছানো। পরনের শাড়ি ভাঁজ করে আলনায় রাখা। বারান্দায় এক পাটি স্যান্ডেল ছিল সেটিও নেই। মেয়েটি গেট দিয়ে বেরুবার সময় কেউ কি দেখেছে? আহসানের অস্বস্তির সীমা রইল না। একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল।

একতলায় কে যেন রেডিও চালিয়েছে। শিল্প-সাহিত্য নিয়ে কেউ একজন এক ঘেঁয়ে গলায় ভ্যাজর-ভ্যাজর করছে।

ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যজনক। যে-বাড়ির প্রধান ব্যক্তিটি হাসপাতালে মর-মর সে-বাড়িতে শিল্প-সাহিত্য শুনবার জন্যে কেউ রেডিও খুলবে এটা ভাবা যায় না। আহসান বারান্দায় এসে দাঁড়াল। রেডিও বন্ধ হয়েছে। কেউ বোধ হয় মনের ভুলে সুইচ টিপেছিল।

এ-রকম হয়। তারিন মারা যাবার পর ঠিক এই জিনিসই হয়েছিল। হাসপাতাল থেকে আহসান একটা বেবিটেক্সি নিয়ে চলে গেল ঝিকাতলার বাসায়। সেই সময় বাসায় আসার তার কোনোই প্রয়োজন ছিল না। কেন যে এসেছে সে সম্পর্কে তার ধারণাও স্পষ্ট নয়। পাশের বাড়ির নীলা ভাবি বললেন, 'হাসপাতাল থেকে আসছেন নাকি ভাই? খবর আছে কিছু?'

আহসান কিছু বলল না। নীলা ভাবি বললেন, 'বুঝতে পারছি আনন্দের কোনো খবর এখনো হয় নি। এত যখন ঝামেলা হচ্ছে তখন ছেলে হবে। ছেলেগুলো বড্ড ঝামেলা করে রে ভাই। সহজে পৃথিবীতে আসতে চায় না।'

আহসান জবাব না দিয়ে ঘরে ঢুকল। কাজের একটি বার-তের বছরের মেয়ে ছিল, তাকে চা বানাবার কথা বলে সে শোবার ঘরের খাটে বসে রইল। তার নিজেরও খেয়াল নেই কখন সে বিছানার ওপর রাখা ক্যাসেট প্লেয়ারটি চালু করেছে। কি একটা হিন্দি গান হচ্ছে। যেখানে 'ছুপ ছুপ কে' এই কথাগুলো বারবার আছে। কাজের মেয়েটি চা এনে জিজ্ঞেস করল, 'ভাইজান, আইজ হাসপাতালও খাওন নিবেন?'

ঠিক তখনই সমস্ত ব্যাপারটার অস্বাভাবিকতা আহসানের কাছে ধরা পড়ল। ক্যাসেটে গান হচ্ছে। চিকন গলায় একটি মেয়ে এবং মোটা গলায় একটি ছেলে খুব রহস্যময় ভঙ্গিতে গাইছে 'ছুপ ছুপ কে'। আহসান ক্যাসেট বন্ধ করল না। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'জাহানারা, খারাপ খবর আছে। তোর ভাবি মারা গেছে। এই কিছুক্ষণ আগে।'

জাহানারা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। আহসান চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'চিনি দিয়ে তো সরবত বানিয়ে ফেলেছিস। এককাপ চা-ও ঠিকমতো বানাতে পারিস না। যা নতুন করে বানিয়ে আন।'

জাহানারা অবিশ্বাসী গলায় বলল, 'ভাবি মারা গেছে? কী কন ভাইজান!'

'হুঁ। ছেলেটা ভালো আছে। ছেলে হয়েছে একটা। বলেছি?'

আহসান উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়ল। হাত বাড়িয়ে ক্যাসেটটা বন্ধ করে সহজ গলায় বলল, 'ভালো করে চা বানিয়ে আন। অনেক রকম ঝামেলা আছে।'

জাহানারা প্রায় দৌড়ে গেল রান্নাঘরে। কিছুক্ষণ পর শোনা গেল সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বড্ড বিরক্ত লেগেছিল কান্না শুনে। ইচ্ছে করছিল উঠে গিয়ে কড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ধমক দিতে। ধমক দেওয়া হয় নি। কিছুক্ষণ পর জাহানারা চা নিয়ে এল। সেই চা-ও মুখে দেওয়া যায় নি। আগের বারের মতো চিনি দিয়ে সরবত। গরম করেছে আগুনের মতো। মুখে দিতেই জিব পুড়ে গেল।

আজ এ-বাড়িতেও হয়ত তাই হয়েছে। অবশ্যি কান্নার কোনো শব্দ আসছে না। ভদ্রলোকের পাঁচ মেয়ে। কিছু একটা হলে এরা কেঁদে বাড়ি মাথায় তুলবে। ঘন-ঘন ফিট-টিট হবে। আত্মীয়-স্বজনে বাড়ি গিজ-গিজ করবে। হৈ-চৈ চেঁচামেচি। মৃত্যু যেমন কুৎসিত, তার পরবর্তী ব্যাপারগুলো তার চেয়েও কুৎসিত।

এ-বাড়িতে কুৎসিত অংশগুলো এখনো শুরু হচ্ছে না। তবে শুরু হতে কতক্ষণ। যেকোনো সময় শুরু হয়ে যাবে। তার আগে একবার গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসা দরকার। এটা হচ্ছে সামাজিকতা। করুণ মুখে খোঁজ-খবর করতে হবে। একবার হাসপাতালে যেতেও হতে পারে।

বসার ঘরের কলিংবেল টিপতেই অপরিচিত একজন মাঝবয়েসী মহিলা বের হয়ে এলেন। বিরক্ত মুখে বললেন, 'কারে চান?'

'করিম সাহেবের মেয়েরা কেউ আছে?'

'কোন মেয়েরে চান?'

'বড় মেয়ে কিংবা অন্য কেউ।'

'আপনে কে?'

'আমি তিনতলায় থাকি। ইনাদের ভাড়াটে। আমার নাম আহসান।'

'আচ্ছা। বুঝেছি। বসেন।'

আহসান বসতে-বসতে বলল, 'করিম সাহেবের খবর নিতে এসেছি। উনার খবর কি? কেমন আছেন এখন?'

'ভালো না। অবস্থা খুবই খারাপ। আপনে বসেন, বেগমেরে ডাক দেই। ও বেগম, বেগম।'

এই যুগে মেয়েদের নাম কেউ বেগম রাখে? কি অদ্ভুত নাম এ-বাড়ির মেয়েদের—বেগম, শাহাজাদী, মহল। মহল হচ্ছে তিন নম্বর মেয়েটি। এই মেয়েটি বড় দু'বোনের মতো নয়। একটু অন্যরকম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-নামতে দেখা হয়ে গেলে বড় দু'বোনের মতো শক্ত হয়ে যায় না। বরং হাসি-হাসি মুখে তাকায়। মাঝে-মধ্যে দু'-একটা কথা-টথাও হয়। যেমন, আহসান যদি বলে, 'কি ভালো?' সে লাজুক স্বরে বলে, 'জ্বি।'

'যাওয়া হচ্ছে কোথায়? ছাদে?'

'জ্বি। আচার শুকাতে।'

'ভালো। বেশি করে আচার শুকাও। আচার ভালো জিনিস।'

সন্ধ্যাবেলা ওদের কাজের মেয়ে বাটি ভর্তি আচার নিয়ে উপস্থিত। আহসান চমকে উঠে বলেছে, 'আচার কী জন্যে?'

'মহল আপা পাঠাইছে।'

'আমি তো আচার খাই না।'

'ও আল্লা, মহল আপা কইছে আপনে চাইছেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে না। খাই না যে জিনিস সেটা শুধু-শুধু চাইব কেন?'

কাজের মেয়েটি বাটি ফিরিয়ে নিয়ে গেল। আহসান খানিকটা বিরক্তই হল। মহল মেয়েটির বুদ্ধি-শুদ্ধি সে-রকম নেই। বুদ্ধি যে কম তার আরেকটি প্রমাণ আছে। একবার নিউমার্কেটে দেখা। সে তার অন্য দুই বোনের সঙ্গে গিয়েছে। বোরকা নেই। তিন বোন হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। দৃশ্যটি অদ্ভুত। এত বড় বড় তিনটি মেয়ে হাত ধরাধরি করে হাঁটবে কেন? আহসানকে দেখে তিনজন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। এটিও অস্বাভাবিক। মহল নিজেকে সামলে নিয়ে এগিয়ে এসে বলল, 'আমরা শাড়ি কিনতে এসেছি।'

'বেশ তো।'

'তিনজন একরকম শাড়ি কিনব।'

'ভালো।'

'আপনি একটু আসবেন আমাদের সঙ্গে?'

'কেন? আমাকে দরকার কেন?'

'আপনি যেটা বলবেন সেটা কিনব।'

'তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো কিনবে। আমি বলব কেন?'

'আপনি আসলে বেগম আপা কিছু বলবে না।'

'আরে না তোমরা তোমাদের মার্কেটিং কর। আমি অন্য কাজে এসেছি।'

মহল ফিরে গিয়ে আবার দু'বোনের হাত ধরল।

এদের তিন বোনের মধ্যে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে ওদের মধ্যে মিলের অংশটুকু। তিনজন দেখতে একরকম। একই রকম লম্বা। গলার স্বরও একধরনের। যতবার একসঙ্গে বাইরে যায় হাত ধারাধরি করে হাঁটে। মাঝখানে মহল দু' পাশে দু' বোন।

বাবা মারা গেলে এরা বোধ হয় একই রকম ভঙ্গিতে জড়াজড়ি করে কাঁদবে। এই চিন্তা মাথায় আসায় আহসানের একটু খারাপ লাগছে। একটি পরিবারের এত বড় দুঃসময়ে এমন কথা কী করে সে ভাবল?

আহসানকে বেশ খানিকক্ষণ বসতে হল। আগের সেই মহিলা এক পেয়ালা চা এবং পিরিচে করে দুধেভর্তি এক পিরিচ সেমাই দিয়ে গেলেন। সেমাইয়ের পিরিচে চামচ নেই। খেতে হলে বিড়ালের মতো চুক-চুক করে খেতে হবে।

'একটু বসেন। বেগম আসতাছে।'

'ঠিক আছে বসছি।'

'আমি বেগমের দূর সম্পর্কের ফুপু। বেগমের আব্বা আমার মামাতো ভাই।'

'ও আচ্ছা।'

ভদ্রমহিলা বসলেন সামনের সোফায়। কৌতূহলী চোখে তাকে দেখতে লাগলেন। আহসান অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। রেবা মেয়েটিকে এরা কি যেতে দেখেছে? দেখাই স্বাভাবিক।

'আপনের কথা মহলের কাছে শুনেছি।'

'কি শুনেছেন?'

'আপনের স্ত্রী মারা গেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঠিকই শুনেছেন।'
'একটা ছেলে আছে আপনের?'
'হ্যাঁ আছে।'
'কার সাথে থাকে?'
'ওর মামার বাড়িতে থাকে। ধানমণ্ডি।'
'মহল বলছে আপনি কোনোদিন ছেলেকে এই বাড়িতে আনেন নাই।
'ছোট ছেলে। মাত্র চার বছর বয়স।'
'চার বছর ছোট হবে কেন? চার বছরের বাচ্চাতো অনেক বড়। তার নাম কি?'
'মারুফ।'
'সেমাইটা খান। সেমাই ভালো হইছে।'
'সেমাই খেতে ইচ্ছে করছে না।'
'আপনে খাওয়া–দাওয়া হোটেলে করেন?'
'একবেলা হোটেলে করি। একবেলা এখানে খাই।'
'মহল বলেছে আমাকে।'
'মহল দেখি অনেক খবর রাখে।'

এই কথাটিতে ভদ্রমহিলা খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন। আহসান বলল, 'আমার একটু বাইরে যেতে হবে। আমি পরে এসে খোঁজ নেব। ডাক্তাররা কী বলেছেন?'

'আর ডাক্তার। ডাক্তারের হাতে এখন নাই। এখন আল্লাহ্‌র হাতে।'

বেগম এসে ঢুকল। তার দেরির কারণ বোঝা যচ্ছে। সে গোসল করেছে। রাত জাগার ক্লান্তি তাতে দূর হয় নি। চোখ লাল হয়ে আছে। বেগমের হাতে একটি চামচ। চামচ নিয়েই সে নিশ্চয়ই আসে নি। পর্দার ফাঁক দিয়ে প্রথমে দেখে গিয়ে চামচ নিয়ে এসেছে।

বেগম বসল না।

আহসান বলল, 'করিম সাহেবের অবস্থা এখন কেমন?'

'আগের চেয়ে ভালো। শেষরাতে জ্ঞান হয়েছে। কথাটথা বলেছেন।'

'তাই নাকি।'

'জ্বি।'

আহসান বড়ই অবাক হল। ভদ্রমহিলার কথার সঙ্গে এই মেয়ের কথার কোনো মিল নেই।

'তোমার অন্য বোনেরা কি হাসপাতালে?'
'জ্বি। আমি গেলে ওরা আসবে। ভাত খাওয়ার জন্যে আসবে।'
'তোমার মা? উনি কোথায়?'
'উনি হাসপাতালে।'
'আচ্ছা আমি তাহলে উঠি এখন।'
'সেমাইটা খান।'
'সেমাই খেতে ইচ্ছা হচ্ছে না।'
'একটু খান। ঘরে আর কিছু নাই।'

আহসান বিস্মিত হয়ে তাকাল। মেয়েটির মধ্যে আগের সেই লজ্জা, সংকোচ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুই নেই। অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে কথা বলছে। বাবার অনুপস্থিতি নিশ্চয়ই এর একমাত্র কারণ নয়।

আহসান উঠতে-উঠতে বলল, 'আমি যাব একবার করিম সাহেবকে দেখতে।'

'আপনি গেলে বাবা খুব খুশি হবেন।'

আহসান অবাক হয়ে বলল, 'তাই নাকি?'

'জ্বি খুব খুশি হবেন। বাবা আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।'

'আমার কথা কী জিজ্ঞেস করলেন?'

'জিজ্ঞেস করছিলেন আপনি এ্যাকসিডেন্টের খবর পেয়েছেন কি-না। মহলকে জিজ্ঞেস করছিলেন।'

'আচ্ছা।'

'আব্বা আপনাকে খুব ভালোমানুষ জানেন।'

আহসানের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। মেয়েটি কি কিছু বোঝাতে চাচ্ছে? বলতে চাচ্ছে—ভালোমানুষ হিসেবে জানলেও আপনি ভালোমানুষ নন। আপনার ঘর থেকে সুন্দর মতো, রোগা ফর্সা একটি মেয়ে বের হয়েছে। সে রাত কাটিয়েছে আপনার সঙ্গে।

বেগমও তার দিকে তাকিয়ে আছে। সরল ও ক্লান্ত চোখ। না এই মেয়ে কিছু দেখে নি। দেখলে চোখে তার ছায়া পড়ত। আহসান বলল, 'আমি যাব একবার।'

'আজ যাবেন?'

'হ্যাঁ আজই। বিকেলে। ভিজিটিং আওয়ার্সে।'

আহসান চলে যাবার জন্য পা বাড়াল। বেগম ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আব্বা কোথায় আছেন তা তো আপনি জানেন না।'

আহসানকে থমকে দাঁড়াতে হল।

'এই কাগজে ঠিকানাটা লেখা আছে।'

বেগমের হাতে এক টুকরো কাগজ। সে তৈরি হয়েই এসেছে। মেয়েটি বুদ্ধিমতি। করিম সাহেব কি এই তথ্যটি জানেন? বোধ হয় জানেন না। আহসান হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল। মেয়েটি এতক্ষণ কাগজটি লুকিয়ে রেখেছিল। হয়ত ভেবেছে আহসান নিজেই চাইবে।

'আচ্ছা এখন যাই?'

বেগম জবাব দিল না।

বাড়ির সামনে ট্রাক দাঁড়িয়ে। জলিল মিয়া বারান্দায় বসে আছে। তার হেল্পার বালতি-বালতি পানি এনে ট্রাকের চাকায় ঢালছে। এই হেল্পারটিকেই বোধ হয় কুকুর কামড়েছে। বাঁ পায়ে পট্টি বাঁধা। সে কিছুক্ষণ পর-পর থুথু ফেলছে। আগেও ফেলত—নাকি কুকুর কামড়ানোর পর ফেলছে—কে জানে। জলিল বলল, 'স্লামালিকুম প্রবেসর সাহেব।'

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'ঝামেলা দেখেন না, এই বিপদের মধ্যে ট্রিপে যাওয়া লাগবে। বগুড়া। পার্টির সাথে কথাবার্তা বলা। না গেলে হবে না।'

'ও।'

'হেল্পার হারামজাদার শরীরটাও ভালো না। ইনজেকশন দেওয়া লাগবে। আপনি

যান কোথায়?'

'নিউমার্কেটের দিকে যাব।'

'একটু বসেন ট্রাক নিয়া বার হব। নামায়ে দিব আপনারে।'

'না লাগবে না।'

'আমাদের দেরি হইত না।'

'কোনো দরকার নেই। শ্যামলীতে আমার একটা কাজ আছে।'

'ও আচ্ছা। যান তাহলে। স্লামালিকুম।'

আহসান রাস্তায় নেমে পড়ল। রাস্তায় প্যাচপেচে কাদা। ইট বিছানো রাস্তা। জায়গায়-জায়গায় ইট উঠে গিয়ে গর্ত হয়েছে। পানি জমে আছে। সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে সে রাস্তা দেখছে। মনে-মনে সে কিছু একটা খুঁজছে। যা খুঁজছে তা সে পেয়ে গেল।

রাস্তার একপাশে ঘাসের ওপর এক পাটি স্যান্ডেল। রেবা কিংবা পারুল নামের মেয়েটির স্যান্ডেল। যাবার সময় বোধ হয় বেচারির চোখে পড়ে নি। লাল ফিতার নতুন স্যান্ডেল, হয়ত অল্প কিছুদিন হল কিনেছে। আহসান লক্ষ করল তার মন খারাপ লাগছে। অথচ মন খারাপ হবার মতো কিছুই হয় নি। এই মেয়েটিকে এক রাতের জন্যে সে আশ্রয় দিয়েছিল। রাত কেটে গেছে সে চলে গেছে, ব্যস ফুরিয়ে গেল কিন্তু এখন এমন লাগছে কেন? শুধু যে এখন এমন লাগছে তাই না, ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যখন দেখেছে মেয়েটি চলে গিয়েছে তখনি বুকে আচমকা একটা ধাক্কা লেগেছিল।

যা সে প্রাণপণে অস্বীকার করেছে। কিন্তু কেন? এ-রকম হচ্ছে কেন? আহসান একটি সিগারেট ধরাল। কার্যকারণ ছাড়া এই পৃথিবীতে কিছুই হয় না। সে কি কার্যকারণ ছাড়াই একপাটি স্যান্ডেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে? নিশ্চয়ই না। কারণ একটি আছে যা স্বীকার করতে তার ইচ্ছে করছে না। রেবা বা পারুল নামের মেয়েটির সঙ্গে তারিনের চেহারার খুব মিল। প্রথম দিকে চোখে পড়ে নি কিন্তু মেয়েটি যখন তারিনের শাড়ি পরে বেরুল তখন আহসানের গা কাঁপছিল। কী অদ্ভুত মিল। কী অসম্ভব ব্যাপার? তখন তা সে স্বীকার করে নি। রূঢ় ব্যবহারই করেছে মেয়েটির সঙ্গে। খেতে বলেছে অবশ্যি। সেই বলায় মমতা বা করুণা ছিল না। কিংবা থাকলেও তার প্রকাশ হয় নি। প্রকাশ হলে ক্ষতি ছিল না কিছু।

কড়া রোদ উঠেছে। আহসান হাঁটছে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। তার তেমন কোনো পরিকল্পনা নেই। কোনো একটা হোটেলে দুপুরের খাবার খেতে হবে। এই পর্যন্ত। বিকেলের জন্যে আরেকটা ঝামেলা বেধে রয়েছে। হাসপাতালে যেতে হবে।

শ্যামলী থেকে সে একটা বাসে উঠল। প্রায় ফাঁকা বাস। বাসে চড়লেই তার কেমন ঝিমুনির মতো আসে। আজ আসছে না। এত খালি সিট থাকতেও নোংরা এক বুড়ো এসে বসল তার পাশে। বুড়োর হাতে পলিথিনের ব্যাগে কিছু ছোট মাছ। বিকট গন্ধ আসছে সেখান থেকে। হঠাৎ করেই আহসানের মনে হল পলিথিনের একটা ব্যাগ থাকলে স্যান্ডেলটা নিয়ে আসা যেত। কোনোদিন এ-মেয়েটির সঙ্গে দেখা হলে ফিরিয়ে দেওয়া যেত। সে নিশ্চয়ই অন্য পাটিটি যত্ন করে রেখেছে।

বুড়োর পলিথিনের ব্যাগ থেকে টপ-টপ করে মাছের রস পড়ছে। এক ফোঁটা পড়ল আহসানের প্যান্টে। উঠে অন্য কোথাও বসা উচিত কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজা খুলে জেরিন বিরক্ত গলায় বলল, 'দুলাভাই আপনি সবসময় অড আওয়ারে আসেন কেন? ছুটির দিনে আড়াইটার সময় কেউ আসে?'

আহসান হাসল।

'আসুন ভেতরে আসুন। কাঁচাঘুম ভাঙিয়েছেন ভীষণ রাগ লাগছে।'

'সরি। বাসায় আর কেউ নেই?'

'বাবা আছেন। ঘুমুচ্ছেন। মা আপনার পুত্রকে নিয়ে মেজোপা'র বাসায়। আপনি খেয়ে এসেছেন নিশ্চয়ই?'

'হুঁ।'

জেরিন হাই তুলে বলল, 'চোখটা শুধু লেগে এসেছে এমন সময় কলিং বেল টিপলেন। এ-রকম অসময়ে ফকির-মিসকিনরা এসে কলিং বেল টিপে ভিক্ষা চায়। বুঝলেন সাহেব?'

'বুঝলাম।'

'কাঁচাঘুম ভাঙলে কি যে খারাপ লাগে।'

'দুপুরে ঘুমের অভ্যাসটা বাদ দাও। হু-হু করে মোটা হয়ে যাবে। পাত্র জুটবে না।'

'চা খাবেন? চা করতে হবে?'

'না হবে না। ফ্রিজে ঠাণ্ডা কিছু আছে?'

'পানি আছে। পানি দিতে পারি।'

'তা-ই দাও।'

জেরিন পানি আনল সঙ্গে একগ্লাস সরবত। দু'টি হিমশীতল সন্দেশ এবং একটুকরো কেক।

'ফ্রিজে যা পেয়েছি নিয়ে এসেছি। কেকটা বাসি। ওটা খাবেন না।'

'বাসি তো আনলে কেন?'

'প্লেটের শোভা বাড়াবার জন্যে। দুলাভাই, সরবত-টরবত খেয়ে রেস্ট নিন। আমি ঘুমুতে চললাম। সন্ধ্যাবেলা দেখা হবে।'

'সত্যি-সত্যি যাচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ সত্যি-সত্যি যাচ্ছি। আপনার ওপর দু'টি দায়িত্ব—কেউ কলিং বেল টিপলে দরজা খুলবেন। টেলিফোন এলে ধরবেন এবং বলবেন—বাসায় কেউ নেই, সন্ধ্যার পর ফোন করুন।'

'আচ্ছা ঠিক আছে—তুমি যাও।'

'রেস্ট নিতে চাইলে রেস্ট নিতে পারেন—বিছানা দেখিয়ে দিচ্ছি। আর যদি জেগে থাকতে চান কিছু ম্যাগাজিন-ট্যাগাজিন দিতে পরি। omni বলে একটা চমৎকার ম্যাগাজিন আছে। সায়েন্স ফিকশান ম্যাগাজিন।'

'কিছু লাগবে না।'

'বসে-বসে ধ্যান করবেন?'

'ঝিমুব। ঝিমুতে ইচ্ছে করছে। তুমি যাও, তোমাকে বসে থাকতে হবে না।'

জেরিন গেল না। কোলের ওপর দু' হাত রেখে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে রইল। জেরিনের সঙ্গে তারিনের কোনো মিল নেই। দু' জন সম্পূর্ণ দু' রকম। তবুও এরা দু' জন যে বোন তা যে-কেউ ধরতে পারবে। অতি সূক্ষ্ম সাদৃশ্য। তা-ও বা কী করে হয়, সূক্ষ্ম সাদৃশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলে চট করে এরা যে দু' বোন তা বলা যায় কি করে? জেরিনের মধ্যে এক ধরনের কাঠিন্য আছে। সে খানিকটা অহংকারী। অহংকার তার চরিত্রের সঙ্গে মানিয়ে গেছে। চার ভাইবোনের মধ্যে জেরিন সবচেয়ে মেধাবী। মেট্রিক থেকে শুরু করে অনার্স পর্যন্ত চোখ-ধাঁধানো রেজাল্ট করেছে। অনার্স প্রথম নিয়েছিল জিওগ্রাফিতে। সেটা বদলে নিয়েছে স্ট্যাটিসটিক্স। তা-ও নাকি কার ওপর রাগ করে। শুধুমাত্র দেখানোর জন্যে অঙ্কে মেয়েদের মাথা পুরুষদের চেয়ে খারাপ নয়। তা সে দেখিয়েছে।

'কি ব্যাপার জেরিন ঘুমুতে যাচ্ছ না যে?'

'যাব খানিকটা ভদ্রতা করে নিই। আফটার অল বড় বোনের হাসব্যান্ড, অভদ্রতা করি কিভাবে? এ-বাড়ির জামাই।'

জেরিন অল্প-অল্প পা দুলাচ্ছে। কাঠিন্য ও স্নিগ্ধতা মেশানো একটা মুখ দেখতে ভালো লাগে। আহসান বলল,

'মারুফ আছে কেমন?'

'ভালো আছে বলেই তো মনে হয়। অবশ্যি আমি ঠিক বলতে পারব না। মা বলতে পারবেন। ওর দেখাশোনা মা করেন। আমার এত সময় নেই।'

'পড়াশোনা?'

'হুঁ। তাছাড়া আপনার পুত্র আমাকে দেখতে পারে না। ঐদিন ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমার কাছে এনে শুইয়েছি। মাঝরাতে একা-একা বালিশ নিয়ে উঠে চলে গেছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আমিও ছাড়বার পাত্র না। আমি আবার তুলে নিয়ে এলাম। আবার ঘুম ভেঙে একা-একা চলে গেল।'

'তুমি কি করলে? আবার নিয়ে এলে?'

'ঠিক ধরেছেন। অন্য কেউ হলে এটা করত না, হাল ছেড়ে দিত। আমি এত সহজে হাল ছাড়ি না।'

'খুব ভালো গুণ।'

'ভালো মন্দ জানি না। আমি যে-রকম সে-রকম। সব মানুষই আলাদা। আপা ছিল আপার মতো। আমি হয়েছি আমার মতো।'

'ফিলসফি করছ?'

'ফিলসফি-টফি না। আমি এইসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আজকাল ভাবি।'

'প্রেমেট্রেমে পড়লে মেয়েরা এইসব ভাবে। ঘটেছে সে-রকম কিছু?'

'না। সবাই কি আর আপা?'

আহসান তাকাল তীক্ষ্ণ চোখে। জেরিন তার আপার প্রেমের প্রসঙ্গটি অত্যন্ত কঠিনভাবে মাঝেমধ্যে আনে। মনে হয় কোনো বিচিত্র কারণে এই বিষয়টি নিয়েই তারিনের ওপর তার চাপা রাগ আছে। যে-মেয়েটি বেঁচে নেই তার ওপর এতটা রাগ এখনো থাকা খুব অন্যায়।

'দুলাভাই।'

'বল।'

'আমার মাঝে-মাঝে জানতে ইচ্ছে করে আপনাকে আপা এতটা পছন্দ করেছিল কেন? ভালো লাগার মতো সত্যি কি কিছু আছে আপনার মধ্যে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না নেই।'

'আসলেই কিন্তু নেই। প্রাইভেট কলেজে মাস্টারি করেন। হেন-তেন করে একটা সেকেন্ড ক্লাস পেলেই প্রাইভেট কলেজের মাস্টারি যোগাড় করা যায়। যায় না?'

'হ্যাঁ যায়।'

'আপনার চেহারা ভালো না। গান জানেন না, খেলাধুলা জানেন না। দরিদ্র পরিবারের ছেলে। ভুল বলছি?'

'না।'

'কি দিয়ে আপাকে ভুলিয়েছিলেন? কাইন্ডলি একটু বলুন শুনি। আমি প্রায়ই ভাবি আপনাকে জিজ্ঞেস করব। জিজ্ঞেস করা হয় না। মনে থাকে না।'

আহসান সিগারেট ধরাল। এক টুকরো সন্দেশ ভেঙে মুখে দিল। জেরিন নিচু গলায় বলতে লাগল, 'বড় আপা এবং আমি এক খাটে ঘুমুতাম। বুঝলেন দুলাভাই, আপনি সেই সময় বড় বড় চিঠি লিখতেন আপাকে। আমি ঘুমিয়ে পড়তেই আপা অসংখ্যবার পড়া চিঠি আবার পড়তে বসত।'

'বুঝতে কী করে? তুমি তো ঘুমে।'

'না ঘুমে না। ঘুমের ভান। আপা সেই সব আজেবাজে চিঠি পড়ে খুব কাঁদত। এমন রাগ লাগত আমার।'

'আজেবাজে বলছ কেন?'

'আজেবাজে বলছি কারণ ঐসব চিঠি আমি লুকিয়ে পড়েছি। নিতান্তই হালকা কথাবার্তা। বানানো সব ব্যাপার। আমি খুব নিশ্চিত ছিলাম বিয়ের পর-পর আপা একটা শক খাবে। দেখবে এইসব প্রেমটেমের ব্যাপারগুলো সত্যি না।'

'তোমার কি মনে হয় শক খেয়েছিল?'

'না বিয়ের পর আপা আরো অন্যরকম হয়ে গেল। যেন পৃথিবীতে আপনি ছাড়া দ্বিতীয় মানুষ নেই। আমি ভীষণ আহত হয়েছিলাম।'

'পাস্ট টেন্সে কথা বলছ, তার মানে কী এই যে এখন আহত হচ্ছ না?'

'এখনো হচ্ছি। হচ্ছি বলেই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। কি দিয়ে তাকে ভুলিয়েছিলেন?'

'কিছু দিয়েই তাকে ভুলাই নি। সে ভুলেছে নিজ গুণে।'

'আমারও তাই মনে হয়। আপা আপনাকে বিয়ে না করে যদি অন্য কাউকে বিয়ে করত তাহলেও একই অবস্থাই হত। তার চিন্তা-চেতনা জুড়ে থাকত ঐ লোকটি।'

'সেটা কি খুব খারাপ?'

'হ্যাঁ খারাপ। প্রতিটি মানুষের নিজস্ব আইডেনটিটি থাকবে। মেয়ে মানেই কি লতানো গাছ? যে অন্য কাউকে না জড়িয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না?'

'পারবে না কেন, নিশ্চয়ই পারবে। তুমি যে অন্তত পারবে এই সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।'

'ঠাট্টা করছেন?'

'না ঠাট্টা করছি না। তুমি খুবই স্পিরিটেড মেয়ে। তোমার এই স্পিরিট দেখতে ভালো লাগে।'

'আর আপার কোন জিনিসটা দেখতে ভালো লাগত?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহসান উত্তর দিল না। জেরিন বলল, 'বলুন না শুনি। আচ্ছা ঠিক আছে উল্টোটা বলুন—আপার কোন জিনিসটা আপনার খারাপ লাগত?'

'ঐ প্রসঙ্গ থাক। অন্য কিছু নিয়ে আলাপ করি শোন। তোমার ঘুমের কি হল?'

জেরিন জবাব দিল না। কি যেন সে ভাবছে। তার কপাল কুঁচকানো, মুখের ভাব চিন্তাক্লিষ্ট। গরমে নাক ঘেমেছে। সুন্দর লাগছে দেখতে। তারিনেরও নাক ঘামত।

'দুলাভাই।'

'বল।'

'আপনার সঙ্গে আমার একটি অত্যন্ত জরুরি কথা আছে।'

'এতক্ষণ যা বললে সেগুলো জরুরি নয়?'

'না নয়।'

'বেশ, বল শুনি।'

'বলছি—কিন্তু আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমার জরুরি কথাটা বলা শেষ হবার পরেও আগে যেভাবে আসতেন এ-বাড়িতে ঠিক এইভাবেই আসবেন।'

আহসান হাসিমুখে বলল, 'বেশ নাটকীয় ওপেনিং। ব্যাপার কী বলত?'

'আপনার বাবা, আমার বাবাকে একটি চিঠি দিয়েছেন। সেই চিঠি পড়ে বাসার সবাই খুব মন খারাপ করেছে। সবচেয়ে বেশি মন খারাপ করেছি আমি। আপনি বোধ হয় জানেন না আমি কোনোদিন কাঁদি না, কিন্তু সেই চিঠি পড়ে খুব কেঁদেছি। কেঁদেছি কারণ আমার ধারণা ঐ চিঠি আপনি আপনার বাবাকে দিয়ে লিখিয়েছেন। আপনার বাবা, সরি আমার বোধ হয় তালই সাহেব বলা উচিত—নিজ থেকে এ-রকম একটা চিঠি লিখতে পারেন না।'

'চিঠিটা দেখি।'

'জেরিন ড্রয়ার থেকে চিঠি বের করল, আহসানের হাতে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আহসানের অনেক সময় লাগল চিঠি শেষ করতে। তার বাবা কুতুবপুর এম. ই. হাই স্কুলের এ্যাসিসটেন্ট হেড মাস্টার জনাব নেছারউদ্দিন অত্যন্ত প্যাঁচল অক্ষরে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন—

।। ইয়া রব ।।

প্রিয় বেয়াই সাহেব,

আসসালামু আলায়কুম। পর সমাচার এই যে, দীর্ঘদিন আপনার সঙ্গে পত্র মারফত কোনো যোগাযোগ নাই। গত রমজানে আপনাকে একটি পত্র দিয়াছিলাম সম্ভবত আপনার হস্তগত হয় নাই।

যাই হোক, একটি বিশেষ আবদার নিয়া আপনার নিকট এই পত্র প্রেরণ করিতেছি। আবদারটি আপনার তৃতীয় কন্যা জেরিন প্রসঙ্গে। এই অত্যন্ত সুলক্ষণা, বিদ্যাবতী ও গুণবতী কন্যাটির সঙ্গে আহসানের বিবাহ কি হইতে পারে না? যদি হয় তাহা হইলে মারুফ সম্পর্কে আমাদের সকলের সকল আশংকা দূর হয়। সৎ মার গৃহে শিশুদের কী অবস্থা হয় তা তো আপনার অজানা নাই। আমি নিজেও ভুক্তভোগী। মা জেরিনের সঙ্গে আহসানের বিবাহ দিতে পারিলে সব দিক নিশ্চিত হওয়া যায়। পত্র মারফত এইসব বিষয় আলোচনা করা সম্ভব না। বাধ্য হইয়া করিলাম। কারণ আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তমানে বাতব্যাধিতে শয্যাশায়ী। হাঁটাচলার সামর্থ্য নাই।

আপনি এই পত্রটি বেয়ান সাহেবকে দেখাইবেন। এবং তাঁহার সহিতও পরামর্শ করিবেন।

এই হচ্ছে চিঠি শুরুর প্রস্তাবনা। এরপরও নানান প্রসঙ্গ আছে। তাঁর অসুখের পূর্ণ বিবরণ আছে। কুতুবপুর এম. ই. স্কুল নিয়ে বর্তমানে যে পলিটিক্স চলছে এবং এই পলিটিক্সের ফলে যে স্কুলের অস্তিত্বই বিপন্ন হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তার বিশদ বিবরণ আছে। এই অবস্থায় কি করা উচিত বলে বেয়াই সাহেব মনে করেন?----এইসবও আছে।

আহসান চিঠিটি খামে ভরে টেবিলের ওপর রাখল। জেরিন চা নিয়ে ঢুকছে। শান্ত ভঙ্গিতে টি-পট থেকে চা ঢালছে।

'দুলাভাই, মা ফিরেছে। আমাকে বলেছে আপনাকে যেন চলে যেতে না দিই। মা নামাজ পড়েই আসবে। চায়ে চিনি হয়েছে?'

'হ্যাঁ হয়েছে।'

'এখন আপনাকে আরেক কাপ চা খেতে হবে বাবার সঙ্গে। তিনি চা-নাশতা নিয়ে অপেক্ষা করছেন।'

'তাহলে আর এখানে চা দিলে কেন?'

'আপনি সিগারেট ছাড়া চা খেতে পারেন না এই জন্যে।'

জেরিন হাসল। হাসতে-হাসতে বলল, 'আজ রাতে তো আপনি থাকবেন এখানে তাই না?'

'তেমন কোনো কথা ছিল কি?'

'না ছিল না। কিন্তু আমি জানতাম আজ আপনি আসবেন এবং রাতে থেকে যাবেন। আমি মাকে সকালবেলাতেই বলে রেখেছি ভালোমতো বাজার করতে।'

'আজ কি কোনো বিশেষ দিন?'

জেরিন তীব্র গলায় বলল, 'কেন প্রিটেন্ড করছেন? আপনি ভালোই জানেন আজ কোন দিন। জানেন বলেই এসেছেন। গত দু' মাসে কি একবারও এসেছেন এ-বাড়িতে?'

আহসানের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আজ এগারই শ্রাবণ। এই দিনে পাঁচ বছর আগে তারিনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। বাসর হয়েছিল এ-বাড়িতেই। খুব ঝড়-বৃষ্টির রাত ছিল বলে বর-কনেকে যেতে দেওয়া হয় নি।

জেরিন ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'যান বাবা বসে আছে। দেখা করে আসুন।'

আহসানের শ্বশুর ইমতিয়াজ সাহেব ঠাণ্ডা ধরনের মানুষ। কোনো কিছুতেই উত্তেজিত না হওয়ার অসাধারণ গুণটি তিনি আয়ত্ত করেছেন। সারাজীবন জজিয়তি করে-করে কথা না বলে শুধু শুনে যাওয়ার বিষয়টিও তাঁর মজ্জাগত হয়েছে। অসম্ভব ভদ্রলোক। নিজের জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলার সময়ও খুব লক্ষ রাখেন যেন কোথাও সৌজন্য এবং শিষ্টতা ক্ষুণ্ন না হয়।

আহসানকে তিনি কখনো সহজভাবে নিতে পারেন নি। অবশ্যি তা বুঝতেও দেন নি; তবে এইসব ব্যাপারগুলি বোঝা যায়। আহসানের বুঝতে অসুবিধা হয় নি। নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিকভাবে একবার সে তারিনকে বলেও ফেলল, 'তোমার বাবা আমাকে সহ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারে না কেন বল তো?'

তারিন খুবই স্বাভাবিকভাবে বলল, 'সবাই কি আর সবাইকে সহ্য করতে পারে? এমন যে মহাত্মা গান্ধী তাঁকেও তো অনেকে সহ্য করতে পারত না।'

'মহাত্মা গান্ধী অনেক বড় ব্যাপার। এইসব তুচ্ছ ব্যাপারে তাঁর কিছু যায় আসে না। আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি আমার খারাপ লাগে।'

'আমারো লাগে কিন্তু কী আর করা।'

'না, করার কিছুই নেই। মেনে নেওয়া ছাড়া আর কি পথ আছে?' আহসান মেনে নিয়েছিল। এ-বাড়িতে পা দিলে সে নিয়ম মাফিক কিছু সময় কাটাত ইমতিয়াজ সাহেবের সঙ্গে। ইমতিয়াজ সাহেব ন্যাশনাল জিওগ্রাফির পাতা বন্ধ করে অতি ভদ্র স্বরে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে এক সময় ইতি টানতেন। সেই ইতি টানার ব্যাপারটিও রুচি সম্মত।

'যাও তোমাকে আর আটকে রাখতে চাচ্ছি না। বুড়ো মানুষদের সঙ্গে বেশি সময় কাটানো ভালো নয়—এতে মনের মধ্যে বুড়ো-বুড়ো ভাব ঢুকে যায়। যা মোটেই ডিজায়ারেবল নয়।'

আহসান পাশের কামরায় ঢুকল। শ্বশুরের সঙ্গে তার কথাবার্তা হল মামুলি ধরনের। সে এদিকে তেমন আসে না কেন? ছেলেটি এখানে আছে সে কারণেও তো আসা উচিত। এবং ছেলেটিকে নিজের কাছে মাঝেমধ্যে রাখা উচিত।

'কি বল আহসান, উচিত না?'

'একটু বড় হোক। তারপর মাঝেমধ্যে নিয়ে রাখব। এখন নিলে কাঁদবে।'

'কাঁদবে কেন? বাবার কাছে কি ছেলে কাঁদে? মোটেই কাঁদে না।'

মোটেই কাঁদে না কথাটা ঠিক না। আহসানের শাশুড়ি মারুফকে কোলে নিয়ে বারান্দায় আসতেই মারুফ তার বাবার দিকে তাকিয়ে কাঁদতে শুরু করল। সে এখানে আসবে না।

'তোমাকে না দেখে-দেখে এ-রকম হয়েছে।'

আহসান কিছু বলল না। তার শাশুড়ি ছেলেকে তার কোলে দিতে চেষ্টা করতে লাগলেন। ছেলে কিছুতেই আসবে না। হাত-পা ছুঁড়ছে।

আহসান খানিকটা অপ্রস্তুত বোধ করছে। সে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি রে ভালো?'

মারুফ পাথরের মতো মুখ করে রইল। আহসানের শাশুড়ি বললেন, 'খোকন তোমার পেঙ্গুইনের খেলনাটা বাপিকে দেখাবে না?'

'না।'

'দেখতে চাচ্ছে যে। আহসান তুমি পেঙ্গুইনের খেলনা দেখতে চাও। তাই না?'

'হ্যাঁ চাই।'

'খেলনাটা দেখার জন্য তোমার খুব লোভ হচ্ছে তাই না?'

'হ্যাঁ হচ্ছে।'

এই জাতীয় কথাবার্তা দীর্ঘ সময় চালিয়ে যাওয়া খুবই বিরক্তির ব্যাপার। শাশুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে আহসান চালিয়ে যায়। মারুফের মুখের কাঠিন্য তাতে বিন্দুমাত্র কমে না। এতে আহসানের শাশুড়ি বেশ আনন্দ পান। আহসানের ধারণা ছেলে যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো দিন তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে মনের কষ্টে তার শাশুড়ির হার্ট এ্যাটাক হবে।

আহসান বলল, 'এখন উঠব, আমাকে একটু হাসপাতালে যেতে হবে, একজনকে দেখতে যাওয়ার কথা।'

তার শাশুড়ি অবাক হয়ে বললেন, 'তা কী করে হয়? আজ রাতে তো তুমি এখানে থাকবে। জেরিন তোমার জন্যে সকাল বেলা বাজার করিয়েছে। রান্নাবান্না হচ্ছে।

'আমাকে যেতেই হবে। আমার চেনা একজন মানুষ এ্যাকসিডেন্ট করেছে। হয়ত মারা যাবে।'

আহসানের কথাগুলো খুব বিশ্বাসযোগ্য হল না। মনে হল সে বানিয়ে-বানিয়ে একটা অজুহাত তৈরি করছে। তাও খুব জোরাল অজুহাত নয়।

তার শ্বশুর গম্ভীর গলায় বললেন, 'ঠিক আছে তুমি হাসপাতালে যাও ভদ্রলোককে দেখে চলে আস। সেখানে নিশ্চয়ই তোমাকে সারারাত থাকতে হবে না।'

'না তা হবে না।'

'ভদ্রলোক কে?'

'আমার বাড়িওয়ালা করিম সাহেব।'

'অসুখটা কি?'

'টেম্পোর সঙ্গে এ্যাকসিডেন্ট করেছেন।'

'ও আচ্ছা, যাও। চা খেয়ে যাও। চা ঠাণ্ডা হচ্ছে।'

ভদ্রলোক একটা চুরুট ধরিয়ে খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, 'তোমার বাবার শরীর কেমন? চিঠিপত্র পাও?'

'পাই। শরীর ভালোই সম্ভবত।'

'আমি অবশ্যি রিসেন্টলি একটি চিঠি পেয়েছি তাতে বাতে কষ্ট পাচ্ছেন বলে লিখেছেন। স্কুলেও কি সব ঝামেলা হচ্ছে।'

আহসান অপেক্ষা করতে লাগল কখন জেরিনের প্রসঙ্গটি আসে। মনে হচ্ছে আসবে। না এলে চিঠির প্রসঙ্গ উনি আনতেন না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার প্রসঙ্গ উঠল না। উনি বর্ষার কথা নিয়ে এলেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে উনি জেরিনের প্রসঙ্গটি এনে ব্যাপারটা এখানেই মিটিয়ে দিতে চান। কিন্তু চক্ষুলজ্জায় আনতে পারছেন না। আহসান বলল, 'আপনার সঙ্গে আমি একটি ব্যাপারে আলাপ করতে চাচ্ছিলাম।'

'কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু কি?'

'না তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।'

'তোমার শাশুড়িকেও ডাকি। ও বোধ হয় মারুফকে দুধ খাওয়াতে গেছে।'

'না ওনাকে ডাকার প্রয়োজন নেই। করিম সাহেবের কথা বলছিলাম না আপনাকে—আমার বাড়িওয়ালা।'

'হ্যাঁ বলছিলে।'

'ভদ্রলোকের খুব ইচ্ছা তাঁর মেয়েকে আমি বিয়ে করি। আমিও ভাবছিলাম--'

'গুড ভেরি গুড। মেয়ে তোমার পছন্দ হলে অফকোর্স করবে। তোমার সারা জীবন তো সামনেই পড়ে আছে। ইয়াংম্যান --'

আহসানের মনে হল তাঁর শ্বশুরের বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেছে। তিনি খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হালকা বোধ করছেন। চট করে চমৎকার একটি মিথ্যা মাথায় আসায় ভালোই হয়েছে। ঐ চিঠির প্রসঙ্গ তিনি আর তুলবেন না।

'আমি এখন উঠি?'

'ঘন্টা খানিকের মধ্যে চলে আসবে কিন্তু। খাবে এখানে।'

'ঠিক আছে।'

'এক কাজ কর না কেন? গাড়ি নিয়ে যাও। ড্রাইভার আছে।'

'না গাড়ি লাগবে না। মেডিক্যাল কলেজে যাব। কতক্ষণ থাকব কিছু ঠিক নেই।'

আহসান উঠে দাঁড়াল।

'বেশি দেরি করবে না। এদিকে রেগুলার ছিনতাই-টিনতাই হচ্ছে। দেশে বাস করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে।'

'না দেরি করব না।'

আহসানের শ্বশুর তাঁর সঙ্গে গেট পর্যন্ত এলেন। একবারও জিজ্ঞেস করলেন না— করিম সাহেবের মেয়েটি কি পড়ে? দেখতে কেমন? এই অসম্ভব ভদ্র, সংস্কৃতিবান পরিবারটির কেউই তার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখায় না। একজন ছাড়া। সেই একজন তারিন। আহসান ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল।

ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে গেছে বলেই বোধ হয় ভিজিটারদের সংখ্যা অনেক বেশি। গিজ-গিজ করছে চারদিকে। ফিনাইলের কড়া গন্ধ, ওষুধের গন্ধ এবং রোগ গন্ধ। কিছুক্ষণ থাকলেই মাথা ভার-ভার হয়ে যায়। বমি-বমি লাগে তবু যদি কেউ বেশিক্ষণ থাকে তাহলে যেতে চায় না। এইসব গন্ধের কোনো একটিতে সম্ভবত এ্যাডিকসনের কিছু আছে। যা মানুষকে আটকে ফেলে। ভাবতে-ভাবতে আহসান এলোমেলোভাবে খানিকক্ষণ করিডোর দিয়ে হাঁটল। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে করিডোর পরিচ্ছন্ন। এত মানুষজন যাওয়া আসার মধ্যেও করিডোর পরিচ্ছন্ন আছে কী ভাবে তা-ও একটা রহস্য। বুড়োমতো একজন হাতে এক ডজন কলা নিয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে এ-মাথা ও-মাথা করছে। সে আহসানের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'ডাক্তার সাব, চইদ্দ নম্বর কোনখানে?'

'হাসপাতালের কাউকে জিজ্ঞেস করুন। আমিও একজনকে খুঁজছি।'

বুড়ো আসতে লাগল তার সঙ্গে-সঙ্গে। ডাক্তারদের চেহারা কি অন্যদের থেকে আলাদা? তারিন হাসপাতালে থাকার সময়ও কয়েকবার অপরিচিত লোকজন তাকে ডাক্তার ভেবেছে। হাসপাতালের ডাক্তাররা অসম্ভব গম্ভীর থাকেন। অস্বাভাবিক একটি কাঠিন্য তাঁদের চোখে-মুখে মাখানো থাকে, তারও কি তাই?

বুড়ো লোকটি গভীর আগ্রহে তাকে লক্ষ করছে। তার কলার কাঁদি থেকে একটি কলা ছিঁড়ে পড়ে গেছে। সেই কলাটি সে অন্য হাতে ধরে আছে। সে ভেবে পাচ্ছে না ডাক্তারের মতো এই লোকটি একবার সিঁড়ির এই মাথায় যাচ্ছে একবার অন্য মাথায় যাচ্ছে কেন? সে ভয়ে-ভয়ে ডাকল, 'ডাক্তার সাব।'

'আমি ডাক্তার না। আপনাকে তো আগে একবার বলেছি। আর শুনুন, আপনি আমার পিছনে পিছনে হাঁটছেন কেন?'

বুড়ো লোকটির কলার কাঁদি থেকে আরো একটি কলা ছিঁড়ে পড়ে গেল। সে কলাটি কুড়িয়ে ভয় পাওয়া ভঙ্গিতে দূরে সরে গেল। বড় মায়া লাগল আহসানের। মায়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারটি বেশ অদ্ভুত। হঠাৎ তেমন কোনো কারণ ছাড়াই কঠিন হৃদয় মানুষের মধ্যে এটা জেগে ওঠে তাকে অভিভূত করে দেয়। তারিনের সঙ্গে পরিচয়ের সময়ও ঐ মায়া নামক ব্যাপারটি কাজ করেছে।

সেই বিকেলে তার কিছু করার ছিল না। কিছু করার না থাকলে শুধু হাঁটতে ইচ্ছে করে। সে প্রায় সারা বিকেল হেঁটে ক্লান্ত হয়ে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দিকে এল। ভ্যাপসা গরম। গায়ে ঘাম চট-চট করছে। অসম্ভব তৃষ্ণা পেয়েছে। বার-বার মনে হচ্ছে শহরের জায়গায়-জায়গায় হাইড্রেন্ট থাকলে বেশ হত। তৃষ্ণার্ত ক্লান্ত পথচারী হাইড্রেন্ট খুলে চোখে-মুখে পানি দিত, আঁজলা ভর্তি পানি পান করত।

বাংলা একাডেমীতে কি একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। রবীন্দ্র বা নজরুল এই দু'জনের কোনো জয়ন্তী-টয়ন্তী হবে। হয়ত এই গরমে অনুষ্ঠান ঠিক জমছে না। যত লোক যাচ্ছে তার চেয়ে বেশি বেরিয়ে আসছে। আইসক্রিমওয়ালারা ঘন্টা বাজিয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কামড়ে-কামড়ে আইসক্রিম খাবার মতো বাজে জিনিস আর কিছুই নেই। তবু আহসান একটি আইসক্রিম কিনল আর ঠিক তখন ছ'-সাত বছরের টোকাই শ্রেণীর একটি বালিকা তার ভাইকে কোলে নিয়ে আহসানের পাশে এসে দাঁড়াল। কড়া একটা ধমক দিতে গিয়েও ধমক দেওয়া গেল না। বালিকার চোখ দু'টি অসম্ভব কোমল। আহসান আইসক্রিমওয়ালাকে বলল, 'এদের দু'জনাকে দু'টি আইসক্রিম দাও।'

'কত দামের?'

'আমারটা যেমন সে-রকম। আমারটার দাম কত?'

'আট টাকা।'

'আট টাকা! বল কি? আইসক্রিমের এত দাম নাকি?'

'চকবারের দাম বেশি।'

'দাও ওদের তাই দাও।'

আইসক্রিমওয়ালা গম্ভীর মুখে দু'টি আইসক্রিম বের করল। তখন গুটি-গুটি আর একটি বালক এসে উপস্থিত। কোমল চোখের মেয়েটি বলল, 'এ আমার ভাই।'

'দাও এর ভাইকেও একটা দাও।'

আইসক্রিমওয়ালা বিরক্ত গলায় বলল, 'অত দিয়ে পার পাইতেন না—দুনিয়ার ফকির আইয়া বেড় দিব।'

বাচ্চা তিনটি গভীর আগ্রহে আইসক্রিম খাচ্ছে। ছোট ছোট টুকরো ভেঙে মুখে দিচ্ছে। আহসান বলল, 'কি রে তোদের নাম কি? বড় মেয়েটি হেসে ফেলল। যেন অদ্ভুত কথা এই জন্মে শোনে নি। তাকে হাসতে দেখে অন্য দু'জনও হাসতে লাগল।

'হাসছিস কেন রে শুধু-শুধু?'

এতে তাদের হাসি আরো বেড়ে গেল। আহসান লক্ষ করল শুধু এরাই হাসছে না। হাসিমুখে আর একজন তাকিয়ে আছে তার দিকে। লম্বা, রোগা একটি মেয়ে। বালিকাদের মতো স্নিগ্ধ মুখ। অনেকদিনের চেনা মেয়ের মতো সে বলল, 'এদের সঙ্গে আপনার দেখি খুব ভাব হয়ে গেছে।'

আহসান কি বলবে ভেবে পেল না। মেয়েটি হাসিমুখে বলল, 'আপনি কি প্রায়ই এ-রকম করেন?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না।'

'আমার নাম তারিন, আমার বান্ধবীর আজ এখানে গান গাওয়ার কথা। সে আসে নি। কি কাণ্ড দেখুন না। অথচ আমি তার জন্যেই এসেছি।'

কত সহজ কত স্পষ্ট ভঙ্গিতে কথা বলছে মেয়েটি। কোনো রকম জড়তা নেই, দ্বিধা নেই।

আহসান খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'আপনিও কি আমাদের সঙ্গে একটা আইসক্রিম খাবেন?' মেয়েটি হাসতে-হাসতে বলল, 'জ্বি না। আমার টনসিলের সমস্যা আছে—ঠাণ্ডা লাগলেই কথা বন্ধ হয়ে যায়।'

পরবর্তী সময়ে আহসান যখন জিজ্ঞেস করেছে—একজন সম্পূর্ণ অচেনা একটি ছেলের সঙ্গে এতগুলো কথা তুমি ঐদিন কিভাবে বললে? তারিন ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলেছে—জানি না। কিভাবে বললাম। আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছিল তাই বলেছি। তুমি এত আন্তরিকভাবে ঐ বাচ্চাগুলোর সঙ্গে কথা বলছিলে দেখে আমার খুব মায়া লাগল। তোমার ওপর মায়া পড়ে গেল।

এখন এই বুড়ো লোকটির ওপর মায়া পড়ে গেছে। কলা হাতে নিয়ে কেমন জবুথবু দাঁড়িয়ে আছে। কেউ তাকে তেমন পাত্তা দিচ্ছে না। সে বোধ হয় পুরো ঠিকানা নিয়ে আসে নি। আহসান এগিয়ে গেল।

'আসুন, আপনার রুগী কোথায় বের করে দিচ্ছি। রুগীর নাম কি?

'মোহাম্মদ ওসমান আলি।'

'কী হয় আপনার?'

'আমার আপন ভাইস্তা। আদমজী মিলে কাম করে।'

'কি কলা কিনেছেন সব তো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে। দিন আমার কাছে কয়েকটা দিন।'

বুড়ো, এই মানুষটির ভদ্রতায় অভিভূত হয়ে গেল।

করিম সাহেবের কেবিনের নম্বর হচ্ছে এগার।

সাধারণত মরণাপন্ন রুগীর কেবিনের সামনে একটা জটলা লেগে থাকে। এখানে তা নেই। কেবিনের সামনের জায়গাটি একেবারে ফাঁকা। ভিড় দেখা যাচ্ছে ১৬ নম্বর কেবিনের সামনে। অত্যন্ত চমৎকার সব পোশাক পরা একদল মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ কাঁদছে। যারা কাঁদছে তাদের মধ্যে একজন বিদেশিনীও আছে। স্কার্ট পরা বিদেশিনী, বাঙালি মেয়েদের মতোই শব্দ করে কাঁদছে।

আহসান এগার নম্বরের কেবিনের দরজায় টোকা দিতেই দরজা খুলে যে-মেয়েটি মাথা বের করল সে মহল।

'আসেন। ভেতরে আসেন। আব্বা, প্রফেসর সাহেব এসেছেন।'

বিছানায় সাদা চাদরে ঢাকা মানুষটি নড়ে উঠল।

'কেমন আছেন করিম সাহেব?'

'ভালো আছি। ভালো আছি। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।'

আহসান বড় রকমের একটা ধাক্কা খেল। বিছানায় যে পড়ে আছে সে একজন মৃত ব্যক্তি। কোনো একটি অসম্ভব অলৌকিক উপায়ে সে কথা বলছে। এ-রকম একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের কথা বলতে পারার কোনো কারণ নেই।

'মহল, প্রফেসর সাহেবকে বসতে দে।'

'আপনি কথা বলবেন না। চুপ করে থাকুন।'

'আপনি দেখতে এসেছেন বড় ভালো লাগছে প্রফেসর সাব। আমি এদের বলতেছিলাম প্রফেসর সাব আসবে। না এসে পারে না। মানুষ তো আমি চিনি। ব্যবসা করি, মানুষ চরাইয়া খাই। মানুষ না চিনলে চলে?'

'প্লিজ কথা বলবেন না।'

'প্রথম বাড়ি ভাড়া নিতে যখন আসলেন আমি বেগমের মার বললাম—খাঁটি লোক একটা। বেগমের মা বলল, বড় বড় মেয়ে ঘরে—আমি বললাম, এ ফেরেশতা লোক, তোমার মেয়েগুলোর দিকে কোনোদিন চোখ পড়বে না। কি কথা ঠিক হইল?'

করিম সাহেব বিজয়ীর মতো তাকালেন স্ত্রীর দিকে। বেঁটেখাটো মলিন মুখের মহিলাকে ঘিরে তাঁর মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে। ভদ্রমহিলা বসে আছেন। সবচেয়ে ছোটো মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়েছে। মেঝেতে জায়নামাজ বিছিয়ে বেগমের দূর সম্পর্কের ফুপু খুব নিচু গলায় কোরান শরীফ পড়ছেন।

'প্রফেসর সাব।'

'জ্বি বলুন।'

বোধ হয় বাঁচব না। আমার মাকে গত রাতে বিছানার পাশে বসে থাকতে দেখলাম। পরিষ্কার দেখলাম কোনো ভুল নাই। মরবার আগে আত্মীয়স্বজনের রুহ দেখা যায়।'

'আপনি ভালো হয়ে উঠবেন শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছেন।'

'ভয় আমি পাচ্ছি না প্রফেসর সাব। মরণের খামাকা ভয় পাব কেন বলেন? মরণ তো আছেই। ভয় পাইতেছি অন্য জিনিসে। সেইটা আপনারে বলতে চাই।'

'আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন তারপর বলবেন।'

'জ্বি না, এখনই বলতে হবে। আমার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। বড় বড় লোকসান দিয়ে শেষ হয়ে গেছি। বাজারে বিরাট দেনা। দশ-বার লাখ টাকা দেনা। মরে গেলে মেয়েগুলোর আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। একটু দেখবেন। খোঁজ রাখবেন। দেখাশোনা করবে সেই রকম আত্মীয় স্বজন আমার কেউ নাই।'

'করিম সাহেব, ঐসব নিয়ে চিন্তার সময় এখনো হয় নি।'

'হয়েছে, সময় হয়ে গেছে। কাউরে না বললে শান্তি হবে না। আমার মেয়েগুলো বোকা তার ওপর মূর্খ। মাথার ওপর কেউ না থাকলে ভেসে যাবে।'

'আপনি শান্ত হয়ে বিশ্রাম নিন। আমার যতদূর দেখার আমি দেখব।'

করিম সাহেব চুপ করে গেলেন। চোখ বন্ধ করে বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। মনে হল তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আহসান উঠে দাঁড়াল। লোকটির ঘুম না ভাঙিয়ে চলে যেতে হবে।

'প্রফেসর সাব।'

'জ্বি!'

'চলে যাচ্ছেন?'

'ভাবলাম ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না ঘুমাই নাই। ঘুম হয় না। তন্দ্রার মতো হয়।'

করিম সাহেব আবার কাশতে লাগলেন। দম নেবার মতো শক্তি সঞ্চয়ের পর তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা সব একটু বাইরে যাও আমি একটা কথা প্রফেসর সাবকে বলব। দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও না।'

খুব অনিচ্ছার সঙ্গে সবাই বেরুল। করিম সাহেব বললেন, 'প্রফেসর সাব একটু কাছে আসেন একটা কথা বলব।' আহসান এগিয়ে গেল।

'আমার তিন নম্বর মেয়েটা যে আছে মহল—শুনছি তারে আপনি খুব স্নেহ করেন। দেখা হলে কথাটথা বলেন। মেয়েগুলো বোকা। পেটে কথা রাখতে পারে না। যা হয় সব তাদের মাকে বলে। তার মা বলে আমারে।'

আহসান অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। করিম সাহেবের চোখ বন্ধ তবে তিনি কথা বলছেন বেশ পরিষ্কার গলায়।

'বুঝলেন প্রফেসর সাব, তাঁর মার কাছ থেকে শুনলাম। একদিন নাকি মহলের কাছে আচার চেয়ে খেয়েছেন। মেয়েটা সব তার মাকে বলেছে। মেয়েটাকে যদি আপনার পছন্দ হয় --- আমার মেয়েগুলো বোকা কিন্তু ভালো। মন্দ কিছু আর এদের মধ্যে নাই। আপনারে দিল থেকে কথাগুলো বললাম। দোষ হইলে মাফ কইরা দিবেন। আচ্ছা তাহলে এখন যান।'

কথা শেষ হবার আগেই নার্স এবং হাসপাতালের এ্যাটেনডেন্ট ঢুকল। করিম সাহেবকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাবে। অল্প বয়স্ক একজন ডাক্তার নার্ভাস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। আহসান তাঁকে একপাশে নিয়ে নিচু গলায় বলল, 'অবস্থা কি খুব বেশি খারাপ?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। মাথার আঘাতটা তেমন গুরুতর না, তবে লাংসে জখম আছে। অপারেশনের আগে বলা যাবে না।'

'সারভাইভালের সম্ভাবনা কেমন?'

'বাঁচা-মরার ব্যাপারে তো স্ট্যাটিসটিকস চলে না।'

আহসান নিদারুণ অস্বস্তি নিয়ে বের হল। অপারেশনের সময় এখানে থাকা উচিত। কিন্তু থাকতে ইচ্ছে করছে না। মেয়েগুলি এমন করে কাঁদছে যে সহ্য করা মুশকিল।

হাসপাতালের গেটে দেখা হল ড্রাইভার জলিল মিয়ার সঙ্গে। তার বগুড়া না কোথায় যেন যাবার কথা ছিল ট্রাক নিয়ে। বোধ হয় যায় নি। বিরস মুখে পান চিবুচ্ছে। আহসানকে দেখে এগিয়ে এল।

'প্রবেসার সাব, সালামালিকুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'দেখে আসছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ভালো করছেন। আপনার কথা খুব বলতেছিল। মরবার সময় মাথায় কিছু ঢুকলে ঐটা নিয়ে শুধু প্যাঁচাল পাড়ে। আপনার সাথে কথা বলনের শখ ছিল। শখ মিটল। আপনি কি এখন বাড়ি যান?'

'হুঁ।'

'আসেন রিকশা করে দিই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রিকশা করে দিতে হবে না।'

'চলেন যাই। আপনার সাথে একটা ছোট কথাও আছে প্রবেসার সাব।'

'কি কথা?'

'মনে রাগ কিন্তুক নিবেন না।'

'না রাগ নেব না।'

'কাইল রাইতে কি আপনার ঘরে একটা মেয়েছেলে ছিল? সকালে দেখি গেইট দিয়া বাইর হয়। আমি আটকাইলাম। চোর না কি কে জানে? শেষে বুঝলাম অন্য ব্যাপার।'

আহসান সিগারেট ধরাল। জলিল মিয়া বেশ শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার তার বক্তব্য শুরু করল, 'করিম সাবের মেয়ে তিনটা খুব মন খারাপ করছে। মেয়ে তিনটার মন খুব নরম। আপনারে খুব মানে। হেই কারণে মনে খুব কষ্ট পাইছে। মহল মেয়েটা তো কানতেছিল।'

আহসান কিছুই বলল না। জলিল মিয়া পানের পিক ফেলে বলল, 'এই সব ছোট কাজ করব আমার মতো মানুষ, আপনে হইলেন--।' জলিল মিয়া কথা শেষ করল না। মাঝ-পথে থেমে গেল। আহসান বলল, 'মহল খুব কাঁদছিল?'

'জ্বি। বয়স কম মেয়ে। দুনিয়ার হালচাল তো জানে না। এরা ভাবে এক রকম দুনিয়া চলে অন্য রকম। প্রবেসার সাব রিকশা নিয়া তাড়াতাড়ি যান গিয়া। আকাশের অবস্থা খারাপ।'

আহসান রিকশা নিল না। হাঁটতে শুরু করল। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। জোর বৃষ্টি হবে। হোক। পৃথিবী ভাসিয়ে নিয়ে যাক। ভিজতে ইচ্ছে করছে। কি যেন সেই গানটা—'এসো কর স্নান নবধারা জলে, এসো নীপবনে'।

জেরিন দরজা খুলল। খুশি-খুশি গলায় বলল, 'সত্যি তাহলে এলেন? আমার মনে হচ্ছিল—শেষ পর্যন্ত বোধ হয় আসবেন না।'

'বলে গিয়েছিলাম তো আসব।'

'তা বলে গিয়েছিলেন। পুরোপুরি বিশ্বাস করি নি। মনে হচ্ছিল পালাতে চাচ্ছেন বলে একটা অজুহাত তৈরি করেছেন।'

'পালাতে চাইলেও সবসময় পালানো যায় না।'

'ভালোই বলেছেন। যারা পালাতে চায় না তারাই শুধু পালাতে পারে। যেমন তারিন আপা। আপনার রুগী কেমন?'

'ভালো না। বাঁচবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'আপনাকে তার জন্যে খুব একটা দুঃখিত মনে হচ্ছে না।'

'দুঃখিত মনে হওয়ার কারণও নেই। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ মরছে।'

'খাবার দিতে বলি। হাত-মুখ ধোবেন তো?'

'হ্যাঁ ধোব।'

জেরিন এবং আহসান খেতে বসল। অপরিচিত একটা কাজের মেয়ে শুধু খাবারদাবার এগিয়ে দিচ্ছে। এই বাড়িতে কোনো কাজের লোকই বেশি দিন টেকে না। জেরিন লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'বাবা শুয়ে পড়েছেন। বাবার তো সব ঘড়ি ধরা, সাড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশটা বাজতেই বাতি নিভিয়ে নিদ্রা। মার মাথা ধরেছে। কাজেই খাবার সাজিয়ে একমাত্র আমিই আপনার জন্য জেগে আছি।'

'থ্যাংকস।'

'আপনি যা-যা পছন্দ করেন সবই জোগাড় করার চেষ্টা করেছি। নিধুর মা তুমি চলে যাও। তোমাকে আর লাগবে না। খাওয়া শেষ হলে বলব, তখন টেবিল গোছাবে।'

নিধুর মা চলে গেল। আহসানের খেতে ভালো লাগছে না। টেবিলে প্রচুর আয়োজন। প্রতিটি পদই চেখে দেখতে হবে ভেবেও বিরক্তি লাগছে।

'খেতে কেমন হয়েছে?'

'ভালো।'

'আপনি যে তরকারিতে খুব ঝাল খান তা মনে ছিল না। সব তরকারিই বোধ হয় আপনার কাছে মিষ্টি-মিষ্টি লাগছে।'

'তুমি রেঁধেছ?'

'কেন আমি কি রাঁধতে জানি না?'

'রাতদিন পড়াশোনা নিয়ে থাক, তাই বলছি।'

'দুলাভাই, আপনি কিন্তু কিছু খাচ্ছেন না।'

'শরীরটা ভালো নেই জেরিন। কিছু মুখে দিতে ইচ্ছে করছে না। তুমি খাও আমি বসে-বসে দেখি।'

জেরিন একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। মৃদু স্বরে বলল, 'বাবাকে আপনি চমৎকার একটা মিথ্যা কথা বললেন। শ্বশুরকে খুশি করে দিলেন।'

'মিথ্যা নাও তো হতে পারে। কোনো দিন দ্বিতীয় একটি মেয়েকে বিয়ে করব না এমন প্রতিজ্ঞা ছিল না।'

'আমার মনে হয় আপনি বাবাকে মিথ্যা বলেছেন। আজকের রাতটা আপনার জন্য খুব একটা বিশেষ রাত। এই রাতে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ের প্রসঙ্গ আপনি তুলতেই পারেন না। তুলেছেন কারণ আপনি বাবাকে নিশ্চিত করতে চেয়েছেন।'

'ঠিকই ধরেছ।'

'দুলাভাই, আপনার সঙ্গে আমি রূঢ় আচরণ করেছি। আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি ভালো করেই জানি ঐ চিঠি আপনার বাবা নিজে থেকেই লিখেছেন। সেখানে আপনার কোনো ভূমিকা নেই।'

'জানতে যখন তখন এ কথাগুলো বললে কেন?'

'খুব রাগ হচ্ছিল বলে বলেছিলাম। রাগের সময় আমরা অনেক অন্যায় কথা বলি। বলি না?'

'তা অবশ্যি বলি।'

'দুলাভাই আপনি কি আমাকে খুব অপছন্দ করেন?'

'অপছন্দ করব কেন?'

'আমার মনে হয় করেন। আপার সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই এই কারণেই করেন।'

আহসান হেসে ফেলল। জেরিন গম্ভীর গলায় বলল, 'কেউ আমাকে অপছন্দ করলে আমার খুব খারাপ লাগে। আমার সব সময় ইচ্ছা করে আমাকে সবাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালবাসুক।'

'তোমার একার না। এ-রকম ইচ্ছে আমাদের সবারই করে।'

'আমার একটু বেশি করে। আশ্চর্য কাণ্ড কি জানেন, আমার তেইশ বছর বয়স হল এখনো কেউ আমাকে ভালবাসার কথা বলে নি।'

'এখনো তো সময় সামনে আছে—ভবিষ্যতে বলবে।'

'যদি বলে তাহলে হয়ত তার মুখের ওপর হেসে ফেলব।'

'হ্যাঁ সেই সম্ভাবনাও আছে।'

আহসান উঠে পড়ল। হাত ধুতে-ধুতে বলল, 'এখন বাসার দিকে রওনা হব। তুমি আমার জন্যে যে মমতা দেখিয়েছ তা আমি অনেক দিন মনে রাখব। সো নাইস অব ইউ।'

জেরিন বিস্মিত হয়ে বলল, 'যাবেন মানে? কোথায় যাবেন?'

'বাসায় যাব। কাল ক্লাস আছে। পড়া তৈরি করব। মাস্টারদের ছাত্রদের মতো পড়া তৈরি করতে হয়।'

'আপনাদের পুরনো বাসরঘর এত কষ্ট করে সাজিয়ে রাখলাম আর আপনি চলে যাবেন?'

'ঐসব ছেলেমানুষির বয়স কি এখন আছে? গল্প-উপন্যাসে এ-সব মানায়। শূন্য বাসর-ঘরে নায়ক ঢুকবে—পুরানো স্মৃতি মনে পড়বে। সবই আছে শুধু সে নেই। বালিশের পাশে বাসি ফুলের মালা। বিছানায় স্মৃতিময় চুলের কাঁটা।'

'দুলাভাই আপনি কিন্তু যেতে পারবেন না। আপনি চলে গেলে আমার খারাপ লাগবে। খুবই খারাপ লাগবে।'

'খারাপ লাগবে কেন?'

'দুপুরে আপনার সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করেছি। এই জন্যেই খারাপ লাগবে।'

'এ-সব নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না জেরিন।'

'আমি জানি আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন না। কারণ আমাকে আপনি খুবই তুচ্ছ জ্ঞান করেন। আমি একটা মন্দ কথা বললেও আপনার কিছু যায়-আসে না।'

'এক জিনিস নিয়ে তর্ক করতে ভালো লাগছে না। ঠিক আছে তুমি খুবই তুচ্ছ। দয়া করে এক কাপ চা দাও। খেয়ে চলে যাব। ঝড়-বৃষ্টি হবে।'

জেরিন গম্ভীর মুখে চা বানিয়ে আনল। এবং খুবই হালকা গলায় বলল, 'আপনি আপনার বাড়িওয়ালার যে মেয়েটিকে বিয়ে করবেন বলে ঠিক করেছিলেন—তার নাম কি মহল?'

আহসান চমকে উঠে বলল, 'ওদের নাম জান তুমি?'

'হ্যাঁ জানি।'

'কী করে জান?'

'আপনার খোঁজে একবার গিয়েছিলাম। তখন আলাপ হয়েছে।'

'কই আমি তো কিছু জানি না। ওরা তো আমাকে কিছু বলে নি। অবশ্যি এমনিতেও ওদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয় না। মেয়েগুলো খুব লাজুক।'

'লাজুক কিনা জানি না তবে মাথায় ছিট আছে। একদিন নিউ মার্কেটে ওদের সঙ্গে দেখা। তিন বোন একসঙ্গে ওজনের যন্ত্রে দাঁড়িয়ে ওজন নিচ্ছে। তিন জন একসঙ্গে ওজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেবার পেছনে যুক্তিটা কি বলুন তো?'

আহসান শব্দ করে হেসে উঠল। জেরিন বলল, 'আপনি কি জানেন এই মেয়ে তিনটি আপনাকে খুব পছন্দ করে? বিশেষ করে মহল মেয়েটি।'

'কি করে বুঝলে?'

'ওর বড় দু' বোন আমার সামনেই এ-সব নিয়ে মহলকে ক্ষেপাতে লাগল। শেষে সেই মেয়ে কেঁদে-টেঁদে অস্থির। আচ্ছা দুলাভাই, আপার সঙ্গে কি মহল মেয়েটির কোনো মিল আছে?'

'না কোনোই মিল নেই।'

'তাহলে ঐ মেয়েটিকে এত পছন্দ করেন আর আমাকে এত অপছন্দ করেন কেন? আমার সঙ্গে তো আপার খুব মিল আছে। ভালো করে দেখুন আমি কি দেখতে অবিকল আপার মতো না?'

'না।'

'আপার মতো হলে বোধ হয় এখানে থেকে যেতে রাজি হতেন।'

'বোধ হয়। উঠি জেরিন। তুমি কি আমাকে একটা ছাতা এনে দিতে পার?'

'মনে হয় পারি।'

জেরিন ছাতা এনে দিল। অস্বাভাবিক কোমল স্বরে বলল, 'দুপুরের ঘটনার জন্যে আমি খুবই লজ্জিত। কিছু মনে করবেন না।'

'আমি কিছুই মনে করি নি।'

'যাবার আগে শুধু একটা কথা বলে যান—আপার কোন জিনিসটা আপনার কাছে খারাপ লাগত। আগেও প্রশ্ন করেছিলাম, জবাব দেন নি।'

'তোমার আপার সঙ্গে মাত্র তের মাস একসঙ্গে কাটিয়েছি। প্রচণ্ড একটা সুখের মধ্যে সময় কেটে গেছে। খারাপ কিছু চোখে পড়বে কীভাবে?'

'আপা খুব ভাগ্যবতী।'

'বিয়ের তের মাসের মাথায় মরে গেল এই জন্যে?'

'হ্যাঁ। আমিও ঠিক করে রেখেছি বিয়ের তিন মাসের মাথায় বিষ খেয়ে মরে যাব।'

'একবার তো শুনেছিলাম সারা জীবন বিয়ে করবে না। মত পাল্টেছ?'

'না। কথার কথা বলছি। ঠাট্টা করছি।'

জেরিন গেট পর্যন্ত এল। ক্লান্ত গলায় বলল, 'অনেকক্ষণ বক-বক করেছি, কিছু মনে করবেন না। দুপুর বেলার ঘটনার জন্য আমি লজ্জিত।'

'কি মুশকিল, এককথা ক'বার বলবে?'

'ঠিক আছে আর বলব না।'

জেরিন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল, কেন ফেলল আহসান বুঝতে পারল না। খুব জটিল ব্যাপার আমরা অনেক সময় চট করে বুঝে ফেলি, আবার খুব সহজ জিনিস বুঝতে পারি না।

রিকশাওয়ালা রোগা।

কিন্তু রিকশা চালাচ্ছে ঝড়ের বেগে। বৃষ্টি নামবার আগেই বাড়ি ফেরার ইচ্ছে। কিংবা রিকশা জমা দেবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। আহসান বলল, 'রিকশা কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গার?'

'মিরপুর।'

'থাক কোথায়? মিরপুর?'

'হুঁ। মিরপুর এক নম্বর।'

'ছেলে-মেয়ে আছে?'

'হুঁ।'

'ক'জন?'

রিকশাওয়ালা জবাব দিল না। আহসান লক্ষ করেছে কোনো রিকশাওয়ালাই ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব দিতে আগ্রহ বোধ করে না বরং বিরক্ত হয়। এই রিকশাওয়ালাটি যেমন হচ্ছে।

রিকশায় উঠে লম্বা আলাপ জুড়ে দেবার স্বভাবও আহসানের নয়। এই বদ অভ্যাসটি তারিনের। অচেনা, অজানা যে-কোনো মানুষের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেবে। একদিন আহসান বলেই বসল, 'কি বিশ্রী স্বভাব। অচেনা একজন মানুষের সঙ্গে কি আলাপ শুরু করলে? এটা খুবই বদ অভ্যাস।' তারিন হাসতে হাসতে বলেছে, 'বদ অভ্যাসটা ছিল বলেই তোমার সঙ্গে পরিচয় হল। নয়ত তোমার সঙ্গে পরিচয় হত না। কি ঠিক বলছি না।'

'তাই বলে রিকশাওয়ালাদের সঙ্গে আলাপ জুড়বে?'

'আলাপ কোথায়? দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

'জিজ্ঞেস করে তো ঝামেলার সৃষ্টি কর।'

'না-হয় হলই খানিকটা ঝামেলা।'

খানিকটা না, মাঝে-মাঝে বেশ বড় রকমের ঝামেলা হয়। একজন বলে বসল তার মেয়ের বিয়ে। সবকিছু যোগাড় হয়েছে শুধু জামাইয়ের জন্যে পাঞ্জাবি যোগাড় হয় নি। এখন যদি পাঞ্জাবির দামটা দেন। সবটা দিতে হবে না। তিরিশ টাকা তার কাছে আছে। তারিন বলল, 'আর কত টাকা হলে পাঞ্জাবি হয়?'

'পঞ্চাশ টেকা আম্মা। পঞ্চাশ হইলেই হয়।'

আহসান এই সময়ে ইংরেজিতে বলল, 'একটা কথাও বিশ্বাস করবে না। ডাহা মিথ্যা কথা বলছে।'

'সত্যিও তো হতে পারে। বেনিফিট অব ডাউট বলে একটা কথা আছে।'

'ওটা হচ্ছে আদালতের কথা। এটা আদালত না।'

'আদালত না হলেও আমার মনে হয় লোকটা সত্যি বলেছে।'

'আমি এক হাজার টাকা বাজি রাখতে পারি—লোকটা মিথ্যা কথা বলেছে।'

তারিন কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলেছে, 'এক কাজ করলে কেমন হয়? চল রিকশাওয়ালাকে বলি আমাদের তার বাড়িতে নিয়ে যেতে। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যাক সত্যি-সত্যি তার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে কিনা।'

'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

'পাগলের কি আছে। একটা এ্যাডভেঞ্চার।'

'অসম্ভব। তারচেয়ে তুমি ওকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দাও। ঝামেলা চুকে যাক।'

'না না চল ওর বাসায় যাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজি কথাবার্তা বন্ধ করে তারিন এবার পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'এই রিকশা চল তোমার বাড়ি যাব। দেখব তোমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে কি-না।'

রিকশাওয়ালা অবাক হয়ে রিকশা থামাল। নিচু গলায় বলল, 'সত্যি যাইবেন।'

'হ্যাঁ, কোথায় তোমার বাসা?'

'সোবানবাগ।'

'চল সোবহানবাগে।'

'সত্যি যাইবেন?'

'হ্যাঁ, যাব।'

আহসান বলল, 'ফর গডস শেক এখন আমরা একটা কাজে যাচ্ছি তারিন।'

'তেমন কোনো জরুরি কাজ না। ঘন্টা খানেক পরে গেলেও ক্ষতি হবে না। এই রিকশা চল।'

রিকশাওয়ালা গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে লাগল। আহসান বলল, 'এই দেখ সে যেতে চাচ্ছে না। তার মানে পুরো ব্যাপারটাই বানানো। ও বিয়েই করে নি—ওর মেয়ে আসবে কোত্থেকে।'

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার বিয়ে সত্যি-সত্যি হচ্ছিল। তের-চৌদ্দ বছরের একটা মেয়ে সেজেগুজে বসে আছে। কাগজের চেইন দিয়ে ঘর সাজানো। দু'টি কলাগাছ পুঁতে গেট।

শুধু পাঞ্জাবির টাকা নয়, মেয়েটির জন্যে একটি শাড়ি। মাইক ভাড়া করবার জন্যে দু' শ' টাকা দিয়ে তারিন ঘোষণা করল বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সে এখানে থাকবে। আহসান রাগী গলায় বলল, 'তার কোনো দরকার আছে?'

'আছে। এই লোকটিকে আমি অন্যায়ভাবে সন্দেহ করেছি। আমার খুব খারাপ লাগছে। তাছাড়া বেচারা তার মেয়ের বিয়ের দিনও রিকশা চালাচ্ছে, আমার মনটা ভেঙে গেছে। আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। তুমি বুঝতে পারবে না। ছোটখাট জিনিস আমাকে খুব কষ্ট দেয়।'

'সত্যি-সত্যি তুমি থাকবে?'

'হ্যাঁ থাকব? তুমি এক কাজ কর না কেন? তুমি চলে যাও।'

আহসান যেতে পারে নি। সে থেকে গেল এবং অবাক হয়ে লক্ষ করল মেয়ে বিদায়ের সময় যখন চারদিকে কান্নাকাটির মাতম উঠল তখন তারিন আড়ালে সরে গেল কারণ তার চোখ দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়ছে। সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে যেন কেউ দেখে না ফেলে।

অনেকদিন পর ঐ রিকশাওয়ালাটির সঙ্গে আহসানের দেখা হয়েছিল। আহসান চিনতে পারে নি। লোকটির চেহারা বদলে গেছে। দাড়ি রেখেছে। শরীর হয়েছে আরো দুর্বল। রিকশা এখন প্রায় টানতেই পারে না। সে ক্লান্ত গলায় বলল, 'স্যার, ভালো আছেন? আমারে চিনছেন?'

'না।'

'আমার মাইয়ার বিয়া দিলেন আপনারা।'

'ও আচ্ছা। তোমার মেয়ে ভালো আছে?'

'জ্বি না। মাইয়াটা মারা গেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহসান চুপ করে গেল। রিকশাওয়ালা বলল, 'আম্মা কেমন আছেন?'

'আমার স্ত্রীর কথা বলছ? সেও মারা গেছে। বাচ্চা হতে গিয়ে মারা গেছে। বেশিদিন হয় নি। মাস ছয় হল।'

রিকশাওয়ালা রাস্তার পাশে রিকশা থামায়। তারপর সমস্ত পথচারীদের সচকিত করে হাউ–মাউ করে কাঁদতে শুরু করল। এই তীব্র আবেগের ভগ্নাংশ হয়ত তারিনের জন্যে বাকি সবটা তার কন্যার শোক।

তারিনের মৃত্যুর পর একবারও আহসান কাঁদে নি। চোখ ভিজে ওঠে নি কখনো। মানুষ বড় আশ্চর্য প্রাণী। তারিনের কথা আজ কাল মনেও পড়ে না। চোখ বন্ধ করে চেহারা মনে করতে চাইলেও লাভ হয় না। চেহারা মনে পড়ে না। ফর্সা, রোগা, লম্বা একটি মেয়ে যে বেশিরভাগ সময়ই চুল ছাড়া রাখে এবং সেই চুলে দু' চোখের খানিকটা ঢাকা পড়ে থাকে তার সত্যিকার চেহারাটা কেমন? ছবির সঙ্গেও তার চেহারাটা ঠিক মিলানো যায় না। সবসময় মনে হয় তারিন অন্যরকম ছিল। ছবিতে চেহারা আসে নি।

হাসপাতালে যাবার আগে হঠাৎ একদিন বলল, 'কেন জানি মনে হচ্ছে হাসপাতাল থেকে আর ফিরে আসব না। ইট ইজ এ ওয়ান ওয়ে জার্নি।'

আহসান হাসতে হাসতে বলেছে, 'প্রতিটি প্রেগনেন্ট মেয়ে যখন হাসপাতালে যায় তখন তার এই কথা মনে হয়। সে ঠিকই ফিরে আসে।'

'ধর যদি না আসি তখন কী হবে?'

'কি হবে বলতে কী মিন করছ?'

'তোমার খুব নিঃসঙ্গ লাগবে না?'

'লাগারই তো কথা।'

'বিয়ে তো করবেই। করবে না।'

'এখন কী করে বলি? সময় আসুক।'

'বিপত্নীক মানুষ খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করে। ওরা নিঃসঙ্গ বোধ করে সেই জন্যেই করে। এতে ওদের কোনো দোষ নেই।'

'আমি বিয়ে করলে তোমার আপত্তি হবে না।'

তারিন সহজ স্বরে বলল, 'না আপত্তি হবে কেন? তবে একটা কথা বলি মন দিয়ে শোন। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। কিছুদিন অপেক্ষা করবে।'

'কীসের জন্যে অপেক্ষা?'

'মনে কর চট করে তুমি বিয়ে করে ফেললে। নতুন একটি মেয়ে এল অথচ তখনো আমার কথা তোমার পুরোপুরি মনে আছে। তুমি সারাক্ষণ আমার সঙ্গে মেয়েটির তুলনা করবে। নিজে কষ্ট পাবে মেয়েটিকেও কষ্ট দেবে। কাজেই তোমার উচিত হবে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করা।'

আহসান হাসতে হাসতে বলল, 'কতদিন?'

'তুমি চোখ বন্ধ করে আমার মুখ কল্পনা করার চেষ্টা করবে। যেদিন দেখবে আর কল্পনা করতে পারছ না সেদিন তোমার মুক্তি।'

তারিনের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর আহসান তার মুখ কল্পনা করতে চেষ্টা করল। পারল না। অসহ্য কষ্টে সারা রাত জেগে রইল। মানুষ বড় বিচিত্র প্রাণী। তারিন শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেই চলে যায় নি সবকিছু সঙ্গে নিয়ে গেছে। এমন করল কেন সে?

তারিন মারা গিয়েছিল রক্তক্ষরণজনিত কারণে। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান রক্তপাত বন্ধের জন্যে কিছুই করতে পারল না। তিন দিনে সাত বার রক্ত দেওয়া হল। অষ্টমবারের বার তারিন বলল, 'আর না। বাদ দিন। আমার ছেলেকে আমার পাশে শুইয়ে দিন। আর ছেলের বাবাকে একটু আসতে বলুন।'

আহসান পাশে এসে বসল। তারিন মৃদু গলায় বলল, 'কি হচ্ছে বুঝতে পারছ?'

'কিছু হচ্ছে না। তুমি সুস্থ হয়ে বাসায় যাবে।'

'যেতে পারলে মন্দ হত না। তুমি এখন আর আমার সামনে থেকে নড়বে না। হাত ধরে বসে থাক। লজ্জা লাগছে না তো আবার?'

'না লজ্জা লাগছে না।'

তারিন ফিস-ফিস করে বলল,'Since there is no help come let us kiss and say good bye.

'কি-সব আজেবাজে কথা বলছ?'

'ঠাট্টা করছি। মরতে বসেছি বলে কি ঠাট্টাও করতে পারব না? তোমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছি।'

তারিন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের মতো খিল-খিল করে হেসে উঠল। সতেজ প্রাণময় হাসি। সে মারা গেল তার মাত্র চার ঘন্টা পর। মৃত্যুর সময় তার জ্ঞান ছিল না। থাকলে হয়ত তখনো মজার কিছু বলার চেষ্টা করত। বেঁচে থাকাটা তার জন্যে খুব সুখের ব্যাপার ছিল বলেই বোধ হয় সে বেঁচে থাকতে পারল না।

রিকশা আদাবর পর্যন্ত ঠিক করা কিন্তু আহসান শ্যামলীতে নেমে পড়ল। সাত টাকা ভাড়া ঠিক করা ছিল সে দিল দশ টাকা। কোমল স্বরে বলল, 'ভাংতি ফেরত দিতে হবে না।' রিকশাওয়ালা অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। আহসান বলল, 'বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে।'

'জ্বি স্যার।'

'তোমার রিকশার জমার টাইম হয়ে গেছে বোধ হয়।'

'জ্বি স্যার।'

'যাও তাহলে আর দেরি করবে না। দেরি করলে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পড়ে যাবে।'

রিকশাওয়ালা থেমে থেমে বলল, 'আপনে আমার ছেলেপুলে কয়জন জিগাইছিলেন— আমার দুই পুলা।'

'ভালো, খুব ভালো।'

'বড় পুলারে ইস্কুলে দিছি।'

'খুব ভালো করেছ।'

'তাইলে স্যার যাই। স্লামালিকুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

রিকশাওয়ালা চলে যেতেই আহসানের ইচ্ছে করল রেবা বা পারুল নামের ঐ মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে। যে মেয়েটি দেখতে তারিনের মতো। তাকে কিছু টাকা-পয়সা দিতে ইচ্ছে করছে। আজকের রাতে সে যেন নিজের ঘরে গিয়ে আরাম করে ঘুমুতে পারে। আজ যেন কেউ তাকে বিরক্ত না করে। হয়ত এই মেয়েটির ঘরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঙ্গু স্বামী আছে, শিশুপুত্র আছে। আজ রাতটি সে তার স্বামীর পাশে শুয়ে থাকুক। একটি হাত রাখুক স্বামীর গায়ে।

আহসান এগিয়ে গেল সিগারেটের দোকানের দিকে। এরা গভীর রাত পর্যন্ত ছোট দোকান সাজিয়ে বসে থাকে। নিশিকন্যাদের খবর এরাই সবচেয়ে ভালো জানবে।

'একটা রোগামতো ফর্সা মেয়ে। বাজে টাইপের মেয়ে এদিকেই থাকে। তুমি দেখেছ তাকে? রেবা কিংবা পারুল নাম।'

দোকানদার রাগী চোখে তাকিয়ে রইল। আহসান বলল, 'তুমি তাকে দেখ নি কোনো দিন।'

'দেখছি। দেখমু না কেন? আল্লায় চউখ দিছে দেখনের লাগিন।'

'আজ দেখেছ?'

'না। তয় বাস স্ট্যান্ডের কাছে গিয়ে দেখেন। রাইত বেশি হইলে ঐখানে দাঁড়াইয়া কাস্টমার খুঁজে।'

রেবা বা পারুল নামের মেয়েটিকে পাওয়া গেল। পুরোপুরি নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। আজ তার হাতে চটের একটা ব্যাগ। আহসানকে দেখে সে একটুও চমকাল না বা অবাক হল না। বিস্মিত হবার ক্ষমতা সম্ভবত এ-জাতীয় মেয়েদের নষ্ট হয়ে যায়। পৃথিবীর কোনো কিছুই তাদেরকে আর অভিভূত করতে পারে না।

'কেমন আছ পারুল।'

মেয়েটি জবাব দিল না। চোখ বড়-বড় করে তাকাল।

'অন্য স্যান্ডেলটি খুঁজে পেয়েছিলে?'

'না।'

'এস আমার সঙ্গে। আমি দেখেছি কোথায় আছে।'

পারুল নিঃশব্দে এগিয়ে এল।

'তোমার হাতে ব্যাগ কেন? ব্যাগে কি আছে?'

'সদাই।'

'ঐ দিন কিছু না বলে চলে গেলে আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলাম।'

'খামাখা টেকা দিবেন কেন?'

'খামাখা নয়। কারণ আছে।'

আহসান আশা করছিল মেয়েটি বলবে—কি কারণ? কিন্তু সে বলল না। নিঃশব্দে পেছনে-পেছনে আসতে লাগল।

'ঐ যে দেখ তোমার স্যান্ডেল।'

মেয়েটি গভীর মমতায় স্যান্ডেলটি তুলল। আহসান অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, 'তুমি কি এখানে ফুলের গন্ধ পাচ্ছ? এই জায়গাটার একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। মাঝে-মাঝে ফুলের গন্ধ পাওয়া যায় অথচ আশেপাশে কোনো ফুলের গাছ নেই।'

'ফুলের গন্ধ না। আগরবাতির গন্ধ।'

'আগরবাতির গন্ধ?'

'হুঁ। পীর সাবের একটা মাজার আছে দোকানের পিছনে। এরা আগরবাত্তি জ্বালায়।'

'ও আচ্ছা। হ্যাঁ তাই। এখন মনে হচ্ছে আগরবাতিরই গন্ধ। এই জিনিসটি নিয়ে আমি অনেকদিন ভেবেছি বুঝলে? কারণটা বের করতে পারি নি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটি হাসছে। সরল সহজ হাসি। পৃথিবীর কোনো মালিন্য সেই হাসিকে স্পর্শ করে নি।

'পারুল।'

'জ্বি।'

'এস আমার সঙ্গে।'

মেয়েটি ছোট-ছোট পা ফেলতে লাগল। আহসান বলল, 'তোমার যখন টাকা-পয়সার দরকার হবে আসবে আমার কাছে, কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে না। আমার স্ত্রীর চেহারার সঙ্গে তোমার খুব মিল আছে এই জন্যেই একথা বলছি।'

'কতদিন আপনে আর আমারে টেকা দিবেন? আমার দুইটা মাইয়া আছে। না খাইয়া সারা দিন বইসা থাকে। দুনিয়াডা খুব খারাপ জায়গা ভাইজান।'

'হ্যাঁ খুবই খারাপ। দি উইন্টার অব ডিসকনটেন্ট।'

পারুল দাঁড়িয়ে পড়ল। শান্তস্বরে বলল, 'আপনের কাছ থাইক্যা টেকা নিতাম না।'

'কেন?'

'ঝড় বৃষ্টি আইতাছে ঘরে যামু।'

'হেটে হেঁটে যাবে?'

'জ্বি।'

'চল তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিই।'

'না। আপনে ঘরে যান।'

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল। পরক্ষণেই দ্রুত পা ফেলতে লাগল।

বাতাস বইতে শুরু করেছে। শিগগিরই বৃষ্টি নামবে। মেয়েটি কি পারবে বৃষ্টির আগে আগে ফিরে যেতে। হয়ত পারবে হয়ত পারবে না।

AMARBOI.COM

করিম সাহেবের বাড়ির সবগুলো আলো জ্বলছে, কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে দূর থেকে। আজ এদের খুব দুঃখের রাত।

আহসান নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। বারান্দায় জলিল মিয়া এবং তার হেল্পার উবু হয়ে বসেছিল। তারা তাকাল কিন্তু কিছু বলল না।

ঝড় বৃষ্টি শুরু হল রাত বারটার দিকে। ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে চারদিকে নিকষ অন্ধকার। আহসান মোমবাতি জ্বালিয়েছে। বাতাসের ঝাপটায় মোমবাতি নিবু-নিবু হয়েও আবার জ্বলে উঠছে। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে কান্নার শব্দ মিলে গিয়ে কি যে অদ্ভুত শোনাচ্ছে।

এই রাতটির সঙ্গে তার বিয়ের রাতের বড় অদ্ভুত মিল তো। বিয়ের রাতেও ঠিক এই ব্যাপার। তাদের বাসর দোতলায়। হঠাৎ করে ঠিক করা। ফুলটুল কিছুই জোগাড় হয় নি। পুরনো আমলের বিশাল পালঙ্কে বড়-বড় ফুল আঁকা একটা চাদর শুধু বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানালার একটা কাঁচ ভাঙা। কাঁচের ভেতর দিয়ে বার-বার পানির ঝাপটা আসছে। ইলেকট্রিসিটি নেই। দু'টি মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। অনেক রাতে হাতে একটা হারিকেন নিয়ে তারিন ঢুকল। আহসান বলল, 'বাসর রাতে হারিকেন! ভারি কুৎসিত ব্যাপার—ওটা বাইরে রেখে আস।'

'হু, তারপর অন্ধকারে ভূতের ভয়ে কাঁপি। হারিকেন থাকবে। ইস পালঙ্ক তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিজে জবজবে। এসো না ধরাধরি করে পালঙ্কটা সরাই।'

দু' জনে বহু ঠেলাঠেলি করেও সেই গন্ধমাদন পর্বত একচুল সরাতে পারল না। তারিন বলল, 'নিচ থকে দু' একজনকে ডেকে আনব?' আহসান বলল, 'থাক ডাকতে হবে না।'

তারিন খুব খুশি। হাসিমুখে বলল, 'গল্প করেই রাতটা কাটিয়ে দিই কি বল? বল তুমি একটি গল্প, তারপর আমি বলব। এইভাবে চলবে সারা রাত। নাকি আমি শুরু করব—এক ছিল টোনা আর এক ছিল টুনি। টোনা কহিল, টুনি পিঠা তৈরি কর---'তারিন গল্প বলছে আর হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। আহসান বলল, 'বাসর রাতে এত হাসতে নেই।'

'কেন? হাসতে নেই কেন?'

'বাসর রাতে হাসা খুব অলক্ষণ।'

'বলেছে তোমাকে।'

'সত্যি অলক্ষণ। বেহুলা বাসর রাতে খুব হাসাহাসি করছিল, তার ফলে লখিন্দর বেচারার কি অবস্থা হল দেখলে না?'

'সত্যি বেহুলা হাসাহাসি করছিল? নাকি তুমি বানিয়ে বানিয়ে বলছ?'

'সত্যি হাসছিল।'

'বেশ তাহলে আর হাসব না।'

তারিন চুপ করে গেল। আর ঠিক তখনি নিচ থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসল। মেয়েলি গলায় কান্না। আহসান চমকে উঠে বলল, 'কে কাঁদছে?'

'আমার দাদি। ওঁনার মাথার ঠিক নেই। রাত-বিরেতে উনি এ-রকম কাঁদেন।'

'বল কি?'

'সবসময় না মাঝে-মাঝে।'

'সারা রাতই কি কাঁদবেন?'

'হ্যাঁ কাঁদবেন। বুড়ো মানুষদের কত রকম কষ্ট।'

বলতে বলতে তারিনের চোখে পানি এসে গেল। আহসান বলল, 'বাসর রাতে কাঁদতেও নেই। কাঁদাও অলক্ষণ।' তারিন আঁচলে চোখ মুছে সঙ্গে সঙ্গে হাসল।

ঐ রাতের সঙ্গে আজকের রাতের কি অদ্ভুত মিল। আজো ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। নিচ থেকে কান্নার শব্দ আসছে। মোমবাতি জ্বলছে ঘরে। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এ-ঘরেও জানালার একটি কাঁচ ভাঙা। প্রচুর বৃষ্টির পানি ঢুকছে। আহসান চোখ বন্ধ করে তারিনের মুখ মনে করতে চেষ্টা করল—পারল না।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ছোট ছোট পা ফেলে কে যেন আসছে। কে হতে পারে? থমকে দাঁড়াল দরজার পাশে। আহসান বলল, 'কে?' কেউ জবাব দিল না। সে উঠে এসে দরজা খুলে দিল। মহল হারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার এক হাতে একটা থালায় কয়েকটা মিষ্টি। সে মিষ্টির থালাটা নিঃশব্দে আহসানের সামনে নামিয়ে রাখল। মৃদু স্বরে প্রায় ফিস-ফিস করে বলল, 'আব্বাজানের অপারেশন খুব ভালো হয়েছে। ডাক্তাররা বলেছে ভয়ের আর কিছু নেই। মিলাদের মিষ্টি। একটু খান।'

আহসান অবাক হয়ে বলল, 'এত বিরাট আনন্দের খবর। সবাই কাঁদছে কেন?'

'খুশিতে কাঁদতেছে। খুশির কাঁদা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মহল তুমি বস—একটু বস। আমি নিজেও অসম্ভব খুশি হয়েছি। বস তুমি—একটু বস।'

মহল অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। যেন আহসানের কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। সে ভয়ে ভয়ে চেয়ারে বসল। আহসান সহজ স্বরে বলল, 'তোমাকে আমি খুব একটা জরুরি কথা বলতে চাই মহল। আজ না বললেও চলত তবু আজই বলতে চাই। কথাটা বলার জন্যে আজ রাতের মতো চমৎকার একটা রাত আর আসবে না। কথাটা হচ্ছে—'

আহসান একটু থামল। মহল চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। তার চোখে শঙ্কার ছায়া। তার হাতের হারিকেন কাঁপছে। বিচিত্র সব নক্শা তৈরি হচ্ছে দেয়ালে, আহসান শান্ত স্বরে বলল, 'তোমার বাবা যখন সুস্থ হয়ে বাসায় আসবেন তখন তাঁকে আমি একটা অনুরোধ করতে চাই। তাঁকে বলতে চাই যে আপনার তিন নম্বর মেয়েটিকে আমি বিয়ে করতে চাই। যদি আপনি রাজি হন তাহলে আমার আনন্দের সীমা থাকবে না।'

মহল এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, চোখে পলক পর্যন্ত পড়ছে না। আহসান হাসি-হাসি মুখে বলল, 'তোমারও রাজি হওয়া না হওয়ার একটা প্রশ্ন আছে, তাই না? তুমি যদি রাজি থাক তাহলে আমার জন্যে খুব চমৎকার এক কাপ চা বানিয়ে নিয়ে এস। খুব চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছে।'

অনেকক্ষণ কেটে গেছে মহল আসছে না। বাইরে তুমুল বর্ষণ হচ্ছে। আহসান যখন প্রায় নিশ্চিত যে মহল আসবে না তখনই চুড়ির শব্দ পাওয়া গেল। চায়ের কাপ হাতে মহল ঢুকল মাথা নিচু করে। সে এর মধ্যে কাপড় বদলে সুন্দর একটা শাড়ি পরেছে। চুল বেঁধে চোখে কাজল দিয়েছে। হাত-ভর্তি লাল কাঁচের চুড়ি। আহসান হাসি মুখে বলল, 'মহল তোমাকে ভারি সুন্দর লাগছে।'

মহলের মাথা আরো নিচু হয়ে গেল। দরজার ওপাশে চাপা হাসি। চুড়ির শব্দ। আহসান বাইরে উঁকি দিল। দরজার ওপাশে বড় দু' বোনও দাঁড়িয়ে আছে। ওরাও অবিকল মহলের মতো শাড়ি পরেছে। চোখে কাজল দিয়েছে—চুল বেঁধেছে। সবার হাত ভর্তি লাল চুড়ি। আহসান উঁকি দিতেই ওরা শব্দ করে ছুটে পালাল। মহল মাথা নিচু করে আছে। কি ভাবছে মনে-মনে কে জানে।

'মহল।'

'জ্বি।'

'একটা গল্প বল।'

মহল বিস্মিত হয়ে তাকাচ্ছে।

'গল্প জান না?'

মহল তার উত্তর দিল না। মুখ ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকাল। সেখানে তারিনের ছবি। সে যেন হাসি-হাসি মুখে দেখছে এদের দু'জনকে।

'মহল।'

'জ্বি।'

'এই লাইনটির মানে জান? Since there is no help come let us kiss and part'.

মহল উত্তর দিল না। আহসান কোমল গলায় বলল, 'ঐ লাইনটির মানে তোমার জানার প্রয়োজন নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বৈরথ

১

বাথরুমের দরজা খোলা। লোকটা অনেকক্ষণ ধরে বাথরুমে। বিশ্রী রকমের একটা আওয়াজ আসছে। গঁরল–গঁল–গঁরল। একজন মানুষ এমন কুৎসিত শব্দে গার্গল করে কিভাবে? সুন্দর শোভন কিছুই কি মানুষটার নেই?

সোমা হাই তুলল। মাত্র ন'টা বাজে। এর মধ্যে হাই ওঠার কথা না। কিন্তু এই মানুষটি আশেপাশে থাকলে তার হাই ওঠে। লোকটি অবশ্য বুঝতে পারে না। হাই ওঠার সঙ্গে যে অবহেলার একটা ব্যাপার আছে, তা বোধহয় সে জানেও না। জানলেও তার হয়তো কিছু যায় আসে না।

'সোমা।'

লোকটার গলার স্বর অবশ্যি মিষ্টি। না, মিষ্টি বলাটা ঠিক হচ্ছে না। পুরুষদের গলা মিষ্টি হয় না। ধাতব একটা ঝংকার শুধু থাকে। এই লোকের তা আছে। শুনতে ভালো লাগে। কথা শুনলে জবাব দিতে ইচ্ছে করে।

'এই সোমা।'

'আসছি।'

'একটু লবণ দাও।'

'লবণ দিয়ে কী করবে?'

'দাঁত ঘষব। শালা দাঁতে পেইন উঠেছে।'

সোমা লবণ আনতে গেল। তার কানে ঝনঝন করে বাজছে—দাঁত ঘষব। শালা দাঁতে পেইন উঠেছে। লোকটা কি ইচ্ছে করলে শালা শব্দটা বাদ দিতে পারত না? বোধহয় না। এইসব শব্দ তার রক্তে মিশে আছে। এই ঘরে একটা সাদা রঙের বিড়াল আসে। বিড়ালটার একটা চোখ নষ্ট। তাই সে বিড়ালটাকে ডাকে কানাশালি। বিড়ালটাকে শালি না ডাকলে কি চলত না?

সোমা ঝকঝকে একটা পিরিচের ঠিক মাঝখানে খানিকটা লবণ নিল। কিছু

ছড়িয়ে গিয়েছিল—সাবধানে সে একত্র করল। অসুন্দর কোনোকিছুই তার ভালো লাগে না। যদিও তাকে বাস করতে হয় অসুন্দরের মধ্যে।

লোকটা তার হাত থেকে পিরিচ নিল। লবণ কত সুন্দর করে সাজানো সে-দিকে সে লক্ষও করছে না। আঙুলে লবণ নিয়ে বিকট ভঙ্গিতে দাঁত ঘষছে। মাঝে-মাঝে থু-থু করে থুথু ফেলছে। সোমা বাথরুমের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়িয়ে না থাকলেও চলত, তবুও সে দাঁড়িয়ে আছে। কেন আছে লোকটা কি তা জানে? মনে হয় জানে না।

'সোমা।'

'বল।'

'শালার রক্ত পড়ছে। মাঢ়ী নষ্ট হয়ে গেছে। নিমের ডাল জোগাড় করতে হবে। টুথপেস্ট ফুতপেস্ট দাঁতের বারটা বাজিয়ে দেয়।'

কিছু বলবে না বলবে না করেও সোমা বলল, 'নিমের ডাল কোথায় পাবে?'

'আছে সবই আছে। ঢাকা শহরে সব আছে। শালার ইন্টারেস্টিং একটা শহর। ভেরি ইন্টারেস্টিং।'

'ভাত বাড়ব?'

'বাড়। মিনু হারামজাদী কোথায়?'

'ঘুমুচ্ছে।'

'নয়টা বাজতেই ঘুম—হারামজাদী পেয়েছে কী? মাসে সত্তর টাকা দিই ওর মুখ দেখার জন্য? কানে ধরে তোল। এগারটার আগে ঘুমাতে দেখলে থাপ্পড় দিয়ে হারামজাদীর দাঁত ফেলে দেব।'

'ওর জ্বর। আমি ভাত বাড়ছি—অসুবিধা তো কিছু নেই।'

'অসুবিধা থাকুক আর না থাকুক, ন'টার সময় ঘুমাবে কেন? ফাজিলের ফাজিল।'

সোমা রান্না ঘরে চলে গেল। খাবার গরম করল। কেটলিতে চায়ের পানি চড়িয়ে দিল। খাওয়াদাওয়ার পর লোকটা এক কাপ চা খায়। আদা দিয়ে কড়া এক কাপ চা। এতে নাকি পিত্ত পরিষ্কার হয়। আজ খাওয়ার আয়োজন ভালো না। ছোট মাছের তরকারি, আলু ভাজা এবং ডাল। মুগের ডাল। লোকটার খুব প্রিয় জিনিস। হুস-হুস শব্দ করে ডাল খাবে। চোখ চকচক করতে থাকবে। খাবার সময় বেশ কয়েকবার বলবে—ভালো হয়েছে। গুড কুকিং। এক নম্বরি ডাল।

তারা খেতে বসতে বসতে দশটা বেজে গেল। বারান্দায় টেবিল। দু'জনে বসেছে মুখোমুখি। লোকটা প্লেটে ডাল নিতে নিতে বলল, 'মুগের ডাল না-কি?'

সোমা জবাব দিল না। লোকটা হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে আছে।

'ডালের গন্ধটা ফাইন। মনে হচ্ছে গুড কুকিং হয়েছে। ডাল ভেজে নিয়েছিলে?'

'হুঁ।'

'গুড। ভেরি গুড। মুগের ডালের আসল রহস্য ভাজার মধ্যে। অল্প ভাজাও যাবে না, আবার বেশিও ভাজা যাবে না। ডিফিকাল্ট। খুব ডিফিকাল্ট।'

সাদা বিড়ালটা চলে এসেছে। লোকটার পায়ের কাছে ঘুর-ঘুর করছে। খামচি দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। খেতে না দেওয়া পর্যন্ত এ-রকম করতেই থাকবে। মাঝে-মাঝে কামড়ও দেবে।

'সোমা।'

'বল।'

'কানাশালির আবার পেট হয়েছে—দেখছ? শালি ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে। প্রতি তিন মাসে এক বার করে পেট। অবস্থাটা চিন্তা কর। শালি মনে হচ্ছে বিরাট প্রেমিকা।'

সোমা মুখ নিচু করে খেয়ে যাচ্ছে। কথাগুলো শুনতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু উপায় নেই। শুনতেই হবে। অসুন্দর কোনো দৃশ্য দেখতে না চাইলে আমরা চোখ বন্ধ করতে পারি। কান বন্ধ করার কোনো উপায় নেই।

'সোমা'

'বল।'

'শালির লাইগেশন করিয়ে দিলে কেমন হয়? ফুর্তি করে বেড়াবে। পেট হবে না। ফাইন ব্যবস্থা। বিড়ালেরও লাইগেশন হয়। তুমি জান?'

'জানি না।'

'হয়। খোঁজ নিয়েছি। বদরুল সায়েবের এক শালা পশু হাসপাতালের কম্পাউন্ডার। তার কাছে শুনলাম। শালিকে পশু হাসপাতালে নিয়ে যাব। কষ্টটা দেখ না, তিন মাস পর-পর—ডালটা ভালো হয়েছে। গুড কুকিং।'

সোমা জবাব দিল না। জবাব দেবার কিছু নেই।

লোকটা গম্ভীর গলায় বলল, 'বিড়াল জানোয়ার ভালো। ফুর্তিফার্তা যা করে মানুষের আড়ালে করে, আর কুকুরের অবস্থাটা দেখ—'

সোমা ভাবল লোকটাকে কঠিন কিছু বলবে। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। থাক আজ আর বলে কি হবে? কোনো দরকার নেই। সোমা উঠে পড়ল। লোকটা বিস্মিত হয়ে বলল, 'খাওয়া হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'একটা বাটিতে করে শালিকে খানিকটা দুধ খেতে দাও। এখন শালির ভালো মন্দ খাওয়া দরকার। ডালটা ভালো হয়েছে সোমা। গুড কুকিং।'

সোমা বাটিতে করে বেশ খানিকটা দুধ বিড়ালটাকে এনে দিল। বিড়ালটা জিভ ভিজিয়ে ভিজিয়ে দুধ খাচ্ছে আবার ফিরে যাচ্ছে লোকটার পায়ের কাছে। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আবার ফিরে আসছে বাটির কাছে। সোমার কাছে এক বারও আসছে না। বিড়ালরাও অনেক কিছু বুঝতে পারে।

'সোমা।'

'বল।'

'শালিকে এখন থেকে রোজ খানিকটা দুধ দেবে। এই সময় খাওয়াটা ভালো দরকার। তিন মাস পরপর পেট হয়ে যাচ্ছে। কি অবস্থা দেখ।'

লোকটা শব্দ করে ঢেকুর তুলল। বাটিতে সামান্য যা ডাল ছিল চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলল। গোঁফে হলুদ রঙের ছোপ। সোমা এক বার ভাবল, বলবে গোঁফে ডাল লেগেছে। শেষ পর্যন্ত আর বলল না।

'চা দাও সোমা, খাওয়া হয়ে গেছে। আজকের মতো একসেলেন্ট ডাল অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিন খাওয়া হয় নি। মাছের একটা মাথা যদি দিতে পারতে তা হলে দেখতে কি জিনিস হত।'

সোমা চা দিতে এসে দেখে লোকটা মেঝেতে উবু হয়ে বসে আছে। বিড়ালের দুধ খাওয়া দেখছে। এখনো হাত ধোয়া হয় নি। ডাল শুকিয়ে হলুদ দাগ পড়েছে।

'চা নাও।'

'শালির দুধ খাওয়ার কায়দাটা দেখেছ? কেমন ঘুরে ঘুরে খায়। অদ্ভুত কাণ্ড।'

সোমা দাঁড়িয়ে রইল। সে বিড়ালের দুধ খাওয়া দেখছে না। লোকটাকে দেখছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই যাকে সে অত্যন্ত কঠিন কিছু কথা বলবে। কঠিন কথাগুলো শুনে সে কি করবে কে জানে, চায়ের কাপ ছুঁড়ে ফেলবে? চিৎকার চেঁচামেচি করবে? গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? কিছুই বলা যাচ্ছে না। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে একটা মানুষ কেমন আচরণ করে তা বলা খুবই কঠিন।

'চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

'শালি কেমন ঘুরে ঘুরে দুধ খায় দেখেছ? ইন্টারেস্টিং। ভেরি ইন্টারেস্টিং।'

সোমা সহজ স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'হাত-মুখ ধুয়ে তুমি বসার ঘরে একটু আসবে? তোমার সঙ্গে খুব জরুরি কিছু কথা আছে।'

লোকটা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সোমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে কি কিছু আঁচ করতে পারছে? মনে হয় না। আঁচ করতে পারলে থমথমে গলায় বলত—কি জরুরি কথা? সে কিছুই না বলে বাথরুমে হাত-মুখ ধুতে ঢুকল। বাথরুম থেকেই চেঁচিয়ে বলল, 'চা খাব না। একটা পান দাও।'

সোমাদের বসার ঘরটা ছোট। এই ছোট ঘরের একটা অংশে মিনু শুয়ে আছে। বার বার এ-পাশ ও-পাশ করছে। জ্বর বেড়েছে বোধহয়। অন্য সময় হলে সোমা মেয়েটার জ্বর দেখত। ঘুম ভাঙিয়ে কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করত। আজ তা করল না। জরুরি কথাগুলো শেষ হোক। তারপর যদি সুযোগ হয় তখন দেখা যাবে।

বসার ঘরে চারটা বেতের চেয়ার। মাঝখানে গোল টেবিলে ধবধবে সাদা টেবিল ক্লথ। টেবিল ক্লথের ঠিক মাঝখানে লাল রঙা পিরিচে পান। সাদা, লাল এবং সবুজ রঙ কি সুন্দর লাগছে।

লোকটা সোমার সামনের চেয়ারে বসল। তার চোখ লালচে। রাতের বেলা তার চোখ লালচে হয়ে থাকে। ভোরবেলা আবার সাদা হয়ে যায়। বাঁ চোখ অবশ্যি সাদা হয় না। লালচে আভা খানিকটা থেকেই যায়। ছোট বেলায় নাকি বাঁ চোখে চোট খেয়েছিল।

'পান দাও।'

লোকটা পান নিতে নিতে কঠিন চোখে তিন চার বার তাকাল। আজ তার চোখ অন্য দিনের চেয়েও লাল মনে হচ্ছে। না-কি এটা সোমার মনের ভুল?

'সোমা।'

'বল।'

'তোমার কোনো জরুরি কথা বলার দরকার নেই। জরুরি কথা আমি জানি। বিজু এসেছিল—ও সব কথা বলল।'

'কখন এসেছিল?'

'দুপুরের দিকে রহমতের চায়ের স্টলে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহমতের চায়ের স্টলে লোকটা রোজ এক বার যায়। দুপুরের দিকেই যায়। ঐ স্টলে তার শেয়ার আছে কিন্তু বিজুর তো তা জানার কথা না। জানল কি করে?

সোমা পান খায় না। তখন একটা মুখে দিল। জর্দা দেওয়া পান। পানের কষটা পিকে মুখ ভরে যাচ্ছে। মাথা ঝিম ঝিম করছে। জর্দার রসে মুখ ভর্তি হয়ে আসছে। ফেলার উপায় নেই। ফেলতে হলে উঠে যেতে হবে। এখন ওঠা সম্ভব না।

"বিজু যা করছে বলার না। চেঁচামেচি হৈ চৈ। আমি বললাম, 'ভদ্রলোকের ছেলে চেঁচাচ্ছ কেন?' এতে তার রাগ আরো বেড়ে গেল। লোকজনের সামনে ইতর ছোটলোক, জেলের ঘুঘু এইসব বলেছে।"

সোমা বিব্রত স্বরে বলল, 'বিজুর মাথা সবসময় গরম। ওকে কেউ তোমার কাছে যেতে বলে নি। নিজে নিজেই গিয়েছে।'

'গিয়েই ভালো করেছে। না গেলে জানতাম যে তুমি আজ ডিভোর্স পেয়ে বসে আছ? বিজুর কারণে জানলাম।'

'তুমি তো জানতে যে আমি ডিভোর্স চেয়ে চিঠি দিয়েছি। জানতে না?'

'হ্যাঁ জানতাম। ব্যাপারগুলো এত তাড়াতাড়ি হয় জানতাম না। এক বার কোর্টে যেতে হল না, কিছু না—হঠাৎ শুনি ডিভোর্স।'

'এইসব কেইস কোর্টে যায় না।'

'তাইতো দেখছি। ব্যাপারটা এত সহজ আমি জানতাম না।'

'জানলে কী করতে?'

'করতাম আর কি? করার কি আছে?'

'বিজু কি খুব হৈ চৈ করেছিল?'

'করেছিল মানে? দেখার মতো একটা দৃশ্য। লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি। বলে কি—তুই জেলের ঘুঘু, চামারের চামার। জেল যখন খেটেছি জেলের ঘুঘু তো বলবেই। তুই তোকারি কেন?'

'ওর মাথা গরম।'

'মাথা আমারও গরম। আমার কি মাথা ঠাণ্ডা? মাথা ঠাণ্ডা হলে চার বছর জেল খেটে আসি? ঠাণ্ডা মাথায় ক'টা লোক জেলের ভাত খায়?'

'তোমার মাথা অনেক ঠাণ্ডা।'

'সমাজে চলতে ফিরতে হয় এই জন্যে ঠাণ্ডা রাখি। আসলে ঠাণ্ডা না। তুমি এতসব ঝামেলা না করে আমাকে গুছিয়ে বললেই হত।'

'বললেই তুমি আমাকে চলে যেতে দিতে?'

'যে থাকতে না চায় তাকে ধরে রাখা যায়? আমার কি জেলখানা আছে যে তোমাকে জেলখানায় আটকে রাখব?'

সোমা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'কাগজপত্র দেখতে চাও?'

'কাগজ দেখে কি হবে?'

'কিছু হবে না, তবু যদি দেখতে চাও।'

'দূর দূর।'

লোকটা হাই তুলল। কী আশ্চর্য! এই অবস্থায় কেউ হাই তুলতে পারে? সত্যি সত্যি কি লোকটার ঘুম আসছে? না-কি সে ভান করছে। না, ভান নিশ্চয়ই করছে না।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটা ভান করতে পারে না। আচ্ছা এই লোক কি নির্বোধ? কারণ একমাত্র নির্বোধরাই ভান করতে পারে না। সাদা বিড়ালটা এসে লোকটার পায়ে গা ঘষছে। আঙুল কামড়ে ধরছে। বড় ঝামেলা করছে। মাঝে মাঝে বিড়ালটা খুব বিরক্ত করে—তখন লাথি খায়। আজও নিশ্চয়ই লাথি খাবে। কিংবা কে জানে হয়তো লাথি খাবে না। আজকের রাতটা আর অন্য দশটা রাতের মতো নয়। লোকটি আবার হাই তুলল; চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। লাথির ভয়েই হয়তো বিড়ালটা ছুটে পালিয়ে গেল।

'সোমা।'

'বল।'

'কাল কখন যাবে?'

'দশটা এগারটার দিকে।'

'ও আচ্ছা। আমি আটটার সময় চলে যাব। নারায়ণগঞ্জ যেতে হবে। ঘুম ভাঙলে হয়। শালার ঘুম ভাঙে না।'

'আমি সাতটার সময় ডেকে দেব।'

'নাশতা–টাশতার হাঙ্গামা করার দরকার নেই। চা খেয়ে চলে যাব। যাও ঘুমুতে যাও।'

লোকটা সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে শোবার ঘরে চলে গেল। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে কিন্তু তার কোনো ছাপ তার আচার অচরণে নেই। যেন আজকের রাতটা অন্য আর দশটা রাতের মতোই। যেন সোমার সঙ্গে সামান্য কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে এবং মিটমাটও হয়ে গেছে। শোবার ঘর থেকে সিগারেটের গন্ধ আসছে। লোকটা দিনের শেষ সিগারেটটা ধরিয়েছে। খুক খুক করে কাশছে। সোমা সামনে থাকলে নির্ঘাত বলত শালার সিগারেট। ধরাও যায় না ছাড়াও যায় না। সিগারেট শেষ করে সে একটা কাঁচা রসুন খাবে। পুরোটা খেতে পারবে না। খানিকটা খেয়েই মুখ বিকৃত করবে। বিড় বিড় করে রসুনকে খানিকক্ষণ গালাগালি করবে।

সোমা চায়ের কাপ নিয়ে রান্না ঘরে চলে গেল। সব ধুয়ে রেখে যাবে। ময়লা অপরিচ্ছন্ন কিছু যেন না থাকে। রান্না ঘরটার জন্যে মায়া লাগছে। কেন লাগছে কে জানে।

'সোমা।'

সোমা শোয়ার ঘরে ঢুকল। লোকটা পা তুলে বুড়ো মানুষের মতো চেয়ারে বসে আছে। সিগারেট ফেলে দিয়েছে। পুরোটা খেতে পারে নি। কখনো পারে না।

'সোমা।'

'বল।'

'অনেক দুঃখ কষ্ট তোমাকে দিয়েছি, কিছু মনে রেখ না। মনের মধ্যে রাগ রাখা ঠিক না। স্বাস্থ্যের খুব ক্ষতি হয়।'

'তোমার উপর আমার কোনো রাগ নেই।'

'আমারও নেই।'

সোমা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'আমি চলে যাব ভেবে তোমার কি খারাপ লাগছে?'

'না। তেল আর পানি কোনোদিন মেশে না এটা ঠিক না—মেশে, তবে খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝাঁকাঝাঁকি করতে হয়। আমার ঝাঁকাঝাঁকি করতে ভালো লাগে না।'

সোমা তাকিয়ে রইল। লোকটা মাঝে মাঝে মজার কথা বলে। ফিলসফারের মতো কথা। সব মানুষের মধ্যেই বোধহয় একজন ফিলসফার থাকে। লোকটা চেয়ার থেকে নেমে মশারির ভেতর ঢুকে পড়ল। নিচু গলায় বলল, 'ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। সারা দিন অনেক ধকল গিয়েছে। বিজুর মাথাটা এ-রকম গরম হল কেন বল তো? বিপদে পড়বে তো। দিনকাল খারাপ।'

'তুমি আজ রসুন খেলে না?'

'বাদ দাও—শরীরটা ভালো না। রসুন খেতে গেলে বমি হয়ে যাবে। বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে যাও।'

সোমা বাতি নিবিয়ে দিল। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার হল না। পাশের ঘর থেকে আলো আসছে। বারান্দায় বাতি জ্বলছে। সোমা বলল, 'টাকা পয়সা সব স্টিলের আলমিরায় আছে। চাবি টেবিলের ড্রয়ারে।'

লোকটা কোনো উত্তর দিল না। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। সোমা বারান্দার বাতি নিবিয়ে দিল। অনেক দিন আর এই বারান্দায় আসা হবে না। আটটা ফুলের টব বারান্দায় সাজানো, দুটোতে আছে বকমভিলিয়া। টবে না-কি বকমভিলিয়া হয় না, তবু সে পরীক্ষা করার জন্যে লাগিয়েছে। দুটো গাছ বড় হয়েছে, এখনো পাতা ছাড়ে নি। কি রঙের পাতা ছাড়বে কে জানে। কাল এই টব দুটো সঙ্গে নিয়ে যাবে? না থাক। এ বাড়ির কিছুই সে নেবে না। এসেছিল খালি হাতে, ফিরেও যাবে খালি হাতে।

সোমা বসার ঘরে ঢুকল। বিড়ালটা আবার ফিরে এসেছে। লোকটা যে চেয়ারে বসেছিল বিড়ালটাও ঠিক সেই চেয়ারে বসেছে। এক চোখে তাকিয়ে আছে সোমার দিকে। সোমা বিড়ালের সামনের চেয়ারে বসল। সে সারা রাত জাগবে। নিশি যাপনের জন্যে একজন সঙ্গী দরকার। পাশের ঘর থেকে লোকটার নিঃশ্বাসের ভারি শব্দ আসছে। চারদিকে সুনসান্ নীরবতা। সোমা জেগে আছে। বিড়ালটাও জেগে আছে। এক চোখে আগ্রহ নিয়ে দেখছে সোমাকে। এই বাড়ি ছেড়ে কাল ভোরে সে চলে যাবে। আর কোনোদিন ফিরে আসবে না, অথচ এ-জন্যে তার তেমন খারাপ লাগছে না। একটু খারাপ লাগা উচিত ছিল। কেন লাগছে না কে জানে।

২

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ মেঘে ঢাকা। মেঘের রঙ ক্রমেই কালো হচ্ছে। মনে হচ্ছে সারা দিনই বৃষ্টি হবে। পর্দা ঢাকা রিকশা, তবু সোমা অনেকখানি ভিজে গেছে। খুব বিরক্ত লাগছে। ভেজা শাড়ি গায়ে লেপ্টে থাকবে আর সে নামবে রিকশা থেকে!

রাস্তা ভালো না—খানাখন্দ। একেক বার এমন ঝাঁকুনি খাচ্ছে মনে হচ্ছে সোমা উল্টে পড়ে যাবে। সে কড়া গলায় বলল, 'আস্তে চালান না ভাই।' মেয়েরা আস্তে চালাতে বললে রিকশাওয়ালারা সাধারণত খুব দ্রুত চালাতে শুরু করে। এখানেও তাই হল রিকশা চলল ঝড়ের গতিতে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে সবকিছু নিয়ে রিকশা উল্টে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়বে। দ্বিতীয় বার রিকশাওয়ালাকে আস্তে চালানোর অনুরোধ করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। হোক একটা অ্যাকসিডেন্ট। সোমার ভাগ্যে অ্যাকসিডেন্ট যোগ আছে। ওর পঁচিশ বছরের জীবনে তিন বার সে রিকশা নিয়ে উল্টে পড়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার কোনো বারই তার নিজের কিছু হয় নি। গায়ে সামান্য আঁচড়ও লাগে নি। অথচ রিকশাওয়ালা প্রতি বারই জখম হয়েছে। এক বার তো এক জন একেবারে মর মর। হাসপাতালে ছিল অনেক দিন। সোমা দু'বার দেখতে গিয়েছে। রিকশাওয়ালার স্ত্রী খাটের কাছে বসে থাকত। সোমাকে দেখলেই বাঘিনীর মতো তাকাত, যেন সমস্ত দোষ সোমার।

'আফা কোন বাড়ি?'

'পরের গলিটা দিয়ে ঢোকেন। সাবধানে যাবেন রাস্তা ভাঙা।'

'ভাঙা রাস্তায় সাবধানে গাড়ি চালাইলে অ্যাকসিডেন্ট বেশি হয় আফা।'

'বেশ তা হলে অসাবধান হয়েই চালান।'

ঝিকাতলার এই বাড়ির অর্ধেক সোমাদের। সোমার দাদা গ্রামের সমস্ত জমিজমা বিক্রি করে ঢাকা শহরে দু'তলা বাড়ি করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর দুই ছেলে বাড়ি পেয়ে গেল। দু' জনেই মোটামুটিভাবে অপদার্থ। সোমার বাবা সাইফুদ্দিন সাহেব এল এম এফ ডাক্তার। দীর্ঘ দিনেও তাঁর কোনো পসার হল না। সারা দিন ডিসপেনসারিতে বসে থাকেন, একটা রুগী আসে না। এক ডিসপেনসারির মালিক তো এক দিন বলেই বসল, 'আপনি ভাই অপয়া মানুষ। অন্য কোথাও গিয়ে বসেন। ডাক্তারের কাছে রুগী না এলে ওষুধপত্র বিক্রি হয় না। বুঝলেন না?'

সোমার বড় চাচা ছদরুদ্দিন সাহেবও একই পদের মানুষ। তাঁর কাজ হচ্ছে টুটকা ফাটকা ব্যবসা করা এবং বড় বড় কথা বলা। গা জ্বলে যাবার মতো কথা। তাঁর কথা যেই শোনে তারই গা জ্বলে যায়—তিনি বিমলানন্দ উপভোগ করেন।

বাড়ির একতলা পেল সোমারা, দোতলা পেলেন ছদরুদ্দিন সাহেব। ছদরুদ্দিন সাহেবের ধারণা তিনি ক্যাপিটালের অভাবে বড়কিছু করতে পারছেন না। একটা বড় রকমের ক্যাপিটাল পেলেই ভেলকি দেখিয়ে দেবেন। ভেলকি দেখাবার আশাতে তিনি তাঁর নিজের অংশ বিক্রি করে দিলেন। ছোট ভাইকে বললেন, 'এক মাসের মামলা, এক মাসের মধ্যে দু'তলা কিনে নেব। টাকা কিছু বেশি দিতে হবে। উপায় কি। এই এক মাস তোর সঙ্গে থাকব। তবে মাগনা থাকব মনে করিস না। পুরো রেন্ট পাবি। হা-হা-হা। নিজের ভাই বলে যে বাড়তি সুযোগ নেব, আমি এই রকম মানুষই না।'

এক মাসের জন্যে এসেছিলেন এখন দশ বছর হয়েছে। এক তলার অর্ধেকটা ছদরুদ্দিন সাহেবের দখলে। এখনো তিনি টুটকা ফাটকা ব্যবসা করেন। এবং সারাক্ষণই আক্ষেপ করেন যে, ক্যাপিটালের অভাবে কিছু করতে পারছেন না। বছর দুই ধরে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর মুখ দেখাদেখি বন্ধ—শুধু ছোট ভাই নয়, ছোট ভাইয়ের পরিবারের কারোর সঙ্গেই তিনি কথা বলেন না। কয়েক দিন আগে প্রথম নাতনির জন্ম হল—এ বাড়ির কাউকে বলা হয় নি।

সোমা রিকশা থেকে নেমেই তার বড় চাচার মুখোমুখি হয়ে গেল। ছদরুদ্দিন সাহেব ছাতা মাথায় দিয়ে বাড়ির সামনের কড়ই গাছটার নিচে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সামনে দড়ি হাতে একটা শুকনো ধরনের লোক। লোকটার সঙ্গে নিচু গলায় কি সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাবার্তা হচ্ছে। সোমা স্যুটকেস হাতে এগিয়ে গেল। বড় চাচার সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বলল, 'কেমন আছেন চাচা?'

'ভালো আছি। তুই কোত্থেকে?'

সোমা তার জবাব না দিয়ে চাচার পা ছুঁয়ে সালাম করল। ছদরুদ্দিন প্রসন্ন গলায় বললেন, 'বাড়িতে আসলেই সালাম করতে হবে না-কি? যা যা—ভেতরে যা।

'আপনি এই বৃষ্টির মধ্যে কি করছেন?'

'গাছ কাটাচ্ছি। আট হাজার টাকায় এই গাছ বেচলাম।'

'গাছের দাম এত?'

'মানুষের চেয়ে গাছের দাম বেশিরে মা। এমনও গাছ আছে যার দাম লাখ টাকা। লাখ টাকা দামের মানুষ ক'টা আছে বল দেখি? হাতে গোনা যায়। যা ভেতরে যা।'

সোমা দরজায় কড়া নাড়ল। ভেতর থেকে ঊর্মি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'কে?' যেন ধমক দিচ্ছে। সতের আঠার বছরের কোনো মেয়ে এ-রকম ধমকের গলায় কথা বলে না-কি? সোমা নরম গলায় বলল, 'ঊর্মি, দরজা খোল। আমি।'

ঊর্মি দরজা খুলল, খুশি-খুশি গলায় বলল, 'আপা তুমি চলে এসেছ। বাবা আর বিজু ভাইয়া এই কিছুক্ষণ আগে তোমাকে আনতে গেল। বিজু ভাইয়া তোমার জন্যে একটা জিপ জোগাড় করেছে।'

'আমি বুঝি জিপ ছাড়া চলাফেরা করি না?'

'জিনিসপত্র থাকবে সঙ্গে এই জন্যে।'

'জিনিসপত্র থাকবে কেন? জিনিসপত্র আমি পাব কোথায়? জিপ যাবে জানলে অবশ্যি ফুলের টব দুটো নিয়ে আসতাম। মা কই রে?'

'রান্নাঘরে নাশতা বানাচ্ছে। এখনো কারো নাশতা হয় নি। তুমি এলে একসঙ্গে হবে।'

'একটা শুকনো গামছা দে তো গোসল করব। ঘরে গায়ে-মাখা সাবান আছে?'

'জানি না। থাকলে বাথরুমে আছে। তবে খুব সম্ভব নেই। এ-বাড়ির নিয়ম হল যখন যে জিনিস চাইবে সে জিনিস থাকবে না।'

সোমার মা এককালে খুব রূপবতী ছিলেন। তাঁর কিছুটা এখনো অবশিষ্ট আছে। এককালে শান্ত এবং মৃদুভাষী ছিলেন, এখন তার কিছুই নেই। অল্পতেই রেগে যান। রেগে গেলে অনর্গল কথা বলেন। কথা বলার এক পর্যায়ে কাজের ছেলেটি মার খায়। সহজ মার না, হিংস্র ধরনের মার। এক কালের শান্ত, মৃদুভাষী এবং রূপবতী এক জন মহিলা যে এতটা হিংস্র হতে পারেন তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

হিংস্রতার পর্ব কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়েছে। খুন্তির হাতল দিয়ে মনের সুখে কাজের ছেলেটিকে পিটিয়ে এখন তিনি খানিকটা ক্লান্ত। কাজের ছেলেটির বয়স নয়-দশ। নাম মুরাদ। তার ব্যথা-বোধ তেমন তীব্র নয় বলে মনে হচ্ছে। খুন্তির হাতার দাগ তার সারা গায়ে কালো হয়ে ফুলে উঠেছে। কানের পাশ দিয়ে রক্ত পড়ছে। সে মোটামুটি নির্বিকার ভঙ্গিতেই রুটি বেলছে। মাঝে-মাঝে ফুঁপিয়ে উঠছে। জাহানারা খুন্তি উঠিয়ে বলছেন, 'খবরদার—শব্দ করলে মেরে ফেলব।'

ঊর্মি রান্নাঘরে ঢুকে হাসিমুখে বলল, 'বড় আপা একা-একা চলে এসেছে।'

জাহানারা বিরস গলায় বললেন, 'কান্নাকাটি করছে না-কি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না।'

'এখানে আসতে বল।'

'গোসল করছে।'

'এসেই গোসল, বালতির পানি সব শেষ না করে তো রেরুবে না। বলে দে, পানি যেন সাবধানে খরচ করে।'

'থাক মা কিছু বলার দরকার নেই। মুরাদকে মেরেছ নাকি?'

জাহানারা কিছু বললেন না।

'ইস কি অবস্থা করেছ। কান দিয়ে রক্ত পড়ছে তো মা।'

জাহানারা তিক্ত গলায় বললেন, 'যা তুই কোলে নিয়ে আদর কর।'

উর্মি আর কিছু বলল না। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাথরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল। নরম গলায় ডাকল, 'আপা।'

'কি রে?'

'সাবান পেয়েছ?'

'হুঁ।'

'পানি কিন্তু সাবধানে খরচ করতে হবে। পানির খুব টানাটানি।'

'আগে বললি না কেন? শেষ করে ফেলেছি তো।'

'শেষ করলে করেছ।'

সোমা মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে বের হয়ে এল। রাতের অঘুমের ক্লান্তি মুছে গেছে। তার সারা মুখে একটা স্নিগ্ধ ভাব।

উর্মি হাসিমুখে বলল, 'তুমি আর একটু ফর্সা হলে খুব সুন্দর লাগত।'

'এখন অসুন্দর লাগে?'

'না, এখনো সুন্দর।'

'বিজুরা এখনো ফেরে নি?'

'না—যত দেরিতে ফেরে ততই ভালো।'

কেন?'

'ফিরলেই প্রচণ্ড হৈচৈ শুরু হবে। বড় চাচা কাউকে কিছু না বলে চার হাজার টাকায় গাছ বিক্রি করে দিয়েছেন।'

'চার হাজার? আমাকে তো বললেন, আট হাজার।'

'একেক জনের কাছে একেক কথা বলছেন। কোনটা সত্যি কে জানে! গাছ কাটার লোকও চলে এসেছে। বিজু ভাইয়া বলেছে গাছে হাত দিলে খুনাখুনি হয়ে যাবে।'

'বিশ্রী ব্যাপার দেখি।'

'কি যে বিশ্রী—কল্পনা করতে পারবে না! রোজ ঝগড়া। জঘন্য সব গালাগালি। বড় চাচা ঐ দিন বলে গেল গুণ্ডা দিয়ে বিজু ভাইয়ার চোখ উপড়ে নেবে।'

'সে কি!'

'চল আপা, রান্নাঘরে চল। রান্নাঘরে গেলেও তোমার খারাপ লাগবে। মা যা মারা মেরেছেন। খবরদার, আবার ঐ নিয়ে কথা বলতে যেও না। কিছু বললেই মা.......'

উর্মি কথা শেষ করল না। কারণ জাহানারা এক কাপ চা হাতে ঘরে ঢুকেছেন। সোমা নিচু হয়ে সালাম করল। জাহানারা বললেন, 'সালাম কেন আবার? নে চা নে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাশতা খেয়ে এসেছিস?'

'না।'

'বিজুরা আসুক। একসঙ্গে নাশতা দেব। তোর জিনিসপত্র কোথায়?'

'ঐ স্যাটকেস। জিনিসপত্র আর কিছু নেই।'

'আনতে দেয় নি?'

'নিজেই আনি নি।'

'ব্যবহারী জিনিসগুলো তো আনতে পারতি। আবার তো টাকা খরচ করে কিনতে হবে। হাতের বালাগুলো কোথায়?'

'রেখে এসেছি।'

'রেখে এলি কেন?'

'আমার আনতে ইচ্ছা করল না।'

জিপের শব্দ শোনা গেল। উর্মি চলে গেল দরজা খুলে দেবার জন্যে। জাহানারা মেয়েকে হাত বাড়িয়ে নিজের দিকে আকর্ষণ করলেন। এই মেয়েটি তাঁর বড় আদরের। জাহানারার চোখ ভিজে উঠতে শুরু করেছে।

সোমা মৃদু স্বরে বলল, 'চা গায়ে পড়ে গেছে মা। হাত আলগা কর।' জাহানারা হাত আলগা করলেন না। সোমা ভেবে রেখেছিল, এ-বাড়িতে এসে সে কিছুতেই কাঁদবে না। কঠিন পাথর হয়ে থাকবে। এই প্রতিজ্ঞা সে রাখতে পারল না। মাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কাঁদতে লাগল। বিজু ভেতরে একনজর উঁকি দিয়ে আবার বাইরে চলে গেল।

সাইফুদ্দিন সাহেব ভেতরে ঢুকলেন। কি বলবেন, এটা ঠিকঠাক করতে করতে তাঁর অনেক সময় গেল। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর কিছু মনে আসে না। বিশেষ বিশেষ ঘটনায় তিনি কি বলবেন তা আগে থেকেই ঠিকঠাক করা থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘটনা বদলে যায়। ঠিক করে রাখা কথাগুলো বলা হয়ে ওঠে না। আজকের দিনের জন্যে যে-সব কথা ঠিক করে রেখেছেন সেগুলো হচ্ছে, সবকিছু যে ভালোয়-ভালোয় শেষ হয়েছে এটা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। আরো খারাপ হতে পারত। সেটা হয় নি। এখন পুরানো কথা সব ভুলে গিয়ে একটা ফ্রেশ স্টার্ট নিতে হবে। লাইফের রিয়েলিটি স্বীকার করতে পারা হচ্ছে বিরাট গুণ।

ঠিক করে রাখা কথা একটাও বলা গেল না। হাউমাউ করে যে-মেয়ে কাঁদছে তাকে কিছুই বলা যায় না। সাইফুদ্দিন সাহেব উর্মির দিকে তাকিয়ে বিব্রত গলায় বললেন, 'নাশতার কি হয়েছে দেখ তো মা।'

এ-বাড়ির ভিতরের বারান্দায় লম্বা একটা ছয় চেয়ারের টেবিল আছে। কোন চেয়ারে কে বসবে তা নির্দিষ্ট করা। সাইফুদ্দিন সাহেব এবং বিজু বসে মুখোমুখি দু' জন দু' প্রান্তে। বাকি চারটি চেয়ারের একটিতে উর্মি, অন্যটিতে জাহানারা। তারা বসে কোনোকুনিভাবে।

আজ দীর্ঘদিন পর নিয়ম ভঙ্গ হল। সোমা ভুল করে তার বাবার চেয়ারে বসে পড়েছে। সাইফুদ্দিন সাহেব অস্বস্তি বোধ করছেন। কিন্তু কিছু বলতে পারছেন না। নিজের চেয়ারে না বসলে তিনি ভালোমতো খেতে পারেন না। হাত রাখার জায়গাটা অপরিচিত লাগে। নির্দিষ্ট যে-কাঠের উপর ডান পা রাখেন সেই কাঠ না থাকায় পাটাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। তিনি আজ বসেছেন উর্মির চেয়ারে। কাজেই সব এলোমেলো হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন পর বাবা এবং ছেলে বসল পাশাপাশি। দু' জনের চেহারার মিল খুবই বেশি। বিজু বুড়ো হলে কেমন দেখতে হবে তা সাইফুদ্দিন সাহেবের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। সোমা লক্ষ করল দু' জনেই রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসছে। যেন তাদের মধ্যে গোপন কোনো রহস্যের ব্যাপার আছে। বাইরে কড়ই গাছ কাটা হচ্ছে। করাত চালানোর শব্দ আসছে। পিতাপুত্র কাউকে গাছকাটা নিয়ে চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে না। উর্মি বলল, 'ভাইয়া গাছ তো কাটা শুরু করেছে।'

বিজু হাসিমুখে বলল, 'কাটুক।'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে সাইফুদ্দিন সাহেবও বললেন, 'কাটুক।'

জাহানারা থমথমে গলায় বললেন, 'দিনে-দুপুরে ডাকাতি করবে কিছু বলবে না?'

বিজু চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে বলল, 'না।'

সাইফুদ্দিন গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমরা কিছুই বলব না।' কথা শেষ করেই তিনি বিজুর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। বিজু হাসল না। গম্ভীর গলায় বলল, 'গাছ কাটার পর খেলা জমবে। অপেক্ষা কর—আগে গাছটা কাটা হোক।'

উর্মি বলল, 'মারামারি করবে?'

বিজু বলল, 'না। কিছুই করব না। বসে বসে শুধু মজা দেখব। গাছ কাটা শেষ হবার পরপরই একটা মজার ব্যাপার হবে। মজার ব্যাপারটা কী বলে দেব বাবা?'

'বলে দে।'

বিজু মজার ব্যাপার ব্যাখ্যা করল সোমার দিকে তাকিয়ে। 'ব্যাপারটা কি হয়েছে আপা শোন, বিগ ম্যাঙ্গো করল কি.......'

'বিগ ব্যাঙ্গো কে?'

'বিগ ম্যাঙ্গো হচ্ছে আমাদের সম্মানিত বড় চাচা—মুখটা ফজলি আমের মতো তো তাই তার নাম বিগ ম্যাঙ্গো। যাই হোক, বিগ ম্যাঙ্গো কি করল শোন—অত্যন্ত গোপনে গাছ বিক্রির ব্যাপারটা এক লোকের সঙ্গে ফাইন্যাল করে ফেলল। চার হাজার টাকা। আসল দাম খুব কম হলেও আট হাজার। যাই হোক, আমি ঐ লোকের সাথে দেখা করলাম। তাকে একটা খুব খারাপ কথা বললাম, সেটা তোমাদের না শুনলেও চলবে। সঙ্গে তিন জন মস্তান নিয়ে গেলাম। গাছওয়ালার নাম কুদ্দুস। ভয়ে সে তখন প্যান্ট ভিজিয়ে দেয় স্টেইজে আছে। আমি বললাম, কুদ্দুস মিয়া, গাছ কিনতে যাচ্ছ খুবই ভালো কথা। তবে গাছ আমার। টাকা তুমি আমাকে দেবে এবং এখন দেবে, তারপর গাছ কেটে নিয়ে যাবে। যার সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে তাকে বলবে গাছের টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। আমি তোমাকে পাকা রসিদ দেব। তবে ঐ পার্টি যেন গাছ কাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছু জানতে না পারে। ব্যাস, কাজ খতম। রসিদ দিয়ে টাকা নিয়ে এসেছি। বিগ ম্যাঙ্গোর অবস্থা কি হয় এটা দেখার জন্যে সারা দিন ঘরে বসে থাকব। হা-হা-হা। বিজু দুলে-দুলে হাসতে লাগল।

বিজুকে এখন কেমন যেন অচেনা লাগছে। তার চেহারায় যে মায়া মায়া ভাবটা ছিল তা নেই। চোখ পিটপিট করে ধূর্ত মানুষের মতো তাকাচ্ছে। বিজুর ভালো নাম বিজয়। ষোলই ডিসেম্বর জন্ম বলেই এই নাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদরে আদরে বিজয় হয়ে গেছে বিজু। এই বিজু ছ'টা লেটার নিয়ে ম্যাট্রিক পাস করে চারদিকে বিস্ময়ের সৃষ্টি করল। সেই বিস্ময় দীর্ঘস্থায়ী হল না। ইন্টারমিডিয়েটে সেকেন্ড ডিভিশন পেয়ে গেল। ইউনিভারসিটিতে অনেক চেষ্টা করেও ভর্তি হওয়া গেল না। ভর্তি হল জগন্নাথ কলেজে। সায়েন্স ছেড়ে দিয়ে নিল ইতিহাসে অনার্স। বর্তমানে সে সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছে। কলেজ সংসদের সে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদক। কোথায় যেন গানও শেখে। দু'-একটা ফাংশনে গণসংগীত গেয়েছে। সাইফুদ্দিন সাহেব পুত্রের এইসব প্রতিভাতেও মোটামুটি মুগ্ধ। ইদানীং তাঁর মনে হচ্ছে পড়াশোনার দিকটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না। পড়াশোনার সঙ্গে-সঙ্গে অন্য সাইডও থাকতে হবে। অন্য সাইড যদি ভালো হয় তা হলে পড়াশোনায় একটু ডাউন হলেও ক্ষতি নেই। থার্ড ডিভিশন পাওয়া একজন ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড় চাকরি পেয়ে যায়। আর ফার্স্ট ডিভিশনওয়ালারা রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে।

টেবিল এখন ফাঁকা। ঊর্মি চলে গেছে কলেজে। বিজু কলেজে যায় নি। অন্য কি-একটা কাজে গেছে, আধ ঘন্টার মধ্যে না-কি এসে পড়বে। জাহানারা আবার রান্নাঘরে ঢুকেছেন। শুধু সোমা তার বাবার সঙ্গে বসে আছে। সাইফুদ্দিন সাহেব বুঝতে পারছেন না সোমা সম্পর্কে ভেবে রাখা কথাগুলো এখন বলবেন, কি বলবেন না। বললে এখনই বলা উচিত।

'সোমা।'

'জ্বি।'

'ও কি কোনো ঝামেলা করেছিল না-কি?

'না।'

'বুঝতে পেরেছে ঝামেলা করে লাভ হবে না। নয় তো এত সহজে ছাড়ত না।'

'হতে পারে।'

'বিজু অবশ্যি সবরকম প্রিকশন নিয়ে রেখেছিল।'

'বিজু খুব কাজের ছেলে হয়েছে।'

'খুবই অ্যাকটিভ। অনেক লোকজনের সঙ্গে চেনা-জানা। অনেক কবি-সাহিত্যিকেও চেনে। ঐ দিন বাসায় দাওয়াত করে ঔপন্যাসিক শওকত আলীকে নিয়ে এসেছিল। বিশিষ্ট ভদ্রলোক।'

'পড়াশুনা কেমন করছে?'

'করছে। পড়াশুনাও করছে। দুটো সাইডই ঠিক আছে। এখন তুই যখন আছিস নিজেই দেখবি।'

'তুমি আজ বেরুবে না?'

'না। বের হবার দরকার ছিল অবশ্যি। থাক, ব্যাপারটা দেখেই যাই।'

'কোন ব্যাপার?'

'গাছ কাটার পর কি হয় ঐটা আর কি।'

সোমা শীতল গলায় বলল, 'এ-রকম একটা ছেলেমানুষির মধ্যে তুমি আছ কেন বাবা? তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও।'

সাইফুদ্দিন কি বলবেন ভেবে পেলেন না। ঠিক সময়ে ঠিক কথাটা তাঁর কিছুতেই মনে আসে না। তিনি মিনমিনে গলায় বললেন, 'তোর মাকে এক কাপ চা দিতে বল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো।' সোমা চায়ের কথা বলার জন্যে উঠে গেল। জাহানারা বললেন, 'তুই শুয়ে থাক। রেস্ট নে।'

'রেস্ট নেবার কি আছে মা? আমি তো আর হাসপাতাল থেকে ফিরছি না। রোগশোকও হয় নি।'

'চা খাবি আরেক কাপ?'

'খাব। কাজের ছেলেটা কোথায় মা?'

'বাজারে গেছে।'

'ঐটুকু ছেলে আবার বাজার করে না-কি?'

'বাজার করে, চুরি করে, সবই করে।'

'মা।'

'কি?'

'এই রকম করে আর মারধোর করো না।'

জাহানারা চা ঢালতে ঢালতে বললেন, 'আর মারব না।'

সোমা বাবাকে চা দিয়ে আবার রান্না ঘরে ফিরে এল। জাহানারা চুপচাপ বসে আছেন। যদিও এই মুহূর্তে রান্নাঘরে তাঁর কোনো কাজ নেই। সোমা বলল, 'সবকিছু কেন জানি অন্যরকম লাগছে।'

'যতই দিন যাবে ততই দেখবি আরো অন্যরকম লাগবে।'

'তুমি এখন রান্নাঘরে বসে আছ কেন?'

'যাব কোথায়? রান্নাঘর ছাড়া আমার যাবার জায়গা আছে?'

WWW.AMARBOI.COM

ছদরুদ্দিন সাহেব গাছ কাটার তদারক করছেন। বৃষ্টি থেমে গেছে। তবু তাঁর মাথায় ছাতি ধরা আছে। সাত ফুটের এক একটা টুকরো করা হচ্ছে। তিনি নিজেই গজফিতা দিয়ে মেপে দেখলেন। বিকেলে মিস্ত্রিদের চা এবং মুড়ি খাওয়ালেন।

সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে কুদ্দুস তাঁকে বলল যে, 'গাছের টাকা দেওয়া হয়ে গেছে।' রেভিন্যু স্ট্যাম্পে দেওয়া পাকা রসিদও কুদ্দুস তাঁকে দেখাল। শুকনো গলায় বলল, 'বিশ্বাস না হলে বিজু ভাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন। উনি ঘরেই আছেন।'

ছদরুদ্দিন সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'বিশ্বাস না হবার কিছু নেই। বিশ্বাস হচ্ছে। ঠিক আছে তুমি যাও।'

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার ছদরুদ্দিন সাহেব এই নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না।

৩

লোকটার নাম কামাল।

কামালউদ্দিন।

বয়স সাঁইত্রিশ। তবে কানের কাছের সব চুল পেকে যাওয়ায় বয়স খানিকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশিই দেখায়। ঠিক রোগা তাকে বলা যাবে না, তবে কেন জানি রোগা দেখায়। মুখটা গোলগাল। ভালোমানুষি ভাব অনেক কষ্ট করে আনে। নিজের ঘরে যা তাকে করতে হয় না। আজ অবশ্যি কামালের চেহারায় ভালোমানুষি ভাবটা নেই। সকালে দাড়ি কামানো হয় নি। খোঁচা-খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি বের হয়ে পড়েছে। চোখটাও যন্ত্রণা দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পরপর পানি পড়ছে। রুমালটাও সঙ্গে আনা হয় নি। তাকে শার্টের হাতায় চোখ মুছতে হচ্ছে। খুবই বিরক্তির ব্যাপার।

কামালউদ্দিন যে কাজে নারায়ণগঞ্জে গিয়েছিল কাজটা পাওয়া গেছে। তবে ঝামেলা আছে। ত্যাঁদড় পার্টি। পানিতে না নেমে মাছ ধরতে চায়। কামাল বড়ই বিরক্ত হচ্ছে। তবে এই বিরক্তি সে প্রকাশ করছে না। তার সামনে বসে আছে সুলতান সাহেব। চেহারা ভালোমানুষের মতো। কথাবার্তার ভঙ্গিও বড় মধুর। কথা শুনলে মনে হয় শান্তিনিকেতন থেকে কথা শিখে এসেছে। অথচ বাড়ি হচ্ছে কুমিল্লায়। বিরাট ফক্কড় লোক।

কামাল বলল, 'কথাবার্তা যা বলার দরকার তা তো বলেই ফেললাম এখন তা হলে উঠি ভাইসাব? অনুমতি যদি দেন।'

'আরে বুসন না। আরেকটু বসুন। লাচ্ছি খান। লাচ্ছি আনতে গেছে।'

'লাচ্ছি খেলে তো আমার হবে না—আমার তো আরো কাজকর্ম আছে।'

'এখানেও কাজকর্মই তো করছেন—তাই না।'

'করছি আর কোথায়। কথাবার্তা বলছি। এত কথা আমার ভালো লাগে না। দরে বনলে কাজ করবেন, না বনলে না।'

সুলতান সাহেব বললেন, 'সামান্য কাজ এত টাকা চাচ্ছেন।'

কামাল শান্ত গলায় বলল, 'কাজটা সামান্য না। এটা আমিও জানি, আপনিও জানেন। দলিল তৈরি করে দিব। সেই দলিল হবে আসল দলিলের বাবা। কোর্টে গেলে আমার দলিল টিকবে। আসলটা টিকবে না। এই জন্যে টাকা খরচ করবেন না? পঞ্চাশ লাখ টাকার সম্পত্তি পাবেন আর এক লাখ টাকা খরচ করবেন না?'

সুলতান সাহেব বললেন, 'আপনাকে ত্রিশ দিতে পারি তবে জিনিস দেখার পরে, তার আগে না। দেখেন আপনি রাজি আছেন কি-না।'

কামাল গম্ভীর হয়ে রইল। লাচ্ছি চলে এসেছে। সে বিনা বাক্য ব্যয়ে একটানে লাচ্ছি শেষ করে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলল, 'উঠি তা হলে ভাইসাব—স্লামালিকুম।'

'উঠি মানে? হ্যাঁ-না কিছু বলেন।'

'আমি ভাইসাব এককথার মানুষ। এক লাখ চেয়েছি এক লাখ দেবেন। পুরানো স্ট্যাম্প জোগাড় করে নিব, কলম দিয়ে লেখলেই দলিল হয় না। রেকর্ড রুমের রেকর্ড ঠিক করা লাগে। খাজনার রসিদ লাগে। মিউটেশনের কাগজপত্র লাগে। আমার কাজকর্ম আপনে জানেন না, তাই মাছের দর শুরু করেছেন। নকল দলিল এক হাজার টাকা দিলে করা যায়, কিন্তু ঐ জিনিস কোর্টে গেলে জজ সাহেব ঐ দলিলে নাকের সর্দি ঝাড়বে, বুঝলেন?'

কামাল উঠে পড়ল। এটা হচ্ছে ত্যাঁদড় পার্টি। এখানে লাভ হবে না। খালি খেলাবে। গোসল করতে চায় অথচ চুল ভিজাতে চায় না। হারামজাদা।

সুলতান নড়েচড়ে বসলেন। মুধর স্বরে ডাকলেন, 'কামাল সাহেব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কি–বলেন।'

'সামনের সপ্তাহে কি আরেক বার আসতে পারেন?'

'কেন?'

'না মানে, আরো ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভেবে দেখতাম।'

'গরম যা পড়েছে তার মধ্যে তো মাথা আর ঠাণ্ডা যাবে না। যত চিন্তা করবেন মাথা তত গরম হবে।'

সুলতান সাহেব বললেন, 'প্লিজ আপনি সামনের সপ্তাহে এক বার আসুন। আমার বড় শ্যালকও থাকবে। সে হচ্ছে এক জন ল ইয়ার। আইনের ব্যাপারগুলো ভালো বুঝবে। আপনি আসুন। আমি আসা–যাওয়ার খরচ দিয়ে দিচ্ছি।'

সুলতান সাহেব মানিব্যাগ খুলে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বের করলেন। কামাল মনে মনে বলল, শুয়োরের বাচ্চা, আসা–যাওয়ার খরচ পঞ্চাশ টাকা? মুখে বলল, 'এই পঞ্চাশ টাকা আপনি রেখেই দেন ভাইসাব। পঞ্চাশ–এক শ' আমি নেই না। ডেইলি পঞ্চাশ টাকা আমি ভিক্ষাই দিই। পাপ কাজ করি তো, দান–খয়রাত করতে হয়। উঠলাম ভাই, স্লামালিকুম।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান—একটু দাঁড়ান। এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন?'

সুলতান সাহেব ভেতরে চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে পাঁচ শ' টাকার একটা নোট নিয়ে এসে অমায়িক গলায় বললেন, 'এই নিন আপনার খরচ। সামনের সপ্তাহে আসুন, দেখি একটা এগ্রিমেন্টে যাওয়া যায় কি–না। এইসব কথা কি লাখ কথার কমে হয়?'

'হবার হলে এক কথাতেই হয়—না হলে লাখ কথাতেও হয় না। আমি আসব সামনের সপ্তাহে। সন্ধ্যা নাগাদ আসব। বুধবার সন্ধ্যা।'

'আচ্ছা।'

'কামাল ঘর থেকে মোটামুটি খুশি হয়েই বের হল। ত্যাঁদড় পার্টির কাছ থেকে পাঁচ শ' টাকা বের করা গেছে এই যথেষ্ট। এই পার্টির ত্রিসীমানায় সে আর আসবে না। আসার দরকারও নেই। এই পার্টির কাছ থেকে আর কিছু পাওয়া যাবে না। ঢাকার বাসে উঠে সে পাঁচ শ' টাকার নোটটা চোখের সামনে মেলল। ছেঁড়া নোট। স্কচ টেপ দিয়ে মেরামত করা। মনে মনে বলল, হারামজাদা। দুনিয়া সুদ্ধ লোক ঠকাতে চাস। ব্যাটা ফকিরের পোলা।

'ফকিরের পোলা' হচ্ছে কামালের একটা প্রিয় গালি। তবে এই গালি সে সবসময় মনে মনে দেয়। মনে মনে গালি দিতে পারার সুযোগ থাকায় সে আনন্দ বোধ করে। তার ধারণা মনে মনে গালাগালি দেবার সুযোগ না থাকলে বিরাট সমস্যা হত। গাল দিলেই রাগ বাষ্প হয়ে যায়। কামাল আবার বলল, হারামজাদা ফকিরের পোলা।

কামালের কাজকর্ম খুব পরিষ্কার। সে কখনো বেশি ঝামেলায় যায় না। নকল দলিলের কথাবার্তা পাকা করে। বেশ কিছু দলিলেন নমুনা দেখায় তারপর সটকে পড়ে। দিন পনের পর যখন পার্টি মোটামুটি নিশ্চিত যে, সে সটকে পড়েছে তখন হঠাৎ উদয় হয়। মুখ–চোখ কালো করে বলে, 'বিরাট সমস্যা ভাই সাব। পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তিন দিন ছিলাম হাজতে। জামিনে ছাড়া পেয়েছি।' পার্টি এইকথা ঠিক বিশ্বাস করে না। সে বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপর একটা কালো দাগ দেখিয়ে বলে, 'এই দেখেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাই অবস্থা। মারের নমুনা দেখেন।'

হাতের এই দাগটা কামালের জন্মদাগ। তবে মারের কারণে কালো হয়ে যাওয়া দাগ হিসেবে একে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়। কামাল গম্ভীর গলায় বলে, 'কার কি কাজ করছি এটা জানার জন্যে পুলিশ হেভি চাপ দিল। আপনাদের কথা অবশ্য কিছু বলি নাই।'

পার্টি এই কথায় একটু সচকিত হয়। নড়েচড়ে বস। তখন কামাল বলে, 'আপনাদের জানাশোনার মধ্যে পুলিশের বড় কেউ আছে? বিরাট বিপদে পড়েছি ভাইসাব।'

এই পর্যায়ে কামালের চোখে পানি এসে যায়, চোখে পানি আনার ক্ষমতা কামালের অসাধারণ। অতি অল্পসময়ে সে তা পারে। তার জন্যে যা করতে হয় তা হচ্ছে চোখের পলক না ফেলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা। এতেই কাজ হয়। চোখে পানি আসে। তার চোখে একটা সমস্যা আছে। ছোটবেলায় চোট খেয়েছিল। এর জন্যে হয়তো চোখে পানি আসে খুব তাড়াতাড়ি।

মানুষ সবকিছুকেই অবিশ্বাস করে। চোখের পানিকে করে না। ভাগ্যিস করে না। যদি করত তা হলে কামালের মতো মানুষদের খুব অসুবিধা হত।

দলিল তৈরি কামালের মূল ব্যবসা নয়। তার মূল ব্যবসা জমি বেচা-কেনা। একদল লোক বিদেশে চাকরি করতে যাওয়ায় এই ব্যবসা খুব রমরমা হয়েছে। কিছু মানুষের হাতে কাঁচা টাকা-পয়সা এসেছে যাদের হাতে কোনো কালেই কোনো পয়সাকড়ি ছিল না। হঠাৎ পাওয়া ধন তারা কি করবে বুঝতে পারে না—তখন জমির টোপ ফেলতে হয়। এগুতে হয় খুব সাবধানে। এইসব ধনীরা সাধারণত খুব সন্দেহপরায়ণ হয়। কোনোকিছুই তারা বিশ্বাস করে না। সবকিছুতেই অবিশ্বাস। পাকা দলিল দেখেও বলে—দলিলটা তো নকল। তাদের ঘায়েল করতে হয় তাদের নিজেদের অস্ত্রে। যেমন গত মাসে কামাল একটা কেইস করল—পার্টির বাসা নূরজাহান রোডে। ছোট ভাই কাজ করছে বিদেশে। টাকাপয়সা ভালোই পাঠাচ্ছে। খোঁজ-খবর আগে থেকে ভালোমতো নিয়ে কামাল উপস্থিত হল—হাতে ব্রিফকেস। চোখে চশমা।

বড় ভাই দরজা খুলে খুবই সন্দেহজনকভাবে তাকাতে লাগল। কামাল বলল, 'ভাই, আমার নাম কামাল। শুনলাম জমি কিনতে চান, সেই জন্যে আসলাম।'

বড় ভাই মুখ লম্বা করে দিয়ে বলল, 'কার কাছে শুনলেন?'

'সেটা দিয়ে তো ভাই আপনার দরকার নাই। কিনবেন কি কিনবেন না সেটা দিয়ে হচ্ছে কথা। যদি বলেন না, তা হলে বিরক্ত করব না। চলে যাব। যদি বলেন হ্যাঁ, তা হলে বসব। কথা হবে।'

সন্দেহপ্রবণ লোকেরা সোজাসুজি কথায় সাধারণত একটু ঘাবড়ে যায়। কারণ এরা সারা জীবনেও সোজাসুজি কথা বলে না।

বড় ভাই বললেন, 'জমি কোথায়?'

'সারা ঢাকা শহর জুড়ে আমার জমি নাই। এক জায়গাতেই আছে। তিন বিঘা জমি আছে। জায়গাটা হচ্ছে সাভার। জায়গার নাম নয়নপুর।'

'এত দূর জমি কিনব না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঠিক আছে। না কিনলে কি আর করা, নেন ভাই একটা সিগারেট নেন।' কামাল সস্তা ধরনের একটা সিগারেট বের করল। সন্দেহপ্রবণ লোকদের দামি সিগারেট দেওয়া যায় না। দামি সিগারেট দিলেই ভাবে—কোনো একটা মতলবে এসেছে।

বড় ভাই সিগারেট নেন। নেবেন জানা কথা। বিনা পয়সার কোনো জিনিস এরা ছাড়ে না। কামাল নিজের মনেই বলে—সবাই জমি কিনতে চায় ঢাকা শহরে। দূরে কেউ যাবে না। ঢাকা শহরে কি জমি আছে যে কিনবে? বিনা ঝামেলায় একটা প্লট কেউ বার করুক ঢাকা শহরে। যদি বার করতে পারে আমি কান কেটে ফেলে দিব। জমি কিনার পর মিউটেশান করতে গেলে দেখা যায় আরেক পার্টির কাছে জমি বিক্রি করা। এর পর বের হয় থার্ড পার্টি। এই থার্ড পার্টি জমি দখল করে বসে থাকে। মামলা ঠুকে দেয়। রাইট অব পজেশান। এইসব দেওয়ানি মামলার অবস্থা জানেন? দেওয়ানি মামলা হল আপনার কচ্ছপের কামড়। এক বার ধরলে আর ছাড়ে না। পনের বছর, বিশ বছর, পঁচিশ বছর মামলা চলতে থাকে।

'আচ্ছা ভাই যাই। অনেক বিরক্ত করলাম।'

'বসেন একটু। রোদের মধ্যে এসেছেন। এক কাপ চা খান।'

কামাল সঙ্গে–সঙ্গে বলে, 'তা খাওয়া যায়। চা পেলে বড় ভালো হয়।' চা আসে। কামাল বলে, 'একটা ভালো সিগারেট খাবেন ভাই সাব? নিজের জন্যে কিছু ভালো সিগারেট আলাদা রাখি। কোনো শালাকে দেই না। নিন একটা খান।'

বড় ভাই সিগারেট ধরান। এর মধ্যে লোকটার প্রতি তাঁর সন্দেহ খানিকটা কমে এসেছে। তিনি মনে করতে শুরু করেছেন—লোকটা ভালো, এককথার মানুষ। কামাল বলে, 'একসময় ধানমণ্ডির জমি কেউ কিনতে চাইত না। চোখ আসমানে তুলে বলত, সর্বনাশ! এত দূরে জমি কিনে কি করব? জংলা জায়গা! আর আজ সেই জংলা জায়গার অবস্থা দেখেন।'

'ঠিক বলেছেন।'

'সাভারেও লোকজন এখন জমি কিনতে চায় না। বলে—জংলা জমি। আমি হাসি। আর মনে–মনে বলি—ব্যাটা দশটা বছর যাক তার পর তোর মুখখান এক বার এসে দেখে যাব।'

বড় ভাই বলেন, 'সাভারের জমি কি আপনার?'

'পাগল হয়েছেন? আমি জমি পাব কোথায়? আমি একজন পথের ফকির। জমি আমার বড় মামার। আমাকে বলেছে বিক্রি করে দিতে। আমার হয়েছে মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা। ঐ জমি বিক্রি হবে না। বেহুদা পরিশ্রম।'

'বিক্রি হবে না কেন?'

'তিন বিঘা জমি পুরোটা এক জনের কাছে বেচতে চায়। কার দরকার পড়েছে একসঙ্গে এতটা জমি কেনার? ভাই উঠি দেরি হয়ে গেছে। চা–টা ভালো বানিয়েছেন।'

'আরে বসেন না। আরেক কাপ চা খান। অসুবিধা কি? খান আরেক কাপ চা।'

কামাল বসে। আরাম করেই বসে। পার্টি টোপ গিলে ফেলেছে। এখন শুধু সুতা ছাড়তে হবে। সুতা ছাড়তে তার বড় ভালো লাগে। সুতা ছেড়ে মাছ সবসময় ঘরে তোলা যায় না। সুতা ছিঁড়ে যায়। তবে এই মাছ সে তুলেছিল। অবিশ্বাসী লোক যখন কাউকে বিশ্বাস করে তখন পুরোপুরিই করে। এই লোক করেছিল। ইচ্ছা করলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটাকে সে পথের ফকির করতে পারত। তা সে করে নি। মায়া লাগল। বায়নার পঁচিশ হাজার টাকা নিয়েই ছেড়ে দিল। মনে মনে বলল, ব্যাটা ফকিরের পোলা, তোকে মাফ করে দিলাম।

বাসায় ফিরতে ফিরতে তিনটা বেজে গেল। দরজা খুলল মিনু। কামাল সার্ট খুলতে–খুলতে অভ্যাসমতো ডাকল, 'সোমা, ও সোমা।' ডাকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল—সোমা নেই। মিনু দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে। তাঁর চোখে কৌতূহলের সঙ্গে খানিকটা ভয়ও মিশে আছে। মানুষটিকে সে বেশ ভয় করে। লোকটাকে তার পাগলা পাগলা মনে হয়।

'জ্বর কমেছে না–কি রে মিনু?'

'হ।'

'রান্নাবান্না করেছিস কিছু?'

'হ।'

'আরে যন্ত্রণা, সবকথা এক অক্ষরে বলছিস কেন? চড় খাবি—বুঝলি। ঠাশ করে একটা চড় দিব। কী রেঁধেছিস?'

'ভাত।'

'ভাত ছাড়া আর কী?'

'আর কিছু না।'

'ফকিরের মাইয়া বলে কী? শুধু ভাত খাব কীভাবে?'

'আর কিছু রানতে জানি না।'

এর ওপরে কোনো কথা চলে না। রাঁধতে না জানলে সে করবে কী? কামাল বলল, 'শুকনো মরিচ ভেজে ফেল। পেঁয়াজ আর শুকনো মরিচের ভর্তা বানিয়ে খাওয়া যাবে। মরিচের ভর্তা ঠিকমতো বানাতে পারলে কোপ্তা–কালিয়ার মতো টেস্ট হয়। ঘরে সরিষার তেল আছে তো? সরিষার তেল দিয়ে হেভি ডলা দিতে হবে।'

বিড়ালটা পায়ের কাছে ঘুর ঘুর করছে। আহ্লাদ করছে। কামাল নিচু হয়ে বিড়ালটাকে খানিকক্ষণ আদর করল। আদর খেয়ে সে একেবারে গলে যাচ্ছে। কি করবে বুঝতে পারছে না। লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি। আদর সবাই বোঝে। শুধু মানুষ বোঝে না। মানুষ হচ্ছে বিচিত্র চিড়িয়া। সে আদর সোহাগ বোঝে না। রাগটা বোঝে। ঘৃণা বোঝে। শালার মানুষ।

'মিনু।'

'জ্বি।'

'বেড়ালটারে দুধ দিয়েছিলি?'

'না।'

'না কি রে হারামজাদী—এমন চড় দেব......

'দুধ কেমনে বানাইতে হয় জানি না।'

কামাল রাগ সামলে নিল। যে দুধ বানাতেই জানে না তাকে দুধ না বানানোর জন্যে চড় দেওয়া যায় না। সোমা এই মেয়েটাকে দেখি কিছুই শেখায় নি। অকর্মার ধাড়ি করে রেখেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ও মিনু।'

'জ্বি।'

'খাওয়াদাওয়ার পর দুধ বানানো শিখিয়ে দিব—বুঝলি। খুব সোজা। বিড়ালটাকে রোজ দুধ দিবি। পেটে বাচ্চা আছে। এই সময় ভালোমন্দ খাওয়ার দরকার। আর খবরদার লাথিফাথি দিবি না। বাচ্চার ক্ষতি হবে। যা ভাত বাড়। শুকনো মরিচ ভাজ। পুড়িয়ে আবার কালো করে ফেলিস না। কালো যদি হয় এক থাবড়া খাবি।'

সাবান গামছা নিয়ে কামাল বাথরুমে ঢুকে পড়ল। বাথরুমে ঢুকেই তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কি সুন্দর সাজানো বাথরুম। ঝক ঝক করছে। এককণা ময়লা কোথাও নেই। অপরিষ্কার বাথরুম ছিল সোমার দু' চোখের বিষ। সোমার মতে বাথরুম এমন হবে যেন ঢুকলেই মনের মধ্যে একটা পবিত্র ভাব হয়। এই মেয়ের কথাবার্তার কোনো মা-বাপ নেই। পরিষ্কার বাতিক। এত পরিষ্কার দিয়ে হয় কি? দুনিয়াটাই অপরিষ্কার। এর মধ্যে পরিষ্কার পরিষ্কার করে চেঁচালে কি হবে? কিছুই হবে না। আজ এই বাথরুম ঝক ঝক করছে। সাত দিন পরে করবে না। তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। কোনোকিছুই আটকে থাকে না। কামাল গায়ে পানি ঢালতে লাগল। ঠাণ্ডা পানি গায়ে ঢালতে বড় আরাম লাগছে। ঘুম এসে যাচ্ছে। সে গুন গুন করে একটা সুর ভাঁজল। তার বেশ ভালো লাগছে।

কামাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমুল। ঘুম ভাঙার পর ডাকল, 'সোমা, ও সোমা।' এক দিনে দ্বিতীয় বার ভুল। মেজাজ খারাপ হওয়ার মতো অবস্থা। মেজাজ কিছুটা খারাপই হল। যে গেছে সে গেছে—এখন ডাকাডাকি করে হবেটা কী? কিছুই হবে না। মানিয়ে নিতে হয়। সব অবস্থায় সব পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াটাই হচ্ছে বড় কথা।

'মিনু।'

'জ্বি।'

'চা বানা দেখি।'

'চা রানতে জানি না।'

'অতি উত্তম। হারামজাদী, তুই জানিস কি? ফ্লাস্ক নিয়ে যা মোড়ের দোকান থেকে চা নিয়ে আয়। বিড়ালকে দুধ দিয়েছিলি?'

'হ।'

'গুড। দু' বেলা দুধ দিবি—সকালে এক বার, রাতে এক বার। যা চা নিয়ে আয়।'

কামাল বিছানা ছেড়ে নামল। হাতমুখ ধুয়ে সিগারেট ধরাল। তার মনে হল সোমার অভাব সে যতটা বোধ করবে ভেবেছিল তার চেয়ে অল্প একটু বেশি বোধ করছে। এর কারণ সে ঠিক ধরতে পারছে না। তার হিসাবে ভুল খুব একটা হয় না। এখানে ভুল হল কেন?

মিনু ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে এসেছে। হোটেলের চা বিস্বাদ হলেও এর আলাদা একটা স্বাদ আছে। এই স্বাদে আবার অভ্যস্ত হয়ে যেতে হবে। সেটা মন্দ কি। স্বাধীন জীবনের আলাদা আনন্দ আছে। চা খেতে খেতে কামালের মনে হল—শুধু স্বাধীন জীবন না, সবধরনের জীবনেরই আলাদা আনন্দ আছে। যে তের মাস সে জেল খাটল সেই তের মাস সময়টাও তার খুব একটা খারাপ কাটে নি। জেলে তার সঙ্গীরা মানুষ হিসেবে খারাপ ছিল না। যথেষ্ট বুদ্ধিমান। শুধু বুদ্ধিমান না—রসিকও ছিল। এদের এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন বিনয় পোদ্দার। বার বছরের কয়েদ হয়েছিল। কি অসম্ভব রসিক মানুষ। তার আশেপাশে থাকাই একটা আনন্দের ব্যাপার। এক বার জেলখানায় ইম্প্রুভ ডায়েট হল ঈদ উপলক্ষে। পোলাও, গোস্ত আর একটা করে চপ। চপ মুখে দিয়েই সবাই থুথু করে ফেলে দিল। বাসি চপ। গরমে টক হয়ে গেছে। বিনয় পোদ্দার বলল, 'বাসি চপের গল্প শুনবে নাকি হে তোমরা।' সবাই হৈ হৈ করে উঠল, 'বলেন, বলেন।'

'এক বার এক হোটেলে গেছি। চপের অর্ডার দিয়েছি। চপ আসল। মুখে দিয়ে দেখি, সর্বনাশ—বাসি মানে, পচে যাওয়া মাল। মেজাজ গেল গরম হয়ে। বেয়ারাকে বললাম, ডাক তোমার ম্যানেজারকে। এই পচা চপ খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। বেয়ারা মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, আপনি নিজেই যে জিনিস খেতে রাজি না ম্যানেজারবাবু সেটা কি করে খাবেন বলুন।'

আহ কি গল্প। আর কি গল্প বলার ভঙ্গি। কামাল বিমর্ষ বোধ করছে। সন্ধ্যা সময়টা আসলেই খারাপ। মন ভার ভার হয়ে থাকে। সন্ধ্যায় এই জন্যে ঘরে থাকতে নেই।

'মিনু!'

'জ্বি।'

'আমি এখন বেরুব—বুঝলি। ফিরতে রাত হবে। একা একা ভয় লাগবে?'

'হুঁ।'

'তা হলে কী করা যায় বলত?'

'আফা আসবে না?'

'না। ঐ সম্পর্ক শেষ। এখন তুই কী করবি চিন্তা করে দেখ। তোর খালার কাছে যাবি? তোর খালা থাকে না কলতাবাজার। যাবি সেখানে?'

'না।'

'যাবি না কেন?'

'খালা খাওন দেয় না।'

'এ তো দেখি আরেক যন্ত্রণা। তোকে কোলে নিয়ে আমি ঘুরব না-কি?'

মিনু হেসে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে হাসি লুকাবার জন্যে মুখ ঘুরিয়ে নিল। এই লোকের সামনে হাসতে বড় ভয় লাগে।

কামাল মিনু-সমস্যার কয়েকটা সমাধান বের করল—ঘরে তালা দিয়ে মিনুকে ঘরের বাইরে বসিয়ে রেখে চলে যাওয়া। দুই, মিনুকে চায়ের দোকানে রেখে যাওয়া। ফেরার পথে উঠিয়ে নেওয়া। মিনুর হাতে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে তাকে তার কলতাবাজারে খালার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া। কোনো সমাধানই তার মনে ধরল না। মুখ অন্ধকার করে একের পর এক সিগারেট টেনে যেতে লাগল।

৪

সোমার শোবার জায়গা ঠিক হয়েছে উর্মির সঙ্গে। এই ঘরে দুটো খাট। একটায় ঘুমায় বিজু, অন্যটায় উর্মি। ঘরে কোনো ফ্যান নেই। গরমের সময় অসহ্য গুমোট। দক্ষিণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানালা একটা। ঐ জানালা বিজুর খাটের পাশে। বাতাস যা লাগে বিজুর গায়ে লাগে। ঘরে এখন আছে সোমা এবং উর্মি। বিজু বারান্দায় টেবিল পেতে পড়ছে। তার পড়া সশব্দ। এত বড় ছেলে এমন শব্দ করে পড়ে কেন কে জানে! সোমার খুব বিরক্তি লাগছে। উর্মি বলল, 'তুমি আসায় খুব সুবিধা হয়েছে আপা। বিজু ভাইয়া আর এই ঘরে সিগারেট খাবে না। সিগারেট খেয়ে ঘর অন্ধকার করে রাখে।'

'তাই নাকি?'

'হুঁ। সিগারেটের উপরই আছে। ঘুম ভাঙলেই হাতে সিগারেট। এক বার তো মশারিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।'

সোমা কিছু বলল না।

উর্মি বলল, 'ঘুম পাচ্ছে আপা?'

'না।'

'কী রকম গরম পড়েছে দেখেছ? বৃষ্টিতেও গরম কমল না। আরেকবার গা ধুতে ইচ্ছা করছে। তুমি গা ধোবে আপা? পানি কিন্তু আছে।'

'না।'

'তুমি খাটের কোন দিকে শোবে?'

'এক দিকে শুলেই হল।'

'ঐ বাড়িতে কোন দিকে শুতে?'

প্রশ্নটা করেই উর্মি লজ্জা পেয়ে গেল। তার মনে হল প্রশ্নটা অনুচিত হয়েছে। ঐ বাড়ি প্রসঙ্গে কোনো কথাই এখন বলা উচিত না। যদিও তার অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা করছে। কেন এ-রকম হল? মানুষটা খারাপ এটা সে জানে। কতটুকু খারাপ? কেমন খারাপ? আপাকে কি জিজ্ঞেস করা যাবে? আজই জিজ্ঞেস করবে? না-কি আরো কিছুদিন পর?

সোমা বলল, 'বাবার রোজগারপাতি এখন কেমন রে উর্মি?'

'ভালো না। এল এম এফ ডাক্তারদের কাছে ঢাকা শহরে কেউ আসে? সব যায় স্পেশালিস্টদের কাছে। বাবা অবশ্যি রোজ ইয়াং ফার্মেসিতে বসে। ওরা মাসে মাসে বাবাকে কিছু টাকা দেয়। রুগী কিছু হয়। সংসার তো চলছে।'

সোমা সহজ গলায় বলল, 'খুব ভালো চলছে বলে তো মনে হয় না।'

'তা চলছে না। চলবে কোত্থেকে? প্রাকটিস নেই। তা ছাড়া আমার মনে হয়, বাবা ডাক্তারিও ভালো জানে না। আমার এক বার অসুখ হল। বাবা সমানে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াচ্ছে, শেষে দেখা গেল টাইফয়েড। এ দিকে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে খেয়ে আমার চুল উঠে গেল।'

'চুল উঠল কোথায়? মাথা ভর্তি তো চুল।'

'বাতি নিবিয়ে দিই আপা? বাতি নেবালে ঘর একটু ঠাণ্ডা হবে।'

উর্মি বাতি নিবিয়ে দিল। ঘর অবশ্যি পুরোপুরি অন্ধকার হল না। বিজুর পড়া শেষ হয়েছে। সে একনাগাড়ে বেশিক্ষণ পড়তে পারে না। ঘুম ধরে যায়। তখন পানির ঝাপটা দিতে হয়। একটা সিগারেট ধরিয়ে চা খেতে হয়। তার জন্যে ফ্লাস্কে চা বানানো থাকে। বিজু ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে বাইরের বারান্দায় চলে গেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে চা খাবে। সিগারেট ধরানোর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সোমা এল বারান্দায়। বিজু সিগারেট নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খানিকক্ষণ ইতস্তত করল। ফেলে দেবে না রাখবে? শেষ পর্যন্ত রেখে দেওয়াই ঠিক করল। এতটুকু একটা বাড়ি এর মধ্যে যদি তিন জনের সামনে সিগারেট খাওয়া বন্ধ রাখতে হয় তা হলে তো বিরাট যন্ত্রণা।

বিজু বলল, 'এখনো ঘুমাও নি, শুয়ে পড় আপা।'

'তুই কখন শুবি?'

'আমার দেরি আছে। দেড়টা–দু'টার আগে ঘুমাতে যাই না।'

'এতক্ষণ কি করিস? পড়াশোনা?'

'হুঁ।'

'ভালোই তো। আগের মতো রেজাল্ট করতে পারলে তো খুবই আনন্দের ব্যাপার হবে।'

'ঐ সব হবে না। কিছু মনে থাকে না। যা পড়ি সব ভুলে যাই। আপা তুমি শুয়ে পড়। এক কাজ কর, আমার বিছানায় শোও। দু' জন একখাটে ঘুমুতে পারবে না। আমি বারান্দায় পাটি পেতে শোব। একস্ট্রা মশারি আছে, অসুবিধা হবে না।'

'রাতে বৃষ্টিটিষ্টি হয় যদি?'

'কোনো অসুবিধা নেই। দু'–এক ফোঁটা বৃষ্টিতে বিজুর কিছু হয় না।'

সোমা দাঁড়িয়েই রইল। তার ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু ঐ অসহ্য গরমে ঘরের ভেতর শুতে ইচ্ছা হচ্ছে না। সে বারান্দায় চেয়ারে এসে বসল। মৃদু স্বরে ডাকল, 'বিজু!'

'কি আপা?'

'তুই কি ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছিলি না–কি?'

'কার সাথে?'

সোমা কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'তোর দুলাভাইয়ের কথা বলছি। ঝগড়া করেছিলি?'

বিজু তিক্ত গলায় বলল, 'কি আশ্চর্য। দুলাভাই শব্দটা তুমি ব্যবহার করলে কেন? ঐ লোকের কথা যদি ওঠে এখন থেকে তুমি সোজাসুজি বলবে—কামাল। নো দুলাভাই বিজনেস।'

'তুই আমার কথার জবাব দিস নি। ঝগড়া করেছিলি?'

'হ্যাঁ। লোকজন ছিল নয়তো চড় দিয়ে শালার দাঁত খুলে ফেলতাম।'

'এইসব তুই কি বলছিস?'

'তুমিই–বা উল্টা কথা বলছ কেন? ঐ শালাকে আমি কোলে নিয়ে চুমু খাব না–কি? সাপের যেভাবে খোলস ছাড়ায় ঐ ব্যাটার চামড়া আমি ঐভাবে খুলে নেব।'

'তোর এত রাগ কেন? তোর সঙ্গে তো কিছু হয় নি। রাগ যদি কারো হবার হয় সেটা হবে আমার।'

'তোমার হবে না। তোমার মধ্যে রাগ বলে কিছু নেই। থাকলে এত দিন লোকটার সঙ্গে থাকতে পারতে না।'

সোমা বলল, 'তোর কাছে আমার অনুরোধ বুঝলি বিজু, রাস্তায় যদি কোনোদিন ওর সঙ্গে দেখা হয় তা হলে হৈ চৈ করবি না।'

বিজু চুপ করে রইল। তার খুব রাগ লাগছে। এ–সব আপা কী বলছে? সোমা বলল, 'সব তো চুকেবুকেই গেছে আর হৈ চৈ কেন? ঠিক না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আচ্ছা ঠিক আছে। যাও হৈ চৈ করব না। এখন ঘুমুতে যাও। আমার বিছানায় ঘুমিও আপা। দু'-একদিনের মধ্যে ফ্যানের ব্যবস্থা করব। তখন আরাম হবে।'

সোমা আবার তার ঘরে ঢুকল। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। অস্থির অস্থির লাগছে।

উর্মি বলল, 'আপা ঘুমুবে না?'

সোমা জবাব দিল না। তার খুব ইচ্ছা করছে প্রফেসর সাহেবের কথা জিজ্ঞেস করতে। উর্মি তাতে কিছু মনে করবে কি না কে জানে। মনে করার অবশ্যি কিছুই নেই। আর যদি মনে করে তাতেই বা কি।

'আপা।'

'কি?'

এ বাড়িতে এসে তোমার কি খারাপ লাগছে?'

'না।'

'আমার নিজের খুবই ভালো লাগছে। এ বাড়িতে আমার গল্প করার কেউ নেই। তোমার সঙ্গে গল্প করতে পারব।'

'দোতলায় যাঁরা থাকেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই?'

'না। বুড়োমতো এক ভদ্রলোক থাকেন। আর তাঁর এক খালা না কি কে যেন থাকেন। আমি ও বাড়িতে যাই না। চাচাদের বাসাতেও যাই না। আমার জীবন এই ঘরটার মধ্যে কেটে যাচ্ছে আপা।'

সোমা চুপ করে রইল। পাশের ঘর থেকে চাপা অথচ রাগী গলা শোনা যাচ্ছে। সোমা বলল, 'এ-রকম করে কথা বলছে কে রে?'

'বড় চাচা। মাঝে-মাঝে চাচা এ-রকম করে। মাথা গরম হয়ে যায় তখন এই সব শুরু করে।'

'তাই না-কি?'

'হুঁ। আমার মনে হয় বড়ো চাচা পাগলটাগল হয়ে যাচ্ছে।'

সোমা চুপ করে বড়ো চাচার কথাগুলো শুনতে চেষ্টা করল। তেমন কিছু বোঝা যায় না তবে 'কেটে ফেলব' 'পুতে ফেলব'—এইসব শব্দ কানে আসছে।

৫

উর্মির ঘরে নতুন ফ্যান লাগানো হচ্ছে। কড়ই গাছ বিক্রির টাকায় কেনা ফ্যান। বিজুর উৎসাহের সীমা নেই। যদিও নীল গেঞ্জি গায়ে এক জন ইলেকট্রিশিয়ান আনা হয়েছে, তবু পুরো কাজটা করল বিজু। কানেকশন দিয়ে সুইচ টিপল। ফ্যান ঘুরল না। ইলেকট্রিশিয়ান টেস্টার দিয়ে দেখে বলল, 'লাইন তো ভাইজান ঠিক আছে।'

উর্মি বলল, 'ফ্যান ঠিক আছে তো? দোকানে চালিয়ে দেখেছ?'

বিজু বিরক্ত গলায় বলল, 'না চালিয়ে ফ্যান কিনব না-কি?'

উর্মি বলল, 'লোক-ঠকানো টাকায় কেনা তো, তাই ঘুরছে না।'

বিজু চোখ লাল করে বলল, 'লোক-ঠকানো টাকা মানে? কি বলছিস তুই?' গাছটা কার, আমাদের—না অন্যদের?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আচ্ছা বাবা যাও—আমাদের! চিৎকার করছ কেন?'

'এমন চড় দেব না—জন্মের শিক্ষা হয়ে যাবে।'

উর্মি বলল, 'চেঁচামেচি না করে চড় দিয়ে ফেল। তাও ভালো।'

বিজু সত্যি-সত্যি চড় বসিয়ে দিল। উর্মি হতভম্ব হয়ে গেল। বিজু যে বাইরের একটা মানুষের সামনে চড় মারতে পারে তা তার কল্পনাতেও আসে নি। কেমন করে এটা সম্ভব হল? হচ্ছে কি এ-সব? নীল গেঞ্জি পরা ইলেকট্রিশিয়ান ব্যাপারটায় খুব মজা পাচ্ছে। দাঁত বের করে হাসছে। উর্মির ইচ্ছা করছে বিজুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। ছোটবেলায় এই জিনিসই করত। ছোটবেলায় যা করা যায় এখন তা করা সম্ভব না। সে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

বারান্দায় জাহানারা কেট্‌লি থেকে কাপে চা ঢালছেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। কাজের ছেলেটা সকালে বাজারের টাকা নিয়ে পালিয়েছে, আর ফেরে নি। সত্তর টাকা নিয়ে ভেগে গেছে। অথচ তার বেতন পাওনা ছিল দেড় শ' টাকার ওপরে।

জাহানারা বললেন, 'সোমা কোথায় গেছে তুই জানিস?'

উর্মি জবাব দিল না। সে কান্না থামাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। জাহানারা বললেন, 'কথা বলছিস না কেন? সোমা কোথায় গেছে জানিস?'

'না।'

'চা-টা বিজুকে দিয়ে আয়।'

'আমি পারব না মা।'

জাহানারা কঠিন চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর ফর্সা গাল রাগে লাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে। তিনি তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'কি বললি?'

'কিছু বলি নি, দাও—চা দাও দিয়ে আসছি।'

উর্মি চায়ের কাপ বিজুর সামনে রেখে সহজ গলায় বলল, 'বিজু ভাইয়া চায়ে চিনি হয়েছে কি-না দেখ।'

বিজু বলল, 'যা রহমানের জন্যে চা নিয়ে আয়—দেখ তাকিয়ে, প্রবলেম সলভ্‌ড। ফ্যান বন-বন করছে। হা-হা।'

উর্মি তাকাল। নীল-রঙা ফ্যান ঘুরছে। ঘরে প্রচুর বাতাস। অথচ তার নিজের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সে বারান্দার দিকে রওনা হল—রহমানের জন্যে চা আনতে হবে। যে একটু আগে তাকে চড় খেতে দেখেছে। দেখে দাঁত বের করে হেসেছে।

উর্মি চা ঢালছে।

জাহানারা পাশের চেয়ারে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন। তিনি বিরস মুখে বললেন, 'কার চা?'

'রহমানের।'

'রহমানটা কে?'

'ইলেকট্রিশিয়ান।'

'ইলেকট্রিশিয়ানকে আবার চা-বিসকিট খাওয়াতে হচ্ছে? সোমা কোথায় গেছে তুই জানিস না?'

'না, জানি না।'

'কাউকে কিছু না বলে গেল কোথায়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উর্মি চা নিয়ে চলে গেল। বিজু এসে বলল, 'ফ্যান কেমন ঘুরছে দেখে যাও মা। বন- বন-ফন-ফন। ঘরে বাতাসের ফ্লাড হয়ে যাচ্ছে।'

জাহানারা বললেন, 'সোমা কোথায় গেছে জানিস?'

'না।'

'কাউকে কিছু না বলে কোথায় গেল?'

বিজু চিন্তিত গলায় বলল, 'কখন গেছে?'

'দুপুর থেকে তো দেখছি না।'

'মাই গড।'

দু' জনের মনেই যে চিন্তা একসঙ্গে কাজ করল তা হচ্ছে—আগের জায়গায় ফিরে যায় নি তো? কাউকে কিছু না বলে যাওয়ার অর্থ তো একটাই। বিজু বলল, 'এক বার চট করে দেখে আসব প্রফেসরের বাসাটায় আছে কি না?'

'সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। সন্ধ্যার মধ্যে যদি না ফেরে তখন না হয়.......

'যদি দেখি ঐখানে আছে তখন কি করব?'

জাহানারা কোনো জবাব দিলেন না।

সোমা দূরে কোথাও যায় নি। গিয়েছে তার চাচার বাসায়। একসময় বড় চাচা ছদরুদ্দিন তাকে খুব স্নেহ করতেন। ঈদে নিজের মেয়েদের জামার সঙ্গে বাড়তি একটি জামা কেনা হত সোমার জন্যে। এক রাতের কথা সোমার পরিষ্কার মনে আছে, সে তখন ক্লাস সেভেনে পড়ে। বড় চাচা থাকেন সোবহানবাগে। রাত তিনটার দিকে হেঁটে-হেঁটে সোবহানবাগ থেকে এখানে এসে উপস্থিত। তিনি সোমাকে নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। দুঃস্বপ্ন দেখে মনটা অস্থির হয়েছে—কাজেই খোঁজ নিতে এসেছেন।

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ বদলায়, সোমার ধারণা, বড় চাচা অনেকখানি বদলেছেন, তবু কিছুটা টান এখনো নিশ্চয়ই অবশিষ্ট আছে। তা বোঝা যায়। কড়ই গাছ নিয়ে বিরাট একটা হৈ চৈ হত। সোমা এ-বাড়িতে উপস্থিত বলেই হয় নি। বড় চাচা চুপ করে গেছেন।

ছদরুদ্দিন সাহেব দুপুরে ঘুমের আয়োজন করছিলেন। সোমাকে ঢুকতে দেখে উঠে বসলেন। কোমল গলায় বললেন, 'আয় মা, আয়।'

সোমা বলল, 'বাসা খালি কেন বড় চাচা? চাচি কোথায়?'

'ও তার ভাইয়ের বাড়িতে গেছে। ছোট মেয়েটাও গেছে। বাকি সব আছে—ঐ ঘরে, কি যেন করছে। আসবে। তুই এখানে বোস খানিকক্ষণ।'

'আপনি ঘুমুচ্ছেন ঘুমুন। আমি ওদের সঙ্গে গল্প করি।'

'ঘুমটুম কিছু না, শুয়ে থাকি। বিরাট যন্ত্রণার মধ্যে আছি। এর মধ্যে ঘুম হয় না।'

'কীসের যন্ত্রণা?'

'আসছিস যখন সবই শুনবি। সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা কি শুনবি? সংসার অচল। একটা পয়সা রোজগার নাই। তোর চাচি যায়—ভাইদের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে কিছু আনে, ঐ দিয়ে সংসার চলে।'

সোমা তাকিয়ে রইল। ছদরুদ্দিন ক্লান্ত গলায় বললেন, 'মেয়েগুলো বড় হয়েছে—বিয়ে দেওয়া দরকার। একটা সম্বন্ধ আসে না। হাড় জিরজিরে শরীর। সম্বন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসবেই বা কেন? কোনো ছেলে চায় একটা কঙ্কাল বিয়ে করে বাড়িতে নিতে?'

সোমা চুপ করে রইল। ছদরুদ্দিন বললেন, 'এমনিতে কঙ্কাল কিন্তু তেজ আবার ষোল আনার ওপর দুই আনা—আঠারো আনা। মান-অপমানের যন্ত্রণায় কাছে যাওয়া যায় না।'

'মান-অপমান থাকা কি খারাপ চাচা?'

'অবশ্যই খারাপ। ভিক্ষুকের আবার মান-অপমান কি? ভিক্ষুক হচ্ছে ভিক্ষুক।'

'কী-যে বলেন চাচা!'

'কি বলি মানে? আমার অবস্থা তুই জানিস? তোর চাচিরা টাকা-পয়সা দেওয়া বন্ধ করলে রাস্তায় ভিক্ষা করতে বের হব। সত্যি বের হব। তুই নিজের চোখে দেখবি।'

'চুপ করুন তো চাচা।'

ছদরুদ্দিন খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি সোমার ভালো লাগল না। কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ চাউনি। চোখ দুটো বড় বেশি জ্বল-জ্বল করছে।

ছদরুদ্দিন বললেন, 'তোর খবর কিছু কিছু শুনলাম। তোর চাচি বলছিল। এইসব কি সত্যি?'

'কোন সব?'

'চলে এসেছিস না-কি?'

'হুঁ।'

'কেন?'

'সে অনেক কথা চাচা, বাদ দিন।'

'বাদ দেব কেন? বল সবকথা।'

'বলার মতো কিছু না।'

'মারধর করত না-কি?'

'সে-সব কিছু না। স্বভাব খুব খারাপ। আজেবাজে কাজ করে বেড়ায়। জেলে পর্যন্ত গেছে। কিছু কিছু তো নিশ্চয়ই জানেন।'

'আগে একটা বিয়েও না-কি করেছিল?'

'বাদ দিন চাচা।'

'এইরকম একটা লোকের সঙ্গে তোর বিয়ে হল কি করে?'

'এইসব নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগছে না চাচা।'

'শয়তান শয়তান—চারদিকে শয়তান। মানুষের মুখোশপরা শয়তান। বুঝলি শয়তান.......।'

'চাচা আমি ঐ ঘরে যাই, দেখি তিথি-মিথিরা কি করছে।'

'কিছুই করছে না। তুই বোস এখানে—চা খাবি?'

'হ্যাঁ।'

'দেখি চায়ের ব্যবস্থা আছে কিনা, দেখা যাবে চায়ের পাতা নাই, চিনি নাই, দুধ নাই। এই সংসারে আর থাকা যাবে না। সংসার আমার জন্য না। ও তিথি, তিথি.... কানে শোনে না না-কি?'

'তিথি।'

তিথি এসে দাঁড়াল। কিছু বলল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোর সোমা আপাকে চা দে। খুটখাট শব্দ হচ্ছে কীসের?'

'ক্যারাম খেলছি।'

'এর মধ্যে ক্যারাম খেলাও চলছে? বাহ্ ভালো—খুব ভালো। খেল, আরাম করে ক্যারাম খেল। সব গুটি গর্তে নিয়ে ফেলে দে।'

তিথি মুখ কালো করে চলে গেল। সোমা ছাড়া পেল সন্ধ্যার আগে-আগে। সারাক্ষণ তাকে বড় চাচার পাশে বসে থাকতে হল। বড় চাচা ক্রমাগত কথা বলে গেলেন যার বেশিরভাগই হচ্ছে হা-হুতাশ।

'বুঝলি সোমা, আমি এখন হয়েছি কীটস্য কীট, গরুর ঘাড়ে ঘা হয় দেখেছিস? ঐ ঘায়ে একরকম সাদা-সাদা কৃমি হয়। আমি হচ্ছি ঐ কৃমি। তিথির মামারা কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন আমি একজন খানসামা। এক দিন কি হয়েছে শোন, তিথির বড় মামার বাড়িতে গিয়েছি। গিয়ে দেখি বিরাট মচ্ছব—রাজ্যের লোকজন এসেছে। তিথির মামা আমাকে কী বলল জানিস? বলল—দুলাভাই আপনি গাড়িটা নিয়ে যান ভালো দেখে কিছু দৈ-মিষ্টি নিয়ে আসুন। অবস্থা চিন্তা কর। আমি এখন হয়েছি বাসার চাকর। ঐদিকে এখন ভুলেও যাই না। ভয়েই যাই না। এখন যদি যাই তা হলে বলবে—দুলাভাই আপনি এসেছেন ভালো হয়েছে, এক বালতি পানি নিয়ে বাইরে যান তো, ড্রাইভার গাড়ি ধুচ্ছে ওকে একটু সাহায্য করুন। বিচিত্র কিছু না—বলবেই। না বলে পারে না—ঐ গুষ্ঠিরে আমি চিনি.....।'

সোমা যখন উঠে এল তখন তার রীতিমতো মাথা ধরে গেছে।

বাসায় পা দেওয়ামাত্র সবাই এক বার করে বলল, 'কোথায় ছিলে?' বড় চাচার বাসায় ছিল শুনে জাহানারা বললেন, 'ঐখানে যাওয়ার দরকার কি?' সোমা বলল, 'তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া চলছে—তোমরা যাচ্ছ না। ভালো কথা। আমি কেন যাব না?'

'বানিয়ে বানিয়ে যখন এক শ' কথা বলবে তখন বুঝবি।'

'বলুক।'

'কিছু তো জানিস না, তাই বলছিস বলুক। জানলে বলতিস না।'

'আমার জানার দরকার নেই মা।'

'তোর বড় চাচা এখন কি বলে বেড়াচ্ছে শুনবি?'

'থাক—বড় চাচা প্রসঙ্গ থাক।'

রাতে খাবার সময় সোমা নিজেই আবার বড় চাচার প্রসঙ্গ তুলল। নিচু গলায় বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বড় চাচার অবস্থা যে কত খারাপ সেটা তুমি জান?'

সাইফুদ্দিন সাহেব বললেন, 'এইসব তোকে বলল—আর তুই বিশ্বাস করে চলে এলি?'

'বিশ্বাস করব না কেন?'

বিজু বলল, 'ওঁর একটা কথাও তুমি বিশ্বাস করবে না। বিগ লায়ার। সপ্তাহে এক দিন ঐ বাড়িতে পোলাও হয়। তুমি তো এইখানেই আছ—প্রতি শুক্রবারে পোলাওয়ের গন্ধ পাবে। বড় চাচির ভাইরা বিরাট পয়সা করেছে। বোনের নামে ব্যাংকে টাকা-পয়সা জমা করে রেখেছে। মাসে মাসে যেন হাতে টাকা আসে এই জন্যে রেস্টুরেন্টের শেয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিনে দিয়েছে।'

'তুই এত খবর পেলি কোথায়?'

'চোখ-কান খোলা রাখি এই জন্যে সব জানি। কোনো কথা যদি ভুল বলি গালে একটা চড় দিও। কিছু বলব না। দিব্যি বাড়ি দখল করে বসে আছে। মতলব খুব খারাপ। তবে আমি ছাড়ার লোক না। তিন মাসের মধ্যে গেট আউট করে দেব। যদি না করি তো আমার নাম বিজু না।'

সোমা ভাত ছেড়ে উঠে পড়ল। বিজুর কথাবার্তা অসহ্য লাগছে। অল্প বয়সের একটা ছেলে কেমন ভুরু কুঁচকে বুড়োদের মতো কথা বলছে। এ-সব কি?

বিজু বলল, 'মা, দেখলে আপা কেমন আমাদের ওপর রাগ করে উঠে গেল? না জেনে, না শুনে, শুধু শুধু রাগ করলে হয়? বড় চাচার সম্বন্ধে লেটেস্ট ইনফরমেশন কী পেয়েছি শুনবে?'

জাহানারা বললেন, 'থাক এইসব।'

'আহ্ শোন না মা। ভেরি ইন্টারেস্টিং। এত দিন আমরা জানতাম বড় চাচা তাঁর দোতলাটা বিক্রি করে দিয়েছেন। ব্যাপারটা সত্যি না। বিক্রির কথা বলে টাকা নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু কাগজপত্রে সই করেন নি, সবই মুখে মুখে।'

সাইফুদ্দিন বললেন, 'বলিস কি তুই?'

বিজু বলল, 'পাকা খবর বাবা। কোনো ভুলে নাই। এখন বড় চাচি বলছেন—বাড়ি তো বিক্রি হয় নাই। বাড়ি ভাড়া অ্যাডভান্স নিয়েছি।'

সাইফুদ্দিন খাওয়া বন্ধ করে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বিজু বলল, 'এখন বাবা অবস্থাটা দেখ, নিজের অংশ তাঁর নিজেরই আছে, প্লাস আমাদের অর্ধেকটা তাঁর দখলে।'

জাহানারা বললেন, 'এই খবর পেলি কবে?'

'অনেক আগেই পেয়েছি। তোমাদের কিছু বলি নি কারণ সিওর ছিলাম না। এখন সিওর হয়েছি।'

আজ রাতটা এমনিতে ঠাণ্ডা। তার ওপর মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। অসহ্য গরমে জেগে থাকার কথা নয়, কিন্তু সোমা জেগে আছে। তার অনিদ্রা রোগ আজকের নয়, অনেক দিনের। বিয়ের পরপরই অসুখটা হল—সে জেগে আছে, পাশেই কামাল মরার মতো ঘুমুচ্ছে। মাঝে-মাঝে ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় করছে এবং কথা বলছে। খুব উত্তেজিত ভঙ্গির কথা। যেন ভয়াবহ কোনো স্বপ্ন দেখছে। প্রথম দিকে ভয় পেয়ে সোমা কামালের গায়ে ধাক্কা দিত।

'এই, এ-রকম করছ কেন? কী হয়েছে—এই!'

কামাল সঙ্গে-সঙ্গে জেগে যেত তবে কিছুই বলত না, চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে থাকত। সোমা বলত, 'এ-রকম করছিলে কেন? কি স্বপ্ন দেখছিলে?'

'মনে নাই।'

'পানি খাবে? পানি এনে দেব?'

'দাও।'

সোমা পানি এনে দেখত কামাল আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। গভীর ঘুম। কিছুক্ষণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যেই আবার ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় কথা। উত্তেজিত ভঙ্গি। হো হো শব্দ। ভয়ে সোমা কাঠ। লোকটা এ-রকম করে কেন? আবার ডেকে তুলবে? পানি খেতে বলবে? এই মানুষটাকে তার গোড়া থেকেই পছন্দ হয় নি। বিয়ের রাতেই তার মনে হয়েছে এই মানুষটা অন্যরকম। আশেপাশে সে যাদের দেখে এ তাদের মতো নয়। আলাদা। কি রকম আলাদা? সোমা ঠিক বুঝতে পারে নি। গোড়াতে অবশ্যি বোঝার চেষ্টাও করে নি। এই মানুষটাকে বোঝার জন্যে সারা জীবনই তো সামনে পড়ে আছে। এত তাড়া কীসের?

অবশ্যি বাসর রাতে লোকটির প্রতি সে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা বোধ করছিল। তাকে বিয়ে করবার জন্যে কৃতজ্ঞ। এই বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে কৃতজ্ঞ। সোমার কৃতজ্ঞ হবার কারণ ছিল। এই বাড়িতে কিংবা এই পাড়ায় সে আর থাকতে পারছিল না। তার সারাক্ষণ ইচ্ছা করত ছুটে পালিয়ে যেতে। এমন কোথাও যেতে, যেখানে একটি মানুষও তাকে খুঁজে পাবে না। কেউ আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে বলবে না—'ঐ দেখ সোমা যাচ্ছে। কোন সোমা বুঝতে পারছো তো?'

'হুঁ হুঁ—ঐ সোমা।'

'দেখতে তো বেশ শান্তশিষ্ট বলে মনে হচ্ছে।'

'শান্ত? তা শান্ত তো বটেই। হা-হা-হা। নিজে শান্ত চারদিকে অশান্ত।'

আঠার বছর বয়স পর্যন্ত সোমাকে সবাই শান্ত মেয়ে, ভদ্র মেয়ে এবং খুবই লাজুক ধরনের মেয়ে বলেই জানত। পাড়ার অতি বখা ছেলেও তাকে দেখে কোনোদিন শিস দেয় নি, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে নি।। কিংবা করলেও সোমা শোনে নি। সোমা রাস্তায় বেরুত মাথা নিচু করে। এমনভাবে হাঁটত মনে হত আশেপাশে কেউ নেই, সে যেন একা জনশূন্য পথে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

একটা ক্ষুদ্র এবং প্রায় তুচ্ছ ঘটনায় সব বদলে গেল। সোমাদের বাড়ির তিনটা বাড়ির পর নারকেল গাছওয়ালা বাড়ির দোতলায় নতুন ভাড়াটে এল। এক প্রফেসর তাঁর সাত বছরের ফুটফুটে মেয়ে এবং অসুস্থ স্ত্রী। ভদ্রলোক প্রথম দিনেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, কারণ ভদ্রলোকের সঙ্গে এল ট্রাক ভরতি বই। এত বই কারোর থাকে? বাড়িটাকে কি সে লাইব্রেরি বানাবে? মানুষগুলো থাকবে কোথায়? ভদ্রলোকের স্ত্রী এলেন এম্বুলেন্সে করে। এ-ও এক রহস্য। এম্বুলেন্স করে রুগীরা হাসপাতালে যায় এটাই জানা। এম্বুলেন্সে করে ভাড়া বাড়িতে থাকতে আসে এটা কারোর জানা ছিল না।

এক দুপুরে সোমা ভদ্রমহিলাকে দেখতে গেল।

মিষ্টি চেহারার একটা মেয়ে। প্যারালাইসিস হয়ে পড়ে আছে। সমস্ত শরীর শুকিয়ে কাঠি অথচ মুখটা ভরাট। চোখ জ্বল-জ্বল করছে। তার নাম অরুণা। তার স্বামী তাকে ডাকে অরু নামে এবং ডাকে খুব মিষ্টি করে।

ভদ্রমহিলা সোমার সঙ্গে তেমন কোনো কথা বললেন না। কি নাম? কি পড়? বাসা কোথায়? এইটুকু জিজ্ঞেস করেই খুব সম্ভব ক্লান্ত হয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। ভদ্রমহিলার স্বামী অনেক কথা বললেন। তাঁর নাম আশরাফ হোসেন। ফিলসফির অধ্যাপক। ভদ্রলোকের গলার স্বর মোটা। কথা বলার সময় চারদিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গম-গম করে, তবে কথা বলার মাঝখানে মাঝখানে হঠাৎ করে তিনি থেমে যান এবং কেমন যেন বিষণ্ন হয়ে পড়েন।

আশরাফ সাহেব বললেন, 'তোমার কি নাম খুকি?'

সোমা লজ্জিত গলায় বলল, 'সোমা।'

'সুন্দর নাম তো। বলতে লজ্জা পাচ্ছ কেন? সোমবারে জন্ম নিশ্চয়ই? সোমবারে জন্ম হলে বাবা-মারা নাম রাখে সোমা। তোমার কি সোমবারে জন্ম?'

'জ্বি।'

'কী পড়?'

'আই এস সি।'

'বাহ্, আমি আরো কম ভেবেছিলাম। বাচ্চা মেয়েরা আজকাল উঁচু-উঁচু ক্লাসে পড়ে।'

সোমা কিছু বলল না। কেন জানি তার লজ্জা কিছুতেই কাটছে না।

'তুমি কি গল্পের বই পড় সোমা?'

'অল্প-অল্প পড়ি।'

'অল্প-অল্প পড়বে কেন? অনেক বেশি-বেশি পড়বে। বই যে মানুষের কত ভালো বন্ধু এটা বই পড়ার অভ্যাস না হলে বুঝতে পারবে না। আমার কাছে অসংখ্য বই আছে। গল্প-উপন্যাসই বেশি। এস তোমাকে দেখাই।'

বইয়ের সংখ্যা, আলমারীতে সাজিয়ে রাখার কায়দা, ঘরের মাঝখানে পড়ার টেবিল সব দেখে সোমা মুগ্ধ হয়ে গেল। সে অবাক হয়ে বলল, 'সব বই আপনি পড়েছেন?'

'না, অনেক বই-ই আছে পড়তে ভালো লাগে নি, দু' এক পাতা পড়ে রেখে দিয়েছি। এখন আগের মতো পড়ার সময়ও পাই না। শুধু কিনে যাচ্ছি। তোমার যদি কোনো বই পড়তে ইচ্ছা করে এখান থেকে নিয়ে যাবে। টেবিলের ওপর যে লাল খাতাটা দেখছ ওখানে নাম লিখবে। কি বই নিতে চাও তার নাম লিখবে। তারিখ দেবে। যেদিন ফেরত দেবে মনে করে ফেরত দেওয়ার তারিখও লিখে রাখবে। কি—নেবে কোনো বই?'

সোমার বই নিতে ইচ্ছা করছিল না, তবু ভদ্রলোকের আগ্রহ দেখে মাথা নাড়ল।

'নিজে পছন্দ করে নেবে, না আমি পছন্দ করে দেব?'

'আপনিই দিন।'

'তোমার বয়সী মেয়েদের দারুণ ভালো লাগবে, পড়তে পড়তে কাঁদবে এইরকম একটা বই তোমাকে দিচ্ছি তবে একটা জিনিস মনে রেখো সোমা, পাঠকের চোখ ভিজিয়ে দেওয়া কিন্তু একটা বইয়ের উদ্দেশ্য হতে পারে না। যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে বইটি নিম্নমানের।'

সোমা বই নিয়ে চলে এল। বইটির নাম 'শোন বরনারী' সুবোধ ঘোষের লেখা। একটা বই পড়েই সোমার বইয়ের নেশা ধরে গেল। বইটা সে তিনবার পড়ল এবং তিনবারই ফুঁপিয়ে কাঁদল। ঐ বাড়ির ভদ্রলোককে তার মনে হতে লাগল ডাক্তার হিমাদ্রী। হিমাদ্রীর মতোই কেমন যেন বিষণ্ন চেহারা ভদ্রলোকের। কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি খেই হারিয়ে ফেলেন। এত ভালো লাগে দেখতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'দিন পর পর সোমা বই আনতে যেত। বেশিরভাগ সময়ই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হত না। সোমা বই নিয়ে খাতায় নাম লিখে চলে আসবার সময় খানিকক্ষণ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলত। ভদ্রমহিলা তেমন কিছু বলতেন না—তাকিয়ে থাকতেন, মাঝে-মাঝে হ্যাঁ হুঁ করে জবাব দিতেন। কথা বেশিরভাগই বলত সোমা।

'আজ আপনার শরীর কেমন?'

'ভালো।'

'আপনার গল্পের বই পড়তে ইচ্ছে করে না'

'একসময় করত, এখন করে না।'

'আপনার তো একটা হুইল চেয়ার আছে। হুইল চেয়ারে বসে এদিক-ওদিক গেলে নিশ্চয়ই আপনার ভালো লাগবে।'

'আমার ভালো লাগে না।'

'আপনার মেয়েটা এ-বাড়িতে বেশি থাকে না—তাই না?'

'ও তার মামার বাড়িতে থাকে। ওখানে ওর সমবয়েসী অনেকে আছে।'

'আমি যে প্রায়ই এসে বই নিয়ে যাই আপনি বিরক্ত হন না তো?'

'না।'

ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশিরভাগ সময় দেখা হত ছুটির দিনে। দেখা হলে তিনি প্রথম যে কথাটা বলতেন তা হচ্ছে—'তারপর সোমা, বইয়ের নেশা ধরিয়ে দিয়েছি তাই না?'

'হ্যাঁ দিয়েছেন।'

'আফিমের নেশার চেয়েও কড়া নেশা হচ্ছে বইয়ের নেশা। আফিমের নেশা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কিন্তু বইয়ের নেশা থেকে কোনো মুক্তি নেই।'

'মুক্তি থাকবে না কেন? আপনি তো আর এখন পড়েন না। আপনার তো মুক্তি ঘটেছে।'

'মোটেই না। এখনো কোনো বই হাতে নিলে শেষ না করে উঠতে পারি না। এই ভয়েই বই হাতে নেই না। হা-হা-হা। বস সোমা, তোমার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করি।'

সোমা বসে। ভদ্রলোকে বক্তৃতা দেয়ার ভঙ্গিতে বলেন, 'আচ্ছা দেখি তোমার বুদ্ধি কেমন? বলতো বই পড়তে মানুষের ভালো লাগে কেন?'

সোমা জবাব দিতে পারে না। চট করে কোন জবাব মাথায় আসে না।

আচ্ছা আরো সহজ করে বলছি, 'গান শুনতে মানুষের ভালো লাগে কেন? একটা সুন্দর ছবি দেখলে মানুষের ভালো লাগে কেন?'

'আমি জানি না।'

জানি না কথাটা বলতে সোমার খুব লজ্জা করে। ভদ্রলোক তা বুঝতে পারেন।

'এতে লজ্জিত হবার কিছু নেই। এখন থেকে চিন্তা করবে। চিন্তাটা শুরু করবে কোথায় জান? শুরু করবে ভালোলাগা ব্যাপারটা কি? বিষয়টা বেশ জটিল। তবে জানা দরকার। শুধু খাওয়া এবং ঘুমের মধ্যে আমাদের জীবন না—এই জন্যেই এসব জানা দরকার। ভাববে, মন লাগিয়ে ভাববে একসময় দেখবে তোমার ভাবতেও ভালো লাগছে। এবং বুঝতে পারবে আমাদেরকে প্রকৃতি কত ঐশ্বর্য দিয়ে পাঠিয়েছেন।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমার অনিদ্রার অসুখ এই সময় প্রথম হল। কিছুতেই ঘুম আসতে চাইত না। জেগে জেগে অদ্ভুত সব কল্পনা করতে ভালবাসত। সেইসব কল্পনার একটি ছিল সোমার খুবই প্রিয়। কল্পনাটা এ-রকম—এক দুপুরে সোমা বই আনতে যাচ্ছে। দুপুরটা আর সব দুপুরের মতো নয়, একটু যেন অন্যরকম। মেঘলা দুপুর। ঐ বাড়ির কাছাকাছি যেতেই ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি শুরু হল। সোমা দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে উঠতেই ঝড় শুরু হয়ে গেল।

ঐ বড়িতে ভদ্রলোক ছিলেন—তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার সোমা ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে, ইস ভিজে গেছ দেখি। যাও গামছা দিয়ে গা মোছ।'

সোমা বলল, 'বাসায় কেউ নেই?'

'না। অরুণা মেয়েকে নিয়ে ভাইয়ের বাসায় গিয়েছে। কাজের মেয়েটাও সঙ্গে গেছে।'

'আপনি গেলেন না কেন?'

'আমার শরীরটা ভালো না—জ্বর।'

'বেশি জ্বর?'

'বেশি বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'কই দেখি?'

বলেই সোমা ভদ্রলোকের কপালে হাত রাখল। হাত রাখতেই তার শরীর ঝিম-ঝিম করতে লাগল। মনে হল তার নিজেরই প্রচণ্ড জ্বর এসে যাচ্ছে। সোমা বলল, 'আমি নতুন একটা বই নিয়ে বাসায় চলে যাব। আপনি শুয়ে থাকুন।'

'পাগল। এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বাসায় যাবে কি? তুমি বরং একটা বই নিয়ে আসো। আমি শুয়ে তাকি তুমি পড়ে শোনাও।'

সোমা তাই করল।

উনি সারা শরীর চাদরে ঢেকে শুয়ে আছেন। বই পড়তে পড়তে সোমার চোখে পানি এসে গেছে। তিনি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সোমার দিকে। বাইরে ঝড়-বৃষ্টি। হাওয়ার তুমুল মাতামাতি। হঠাৎ........

সোমার কল্পনা এই পর্যন্তই। বাকিটা সে আর ভাবতে পারে না। বুক ধড়ফড় করে। এই কল্পনাটা সে যতবারই করে ততবারই ঠিক করে রাখে আর কোনোদিন সে ঐ বাড়িতে যাবে না। কোনোদিন না, মরে গেলেও না। দিনের বেলা মনে হয়—আচ্ছা, আর একবার শুধু যাব। আর যাব না। শুধু একবার। বইটা শুধু দিয়ে চলে আসব। এই শেষবারের মত.......

জাহানারা একদিন বললেন, 'তোর চেহারা এমন খারাপ হয়েছে কেন? তোর কি কোনো অসুখ-বিসুখ হয়েছে?'

'বুঝতে পারছি না।'

'তোর বাবাকে দেখিয়ে ওষুধ-টষুধ খা। তোর দিকে তো তাকানো যাচ্ছে না।'

সাইফুদ্দিন সাহেব মেয়েকে দেখে টেখে বললেন, 'লিভারের কোনো সমস্যা। হজমে গণ্ডগোল হচ্ছে। একটা ডাইজেসটিভ এনজাইম দিচ্ছি। ওতেই কাজ হবে। আর শোন মা, তুই রাতদিন মুখের ওপর বই নিয়ে পড়ে থাকবি না, একটু হাঁটা-হাঁটি করবি। এক্সারসাইজের দরকার আছে। খুব ভোরবেলা উঠে খানিকক্ষণ ফ্রিহ্যান্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক্সারসাইজ করবি।

সেই সময় ঘটনাটা ঘটল।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, ঐদিনের দুপুরটা ছিল সোমার কল্পনার দুপুরের মতো—মেঘলা–বাতাস ছিল মধুর। ঐ বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। সোমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজল। হোক—সবকিছু কল্পনার মতো হোক।

ভদ্রলোকই দরজা খুলে দিয়ে বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এই বৃষ্টির মধ্যে? বাবা বইয়ের তো দেখি ভালো নেশা ধরে গেছে।'

সোমা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'বাসায় আর কেউ নেই।'

তিনি বললেন, 'থাকবে না কেন? সবাই আছে। এসো। আজ দেখি শাড়ি পড়ে এসেছ। ভেরি গুড। শাড়ি হচ্ছে একটা এলিগ্যান্ট ড্রেস। এবং এই ড্রেসের সবচেয়ে বড় বিউটি কি জান?'

'জ্বি না।'

'পৃথিবীর অন্য সব ড্রেসের সমস্যা হচ্ছে একজনেরটা অন্যজনের গায়ে লাগে না। দরজি দিয়ে বানাতে হয়। শাড়িতে এই সমস্যা নেই। কি ঠিক বলি নি?'

'হ্যাঁ ঠিক।'

'তুমি আজ এত গম্ভীর হয়ে আছ কেন বল তো? কি হয়েছে?'

'কিছু হয় নি।'

'জ্বর–জারি না তো?'

'জ্বি না।'

'সাবধান থাকবে। এখন খুব অসুখ বিসুখ হচ্ছে। এস আজ আমি নিজেই তোমাকে পছন্দ করে বই দেব। এস।'

তারা লাইব্রেরি ঘরে ঢুকল।

ঘরটা এমনিতেই অন্ধকার অন্ধকার। আজ আকাশ মেঘলা থাকায় আরো যেন বেশি অন্ধকার লাগছে। সোমার কেমন যেন লাগছে। বুক শুকিয়ে কাঠ, অসম্ভব তৃষ্ণাবোধ হচ্ছে। খুব ইচ্ছে করছে মানুষটার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতে।

'কি ব্যাপার সোমা এত ঘামছ কেন? তুমি বস তো এই চেয়ারটায় আমার মনে হচ্ছে তোমার শরীর ভালো না। দাঁড়াও ফ্যানটা ছেড়ে দিচ্ছি।'

সোমা কাতর গলায় বলল, 'আমি বাসায় যাব।'

তিনি বিস্মিত হয়ে তাকালেন। আর ঠিক তখনি পাশের ঘর থেকে অরুণা তীব্র ও তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমরা ঐ–ঘরে কি করছ? তোমরা ঐ–ঘরে কি করছ? তোমরা দুজন ঐ–ঘরে কি করছ?'

ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে তাকালেন সোমার দিকে। তারপরই শান্ত ভঙ্গিতে স্ত্রীর ঘরে ঢুকে ভারী গলায় বললেন, 'এ–রকম করছ কেন অরুণা? ছিঃ, এসব কি? আমার স্বভাব–চরিত্র তুমি জান না?'

অরুণা আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'আমি দেখেছি। আমি দেখেছি। আমি জানি তোমরা কি করছ। আমি জানি। আমি জানি।'

কাজের মেয়েটি ছুটে এল। একতলার ভদ্রমহিলা ছুটে এলেন। পাশের ঘরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানালা খুলে গেল। বাড়ির সামনের গেটে দু'জন পথচারী থমকে দাঁড়ালেন। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মানুষের মতো অরুণা চেঁচাচ্ছেন, 'আমি জানি, আমি জানি।'

সোমা ছুটে বের হয়ে গেল।

এ-রকম ঘটনা এ-পাড়ায় অনেকদিন ঘটে নি। সাইফুদ্দিন সাহেবের বাসার সামনে দেখতে দেখতে লোক জমে গেল। নিতান্ত অপরিচিত লোকজন দরজায় কড়া নেড়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'মেয়েটাকে ওরা কি করেছে বলেন দেখি ভাই। ঐ হারামজাদার আমরা চামড়া খুলে ফেলব।'

প্রফেসর সাহেবের ঐ দোতলা বাড়ির চারদিকে ছেলেপুলে জমে গেল। ঢিল পড়তে লাগল—সেই সঙ্গে কুৎসিত গালাগাল—তলে তলে ফূর্তি। রস বেশি হয়ে গেছে। আয় হারামজাদা রস বের করে দিই।'

সন্ধ্যার পর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে পাড়ায় পুলিশ চলে এল। সাইফুদ্দিন সাহেব সেই রাতেই মেয়েকে খালার বাড়ি টাঙ্গাইলের বড়ো বাসালিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। খালার সেই পাঁচিল ঘেরা বড়ি ছিল দুর্গের মতো। সোমার মনে হল এই দুর্গ থেকে কোনোদিন সে বেরুতে পারবে না। দু' মাস পর সাইফুদ্দিন সাহেব মেয়েকে ঢাকায় নিয়ে এলেন। সোমার দিকে তখন তাকানো যায় না। চোখ বসে গেছে। মাথার সামনের দিকের চুল খানিকটা উঠে গেছে। কথা বার্তাও কেমন অসংলগ্নভাবে বলে।

জাহানারা মেয়েকে দেখে কেঁদে ফেললেন।

পাড়ার মেয়েরা রোজ দল বেঁধে আসে। নানান কথা বার্তার পর একসময় বলে, 'কৈ, মেয়ে এসেছে শুনলাম। মেয়েকে লুকিয়ে রেখেছেন কেন? লুকিয়ে রাখার দরকার কি?'

তারা নিজেদের মধ্যে চোখে-চোখে কথা বলেন। সেই চোখের ভাষা জাহানারা পড়তে পারেন। তিনি আতঙ্কে শিউরে ওঠেন।

পাড়ার মেয়েরা নিজেদের মধ্যে প্রকাশ্যেই আলোচনা করে, 'পেট নামিয়ে এসেছে। দেখলেই বোঝা যায়। কোন আনাড়িকে দিয়ে কাজ করিয়েছে কে জানে—দেখেন না মেয়ের কি অবস্থা? প্রায় মেরে ফেলতে বসেছিল।'

একদিন সন্ধ্যায় সোমা কি জন্যে যেন বাইরের বারান্দায় গিয়েছে—দুটি ছেলে তাকে দেখে শিশুদের কান্নার নকল করে ওঁয়া ওঁয়া করতে লাগল। সোমা মাকে গিয়ে বলল, 'মা, ওরা এমন করছে কেন?' জাহানারা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তার পরেরদিন আবার তাকে টাঙ্গাইল পাঠিয়ে দেওয়া হল। জাহানারা তাঁর বোনকে লিখলেন—আপা, তুমি যেভাবেই পার আমার এই মেয়েটাকে একটা বিয়ে দিয়ে দাও। কানা, খোঁড়া, অন্ধ যাই হোক। তুমি এটা কর, আমি তোমার কাছে হাতজোড় করছি। আমার মন কেমন করছে। মনে হচ্ছে এই মেয়ের কোনোদিন বিয়ে হবে না। আপা, তুমি আমাদের বাঁচাও।

পৌষ মাসে সোমার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে টাঙ্গাইলে হল, খুব তাড়াহুড়ার বিয়ে বলে কাউকে খবর দেওয়া গেল না। বিয়েতে বাবা-মা কিংবা ভাই-বোনেরা কেউ আসতে পারল না।

বিয়েতে সোমা খুশিই হয়েছিল।

সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিল বিয়ের রাতে কামালের ব্যবহারে। সে তার স্ত্রীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়ের রাতে কোনোরকম বিরক্ত করে নি—হাই তুলে বলেছে, সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়। রাত থাকতে উঠতে হবে, দিনে-দিনে চিটাগাং পৌঁছাতে হবে। বিরাট যন্ত্রণা চিটাগাংয়ে ফেলে এসেছি। বিয়েটা তিনদিন পরে করলে আরাম করা যেত। বলেই লোকটা শুয়ে পড়ল। আর শোয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুম। কিছুক্ষণের মধ্যে লোকটার নাক ডাকার শব্দ শোনা যেতে লাগল। কোনো আদর না। কোনো গল্প না। ভালবাসার কোনো কথা না। সোমা সারারাত খাটের এক মাথায় কাঠ হয়ে বসে রইল। তার সারাক্ষণ ভয় ভয় করছিল—এইবুঝি লোকটা জেগে বলবে, 'এই এদিকে আস তো।' লোকটার চোখে থাকবে অন্য ধরনের আহ্বান।

সে-রকম কিছুই হল না।

খুব ভোরে ফার্স্ট বাস ধরে তারা চলে এল ঢাকায়।

কামাল বলল, 'চল তোমাদের বাসায় যাই। চা-টা খেয়ে গোসল-টোসল করে চিটাগাংয়ের বাস ধরি।'

সোমা বলল, 'আমি বাবার বাড়িতে যাব না।'

লোকটা অবাক হয়ে বলল, 'যাবে না কেন?'

'ইচ্ছা করছে না।'

'ইচ্ছা না করলে দরকার নেই। জোর-জবরদস্তির কোনো ব্যাপার না। জোর-জবরদস্তি আমার কাছে নাই।'

দুই কামরার একটা বাসায় তাদের বিবাহিত জীবন শুরু হল। দামপাড়ায় বাসা। বাসার কাছেই মসজিদ। মাইক বাজিয়ে সারাদিন সেই মসজিদে ওয়াজ হয়। লোকটা দাঁত বের করে বলল, 'দিনরাত আল্লাহ্-খোদার নাম শুনবে। নামাজ রোজা ছাড়াই সোয়াব হবে। বাসা পছন্দ?'

সোমা পুরুষ-পুরুষ গন্ধের সেই ঘরের বিছানায় চুপচাপ বসে রইল। পছন্দ-অপছন্দের কিছুই তার তখন নেই। পৃথিবীর সবকিছুই তার পছন্দ আবার সবকিছুই তার অপছন্দ।

'চা বানাতে পার? শিখেছ এইসব?'

সোমা তাকিয়ে রইল। কি-রকম অমার্জিত ভঙ্গিতে কথা বলছে লোকটা। এই কথাগুলো কি আরো সুন্দর করে বলা যায় না?

'যাও—চা বানাও, রান্নাঘরে জিনিসপত্র আছে। চা খেয়ে হেভি গোসল দিব। তারপরে দিব ঘুম। শালা ঘুম কারে বলে দেখবে। ঘুম নাম্বার ওয়ান। হা-হা-হা।'

সোমা চা বানিয়ে আনল। লোকটা হাঁটুর ওপর লুঙ্গি তুলে খালি গায়ে বসে আছে। দৃশ্যটা যে কি পরিমাণ কুৎসিত সে বোধহয় জানেও না।

লোকটা বলল, 'তোমার জন্য চা আনলে না?'

'আমি চা খাই না।'

'না খেলে কি আর করা। না খেলে নাই। বস আমার সামনে, দু একটা কথা বলি।'

সোমা বসল।

লোকটা চুক চুক করে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, 'তোমার কিছু সমস্যা আছে, আমি জানি। এও জানি সমস্যাটা ভালো না। সমস্যা আছে বলেই আমার মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলের সাথে তোমার বিয়ে হল। আমি কচি খোকা না। আল্লাহতায়ালা আমাকে কিছু বুদ্ধি দিয়ে পাঠিয়েছেন। এই জিনিস অনেককে তিনি দেন না। যাই হোক, এখন আমি কি বলছি মন দিয়ে শোন। তোমার কি সমস্যা আছে আমি জানতে চাই না। হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে। গু কাটি দিয়ে ঘাঁটলে গন্ধ ছড়ায়। গন্ধের আমার দরকার নাই। তোমার যেমন কিছু সমস্যা আছে আমারও আছে। আগে একটা বিয়ে করেছিলাম। বিয়ে টিকে নাই। এই কথা তোমার আত্মীয়-স্বজনেরে বলি নাই। আগ বাড়িয়ে সব কথা বলার দরকার কি? তুমি যদি জানতে চাও বলব। জানতে না চাইলে বলব না। তারপর ধর...

সোমা তার কথা শেষ করতে দিল না। কথার মাঝখানেই স্পষ্ট করে বলল, 'আমার কোনো সমস্যা নেই।

লোকটা বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'কি বললে তুমি?

'আমার কোনো সমস্যা নেই।

'না থাকলে তো ভালো। কাছে আস।

সোমা কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে কাছে এগিয়ে গেল।

'বস।

সোমা বসল।

লোকটা হাতের সিগারেট দূরে ছুঁড়ে ফেলে খুবই সহজ ভঙ্গিতে সোমার বুকে হাত রাখল। সোমা কাঠ হয়ে গেল। লোকটা বলল, 'যাও জানালাগুলো বন্ধ করে দাও।

সোমা তাকিয়ে রইল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে কিছুই বিশ্বাস করতে পারছে না।

'যাও জানালাগুলো বন্ধ কর। লজ্জার কিছু নাই।

সোমা উঠে গিয়ে জানালা বন্ধ করল। তার অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। এই মানুষটার সঙ্গে তার বাকি জীবন কাটাতে হবে? কেন? সে এমন কি অপরাধ করেছে?

সোমাদের ঢাকা পৌঁছানোর সাত দিনের দিন সাইফুদ্দিন সাহেব মেয়েকে দেখতে এলেন। মেয়ের ছোট্ট এবং গোছানো সংসার দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। জামাইয়ের জন্যে দামি একটা ঘড়ি এবং পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে এসেছিলেন। ঘড়ি এবং টাকা দিয়ে জামাইকে ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথাই বললেন যার তেমন কোনো অর্থ নেই। কামাল নত মস্তকে সব শুনল এবং প্রতিবারই বলল, 'অবশ্যই। যা বলেছেন সবই খাঁটি কথা। একটাও ফেলে দেবার কথা না।

জামাইয়ের ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হলেন। তাঁর কাছে মনে হল—ছেলেটার বয়স একটু বেশি হলেও সে অতি নম্র, অতি ভদ্র।

ঢাকায় ফিরে আসার আগে সোমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'জামাই কি করে সেটাতো বুঝলাম না? ছেলে করে কি?

সোমা ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

সাইফুদ্দিন সাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা কি?

কামাল তার শ্বশুরকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিল। সাইফুদ্দিন সাহেব ট্রেন ছাড়ার আগ মুহূর্তে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা, তুমি কি কর ঠিক বুঝলাম না। ব্যবসা?

কামাল দাঁত বের করে হাসল। জবাব দিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাইফুদ্দিন সাহেব গভীর দুশ্চিন্তা নিয়ে ঢাকায় ফিরলেন। লম্বা চিঠি লিখলেন মেয়েকে। কোনো উত্তর পেলেন না। আবার লিখলেন, তারও উত্তর নেই। তিনি আবার চিটাগাং গেলেন, সোমারা ঐ বাড়িতে নেই। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারে না।

বাড়িওয়ালা বলল, 'ঐ লোক আপনার কি হয়? বিরাট ফক্কড় লোক। তাকে বাড়ি ভাড়া দিয়ে বিরাট যন্ত্রণায় পড়েছি। দু' দিন পরে-পরে পুলিশ এসে খোঁজ করে। বাড়িটার বদনাম হয়ে গেছে।'

সাইফুদ্দিন সাহেব মাটিতে বসে পড়লেন। পরের তিন মাস তিনি মেয়ে-জামাইয়ের কোনো খোঁজ বের করতে পারলেন না। তিন মাস পর খুলনা থেকে মেয়ের চিঠি পেলেন–

বাবা,

আমি ভালো আছি। আমাকে নিয়ে তোমরা দুশ্চিন্তা করবে না। ইতি,

তোমাদের

সোমা।

পুনশ্চ: মাকে সালাম দিও। বিজু এবং ঊর্মিকে আদর।

৬

কামালের চোখের অবস্থা খুব খারাপ হয়েছে। আগে মাঝে-মাঝে পানি পড়ত, এখন ক্রমাগত পড়ে। রোদে বের হলে যন্ত্রণা হয়। চিনচিনে ব্যথা হয়। ঘন কালো রঙের চশমা একটা সে কিনেছে। সেই চশমা চোখে দিলে দিনে-দুপুরে ঢাকা শহর অন্ধকার হয়ে যায়। কাউকে চেনা যায় না। এও এক যন্ত্রণা।

ঢাকা শহরে প্রতিটি লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে পথ হাঁটতে হয়। চিনে চিনে পথ চলা। এখন সেটা সম্ভব হচ্ছে না। পথ চলতে হচ্ছে অন্ধের মতো। তার মতো মানুষের জন্যে এটা খুবই বিপজ্জনক।

একদিন দুপুরে গুলিস্তানের মোড়ে তাকে পিছন থেকে কে যেন ডাকল, 'কে কামাল সাহেব না?'

এইসব ক্ষেত্রে কামাল কখনো মাথা ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকায় না। দ্রুত সরে পড়তে চেষ্টা করে। সেদিনও তাই করল। প্রায় লাফ দিয়ে চলন্ত একটা বেবিট্যাক্সিতে উঠে পড়ল। বেবিট্যাক্সিওয়ালা তার দিকে ফিরতেই বলল, 'তাড়াতাড়ি যাও। পিজি। পেটে ব্যথা উঠেছে। মরে যাচ্ছি।'

বেবিট্যাক্সিওয়ালা ঝড়ের গতিতে বেবিট্যাক্সি পিজিতে নিয়ে এল। কামাল ভাড়া মিটিয়ে শিশুপার্কের দিকে হাঁটা ধরল। বেবিট্যাক্সিওয়ালা তাকিয়ে রইল হতভম্ব হয়ে। পেটে ব্যথার রুগী শিশুপার্কে যায় কেন?

ঢাকা শহরে কামালের চেনা লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এটা তার জন্যে খুবই খারাপ। বছর চারেকের জন্যে এই শহর ছেড়ে অন্য কোথায়ও চলে যাওয়া দরকার। মুশকিল হচ্ছে যেতে ইচ্ছা করছে না। আলস্য এসে গেছে। বেশিরভাগ সময় এখন সে ঘরেই থাকে। খবরের কাগজ পড়ে। ঘুমায়। কিছু জমা টাকা আছে, এইগুলি শেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না হওয়া পর্যন্ত সে এইভাবেই থাকবে। ঝামেলায় যেতে ইচ্ছা করে না। রোজ সন্ধ্যাবেলা সোমার জন্যে তার কেন জানি খুব খারাপ লাগে। মনে হয়, মেয়েটা বড় ভালো ছিল। আমার সঙ্গে থেকে খুব কষ্ট করে গেল।

৭

সোমার কেমন যেন শীত শীত লাগছে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে বোধহয়। ফ্যানের শোঁ-শোঁ শব্দে কিছুই শোনা যাচ্ছে না। বিজু ফ্যানটা ভালো কেনে নি। এত শব্দ হবার তো কথা না।

সোমা উঠে বসল।

পাশের খাটে উর্মি। কেমন এলোমেলো ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। উর্মির জীবনটা কেমন হবে কে জানে! এই ব্যাপারটা আগেভাগে জানা থাকলে ভালো হত। নিজেকে প্রস্তুত করে রাখা যেত। পৃথিবী বড় রহস্যময় জায়গা। সব রহস্যে ঢাকা। আগে থেকে কিছুই জানা যায় না।

স্যান্ডেল খুঁজে ,পাওয়া যাচ্ছে না। সোমা খালি পায়েই দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। বৃষ্টি পড়ছে ঠিকই। বিজু শুয়েছে বারান্দায়। বৃষ্টির ছাট লাগছে গায়ে। তবু ঘুম ভাঙছে না। সে এসে বিজুকে বিপদে ফেলে দিয়েছে। নিজের ঘর ছেড়ে বেচারাকে ঘুমুতে হচ্ছে বারান্দায়।

সোমা ডাকল, 'এই বিজু।'

বিজু সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিল, 'কি আপা?'

'জেগেছিলি নাকি?'

'হুঁ।'

'বৃষ্টিতে ভিজছিস তো, ভেতরে গিয়ে ঘুমো। আমি উর্মির সঙ্গে শোব।'

'দু' এক ফোঁটা পানিতে আমার কিছু হয় না আপা।'

বলতে বলতে বিজু মশারির ভেতর থেকে বের হয়ে এল। হাত বাড়িয়ে বালিশের নিচ থেকে সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই বের করল। সোমা তাকিয়ে আছে। কত ছোট দেখেছে তাকে। ঘরময় হামাগুড়ি দিত। একটু পর পর বলত—হাঁউ। এই ছেলে বয়স্ক লোকের ভঙ্গিতে মুহূর্তে সিগারেটের প্যাকেট বের করে। কায়দা করে ধোঁয়া ছাড়ে।

'আপা।'

'কি।'

'এ বাড়িতে রাতে তোমার ভালো ঘুম হচ্ছে না—তাই না?'

'হবে না কেন, হয়।'

'একটু পর-পর বিছানা থেকে ওঠো। পানি খাও। বারান্দায় হাঁটাহাঁটি কর। আবার গিয়ে শোও।'

'তুই এত-সব দেখিস কখন? জেগে থাকিস?'

'হুঁ।'

'তোরও ঘুম হয় না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হয়। তবে কম হয়। আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে নানান চিন্তা করি।'

'কি চিন্তা-ভাবনা?'

'দ্রুত কীভাবে বড়লোক হওয়া যায়।'

'এখনি মাথায় এই চিন্তা?'

'হুঁ। এখনি। এবং দেখবে আমি হয়ে ছাড়ব। পুতু-পুতু লাইফ অসহ্য। বি এ পাশ করে পড়াশোনা স্টপ করে দেব। তারপর.....'

'তারপর কি?'

'এখন বলব না। আছে অনেক পরিকল্পনা। প্রথম পরিকল্পনা হচ্ছে—বড় চাচার উচ্ছেদ। কী-রকম কায়দা করে এটা করি সেটাই শুধু দেখো।'

'ছিঃ বিজু ছিঃ।'

বিজু কোনো উত্তর করল না। নিজের মনে হাসল। সোমা বারান্দায় রাখা চেয়ারে বসল। বৃষ্টি দেখতে তার ভালো লাগছে।

'চা খাবে নাকি আপা? ফ্লাস্কে চা আছে। খেতে পার। দেব?'

'দে।'

বিজু উঠে চা ঢালল। আপার জন্যে এবং তার নিজের জন্যে।

'আপা।'

'বল।'

'ঐখানে তুমি অনেক কষ্ট করেছ। আর তোমাকে কষ্ট করতে দেব না। তোমার ঝামেলাটা যখন হয় তখন আমি ছোট ছিলাম। আমার বয়স একটু বেশি হলে ঘটনা অন্যরকম হত।'

'তুই বিরাট দায়িত্ববান হয়েছিস মনে হয়।'

'হ্যাঁ হয়েছি। তোমাদের ভালো লাগুক বা না লাগুক দায়িত্ববান কিন্তু হয়েছি।'

বিজু চুপ করে গেল। সে বৃষ্টি দেখছে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। একটা ব্যাঙ লাফিয়ে বারান্দায় উঠেছে। এখন ঢুকতে চাচ্ছে। বিজু তা দেখেও চুপ করে আছে। সোমা মৃদু গলায় বলল, 'বিজু।'

'বল।'

'ঐ প্রফেসর সাহেব কি এখন আছেন? মানে ঐ যে......

'জানি কার কথা বলছ। হ্যাঁ আছেন।'

'ঐ বাড়িতেই?'

'হুঁ।'

'কেমন আছেন—তুই কিছু জানিস?'

'ভালোই আছেন। খারাপ থাকবেন কেন। তবে বেচারার বৌ মারা গেছে।'

'কবে?'

'তা প্রায় দুই বছর। মারা যাবার আগে ভদ্রমহিলার পুরোপুরি মাথা খারাপ হয়ে গেল। গলায় মাইক লাগিয়ে রাতদিন চেঁচাত। কানে আঙুল দিতে হয় এমন সব গালাগালি। বিশ্রী অবস্থা।'

সোমার খুব ইচ্ছে করছে জিজ্ঞেস করতে—ভদ্রলোক কি আবার বিয়ে করেছেন? জিজ্ঞেস করতে লজ্জা লাগছে। বিজু কি মনে করবে কে জানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভদ্রলোক কি আবার বিয়ে করেছেন?'

বিজু কঠিন স্বরে বলল, 'না।'

ব্যাঙটা এখনো লাফালাফি করছে। বিজু তার চায়ের কাপের গরম চা ব্যাঙটার উপর ঢেলে দিল।

৮

দোতলা বাড়িটা আগের মতোই আছে।

নারিকেল গাছ দু'টি বড় হয়েছে। আগে যেখানে ফুলের বাগান ছিল সেখানে টিনের ছাদ দেওয়া গ্যারাজ। বাড়ির পাঁচিল ভেঙে আরো উঁচু করা হয়েছে। এ-ছাড়া সব আগের মতো।

সোমা গেট দিয়ে ঢুকে একটু ইতস্তত করতে লাগল। সরাসরি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যাওয়া কি ঠিক হবে? শোভন হবে? একতলায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দেখা গেলে জিজ্ঞেস করা যেত—প্রফেসর সাহেব কি আছেন? একতলার বাসিন্দাদের জানার কথা না প্রফেসর আছেন কি নেই, তবু জিজ্ঞেস করা।

সোমা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। এক বার শুধু মনে হল, কেন সে যাচ্ছে? মনের ভেতরের সেই প্রশ্ন তাকে কাবু করেই ফেলত যদি না দোতলার সিঁড়ি দিয়ে কাজের মেয়েটি না নামত। খালি বালতি হাতে সে নামছে। সোমাকে দেখে বলল, 'কারে চান আফা?'

'প্রফেসর সাহেব কি আছেন?'

'জ্বি আছেন। একটু আগে দেখছি।'

কাজের মেয়েটি তাকিয়ে আছে। তার চোখের সামনে থেকে নেমে চলে যাওয়া যায় না। সোমা দরজার কলিং বেলে হাত রাখল।

দরজা খুলল।

সোমা শুকনো গলায় বলল, 'আপনি আমাকে চিনতে পারছেন?'

ভদ্রলোক ভারি গলায় বললেন, 'এস সোমা। এস।'

সোমার পা যেন মেঝেতে আটকে গেছে। সে নড়তে পারছে না। ভদ্রলোক চশমার ভেতর দিয়ে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বয়স তাঁর মধ্যে তেমন ছাপ ফেলতে পারে নি। শরীর একটু ভারি হয়েছে। কানের কাছের কিছু চুল রুপালি হয়ে গেছে। এতে তাঁকে আরো যেন সুন্দর দেখাচ্ছে।

'দাঁড়িয়ে আছ কেন সোমা? এস ভেতরে এস।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না।'

'কেন চিনতে পারব না বল তো? তুমি তো বদলাও নি। আগের মতো আছ। তোমার বয়স বাড়ে নি। এখনো খুকির মতোই লাগছে। বস, এখানে বস।'

'আজ যাই। অন্য একদিন আসব।'

সোমা বসতে-বসতে বলল, 'বাসায় কেউ নেই?'

'কাজের একটা ছেলে এসেছে। কি যেন আনতে গেছে। এসে পড়বে। ও এলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে চা দেব।'

'আপনার মেয়ে কোথায়?'

'ওকে মেয়েদের ক্যাডেট কলেজে দিয়েছি। ময়মনসিংহ। জান বোধহয়।

'হ্যাঁ জানি।'

একটু বস, আমি সিগারেট নিয়ে আসি। আগে সিগারেট খেতাম না। এখন হয়েছি চেইন স্মোকার।'

উনি সিগারেট আনতে অনেক দেরি করলেন। সোমা একা একা বসে রইল। আশ্চর্য। এই বাড়ির বারান্দায় একা একা বসে থাকতে খারাপ লাগছে না।

'সোমা।'

'জ্বি।'

'তোমার কথা প্রায়ই ভাবতাম। তুমি আমার স্ত্রীর উপর কোনো রাগ রেখ না। ওর মাথার ঠিক ছিল না।'

'আমি জানি।'

'দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই অবস্থা হল। ঐ-দিন তোমার জন্যে যে কি খারাপ লেগেছে......'

'ঐ-সব বাদ দিন।'

'বাদ দিতে পারলে তো ভালোই হত। কিছুই বাদ দেওয়া যায় না। সব থাকে।'

সোমা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

তিনি বললেন, 'তোমার খবর আমি সবই রেখেছি। অবশ্যি কখনো কোনোরকম যোগাযোগের চেষ্টা করি নি। ইচ্ছা করেই করি নি। এমনিতেই যথেষ্ট সমস্যা হয়েছে। আমি আর তা বাড়াতে চাই নি।'

সোমা কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, 'আপনার লাইব্রেরি আগের মতোই আছে?'

'আছে। বই অনেক বেড়েছে। আগে বই পড়ার সুযোগ হত না। এখন সুযোগ পাই। প্রচুর পড়ি। ঠিক তুমি আগের মতো আসবে। এসে বই নিয়ে যাবে। এস আমার সঙ্গে বই দিয়ে দিই।'

'আজ থাক। আরেক দিন এসে নেব। আজ বই নিতে ইচ্ছে করছে না।'

'ইচ্ছে করছে না কেন?'

'আমার বই পড়ার অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর বই পড়তে ভালো লাগে না।'

তিনি সোমার সঙ্গে-সঙ্গে একতলায় নেমে এলেন। সোমা বলল, 'আপনাকে আসতে হবে না, আপনি কেন কষ্ট করছেন।'

তিনি হাসিমুখে বললেন, 'একটু কষ্ট না হয় তোমার জন্য করলাম। তুমি তো আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছ। কর নি?'

রাস্তায় নেমেই সোমা লক্ষ করল বিজু রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। সোমার চোখে চোখ পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিজু চোখ নামিয়ে উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করল। বিজুর হাতে সিগারেট। সে আধ-খাওয়া সিগারেট দূরে ছুঁড়ে ফেলল। তার মুখ গম্ভীর। থু-থু করে সে কয়েক বার থুথু ফেলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯

খাটের নিচে মিউ-মিউ শব্দ হচ্ছে। রাতে কামালের ঘুম সচরাচর ভাঙে না। আজ মিউ-মিউ শুনে ঘুম ভাঙল। বিড়াল নির্ঘাত বাচ্চা দিয়ে দিয়েছে। শালি তা হলে খালাস হয়েছে। কামাল খাট থেকে নেমে বাতি জ্বালাল—উঁচু স্বরে ডাকল, 'মিনু ও মিনু।' কেউ সাড়া দিল না। কারণ মিনু বাড়িতে নেই। আজ সন্ধ্যায় তাকে কামাল নিজেই তার খালার বাড়িতে রেখে এসেছে।

'ও মিনু।'

কামাল খাটের নিচে উঁকি দিল। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। দেয়াশলাই কাঠি জ্বালাতেই বিড়ালের জ্বলজ্বলে চোখ নজরে এল।

'ঐ বেটি, এবার কটা?'

বিড়াল বিরক্ত স্বরে মিউ করল। রাত-দুপুরে এই জ্বালাতন আর সহ্য হচ্ছে না।

কামাল বলল, 'সর না একটু দেখি। দেখি বাচ্চাগুলোকে।'

বিড়াল কি মানুষের কথা বুঝতে পারে? সে সত্যি-সত্যি সরে দাঁড়াল। ইঁদুরের মতো চারটা ক্ষুদে-ক্ষুদে বাচ্চা। চারটাই ধবধবে সাদা। চোখ ফোটে নি।

কামাল ওয়াড্রবের ওপর থেকে টর্চ লাইট নিয়ে এসে ধরল। কি সুন্দরই না লাগছে বাচ্চাগুলোকে। এখনো চোখ ফোটে নি। এক জন গড়িয়ে অন্য জনের গায়ে পড়ে যাচ্ছে। মা বিড়ালটা তখন বিরক্ত মুখে মিউ করছে।

কামাল আবার ডাকল, 'সোমা ও সোমা।' তখন মনে পড়ল সোমা নেই। মনটা একটু খারাপ হল। আনন্দের জিনিস একা-একা ভোগ করা যায় না। কাউকে পাশে লাগে। কামাল পিরিচে দুধ ঢেলে এগিয়ে দিল। দরাজ গলায় বলল, 'খা বেটি, বেশি করে খা।' বিড়ালটা যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় পিরিচের দুধে জিভ ভেজাল। মানুষটা এত করে বলছে না খেলে ভালো দেখায় না এ-রকম একটা ভাব।

কামাল বারান্দায় এসে দাঁড়াল। রাত বেশি বাকি নেই। আবার ঘুমুতে যাবার মানে হয় না। ভোরে উঠে মানিকগঞ্জ যেতে হবে। একটা পার্টি পাওয়া গেছে। খোঁজ এনেছে মোশতাক আলি। মোশতাক আলি লোকটা বদের হাড্ডি, অন্য কোনো মতলব আছে কি-না বোঝা যাচ্ছে না। মতলব থাকা বিচিত্র নয়। মানিকগঞ্জে যাওয়াটা ঠিক হবে কি-না কে জানে। কামাল বারান্দায় চেয়ারে এসে বসল। তার সামনেই ফুলের টবে-টবে বগনভিলিয়া। লাল-লাল পাতা ছেড়েছে। রাতে অবশ্যি কেমন কালচে দেখায়, কিন্তু দিনে অপূর্ব লাগে। টব দুটো সোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। দুটো কেন, সবগুলোই পাঠিয়ে দিলে হয়। বেচারির শখের জিনিস। একটা ঠেলাগাড়ি ডেকে ঠিকানা দিয়ে দিলেই হয়। ঘর তো এমনিতেই খালি করতে হবে। একা মানুষ, এ-রকম বাড়ি নিয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। সব বিক্রি-টিক্রি করে একটা হোটেলে গিয়ে উঠলেই হয়। এতে কাজকর্মের সুবিধা। চট করে হোটেল বদল করা যায়। বাড়ি তো আর চট করে বদল করা যায় না। চিঠিপত্রের জন্যে সে অবশ্যি জি পি ও পোস্টবক্স ব্যবহার করে। পোস্ট অফিসের এই ব্যবস্থাটা ভালো।

কামাল নিজেই চা বানিয়ে আনল। বানাতে বানাতে চা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মেয়েরা চা বানালে এত দীর্ঘ সময় গরম থাকে কি করে কে জানে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিতে দিতে কামাল ভাবতে লাগল মানিকগঞ্জে যাওয়াটা ঠিক হবে কি ঠিক হবে না। মানিকগঞ্জ না গেলে অনেকগুলো কাজ শেষ করা যায়। আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ অনেক দিন নেওয়া হয় না। খোঁজ নেওয়া দরকার। ঢাকায় তার আত্মীয় আছে তিন জন। তার বড় বোন, ভাবি এবং ছোট মামা। আরেক বোন আছে বগুড়ায়। এদের সবাইকেই সে মাসে-মাসে নিয়মিত টাকা দেয়। কামালের টাকাটা তাদের খুবই দরকার। ছোট মামা তাদের দুই ভাই এবং দুই বোনকে নানান দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও নিজের কাছে রেখেছেন। বোনদের বিয়ে দিয়েছেন। এখন বিপাকে পড়েছেন। ছেলেপুলে সব ক'টা অপদার্থ হয়েছে। ছোট মামাকে টাকা না দিয়ে সাহায্য করলে বিরাট অধর্ম হবে। আর বড় ভাবি, কামাল টাকা না পাঠালে না খেয়ে থাকবেন। চারটা বাচ্চা নিয়ে বিধবা হয়েছেন, এখন আছেন তার বোনের বাসায়। বোন এবং বোনের জামাই যে তাদের বের করে দিচ্ছে না তার কারণ কামালের পাঠানো টাকা। কামাল ভালো করেই জানে যেদিন সে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেবে সেদিনই তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেবে। সোজা হিসাব। বোন দু' জনের মধ্যে বগুড়ায় যে আছে তার অবস্থা ভালো। তবু তাকে মাঝে-মাঝে টাকা পাঠাতে হয়। বগুড়ার বোন হচ্ছে সবচেয়ে ছোট। বড় ভাইয়ের একটা দায়িত্ব থেকেই যায়। তা ছাড়া সবাই যখন পাচ্ছে, সেই বেচারি একা বাদ যাবে কেন?

শেষ পর্যন্ত মানিকগঞ্জ যাবার পরিকল্পনা সে বাদ দিল। খবরের কাগজের কাজটা সেরে ফেলা যাক। শুধু-শুধু দেরি হচ্ছে।

দু'টি দৈনিকে সে বিজ্ঞাপন দিল। সব জিনিসের দাম বাড়ছে, সামান্য কয়েকটা শব্দের বিজ্ঞাপনে সাত শ' আঠার টাকা বের হয়ে গেল। বিজ্ঞাপনটা এ-রকম।

AMARBOI.COM

জমি বিক্রয়

ঢাকার অদূরে ১১ কাঠার একটি প্লট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় হইবে। উঁচু জমি। এই মুহূর্তে বাড়ি করা যাইবে, তবে জমিতে ব্যাংক-সংক্রান্ত লোনের জটিলতা আছে। যোগাযোগ করুন—

সালামত শেখ, জিপিও বক্স নং—৬১৩

বিজ্ঞাপনের মূল আকর্ষণ হচ্ছে সামান্য জটিলতা। সামান্য জটিলতার লোভে লোকজন যোগাযোগ করবে। এদের মাঝখান থেকে এক জনের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা হবে। দেশটা ভর্তি বুদ্ধিমান গাধায়। কাঁঠাল ভাঙা হবে ওদেরই কারোর মাথায়।

আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাওয়ার পরিকল্পনা কামাল বাতিল করে দিল। ইচ্ছা করছে না। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক কম থাকাই ভালো। সম্পর্ক কম থাকলেই টান থাকবে। সবসময় গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে রাখলে টান থাকে না। এটা হচ্ছে জগতের নিয়ম। ছোট মামার কাছে অবশ্যি তার যেতে ইচ্ছা করছে। তবে নানান কারণেই যাওয়াটা ঠিক হবে না। বয়স বাড়ায় ছোট মামার প্যাঁচালপাড়া স্বভাব হয়েছে। সব জিনিস নিয়ে প্যাঁচাল পাড়বে। সোমা চলে গেল কেন এই প্রসঙ্গ উঠলে প্যাঁচাল পাড়তে পাড়তে মাথা ধরিয়ে দেবে।

'চলে গেল কেন? তুই কি করেছিলি?'

'আগের বৌটাও তো চলে গেল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাচ্চাকাচ্চা থাকলে তো এ-রকম হত না।'

'তোর বাচ্চা হয় না কেন? অসুবিধাটা কি? এক জন ডাক্তার দেখা। পীর-ফকিরের কাছে যা।'

এক লক্ষ কথা বলবে। কথা আর উপদেশ। নিজের ছেলেকে উপদেশ দিয়ে কিছু করতে পারল না আর সে হল গিয়ে ভাগ্নে। বুড়ো হয়ে গেলে সত্যি-সত্যি ভীমরতি হয়। খালি উপদেশ দিতে ইচ্ছা করে। মামাকে এইবার বলতে হবে—মামা, উপদেশ খাতায় লিখে আমাকে দিয়ে দিও। অবসর সময়ে পড়ব। মুখে প্রত্যেক বার বল—কষ্ট হয়।

কামাল দুপুরে দু'টা খবরের কাগজ কিনে হোটেলে খেতে গেল। খবরের কাগজে মাঝে-মাঝে বেশ ইন্টারেস্টিং কেইস পাওয়া যায়। আজকের কাগজে তেমন কিছু ছিল না, তবে এক জন বিজ্ঞাপন দিয়েছে সেকেন্ডহ্যান্ড মিউজিক সেন্টার কিংবা ক্যাসেট ডেক কিনতে চায়। টেলিফোন নাম্বার দেওয়া আছে—এই ব্যাটাকে একটু খেলিয়ে দেখা যেতে পারে।

কামাল বিকালে টেলিফোন করল।

'ভাই আপনার বিজ্ঞাপনটা দেখলাম। ক্যাসেট ডেক একটা আমার কাছে আছে।'

ওপাশ থেকে আগ্রহের সুর শোনা গেল।

'কোন কোম্পানি সেটা তো ভাই বলতে পারব না। প্যাকেট খোলা হয় নি। ব্রান্ড নিউ জিনিস।'

'তা হলে তো হবে না, আমি চাচ্ছিলাম সেকেন্ডহ্যান্ড যাতে কি-না কম দামে,—ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা দেওয়া তো সম্ভব না। তা হলে তো দোকান থেকেই কিনতাম। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেব কেন?'

'সেকেন্ডহ্যান্ডের কমে পাবেন—চোরাই মাল।'

'চোরাই মাল মানে?'

'স্মাগলড করা জিনিস।'

'ও, আই সি।'

'দশ হাজারে দিয়ে দিতে পারি, জিনিসটা নিয়ে বিপদে পড়ে গেছি। আমার টাকার দরকার।'

'কোন কোম্পানির?'

'বললাম তো ভাই আমি জানি না।'

'আমি কি এসে দেখতে পারি?'

'আপনার আসার দরকার নাই। আমি বাসায় এসে আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে যাব।'

'তা হলে তো খুবই ভালো হয়। এখন আনতে পারবেন?'

'এখন পারব না। পরশু দিন নিয়ে আসব। আপনার অ্যাড্রেসটা বলেন।'

কামাল অ্যাড্রেস লিখে নিল। এই পার্টিকে শেষ পর্যন্ত ধরা হবে কি-না এটা পরে ভেবেচিন্তে ঠিক করতে হবে। এক দিন সময় আছে, তাড়া নেই। কামাল হোটেল দেখতে বের হল। সস্তার মধ্যে ভালো হোটেল। এত দিন বাড়িতে থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে। হোটেল খুঁজতে যেতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু উপায় কি? মানুষের ইচ্ছার উপর তো আর দুনিয়া চলে না। দুনিয়া চলে তার নিজের নিয়মে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখ জ্বালা করছে। এই আরেক যন্ত্রণা হল চোখ নিয়ে। ডাক্তারের কাছে যেতে ইচ্ছা করে না।

১০

সন্ধ্যাবেলা সোমা চা বানাচ্ছিল। উর্মি এসে বলল, 'আপা একটু বাইরে যাও তো।'

সোমা বলল, 'কেন?'

'কে যেন এসেছে। তোমাকে চাচ্ছে।'

সোমা পাংশু মুখে উঠে দাঁড়াল। আচমকা বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। উনি কি এসেছেন?

'বসতে বলেছিস?'

'না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।'

'বসতে বললি না কেন?'

'বসতে বলা ঠিক হবে কি–না বুঝতে পারি নি। তুমি গিয়ে বল।'

সোমা বাইরে এসে দেখে উনি আসেন নি। কামাল দাঁড়িয়ে। সোমা শুকনো গলায় বলল, 'কি ব্যাপার?'

'আধ ঘন্টা ধরে এই এলাকায় ঘোরাঘুরি করছি। বাসা চিনতে পারছি না। অথচ এর আগে তিন বার এসেছি।'

'এখানে দরকারটা কি?

'দরকার নাই কিছু, তোমার টব দু'টা নিয়ে আসলাম। রেখেছি ঐ কোণায়। লাল রঙের পাতা ছেড়েছে। আমার ধারণা ছিল এই গাছগুলো ফাল্গুন মাসে পাতা ছাড়ে, এখন ছাড়ল কেন বুঝলাম না।'

সোমা বিরক্ত গলায় বলল, 'এগুলো আমার দরকার ছিল না।'

'বাসা ছেড়ে দিচ্ছি তো। না এনে করব কি? হোটেলে গিয়ে উঠব। একা মানুষ।'

সোমা কিছু বলবে না বলবে না ভেবেও বলে ফেলল, 'তোমার জন্যে হোটেলে থাকাই ভালো। ঘন ঘন বদলাতে পারবে।'

'তা ঠিক। তোমাকে এমন রোগা লাগছে কেন? অসুখ বিসুখ না–কি?'

'না অসুখ বিসুখ হবে কেন?'

'খুব রোগা লাগছে এই জন্যে বলছি।'

'আমার স্বাস্থ্য নিয়ে তোমার চিন্তিত হবার দরকার আছে কি?'

সোমা লক্ষ করল লোকটা লজ্জা পেয়ে কেমন বিব্রত ভঙ্গিতে হাসছে। এই লোক বিব্রত ভঙ্গিতে হাসতেও পারে না–কি? আশ্চর্য তো!

কামাল পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'বিড়ালটা বাচ্চা দিয়েছে। চারটা বাচ্চা। তিনটা খুব হেলদি। আর রোগা যেটা ঐটাকে তার মা দুধ খেতে দিচ্ছে না। ব্যাপারটা কিছু বুঝলাম না। আদর–যত্ন এটাকেই করা উচিত, অথচ.....'

সোমা চুপ করে রইল। কি বলবে সে? ভাগ্যিস বিজু বাসায় নেই। বিজু থাকলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ঘাত হৈ চৈ চেঁচামেচি শুরু করত।

'বুঝলে সোমা, আমি ন্যাকড়ায় দুধ ভিজিয়ে ঐ বাচ্চাটার মুখের সামনে ধরেছিলাম, এক বার শুধু চুক-চুক করে খেয়েছে। এখন আর খাচ্ছে না। বিরাট প্রবলেম।'

'আমাকে এসব বলছ কেন? ফুলের টব দিতে এসেছিলে, দেওয়া হয়েছে। এখন চলে যাও।'

কামাল নিচু গলায় বলল, 'তুমি চলে আসায় খুব খারাপ লাগছে। এতটা খারাপ লাগবে বুঝতে পারি নি।'

'কিছুদিন খারাপ লাগবে তারপর আর লাগবে না।'

'তা ঠিক, নিজের বাপ-মার কথাই এখন আর মনে হয় না। সোমা তা হলে যাই।'

'আচ্ছা-যাও।'

'তোমাদের বাসার সামনে একটা গাছ ছিল না, বিরাট গাছ। কেটে ফেলেছ না-কি?'

'হ্যাঁ।'

'উচিত হয় নি। গাছ কাটা ঠিক না। যাই তা হলে সোমা। ইয়ে, শোন—একদিন এসে কি বিড়ালগুলোকে দেখে যাবে?'

'না। কেন শুধু কথা বাড়াচ্ছ।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তা হলে যাই।'

যাই বলেও সে দাঁড়িয়ে রইল। সোমা বলল, 'চোখের অবস্থা তো মনে হচ্ছে খুব খারাপ। ডাক্তার দেখিয়েছ?'

'না।'

'না কেন?'

'যাব একদিন। সব শালা ফক্কড়। যেতে ইচ্ছে করে না।'

'সবাই ফক্কড়। আর তুমি হচ্ছ ভালো মানুষ?'

'না। তা না।'

'যাও, চলে যাও, দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'আচ্ছা তা হলে যাই।'

কামাল যাচ্ছে কেমন ক্লান্ত ভঙ্গিতে। ওকে ডেকে বসিয়ে এক কাপ চা খাইয়ে দিলে খুব কি অন্যায় হয়? হ্যাঁ হয়। কেন শুধু শুধু চা খাওয়াবে?

সোমা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে ঘরে ঢুকে গেল।

জাহানারা কঠিন স্বরে বললেন, 'ও এসেছিল কেন?'

'ফুলের টব দিতে এসেছিল।'

'সাহস তো কম না। ছোটলোক।'

সোমা শান্ত স্বরে বলল, 'কেন শুধু গালাগালি করছ মা। গালাগালির দরকারটা কি তা তো বুঝছি না।'

'তোর কাণ্ডকারখানা তো কিছু বুঝছি না। এত কি কথা তোর?'

'আমার কোনো কথা নেই মা। ওর কিছু কথা ছিল শুনেছি। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বের করে দিতে পারি না।'

'ওর কি কথা ছিল?'

'তেমন জরুরি কিছু না। বিড়াল চারটা বাচ্চা দিয়েছে এইটাই বলল।'

জাহানারা অবিশ্বাসী গলায় বললেন, 'বিড়াল বাচ্চা দিয়েছে এই খবর দেবার জন্যে এখানে এসেছে?'

'হ্যাঁ।'

'পাগল না-কি?'

'হ্যাঁ মা পাগল। পাগলের সঙ্গে থেকে-থেকে আমিও খানিকটা পাগল হয়ে গেছি। কারণ ঐ শয়তানটার জন্য আমার খারাপ লাগছে।'

সোমার গলা কেমন যেন ভারি শোনা গেল।

সে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। না নিজের ঘরে নয়। এই বাড়িতে তার নিজের কোনো ঘর নেই। একলা হতে ইচ্ছা করলেও এ-বাড়িতে সে উপায় নেই। অথচ এখন তার একা থাকতে ইচ্ছা করছে। সোমা হাত বাড়িয়ে চা নিল।

১১

ছদরুদ্দিন সাহেব খাটে আধশোয়া হয়ে বসা। তাঁর সামনের চেয়ারে বিজু। বিজুর চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। হাত মুঠি করা। ঘরে আর কেউ নেই তবে তিথি মাঝে-মাঝে দরজার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে এবং চলে যাচ্ছে। তিথির চোখে ভয়।

ছদরুদ্দিন সাহেব কঠিন গলায় বললেন, 'তুই আমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলছিস?'

বিজু কঠিন গলায় বলল, 'হ্যাঁ। দশ দিনের মধ্যে চলে যাবেন।'

'দশ দিনের মধ্যে চলে যাব?'

'হ্যাঁ, আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। বড় আপার ঘুমাবার জায়গা নেই। আমি ঘুমাই বারান্দায়। বিশ্বাস না হলে এক বার এসে দেখে যাবেন।'

'সোমাকে আমার এখানে পাঠিয়ে দিলেই হয়। তিথির সাথে থাকবে।'

'বড় চাচা, আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন না। বাড়িটা আপনি দশ দিনের মধ্যে ছাড়বেন।'

'কেন?'

'আবার বলছেন কেন? আপনি জানেন না কেন?'

'না, জানি না।'

'এই বাড়ি আমাদের।'

'কে বলেছে তোকে?'

'কি বলছেন আপনি? কে বলেছে মানে?'

'যা, একটা দলিল এনে আমাকে তুই দেখা যে এই বাড়ি তোর। যেদিন দেখাবি সেই দিনই ছেড়ে দেব। আর শোন বিজু, তোর মাথাটা বেশি গরম হয়ে আছে। মাথা এত গরম করিস না। এই বয়সে মাথা যদি এত গরম হয় তা হলে বাকি জীবনটা কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবি?'

'আপনি দয়া করে উপদেশ দেবেন না। উপদেশের আমার দরকার নেই।'

'তা নেই। তোর যে জিনিসের দরকার সেটা হল জুতোর বাড়ি। নেংটা করে তোকে জুতো দিয়ে পেটানো দরকার। আর মাথাটা কামিয়ে দেওয়া দরকার।'

বিজু থমথমে মুখে উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে যাবার সময় পিছনে-পিছনে তিথি আসছে। তিথি নরম গলায় বলল, 'বিজু ভাইয়া।'

বিজু জবাব দিল না।

তিথি বলল, 'আমরা এই বাড়িতে থাকব না বিজু ভাইয়া। এই বাড়ি ছেড়ে দেব। সবাই মামার বাড়িতে চলে যাব। আগেই যেতাম, শুধু বাবা যেতে চাচ্ছে না বলে যাচ্ছি না। বাবা মামাদের একেবারেই সহ্য করতে পারে না। দেখলেই কেমন পাগলের মতো হয়ে যান। বিজু ভাইয়া, তুমি রাগারাগি করো না। আমরা থাকব না।'

বিজু কোনো জবাব দিল না। তবে তিথি যে শান্ত-সহজ ভঙ্গিতে এতগুলো কথা বলতে পারল তাতে সে অবাক হল। ও সেদিনও পুঁচকে মেয়ে ছিল, আজ কেমন গুছিয়ে কথা বলতে শিখেছে। বিজুর মনে হল বড় চাচার মেয়েগুলো বড়চাচা কিংবা বড় চাচির মতো খারাপ হয় নি। চেহারা ভালো না, কিন্তু মেয়েগুলো ভালো। বিশেষ করে তিথি। এর গলায় সে কোনোদিন একটা উঁচু স্বর শোনে নি। তিথির সঙ্গে সোমার কোথায় যেন মিল আছে।

সাইফুদ্দিন সাহেব আজ সকাল সকাল বাড়ি ফিরবেন ভেবেছিলেন। শরীরটা ভালো লাগছে না। কাল রাতে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর-জ্বর লাগছে। যেদিন সকাল সকাল ফিরবেন ভাবেন সেদিনই ফেরা হয় না। ছ' সাত জন রুগী বসে আছে। তাঁর জন্যে এতগুলো রুগী অপেক্ষা করবে এটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার। শেষ বয়সে পসার বাড়তে শুরু করল কি-না কে জানে! খারাপ সময়টা বোধহয় কেটে যাচ্ছে। দিনের পর দিন গিয়েছে একটা রুগী পান নি। কম্পাউন্ডারের যে কাজ—ইনজেকশান দিয়ে দু'টাকা নেওয়া সেই কাজও করতে হয়েছে। জীবনের শেষে এসে সুদিনের মুখ দেখছেন। ডাক্তার হিসাবে আগে যা ছিলেন এখনো তাই আছেন, তা হলে রুগী আসছে কেন? বয়সের কারণে কি চেহারায় ডাক্তার ভাবটা বেশি এসেছে? হতে পারে। তাঁর মাথায় চুল লম্বা। সব চুল পেকে ধব ধব করছে বলে চেহারায় একটা ঋষি-ঋষি ভাব এসে গেছে।

তিনি পর্দা সরিয়ে ডাকলেন, 'এখন কে? আপনি? আসুন।'

ছেলে কোলে নিয়ে মধ্যবয়সী এক লোক ঢুকল। ছেলের বয়স চার-পাঁচ। রোগা লিক-লিক করছে। চেহারা দেখেই বোঝা যায় এর একমাত্র অসুখ অপুষ্টি।

'খোকার কি হয়েছে?'

'পেটে ব্যথা। কাল সারা রাত ঘুমাতে দেয় নাই। ছটফট করছে।'

'ব্যথা কি এখনো আছে?'

'কিছু বলছে না।'

'কি খোকা, ব্যথা আছে?'

ছেলে না সূচক মাথা নাড়ল। সাইফুদ্দিন সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'ব্যথা থাকলেও অনেক সময় ছেলেরা ডাক্তারের ভয়ে বলে, না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঠিক বলেছেন ডাক্তার সাহেব।'

'দেখি খোকাকে এখানে শুইয়ে দিন তো। কি খোকা, আমাকে ভয় লাগে?'

খোকা হেসে ফেলল। দীর্ঘ সময় নিয়ে সাইফুদ্দিন সাহেব রুগীকে দেখলেন। তাঁর পসার বাড়ছে। তাঁকে আরো সাবধান হতে হবে। পসারের সাথে সাথে দায়িত্ব চলে আসে।

রুগী দেখে শেষ পর্যন্ত বেরুতে বেরুতে ন'টা বেজে গেল। এখান থেকে বাড়ি প্রায় আধ মাইলের মতো। এইটুকু পথ হেঁটে হেঁটে যান। এতে শরীরটা ঠিক থাকে। রাতে সুনিদ্রা হয়।

রাস্তায় নামতেই দেখলেন বিজু দাঁড়িয়ে আছে। তিনি হাসিমুখে বললেন, 'কি রে বিজু তুই!'

'তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। মেলা রুগী আসছে দেখি তোমার কাছে।'

তিনি তৃপ্তির হাসি হাসলেন। বিজু বলল, 'রিকশা নেবে না হাঁটবে?'

'চল হাঁটি। তুই কিছু বলবি?'

হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট থাকলে বিজুর কথা বলতে সুবিধা হয়। তবে বাবার সঙ্গে তো আর সিগারেট হাতে কথা বলা যায় না। বিজু সিগারেট ফেলে দিল। আস্ত সিগারেট ফেলে দিতে মায়া লাগল। সাইফুদ্দিন সাহেব বললেন, 'সোমার ব্যাপারে কিছু বলবি?'

'না। আচ্ছা বাবা, দাদার মৃত্যুর পর তোমাদের সম্পত্তির ভাগটাগগুলো কীভাবে হল।'

'সম্পত্তি আছেই বা কি আর ভাগই বা কি হবে।'

'তবু যা আছে সেটার কথাই বল।'

'কাগজপত্রে তো কিছু নাই, মুখে মুখে ভাগ।'

'বল কি?'

'কেন, কি হয়েছে?'

বিজু জবাব দিল না। এক দলা থুথু ফেলে মুখ বিকৃত করল। তার অনেক পরিকল্পনা মাথায়। এখন মনে হচ্ছে সব পরিকল্পনায় পানি লেগে গেছে। কোনো পরিকল্পনা কাজে লাগানো যাবে না। ঢাকা শহরের এমন সুন্দর একটা জায়গায় তাদের সাড়ে পাঁচ কাঠা জমি। পুরনো বাড়িটা ভেঙে ব্যাংক লোন নিয়ে ছ'তলা দালান তোলা যায়। নিচের তলায় হবে ডিপার্টমেন্ট স্টোর, উপরে ফ্ল্যাট। একেক ফ্লোরে দুটো করে ফ্ল্যাট, মোট দশটা ফ্ল্যাটে চার হাজার করে ভাড়া হিসাব করলেও হয় চল্লিশ হাজার। ডিপার্টমেন্ট স্টোর সে নিজে চালাবে। সব পাওয়া যাবে এখানে। একটা স্ন্যাকস কর্নার থাকবে। ভিডিও কর্নার থাকবে—আজকাল ভিডিও ব্যবসা জমজমাট। লোকজন বাজার করতে এসে পছন্দসই একটা ক্যাসেট নিয়ে চলে যাবে।

বিজু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

সাইফুদ্দিন সাহেব বললেন, 'কি হয়েছে রে বিজু?'

বিজু এক দলা থুথু ফেলল, জবাব দিল না। তার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। বড্ড গরম লাগছে। আজ আবার গরম পড়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২

প্যাকেট করা নতুন ক্যাসেট ডেক জোগাড় করতে কামালের বেশ ঝামেলা হয়েছে। তিন ঘন্টার জন্যে নিয়ে যাবে, প্যাকেট খোলা যাবে না—এই কথার পরও কোনো দোকানদার রাজি হয় না। এই তিন ঘন্টার জন্যে পাঁচ শ' টাকা দিতে সে রাজি, তাতেও কাজ হয় না। শেষ পর্যন্ত সাত শ' টাকায় রফা হল। ঠিক হল দোকানের এক জন কর্মচারীও সাথে যাবে। তাতেই সই। এত যন্ত্রণা করে শেষ পর্যন্ত একটা পয়সা না পাওয়া গেলে মাথায় বাড়ি।

দোকানের কর্মচারী যাবার পথে বলল, 'তিন ঘন্টার জন্যে জিনিসটা নিচ্ছেন কেন?'

কামাল বিরক্ত হয়ে বলল, 'এত কথার আপনার দরকার কি? এই নেন পঞ্চাশটা টাকা—রাখেন। চা-পানি খাবেন। আর দয়া করে মুখটা বন্ধ রাখবেন।'

'ব্যাপরটা কি?'

'ব্যাপারটা কি না জিজ্ঞেস করার জন্যেই তো পঞ্চাশ টাকা। আবার বলেন ব্যাপারটা কি? বাড়ি কোথায় ভাই আপনার?'

কর্মচারী চুপ করে গেল।

ক্যাসেট ডেক ভদ্রলোকের পছন্দ হল। মুখে সে কিছু বলল না তবে পছন্দ যে হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে। চোখ চক চক করছে। চোখের পাতা ঘন ঘন কাঁপছে। কামাল মনে মনে বলল, 'হারামজাদা লোভী।'

ভদ্রলোক বললেন, 'কত চান আপনি?'

কামাল বলল, 'এর আসল দাম আপনি জানেন?'

'আপনি কত হলে দিতে পারেন শুনি।'

'পনের হাজার।'

'আপনি পাগল না-কি, ব্ল্যাক মার্কেটের জিনিস চাচ্ছেন পনের হাজার।'

'ব্ল্যাক মার্কেটের বলেই পনের চাচ্ছি—আসল দাম চল্লিশ।'

'আমি ছয় হাজার দিতে রাজি।'

'কত বললেন?'

'ছয়।'

রাগে কামালের ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। হারামজাদা বলে কি?

'রাজি থাকলে বলেন আমি এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি ক্যাশ।'

'এই দামাদামি কার কাছে শিখছেন ভাইসাব?'

'কি বললেন?'

'না বলব আবার কি?'

'ব্ল্যাক মার্কেট করছেন এইটাই তো অপরাধ—তার ওপর আবার প্রফিট করার চেষ্টা।'

'তা তো ঠিকই।'

'আপনাকে তো পুলিশেও ধরিয়ে দিতে পারি। পারি না?'

'জ্বি পারেন। কেন পারবেন না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সাড়ে ছয় পাবেন।'

কামাল মধুর ভঙ্গিতে হাসল। ভদ্রলোক বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে যান, সাত হাজার। ক্যাশ দিয়ে দিচ্ছি। রাজি থাকলে বলেন হ্যাঁ।'

'রাজি আছি। বিকালে আসব টাকা জোগাড় রাখবেন।'

'বিকালে আসতে হবে না এখনই দিয়ে দিচ্ছি। আপনার লোককে বলুন ফিট করে দিক।'

'এটা তো দেওয়া যাবে না। আরেক জনকে দেখাতে নিয়ে যাব। আমার তিনটা সেট আছে তিনটাই বেচতে হবে।'

'একই জিনিস?'

'জ্বি একই জিনিস। একই কোম্পানি। একই মাল।'

'ওদের কাছে কততে বেচবেন।'

'যত পাওয়া যায়। তবে সাত পর্যন্ত আসলে ছেড়ে দেব। বেশি লোভ করতে নাই।'

'আপনি নিজে কত দিয়ে কিনেছেন?'

কামাল মধুর ভঙ্গিতে হাসল। ভদ্রলোক বললেন, 'এইটাই রেখে যান। অন্য সেট কাস্টমারদের দেখান।'

'অন্য দুই সেট আছে টঙ্গিতে। আবার টঙ্গি যাব? বিকেলে আমি নিয়ে আসব। জিনিস দেখে ফিট করে তারপর টাকা দিবেন। আমি ভাই এক কথার মানুষ।'

কামাল সন্ধ্যার পর ঐ বাড়িতে উপস্থিত হল। ভদ্রলোক চিন্তিত হয়ে অপেক্ষা করছেন। এটাই স্বাভাবিক। কামালকে দেখেই উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'জিনিস কোথায় সেটা শুনি।'

'আপনার এখান থেকে গেলাম না? ভদ্রলোক জিনিস দেখে মুগ্ধ। এক কথায় বার হাজার দিতে রাজি। আমি তিনটাই খালাস করে দিলাম পঁয়ত্রিশ হাজারে।'

'সে কি?'

'তিনটাই কিনে নিলেন?'

'জ্বি। আমি ভাবলাম খবরটা আপনাকে দিয়ে যাই। বলে গিয়েছিলাম, অপেক্ষা করে আছেন।'

'এই খবরে আমার লাভটা কি? বার হাজার তো আমিও দিতে পারতাম।'

'আপনি তো ভাই দিতে চান নাই। আপনি বলেছেন সাত।'

ভদ্রলোক মুখ কালো করে বসে রইলেন। কামাল বলল, 'ভাইসাব মন খারাপ করবেন না, এই রকম চালান যদি আরো আসে আপনাকে খবর দিব। আমি আপনাকে কথা দিলাম যে দাম আপনার সাথে ঠিক হয়েছে ঐ দামেই দিব। সাত হাজার। আমি এক কথার মানুষ।

'কবে আসবে এ-রকম চালান?'

'তার কি ভাই কোনো ঠিক আছে? কালও আসতে পারে, আবার ধরেন দুই মাসও লাগতে পারে। তবে আপনাকে কথা দিচ্ছি আসামাত্র আপনাকে টেলিফোন করব। আমি এক কথার মানুষ।'

ভদ্রলোক মন খারাপ করে বসে রইলেন। কামাল হৃষ্টচিত্তে বেরিয়ে এল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারামজাদা টোপ গিলেছে। এখন টেলিফোন করলেই পকেটে টাকা নিয়ে ছুটে আসবে। টঙ্গি আসতে বললে টঙ্গি আসবে। জয়দেবপুর যেতে বললে যাবে জয়দেবপুর। তবে টেলিফোন করতে হবে মাস খানেক পরে। দু' এক দিনের মধ্যে করলে সন্দেহ করতে পারে। লোভ, লোভ। শালা লোভের জন্যে মারা পড়ছিস। লোভটা একটু কমা। একটু না–কমালে ধনে প্রাণে যাবি।

১৩

বিজু মুরাদকে ধরে এনেছে।

কলেজে যাওয়ার পথে সে মুরাদকে প্রথম এক ঝলক দেখতে পায়। সে আমজাদের চায়ের দোকানে বসেছিল। বিজুকে দেখেই চট করে সরে পড়ল। বেশি দূর যেতে পারল না। বিজু ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল, পর মুহূর্তেই প্রচণ্ড এক চড় বসাল। এমন প্রচণ্ড চড় যে, মুরাদ উল্টে পড়ে মাথায় চোট খেল। এক ভদ্রলোক আঁতকে উঠে বললেন, 'করেন কি?'

বিজু বলল, 'কি করছি দেখতে পাচ্ছেন না, মার দিচ্ছি। আপনার বাসা থেকে টাকা নিয়ে পালালে আপনি কি করতেন? কোলে নিয়ে চুমু খেতেন? কি চুমু খেতেন কোলে নিয়ে?'

ভদ্রলোক কথা বললেন না। বিজু মুরাদের চুল ধরে টানতে টানতে বাসায় নিয়ে এল। তার মূর্তি ভয়ঙ্কর। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। মাঝে–মাঝে হিংস্র গলায় বলছে, 'তোর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব। এত বড় সাহস। বাজারের টাকা নিয়ে উধাও। মামদোবাজি?'

সোমা ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত। এক জন মানুষ অন্য এক জনকে এমনভাবে মারতে পারে? সোমা বলল, 'এই সব কী হচ্ছে?'

বিজু বলল, 'আদর হচ্ছে। হারামজাদাকে আদর করছি।'

সোমা কড়া গলায় বলল, 'ছাড়—ওর চুল ছাড়।'

'তুমি এখান থেকে যাও তো আপা।'

'তুই ওর চুল ছাড়।'

'বললাম তো—তুমি এখান থেকে যাও।'

'ওকে ছেড়ে দে বিজু।'

'তুমি বড্ড যন্ত্রণা করছ আপা।'

'তুই ওকে না ছাড়লে আমি এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।'

বিজু চুল ছেড়ে দিল। সোমা বলল, 'তুই এসব কী শুরু করেছিস?'

'চোরকে ধরে কয়েকটা চড় দিয়েছি, এর বেশি কী করলাম?'

'বড় চাচাকে তুই কী বলেছিস?'

'বড় চাচার কথা এখানে আসছে কেন?'

'তুই কী বলেছিস বড় চাচাকে?'

'কী বলব, কিছুই বলি নি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিছুই বলিস নি তা হলে উনি এ-রকম করছেন কেন?'

'কী-রকম করছেন?'

'তাও জানিস না?'

'তুমি বড় চেঁচামেচি করছ আপা। এত চেঁচামেচি করার তো কিছু হয় নি, তুমি অনেক কিছু করছ যা আমার পছন্দ না। কিন্তু কই আমি তো চেঁচামেচি করছি না। আমি তো চুপ করে আছি।'

সোমা চাপা স্বরে বলল, 'আমি কী করেছি?'

'ঐ হারামজাদা প্রফেসরের বাসায় তুমি যাও নি? এত কিছুর পরও তো গিয়েছ। হেসে হেসে গল্পগুজব করেছ। কর নি?'

জাহানারা বের হয়ে এলেন। কঠিন স্বরে বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে। বিজু ঘরে যা।'

বিজু ঘরে ঢুকে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে সহজ-স্বাভাবিক গলায় বলল, 'চা দে তো ঊর্মি। আজ ক্লাসটা মিস হয়ে গেল। ইম্পর্টেন্ট ক্লাস ছিল। তুই কলেজে যাস নি কেন রে?'

'কলেজ বন্ধ।'

'আজ আবার কীসের বন্ধ? যন্ত্রণা হল দেখি। দু' দিন পর পর বন্ধ? তোদের কলেজের অবস্থা তো দেখি আমাদেরটার চেয়েও খারাপ।'

বিজু সহজ ভঙ্গিতে কথা বলছে। একটু আগের ঘটনার কোনো ছাপ তার মধ্যে নেই। আবার কলেজের দিকে রওনা হবার আগে সে সোমাকে বলল, 'আপা, তোমার টবের এই গাছ দু'টা চমৎকার। বগনভিলিয়ার এত সুন্দর কালার হয় জানাই ছিল না। একসেলেন্ট!'

সোমা জবাব দিল না।

বিজু নিচু গলায় বলল, 'মাঝে-মাঝে হট ব্রেইনে কি বলে ফেলি কিছু মনে রেখ না আপা। আর ঐ পিচ্চিকে পাঁচটা টাকা দিয়ে দিয়েছি। দেখ গিয়ে ও দাঁত বের করে হাসছে। মারধরে ওদের কিছু হয় না। মারধর ওদের ডাল ভাত।'

দুপুরে সোমা বড় চাচাকে দেখতে গেল। তিথি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'বাবার বোধহয় মাথাই খারাপ হয়ে গেছে আপা। ঐদিন বিজু ভাই কি-সব বলে গেছেন। তারপর থেকে......'

সোমা বলল, 'চাচি নেই?'

'মা সাত দিন আগে রাগারাগি করে ঐ যে বড় মামার বাসায় গেছেন আর আসছেন না। কী করি বল তো আপা?'

'বড় চাচার অবস্থার কথা চাচি জানেন?'

'জানেন। আমি নিজে গিয়ে বলেছি।'

'চাচি কী বললেন?'

'কিছুই বলেন না।'

'সোমা বড় চাচার ঘরে ঢুকল। তিনি একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কে, সোমা না?'

'জ্বি।'

'ভালো আছিস মা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জ্বি ভালোই তো?'

'শরীরটা ভালো তো?'

'জ্বি ভালো।'

'শরীরটা ঠিক রাখবি। শরীর ঠিক রাখাটা খুবই দরকার। শরীরটা নষ্ট হয়ে গেছে—তাই আমার এই অবস্থা। শরীর ঠিক থাকলে তিথির তিন মামাকে কি করতাম দেখতে পেতিস। ধরে ধরে আছাড় দিতাম। তিনটাই বদ। মহা বদ। দুটো কাঁচাপয়সার মুখ দেখে মনে করছে দুনিয়া কিনে ফেলেছে। দুনিয়া কেনা এত সস্তা না। ফেরাউন বাদশা কিনতে পারে নি। তার তো টাকার অভাব ছিল না। ব্যাটা তোদের ক'টা টাকা হয়েছে বল দেখি? দুটো ব্যাঙের আধুলি পেয়ে মনে করেছিস কি? তোদের মুখে আমি পেচ্ছাব করে দিই—ইয়েস পেচ্ছাব। স্ট্রেট পেচ্ছাব করে দেব। তখন বুঝবি কত ধানে কত চাল? তোরা ভেবেছিস কী? দুই মণ ধানে দুই মণ চাল? উঁহু, এত সহজ না। দুই মণ ধানে এক মণ চাল—খুব বেশি হলে দেড় মণ......'

বড় চাচা অনবরত কথা বলে যাচ্ছেন। এক মুহূর্তের জন্যেও থামছেন না। তিথি ও মিথি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে তাদের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। মিথি হাত ইশারা করে সোমাকে ডাকছে।

সোমা উঠে গেল বড় চাচার কথা বলা বন্ধ হল না। তিনি কথা বলেই যাচ্ছেন। মিথি বলল, 'কি করব আপা?'

'বড় চাচিকে নিয়ে আয়। কিংবা তোর কোনো মামাকে আন। ভয় নেই আমি এখানে আছি।'

'বাবা কি পাগল হয়ে গেছেন?'

'আরে না, মানুষ এত সহজে পাগল হয় না। মাথাটা গরম হয়েছে। ওষুধপত্র খেলে ঠিক হয়ে যাবে। যা তোরা দু' জনে মিলে চলে যা।'

মিথিরা চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই বড় চাচা বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। বেশ আরামের ঘুম। তাঁর নাক ডাকতে লাগল।

সোমা পাশেই বসে রইল। তার কিছুই করার নেই। একটা বই হাতের কাছে থাকলে বসে বসে পড়া যেত। অনেক দিন বই পড়া হয় না। বই পড়তে কেমন লাগবে এখন কে জানে! বিকেলের দিকে একবার কি যাবে বই আনতে? না থাক। যন্ত্রণা বাড়িয়ে লাভ নেই। এমনিতেই অনেক যন্ত্রণা।

সোমার বড় চাচি তাঁর ছোট ভাইকে নিয়ে সন্ধ্যার আগে আগে ফিরলেন। বড় চাচা তখনো ঘুমে। সোমা নিজের ঘরে চলে এল। ঘুমন্ত মানুষের পাশে থেকে থেকে তারও ঘুম পাচ্ছে। সারা দিন সে কিছুই করে নি। তবু খুব ক্লান্ত লাগছে। সে খানিকক্ষণ ঘুমুবে। ঊর্মিকে বলে দেবে তাকে যেন ডাকা না হয়। রাতের খাবার সময়ও যদি দেখা যায় তার ঘুম ভাঙে নি তবু যেন ডাকা না হয়। এক রাত না খেলে কিছু হয় না।

সোমা কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল সে বলতে পারবে না, তার কাছে মনে হল শুধু তার চোখ একটু লেগেছে ওমনি যেন ঊর্মি এসে তার গা ঝাঁকাচ্ছে, 'আপা ওঠ তো। প্লিজ ওঠ।'

সোমা বিরক্ত গলায় বলল, 'তোকে কী বলেছিলাম?"

'আপা ওঠ, দরকার আছে। প্লিজ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমা উঠে বসল। ঘর অন্ধকার। বারান্দায় বাতিও জ্বালানো হয় নি। দরজা–জানালা লাগানো।

'তুমি অনেকক্ষণ ধরে ঘুমাচ্ছ আপা। এখন সাড়ে ন'টা বাজে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি। তবে তোমাকে ঘুম থেকে তুলেছি অন্য কারণে। প্রফেসর সাহেব এসেছেন।'

'কে এসেছেন?'

'প্রফেসর সাহেব। ঐ যে দোতলা বাড়ির। সন্ধ্যার পর পর এসেছেন। আর যেতে চাচ্ছেন না। আমি এতক্ষণ গল্প করলাম। গল্প আমার পেটে যা ছিল সব শেষ। তিনিও চুপচাপ বসে। আমিও চুপচাপ। আপা হাত মুখে একটু পানি দিয়ে চলে এস।'

সোমা কখনো ভাবে নি যে, সে বসার ঘরে ঢুকতেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবেন। যেন সোমা এক জন খুব সম্মানিত মহিলা। সোমার ভীষণ লজ্জা লাগল।

সে নিচু গলায় বলল, 'আপনি বসুন।'

'উর্মি বলছিল, তোমার শরীর ভালো না। সন্ধ্যা থেকে ঘুমুবার সময় বলে গেছ—তোমাকে যেন ডাকা না হয়। আমি তাই অপেক্ষা করছিলাম।'

সোমা কি বলবে ভেবে পেল না। বসার ঘরের অবস্থা কি হয়ে আছে। উনি আসবেন জানলে সে ঘর গুছিয়ে রাখত।

প্রফেসর সাহেব নরম গলায় বললেন, 'তোমার ছোটবোনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে খুব হাসছিলাম। ও যে এত মজার মজার গল্প জানে—আশ্চর্য। মেয়েরা সাধারণত রসিকতা করতে পারে না। কিন্তু ও দেখলাম সুন্দর রসিকতা করে।'

'আপনাকে কি ও চা দিয়েছে?'

'হ্যাঁ তিন বার দিয়েছে। আর চা খাব না, তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে চলে যাব।'

'বলুন।'

'তুমি এত দূরে বসেছ—কথা বলতে হলে তো চেঁচিয়ে বলতে হবে। কাছে এস।'

'সোমা এগিয়ে এল।'

'নিজেদের বাড়িতে তুমি এত লজ্জা পাচ্ছ কেন বল তো?'

'লজ্জা পাচ্ছি না।'

'আমি যে জন্যে এসেছি সেটা বলে চলে যাই। তুমি খুবই অস্বস্তি বোধ করছ। তোমাকে অস্বস্তিতে ফেলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আচ্ছা শোন, ঐ দিন যে তুমি আমার বাসায় গিয়েছিলে তা নিয়ে কি কোনো সমস্যা হয়েছে?'

'না। সমস্যা হবে কেন?'

'গত কাল সন্ধ্যায় তোমার বাবা আমার বাসায় এসেছিলেন। কাজেই মনে হল হয়তো কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনটা খুব খারাপ হয়েছে। তোমার বাবাকে সেটা বুঝিয়ে বললাম।'

'বাবা আপনার কাছে গিয়েছিলেন?'

'তুমি জান না?'

'না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ গিয়েছিলেন। তিনি তোমাকে নিয়ে খুবই চিন্তিত। তোমার আগের হাজব্যান্ড না-কি খুব বিরক্ত করছে তোমাকে?'

'না তো।'

'তোমার বাবা তো তাই বললেন। রাত দশটা–এগারটার দিকে বাসার সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করে। ক্রিমিন্যাল নেচারের মানুষ, তাই তোমার বাবা ভয় পাচ্ছেন। যদি কোনো ক্ষতিটতি করার চেষ্টা করে।'

'ও কোনো ক্ষতিটতি করার চেষ্টা করবে না।'

'না করলে তো ভালোই। তোমার বাবাকে সেই কথা বললাম। এবং আরো একটা কথা বললাম; সেই কথাটা তোমাকেও বলা দরকার। কথা ঠিক না, এক ধরনের আবেদন বলতে পার। আমি তোমার বাবাকে বলেছি যে, আপনার বড় কন্যাকে আমি খুবই পছন্দ করি। তার জীবনের ভয়াবহ দুর্যোগের জন্যে আমি পরোক্ষভাবে হলেও দায়ী, কাজেই.......'

সোমা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ভদ্রলোক চোখ থেকে চশমা খুলে কাচ মুছতে মুছতে বললেন, 'আমার মনে হল তোমার বাবা আমার কথা শুনে খুশিই হয়েছেন। ওঁর খুশি হওয়াটা তেমন জরুরি নয়, তুমি খুশি কি না বা তুমি কী ভাবছ সেটা হচ্ছে জরুরি। জীবন নতুন করে শুরু করা অন্যায় কিছু না। পিছন দিকে তাকিয়ে বড় বড় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলার কোনো মানে হয় না। আজ উঠি। ভালো কথা, তোমার জন্যে দুটো বই এনেছি।'

সোমা তাঁকে বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল। ভদ্রলোক চলে যাবার পরও সে অনেকক্ষণ গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। বড় চাচার কথা শোনা যাচ্ছে—এক নাগাড়ে তিনি কথা বলে যাচ্ছেন। এখন কথা বলছেন আগের চেয়েও অনেক উঁচু গলায়।

'সমস্যা আবার কী? কীসের সমস্যা? কার বাপের সমস্যা? কাকে আমি ডরাই? কোন ব্যাটাকে ডরাই? তারা আমাকে কী ভাবে? এখনো হাতে এমন জোর আছে যে, একটা চড় দিলে দ্বিতীয় চড় দেওয়া যাবে না। এক চড়েই পাউরুটি বিস্কুট হয়ে যাবে.........।'

বড় চাচা কথা বলছেন। আরেক জন কে যেন কাঁদছে। কে কাঁদছে বোঝা যাচ্ছে না—মিথি, তিথি না বড় চাচি? সব পুরুষের কান্নার শব্দ যেমন এক রকম, সব মেয়েদের কান্নার শব্দও এক। কে জানে যখন মানুষ কাঁদে তখন বোধহয় সবাই সমান হয়ে যায়।

সোমা দেখল বাবা আসছেন। হেঁটে হেঁটে আসছেন। আজকাল প্রায় রাতেই উনি দেরি করে ফিরছেন। পসার বোধহয় বাড়ছে। আগের বিমর্ষ ভাব এখন আর তাঁর মধ্যে নেই।

'কে, সোমা?'

'জ্বি বাবা।'

'অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছিস কেন রে মা?'

'তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। এত দেরি কেন?'

'একটা কলে গিয়েছিলাম। ওরা আবার চা–টা খাইয়ে দিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নামি ডাক্তার হয়ে যাচ্ছ মনে হয় বাবা।'

বাবা হাসলেন। সোমা অবাক হয়ে লক্ষ করল—এই যে বড় চাচা চেঁচামেচি করছেন বাবার কানে তা যাচ্ছে না। তিনি হাসতে হাসতে কথা বলছেন।

'এখানে তো বেশ বাতাস সোমা।'

'জ্বি।'

'দাঁড়াই খানিকটা গায়ের ঘাম মরুক, কী বলিস?'

'দাঁড়াও।'

তিনি ইতস্তত করে বললেন, 'তোকে একটা কথা বলা হয় নি। প্রফেসর সাহেবের বাসায় গিয়েছিলাম। মানে এমনি হঠাৎ ভাবলাম....হাজার হলেও প্রতিবেশী। তাই না?'

'তা তো ঠিকই।'

'ভদ্রলোককে যেরকম ভেবেছিলাম সে-রকম না। খুবই ভদ্রলোক। ধরতে গেলে আমি তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ। তোর মাকে বলেছি সেকথা। খুবই ভালো মানুষ। পাড়াতেও খুবই সুনাম।'

'ভালো মানুষ, সুনাম কেন হবে না বল?'

'নিরহঙ্কারী লোক। এক দিন পানি ছিল না, উনি নিজেই রাস্তার মিউনিসিপ্যালিটির কল থেকে বালতি করে পানি নিয়ে গেলেন। সবাই পারে না। সঙ্কোচ বোধ করে। তাই না?'

'তা ঠিক।'

'সম্মান যার আছে সে সম্মান যাওয়ার ভয় করে না। যার সম্মান নেই তার যত ভয়।'

'তোমার গায়ের ঘাম বোধহয় মরেছে, চল ভেতরে যাই।'

'দাঁড়া আরেকটু। বাতাসটা ভালোই লাগছে। সোমা, প্রফেসর সাহেব একটা প্রস্তাব দিয়েছেন, মানে—ইয়ে—তোর মা কি কিছু বলেছে তোকে?'

'না।'

'আচ্ছা তোর মার কাছ থেকে শুনিস। প্রস্তাবটা আমার পছন্দ হয়েছে। একটা ফ্রেশ স্টার্ট হলে ভালো হয়। বেশ ভালো হয়। চেঁচামেচি কে করছে রে?'

'বড় চাচা।

'যন্ত্রণা হল দেখি।'

সাইফুদ্দিন সাহেব বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে ফেললেন।

রাত বারটা দশ। বিজু এখনো ফেরে নি। মাঝে-মাঝে সে খুব রাত করে। তার না কি পার্টি মিটিং থাকে। আজও বোধহয় পার্টি মিটিং ছিল। জাহানারা ভাত বেড়ে ক্লান্ত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

সোমা বলল, 'তুমি ঘুমিয়ে পড় মা। আমি জেগে আছি। আমি সন্ধ্যাবেলায় ঘুমিয়েছি। এখন আর ঘুম আসছে না।'

জাহানারা সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমুতে গেলেন। বাড়ি নিঝুম হয়ে গেল। বড় চাচার কথাও শোনা যাচ্ছে না। সম্ভবত তিনিও ঘুমুচ্ছেন। মাঝে-মাঝে একটা ঘুমন্ত বাড়িতে একা একা জেগে থাকতে ভালো লাগে। অদ্ভুত-অদ্ভুত সব চিন্তা আসে। আজ অবশ্যি তেমন কোনো অদ্ভুত চিন্তা সোমার মাথায় আসছে না। সে প্রফেসর সাহেবের রেখে যাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইটি কোলে নিয়ে বসে আছে।

এই ভদ্রলোককে সে কখনো কোনো নামে ডাকে নি। প্রথম পরিচয়ের দিন এক বার শুধু স্যার বলেছিল। উনি বলেছিলেন, 'সবার মুখে দিনরাত স্যার–স্যার শুনি। তুমি স্যার না বললে কেমন হয়?'

সোমা বলেছিল, 'কী ডাকব?'

'তোমার যা ইচ্ছা তাই ডাকতে পার।'

সোমা কিছু ডাকে নি।

দরজার কড়া নড়ছে। সোমা খুলে দিল। লজ্জিত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল বিজু।

'দেরি করলাম আপা। সরি। পার্টি মিটিং ছিল।'

'তরকারি গরম করব, না যেমন আছে তেমনি খাবি?'

'কিছু খাব না আপা। বিরিয়ানি খেয়ে এসেছি।'

'চা খাবি? চা করে দেব?'

'দাও। বেশি করে বানিও। ফ্লাস্কে ভরে রাখব।'

সোমা রান্নাঘরে চা বানাচ্ছে। বিজু কাপড় ছেড়ে সিগারেট হাতে এসে বসল বোনের পাশে।

সোমা চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে বলল, 'বিজু, ও নাকি রাতের বেলা বাসার সামনে দিয়ে হাঁটা হাঁটি করে?'

'কে বলেছে তোমাকে?'

'করে কি না বল।'

'আর করবে না। হেভি ধাঁতানি দিয়ে দিয়েছি।'

'মারধর করেছিস?'

'আরে না। তুমি কি ভাবো আমি রাতদিন মারামারি করে বেড়াই? আমি লোকটাকে কঠিন করে বলে দিয়েছি—আপনাকে তিন রাত এখানে হাঁটাহাঁটি করতে দেখেছি। আর যেন না দেখি। মামদোবাজি আমি সহ্য করব না।'

সোমা শীতল গলায় বলল, 'এক জন লোক যদি বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, তা হলে তোর অসুবিধা কী?'

বিজু খুব অবাক হল।

সোমা বলল, 'এমন তো না যে সে কারোর কোনো ক্ষতি করছে।'

'ও একটা ক্রিমিন্যাল লোক আপা। বল, ক্রিমন্যাল না?'

সোমা চুপ করে রইল।

বিজু বলল, 'একটা কথা সত্যি করে বল তো আপা, তুমি ওর কাছে ফিরে যেতে চাও?'

'না।'

'কখনো কি তোমার মনে হয়েছে যে, চলে এসে তুমি ভুল করেছ?'

'না।'

'শুনে ভালো লাগল আপা। তোমার কাণ্ডকারখানায় মাঝে–মাঝে কনফিউজড হয়ে যাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমা বলল, 'তুই যখন ঐ সব কথা ওকে বললি, তখনও ও কী বলল?'

'তুমি এখনো ও সব নিয়ে ভাবছ?'

'কী বলল ও?'

'কিছুই বলে নি।'

'এখানে আসত কেন, জিজ্ঞেস করেছিলি?'

'না। কথা বলার অবস্থা ছিল না।'

'কেন?'

'মাথায় ব্যান্ডেজফ্যান্ডেজ দেখলাম। কেউ বোধহয় হেভি পিটন দিয়েছে।'

সোমার হাত থেকে চা ছলকে পড়ল।

বিজু বলল, 'ঠাট্টা করছিলাম আপা। তোমার রিঅ্যাকশন দেখছিলাম। লোকটা বহাল তবিয়েতেই আছে। তবে মার একদিন সে খাবে। পাবলিক তাকে পিটিয়ে লম্বা বানাবে। তোমার শুনতে খারাপ লাগলেও কথাটা সত্যি।'

সোমা উঠে দাঁড়াল।

বিজুও উঠল। সোমার পিছনে পিছন আসতে আসতে বলল, 'তুমি খুব শক্ত মেয়ে, তবে তোমার আরো শক্ত হওয়া দরকার।'

'তোকে উপদেশ দিতে হবে না।'

'উপদেশ দিচ্ছি না আপা; আর শুধু একটা কথা বলব। তোমার ঐ প্রফেসর ভদ্রলোক—খারাপ না। ভালো। তুমি যদি ওঁর বাসায় যাও, আমি রাগ করব না। বরং খুশিই হব। শুধু আমি একা না, এ-বাড়ির সবাই খুশি হবে।'

AMARBOI.COM

১৪

বড় চাচাকে নিয়ে যেতে মিথির দুই মামা এসেছেন।

বাড়ির সামনে একটা পিকআপ এবং একটা ডাইহাটসু গাড়ি দাঁড়িয়ে। পিকআপে জিনিসপত্র তোলা হচ্ছে। ব্যাপারটা উর্মি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল। তার খুব খারাপ লাগল। সে ভেতরে এসে বিজুকে বলল, 'ওরা সবকিছু নিয়ে চলে যাচ্ছে।'

বিজু বলল, 'যাক না। তোর এত মাথাব্যথা কীসের?'

'মিথি-তিথিরা খুব কান্নাকাটি করছে।'

'বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখার কোনো দরকার নেই। বড় আপা কোথায়?'

'ঐ বাড়িতে।'

'যা, আপাকে ডেকে নিয়ে আয়।'

উর্মি বলল, 'আমি পারব না। এইরকম কান্নাকাটির মধ্যে আমি যাব নাকি?'

বড় চাচা ভীষণ হৈ চৈ করছেন। তিনি কিছুতেই যাবেন না। ক্রমাগত বলছেন—ওরা আমাকে নিয়ে মেরে ফেলবে। খুনীর দল আমাকে নিয়ে মেরে ফেলবে। আমাকে নিয়ে খুন করবে। খুন করতে নিয়ে যাচ্ছে।'

মিথির দুই মামা খুবই বিরক্ত হচ্ছেন। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন। গাড়ির দুই ড্রাইভার তাঁর হাত ধরে তাঁকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তিনি গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁকে ঘর থেকে বের করতে ড্রাইভার দু' জনকে খুব বেগ পেতে হল।

মিথির বড় মামা বিরক্ত গলায় বললেন, 'এই সামান্য কাজে তোমরা সারা দিন লাগিয়ে দিচ্ছ। হাত দু'টা শক্ত করে ধর না কেন?'

বাড়ি থেকে বের করে আনার পর বড় চাচা কিছুক্ষণের জন্যে চিৎকার করলেন। তারপর শিশুদের মতো শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। বিজুকে ডাকতে শুরু করলেন, 'ও বিজু, বিজু—ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ও বিজু,—বিজু.....। আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বিজু.......ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।'

মিথির ছোট মামা বললেন, 'এক জন কেউ মুখটা চেপে ধর। চিৎকার সহ্য করা যাচ্ছে না। আহ্, কি—যে যন্ত্রণা।'

বড় চাচাকে পিকআপে ওঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ড্রাইভার দু' জন পেরে উঠছে না। সাহায্যের জন্যে মিথির বড় মামা এগিয়ে গেলেন। বড় চাচা ফুঁপিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'ও বিজু, বিজু.......।'

বিজু বেরিয়ে এল। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল বড় চাচার দিকে। তারপর গর্জন করে উঠল, 'একটা মানুষ যেতে চাচ্ছে না, তারপরও আপনারা তাঁকে জোর করে নিয়ে যাবেন? পেয়েছেন কী আপনারা? মগের মুল্লুক নাকি?'

বড় চাচা কান্না থামিয়ে উঁচু গলায় বললেন, 'ঘুষি মেরে ওদের নাক ফাঁটিয়ে দে বিজু। কথায় কাজ হবে না। কথার মানুষ এরা না।'

বিজু বলল, 'যান, রেখে আসুন।'

মিথির বড় মামা বললেন, 'কি বলছ তুমি? চিকিৎসা করাতে হবে না? এখানে চিকিৎসাটা কে করাবে?'

'আমরা করাব। আমরা কি পানিতে ভেসে গেছি নাকি? একটা লোক ভয় পাচ্ছে, যেতে চাচ্ছে না, তবু তাকে নিয়ে যাবেন। পেয়েছেনটা কী?'

বড় চাচা বললেন, 'খামাখা কথা বলে সময় নষ্ট করছিস বিজু। ঘুষি দিয়ে নাক ফাটিয়ে দে। এরা কথার মানুষ না।'

বিজু বলল, 'যান রেখে আসুন। নইলে অসুবিধা হবে। পাড়ার লোক ডেকে ধোলাই দিয়ে দেব।'

বড় চাচা আনন্দে হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'দেরি করিস না, ধোলাই দিয়ে দে। রাম ধোলাই দিয়ে দে।'

বড় চাচাকে আবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিথি মিথিরা গাড়িতে উঠে বসেছিল, তারা নেমে আসছে। মালপত্র নামানো হচ্ছে। উর্মি বারান্দায় আছে।

বিজু একদিন ইলেকট্রিশিয়ানের সামনে তার গালে চড় মেরেছিল—এই অপরাধের জন্যে কোনোদিন সে বিজুকে ক্ষমা করবে না বলে ভেবে রেখেছিল। আজ ক্ষমা করল। সে এগিয়ে গেল জিনিসপত্র নামানোর কাজে বিজুকে সাহায্য করবার জন্যে। বড় চাচা এখন বেশ স্বাভাবিক। তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলছেন, 'কাচের জিনিস আছে। আস্তে নামা! এরা কোনো একটা কাজ যদি ঠিকমতো করতে পারে! বিজু উর্মিটাকে একটা ধমক দে তো—কি রকম টানাটানি করছে। ভাঙবে না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫

সোমা নতুন বই নিতে এসেছে। তিনি বই বেছে দিচ্ছেন। সোমা দেখল একটা কুচকুচে কালো বিড়াল তাঁর পায়ে গা ঘষছে।

সোমা বলল, 'এই বিড়ালটা কি আপনার?"

'না। বেড়াল আমার পছন্দের প্রাণী না। তবে আমার স্ত্রী পছন্দ করত। বেড়ালকে খেতেটেতে দিত। এই কালো বেড়ালটা হচ্ছে আমার স্ত্রীর পোষা বেড়ালগুলোর কোনো একটা বংশধর।'

'আপনি কি একে খেতেটেতে দেন?'

'হ্যাঁ দিই। আমার স্ত্রীর প্রতি মমতা থেকে দিই। এমনিতে কিন্তু কুকুর–বেড়াল কোনোটাই আমি পছন্দ করি না।'

'আমিও করি না।'

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'লোকে বলে যারা পাখি পছন্দ করে তারা পশু পছন্দ করে না। তুমি কি পাখি পছন্দ কর সোমা?'

'জানি না, করি বোধহয়।'

'আজ এই বইটা নিয়ে যাও, প্রথম এক শ' পাতা কষ্ট করে পড়তে হবে তারপর দেখবে—হাত থেকে বই নামাতে পারছ না।'

সোমা জবাব দিল না। সে কালো বিড়ালটার দিকে একদৃষ্টিতে কি যেন দেখছে। সোমা চাপা গলায় বলল, 'ও বিড়াল খুব পছন্দ করে।' বলেই সে অসম্ভব লজ্জা পেয়ে গেল।

তিনি অবাক হয়ে দৃশ্যটি দেখলেন। নরম স্বরে বললেন, 'উনি বেড়াল পছন্দ করতেন?'

'জ্বি। এক বার রাস্তা থেকে একটা বিড়াল ধরে নিয়ে এসেছিল। পিঠে ঘা হয়েছিল, তাই রোজ ডেটল দিয়ে ঘা ধুয়ে দিত। পুঁজ পরিষ্কার করত। আমার গা ঘিন ঘিন করত। ভাত খেতে পারতাম না। বিড়ালটা অবশ্যি বাঁচে নি। সাত দিনের দিন মরে গেল।'

'উনি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন মনে হয়।'

'হ্যাঁ, হাউমাউ করে কিছুক্ষণ কাঁদল। তার পরপরই অবশ্যি খুব স্বাভাবিক। ওর কষ্ট বেশিক্ষণ থাকে না।'

'সোমা?'

'জ্বি।'

'তুমি কিন্তু এখনো ঐ ভদ্রলোককে খুব পছন্দ কর।'

সোমা চুপ করে রইল।

তিনি নরম স্বরে বললেন, 'এস আমরা বাইরে খানিকক্ষণ বসি।'

তারা বারান্দায় এসে বসল। তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে সহজ গলায় বললেন, 'সোমা, আমার মনে হয় তোমার ঐ ভদ্রলোকের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। তাঁকে আরেকটা সুযোগ দেওয়া উচিত।'

'সে কেমন মানুষ আপনি কিছুই জানেন না বলে এটা বলতে পারলেন।'

'ধরে নিলাম খুবই খারাপ মানুষ। কিন্তু তুমি তাকে বদলাবার কোনো চেষ্টা কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছ? আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তুমি কর নি। করে দেখ না।'

সোমা তাকিয়ে আছে কোনো কথা বলছে না।

তিনি বললেন, 'চা খাবে?'

সোমা বলল, 'না।'

তিনি ভারি গলায় বললেন, 'তোমাকে ওঁর কাছে ফিরে যেতে বলছি কেন জান, ঐ মানুষটার জন্যে তোমার তীব্র ভালবাসা আছে, কিন্তু তুমি সেটা বুঝতে পারছ না।'

'আমি যা বুঝতে পারি নি—আপনি কী করে তা বুঝে ফেললেন?'

'বেড়াল তুমি পছন্দ কর না, কিন্তু গভীর মমতায় তুমি কালো বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে রইলে। কারণ, তোমার খুবই প্রিয় এক জন বেড়াল পছন্দ করে।'

সোমার চোখে পানি এসে গেল।

তিনি বললেন, 'বড্ড চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছে। তুমি কি আমাকে এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়াবে? রান্নাঘরে সবই হাতের কাছে আছে।'

সোমা চা বানানোর জন্যে উঠে দাঁড়াল।

১৬

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে।

কামাল এখনো বিছানায়। দুপুরে ঘুমিয়েছিল, বিকেলে ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। এই সময়টা তার খুব খারাপ যায়। গলা ফাটিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে। আজও কাঁদতে ইচ্ছা করছে।

বিড়ালের বাচ্চাগুলোর চোখ ফুটেছে। সব ক'টা এখন বিছানায়। বালিশ নিয়ে কামড়াকামড়ি করছে। কি সুন্দর দৃশ্য। কাউকে দেখাতে ইচ্ছা করে। দেখানোর কেউ নেই।

কামালের বুক হু-হু করে।

ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালতে ইচ্ছা করছে না। মাঝে-মাঝে কিছুই করতে মন চায় না।

আকাশ মেঘে মেঘে ঢাকা। গুড় গুড় শব্দ হচ্ছে। মনে হয় ঢালা বর্ষণ হবে। একটু-একটু বৃষ্টি বোধহয় হচ্ছেও। ঝির ঝির শব্দ কানে আসছে। একটা বিড়াল কামালের বুড়ো আঙুল কামড়াবার চেষ্টা করছে। কামাল বলল, 'তোরা কিন্তু বড্ড বেশি বিরক্ত করছিস। লাথি খাবি।'

ঠিক তখনই দরজায় টোকা পড়ল।

কামাল বলল, 'কে?'

কেউ জবাব দিল না। আবার মৃদু টোকা পড়ল।

কামাল দরজা খুলে তাকিয়ে রইল। সোমা দাঁড়িয়ে।

সোমা বলল, 'বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। ভিজে কী হয়েছি, দেখ না।'

কামাল বলল, 'তুমি কেমন আছ সোমা?'

বলতে বলতে তার চোখ ভিজে উঠল। সন্ধ্যাবেলার এই সময়টা ভালো না। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় মানুষ বড় একাকী বোধ করে। তাদের বুক হু হু করে। অকারণেই তাদের চোখ ভিজে ওঠে। সন্ধ্যাবেলার এই অদ্ভুত সময়টাতে প্রিয়জনদের কাছে যেতে নেই। তবু সব মানুষই প্রিয়জনদের কাছে যাবার জন্যে এই সময়টাই বেছে নেয়। কেন বেছে নেয় কে জানে!

AMARBOI.COM

সাজঘর

১

কেরোসিনের চুলায় জাম্বো সাইজের এক কেতলি। মজনু পাশে বসে আছে—একটু পর–পর কেতলির মুখ তুলে পানি ফুটছে কিনা তা দেখার চেষ্টা করছে। তার হিসেব মতো ইতোমধ্যে পানি ফুটে যাওয়া উচিত। অথচ ফুটছে না। ব্যাপারটা কি?

মজনুর বয়স তের–চৌদ্দ কিন্তু দেখায় অনেক বেশি। তার মুখ চিমসে গিয়েছে, গালের হাড় উঁচু, মাথার চুল জায়গায় জায়গায় পড়ে গেছে। উপরের পাটির দুটি দাঁত ভাঙা। ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচ করে থুথু ফেলা ছাড়া তার মধ্যে আর কোনো ছেলেমানুষী নেই।

মজনু 'পূর্বা নাট্যদলের' টি বয়। এদের সঙ্গে সে গত তিন বছর ধরে লেগে আছে। তার কাজ হচ্ছে রিহার্সেল চলাকালীন সময়ে এক শ' থেকে দেড় শ' কাপ চা বানানো। এর বিনিময়ে মাসে সে নব্বুই টাকা করে পায় এবং রিহার্সেলের এই ঘরে রাতে ঘুমুতে পারে। এমন কোনো লোভনীয় চাকরি নয়। প্রতি সপ্তাহে মজনু একবার করে ভাবে চাকরি ছেড়ে দেবে। ছাড়তে পারে না। তার নেশা ধরে গেছে। রিহার্সেল না শুনলে তার ভালো ঘুম হয় না। বৃহস্পতি এবং শুক্র এই দু'দিন রিহার্সেল হয় না। মজনুর খুব অস্থির লাগে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার এই কথা ভেবে এখন থেকেই মজনুর মেজাজ খারাপ। মেজাজ খারাপ হলে সে কিছুক্ষণ পর পর দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুথু ফেলে। এখনো ফেলছে এবং আড়ে আড়ে দরজার দিকে তাকাচ্ছে। কেউ দেখে ফেললে কপালে যন্ত্রণা আছে। তার থুথু ফেলা কেউ সহ্য করে না।

প্রণব বাবু দরজা দিয়ে ঢুকলেন। মজনু অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে পড়ল। প্রণব বাবুকে সে দু'চোখে দেখতে পারে না। তার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সে মনে মনে বলে, 'হারামজাদা মালাউন।'

'মজনু।'

মজনু জবাব দিল না। তাকালও না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মজনু, জল ফুটল নাকি রে?'

'না।'

'চুলায় আগুন আছে নাকি দেখতো, তুই দেখি রাত বারটা বাজাবি।'

মজনু প্রণব বাবুর উল্টোদিকে মুখ নিয়ে খুব সাবধানে একদলা থুথু ফেলে মনে মনে বলল, 'হারামজাদা কুত্তা।'

এই দলের দু'জন লোককে মজনু সহ্য করতে পারে না। এক জন প্রণব বাবু, অন্যজন জলিল সাহেব। অথচ এই দু'জনই নিতান্ত ভালোমানুষ। বিভিন্ন উপলক্ষে মজনুকে টাকা-পয়সা দেন।

প্রণব বাবু পকেট থেকে কুড়িটা টাকা বের করে মজনুর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মধুর স্বরে বললেন, 'পাঁচটা ফাইভ-ফাইভ নিয়ে আয়। বিদেশি। যাবি আর আসবি।'

মজনু বেরিয়ে গেল। বিদেশি সিগারেট আনতে তার খুব আগ্রহ। দেশিটাই সে কেনে, কেউ ধরতে পারে না। সব বেকুবের দল। অথচ তারা নিজেরা তা জানে না। পৃথিবীতে বোকার সংখ্যা এত বেশি কেন এই জিনিসটা নিয়ে প্রায়ই মজনু ভাবে।

রিহার্সেল হয় পুরানা পল্টনের জনতা পাবলিক লাইব্রেরির হল ঘরে। দুটো চৌকি একত্র করে একটা স্টেজ তৈরি করা আছে। এই পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা পূর্বা নাট্যদলের সঙ্গে জড়িত বলে এখানে রিহার্সেলের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। তবে বেশিদিন পাওয়া যাবে না। হল ঘরটা লাইব্রেরির রিডিং রুম হয়ে যাবে।

হল ঘরে নাটকের পাত্র-পাত্রীরা উপস্থিত হচ্ছে। মহড়া শুরু হতে দেরি হচ্ছে; কারণ আসিফ এখনো এসে উপস্থিত হয় নি। আসিফের স্ত্রী লীনা অনেকক্ষণ হল এসেছে। অন্য কোনো মেয়ে এখনো উপস্থিত হয় নি।

লীনার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। তাকে কখনো সে রকম মনে হয় না। হালকা পাতলা গড়নের জন্যে আঠারো উনিশ বছরের তরুণীর মতো মনে হয়। লীনার মুখটি স্নিগ্ধ। তবে আজ তাকে কিছুটা বিষণ্ন দেখাচ্ছে। মিজান বসেছে লীনার পাশে। সে জিজ্ঞেস করল, 'ভাবি আপনার শরীরটা কি খারাপ?'

লীনা জবাব না দিয়ে হাসল। যে হাসির মানে হচ্ছে—শরীর ভালোই আছে।

মিজান বলল, 'আসিফ ভাই দেরি করছেন কেন জানেন?'

'জানি।'

লীনা আবার হাসল। তার হাসি রোগ আছে। যে কোনো কথা বলবার আগে একটু হলেও হাসে। এবং কথা কখনো পুরোপুরি বলে না।

মিজান বিরক্ত হয়ে বলল, 'জানলে বলুন। আপনি অর্ধেক কথা বলেন, অর্ধেক পেটে রেখে দেন, বড় বিরক্ত লাগে।'

লীনা বলল, 'ও তার বোনের বাসায় যাবে। ওর ভাগ্নির শরীর খারাপ। ওখানেই মনে হয় দেরি হচ্ছে!' মিজান ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'কোনোদিন টাইমলি রিহার্সেল শুরু করতে পারি না। কোনো মানে হয়?'

লীনার বেশ মজা লাগছে। মিজানের কথা বলার ভঙ্গিটাই মজার। এমন ভাবে সে কথা বলে যেন পুরো নাটকের দায়িত্ব তার ঘাড়ে। অথচ সে এই বছরেই মাত্র গ্রুপে জয়েন করেছে। নাটকে এখনো কোনো রোল পায় নি। পাওয়ার সম্ভাবনাও কম। মিজানের গলাটা মেয়েলি। তবে এ নিয়ে তার কোনো ক্ষোভ নেই। সে যে লেগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতে পারছে এতেই সে খুশি।

মিজানদের থেকে একটু দূরে জলিল সাহেব কয়েকজনের সঙ্গে নিচু গলায় আড্ডা দিচ্ছেন। আড্ডা ঠিক না। কথা বলছেন জলিল সাহেব একাই। অন্যরা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছে। আদিরসের গল্প। জলিল সাহেব আদিরস বিষয়ক রসিকতা অতি চমৎকার করেন। তবে সব সময় করেন না। এমন সময় করেন যখন আশেপাশে মেয়েরা কেউ থাকে। আজ লীনা কাছেই আছে।

জলিল সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'গল্পটা হচ্ছে একটা ভীমরুল নিয়ে। ভীমরুল হুল ফুটিয়ে দিয়েছে। ভীমরুল হুল ফোটালে কী হয় জান তো? ফুলে বিশাল হয়ে যায়। এখন চিন্তা কর, এক জন লোকের একটা বিশেষ জায়গায় যদি ভীমরুল হুল ফোটায় তাহলে?'

জলিল সাহেবের কথা শেষ হল না, তার আগেই একেকজন হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে।

লীনা বলল, 'মিজান, ওরা হাসাহাসি করছে কী নিয়ে জান?'

মিজান বলল, 'জলিল সাহেব আজেবাজে গল্প বলেন, ঐ নিয়ে হাসাহাসি হয়।'

'আজেবাজে গল্প মানে কী রকম গল্প?'

'বাদ দেন তো ভাবি।'

জলিল সাহেবের গল্প আরো খানিকটা অগ্রসর হয়েছে। আবার সবাই হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে। ঘরের ভেতর খুব গরম লাগছে। লীনা বারান্দায় চলে এল। বারান্দা থেকেই দেখল মেয়েরা সব চলে এসেছে। মেয়েদের আনার জন্যে একটা গাড়ি যায়। নতুন মেয়েটির আজ আসার কথা, সে এসেছে কিনা কে জানে।

মজনু চা বানাচ্ছে। প্রথম কাপটা সে লীনার দিকে বাড়িয়ে দিল।

লীনা বলল, 'চা খাব না রে। গরম লাগছে?'

'ঠাণ্ডা কিছু আইন্যা দিমু?'

'না।'

'আফনের শইলডা কি খারাপ আফা?'

'না—শরীর খারাপ না।'

লীনা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তার শরীরটা আসলেই খারাপ। কেন খারাপ তা সে নিজেও ঠিক জানে না। রাতে ঘুম ভালো হচ্ছে না। একবার ঘুম ভাঙলে কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

যে চার জন মেয়ে এসেছে তাদের এক জন আজই প্রথম এল। শ্যামলা একটি মেয়ে, মুখ থেকে বালিকা ভাবটা এখনো যায় নি। সে অবশ্য লালমাটিয়া কলেজে আই এ পড়ছে। এবার সেকেন্ড ইয়ার। ভালো নাম ইসরাত বেগম। সবাই অবশ্যি তাকে পুষ্প–পুষ্প ডাকছে।

মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে সে খুব লজ্জা পাচ্ছে, তবে কৌতূহলী চোখে চারদিক দেখছে। সে একা পড়ে গেছে। অন্য মেয়েরা জলিল সাহেবের কাছে চেয়ার টেনে বসেছে। জলিল সাহেব ভূতের গল্প শুরু করেছেন। ভূতের গল্পগুলো অবশ্যি আদিরসের গল্পের মতো জমছে না।

লীনা বারান্দা ছেড়ে আবার ঘরে ঢুকল। পুষ্পের পাশের চেয়ারে এসে বসল। হাসি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখে বলল, 'নাম কি তোমার?'

'পুষ্প।'

'বাহ খুব ভালো নাম।'

বলে লীনা নিজেই একটু লজ্জা পেল। 'বাহ খুব ভালো নাম তো—' এই জাতীয় কথাগুলো সাধারণত ছোট বাচ্চাদের বলা হয়। এই মেয়েটি ছোট বাচ্চা নয়।

'তুমি কি আগে অভিনয় করেছ?'

'জ্বি না। আমি হয়ত পারব না।'

'কেন পারবে না। নিশ্চয়ই পারবে। অভিনয় কঠিন কিছু না। আমি যদি পারি তুমিও পারবে।'

'বাসা থেকে করতে দেবে কিনা তাও তো জানি না।'

'সে কি। বাসায় কাউকে কিছু বল নি?'

'জ্বি না।'

'বল নি কেন?'

'বাসায় বললাম, তারপর এখানে কিছু পারলাম না, আপনারা বাদ দিলেন—'

লীনা খানিকটা অবাক হল। এই মেয়েকে যতটা লাজুক শুরুতে মনে হচ্ছিল, এ ততটা লাজুক নয়। গলার স্বর পরিষ্কার ও স্পষ্ট। এ পারবে। লীনা বলল, 'আমাদের দিকটাও কিন্তু তুমি দেখ নি। ধরা যাক আমরা তোমাকে নিলাম, তারপর বাসা থেকে বলল— হবে না। তখন আমরা ঝামেলায় পড়ব না?'

'আমি আপনাদের দিকটা ভাবি নি, আমি শুধু আমার নিজের দিকটাই ভেবেছি।'

'সবাই তাই ভাবে পুষ্প।'

নাটকের পরিচালক বজলু ভাই এসে ঢুকলেন। আজ তিনিও দেরি করেছেন। অসম্ভব রোগা, অসম্ভব কালো এবং প্রায় ছ'ফুটের মতো লম্বা এক জন মানুষ। খানিকটা কুঁজো হয়ে হাঁটেন বলে তাঁর অন্য নাম হচ্ছে 'হাঞ্চ ব্যাক অব মিরপুর।'

বজলু ভাই এসেই বিরক্ত স্বরে বললেন, 'তোমরা বসে আছ কেন? শুরু করে দিলেই হত।'

জলিল সাহেব বললেন, 'আপনি নেই, শুরু করব কী ভাবে?'

'আমি না থাকলে শুরু হবে না, এটা কেমন কথা?'

'আসিফ ভাইও এখনো আসেন নি।'

'বল কী? এদের হয়েছে কী? দেখি চা দিতে বল। চা খেয়ে ম্যারাথন। আজ ফুল রিহার্সেল হবে। নতুন মেয়ে একটা আসার কথা। এসেছে? কুসুম কিংবা পুষ্প এই জাতীয় নাম।'

পুষ্প উঠে দাঁড়াল। বজলু সাহেব সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন। পুষ্প খুব অস্বস্তি বোধ করছে। এতক্ষণ কেউ তেমন করে তার দিকে তাকায় নি, এখন একসঙ্গে সবাই তাকাচ্ছে।

'তোমারই নাম কুসুম?'

'আমার নাম পুষ্প।'

'একই ব্যাপার। তৈলাধার পাত্র কিংবা পাত্রাধার তৈল—অভিনয় করেছ কখনো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জ্বি না।'

'এইতো একটা ভুল কথা বললে—অভিনয় তো আমরা সারাক্ষণই করছি। করছি না? বাড়িতে মেহমান এসেছে, তুমি খুব বিরক্ত, তবু তার সঙ্গে হাসিমুখে গল্প করতে হচ্ছে। দেখাতে হচ্ছে যে তুমি আনন্দিত। এটা অভিনয় না? অভিনয় তো বটেই। কঠিন অভিনয়। আমাদের প্রতিনিয়ত অভিনয় করতে হয়।'

পুষ্প তাকিয়ে আছে। এই লোকটিকে তার পছন্দ হচ্ছে না। কথা বলার সময় লোকটির মুখ থেকে থুথু ছিটকে আসছে। আর কথা বলছে কেমন মাস্টারের ভঙ্গিতে। কথাবার্তায় একটা সবজান্তা ভাব। এই রকম সবজান্তা লোক তার ভালো লাগে না।

'পুষ্প।'

'জ্বি।'

'তুমি একটা কাজ কর। একটু দূর থেকে হেঁটে হেঁটে এখানে এসে দাঁড়াও। তারপর তুমি তোমার মাকে ডাক। এমন ভাবে ডাকবে যেন তাঁকে তুমি জরুরি খবর দিতে চাচ্ছ।'

'কী খবর?'

'মনে কর একটা দুঃসংবাদ।'

পুষ্প তাই করল। যদিও তার মোটেও ভালো লাগছে না। একটু দূর থেকে হেঁটে এসে বলল, 'মা, মা।'

বজলু সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, 'কিছুই তো হল না, আবার কর।'

পুষ্পের মুখ লাল হয়ে গেছে। সে একবার ভাবল কিছু করবে না। দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু তা কি ঠিক হবে? সবাই তার দিকে তাকাচ্ছে। পুষ্প আবার একটু দূরে সরে গেল। এগিয়ে এল জড়ানো পায়ে। আবার ডাকল, 'মা, মা।'

বজলু সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, 'রোবটের মতো কথা বলছ। ফ্রিলি বল। পরিষ্কার গলায় বল। জায়গাটা আবার কর।'

পুষ্প বলল, 'আর করব না, আমার ইচ্ছে করছে না।'

'ইচ্ছে করছে না মানে?'

'আমি অভিনয় করব না।'

পুষ্প লীনার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল। তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। কী রকম বিশ্রী ভঙ্গিতে লোকটা বলল—কিছুই তো হল না। কিছুই না হওয়াটা যেন তার অপরাধ।

পুষ্পের ইচ্ছা করছে বাসায় ফিরে যেতে। রাত এখনো তেমন হয় নি। সে একটা রিকশা নিয়ে চলে যেতে পারবে। তার এত ভয় টয় নেই। তবে ইচ্ছা করলেই তো আর যাওয়া যায় না। মীনা আপা তাকে নিয়ে এসেছেন। ফিরতে হবে মীনা আপার সঙ্গেই। মীনা আপার কাণ্ড কারখানাও অদ্ভুত। তাকে নিয়ে আসার পর আর কোনো খোঁজখবর নেই। ফর্সা মতো একটা লোকের পাশে বসে ক্রমাগত কথা বলছে। ফর্সা লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে এইসব কথা মন দিয়ে শুনছে। বরং মনে হচ্ছে ফর্সা লোকটা বিরক্ত হচ্ছে।

মীনা আপা পুষ্পদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন। কৃষি ব্যাংকে কাজ করেন আর নাটক থিয়েটার করেন। বয়স ত্রিশ ছাড়িয়ে গেছে। এখনো বিয়ে হয় নি। পুষ্পের ধারণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়ে হবার সম্ভাবনা খুব কম। মীনা আপা বছর তিন আগে থেকে মোটা হতে শুরু করেছেন। এখন প্রায় মৈনাক পর্বত। থুতনিতে ভাঁজ পড়েছে। হাঁটার সময় থপ থপ শব্দ হয়।

মীনা আপার ধারণা টনসিল অপারেশনের জন্যে তাঁর এটা হয়েছে। টনসিল অপারেশন না হলে আগের মতো হালকা পাতলা থাকতেন। এই নাটকে মীনা আপা কিসের পার্ট করেন কে জানে?

আসিফ এসে ঢুকল ঠিক সাড়ে আটটায়। দরজা থেকেই লীনার দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসি হাসল। এই হাসির অনেকগুলো অর্থ। আট বছর পাশাপাশি থাকায় লীনা এখন সব ক'টি অর্থ ধরতে পারে। অর্থগুলো হচ্ছে—দেরির জন্যে আমি লজ্জিত, সারাদিনের পরিশ্রমে আমি খানিকটা ক্লান্ত এবং একটা খারাপ খবর আছে।

আসিফকে ঠিক সুপুরুষ বলা যাবে না। শক্ত সমর্থ গড়ন। মাথা ভর্তি অগোছালো কোঁকড়ানো চুল। চোখ দু'টি ছোট, ঠোঁট বেশ পুরু। চওড়া কাঁধ। সব কিছু মিলিয়েও আলাদা কিছু আকর্ষণ তার মধ্যে আছে।

লীনা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। আট বছর এর সঙ্গে বিবাহিত জীবন কাটানোর পরেও এই মানুষটাকে দেখলে তার মধ্যে তরল অনুভূতি হয়। পাশে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে।

আসিফকে ঢুকতে দেখেই বজলু সাহেব চায়ের কাপ নামিয়ে হুংকার দিলেন, 'স্টার্ট কর। দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে শুরু হবে। আজ কোনো প্রম্পটিং হবে না। একেকবার ডায়লগ ভুলে গেলে পাঁচ টাকা করে জরিমানা। আসিফ যাও স্টেজে উঠে পড়। তোমরা চেয়ার আর টেবিল দাও, বাঁ দিকে একটু পেছনে। দর্শকরা যেন শুধু সাইড ভিউ পায়।'

মিজান বলল, 'পেছনের চৌকির পশ্চিম দিকের কোণায় একটা ভাঙা আছে। খেয়াল রাখবেন কাইন্ডলি।'

আসিফ বলল, 'এক কাপ চা খেয়ে নিই বজলু ভাই। খুব টায়ার্ড ফিল করছি।'

'এক চুমুকে চা শেষ কর। কুইক। সাতদিন পর শো, অথচ এখনো একটা দিন ফুল রিহার্সেল দিতে পারলাম না।'

লীনা ভেবেছিল আসিফ চায়ের পেয়ালা হাতে তার পাশে এসে দাঁড়াবে। টুকটাক কিছু কথাবার্তা বলবে। তা সে করল না। চায়ের কাপ হাতে প্রণবকে নিয়ে বারান্দায় চলে গেল। আসিফ নিজের বাসার বাইরে এলে স্ত্রীর সঙ্গে কেমন যেন আলগা একটা ব্যবহার করে। যেন সে লজ্জা পায়।

পুষ্প বলল, 'চায়ের কাপ হাতে বারান্দার দিকে যে গেলেন, উনি কি এই নাটকের নায়ক?'

লীনা হেসে বলল, 'তার চেহারাটা কি তোমার কাছে নায়কের মতো মনে হল?'

'না, তা না।'

'হ্যাঁ, এ-ই নায়ক। নাটকের শুরুটা বলি, তোমার ভালো লাগবে। একজন বিখ্যাত লেখকের উপন্যাস থেকে নাটক করা। গল্পটা খুব চমৎকার। শুনতে চাও?'

'হ্যাঁ চাই।'

'এই নাটকের নায়ক হচ্ছেন একজন লেখক। নতুন বিয়ে করেছেন। স্ত্রীর দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার যতটা সময় দেয়া দরকার ততটা দিতে পারছেন না। রাত দশটার পর উনি লেখার খাতা নিয়ে বসেন। স্ত্রী বেচারী একা একা শুয়ে থাকে। মেয়েটির বয়স খুব কম, এই ধর আঠার উনিশ। তার খুব ইচ্ছে করে স্বামীর সঙ্গে রাত জেগে গল্প করতে। স্বামী বেচারা তা বুঝতে পারে না। সে তার উপন্যাস নিয়ে ব্যস্ত। ঘটনাটা শুরু হয়েছে এক রাতে। স্বামী লিখছে। হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি শুরু হল। ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। লেখকের স্ত্রী একটা জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে বসার ঘরে ঢুকল।'

'লেখকের নাম কি?'

'পুরো নাটকে লেখকের কোনো নাম নেই। তাকে সব সময় লেখক বলা হয়েছে, তবে লেখকের স্ত্রীর নাম হচ্ছে জরী।'

'আপনি হচ্ছেন লেখকের স্ত্রী, তাই না?'

'হ্যাঁ। কী করে বুঝলে?'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল।'

নাটক শুরু হল। স্টেজের এক প্রান্তে লেখার টেবিল। চেয়ারে পা তুলে আসিফ বসে আছে। বজলু সাহেব বললেন, 'চেয়ারে পা তুলে বসেছ কেন? এটা কী রকম বসা?'

আসিফ বলল, 'ঘরোয়া ভাবে বসেছি বজলু ভাই। খুব রিলাক্সড হয়ে বসা। পা নামিয়ে ঠিকঠাক মতো বসলে ফর্মাল একটা ভাব চলে আসে।'

'দেখতে ভালো লাগছে না। দেখতে ভালো লাগার একটা ব্যাপার আছে। দর্শক হিসাবে জিনিসটা দেখতে ভালো লাগতে হবে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি....'

বজলু সাহেব কথা শেষ করলেন না। আসিফ বলল, 'বজলু ভাই আমি চাচ্ছি যেন আমাকে ভালো না লাগে। লেখকের সব কাণ্ডকারখানায় তার স্ত্রী যেমন বিরক্ত—আমি চাই দর্শকরাও যেন ঠিক তেমনি ভাবে বিরক্ত হয়।'

বজলু সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'তুমি পা নামিয়ে বস।' আসিফ পা নামাল।

'বা হাতে মাথা হেলান দিয়ে লিখতে শুরু কর।'

পুষ্প মুগ্ধ হয়ে দেখছে। মুগ্ধ হয়ে দেখার মতোই ব্যাপার। একজন লেখক গভীর আগ্রহ নিয়ে লিখছেন এটা এত সুন্দর বোঝা যাচ্ছে! মাঝে মাঝে লেখা থেমে যাচ্ছে, আবার শুরু হচ্ছে। লেখক একটা সিগারেট মুখে দিলেন। দেশলাই দিয়ে সিগারেটে আগুন ধরাতে গিয়ে ধরালেন না। নতুন কিছু মাথায় এসেছে। দেশলাই ফেলে কলম তুলে নিয়ে আবার ঝড়ের বেগে লিখতে শুরু করেছেন—এমন সময় বাতি নিভে গেল। লেখক কী প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়েই না তাকাচ্ছেন টেবিল ল্যাম্পটার দিকে। লেখকের প্রতি সহানুভূতিতে পুষ্পের চোখে প্রায় পানি এসে যাচ্ছে। এমন সময় দেখা গেল লেখকের স্ত্রী জরী আসছে। তার হাতে মোমবাতি। বাতাসের ঝাপ্টা থেকে বাতি আড়াল করে আসছে। তার মুখে কেমন যেন দুষ্টু দুষ্টু হাসি। পুষ্প দেখছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছে। লেখক কথা বললেন। কি চমৎকার ভরাট গলা। স্বপ্ন মাখা স্বর।

লেখক জরী তুমি এখনো জেগে আছ?

জরী ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ শুনি খাটের নিচে খুট খুট শব্দ হচ্ছে। কে যেন আবার খুক খুক করে কাশল। পুরুষ মানুষের কাশি। ভয়ে আমি অস্থির। খাটের নিচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে যেন বসে আছে।

লেখক আবার আজেবাজে কথা শুরু করেছ?

জরী মোটেই কোনো আজেবাজে কথা না। আমার মনে হচ্ছে আমাদের খাটের নিচে একটা ভূত থাকে। পুরুষ ভূত। ভূতটার গায়ে তামাকের গন্ধ।

লেখক জরী, তুমি দয়া করে মোমবাতিটা এখানে রেখে ঘুমিয়ে পড়। প্লিজ, প্লিজ—এই দেখ হাতজোড় করছি।

জরী : ঝড় বৃষ্টির রাতে একা একা ঘুমুব? ভূতটা যদি আমাকে কিছু করে। ওর মতলবটা আমার কাছে বেশি ভালো মনে হচ্ছে না।

লেখক তোমার সঙ্গে ঘুমুতে পারলে আমি খুবই খুশি হতাম। কিন্তু তুমি একটা জিনিস বুঝতে পারছ না—লেখালেখিটা একটা মুডের ব্যাপার। মুড সব সময় আসে না।

জরী এখন এসেছে?

লেখক হ্যাঁ এসেছে। সারারাত আমি লিখব।

জরী আর আমি সারারাত ঐ ভূতটার সঙ্গে ঘুমুব?

লেখক আমি একটা ক্লাইমেক্সে এসে থেমে আছি। আমার নায়ক অভাবে অনটনে পর্যুদস্ত। বেকার, হাতে একটা পয়সা নেই। সকালবেলা খবর পেয়েছে তার প্রেমিকার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। সে ঠিক করেছে আত্মহত্যা করবে..... ।

জরী এখনো করে নি?

লেখক : না করে নি। তবে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন পথে পথে ঘুরছে।

জরী সিদ্ধান্ত যখন নিয়েই ফেলেছে তাহলে আর দেরি করছ কেন? কোনো একটা ট্রাকের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ুক। ঝামেলা চুকে যাক। আমরা আরাম করে ঘুমুতে যাই।

লেখক বড্ড যন্ত্রণা করছ জরী।

জরী আমি আর কত যন্ত্রণা করছি? তোমার নায়ক অনেক বেশি যন্ত্রণা করছে। স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েও পথে পথে ঘুরছে। এত ঘোরার দরকার কিরে ব্যাটা? লাফ দিয়ে কোনো একটা ট্রাকের নিচে পড়ে যা। ঢাকা শহরে কি ট্রাকের অভাব?

লেখক (কড়া স্বরে) জরী।

জরী আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। যদি চাও তো এক কাপ চা বানিয়ে দিতে পারি।

লেখক এই মুহূর্তে আমি একটা জিনিস চাই, তা হচ্ছে নীরবে কাজ করার স্বাধীনতা।

জরী বেশ স্বাধীনতা দিচ্ছি। স্বাধীনতার সঙ্গে এক কাপ চাও দিয়ে যাচ্ছি।

পুষ্প দেখল জরী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্বামীর কাছ থেকে চলে আসছে। ঢুকেছে রান্নাঘরে। চা বানাচ্ছে। চা বানাতে বানাতে তার চোখে পানি এসে গেল। সে চোখে আঁচল দিয়ে খানিকক্ষণ কাঁদল তারপর চায়ের কাপ হাতে বসার ঘরে ঢুকল।

বজলু সাহেব চেঁচিয়ে বললেন, 'স্টপ।' অভিনয় থেমে গেল। বজলু সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, 'পুরো ব্যাপারটা স্লো হয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই নাটক স্লো। এরকম একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্লো নাটকে তার চেয়েও স্লো এ্যাকশান পাবলিক মোটেও একসেপ্ট করবে না। চা বানানোর জন্যে পাশের ঘরে যাওয়া মানেই নাটক স্লো করে দেয়া। জরী, তোমাকে লেখকের পাশেই থাকতে হবে। ঐ ঘরেই ফ্লাস্কে চা বানানো আছে। তুমি শুধু ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে দেবে।'

লীনা বলল, 'বজলু ভাই একটা সমস্যা আছে তো। ইমোশান বিল্ড আপ করার জন্যে আমার কিছু সময় দরকার। এই সময় তো আমি পাচ্ছি না।'

'যা করার এই সময়ের মধ্যেই করতে হবে।'

'এত অল্প সময়ে চোখে পানি আনতে পারব বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'পারবে। অবশ্যই পারবে। না পারলেও ক্ষতি নেই। সাজেসানের উপর দিয়ে কেটে বের হয়ে যাবে। নাও শুরু কর। স্টার্ট। লেখকের পাশে তুমি দাঁড়িয়ে আছ। শান্ত ভঙ্গিতে বলছ—বেশ স্বাধীনতা দিচ্ছি। স্বাধীনতার সঙ্গে-সঙ্গে এককাপ চা দিয়ে যাচ্ছি। ওকে স্টার্ট। জরী, ডেলিভারি এত সফট দিও না। একটু হার্ড দিও।'

অভিনয় শুরু হল। লেখক একমনে লিখছেন। জরী ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালতে-ঢালতে লেখকের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। তার মন বিষাদে ভারাক্রান্ত। এক সময় টপ-টপ করে চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। পুষ্প অবাক হয়ে দেখল কত সহজে মেয়েটির চোখে পানি এসে গেছে। এটা যেন অভিনয় নয়। বাস্তব জীবন। স্বামীসঙ্গ কাতর একটি মেয়ের অভিমানের অশ্রু। লেখক চোখ তুলে তাকালেন—এবং অবাক হয়ে বললেন—

লেখক কী হয়েছে, চোখে পানি কেন?

জরী (চোখ মুছতে-মুছতে) আমার খুব বাজে একটা চোখের অসুখ হয়েছে। রাত হলে চোখ কড় কড় করে, চোখ দিয়ে পানি পড়ে।

লেখক পল্টুকে একবার দেখাও না কেন?

এই বলেই লেখক আবার লিখতে শুরু করেছেন।

জরী চলে আসছে। দরজার পাশে এসে থমকে দাঁড়াল। জরী তাকিয়ে আছে লেখকের দিকে। লেখক একমনে লিখছেন। জরীর চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

পুষ্প বুঝতেও পারে নি যে তার চোখ দিয়েও পানি পড়তে শুরু করেছে। মেয়েটির কষ্টে তার বুক ভেঙে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে এক্ষুনি চেঁচিয়ে লেখককে বলবে—পাষণ্ড কোথাকার। সে কিছুই বলতে পারল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। সবাই অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে। তার খুবই খারাপ লাগছে, কিন্তু সে চোখের পানি থামাতে পারছে না। আসিফ এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে।

আসিফ বলল, 'তোমার নাম কি?'

পুষ্প ধরা গলায় বলল, 'আমার নাম দিয়ে আপনার কোনো দরকার নেই।'

এটা সে কেন বলল কে জানে? লেখকের উপর তার অসহ্য রাগ লাগছিল। এই রাগের জন্যেই হয়ত বলেছে। এখন আবার তার জন্যে খারাপ লাগছে।

হলঘরের ভেতর অসহ্য গরম।

বাইরে এসে একটু আরাম লাগছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। লীনা হালকা গলায় বলল, 'বৃষ্টি হবে না কি?' আসিফ জবাব দিল না। মনে হচ্ছে সে অন্য কিছু ভাবছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীনা বলল, 'কিছু ভাবছ নাকি?'

'না।'

'বড্ড পানির তৃষ্ণা পেয়েছে। ঠাণ্ডা কিছু খেলে কেমন হয়?'

'ভালোই হয়।'

তারা দু'জন কনফেকশনারি দোকানে ঢুকল। লীনার কী যেন একটা বলার কথা, অথচ কিছুতেই মনে পড়ছে না। মাঝে-মাঝে তার এ রকম হয়। খুব জরুরি কথা, যেটা না বললেই নয়—অথচ মনে পড়ে না।

'লীনা।'

'কি?'

'টিভিতে একটা অফার পেয়েছি, যাব কি-না বুঝতে পারছি না।'

'যাবে না কেন?'

'কখনো করি নি তো। বুঝিও না। তাছাড়া—।'

'তাছাড়া কি?'

'রোলটা খুব ছোট। নায়কের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। নায়কের কাছে দু'বার টাকা ধার চাইতে আসে। এই পর্যন্তই। অভিনয়ের কোনো স্কোপ নেই।'

'তা হলে যাবে কেন? তোমার মতো এত বড় অভিনেতা। তুমি যদি টিভিতে যাও সুপার স্টার হয়ে যাবে।'

আসিফ হাসল। লীনা বলল, 'আমি মোটেও হাসির কথা বলি নি। তুমি হচ্ছ সুপার-সুপার স্টার। তুমি নিজেও সেটা খুব ভালো করেই জান। জান না?'

আসিফ জবাব দিল না। নিজের সম্পর্কে তার ধারণা বেশ উঁচু। সে খুব ভালো করেই জানে তার ক্ষমতা কতটুকু। তার আশেপাশে যারা আছে তারাও জানে। ক্ষমতা তেমন কাজে আসছে না। তাদের দলটা ছোট—অভিনেতা-অভিনেত্রী তেমন নেই। মঞ্চে যেদিন শো হয়, সেদিন অডিটরিয়াম প্রায় ফাঁকা থাকে। বড় কোনো দলে যদি সুযোগ পাওয়া যেত। তবে দলটির প্রতি তার মমতা আছে। এরা তার জন্যে অনেক করেছে। প্রথম বারেই প্রধান চরিত্র তারা তাকে দিয়েছে। অন্য কোনো দল তা করত না।

লীনা বলল, 'তুমি কোনো কিছু নিয়ে খুব চিন্তা করছ বলে মনে হচ্ছে।'

'না তা করছি না। কোক শেষ হয়েছে? চল রওনা দিই। বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে।'

লীনা বলল, 'কিছুক্ষণ হাঁটি, তারপর রিকশা নেব। হাঁটতে ভালো লাগছে।'

'বেশ তো চল হাঁটি।'

লীনা ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটছে। সে আসিফের হাত ধরে আছে। রিহার্সেলের সময় খুব ক্লান্তি লাগছিল। এখন বেশ ভালো লাগছে। আসিফ ঘড়ি দেখল—রাত দশটা। আশপাশ কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। ছিনতাই পার্টির সামনে না পড়লেই হল।

লীনা বলল, 'তোমাকে কি একটা জরুরি কথা বলতে চাচ্ছিলাম, এখন আর কিছুতেই মনে পড়ছে না।'

'তাহলে বোধ হয় তেমন জরুরি নয়।'

'না, জরুরি। খুবই জরুরি। আমার মাথায় কী যেন হয়েছে বুঝলে—কিছু মনে থাকে না। ব্রেইন টিউমার-ফিউমার কিছু একটা হয়েছে।'

আসিফ তার জবাব দিল না। সিগারেট ধরাল। হাত ইশারা করে খালি রিকশা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাকল। ক্লান্ত গলায় বলল, 'আর হাঁটতে পারছি না, চল রিকশায় উঠি। তোমার জরুরি কথাটা মনে পড়েছে?'

'না। তুমি যখন আশেপাশে থাকবে না তখন হয়ত মনে পড়বে। আমি ঠিক করেছি মনে পড়লেই একটা কাগজে লিখে ফেলব। কাগজটা থাকবে আমার ব্যাগে।'

'বুদ্ধিটা খারাপ না।'

রিকশা দ্রুত চলছে। হাওয়ায় লীনার শাড়ির আঁচল উড়ছে। লীনা শাড়ির আঁচল সামলাতে সামলাতে বলল, 'এক সময় আমরা একটা গাড়ি কিনব, বুঝলে। তারপর রোজ রাতে গাড়িতে করে ঘুরব। তুমি চালাবে। আমি তোমার পাশে থাকব।'

আসিফ জবাব দিল না। লীনা যখন কথা বলে তখন সে বেশিরভাগ সময় চুপচাপ থাকে। বিয়ের প্রথম দিকে লীনার অসুবিধা হত। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। আসিফ কথা না বললেও তার অসুবিধা হয় না।

'আজ রিহার্সেলে নতুন মেয়েটাকে দেখেছ? পুষ্প নাম।'

'হ্যাঁ দেখলাম। কথাও তো বললাম। অভিনয় না কি পারে না, বজলু ভাই বলছিলেন।'

'মেয়েটা অভিনয় দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।'

'হুঁ।'

'এই দেখে তোমার কোনো স্মৃতি মনে পড়ে নি?'

'কোন স্মৃতি?'

'একটু মনে করে দেখ।'

আসিফ তেমন কিছু মনে করতে পারল না। লীনার খানিকটা মন খারাপ হল। সে চাপা গলায় বলল, 'তোমার সঙ্গে ঠিক এইভাবে আমার পরিচয় হয়েছিল। মনে আছে? ময়মনসিংহ টাউন ক্লাবে নাটক করছিলে। তুমি হলে মধু পাগলা। মনে আছে?'

'আছে।'

'তোমার ছেলে মরে গেছে, তার ডেডবডি নিয়ে তুমি যাচ্ছ। আপন মনে কথা বলছ। অভিনয় যে এত সুন্দর হতে পারে ঐদিন প্রথম বুঝলাম, কেঁদে-কেটে একটা কাণ্ড করেছি। শেষে বাবা আমাকে হলের বাইরে নিয়ে যান। তখনো আমি ফোঁপাচ্ছিলাম। তোমার কিছু মনে নেই, তাই না।'

'মনে থাকবে না কেন? মনে আছে—নাটকটা সুবিধার ছিল না। মেলোড্রামা। খুবই দুর্বল সংলাপ।'

রিকশা গলির মোড়ে থামল। জায়গাটা হচ্ছে শান্তিবাগ। গলির ভেতর তিন তলা বাড়ির দোতলায় তারা থাকে। একটাই ফ্ল্যাট। দু'টি পরিবার শেয়ার করে। কমন রান্নাঘর। তবে তাতে তেমন অসুবিধা হয় না।

বাড়ির গেটের কাছে এসে আসিফ থমকে দাঁড়াল। বিব্রত গলায় বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে আর যাচ্ছি না। সকালে ফিরব।'

লীনা অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে!'

'শেলীর এ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন হবে রাত এগারটায়। থাকা দরকার। দুলাভাই চিটাগাং গেছেন। বড় আপা একা।'

'এতক্ষণ এটা আমাকে বল নি কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এইতো বললাম।'

'চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।'

'তোমার যাওয়ার দরকার নেই। তুমি বিশ্রাম নাও। তোমার শরীর খারাপ—রেস্ট দরকার।'

'আমার শরীর খারাপ তোমাকে বলল কে?'

'কয়েক রাত ধরেই তো ঘুমুতে পারছ না। যতবারই উঠি, দেখি চুপচাপ বিছানায় বসে আছ।'

লীনা বলল, 'বেশ তো যাবে যাও—ভাত খেয়ে যাও।'

'ভাত খাব না। একদম খিদে নেই। সন্ধ্যাবেলা ভাজাভুজি কি সব খেয়েছি, টক ঢেকুর উঠছে। যাই লীনা।'

লীনা বেশ মন খারাপ করে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। জরুরি কথাটা এখন তার মনে পড়েছে। চেঁচিয়ে ডাকবে আসিফকে? ডেকে বলবে জরুরি কথাটা? ডাকাটা কি ঠিক হবে? এখন মনে হচ্ছে কথাটা তেমন জরুরি নয়।

দোতলার ফ্ল্যাটটা লীনারা যাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে থাকছে, তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা তিন। স্বামী স্ত্রী এবং তিন বছর বয়েসী একটি মেয়ে। এক জন কাজের ছেলে আছে, সে বেশিরভাগ সময়ই ঘুমিয়ে কাটায়। পরিবারের কর্তা হাশমত আলি বেশ বয়স্ক লোক। চল্লিশের মতো বয়স। আগে একবার বিয়ে করেছিলেন। ঐ পক্ষের দু'টি মেয়ে আছে। মেয়েরা তাদের নানার বাড়িতে থাকে। নানার বাড়ি টঙ্গিতে। মাঝে-মাঝে আসে, সারাদিন থেকে সন্ধ্যাবেলা চলে যায়। হাশমত সাহেবের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বেনু। এই মেয়েটার বয়স খুবই কম। পনেরো যোল হওয়া বিচিত্র নয়। গ্রামের মেয়ে। তবে শহরের চাল-চলন দ্রুত আয়ত্ত করে ফেলেছে। মেয়েটি সুন্দরী, তবে বাচ্চা হবার পর গাল-টাল ভেঙে গেছে। বাচ্চাটা মায়ের কোল ছাড়া থাকতেই পারে না। বেনুকে সারাদিন বাচ্চা কোলে নিয়ে ঘুরতে হয়। লীনাকে সে খুবই পছন্দ করে। যতক্ষণ লীনা বাসায় থাকে বেনু তার পেছনে থাকে। ব্যাপারটা লীনার পছন্দ না হলেও কিছু বলে না। এই সাদাসিধা অল্প বয়েসী মেয়েটাকে লীনার ভালোই লাগে। সেই তুলনায় হাশমত আলিকে তার একেবারেই ভালো লাগে না। লোকটার সব কিছুই কেমন যেন গ্রাম্য। রেলের বাঁধা মাইনের চাকরিতেও তার রোজগার সন্দেহজনকভাবে ভালো। তবে তার ব্যবহার ভালো। গত মাসে সে একটা ফ্রিজ কিনেছে এবং লীনাকে বলেছে, 'কিছু এরিয়ার টাকা পেলাম, তারপর প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে লোন নিলাম, তারপর কিনে ফেললাম। একটা শখ ছিল ভাবি।'

লীনা বলল, 'ভালো করেছেন।'

'এখন আরাম করে ঠাণ্ডা পানি খেতে পারবেন। হা হা হা। বেনু, ভাবীকে একটা পেপসি দাও।'

'এখন থাক।'

'না ভাবি খান। খেতে হবে। এটা ভাবি আপনি নিজের ফ্রিজ ভাববেন। রিকোয়েস্ট। বেনু শোন, নিচের একটা তাক ভাবির। খবরদার কিছু রাখবে না। যদি দেখি তোমার কিছু আছে তাহলে অসুবিধা আছে। জিনিসটা কেমন কিনলাম ভাবি? ভালো না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খুব ভালো। খুব সুন্দর।'

'অনেকগুলো টাকা চলে গেল, তবু শখের একটা জিনিস, তাই না ভাবি?'

'তা তো বটেই।'

হাশমত আলির মধ্যেও এক ধরনের সরলতা আছে। এটা লীনার ভালো লাগে।

এরা সুখেই আছে। নিজেদের নিয়ে আনন্দে আছে। পৃথিবী সমাজ টমাজ এইসব নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসে এরা গভীর আনন্দ খুঁজে পায়। প্রায়ই দেখা যায় অনেক রাতে হাশমত আলি বড়–সড় একটা মাছ কিনে এনেছে। বেনু সেই মাছ কাটছে। হাশমত আলি উবু হয়ে তার সামনে বসে আছে। মাছটা কী রকম, সেই নিয়ে গবেষণা হচ্ছে।

'পুকুরের মাছ, কী বল বেনু? রঙটা কেমন কালো দেখ না। শ্যাওলার নিচে থেকে কালো হয়ে গেছে। নদীর মাছ হলে লাল হত। তেলটা ঠিক আছে কিনা দেখ তো।'

'ঠিকই আছে।'

'তেল দিয়ে বড়া বানাতে পারবে। মাছের তেলের বড়া—তার স্বাদই অন্যরকম। দুটো বড় করে পিস কাট। ভেজে লীনা ভাবিদের দিয়ে এস।'

'ওরা বোধ হয় শুয়ে পড়েছে। সকালে দেব।'

'আরে না এখনই দাও। টাটকা জিনিসের একটা আলাদা ব্যাপার আছে।'

গভীর রাতে প্লেটে ভাজা মাছ নিয়ে হাশমত আলি নিজেই দরজা ধাক্কায়, 'ভাবি ঘুমিয়ে পড়লেন না কি? ও ভাবি, ভাবি।'

পরিষ্কার বোঝা যায় এই পরিবারটি লীনাদের বেশ পছন্দ করে। কেন করে সেও এক রহস্য। এতদিন একসঙ্গে আছে, এর মধ্যে একদিনও নাটক দেখার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখায় নি। হাশমত আলি অবশ্যি প্রায়ই বলে, 'একদিন যাব। বুঝলেন ভাবি, আপনাদের কাণ্ডকারখানা দেখে আসব। মেয়েটাকে নিয়ে হয়েছে মুশকিল। সারাক্ষণ ভ্যাঁ–ভ্যাঁ করে। বাচ্চা নিয়ে কি যাওয়া যায় ভাবি? বেনুকে একদিন নিয়ে দেখাব। গ্রামের মেয়ে, কিছু তো এই জীবনে দেখে নি।'

সিঁড়ির বাতি বোধ হয় আবার চুরি হয়েছে। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে উঠতে হচ্ছে। একটা সিঁড়ি আছে ভাঙা। বাড়িওয়ালাকে কতবার বলা হয়েছে। এখনো কিছু করছে না।

দরজা খুলে দিল বেনু। অবাক হয়ে বলল, 'এত রাতে একা–একা আসলেন ভাবি!'

'না একা না। তোমার ভাই নামিয়ে দিয়ে গেছে।'

'ভাই আবার গেলেন কই?'

'তার এক ভাগ্নির অপারেশন।'

'ও আল্লা! কী হইছে?'

কী হয়েছে লীনা নিজেও ভালোমতো জানে না। জানা উচিত ছিল। কথাবার্তা শুনে হাশমত বেরিয়ে এল। হাসিমুখে বলল, 'একটা ভিসিপি ভাড়া করে নিয়ে এসেছি ভাবি।'

'তাই নাকি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তিন শ' টাকা দিয়ে এক সপ্তাহের জন্যে ভাড়া করলাম। মনের শখ মিটিয়ে ছবি দেখব।'

'ভালোই তো।'

'খাওয়া দাওয়া করে আসেন। এক সঙ্গে দেখি—এগারটা ছবি এনেছি। সব ভালো-ভালো ছবি। আসিফ ভাই কই?'

'ওর এক ভাগ্নিকে দেখতে গেছে। ভোরবেলা আসবে।'

'আমি ভাবি দু'দিনের ছুটি নিয়ে নিয়েছি। ক্যাজুয়েল লিভ। দিনরাত ছবি দেখব।'

'ভালো। দেখুন।'

'আপনি ভাত খেয়ে আসুন। একা একা ছবি দেখে সুখ নেই ভাবি।'

প্লেটে ভাত নিয়ে লীনা শোবার ঘরে চলে এসেছে। লীনার পেছনে পেছনে ঢুকেছে বেনু। ভাত খাওয়া হলে জোর করে তাকে ছবি দেখাতে নিয়ে যাবে। লীনার চোখ ঘুমে জড়িয়ে যাচ্ছে। তবু মনে হচ্ছে তাকে ছবি দেখতেই হবে।

'ভাবি?'

'কী বেনু।'

'আপনি এত কাজ সারাদিনে ক্যামনে করেন তাই ভাবি। দিনে স্কুল। রাতে নাটক, থিয়েটার।'

'তুমিও তো অনেক কাজ কর। ঘরের সব কাজ সামলাও, বাচ্চা দেখ। বাচ্চা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?'

'জ্বি। অনেক কষ্টে ঘুম পাড়াইছি। এরে একটা তাবিজ-টাবিজ দিতে হইব ভাবি।'

'তুমি কোলে নিয়ে নিয়ে মেয়েটাকে নষ্ট করেছ বেনু।'

'তাও ঠিক।'

বেনু তৃপ্তির হাসি হাসল। যেন সে মেয়েকে নষ্ট করায় খুব আনন্দিত। সব মায়েরা যা পারে না সে তা পেরেছে।

'ভাবি।'

'বল।'

বেনু ইতস্তত করে বলল, 'একটা শরমের কথা ভাবি। খুকির আব্বা কেমুন একটা ছবি আনছে। অসভ্য কাণ্ডকারখানা। দেখলে শইল ঝিম ঝিম করে।'

'না দেখলেই হয়।'

'আমি খুকির আব্বারে বলছি—এই ছবি দেখলে পাপ হইব। সে খালি হাসে। এইসব ক্যামনে বানায় আফা?'

'জানি না বেনু।'

লীনাকে ছবি দেখার জন্যে বসতে হল। দিদার নামের কি একটা পুরনো সিনেমা হচ্ছে। হিন্দী প্রতিটি বাক্য হাশমত আলি অনুবাদ করে দিচ্ছে। খুব বিরক্তিকর ব্যাপার। প্রচণ্ড ঘুমে শরীর আচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

ছবি মাঝপথে রেখে লীনা উঠে এল। আর আশ্চর্য, বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুম উধাও। লীনা অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করল। মাথায় পানি দিয়ে এল, লাভ হল না। এই রাতটাও সম্ভবত অঘুমে কাটাতে হবে। এ রকম হচ্ছে কেন? তার মনে কি কোনো গোপন দুঃখ আছে? কোনো হতাশা আছে? থাকার তো কথা নয়। তাহলে এ রকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে কেন?

বাবার অভিশাপ লাগল নাকি?

লীনার বাবা ডিস্ট্রিক্ট জাজ ওয়াদুদুর রহমান সত্যি-সত্যি মেয়েকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। জাজ শ্রেণীর মানুষরা কখনো খুব বেশি রাগতে পারেন না। কিন্তু তিনি রেগে গিয়েছিলেন। রাগে অন্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'কী আছে ঐ ছেলের? অভিনয় করে। অভিনয়টা আবার কি? অভিনয় হচ্ছে অনুকরণ। একটা বানরও অনুকরণ করে। তাই বলে একটা বানরকে বিয়ে করা যায়?'

লীনা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'এসব তুমি কী বলছ বাবা?'

ওয়াদুদুর রহমান সাহেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'যা বলেছি ঠিকই বলেছি। ঐ ছেলের আর আছে কী? ঘাড়ে-গর্দানে এক ছেলে। থার্ড ক্লাস পেয়েছে বি. এ- তে। ব্যাংকে চাকরি করে। ঐ চাকরির বেতন কত তুই জানিস? এগার শ' টাকা। এগার শ' টাকা দিয়ে ও নিজে খাবে, না তোকে খাওয়াবে? না কি না খেয়ে থাকবে আর অভিনয় করে দেখাবে যে খুব খাওয়া হল?'

'ছিঃ বাবা, এই ভাবে কথা বল না।'

'আমার যা বলার আমি বললাম। এখন তোর যা ইচ্ছা করবি। তোর স্বাধীন ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না। তবে এই বাড়িতে বিয়ে হবে না। বিয়ের খরচ আমি দেব। সেই টাকা আলাদা করা।'

'তোমার টাকা আমার লাগবে না বাবা।'

'নাটকের লোক বিয়ে করার আগেই নাটকের সংলাপ শুরু করেছিস। জীবন নাটক না, এটা হাড়ে হাড়ে টের পাবি। জীবন এক সময় অসহ্য বোধ হবে।'

'অভিশাপ দিচ্ছ?'

'সত্যি কথা বলছি। মাঝে-মাঝে সত্যি কথা অভিশাপের মতো মনে হয়।'

লীনার বিয়ে হল বড় খালার বাড়িতে। সেই বিয়েতে ওয়াদুদুর রহমান সাহেব এলেন না। তবে লীনার ধারণা তার বাবার অভিশাপ লাগে নি। তারা সুখী। প্রচণ্ড সুখী। টাকা পয়সার কষ্ট তো আছেই। এই কষ্ট তেমন কোনো কষ্ট নয়। সহনীয় কষ্ট। অসহনীয় কষ্ট হচ্ছে ভালবাসার অভাবের কষ্ট। সে কষ্ট লীনাদের হয় নি। লীনা এখনো তার স্বামীর প্রতি তীব্র ভালবাসা বোধ করে। ভালবাসা কখনো একপক্ষীয় হয় না। আসিফও নিশ্চয়ই তার প্রতি সমপরিমাণ ভালবাসা লালন করে। কিন্তু সত্যি কি করে?

লীনা উঠে পড়ল। আবার মাথায় কিছু পানি দিল। পাশের ঘরে ভিসিপি চলছে। যুগল সংগীত। সুর বেশ সুন্দর। কথাগুলোর মানে কি কে জানে— ও মেরা পানছেরি।

পানছেরি শব্দের মানে কি? হাশমত সাহেবকে কাল একবার জিজ্ঞেস করতে হবে। মনে থাকলে হয়। আজকাল কিছু মনে থাকে না।

বেনুর বাচ্চা জেগে উঠেছে। কাঁদছে ট্যা-ট্যা করে। বেনু তাকে নিয়ে বারান্দায় হাঁটছে আর বলছে, 'ও খুকি কান্দে না। ও খুকি কান্দে না।'

কি বিশ্রী নাম—খুকি। এর পর যদি ছেলে হয় হয়ত নাম রাখবে—খোকা।

লীনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তাদের প্রথম মেয়ের নাম সে রেখেছিল লোপামুদ্রা, পরের মেয়েটির নাম ত্রপা। ওরা কোথায় গেল? মৃত্যুর পর শিশুরা কোথায় যায়? সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশে একা একা ওরা কী করে? বাবা মার জন্যে অপেক্ষা করে কি? একদিন লীনা যখন যাবে ওরা কি তখন সেই ছোটটিই থাকবে না বড় হয়ে যাবে? যদি ছোট থাকে তাহলে কি চিনতে পারবে তাদের মাকে? মা মা বলে ছুটে আসবে তার দিকে? যদি ছুটে আসে তাহলে কাকে সে প্রথমে কোলে নেবে? লোপাকে না ত্রপাকে?

লীনার বুক জ্বালা করছে। সে দরজা খুলে বারান্দায় এল। বেনু বলল 'ঘুমান নাই আফা?'

'না।'

'দেখেন না কি বিরক্ত করে। ইচ্ছা করতাছে একটা আছাড় দেই।'

'ছিঃ এসব কী কথা। দেখি আমার কাছে দাও তো।'

বেনু তার মেয়েকে লীনার কাছে দিল। মেয়েটির কান্না থামল না। লীনা বলল, 'গরম লাগছে বোধ হয়, জামাটা খুলে দেব?'

'দেন।'

'মেয়ের তো খুব ঘামাচি হয়েছে। আমার ঘর থেকে পাউডার নিয়ে এস তো বেনু, পাউডার দিয়ে দিই।'

গায়ে পাউডার দেয়াতে হয়ত একটু আরাম হয়েছে। খুকি ঘুমিয়ে পড়েছে। হাত-পা ছড়িয়ে ঘুম। মেয়েটা দেখতে সুন্দর হয় নি। বাবার মতো ভোঁতা ধরনের চেহারা। দাঁতগুলোও সম্ভবত উঁচু—তবু কী সুন্দরই না লাগছে। মানব শিশুর মতো সুন্দর এ পৃথিবীতে আর কিছুই বোধ হয় নেই।

লীনার খুব ইচ্ছে করছে বলে—বেনু, তোমার মেয়ে আজ থাকুক আমার এখানে। তা সে বলতে পারল না। সহজ গলায় খুব সাধারণভাবে যা বলল তা হচ্ছে, 'নিয়ে যাও বেনু, ঘুমিয়ে পড়েছে।'

বেনু তার মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। লীনা ঠিক আগের ভঙ্গিতে খাটের উপর বসে আছে। পানি খেতে পারলে ভালো হত। বুক শুকিয়ে কাঠ, কিন্তু উঠতে ইচ্ছা করছে না।

পাশের ঘরে এখনো ভিসিপি চলছে। এরা কি সত্যি-সত্যি সারা রাত ছবি দেখবে নাকি! হাশমত আর বেনু দু'জনেই খুব হাসছে। এ রকম হাসাহাসির মধ্যে বাচ্চা ঘুমুবে কী করে? এই সহজ জিনিসটা বোঝে না কেন?

লীনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তার লোপার কথা মনে পড়ছে। কেমন থপ থপ করে হাঁটত। চলন্ত কোনো পোকা টোকা দেখলেই খপ করে ধরে মুখে পুরে ফেলত। সেই মুখ তখন কিছুতেই হাঁ করান যেত না। যেন পৃথিবীর সবচে লোভনীয় খাবারটি তার মুখে। এক বছর বয়সে কত কথা শিখে গেল—। কিছু কিছু কথার আবার কোনো অর্থই নেই। যেমন, ইরি কিরি মিরি মিরি।

লীনা বলত, 'এসব কোন পৃথিবীর ভাষা মা?'

লোপা তাতে আরো মজা পেত। হাত নেড়ে নেড়ে আরো অনেক উৎসাহ নিয়ে বলত, 'ইরি কিরি মিরি মিরি।'

লীনার চোখ জ্বালা করছে। সে বিছানায় উঠে বসল। কী করা যায়? কী করলে এই মেয়েটার কথা ভুলে থাকা যায়? লোপা ত্রপা এদের কথা সে কিছুতেই মনে করতে চায় না। কিছুতেই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশের ঘরে খুকি কাঁদছে। বেনুর বিরক্ত গলা শোনা যাচ্ছে। লীনা কি উঠে গিয়ে ওদের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলবে, 'বেনু, ওকে আমার কাছে দিয়ে যাও।'

নাকি চুপচাপ বিছানায় বসে থাকবে।

২

একা একা বসে থাকতে আসিফের কখনো খারাপ লাগে না।

আজ লাগছে। সোফাটায় কোনো ঝামেলা আছে কি না কে জানে। কোনোভাবে বসেই আরাম পাওয়া যাচ্ছে না। সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে—খাওয়া যাচ্ছে না। সাইন বোর্ড ঝুলছে—'ধূমপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।' চোখের সামনে এ রকম কড়া একটা সাইন বোর্ড নিয়ে সিগারেট ধরান যায় না। তা ছাড়া ঘরে ফিনাইলের গন্ধ। এই গন্ধ নাকে এলেই কেমন যেন নিজেকে অসুস্থ মনে হয়।

আসিফ ঘড়ি দেখল, বারটা দশ। যে অপারেশন এগারটায় হবার কথা সেটা এখন হবে রাত একটায়। এনেসথেসিস্ট পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি নাকি কোন বিয়ে বাড়িতে গেছেন, বলে গেছেন বারটার দিকে ফিরবেন। সেইভাবেই ব্যবস্থা হয়েছে। আসিফের বড় বোন রেহানা খুব ছটফট করছেন। একবার তিন তলায় যাচ্ছেন আবার আসছেন এক তলায়। এই ক্লিনিকটা বেশ ভালো। লিফট আছে। মাঝরাতেও লিফটম্যান আছে। রেহানা লিফটে উঠছেন না। সিঁড়ি ভেঙ্গে ওঠা-নামা করছেন। রেহানার শরীর বিশাল, কিন্তু তাতেও তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। শুধু মুখ টকটকে লাল হয়ে আছে এবং তিনি খুব ঘামছেন।

আসিফ বলল, 'তুমি শান্ত হয়ে বস তো আপা। এ রকম করছ কেন?'

'এনেসথেসিস্টতো এখনও এল না। অন্য কোনো ক্লিনিকে নিয়ে যাব?'

'এসে পড়বেন। তুমি শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছ। বস আমার পাশে। তোমার নিজের হার্ট এ্যাটাক হয়ে যাবে।'

রেহানা বসলেন না। ছটফটিয়ে আবার তিন তলায় রওনা হলেন। তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই এনেসথেসিস্ট এসে পড়ল। এক ধরনের টেনশান আসিফের মধ্যেও ছিল। এখন আর তা নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার, সোফায় বসতেও তার আরাম লাগতে শুরু করেছে। ঘুম ঘুমও পাচ্ছে। এ ভাবে বসে থাকলে ঘুম এসে যেতে পারে। আসিফ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে, ধরান যাচ্ছে না। চারদিকে আত্মীয়স্বজন। ঢাকা শহরে যেখানে যে ছিল সবাই চলে এসেছে। ক্লিনিকের সামনে ছ'সাতটা গাড়ি।

আসিফদের পাঁচ বোনের চার জনই থাকে ঢাকাতে। তারা সবাই এসেছে। তাদের আত্মীয়স্বজনরা এসেছে। হুলুস্থূল ব্যাপার। এদের প্রায় কাউকেই সে ভালোমতো চেনে না। কয়েকবার হয়ত দেখা হয়েছে, 'কি কেমন? ভালো?'—এই জাতীয় কথাবার্তা হয়েছে। এর বেশি কিছু না। বোনদের স্বামীর বাড়ির লোকজনদের সে যেমন চেনে না, ওরাও চেনে না। তবু কয়েকজন চকচকে চেহারার মানুষ আসিফকে বলল, 'কি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো?’

আসিফ খুবই পরিচিত ভঙ্গিতে হেসেছে। কথাবার্তা পর্ব এই পর্যন্তই।

এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে গার্লস হাইস্কুলের একজন দরিদ্র এ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টার তাঁর পাঁচ মেয়েকেই খুব ভালো বিয়ে দিয়েছেন, অথচ মেয়েগুলো পড়াশোনা বা দেখতে শুনতে এমন কিছু না। আসিফ তার বাবা মার পাঁচ কন্যার পরের সন্তান। শুধুমাত্র এই কারণেই যতটুকু আদর তার পাওয়া উচিত ছিল তার শতাংশও সে পায় নি। আসিফের বাবা সিরাজুদ্দিন সাহেব তাঁর সর্বশেষ সন্তানকে কঠিন হাতে মানুষ করতে শুরু করলেন। তাঁর এই ছেলে যে হীরের টুকরো ছেলে এটা তিনি সবাইকে দেখিয়ে দিতে চান। অন্য বাচ্চারা যখন এক দুই শিখছে, তখন তাঁর ছেলে শিখছে তিনের ঘরের নামতা। ক্লাশ টুতে উঠেই সে রবীন্দ্রনাথের বীরপুরুষ কবিতা গোটাটা মুখস্থ বলে লোকজনদের চমকে দিতে শিখে গেল। সিরাজুদ্দিন সাহেবও পুত্রের প্রতিভায় মুগ্ধ। বাড়িতে কেউ এলে আসিফকে তার প্রতিভার পরীক্ষা দিতে হয়। বীরপুরুষ কবিতা মুখস্থ বলবার পর সিরাজুদ্দিন সাহেব নিজেই বলেন, ‘আচ্ছা বাবা, তিন আঠার কত বল তো?’

আসিফ গম্ভীর গলায় বলে, ‘চুয়ান্ন।’ অতিথি চমকে উঠে বলেন, ‘আঠারোর ঘরের নামতা জানে না কি!’ সিরাজুদ্দিন সাহেব উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেন, ‘ইংরেজি জিজ্ঞেস করেন। বানান জিজ্ঞেস করেন। আচ্ছা বাবা, জিরাফ বানানটা কি বল তো?’

আসিফ বানান বলে। অতিথি যত না চমৎকৃত হন, বাবা হন তারচে বেশি। গম্ভীর গলায় বলেন, ‘সবই হচ্ছে ট্রেনিং। যত্ন নিতে হয়। প্রপার গাইডেন্স দরকার।’

ক্লাস এইট পর্যন্ত আসিফ প্রতিটি পরীক্ষায় ফার্স্ট হল। তারপর একদিন খুবই স্বাভাবিক গলায় বাবাকে এসে বলল, ‘আমি আর পড়াশোনা করব না বাবা।’ সিরাজুদ্দিন সাহেব হতভম্ব হয়ে বললেন, ‘সে কী!’

আসিফ সহজ স্বরে বলল, ‘আমার ভালো লাগে না বাবা।’

সিরাজুদ্দিন সাহেব থেমে থেমে বললেন, ‘আজ আর কাল এই দু’দিন পড়তে হবে না। বিশ্রাম কর। মাঝে–মাঝে বিশ্রামের প্রয়োজন আছে।’

‘বিশ্রাম না বাবা। আমি আর পড়াশোনাই করব না।’

‘টান দিয়ে কান ছিঁড়ে ফেলব হারামজাদা।’

‘কান ছিঁড়ে ফেললেও পড়ব না।’

সিরাজুদ্দিন সাহেব অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

তখন তাঁর তৃতীয় মেয়ের বিয়ের আয়োজন চলছে। বাড়ি ভর্তি মেহমান। কিছু বলা বা শাসন করার মতো মানসিক অবস্থা তাঁর নেই। তিনি অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেলেন। আসিফের মা চিররুগ্না মহিলা। সংসারের কোনো ব্যাপারেই তাঁর কোনো ভূমিকা নেই। তবু তিনি ক্ষীণ স্বরে বললেন, ‘বাদ দাও। কয়েকটা দিন যাক। ছেলে মানুষ। বয়সটা দেখবে না?’

সিরাজুদ্দিন অবাক হয়ে লক্ষ করলেন—আসিফ পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। সকালবেলা বের হয়। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘোরে। স্টার ড্রামাটিক ক্লাবে নাটকেও নাকি নাম দিয়েছে। রাত আটটা ন’টা পর্যন্ত রিহার্সেল হয়। রিহার্সেল শেষ করে সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বাড়ি ফেরে। সিরাজুদ্দিন সাহেব ছেলের দিকে তাকিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকেন আর হতভম্ব হয়ে ভাবেন এসব কী হচ্ছে? হচ্ছেটা কী?

স্টার ড্রামাটিক ক্লাবের এ্যানুয়েল নাটক হল জেলা স্কুলের মাঠে। বিরাট হৈ-চৈ। সিরাজুদ্দিন সাহেব নাটক দেখতে গেলেন। ত্রিপুরা রাজপরিবার নিয়ে জমকালো নাটক। তিন রাজকুমারের গল্প। বড় রাজকুমার, মধ্যম রাজকুমার এবং ছোট রাজকুমার। বড় এবং ছোট রাজকুমারের অত্যাচারে মধ্যম রাজকুমার জর্জরিত। একদিন তার দু'চোখ নষ্ট করে দিয়ে দুই ভাই তাকে গভীর বনে ফেলে দিয়ে এল। ক্লান্ত শ্রান্ত মধ্যম রাজকুমার যে দিকে যেতে চায় গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। কোনোমতে উঠে দাঁড়ায়, আবার ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায় এবং কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'কে কোথায় আছ? বন্ধু হও, শত্রু হও—কাছে এস ভাই। দৃষ্টিহীন, ভাগ্যহীন, আত্মীয় বান্ধবহীন মধ্যম কুমার আজ পথের ধূলায়।

মধ্যম রাজকুমারের অভিনয় দেখে সিরাজুদ্দিন সাহেব অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখ দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়তে লাগল। বুকের মধ্যে হু-হু করতে লাগল। চারদিকে প্রচণ্ড হাততালি পড়ছে। সেই শব্দ ছাপিয়ে তাঁর কানে বাজছে মধ্যম কুমারের হাহাকার—'কে কোথায় আছ? বন্ধু হও, শত্রু হও কাছে এস ভাই। দৃষ্টিহীন, ভাগ্যহীন, আত্মীয় বান্ধবহীন মধ্যম কুমার আজ পথের ধূলায়।'

গলায় একটা রুপার মেডেল ঝুলিয়ে আসিফ বাড়ি ফিরল। সিরাজুদ্দিন সাহেব আগেই পৌঁছেছেন। একা একা অন্ধকার বারান্দায় জায়নামাজে বসে আছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে গভীর চিন্তায় তিনি মগ্ন। আসিফ ঘরে ঢুকতেই তাঁর আচ্ছন্ন ভাব দূর হল। শান্ত গলায় বললেন, 'আয় আমার সাথে।'

ছেলেকে তিনি বাসার পেছনের কুয়োতলায় নিয়ে গেলেন। সহজ গলায় বললেন, 'গলার মেডেলটা খুলে কুয়ার মধ্যে ফেল।'

তাঁর কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যে আসিফ কোনো কথা না বলে মেডেল ফেলে দিল। গহীন কুয়া। মনে হল যেন দীর্ঘ সময় পর পানিতে ঝপ করে শব্দ হল।

সিরাজুদ্দিন সাহেব বললেন, 'এখন বল, আর কোনোদিন অভিনয় করব না। বল, বল হারামজাদা।'

আসিফ কিছু বলল না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সিরাজুদ্দিন সাহেব বললেন, 'বল, আর কোনোদিন অভিনয় করব না। নয়ত তোকে আজ খুন করে ফেলব। বল, হারামজাদা। বল।'

আসিফ ক্ষীণ গলায় বলল, 'কেন বাবা?'

'বল তুই। বল। নয়ত খুন করে ফেলব।'

সিরাজুদ্দিন সাহেবের চোখে-মুখে উন্মাদ ভঙ্গি। তিনি ছেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দু'হাতে চুলের মুঠি ধরে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'বল আর অভিনয় করব না। বল।'

আসিফ যন্ত্রের মতো বলল, 'আর অভিনয় করব না।'

সিরাজুদ্দিন সাহেব ছেলের মাথা কুয়ার মুখের কাছে ধরলেন। হিস হিস করে বললেন, 'বল, আবার বল। তিন বার বল।'

আসিফ বলল। গহীন কুয়া সেই শব্দ ফেরত পাঠাল। কুয়ার তল থেকে গমগমে অথচ শীতল একটি স্বর ফিরে এল। 'আমি অভিনয় করব না... অভিনয় করব না...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করব না।'

আসিফ তার কথা রেখেছিল। বাবা জীবিত থাকাকালীন সময়ে সে অভিনয় করে নি। তার জীবনের দ্বিতীয় অভিনয় সে করে বাবার মৃত্যুর এক বছর পর। গ্রাম্য কবিয়ালের একটা ভূমিকা। যে কথায় কথায় পদ বাঁধে। সেই পদ লোকজনদের বলে বলে শোনায় এবং গভীর আগ্রহে বলে, 'পদটা কেমন হইছে ভাইজান এট্রু কন দেহি। বুকের মইধ্যে গিয়া ধরে, ঠিক না? আহারে কী পদ বানছি—'

হলুদ পাখি সোনার বরণ কালা তাহার চউখ,
ছোট্ট একটা পাখির ভিতরে কত্ত বড় দুখ
ও আমার সোনা পাখিরে। ও আমার ময়না পাখিরে।

গ্রাম্য গীতিকারের অভিনয় করে সে ময়মনসিংহ শহরে একটা হৈ-চৈ ফেলে দিল। অভিনয়ের শেষে স্টেজের পেছনে গ্লাসে করে চা খাচ্ছে, জেলা স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঢুকে বললেন, 'আসিফ একটু বাইরে আস তো, ডিসট্রিক জাজ ওয়াদুদুর রহমান সাহেব তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'চা-টা শেষ করে আসি স্যার।'

'চা পরে খাবে—আস তো তুমি।'

আসিফ বাইরে এসে দেখে ওয়াদুদুর রহমান সাহেব হাতে চুরুট নিয়ে বিমর্ষ ভঙ্গিতে টানছেন। তাঁর গা ঘেঁষে লম্বা রোগামতন একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়েটির মুখে দীঘির শীতল জলের মতো ঠাণ্ডা একটা ভাব। মেয়েটি কিছু বলল না। ওয়াদুদুর রহমান সাহেব বললেন, 'ইয়াং ম্যান, তোমার অভিনয় দেখে আমার মেয়ে খুব ইমপ্রেসড। ওয়েল ডান।'

আসিফ কী বলবে বুঝতে পারল না। ওয়াদুদুর রহমান সাহেব বললেন, 'আমার মেয়ের খুব ইচ্ছা তুমি একদিন আমাদের বাসায় এসে লাঞ্চ বা ডিনার কর। আমি নিজেও খুশি হব।'

'জ্বি আচ্ছা, আমি যাব।'

'ভেরি গুড। ইয়াং ম্যান, পরে একদিন দেখা হবে, কেমন?'

আসিফ জবাব দেবার আগেই লীনা বলল, 'আপনি আজই চলুন না। আমাদের সঙ্গে গাড়ি আছে। আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেবে। প্লিজ।'

ওয়াদুদুর রহমান সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'বেচারা অভিনয় করে ক্লান্ত হয়ে আছে। আজ থাক। কোনো একটা ছুটির দিনে বরং....।'

'না বাবা আজ। ভালো লাগাটা থাকতে থাকতে ওকে বাসায় নিয়ে যেতে ইচ্ছা করছে। আপনার কি খুব অসুবিধা হবে? প্লিজ আসুন না, প্লিজ।'

আসিফ গেল। ওয়াদুদুর রহমান সাহেবের পরিবারের অন্য সবার সঙ্গে এক টেবিলে বসে ভাত খেল।

ওয়াদুদুর রহমান সাহেবের স্ত্রী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলেন—বাবা কী করেন? ভাই বোন কজন? বোনদের কোথায় বিয়ে হয়েছে? সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী পড়ছে? ম্যাট্রিক রেজাল্ট কী? আই. এ তে কী রেজাল্ট?

লীনা এক সময় বিরক্ত হয়ে বলল, 'চুপ কর তো মা। কি শুধু উকিলের মতো প্রশ্ন করছ। ওকে ভাত খেতে দাও।'

মা চুপ করলেন না। প্রশ্ন করা ছাড়াও তাঁর পরিবারের সমস্ত তথ্য দিয়ে দিলেন। তার তিন মেয়ে এক ছেলে। ছেলে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, পড়ছে নিউ জার্সি স্টেট কলেজে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে। জামাই ডাক্তার। সম্প্রতি এফ আর সি এস করেছে। এখন আছে পিজিতে। লীনা দ্বিতীয় মেয়ে। ম্যাট্রিকে চারটা লেটার এবং স্টার মার্ক নিয়ে ছেলেমেয়ে সবার মধ্যে ফিফথ হয়েছে। আই. এ-তে খুব ভালো করতে পারে নি। সায়েন্স থেকে আর্টস-এ আসায় একটু অসুবিধা হয়েছে। তবু ফার্স্ট ডিভিশন ছিল। এখন পড়ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। হলে থাকে। গরমের ছুটি কাটাতে এসেছে। ছোট মেয়েকে শান্তিনিকেতনে দিয়েছিলেন। কলাভবনের ছাত্রী। তবে ওর সেখানে থাকতে ভালো লাগছে না। গরমের সময় খুব গরম পড়ে। মেয়ের আবার গরম সহ্য হয় না।

ফেরার পথে লীনা তাকে গাড়িতে তুলে দিতে এল। নরম গলায় বলল, 'মা নিজেদের কথা বলতে খুব পছন্দ করেন। আপনি আবার কিছু মনে করলেন নাতো?'

আসিফ বলল, 'না। কিছু মনে করি নি।'

'আমি আপনার জন্যে একটা উপহার এনেছি। সবার সামনে দিতে লজ্জা লাগল। আপনি যদি এটা নেন আমি খুব খুশি হব। আপনার অভিনয় আমার কী যে ভালো লেগেছে! অনেকদিন ধরেই আমার মনটা অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে ছিল। হঠাৎ সেখানে এক ঝলক আলো পড়ল। খুব কাব্য করে কথা বলে ফেলেছি। কিছু মনে করবেন না, এই নিন।'

শাড়ির আঁচলের ভাঁজ থেকে লীনা কালো রঙের কী যেন বের করল। আসিফ বলল, 'এটা কি?'

'নটরাজের একটা মূর্তি। আমার ছোটবোন শান্তিনিকেতন থেকে আমার জন্যে এনেছিল। আমার খুব প্রিয়। আপনি নিন। আপনার টেবিলে সাজিয়ে রাখবেন। প্লিজ, প্লিজ।'

তখন আসিফের বয়স ছিল অল্প। হৃদয় আবেগে পরিপূর্ণ। রাতটাও ছিল অন্য রকম। চৈত্র মাসের রহস্যময় রাত। চারদিকে উথাল পাথাল চাঁদের আলো। পাশে নটরাজের মূর্তি হাতে দেবীর মতো এক তরুণী। তরুণীর কণ্ঠস্বর বড় স্নিগ্ধ। আসিফের চোখে জল এসে গেল। সেই জল গোপন করার কোনো চেষ্টা সে করল না। কেন যেন তার মনে হল, এই নারীর কাছে তার গোপন করার কিছুই নেই। এই নারী সর্বজ্ঞ ঈশ্বর।

নটরাজের মূর্তি আসিফ নিজের কাছে রাখে নি। রূপার মেডেলের মতো মূর্তিটি সে কূয়ায় ফেলে দিয়েছিল। কেন সে এটা করল? পৃথিবীর মতো, চৈত্র মাসের চাঁদের মতো, গহীন অরণ্যের মতো মানুষও রহস্যময়।

'ঘুমুচ্ছিস নাকি রে আসিফ?'

আসিফ চমকে উঠল। সে প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল। তার বেশ লজ্জা লাগছে। ভাগ্নির এত বড় একটা অপারেশন হচ্ছে, আর সে কি না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে। রেহানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন, 'অপারেশন হয়ে গেছে। পুতুল ভালো আছে। জ্ঞান ফিরেছে, কথা–টথা বলল।'

'বাহ্, চমৎকার তো! তুমি এখন রেস্ট নাও আপা। খুব ধকল গেছে।'

রেহানা ক্লান্ত ভঙ্গিতে আসিফের পাশে বসল। ক্লিনিকের এই ঘরটা এখন প্রায় ফাঁকা। আত্মীয়স্বজন যারা এসেছিল সবাই চলে গেছে। আসিফের মেঝো বোন এখনো আছে। সে দাঁড়িয়ে আছে ইনটেনসিভ কেয়ার ঘরটার পাশে। তারও চলে যাবার কথা। গাড়ি গিয়েছে একজনকে নামিয়ে দিতে। গাড়ি এলেই সেও চলে যাবে। এখানে থাকার আর কোনো মানে হয় না।

রেহানা বলল, 'আসিফ তুই কী করবি? থাকবি না চলে যাবি?'

'আমার অসুবিধা নেই, থাকতে পারি।'

'তোর খিদে লেগেছে বোধ হয়। রাতে তো খাস নি।'

'না খিদে লাগে নি।'

'তোর বউ কেমন আছে?'

'ভালোই।'

'অনেক দিন দেখি না। তোরা আসিস না কেন?'

'ব্যস্ত থাকি।'

'নাটক নিয়ে ব্যস্ত?'

'হুঁ।'

'কে যেন বলছিল—বউকেও নামিয়েছিস। এসব কী কাণ্ড বল তো। নিজে যা করছিস তাই যথেষ্ট, তার উপর যদি....।'

আসিফ কিছু বলল না। হাই তুলল। রেহানা বললেন, 'নাটক নাটক করে তোর লাভটা কী হয়েছে শুনি? এমন তো না যে দশটা লোক তোকে চেনে। তোর তো কিছুই হয় নি।'

'তা ঠিক।'

'এই জীবনে কোথাও স্থির হতে পারলি না। আজ এই চাকরি, কাল ঐ চাকরি। তোর বয়স হচ্ছে না?'

'হচ্ছে।'

'বয়স হলে মানুষের একটা সিকিউরিটির দরকার হয়। একটা বাড়ি। কিছু টাকা পয়সা.... তোর আছে কি?'

'এইসব বাদ দাও।'

'বাদ দাও বললেই বাদ দেয়া যায়? এই যে পুতুলের অপারেশন হল—বার তের হাজার টাকা খরচ হয়েছে। টাকা ছিল বলে খরচ করতে পেরেছি। যদি না থাকত? তোর এই রকম কিছু হলে তুই কী করবি?'

'কী আর করব? হাসপাতাল যাব। বিনা পয়সার চিকিৎসার চেষ্টা করব।'

'তুই হয়ত ভাবিস তোকে নিয়ে আমরা চিন্তা–ভাবনা করি না। এটা ঠিক না। প্রায়ই আমাদের বোনদের মধ্যে আলোচনা হয়। খুবই কষ্ট লাগে।'

'কষ্ট লাগার কি আছে?'

'কষ্ট লাগার কিছু নেই? কী বলছিস তুই! একটা বাড়িতে থাকিস, সেই বাড়ির রান্নাঘর অন্য এক জনের সঙ্গে শেয়ার করতে হয়। এটা কেমন কথা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সবার তো সব কিছু হয় না।'

'চেষ্টা করলে ঠিকই হয়। চেষ্টা না করলে হবে কীভাবে? কোনো রকম চেষ্টা নাই, বড় হবার ইচ্ছা নাই—নাটক, নাটক, নাটক।'

'এইসব বাদ দাও আপা, দেখি চা পাওয়া যায় কি না।' মাথা ভার-ভার লাগছে। চা খেলে ভালো লাগবে।'

'রাত দুপুরে চা পাবি কোথায়? চুপ করে বোস। তোর সঙ্গে দেখাই হয় না। সুযোগ পাওয়া গেল।'

আসিফ সিগারেট ধরাল। তার সত্যি-সত্যি ঘুম পাচ্ছে। সিগারেটের ধোঁয়া দিয়েও ঘুম তাড়ান যাচ্ছে না। রাত জাগার জন্যেই বোধ হয় প্রচণ্ড খিদেও লাগছে। খালি পেটে সিগারেট—নাভিতে পাক দিচ্ছে। মনে হচ্ছে বমি হয়ে যাবে।

'আসিফ।'

'বল আপা।'

'তুই আমাকে একটা সত্যি কথা বল তো।'

'বেশিরভাগ সময়ই আমি সত্যি কথা বলি।'

'তোর কি এখন চাকরি নেই?'

'এই কথা বলছ কেন?'

'তুই তোর দুলাভাইকে বলেছিস তোর জন্যে একটা কিছু দেখে দিতে। এই থেকে অনুমান করছি। তোর কি চাকরি নেই?'

'না নেই।'

'ক'দিন ধরে নেই?'

'মাস দুই।'

'তোর বউ জানে?'

'জানবে না কেন? জানে।'

'তবু তুই নাটক করবি? এর পরেও তোর শিক্ষা হয় না? তুই কি মানুষ না জানোয়ার?'

রেহানা উঠে চলে গেলেন। আসিফ একা একা বসে রইল।

বেশিক্ষণ একা বসে থাকতে হল না। রেহানা আবার এসে ঢুকলেন। তিনি খুব কঠিন কিছু কথা বলতে এসেছিলেন—বলতে পারলেন না। আসিফের বসে থাকার ভঙ্গিটি দেখে তাঁর খুব মায়া লাগল।

৩

লীনা যে স্কুলে পড়ায় তার নাম—লিটল ফ্লাওয়ার্স। ইংরেজি স্কুল। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। নানান কায়দা কানুন। সপ্তাহে সপ্তাহে পরীক্ষা। মাসে একবার আউটিং।

আজ সেই আউটিংয়ের দিন। লীনাকে ক্লাস ওয়ানের ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেতে হবে সাভার স্মৃতিসৌধে। একটা মাইক্রোবাস জোগাড় করা হয়েছে। লীনার সঙ্গে যাচ্ছে অতসী দি। গেম টিচার। মাইক্রোবাসে ওঠবার ঠিক আগ মুহূর্তে লীনা অতসীকে বলল,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার না শরীরটা খুব খারাপ লাগছে অতসী দি।'

অতসী বলল, 'যেতে চাও না?'

'না। শরীরটা খুবই খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে ফেইন্ট হয়ে যাব।'

অতসী বলল, 'তুমি কি কনসিভ করেছ নাকি?'

লীনা জবাব দিল না। এসব নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগে না অথচ বিবাহিত মেয়েরা কত স্বাভাবিক ভাবেই না এসব নিয়ে আলাপ করে। লীনার মাঝে-মাঝে মনে হয়—তার মধ্যে কিছুটা অস্বাভাবিকতা আছে।

'তুমি এখন না গেলে বড় আপা খুব রাগ করবেন।'

'শরীরটা খুব খারাপ লাগছে অতসী দি।'

'তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি। দাঁড়াও, আপার সঙ্গে আলাপ করে আসি।'

লীনা ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইল। বাচ্চাগুলো মাইক্রোবাসে উঠে বসে আছে। কোনো সাড়াশব্দ করছে না, যেন একদল রোবট। ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে এদের রোবট বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। হুকুম ছাড়া এরা মুখ খুলবে না। এর কোনো মানে হয়। শিশুরা থাকবে শিশুদের মতো। হৈ-চৈ করবে, মারামারি করবে, কাঁদবে, হাসবে।

অতসী ফিরে এসে বলল, 'ব্যাপার সুবিধার না লীনা। বড় আপা খুব রেগে গেছে। তুমি যাও শুনে আস।'

প্রিন্সিপ্যাল জোবেদা আমিন সত্যি-সত্যি রেগেছেন। লীনাকে ঢুকতে দেখে তিনি শুকনো গলায় বললেন, 'বোস।' বলেই টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'হ্যালো, প্রিন্সিপ্যাল জোবেদা আমিন বলছি....'

এইসব কেজি স্কুলগুলোর প্রধানরা বিচিত্র কারণে প্রিন্সিপ্যাল পদবী নেন। কেজি স্কুলগুলোতে কোনো হেডমিসট্রেস নেই। সব প্রিন্সিপ্যাল। এরা কথা-বার্তায় সত্তুর ভাগ ইংরেজি বলেন। অদ্ভুত ধরনের ইংরেজি।

'লীনা।'

'জ্বি আপা।'

'আপনি এসব কী শুরু করেছেন বলুন তো?'

'তেমন কিছু তো শুরু করি নি আপা। শরীরটা ভালো না, এটাই বলছি।'

'একটা এ্যারেঞ্জমেন্ট সম্পূর্ণ হবার পর আপনারা বলবেন শরীর খারাপ, তাহলে কী করে হবে বলুন? আর এই শরীর খারাপ ব্যাপারটাও তো নতুন না। দুদিন পর-পর শুনছি শরীর খারাপ। এ ভাবে তো আপনি মাস্টারি করতে পারবেন না। আপনি বরং অন্য কোনো প্রফেসন খুঁজে বের করুন যেখানে তেমন কাজকর্ম নেই।'

লীনা উঠে দাঁড়াল।

জোবেদা আমিন ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'যাচ্ছেন কোথায়?'

'বাসায় চলে যাব। শরীরটা ভালো লাগছে না।'

জোবেদা আমিন কঠিন চোখে তাকিয়ে আছেন। লীনার খুব ইচ্ছা করছে বলে, 'আপনি কি আপা কখনো লক্ষ করেছেন যে আপনার গোঁফ আছে? গায়ের রঙ কালো বলে তেমন বোঝা যাচ্ছে না। ফর্সা হলে রোজ শেভ করতে হত।'

কথাটা বলা হল না। লীনা বাসায় চলে এল। বাসায় এসেই শরীর খারাপ ভাবটা কেন জানি কেটে গেল। সে বেনুর সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করল। খুকিকে গামলায় পানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে গোসল করিয়ে দিল।

দুপুরে দরজা জানালা বন্ধ করে খানিকক্ষণ ঘুমুল। ঘুম ভাঙার পর মনে হল আসিফ থাকলে বেশ হত। দু'জন মিলে বিকেলে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যেত। মিরপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন কিংবা বলধা গার্ডেন।

আসিফকে আজকাল কাছেই পাওয়া যায় না। বেচারা চাকরির জন্যে ব্যস্ত হয়ে সারাদিন ঘোরে। কোথায় কোথায় ঘোরে, কার কাছে যায় কে জানে।

আজ অবশ্যি আসিফ চাকরির সন্ধানে ঘুরছিল না। সে চুপচাপ টেলিভিশন রিহার্সেল রুমে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত ঋণপ্রার্থী লোকটির ক্ষুদ্র ভূমিকা নিতে সে রাজি হয়েছে। কৌতূহল থেকেই রাজি হয়েছে। দেখাই যাক না টিভি অভিনয় ব্যাপারটা কি? টেলিভিশন এখন অতি শক্তিশালী একটি মাধ্যম। একে উপেক্ষা করার প্রশ্নই ওঠে না।

অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সবাই এসে গেছেন। আসিফ এদের কাউকে চিনতে পারছে না। তার ঘরে টিভি নেই। টিভি তারকারা তার কাছে অপরিচিত।

প্রযোজক এলেন পাঁচটার দিকে। মধ্যবয়স্ক এক জন ভদ্রলোক। হাসি-খুশি ধরনের মানুষ। ঘরে ঢুকেই কি একটা রসিকতা করলেন। কেউ হাসল না। আসিফ কী করবে বুঝতে পারল না। এই ভদ্রলোক এখন মনে হচ্ছে তাকে চিনতে পারছেন না। একবার চোখে চোখ পড়ল, তিনি চোখ সরিয়ে নিলেন।

সবাইকে স্ক্রিপ্ট দিয়ে দেয়া হয়েছে। আসিফ কোনো স্ক্রিপ্ট পেল না। ছোট রোলের আর্টিস্টদের হয়ত স্ক্রিপ্ট দেয়া হয় না। কিন্তু সংলাপগুলোতো জানতে হবে।

আসিফ উঠে দাঁড়াল; বেশ খানিকটা দ্বিধা নিয়ে এগিয়ে গেল প্রযোজকের দিকে। প্রযোজক তাকে এইবার মনে হল চিনতে পারলেন। হাসিমুখে বললেন, 'ভেরি সরি ভাই, একটা সমস্যা হয়েছে।'

আসিফ বলল, 'কি সমস্যা?'

'লাস্ট মোমেন্টে নাটকে কিছু কাট-ছাঁট করা হয়েছে। ষাট মিনিটের বেশি হয়ে যাচ্ছিল, কাজেই বাধ্য হয়ে—আপনি ভাই কিছু মনে করবেন না। নেক্সট নাটকে দেখব আপনাকে একটা রোল দেয়া যায় কি না।'

আসিফের কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে। সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে। সবার চোখে- মুখে সহানুভূতির ছায়া। আসিফ বলল, 'আমি তাহলে যাই?'

প্রযোজক বললেন, 'বসুন না, চা খেয়ে যান। একটা রিডিং হবার পরই চা আসবে।'

আসিফ নিজের জায়গায় এসে বসল। এরকম একটা পরিস্থিতিতে চট করে চলে যাওয়া যেমন মুশকিল, আবার বসে থাকাও মুশকিল।

রিহার্সেল শুরু হয়েছে। রিহার্সেলের ধরনটা অদ্ভুত। সবাই নিজের নিজের জায়গায় বসে রিডিং পড়ে যাচ্ছে। একেক জনের পড়া হয়ে যাওয়া মাত্র সে পাশের জনের সঙ্গে গল্প করছে। মনে হচ্ছে পুরো নাটকটার ব্যাপারে কারো কোনো আগ্রহ নেই। নিজের অংশটা হয়ে গেলেই যেন দায়িত্ব শেষ।

একজন অভিনেতা পড়ার মাঝখানেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমিতো ভাই আর থাকতে পারছি না। জরুরি এ্যাপয়েন্টমেন্ট।' প্রযোজক তাঁকে রাখতে চেষ্টা করছেন। তিনি রাজি হচ্ছেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসিফ মনে মনে ভাবল—অতটা অনাগ্রহ নিয়ে এরা নাটক কেন করে? তার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

৪

বজলু ভাই রাগী গলায় বললেন, 'এসব তুমি কী বলছ—লীনা আসবে না মানে? এর মানেটা কি?'

আসিফ বলল, 'লীনার শরীরটা ভালো না। ক'দিন ধরেই শরীর খারাপ যাচ্ছে।'

'কালই তো দেখলাম ভালো।'

'বাইরে থেকে ভালো মনে হয়েছে। আসলে ভালো না।'

'সবাই যদি এ রকম অসুখ-বিসুখ বাঁধিয়ে বসে থাকে তাহলে নাটক চলবে কী ভাবে? নাটক-ফাটক বন্ধ করে চল বাসায় চলে যাই।'

'প্রক্সি দিয়ে কোনো মতে চালিয়ে নিন।'

'প্রক্সি দিয়ে এইসব হয়? প্রত্যেকের তার নিজের রোল আছে, প্রক্সিটা দেবে কে? মুভমেন্ট সিনক্রোনাইজ করতে হবে না?'

'বজলু ভাই, আপনার সঙ্গে একটু আড়ালে কথা বলা দরকার। আসুন বাইরে যাই।'

'আমার সঙ্গে আবার আড়ালে কথা কি? ফিসফিসানি, গুজগুজানি এর মধ্যে আমি নেই। চল কোথায় যাবে।'

দু'জন রাস্তায় চলে এল। বজলু সিগারেট ধরালেন। তাঁর প্রেসার আছে। অল্পতেই প্রেসার বেড়ে যায়। সামান্যতম টেনশান সহ্য করতে পারেন না। এখন তাঁর টেনশান খুব বেড়েছে। আসিফ কী বলবে কে জানে।

'একটা সমস্যা হয়েছে বজলু ভাই।'

'কী সমস্যা?'

'লীনা অভিনয় করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'কী বলছ তুমি এসব!'

'ওর শরীরটা খারাপ।'

'শরীর খারাপ, শরীর ঠিক হবে। চিরজীবন কারোর শরীর খারাপ থাকে? আজ রাতটা রেস্ট নিক। দরকার হলে আগামীকালও রেস্ট নেবে। আজ রিহার্সেলের পর আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখে আসব।'

'ওর বাচ্চা হবে বজলু ভাই। আপনি তো ওর অবস্থাটা জানেন। এর আগে দুটো বাচ্চা মারা গেছে। জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই বাচ্চাগুলো মরে যায়। ডাক্তাররা বলছে—পুরো রেস্টে থাকতে।'

'তুমি তো ভয়াবহ খবর দিলে আসিফ। আমার তো মনে হচ্ছে হার্ট এ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে। শো পিছিয়ে দিতে হবে। এ তো মাথায় বাড়ি।'

'শো পেছানোর দরকার নেই। অন্য কাউকে এই রোলটা দিন। এটা তো খুব কমপ্লিকেটেড রোল নয়। যে কেউ পারবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এটা কি সাপ লুডু খেলা যে, যে কেউ পারবে। ফালতু কথা আমার সঙ্গে বলবে না তো। যে কেউ পারবে। যে কেউ পারলে তো কাজই হত।'

'ঐ দিন যে মেয়েটি এসেছিল—পুষ্প, ও পারবে, ওকে....

'মাথাটা তোমার কি খারাপ হয়ে গেল নাকি? অভিনয়ের অ জানে না যে মেয়ে, গলা দিয়ে স্বর বের হয় না...।'

'আমি ওকে শিখিয়ে-পড়িয়ে ঠিক ঠাক করে দিতে পারব।'

'আমার কাছ থেকে একটা জিনিস শিখে রাখ—ছবি আঁকা, গান গাওয়া আর অভিনয়, এই তিন জিনিস শেখান যায় না—ভেতরে থাকতে হয়।'

'ঐ মেয়ের মধ্যে অভিনয় আছে। খুব সহজে মেয়েটা ইনভলভড হতে পারে। অভিনয় দেখতে দেখতে মেয়েটা কাঁদছিল।'

'অভিনয় দেখেই যে কেঁদে ফেলে, সে আবার অভিনয় করবে কি?'

'কে অভিনয় পারবে, কে পারবে না, এটা আমি বুঝি বজলু ভাই। লীনাকে আমি অভিনয়ে নিয়ে এসেছিলাম। লীনা কিন্তু আগে কোনোদিন করে নি।'

'মেয়েটা রাজি হবে কি না কে জানে। যেতে বলছ?'

'হ্যাঁ বলছি।'

'এখনই চলে যাই—মীনাকে সাথে নিয়ে যাই। ওই প্রথম দিন মেয়েটিকে এনেছিল। তুমি বরং থার্ড সিন শুরু করে দাও।'

বজলু আরেকটা সিগারেট ধরালেন। তাঁর টেনশান যেমন দ্রুত আসে তেমনি দ্রুতই চলে যায়। এখন টেনশান একেবারেই নেই।

'আসিফ, শো কি সময় মতো যাবে?'

'অবশ্যই যাবে।'

'টেনশান ফিল করছি।'

'টেনশানের কিছু নেই।'

'জাতীয় উৎসব, বড় বড় দল আসবে। কোলকাতা থেকেও নাকি দুটো টিম আসছে।'

'আসুক না।'

'তোমাকে সত্যি কথা বলি আসিফ, নাটকটা আমার কাছে বেশি সুবিধার মনে হচ্ছে না। কোনো কনফ্লিক্ট নেই। রিলিফ নেই। ক্লাইমেক্স নেই।'

'জিনিস কিন্তু ভালো।'

'ভালোর তুমি কী দেখলে?'

'প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্বপ্ন স্বপ্ন ব্যাপার আছে। কঠিন কিছু কথা খুব নরম করে বলা।'

'নরম করে বললে এই দেশে কিছু হয় না। শক্ত করে বলতে হয়। পাছায় লাথি দিতে হয়।'

'সবাই তো পাছায় লাথি দেয়া নাটক নিয়ে যাবে। আমরা না হয় একটা নরম নাটক নিয়ে যাই। নরম হলেও এটা খুব নামকরা নাটক বজলু ভাই। কবি এমিলি জোহানের কাব্যনাটক। বাংলায় ভাবানুবাদ করা। সত্যি করে বলুন তো আপনার ভালো লাগে না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আর আমার ভালো লাগা। তোমাকে আরেকটা সত্যি কথা বলি আসিফ, আজ পর্যন্ত কাউকে বলি নি। তোমাকে বলছি—নাটক ভালো না মন্দ এটা আমি বুঝি না। আমি শুধু বুঝি—অভিনয় ঠিকমতো হচ্ছে কি না।'

'আপনি সবই বোঝেন। শুধু বোঝেন বললে কম বলা হবে, খুব ভালোই বোঝেন। দেখুন বজলু ভাই, আমি মানুষটা খুব অহংকারী, আমি অভিনয় ভালো করি। নিজে সেটা জানি—অভিনয়ের ব্যাপারে আমি কারোর কোনো উপদেশ শুনি না, কিন্তু আপনার কথা আমি শুনি। বজলু ভাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে, আপনি চলে যান।'

রিহার্সেল শুরু হতে খানিকটা দেরি হল। প্রণব বাবুর বড় মেয়ে বৃত্তি পেয়েছে, সেই উপলক্ষে তিনি প্রচুর খাবার-দাবার এনেছেন। হৈ-হৈ করে খাওয়াদাওয়া হচ্ছে। গ্রুপের মেয়েরা কেউ নেই—সবাই বজলু সাহেবের সঙ্গে পুষ্প মেয়েটির কাছে গেছে। এই সুযোগে জলিল সাহেব আদিরসের দুটো গল্প বলে ফেললেন। দুটোর মধ্যে একটা হিট করল। কারোর হাসি আর থামতেই চাচ্ছে না। এই দলটিকে দেখলে কে বলবে এদের জীবনে কোনো দুঃখ-কষ্ট আছে? এদের দেখে মনে হচ্ছে গভীর আনন্দে এদের হৃদয় পরিপূর্ণ। রিহার্সেলের ঘরে এরা যখন ঢোকে জীবনের সমস্ত হতাশা ও বঞ্চনা পেছনে ফেলে ঢোকে। নাটক তাদের দ্বিতীয় জীবন। এই জীবনটাকেই তারা আঁকড়ে ধরে। দ্বিতীয় জীবনই এক এক সময় প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয় দৃশ্য শুরু হল। এটিও রাতের দৃশ্য। লেখক শোবার ঘরে। বিছানায় বসে আছেন। পাশেই তাঁর স্ত্রী—কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। লেখক লিখে যাচ্ছেন। হঠাৎ একটা শব্দ হল। লেখক চমকে তাকালেন—ঘরের মধ্যে কে যেন দাঁড়িয়ে। যে দাঁড়িয়ে, তার চেহারা ভালো না। সে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ। তার নাম ছলিমুদ্দিন। ছলিমুদ্দিনের ভূমিকায় অভিনয় করছেন প্রণব বাবু।

লেখক অবাক হয়ে ছলিমুদ্দিনকে দেখছেন। চিনতে পারছেন না। এই গভীর রাতে শোবার ঘরে লোকটা কোত্থেকে এল বুঝতে পারছেন না। তিনি খানিকটা ভীত।

লেখক   কে কে কে?

ছলিমুদ্দিন   আস্তে। চেঁচাবেন না। আপনার স্ত্রী জেগে উঠতে পারেন।

লেখক   কে কে? আপনি কে?

ছলিমুদ্দিন   চিনতে পারছেন না? কি অদ্ভুত কথা। নিজের সৃষ্টি করা চরিত্র নিজেই চিনতে পারছেন না। ভালো করে তাকিয়ে দেখুন, জীবন যুদ্ধে পরাজিত, ক্লান্ত শ্রান্ত একজন মানুষ, আজ সারাদিন যার খাওয়া হয় নি। যার প্রেমিকা অন্য এক পুরুষের হাত ধরে....

লেখক : ও আচ্ছা, আপনি ছলিমুদ্দিন!

ছলিমুদ্দিন   হ্যাঁ ছলিমুদ্দিন। আপনি আমার জন্যে একটা ভালো নাম পর্যন্ত খুঁজে পান নি। নাম দিয়েছেন ছলিমুদ্দিন। সুন্দর, শোভন, আনন্দদায়ক কিছুই আপনি আমার জন্যে রাখেন নি। একটি ভালো নাম কি আমার হতে পারত না?

লেখক   না, পারত না। আপনার জন্ম হয়েছে কৃষক পরিবারে। আপনার বাবা একজন বর্গাদার। সে তার পুত্রদের এ রকম নামই রাখবে। একজন কৃষক তার পুত্রের নাম নিশ্চয়ই আবরার চৌধুরী রাখবে না।

ছলিমুদ্দিন   আপনি ইচ্ছা করলে সবই সম্ভব। কলম আপনার হাতে। আপনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইচ্ছা করলেই কোর্টে এফিডেভিট করে আমার নাম পাল্টে আবরার চৌধুরী করতে পারেন। আপনি ইচ্ছা করলেই বিদেশি কোনো কোম্পানিতে আমার চমৎকার একটা চাকরি হতে পারে। ছলিমুদ্দিন নামটা যদি আপনার এতই প্রিয় হয়, বেশ তো আপনার ড্রাইভারের ঐ নাম দিয়ে দিন।

লেখক : তা সম্ভব নয়।

ছলিমুদ্দিন কেন সম্ভব নয়? একের পর এক আপনার কারণে আমি জীবন যুদ্ধে পরাজিত হচ্ছি। কেন আপনি এ রকম করছেন?

লেখক এ রকম করছি কারণ, তোমার মাধ্যমে আমি সমাজকে তুলে আনছি। তুমি আলাদা কেউ নও। তুমি এই সমাজেরই একজন প্রতিনিধি। তোমাকে দেখে পাঠক চমকে উঠবে। ঘা খাবে।

ছলিমুদ্দিন : আপনি আমাকে তুমি করে বলছেন কেন? নিজের লেখা পড়ে দেখুন, বয়সে আমি আপনার চেয়ে বড়। এ জীবনে তো আপনি আমাকে কিছুই দেন নি। সামান্য সম্মানটুকু অন্তত দিন।

লেখক : আমার ভুল হয়েছে। ক্ষমা করবেন। এখন থেকে আপনি করে বলব।

ছলিমুদ্দিন ধন্যবাদ, আপনাকে যতটা হৃদয়হীন মনে করেছিলাম তত হৃদয়হীন আপনি নন। এটাই যখন করলেন তখন আরেকটু করুন। আমার প্রেমিকাকে আপনি ফিরিয়ে দিন। অর্থ বিত্ত, কিছুই চাই না। আমি পথে-পথে না খেয়ে ঘুরতে রাজি আছি। আপনি শুধু আমার প্রেমিকাকে ফেরত দিন।

লেখক তা হয় না।

ছলিমুদ্দিন অবশ্যই হয়। আপনি নিজে তো আপনার স্ত্রীকে পাশে নিয়ে আরাম করে বসে আছেন। আমি কেন বসব না? সমাজ দোষ করতে পারে, রাষ্ট্র দোষ করতে পারে—আমি তো কোনো দোষ করি নি। আমি কেন শাস্তি পাব?

লেখক এই পচা সমাজে নির্দোষ যারা, তারাই শাস্তি পায়।

ছলিমুদ্দিন সমাজ করুক। আপনি কেন করবেন? আপনি মানবপ্রেমিক এক জন লেখক। আপনি আমার প্রতি করুণা করুন। আপনি শেষের কুড়িটা পাতা ছিঁড়ে ফেলুন। আবার নতুন করে লিখুন। এর মধ্যে আমি আপনার জন্যে চা বানিয়ে নিয়ে আসছি।

লেখক আপনাকে হাত জোড় করে অনুরোধ করছি, আপনি এ ঘর থেকে যান।

ছলিমুদ্দিন না, আমি যাব না।

লেখক যাবেন না মানে?

ছলিমুদ্দিন মানে হচ্ছে, যাব না। প্রয়োজন হলে আপনাকে খুন করব।

লেখক : খুন করবেন!

ছলিমুদ্দিন : হ্যাঁ। অস্ত্র নিয়ে এসেছি—এই দেখুন। এগার ইঞ্চি ছোরা। এটা সোজা আপনার পেটে বসিয়ে দেব। আমি কেন আত্মহত্যা করব? আমার কি দায় পড়েছে?

লেখক (ভয় পেয়ে) জরী, জরী, একটু ওঠ তো। এই জরী।

নাটক এক পর্যায়ে থেমে গেল। বজলু সাহেব ফিরে এসেছেন। পুষ্প তার সঙ্গে আছে। পুষ্পের চোখ মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। বজলু সাহেব অতিরিক্ত গম্ভীর। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, 'এই মজনু, চা দে।' আসিফ স্টেজ থেকে নেমে এল। বজলু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে নিয়ে বাইরের বারান্দায় চলে গেলেন। তিক্ত গলায় বললেন, 'অপমানের চূড়ান্ত হয়েছি। শালার নাটক–ফাটক ছেড়ে দেব।'

আসিফ বলল, 'মেয়েকে তো নিয়েই এসেছেন দেখতে পাচ্ছি।'

'ভেতরের ঘটনা জানলে এটা বলতে না। আমি নাটকের কথাটা বলতেই বাড়িতে আগুন ধরে গেল। সবাই এমন ভাব করতে লাগল, যেন আমি একজন মেয়ের দালাল। বুড়োমতো এক লোক, সম্ভবত মেয়ের চাচা–টাচা কিছু হবে, সরু গলায় বলছে, 'এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি।' রাগে আমার গা জ্বলে গেল। ব্যাটা বলে কী? আমি কি অভদ্রলোক নাকি?'

'রাজি করালেন কী ভাবে?'

'আমাকে কিছু করতে হয় নি, মেয়ে নিজেই উল্টে গেল। সে নাটক করবেই। কান্নাকাটি করে বিশ্রী এক কাণ্ড, এমন অবস্থা যে চলেও আসতে পারি না। বসেও থাকতে পারি না। ব্যাঙের সাপ গেলার মতো অবস্থা। এরকম সুপার ইমোশনাল মেয়ে নিয়ে কাজ করা যাবে না। শুধু শুধু পরিশ্রম।'

আসিফ বলল, 'আমি মেয়েটার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলি। তারপর ছ' নম্বর দৃশ্যটা হোক। বাড়তি লোক চলে যেতে বলুন। মেয়েটা পারবে কী পারবে না আজই বোঝা যাবে।'

'তোমার মনে হয় পারবে?'

'হ্যাঁ পারবে। ভালোই পারবে।'

আসিফ পুষ্পকে বলল, 'এস আমরা ঐ কোণার দিকে গিয়ে বসে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করি। গল্পগুজব করলে টেনশান কমবে। অভিনয় করা সহজ হবে।'

'আমার মধ্যে কোনো টেনশান নেই।'

'আছে। যথেষ্ট আছে। টেনশানের সময় মানুষ খুব উঁচু পর্দায় কথা বলে; তুমিও তাই বলছ। এস আমার সঙ্গে।'

পুষ্প এগিয়ে গেল। আসিফ বলল, 'চা খাবে?'

পুষ্প বলল, 'না।'

'একটু খাও। চা খাবার সময় মানুষ একটা কাজের মধ্যে থাকে। কাজের মধ্যে থাকলে আপনাআপনি মানুষ খানিকটা ফ্রি হয়ে যায়। তখন কথাবার্তা সহজ হয়।'

'এত কিছু আপনি জানেন কী ভাবে!'

'রাত–দিন তো এটা নিয়েই ভাবি। কাজেই কিছু কিছু জানি।'

পুষ্প চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'আপনার কি মনে হয় আমি পারব?'

'অবশ্যই পারবে। যারা অভিনয় করে না, তারা মনে করে অভিনয় ব্যাপারটা বুঝি খুবই কঠিন। আসলে তা না। অভিনয় খুবই সহজ।'

'আপনি আমাকে সাহস দেয়ার জন্যে এটা বলছেন।'

'মোটেই না। তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। মনে কর তুমি এক জনের চরিত্রে অভিনয় করছ। অভিনয়ের অংশটা হচ্ছে প্রিয়জনের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর তোমার রিএ্যাকশান। এখন দেখ এই অভিনয়ের কোনো সেট প্যাটার্ন নেই। পৃথিবীতে অসংখ্য ধরনের মানুষ। একেক জন মানুষ মৃত্যুর খবর একেকভাবে নেবে। এর যে কোনো একটা করলেই হল। তুমি গড়াগড়ি করে কাঁদলেও ঠিক আছে, আবার স্তব্ধ হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলেও ঠিক আছে।'

'এত সোজা?'

'হ্যাঁ, এই অংশটা সোজা। তবে সবচে কঠিন কাজ হচ্ছে, একবার একটা প্যাটার্ন নিয়ে নিলে গোটা নাটকে তা বজায় রাখতে হবে। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'এই নাটকে তুমি বালিকা বধূর চরিত্রে অভিনয় করছ। ঐ চরিত্রের একটা প্যাটার্ন তোমাকে তৈরি করতে হবে। কোনটা তুমি নেবে? সবচে সহজটা নাও, যেটা তুমি জান।'

'কোনটা আমি জানি?'

'তোমার নিজের চরিত্র তুমি জান। ঐ চরিত্রটাই তুমি স্টেজে নিয়ে আসবে। মঞ্চে তুমি দেখবে তোমার স্বামীকে। এই স্বামী কিন্তু মিথ্যা স্বামী না। মঞ্চে সে তোমার সত্যিকার স্বামী। এটা যখন তোমার মনে হবে তখনই তুমি পাশ করে গেলে।'

'আমার ভয় ভয় লাগছে।'

'কোনো ভয় নেই। তুমি সংলাপগুলো একটু দেখে নিয়ে মঞ্চে যাও, আমি তোমার ভয় কাটিয়ে দিচ্ছি।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'পুষ্প, আরেকটা কথা তোমাকে বলি শোন, এটাও খুব জরুরি। রিহার্সেলে রোজ বালিকা বধূর মতো সেজে আসবে। এতে সাহায্য হয়। ঘরোয়া ধরনের শাড়ি পরবে, চুলগুলো খোলা রাখবে। একটু পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে ফেলবে। কাঁচের চুড়ি আছে না তোমার? হাতে বেশ কিছু কাঁচের চুড়ি পরে নিও। কথা বলার সময় হাত নাড়বে; চুড়ির ঝনঝন শব্দ হবে—এতে খুব সাহায্য হবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'এখন যাও নাটকটা একটু পড়। ছোট্ট দৃশ্য। দু'তিনবার পড়লেই মনে এসে যাবে। তোমার ভয়টা একটু কমেছে, না ভয় এখনো আছে?'

'এখনো আছে।'

'থাকবে না।'

দৃশ্যটা আসলেই ছোট। এই দৃশ্যেও লেখকের স্ত্রী লেখকের সঙ্গে রসিকতা করতে থাকে। লেখক ক্রমেই রেগে যেতে থাকে। এক সময় রাগ অসম্ভব বেড়ে যায়। সে তার স্ত্রীর গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে যে লেখক হতভম্ব হয়ে যান। গভীর বিস্ময় ও গভীর বেদনা নিয়ে লেখকের স্ত্রী লেখকের দিকে তাকান। লেখক এসে জড়িয়ে ধরেন তাঁর স্ত্রীকে। দু'হাতে স্ত্রীর মুখ তুলে চুমু খান তাঁর ঠোঁটে। পুষ্পের কেমন জানি লাগছে। সত্যি কি চুমু খাবে? সত্যি জড়িয়ে ধরবে? পুষ্পের গা কাঁপছে, খুব অস্থির-অস্থির লাগছে। তার ইচ্ছা করছে সে চেঁচিয়ে বলে—আমি এই দৃশ্য করব না। আবার করতেও ইচ্ছা করছে। স্বামীর প্রতি তার খুব রাগ লাগছে, আবার খুব মমতাও লাগছে। এ রকম এক জন লেখক স্বামী যদি তার হত তাহলে বেশ হত। তার ভাগ্যে কি আর এ রকম কেউ আসবে? হয়ত এলেবেলে ধরনের কারো সঙ্গে বিয়ে হবে। রাত জেগে গল্প করার বদলে সে হয়ত ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমুবে। ঘুমের ঘোরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারী একটা পা তুলে দেবে তার গায়ে।

আসিফ মঞ্চে এসে দাঁড়াল। সহজ স্বরে বলল, 'এস শুরু করা যাক।' বলেই সে বদলে গেল। পুষ্প মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখল এই লোকটা নিমিষের মধ্যে কি করে যেন বদলে গিয়ে লেখক হয়ে গেল। লেখক এবং তার স্বামী। খুবই নিকটের কেউ।

লেখক : অসাধারণ একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে জরী। অসাধারণ উপন্যাসের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এটা শুরু হবে। একটা শহর। মনে করা যাক—এই ঢাকা শহর। এর উপর ঝড় আসছে, প্লাবন আসছে, মহামারী আসছে। শুধু মৃত্যু আর মৃত্যু। কেমন হবে বল তো?

জরী খুব ভালো হবে।

লেখক একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়—প্রথমে ঝড়, তারপর বন্যা, তারপর.....

জরী একটা ভূমিকম্প দিয়ে দাও।

লেখক : রাইট, ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম।

জরী বিরাট একটা ভূমিকম্প হোক। সেই ভূমিকম্পে পুরো ঢাকা শহর তলিয়ে যাক।

লেখক ঠাট্টা করছ?

জরী : না, ঠাট্টা করছি না। একদিন দেখা যাবে যেখানে ঢাকা শহর ছিল, সেখানে বিরাট একটা হ্রদ।

লেখক কী বলছ তুমি!

জরী আমরা সেই হ্রদের পাশে ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘর বানাব। আমাদের একটা নৌকা থাকবে। নৌকায় করে আমরা হ্রদে ঘুরব।

[লেখক প্রচণ্ড রাগে স্ত্রীর গালে চড় বসিয়ে দিলেন। পরমুহূর্তেই স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বলছেন।]

লেখক প্লিজ, জরী প্লিজ। আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি ভুল করে ফেলেছি।

অভিনয় শেষ হয়েছে। আসিফ এখনো পুষ্পকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। হাতের বাঁধন এতটুকুও আলগা না করে সে বলল, 'মজনু গ্লাসে করে পানি আন তো, মেয়েটা ফেইন্ট হয়ে গেছে।'

আসিফ খুব সাবধানে পুষ্পকে টেবিলে শুইয়ে দিয়ে সহজ গলায় বলল, 'বজলু ভাই, খুব বড় মাপের এক জন অভিনেত্রী পেয়ে গেলেন। আপনার উচিত আমাকে মিষ্টি খাওয়ানো।'

বজলু ভাই মানিব্যাগ বের করে সত্যি-সত্যি এক শ' টাকার একটা নোট বের করলেন মিষ্টির জন্যে।

পুষ্প টেবিলে উঠে বসে ঘোর লাগা চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে। আসিফের দিকে চোখ পড়তেই আসিফ বলল, 'তুমি যে কত ভালো করেছ তুমি নিজেও জান না।'

পুষ্প কিছু বুঝতে পারছে না। সব কিছু তার কেমন জানি এলোমেলো হয়ে গেছে। এই জায়গাটা কী? তাদের বাসা? নাকি অন্য কোনো জায়গা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

হাশমত আলি বিকেলে বাজার করে ফিরেছে। সস্তায় পেয়েছে দুটো বিশাল সাইজের ইলিশ। বৈশাখ মাসের শুরু—ইলিশ মাছে স্বাদ এসে গেছে। এই সময়ে এত সস্তায় ইলিশ পাওয়ার কথা না। ভাগ্যক্রমে পাওয়া গেছে।

বারান্দায় মাছ কাটা হচ্ছে। বটিটা বেশ ধারাল—কচ-কচ করে কেটে যাচ্ছে। দেখতে ভালো লাগছে। খুকিকে কোলে নিয়ে হাশমত আলি মুগ্ধ চোখে মাছ কোটা দেখছে। তার জীবনের এটা একটা আনন্দঘন মুহূর্ত।

লীনা চায়ের কাপ হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। হাশমত বলল, 'ভাবি মাছ দেখলেন? পেটটা কেমন গোল। এর স্বাদই অন্যরকম। রাতে আমাদের সঙ্গে খাবেন ভাবি, মনে থাকে যেন।'

লীনা বলল, 'আমি তো খেতে পারব না। আপনার ভাইকে খাইয়ে দেবেন। আমি একটু মার বাসায় যাচ্ছি।'

'তাহলে এগ্নি-এগ্নি এক টুকরা মাছ খান। বেনু ভেজে দেবে।'

'না ভাই থাক।'

'এক মিনিট লাগবে। ইলিশ মাছ ভাজা হতে এক মিনিটের বেশি লাগে না।'

'আমার ইচ্ছা করছে না। শরীরটা ভালো না। ফ্রিজে থাকুক। একসময় খাব।'

'ফ্রেস জিনিস তো আর পাচ্ছেন না ভাবি।'

'ফ্রেস জিনিস তো সব সময়ই আপনার কাছ থেকে পাচ্ছি, তাই না? হাশমত সাহেব।'

'জ্বি ভাবি।'

'আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল—আপনি কি একটু বসার ঘরে আসবেন? বেনুর সামনে বলতে কেমন জানি সংকোচ বোধ করছি।'

বেনু বিস্মিত হয়ে তাকাল। হাশমত আলি নিঃশব্দে উঠে এল বসার ঘরে। অবাক হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার ভাবি?'

'এ মাসের বাড়ি ভাড়াটা কি আপনি দিয়ে দেবেন? একটু সমস্যা হচ্ছে। আমি দিন দশেকের মধ্যে—'

'এটা কোনো ব্যাপারই না ভাবি। এটা নিয়ে আপনি চিন্তাই করবেন না। এই মাস কেন? দরকার হলে ছ' মাসের ভাড়া দিয়ে রাখব। আপনি আমাকে ভাবেন কী?'

লীনা খুব কৃতজ্ঞ বোধ করছে। হাশমত আলিকে এই কথাটা কী করে বলবে এটা ভাবতে তার মাথা ধরে গিয়েছিল। এখন মাথা ধরাটা নিমিষের মধ্যে চলে গেছে।

হাশমত আলি বলল, 'কথাটা বেনুর সামনে না বলে ভালো করেছেন। টাকা-পয়সার কোনো কথায় মেয়েছেলে থাকা উচিত না।'

লীনা হেসে বলল, 'আমি নিজেও তো মেয়েছেলে।'

'কী যে বলেন ভাবি, কোথায় আপনি আর কোথায় বেনু। আকাশ আর পাতাল ফারাক।'

লীনা বলল, 'আপনার ভাই এলে বলবেন আমি মার কাছে গিয়েছি। রাতেই ফিরব। সে যেন খেয়ে নেয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জ্বি আচ্ছা বলব। আপনি একটা ছাতা নিয়ে যান ভাবি। দিনের অবস্থা ভালো না। ঝড়–বৃষ্টি হতে পারে।'

'ছাতা লাগবে না।'

'লাগবে না বলছেন কি? অবশ্যই লাগবে। লেডিস ছাতা ঘরে আছে। ব্রান্ড নিউ। জাপানি।'

হাশমত নিজেই লেডিস ছাতা বের করে আনল।

লীনার বাবা ওয়াদুদুর রহমান সাহেব চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর বাড়ি তৈরিতে হাত দিয়েছিলেন। ঝিকাতলায় তাঁর জমি কেনা ছিল। রিটায়ার করবার সঙ্গে– সঙ্গে যুবকের উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর সার্বক্ষণিক ধ্যান জ্ঞান হচ্ছে বাড়ি। চমৎকার দখিনদুয়ারি বাড়ি। ইস্টার্ন রীতি অনুযায়ী বিরাট বারান্দা থাকবে, আবার ওয়েস্টার্ন ধরনে প্রতিটি ঘরে থাকবে বিল্ট ইন কাবার্ড। লোকজন বাথরুম বানানোয় কিপটেমি করে, তিনি করবেন না। বাথরুমে ঢুকেই যেন খোলামেলা ভাব হয়। প্রতিটি বাথরুমে থাকবে ঝকঝকে বাথটাব। দরজা–জানালা হবে সিজন করা বার্মা টিকের। আজকাল কী সব কাঠ দিয়ে দরজা–জানালা করে, গরম কালে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হয়।

ওয়াদুদুর রহমান সাহেব প্রতিটি জিনিস নিজে পছন্দ করে কিনলেন। মিস্তিরিরা সিমেন্ট বালি মিশিয়ে মশলা তৈরি করে, তিনি পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। ইট বিছিয়ে দেয়াল তৈরি হয়—তিনি গভীর আগ্রহে দেখেন, মাঝে–মাঝে নির্দেশ দেন—ঐ ইটটা বদলে দাও বসির মিয়া। ইটটা বাঁকা।

বসির মিয়া বদলাতে চায় না। তিনি বড়ই বিরক্ত হন।

'আহা বদলাতে বললাম না? ইটের কি অভাব হয়েছে যে একটা ক্রিপলড ইট দিতে হবে। চেঞ্জ ইট।'

রিটায়ার করার পরও হয়ত ওয়াদুদুর রহমান সাহেবের কুড়ি বছরের মতো আয়ু ছিল, সেই আয়ু বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে তিনি খরচ করে ফেললেন। ছাদ ঢালাইয়ের পর দিন স্ট্রোকে মারা গেলেন।

কারো জন্যেই কিছু থেমে থাকে না। যথাসময় বাড়ি শেষ হল। দোতলা করা গেল না। একতলা বানাতেই সঞ্চিত প্রতিটি পয়সা শেষ হয়ে গেল। লীনার মা সুলতানা বেগম একতলা বাড়ির দুটো ঘর নিয়ে থাকেন। বাকিটা ভাড়া দিয়েছেন তাঁর ডাক্তার জামাইকে। এই ডাক্তার জামাই বাড়িটাকে মোটামুটি একটা হাসপাতাল বানিয়ে ফেলেছে। রোজ বিকাল চারটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এখানে রুগী দেখা হয়। ভদ্রলোকের ভালো পসার হয়েছে। রুগীতে সারাক্ষণ বাড়ি ভর্তি থাকে। সুলতানার গা শিরশির করে, কিন্তু জামাইকে কিছু বলতে পারেন না।

আজ শুক্রবার। ডাঃ জামান শুক্রবারে রুগী দেখেন না, তবু দু'তিন জন রুগী বাইরের বারান্দায় বসে আছে। ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা না করে তারা কিছুতেই যাবে না। লীনাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে তাকেই ধরল, 'আপা ডাক্তার সাহেবকে একটু বলে দেন। খুব বিপদে পড়েছি।'

লীনা মার শোবার ঘরে ঢুকতেই একসঙ্গে সবাই হৈ–চৈ করে উঠল। লীনার বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোন দীনা বলল, 'ঝড় বৃষ্টির মধ্যে রিকশা নিয়ে চলে এলি? তোকে আনতে গাড়ি গেছে।' সবচে ছোট বোন নীনা বলল, 'একটা লেটেস্ট মডেল গাড়িতে চড়া মিস করলে আপা। দুলাভাই নতুন গাড়ি কিনেছে। বড় আপাদের এখন দুটো গাড়ি।' সুলতানা বললেন, 'জামাইকে আনলি না কেন? আমরা নাটক করি না বলে বুঝি আমাদের বাড়িতে আসা যাবে না।'

নাটকের একটা খোঁচা না দিয়ে সুলতানা মেজো জামাই সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন না। আজও পারলেন না। লীনার মনটা খারাপ হয়ে গেলেও সহজ স্বরে বলল, 'ওর কাজ আছে মা, রাত দশটার আগে ছাড়া পাবে না।'

সুলতানা তিক্ত গলায় বললেন, 'আমার তিন জামাইয়ের মধ্যে মেজোটাই সবচে কাজের হয়েছে। রাত দশটা–এগারটার আগে কোনোদিন ছাড়া পায় না।'

লীনা বলল, 'জামাই প্রসঙ্গ থাক মা। সবাই তো আর একরকম হয় না। কেউ কাজের হয়, কেউ হয় অকাজের—কি আর করা। কী জন্যে ডেকেছ বল? কারো জন্মদিন–টিন নাকি? আমি তো কিছু মনে করতে পারলাম না। ফুল নিয়ে এসেছি। যার জন্মদিন সে নিয়ে নিক।'

নীনা ছুটে এসে ফুল নিয়ে নিল। নীনার কাছ থেকে ফুল নেবার জন্যে বড় জামাই ঝাঁপিয়ে পড়ল। নীনা তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্লিজ আমার ফুলগুলো সেভ কর।' বলেই সে ফুলের তোড়া ক্রিকেট বলের মতো ছুঁড়ে মারল স্বামীর দিকে। সুলতানা কপট বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে বললেন, 'এরা সব সময় কি যে যন্ত্রণা করে। এই তোরা চা খাবি না কফি খাবি? যেটাই খাবি একটা। দু'তিন পদের জিনিস বানাতে পারব না।'

দীনা ও দীনার স্বামী জামান সাহেব বললেন, 'কফি।'

নীনা বলল, 'চা।'

নীনার স্বামী লুৎফুল হক চেঁচিয়ে বলল, 'সরবত।'

চারদিকে তুমুল হাসি শুরু হল। লীনা মনে–মনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এই সব চমৎকার হাসিখুশির মুহূর্তগুলোতে আসিফ কখনো অংশ নিতে পারে না। মাঝে–মাঝে সে যে উপস্থিত থাকে না তা নয়। থাকে, কিন্তু বড়ই বিব্রত বোধ করে। দেখে মনে হয় তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

সবাইকে একত্র করার উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। জামান সাহেব বললেন, 'রাতে খাওয়া–দাওয়ার পর অফিসিয়ালী সেটা বলা হবে। টপ সিক্রেট। এখন আমি আমার নতুন গাড়িতে সবাইকে নিয়ে একটা চক্কর দেব। এখান থেকে সাভার যাব—সাভার থেকে ফিরে আসব। টাটকা হাওয়ায় খিদেটা চাগবে। আমাকে বিশ মিনিটের জন্যে ক্ষমা করতে হবে। আমার কয়েকটা রুগী বসে আছে। বিদেয় করে আসি।'

লুৎফুল বলল, 'ছুটির দিনেও রুগী দেখেন! এত টাকা দিয়ে করবেন কী দুলাভাই? লোকজন ব্লাড প্রেসারে মারা যায়—আপনি দেখি টাকার প্রেসারে মারা যাবেন।'

জামান সাহেব ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। সুখী মানুষের হাসি। সুখী মানুষ অতি তুচ্ছ রসিকতায় হেসে ভেঙে পড়তে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিমন্ত্রণের রহস্য জানা গেল রাতের খাবারের পর। জামান সাহেব ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিলেন। তিনি সবাইকে নিয়ে কাশ্মীর যেতে চান। শুধু কাশ্মীর না—আগ্রা, জয়পুর এবং কাশ্মীর। থাকা খাওয়ার যাবতীয় খরচ তাঁর। দুই শ্যালিকা এবং শাশুড়ির টিকিটও উনি কাটবেন। অন্য কেউ যেতে চাইলে তাদের টিকিট তাদের কাটতে হবে। এই ভ্রমণে বাচ্চারা কেউ যাবে না।

লুৎফুল বলল, 'আমার টিকিট কাটবেন না, এর মানেটা কি দুলাভাই?'

'আমার কর্তব্য হচ্ছে শ্যালিকা পর্যন্ত, এর বাইরে না।'

নীনা বলল, 'আপনি কি সত্যি মিন করছেন দুলাভাই?'

'তোমার সন্দেহ আছে নাকি?'

'হ্যাঁ আছে। আপনার মধ্যে যে এক জন হাতেম তাই লুকিয়ে আছে সেটা জানা ছিল না।'

'এখন জানলে?'

'তা জানলাম। যাচ্ছি কবে আমরা?'

'সামনের মাসের এগার তারিখে, ফিরব বাইশ তারিখ। দীনা, তুমি ওদের টিকিট ওদের দিয়ে দাও।'

নীনা বিস্মিত হয়ে বলল, 'টিকিটও কেটে ফেলেছেন!'

'অফকোর্স। আমি কাঁচা কাজ করি না। ঢাকা–দিল্লী–ঢাকা রিটার্ন টিকিট।'

লীনা কিছুই বলল না। চুপচাপ বসে রইল। জামান সাহেব বললেন, 'আমার মেজো শালীকে দেখে মনে হচ্ছে তার ফাঁসির হুকুম হয়েছে। লীনা তুমি এমন মুখ কালো করে বসে আছ কেন?'

'আমার শরীরটা ভালো না দুলাভাই।'

'তুমি যাচ্ছ তো।'

'না দুলাভাই।'

'না কেন? তোমার বরকে ছেড়ে এই দশটা দিন তুমি থাকতে পারবে না?'

'তা না।'

'তাহলে অসুবিধাটা কোথায়।'

'অসুবিধা কিছু নেই।'

জামান সাহেব নিজেই লীনাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিলেন। কোমল গলায় বললেন, 'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেতে চাচ্ছ না।'

লীনা বলল, 'আপনি ঠিকই বুঝেছেন।'

'কর্তাকে ছাড়া যেতে মন চাচ্ছে না?'

লীনা চুপ করে রইল। জামান সাহেব বললেন, 'লীনা তোমাকে আমি খোলাখুলি কিছু কথা বলি। কিছু কিছু কথা সরাসরি হওয়াই ভালো। দেখ লীনা, তোমাদের আর্থিক অবস্থার কথা আমি ভালোভাবেই জানি। সেটা জেনে তোমার কর্তার জন্যে একটা টিকিট আমার কেনা উচিত। কিনতেও আমার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু মুশকিল কি জান? তোমাদের আত্মসম্মান বোধ অনেক বেশি। তোমরা আহত বোধ করবে। ভালো করতে গিয়ে মন্দ করা হবে। আমি সত্যি চাই তুমি যাও আমাদের সঙ্গে। তোমার শরীর খারাপ। বেশ খারাপ। বাইরে একটু ঘুরে টুরে এলে ভালো লাগবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীনা কিছুই বলল না।

জামান সাহেব বললেন, 'আসিফকে নিয়ে গেলে আরেকটা বাস্তব সমস্যা আছে, সেটাও তোমাকে খোলাখুলি বলি। তোমার মা, আই মিন আমার শাশুড়ি আসিফকে তেমন পছন্দ করেন না। এগার দিন এক সঙ্গে থাকতে হবে। এর মধ্যে তিনি অনেকবার আসিফকে নিয়ে অনেক অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুলবেন। তোমার খুব খারাপ লাগবে।'

লীনা বলল, 'আপনিই বা হঠাৎ দল বেঁধে বাইরে যাবার ব্যাপারে এত উৎসাহী হলেন কেন?'

'খুব ক্লান্ত লাগছে। টাকা বানানোর একটা মেশিন হয়ে পড়েছি। সারাদিন হাসপাতালে থাকি। বাসায় ফিরে বিশ্রামের বদলে রাত দশটা এগারটা পর্যন্ত রুগী দেখি। জীবনটা মানুষের রোগ-শোকের মধ্যে আটকা পড়ে আছে। মুক্তি চাচ্ছি। কিছু সময়ের জন্যে হলেও মুক্তি। মাঝে-মাঝে তোমাদেরকে আমার বেশ হিংসাই হয়। মনে হয় বেশ সুখেই তো তোমরা আছ।'

'আপনি কি অসুখে আছেন?'

'হ্যাঁ অসুখেই আছি। উত্তরায় বাড়ি করছি। কত রকম প্ল্যানিং; কত পরিকল্পনা। ফলের গাছ কী কী থাকবে, ফুলের গাছ কী কী থাকবে। অথচ আমি নিজে ডাক্তার, আমি খুব ভালো করে জানি আমরা যে বেঁচে আছি এইটাই পরম আশ্চর্যের ব্যাপার। দীর্ঘ পরিকল্পনা অর্থহীন।'

'ফিলসফার হয়ে যাচ্ছেন দুলাভাই। এটা তো ভালো লক্ষণ না।'

'ফিলসফার হতে পারলে তো কাজই হত। হাইলি মেটেরিয়েলিস্টিক মানুষ হয়ে জন্মেছি। এ ভাবেই মরব। আমার মতো সাকসেস্‌ফুল ডাক্তারদের এটাই হচ্ছে ডেসটিনি।'

অনেক রাতে আসিফের ঘুম ভেঙে গেল। ঘর অন্ধকার, বাইরে ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাঁট আসছে। হাওয়ায় মশারি উড়ে উড়ে যাচ্ছে। আসিফ বিছানায় উঠে বসল। লীনা পাশে নেই। এটা নতুন কিছু না, প্রায় রাতেই ঘুম ভাঙলে লীনাকে পাশে দেখা যায় না। সে একাকী বারান্দার বেতের চেয়ারটায় বসে বাড়ির সামনের ঝাঁকড়া কাঁঠাল গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে। আজও নিশ্চয়ই তাই আছে।

আসিফ বাতি জ্বালল না। নিঃশব্দে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। লীনা তার দিকে তাকিয়ে হাসল। যেন সে জানত এই মুহূর্তে আসিফ এসে তার পাশে বসবে।

'কী করছ লীনা?'

'কিছু না। বৃষ্টি দেখছি।'

'ঘুম আসছে না?'

'উঁহু।'

'ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন?'

'দেখাব। বস আমার পাশে। বৃষ্টি দেখতে দেখতে খানিকক্ষণ গল্প করি।'

আসিফ বসতে বসতে মৃদু স্বরে বলল, 'একা একা বসে তুমি কী ভাব বল তো?'

'সাধারণত কিছু ভাবি না, আজ অবশ্যি ভাবছিলাম—কাশ্মীর জায়গাটা দেখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমন হবে। নিশ্চয়ই খুব সুন্দর, তাই না?'

'সুন্দর তো বটেই।'

'সব সুন্দর–সুন্দর জায়গাগুলো ইন্ডিয়াতে পড়ে গেল। রাগ লাগে না তোমার?'

'লাগে।'

'কাশ্মীর জায়গাটা কেমন হবে ভাবতে ভাবতে কী ঠিক করলাম জান? ঠিক করলাম আমি দুলাভাইয়ের সঙ্গে ঘুরেই আসব।'

'খুব ভালো, যাও ঘুরে আস। তোমার কাছে যদি ভালো লাগে তাহলে পরে আমরা দু'জন আবার যাব। হাউস বোট ভাড়া করে থাকব।'

'কাশ্মীর দেখার জন্যে আমি যাচ্ছি না কিন্তু। আমি যাচ্ছি অন্য কারণে।'

'অন্য কারণটা কি?'

'আমি আজমীর যাব। আজমীর শরীফে গিয়ে যা চাওয়া যায় তাই না কি পাওয়া যায়। আমি ঐ জন্যেই যাব। যেন আমাদের এই বারের বাচ্চাটা বেঁচে থাকে।'

'ওর বয়স কত হল লীনা?'

'তিন মাস। তুমি বিশ্বাস করবে না, আমি কিন্তু ওর হার্টবিট বুঝতে পারি।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ সত্যি। তবে সব সময় না। গভীর রাতে যখন একা একা বসে থাকি তখন।'

'এই জন্যেই কি তুমি রাত জাগ?'

'হুঁ।'

আসিফ সিগারেট ধরাল। তার পাশে বসে থাকা এই মেয়েটি তার কত দিনের চেনা, অথচ গভীর রাতে সে যখন একা একা বসে থাকে তখন কেমন অচেনা হয়ে যায়।

লীনা বলল, 'অনেকদিন তোমাদের রিহার্সেলে যাই না। রিহার্সেল কেমন হচ্ছে?'

'বেশি ভালো হচ্ছে না। শো পিছিয়ে দিয়েছে, সব কেমন ঢিলাঢালা হয়ে গেছে।'

'পুষ্প মেয়েটা কেমন করছে?'

'ভালো করছে।'

'আমার চেয়েও ভালো?'

'হ্যাঁ তোমার চেয়েও ভালো।'

'আমাকে যেমন অভিনয়ের আগে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলে, ওকেও কি দিয়েছিলে?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা ষষ্ঠ দৃশ্যে তুমি যখন পুষ্পকে জড়িয়ে ধর, তখন তোমার কেমন লাগে?'

আসিফ অবাক হয়ে বলল, 'এই প্রশ্ন করছ কেন?'

'এম্নি করছি, কিছু মনে করো না।'

বৃষ্টির বেগ আরো বাড়ছে। ঝড়ের মতো হচ্ছে।

জামগাছের পাতায় শোঁ–শোঁ শব্দ। ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছে। সমস্ত শহর অন্ধকারে ডুবে গেছে। আসিফ বলল, 'চল শুয়ে পড়ি।' লীনা বিনাবাক্যব্যয়ে উঠে এল। দু'জনের কেউই বাকি রাত ঘুমুতে পারল না। আসিফ জেগে জেগে শুনল বৃষ্টির শব্দ, লীনা শুনতে চেষ্টা করল অনাগত শিশুটির হৃৎপিণ্ডের শব্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

হাঞ্চ ব্যাক অব মীরপুর পিঠ সোজা করে মতিঝিলের ট্রাভেল এজেন্সি সুরমা ট্রাভেলস–এ ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে আসিফ। বিশাল অফিস। দু'জন স্টেনো বা রিসিপশনিস্ট ধরনের মেয়ে বসা। এক জনের দিকে তাকান যায় না। মৈনাক পর্বত। তবে অন্যজন রূপবতী। মৈনাক পর্বত মধুর গলায় বলল, 'আপনাদের জন্যে কী করতে পারি?'

বজলু সাহেব বললেন, 'কেরামত আছে?'

'জ্বি আছেন। এখন একটু ব্যস্ত।'

'আমিও ব্যস্ত। আপনি দয়া করে বলুন, ভৈরবের বজলু।'

মৈনাক পর্বত বিরক্ত ভঙ্গিতে ভেতরে চলে গেল। বজলু আসিফকে নিচু গলায় বললেন, 'তুমি এখানেই বসে থাক। আমি একা যাই। দরকার হলে তোমাকে ডাকব।'

আসিফ বলল, 'দরকার হবে বলে মনে করছেন?'

'অবশ্যই হবে। কেরামত আমার কথা ফেলবে না। ওর সেই ক্ষমতাও নেই। এস এম হলে লিটারেলি আমিই ওকে পেলেছি।'

'পুরানো কথা কেউ মনে রাখে না বজলু ভাই।'

'দেখা যাক। আগেই ডিসহার্টেড হচ্ছ কেন?'

বজলু এসেছেন আসিফের চাকরির ব্যাপারে। এসেছেন খুবই উৎসাহ নিয়ে। তাঁর ধারণা এই মুহূর্তেই একটা কিছু হবে। আসতে আসতে বলেছিলেন, 'তোমার চাকরি কোনো ব্যাপারই না। যে কোনো অফিসের এক জন বসকে ধরে এনে নাটক একটা দেখিয়ে দিলেই ব্যাটেল ইজ ও'ন।'

আসিফ কোনো প্রতিবাদ করে নি। যদিও বলতে চেয়েছিল নাটকের ক্ষেত্রে এটা কখনো হয় না। খেলোয়াড়দের ব্যাপারে হয়। ভালো ফুটবল প্লেয়ার, ক্রিকেট প্লেয়ারদের ডেকে ডেকে চাকরি দেয়। এরা অফিসের শোভা। কিন্তু নাটক করা লোককে কে রাখবে?

মৈনাক পর্বত বজলু সাহেবকে ডেকে নিয়ে গেল। আসিফ বসে রইল। সুন্দরী মেয়েটি বলল, 'আপনি চা খাবেন?'

'জ্বি খাব।'

মেয়েটি কেমন যেন আগ্রহ নিয়ে তাকাচ্ছে। কোনো একটা নাটক কি সে দেখেছে? অসম্ভব কিছু তো নয়। দেখতেও তো পারে। সুন্দরী মেয়েটি নিজেই চায়ের কাপ নিয়ে এগিয়ে এল। মিষ্টি গলায় বলল, 'আপনি কি মাধবীর ভাই?'

'জ্বি না।'

মেয়েটির সব আগ্রহ শেষ। সে ফিরে গেল নিজের জায়গায়। ব্যস্ত হয়ে পড়ল টেলিফোন নিয়ে। সম্ভবত চা এনে দেয়ায় নিজের উপরই সে এখন রাগ করছে।

কেরামত যতটা আন্তরিকতা দেখাবে বলে বজলু ভেবেছিলেন, সে তার চেয়েও বেশি দেখাল। জড়িয়ে ধরে নাচানাচি করল খানিকক্ষণ। গদগদ গলায় বলল, 'ভৈরবের বজলু যে তুমি তা বুঝতে পারি নি দোস্ত। বিশ্বাস কর। এই টাকা ছুঁয়ে বলছি। ব্যবসায়ী কখনো টাকা ছুঁয়ে মিথ্যা কথা বলে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ব্যবসা কেমন চলছে?'

'টুকটাক। ফাজিলের দেশ। ফাজিলের দেশে ব্যবসা করে সুখ নেই।'

'তুই তো মনে হচ্ছে সুখে আছিস।'

'টাকা আছে। মনে শান্তি নাইরে দোস্ত। কী জন্যে এসেছিস বল।'

'চাকরি দিতে হবে একটা।'

'এটা ছাড়া আর কিছু বলার থাকলে বল।'

'আর কিছু বলার নেই।'

কেরামত গম্ভীর হয়ে গেল। বজলু সিগারেট ধরালেন। এই ঘরের এয়ার কন্ডিশনার অনেক নিচে সেট করা। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। মনে হচ্ছে ফ্রিজের ভেতর তিনি বসে আছেন। কেরামত বলল, 'চাকরি কার?'

'আমার গ্রুপের এক জন।'

'তোর আবার কিসের গ্রুপ।'

'নাটকের গ্রুপ।'

'ও আচ্ছা, এখনো নাটক নিয়ে আছিস? ভালো। শিল্প-সাহিত্যের কোনো খবর রাখি না। আমার বউ বলছিল মহিলা সমিতিতে ভালো-ভালো নাটক হয়। সে একদিন দেখে আসল—কমেডি ধরনের কিছু হবে। রাতে ঘুমুতে গিয়েও একটু পর-পর হেসে ওঠে।'

বজলু বললেন, 'আসল কথা থেকে দূরে সরে যাচ্ছিস।'

'তোর ক্যান্ডিডেটের যোগ্যতা কি? মানে নাটক ছাড়া আর কী জানে?'

'বি. এ পাশ। শুরুতে ব্যাংকে চাকরি করত, তারপর ইস্টার্ন ট্রান্সপোর্টে কিছুদিন ছিল। জীবন বীমাতে কিছুদিন কাজ করেছে।'

'অচল মাল গছাতে চাচ্ছিস।'

বজলু সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'আসিফের মতো ছেলেকে চাকরির জন্যে মানুষের দরজায় দরজায় ঘুরতে হচ্ছে এইটাই হচ্ছে আফসোসের ব্যাপার। বিলেত আমেরিকা হলে এই ছেলে টাকার উপর শুয়ে থাকত।'

কেরামত বলল, 'কষ্ট করে কিছু টাকা পয়সা জোগাড় করে এই ছেলেকে বিলেত আমেরিকা পাঠিয়ে দিলেই হয়।'

বজলু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

কেরামত বলল, 'ঠাট্টা করলাম রে দোস্ত। তোকে সত্যি কথা বলি—বিজনেসের অবস্থা খুবই টাইট। তবু তুই এসেছিস সেই খাতিরে আমি যা করতে পারি সেটা হচ্ছে—টাইপিস্টের একটা চাকরি দিতে পারি। তবে টাইপ জানতে হবে।'

বজলু উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। তবু বললেন, 'তোর এখানে হবে না বুঝলাম। উঠি।'

কেরামত বলল, 'রাগ করে উঠে যাচ্ছিস তা বুঝতে পারছি। উপায় নেই দোস্ত। আমার জায়গায় তুই থাকলে তুইও ঠিক এই কথাই বলতি। পুরনো দিনের খাতিরে এক কাপ চা অন্তত খেয়ে যা। আমি মানুষটা খারাপ হতে পারি—আমার অফিসের চা কিন্তু ভালো।'

বজলু চা খেলেন না। অফিস থেকে বের হবা মাত্র তাঁর পিঠ আবার কুঁজো হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল। তবে বেশ শক্ত গলায় বললেন, 'তুমি কোনো চিন্তা করবে না। আমি একটা ব্যবস্থা করব। অবশ্যই করব। চল কোথাও বসে চা-টা কিছু খাওয়া যাক।'

আসিফ বলল, 'আমি একটু পুরানা পল্টনের দিকে যাব। এগারটার মধ্যে না গেলে কাজ হবে না। চা থাক।'

'চাকরি সংক্রান্ত ব্যাপার?'

'জ্বি।'

'আচ্ছা যাও। তবে শোন, বিকেলে রিহার্সেলে আসার সময় কয়েক কপি বায়োডাটা নিয়ে আসবে।'

'দেয়ার মতো বায়োডাটা তো কিছু নেই।'

'যা আছে তাই আন না। আমার এক খালু আছেন খুবই হাই লেভেলের লোক। মন্ত্রী লেভেলের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ। তাঁকে দিয়েই কার্য উদ্ধার করতে হবে। তুমি একেবারেই চিন্তা করবে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'লীনার শরীর এখন কেমন?'

'ভালো।'

'ভেরি গুড। আমি দেখতে যাব। আজই যাব। রিহার্সেলের পর চলে যাব। রাতে খাব তোমাদের সাথে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'শোন আসিফ, টাকা পয়সা কিছু লাগবে?'

'এই মুহূর্তে না।'

'কোনোরকম সংকোচ করবে না। তোমার মতো মানুষকে এটা জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে—কী আফসোস বল তো।'

আসিফ হেসে ফেলল।

'হাসবে না, বুঝলে? এটা হাসির কোনো ব্যাপার না। এটা হচ্ছে একটা গ্রেট ট্র্যাজেডি।'

আসিফের তেমন কোথাও যাবার কথা ছিল না। বজলু সাহেবের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়াই তার প্রথম উদ্দেশ্য। বজলু কাউকে ধরলে সহজে ছাড়েন না। আসিফ এখন কী করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। বাসায় ফিরে যাওয়া যায়। খালি বাসায় ফিরে গিয়েই বা কী হবে? লীনা আছে স্কুলে। আজ আবার স্কুলে কিসের যেন পরীক্ষা। ছুটি হবে বিকেল পাঁচটায়। ছুটির জন্যে দরখাস্ত করেছিল—নামঞ্জুর হয়েছে। স্কুলের চাকরিটা লীনার ছেড়েই দিতে হবে। ভয়াবহ দিন সামনে। আসিফ হাঁটতে-হাঁটতে ভাবছে এইসব নিয়ে গুছিয়ে একটা নাটক লিখতে পারলে বেশ হত। তবে এই নাটক দর্শক নিত না। নাটকের বক্তব্য যাই হোক, তার মধ্যে বিনোদন থাকতে হবে। রিলিফ থাকতে হবে। পিকাসোর যে ছবি, তারও বিনোদনের একটি দিক আছে।

সবচে কঠিন বক্তব্যের নাটকেও আছে রিলিফের ব্যবস্থা। কুইনাইন সরাসরি গেলান যায় না। মিষ্টি চিনির প্রলেপ দিয়ে দিতে হয়।

দুপুর দেড়টার দিকে আসিফ উপস্থিত হল তার বড় দুলাভাইয়ের অফিসে। নিকট আত্মীয়দের মধ্যে অল্প যে ক'জনের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে ফরহাদ সাহেব

AMARBOI.COM

হচ্ছেন তাঁদের এক জন। এক সময় সরকারী চাকুরে ছিলেন। রোডস এন্ড হাইওয়েজের ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন কনস্ট্রাকশান ফার্ম দিয়েছেন। সাধারণত ইঞ্জিনিয়াররা ব্যবসা শুরু করলে দ্রুত বড়লোক হয়ে যায়। এর বেলায় ব্যতিক্রম হয়েছে। আগে যা ছিলেন এখনো তাই আছেন। কাজকর্ম নাকি তেমন জোগাড় করতে পারেন না। আসিফ যখনই তাঁর কাছে আসে, দেখে—তিনি চেয়ারে পা তুলে বসেছেন। হাতে ম্যাগাজিন। দেশি–বিদেশি অসংখ্য ম্যাগাজিন তাঁর টেবিলে থাকে। তিনি সব ম্যাগাজিন গভীর আগ্রহে পড়েন।

ফরহাদ সাহেব মানুষটা ছোটখাট। বেমানান বিশাল গোঁফ আছে। গোঁফের আড়ালে ঠোঁট ঢাকা বলে কখন হাসছেন তা বোঝা যায় না, মনে হয় সারাক্ষণই রেগে আছেন। আসিফকে ঢুকতে দেখে হাতের ম্যাগাজিন না নামিয়ে এবং আসিফের দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'টাকা ধার চাইতে এসেছ?'

আসিফ বলল, 'হ্যাঁ।'

'কত?'

'লাখ খানিক।'

'বস।'

আসিফ বসল। ফরহাদ ম্যাগাজিন নামিয়ে রাখলেন, গোঁফের আড়ালে হাসলেন। পর মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কিছু হয় নি এখনো?'

'না।'

'হবে বলে কি মনে হচ্ছে?'

'না, হচ্ছে না।'

'হতাশ?'

'জ্বি হতাশ।'

'খুব হতাশ?'

'হ্যাঁ।'

'দুপুরে খাওয়া হয়েছে?'

'জ্বি না।'

'চল কোথায়ও গিয়ে খাই। পেটে ক্ষুধা থাকলে হতাশ ভাবটা বেশি থাকে। জাতি হিসেবেই আমরা হতাশ কেন জান? হতাশ, কারণ বেশির ভাগ মানুষ ক্ষুধার্ত। বুঝলে?'

'বুঝলাম।'

"না বোঝ নি। এটাই সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যেখানে ক্ষুধাকে খুব সম্মানের চোখে দেখা হয়। এই দেশের কবি লেখেন, 'হে দারিদ্র তুমি মোরে করেছ মহান।' দারিদ্র মানুষকে মহান করে না, পঙ্গু করে ফেলে।"

'খুবই ফিলসফিক কথাবার্তা বলছেন দুলাভাই।'

'বলছি, কারণ আমার অবস্থা কাহিল। তোমার বোন সেই খবরটা এখনো জানে না। সে সুখে আছে'

'ব্যবসাপাতি খারাপ যাচ্ছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ইয়েস। কী পরিমাণ খারাপ, তুমি চিন্তা করতে পারবে না। মোটা এমাউন্টের টাকা ঘুষ দিয়ে একটা কনট্রাক্ট দেই। কাজ শুরু মাত্র সবাই হাঁ করে ফেলে—প্রতিটি মানুষকে টাকা খাওয়াতে হয়।

যে রাস্তায় ছ ইঞ্চি বিটুমিন দেয়ার কথা সেখানে দিই এক ইঞ্চি। প্রথম বৃষ্টিতেই সেই বিটুমিন ধুয়ে মুছে যায়। আবার টেন্ডার হয়। আবার টাকা খাওয়াখাওয়ি। তুমি বিশ্বাস কর—বাংলাদেশে কোথাও কোনো সৎ মানুষ নেই। সৎ মানুষ এখন আছে কোথায় জান? গল্প, উপন্যাস এবং তোমাদের নাটকে।'

ফরহাদ সাহেব আসিফকে নিয়ে দামি একটা রেস্টুরেন্টে গেলেন। নতুন রেস্টুরেন্ট, বিদেশিরাই বেশিরভাগ ভিড় করেছে। রেস্টুরেন্টের বিশেষত্ব হচ্ছে সঙ্গে বার আছে। ফরহাদ সাহেব খাবারের অর্ডার দিয়ে পর-পর ছ'পেগ হুইস্কি খেয়ে চোখ লাল করে ফেললেন। আসিফ অবাক হল। ফরহাদ সাহেবের এই ব্যাপারটা তার জানা ছিল না। ভালো মানুষ ধরনের লোক ছিলেন। তাঁর ব্যবহার এবং স্বভাব চরিত্রের সঙ্গে দুপুরবেলায় মদ্যপানটা ঠিক মানাচ্ছে না।

ফরহাদ সাহেব বললেন, 'আসিফ তোমরা নাটক কেন কর?'

আসিফ কিছু বলল না। ফরহাদ সাহেব মুখ খানিকটা এগিয়ে এনে উত্তেজিত গলায় বললেন, 'পত্রিকা ওল্টালেই দেখি গ্রুপ নাটকের মটো হচ্ছে—আমরা নাটক করি সমাজ বদলাবার জন্যে। এইসব ফালতু কথা তোমরা কেন বল? মহিলা সমিতির ফ্যানের নিচে দেড় ঘন্টার একটা নাটক করে তোমরা সমাজ বদলে ফেলবে? সমাজ কোথায় আছে তোমরা জান?'

আসিফ হাসল। ফরহাদ সাহেব থমথমে গলায় বললেন, 'হেসে ফেললে? আমি কি খুব হাস্যকর কিছু বলেছি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস সমাজ কোথায় আছে তোমরা জান না।'

'আপনি জানেন?'

'কিছুটা জানি। মাঝে-মাঝে প্রচুর মদ্যপান যখন করি তখন কিছুটা ইনসাইট ডেভেলপ করে।'

ফরহাদ সাহেব আরো এক পেগের অর্ডার দিলেন। আসিফ একবার ভাবল বলবে—দুলাভাই বেশি হয়ে যাচ্ছে।

কিছু বলল না। ফরহাদ সাহেব গলা নিচু করে বললেন, 'থিয়েটার-ফিয়েটার কর। তোমার সন্ধানে সতের-আঠার বছরের কচি মেয়ে আছে? যে সাতান্ন-আটান্ন বছরের এক জন বুড়োর সাথে কোনো একটা ভালো হোটেলে এক রাত থাকবে? আছে এ রকম কিছু তোমার সন্ধানে?'

'দুলাভাই, আপনি কী বললেন, কিছু বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারবে না জানি। বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার আঠারো লাখ টাকার একটা বিল আটকে আছে। আটকেছে মাত্র এক জায়গায়। যেখানে আটকেছে সেখানে যিনি আছেন তাঁর বয়স সাতান্ন-আটান্ন। তিনি আমাকে ডেকে বলেছেন, 'লাইফ খুব ডাল হয়ে যাচ্ছে—এটাকে ইন্টারেস্টিং করার একটা ব্যবস্থা করতে পারেন?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই পারি।'

উনি বললেন, 'আপনাকে বলতে একটু ইয়ে লাগছে—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, 'আপনি কোনোরকম সংকোচ করবেন না স্যার।' তখন উনি বললেন, 'আজকাল শুনতে পাই ভেরি ইয়াং গার্লস, অনেকটা এ্যাডভেঞ্চারের লোভে হোটেলে-টোটেলে রাত কাটাচ্ছে. বুঝতে পারছেন কী মিন করছি?'

আমি বললাম, 'পারছি।'

তিনি বললেন, 'জাস্ট একটা এক্সপেরিয়েন্সের জন্যে। পারা যাবে?' আমি বললাম, 'অবশ্যই। এটা কোনো ব্যাপারই না।'

আসিফ বলল, 'আপনি কি কোনো ব্যবস্থা করলেন?'

ফরহাদ সাহেব বললেন, 'আমি কী করলাম শোন, অফিসে এসে দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইলাম। আমার মেঝো মেয়ে সুমি—ওর বয়স সতের। চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে উঠল, যেন সুমি এই লোকটার কোমর জড়িয়ে হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। মাথায় আগুন লেগে গেল। কী করলাম জান?'

'কী করলেন?'

'ভদ্রলোকের স্ত্রীকে টেলিফোনে সমস্ত ব্যাপারটা বললাম।'

'তারপর?'

'তারপরের কথা কিছু জানি না।'

'আপনার বিল? আপনার বিলের কী হল?'

'ঐসব এখন জানতে চাওয়া কি অর্থহীন না?'

ফরহাদ সাহেব খাবার মুখে দিচ্ছেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি ঘাস চিবুচ্ছেন। অনেক কষ্টে কুৎসিত কিছু গিলে ফেলার চেষ্টা করছেন। খানিকক্ষণ পর-পর পানির গ্লাসে চুমুক দিয়ে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছেন।

'আসিফ।'

'জ্বি।'

'মনটা খুব অস্থির। কোনো কিছুই ভালো লাগে না। অফিসে বসে সারাদিন শুধু ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাই। নাটক-ফাটক দেখলে মনটা ভালো হবে নাকি বল তো? ভালো কিছু কি হচ্ছে?'

আসিফ জবাব দিল না।

ফরহাদ সাহেব বললেন, 'রিয়েল ওয়ার্লড থেকে আনরিয়েল ওয়ার্লডে খানিকক্ষণের জন্যে হলেও ঢুকতে ইচ্ছা করে। টিপু সুলতান, সিরাজদ্দৌলা এইসব নাটক কি আজকাল হয়, আসিফ?'

'মফস্বলের দিকে হয়।'

'তোমরা কর না কেন? ফ্যান্টাসি ধরনের জিনিস দেখতে ইচ্ছা করে। মশিয়ে লালী, নানা ফারনাবিশ, ভেরি ইন্টারেস্টিং, তাই না? তারপর একটা মেয়ে ছিল না? যে বলল—আমার বাপুজী জৌতিষ চর্চা করেন। টিপু সুলতান বলল, 'কে তোমার বাপুজী, কি তার পরিচয়?' মেয়েটি বলল, 'বাপুজীকে আপনার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন তাঁর গণনায়।'

আসিফ বলল, 'দুলাভাই আপনার মনে হয় খানিকটা নেশা হয়ে গেছে।'

ফরহাদ সাহেব সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, 'হ্যাঁ হয়েছে। আমি নিজেই বুঝতে পারছি। অভ্যাস নেই। তার উপর গরমটাও পড়েছে প্রচণ্ড। অল্পতেই..... চল উঠে পড়ি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি তো কিছুই খেলেন না।'

'ইচ্ছা করছে না। টেস্টলেস সব খাবার। মনে হচ্ছে মানুষের বমি খাচ্ছি। ভালো কথা, বমির ইংরেজি কি জান না কি? কয়েকদিন ধরেই ভাবছি কাউকে জিজ্ঞেস করব—মনে থাকে না।'

গাড়িতে উঠে ফরহাদ সাহেব আরো ঝিম মেরে গেলেন। আসিফ বলল, 'দুলাভাই আপনি কি গাড়ি চালাবেন?'

'ইয়েস। ভয় নেই, এক্সিডেন্ট করব না। স্টিয়ারিং হুইল ধরামাত্র আমি সোবার হয়ে যাই। তাছাড়া ধর এক্সিডেন্ট যদি করেই ফেলি, তেমন কী আর হবে?'

গাড়িতে উঠে ফরহাদ সাহেব সত্যি-সত্যি সোবার হয়ে গেলেন। সহজভাবে গাড়ি চালাতে লাগলেন। হাসিমুখে বললেন, 'ভয় কমেছে?'

'কমেছে।'

'আসিফ, তোমার জন্যে আমি একটা ব্যবস্থা করে দেব। চিন্তা করবে না। আমাকে খানিকটা সময় দাও—ধর মাস খানিক।'

'থ্যাংকস দুলাভাই।'

'কোথায় যাবে বল, তোমাকে নামিয়ে দিই।'

'যে কোনো এক জায়গায় নামিয়ে দিলেই হবে। আমার বিশেষ কোথাও যাবার প্রোগ্রাম নেই।'

ফরহাদ সাহেব গাড়ি পার্ক করলেন। আসিফ নেমে পড়ল। ফরহাদ সাহেব বললেন, 'এক সেকেন্ডের জন্যে দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে কিছু মিথ্যা কথা বলা হয়েছে। সত্যি কথাটা বলে ফেলি।'

'কোন বিষয়ে?'

'আমি ঐ লোকের স্ত্রীকে টেলিফোন করি নি। ভদ্রলোক যেমন চেয়েছেন সেই মতো ব্যবস্থা হয়েছে। গত পরশু আমি বিল পেয়েছি। যাই, কেমন?'

ফরহাদ সাহেব গাড়ি নিয়ে ছুটে বের হয়ে গেলেন। রাস্তায় যানবাহনের জটলা, কিন্তু তাঁর গাড়ি দ্রুত চলছে। আসিফ লাল রঙের গাড়িটির দিকে তাকিয়ে রইল।

একজন মানুষের সঙ্গে অন্য একজন মানুষের সম্পর্কের ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। আসিফ নিজের আত্মীয়-স্বজন কারোর সঙ্গেই কেমন যেন সহজ হতে পারে না। অদৃশ্য একটা পর্দা থেকেই যায়। অথচ এই মানুষটিকে খুবই আপন মনে হয়। যদিও আসিফের বোনের সঙ্গে এই লোকটির তেমন অন্তরঙ্গতা বিয়ের এত বছরেও তৈরি হয় নি। কুৎসিত সব ঝগড়া হয়।

অন্য বোনদের সঙ্গে তাদের স্বামীদের ভাব-টাব কেমন আসিফ জানে না। অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বললেই হয়। মা বেঁচে থাকতে খানিকটা যোগাযোগ ছিল। মা পালা করে একেক মেয়ের বাসায় থাকতেন। ঈদ উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বোনদের সঙ্গে দেখা হত। বোনরা কড়া কড়া কথা শোনাত, যার মূল ভাব একটিই—আসিফ ভয়াবহ একটা চরিত্র। আসিফের মেজো বোন একটি কথা প্রায় সরাসরি বলে, 'বাবা এত সকাল সকাল মরে গেল শুধু মাত্র আসিফের কারণে। আসিফ বাবাকে কষ্ট দেয়ার জন্যেই ইচ্ছা করেই পড়াশোনা ছেড়ে দিল। নয়ত যে ছেলে ফাইভের বৃত্তি পরীক্ষায় ডিসট্রিক্টে ফার্স্ট হয়, সে কী করে ম্যাট্রিক প্রথমবারে ফেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে দ্বিতীয়বারে থার্ড ডিভিশনে পাশ করে, আই.এ তে কম্পার্টমেন্টাল পায়! বাবা মরে গেল এই দুঃখে।'

যে কোনো কথাই অনেকবার শুনলে সেটাকে সত্যি মনে হয়। রেসকোর্সের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এই মুহূর্তে আসিফের মনে হচ্ছে মেজো আপার কথা সত্যি হলেও হতে পারে। বৈশাখ মাসের দুপুরে হাঁটতে হাঁটতে সে খানিকটা বিষণ্ন বোধ করল। তার মনে হল সব মানুষের অন্তত একবার করে হলেও জীবন গোড়া থেকে শুরু করার সুযোগ থাকলে ভালো হত। বড় ধরনের ভুলগুলোর একটি অন্তত শোধরান যেত।

তার সবচেয়ে বড় ভুল কোনটা? নাটক? আর লীনা? লীনাও কি তার মতো বড় কোনো ভুল করেছে? একবার তাকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়?

আসিফ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। প্রচণ্ড পানির পিপাসা হচ্ছে। আশেপাশে পানি খাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। ঢাকা শহরের নানান জায়গায় এখন চমৎকার ফোয়ারা। এই সব ফোয়ারার পানি কি খাওয়া যায়? প্রেসক্লাবের কাছের ফোয়ারার পানি একবার এক তৃষ্ণার্ত বৃদ্ধকে খুব আগ্রহ করে খেতে দেখেছিল। বৃদ্ধের চেহারা বেশ সম্ভ্রান্ত। হাতে মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভের লোকদের মতো চামড়ার ব্যাগ। সে এই ব্যাগ পাশে রেখে ফোয়ারার পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে বেশ আয়োজন করে পানি খেল। দৃশ্যটা আসিফের এতই মজা লাগল যে সে এগিয়ে গেল। বৃদ্ধ খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে আসিফকে বললেন, 'সরকার পানি খাওনের ভালো ব্যবস্থা করছে। খুবই উত্তম ব্যবস্থা!'

আসিফের ইচ্ছা করছে এই রকম কোনো একটা ফোয়ারার কাছে গিয়ে ঐ বৃদ্ধের মতো হাত-মুখ ধুয়ে খুব আয়োজন করে খানিকটা পানি খায়। লোকজন পাগল ভাববে নিশ্চয়ই। ভাবুক। মাঝে-মাঝে পাগল হতে ইচ্ছা করে।

সে সত্যি-সত্যি হেঁটে হেঁটে প্রেসক্লাবের কাছের ফোয়ারাটার কাছে এল। ফোয়ারা বন্ধ। শুকিয়ে খট খট করছে। কিছু জিজ্ঞেস না করতেই একজন বলল, 'সন্ধ্যার সময় লাল নীল বাতি জ্বালাইয়া ছাড়ে।' সন্ধ্যা পর্যন্ত সে কি অপেক্ষা করবে? অপেক্ষা করলে কেমন হয়?

আসিফ নিজের পাগলামীতে নিজেই হেসে ফেলল।

৭

ঝুম বৃষ্টি পড়ছে।

মজনু চুলায় কেতলি চাপিয়ে বিরক্ত মুখে বৃষ্টি দেখছে। বৃষ্টি মানেই যন্ত্রণা। চা বেশি লাগবে। দু'বারের জায়গায় তিনবার কেতলি বসাতে হবে। তিনবারের মতো চা পাতা নেই। চা পাতা আনতে যেতে হবে। রিহার্সেলের সময় বাইরে যেতে তার ভালো লাগে না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত না দেখলে মজা কোথায়? তা ছাড়া বৃষ্টির সময় সবাই আসেও না। রিহার্সেল ঠিকমতো হয় না। আগে আগে শেষ হয়ে যায়। রিহার্সেল বাদ দিয়ে গোল হয়ে বসে গল্পগুজব করে। আগে কাজ, পরে গল্পগুজব। এই জিনিসটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরা বোঝে না। ছাগলের দল।

কেতলিতে চায়ের পাতা ফেলে মজনু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। মনে হচ্ছে লাস্ট সিনটা আজও হবে না। লাস্ট সিনটাই সবচে মারাত্মক। প্রায় দিনই এই সিন হচ্ছে না। আজমল সাহেব আসে না। তাঁর নাকি মায়ের অসুখ। লাস্ট সিনের মেইন একটর হচ্ছে আজমল হুদা। মজনুর মতে আজমল সাব হচ্ছে এই টিমের দুই নম্বর একটর। এক নম্বর আসিফ সাব। এই দুই জন না থাকলে টিম কানা। তবে নতুন মেয়ে পুষ্প মন্দ না। লীনা আপার কাছাকাছি। কিংবা কে জানে লীনা আপার চেয়েও বোধ হয় ভালো। তবে লীনা আপা ডায়লগ দেবার সময় শুরুর সব কথাতেই কি সুন্দর করে হাসে, এই মেয়ে সেটা করে না। এই মেয়ে একটু বেশি গম্ভীর। এই গাম্ভীর্যটাও ভালো লাগে। হাসিটাও ভালো লাগে। কে জানে কোনটা বেশি ভালো।

মজনু ভেতরে উঁকি দিল। উঁকি দেবার মূল কারণ আজমল হুদা এসেছে কিনা তা দেখা।

না আসে নি।

তার মায়ের অসুখ বোধ হয় আরো বেড়েছে। এইসব বুড়া–বুড়ি মা বাবা নিয়ে বড় যন্ত্রণা। কাজের কাজ কিছু করে না, অসুখ বাঁধিয়ে অন্য সবের কাজের ক্ষতি করে। মজনুর খুবই মন খারাপ হল। এর মধ্যেও যা একটু আনন্দের ব্যাপার তা হচ্ছে অনেকদিন পর লীনা আপা এসেছে। একদম কোণার দিকের একটা চেয়ারে একা–একা বসে আছে। স্টেজের উপরে আসিফ এবং পুষ্প। আসিফ নিচু গলায় পুষ্পকে কি যেন বলছে, পুষ্প মন দিয়ে শুনছে। লীনা আপা একদৃষ্টিতে ঐ দিকে তাকিয়ে আছে।

মজনু লীনার সামনে এসে বলল, 'কেমন আছেন আফা?'

'ভালো। তুই কেমন আছিস রে মজনু?'

'জ্বি ভালো।'

লীনা হাসিমুখে বলল, 'পুষ্প কেমন পার্ট করছে রে মজনু? তোর তো আবার সব কিছুতে নম্বর দেয়া। পুষ্প কত নম্বর?'

'তিন নম্বরে আছে আফা।'

'দু নম্বরে কে আছে?'

'আজমল সাব?'

'তাই নাকি?'

'জ্বি। কাজটা অনুচিত হইছে আফা। আজমল সাবের মতো লোকরে ছোড একটা পাট দিছে।'

'ছোট হলেও খুব গুরুত্বপূর্ণ রোল। তার উপর ভর করেই তো নাটক দাঁড়িয়ে আছে।'

'কথাডা ঠিক।'

মজনুর বড় ভালো লাগে। লীনা আপা তার সাথে হেলা ফেলা করে কথা বলে না। তার কথা শুনে অন্যদের মতো হেসে ফেলে বলে না—যা ভাগ। কি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিল কেন আজমল সাবের পার্ট এত ছোট। জিনিস থাকলে ছোট পার্ট দিয়েও আসর মাত করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজমল সাব যতক্ষণ স্টেজে থাকে ততক্ষণ শরীরের রক্ত গরম হয়ে থাকে। মনে হয় কি শালার দুনিয়া। লাথি মারি দুনিয়ায়।

লীনা বলল, 'আজ আমাকে একটু চা দিস তো মজনু। চা খেতে ইচ্ছা করছে।'

'আনতাছি আফা। হুনলাম বিদেশ যাইতাছেন?'

'ইন্ডিয়া যাচ্ছি, দূরে কোথাও না। তুই কার কাছে শুনলি?'

'বলাবলি করতেছিল। কবে যাইতেছেন আফা?'

'পরশু। পরশু রাত ন'টার ফ্লাইটে। তোর জন্যে কি কিছু আনতে হবে?'

'না আফা।'

আনন্দে মজনুর চোখে প্রায় পানি এসেই যেত, যদি না প্রণব বাবু চেঁচিয়ে বলতেন, 'গাধা, চা কই? এক ঘন্টা আগে চা দিতে বলেছি।' মজনু চা আনতে গেল। চা বানাতে-বানাতেই শুনল সেকেণ্ড সিন হচ্ছে। সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছে। প্রতিটি ডায়লগ তার মুখস্থ। অনেকেই যেমন গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান গায়, মজনুও অভিনেতার সঙ্গে-সঙ্গে অভিনয় করে। তার বড় ভালো লাগে। এই মুহূর্তে সে করছে লেখকের ভূমিকা। তার মনে হচ্ছে সে খুব ভালো করছে। মনটা তার খানিকটা খারাপও লাগছে। এত চমৎকার অভিনয়, অথচ কেউ দেখতে পারছে না। অন্তত এক জন যদি দেখত।

মজনুর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হল। মোটর সাইকেল ভট ভট করতে করতে আজমল চলে এসেছে। লাস্ট সিনটা আজ তাহলে হবে। ঘুম ভেঙে আজ সে কার মুখ দেখেছিল কে জানে। বিউটি সেলুনের ছেলেটার মুখ বোধ হয়। ঐ ছেলেটার মুখ দেখলে তার দিনটা খুব ভালো যায়।

আজমল লীনার পাশের চেয়ারে এসে বসেছে। সে সিটি কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক। তার বিশাল চেহারা, বিশাল গোঁফ দেখে ঠিক অনুমান করা যায় না। বড়-সড় চেহারার মানুষগুলোর গলার স্বর সাধারণত খুব কোমল হয়। আজমলের বেলায় তা হয় নি। সে কথা বললে হল কাঁপে।

লীনা বলল, 'আপনার মার শরীর এখন কেমন?'

আজমল বলল, 'ভালো, মানে খুব না, খানিকটা ভালো। হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি। হাঁটুতে কি একটা অপারেশন না কি হবে।'

'কবে হবে?'

'জানি না কবে। বউ দৌড়াদৌড়ি করছে, সে-ই জানে?'

স্ত্রীর কথা বলতে গিয়ে আজমল ভ্রূ কুঞ্চিত করল। লীনা হাসি মুখে বলল, 'ভাবির সঙ্গে আবার ঝগড়া হয়েছে?'

'হুঁ।'

'এবার কী নিয়ে ঝগড়া করলেন?'

'তার ধারণা আমি কোনো কিছুই দেখি না। শুধু নাটক নিয়ে থাকি।'

'ধারণা কি ভুল?'

'অবশ্যই ভুল। নিয়মিত ক্লাস করি। প্রাইভেট টিউশানি করি, প্রতিদিন সকালে বাজার করি। এরচে বেশি' কোন পুরুষটা কী করে? ঝগড়া করার জন্যে অজুহাত দরকার, এটা হচ্ছে একটা অজুহাত। ঐ যে সিংহ ছাগল ছানার গল্প। সিংহ বলল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাটা তুই জল ঘোলা করছিস কেন?.

লীনা বলল, 'আপনি মনে হচ্ছে ভাবির উপর খুব রেগেছেন।'

'রাগব না? অফকোর্স রাগব।—ভাবি, এটাই কি নতুন মেয়ে নাকি? বাহ্, অভিনয় তো খুব ভালো করছে। একসেলেন্ট—নাম কি?'

'পুষ্প।'

'মনটা খারাপ হয়ে গেল ভাবি।'

'কেন?'

'এই মেয়েকে বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না। টেলিভিশন ছোঁ মেরে নিয়ে নেবে, তারপর আসবে ফিল্মের লোকজন। আর তা যদি নাও আসে মেয়েটির অভিনয় দেখে কোনো এক জন ছেলে তার প্রেমে পড়বে। বিয়ে হয়ে যাবে। বিয়ের পর ঐ ছেলে আর মেয়েটিকে অভিনয় করতে দেবে না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল ভাবি। খুবই খারাপ। মেয়েটার কী নাম বললেন?'

'পুষ্প।'

'আমি নিজেই তো মনে হচ্ছে প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। মাই গড, দারুণ মেয়ে তো!'

লীনা খিলখিল করে হেসে ফেলল। স্টেজ থেকে বিরক্ত চোখে আসিফ তাকাচ্ছে। লীনা হাসি বন্ধ করার জন্যে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বারান্দায় চলে গেল। তার এই জাতীয় হাসাহাসির মূল কারণ হচ্ছে যখনই গ্রুপে কোনো নতুন মেয়ে আসে, আজমল সবাইকে বলে বেড়ায় সে এই মেয়েটির প্রেমে পড়ে গেছে।

আসিফ লীনাকে নিয়ে রিকশা করে ফিরছে। জলিল সাহেব একটা পিকআপ নিয়ে এসেছিলেন। তিনি লিফট দিতে চাইলেন। আসিফ রাজি হল না। বৃষ্টিতে আধভেজা হয়ে বাড়ি ফেরার নাকি আলাদা একটা মজা আছে।

বৃষ্টি অবশ্য থেমে গেছে। তবে আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বিজলি চমকাচ্ছে। ব্যাঙ ডাকছে। ঢাকা শহরে এখনো ব্যাঙ আছে। এবং বৃষ্টি দেখলে এরা গলা ফুলিয়ে ডাকে—এটাই একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা। লীনা বলল, 'ব্যাঙ ডাকছে, শুনছ?'

'হ্যাঁ শুনছি।'

'গ্রাম-গ্রাম লাগছে না?'

'কিছুটা।'

'এত বড় শহর হয়েও ঢাকার মধ্যে গ্রাম ব্যাপারটা রয়েই গেল!'

'হ্যাঁ। আজিমপুরের কাছে যারা থাকে তারা শেয়ালের ডাকও শোনে। ঐদিকটায় এখনো শেয়াল আছে।'

খানাখন্দ ভরা রাস্তা। রিকশা খুব ঝাঁকুনি দিচ্ছে। আসিফ ডান হাত দিয়ে লীনাকে জড়িয়ে ধরল। লীনার গা একটু যেন কেঁপে উঠল। সে নিজে এতে খানিকটা অবাকও হল। এত দিন পরেও আসিফ তার গায়ে হাত রাখলে গা কেঁপে ওঠে। মনটা তরল ও দ্রবীভূত হয়ে যায়। কোত্থেকে যেন উড়ে আসে খানিকটা বিষণ্নতা।

আসিফ বলল, 'শীত লাগছে লীনা?'

'না।'

'পুষ্পের অভিনয় কেমন দেখলে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভালো, খুব ভালো। কল্পনা করা যায় না এমন ভালো।'

'আসলেই তাই।'

লীনা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'ও যে কেন এত ভালো অভিনয় করছে তা কি তুমি জান?'

আসিফ গম্ভীর গলায় বলল, 'জানি।'

'বল তো কেন?'

'ধাঁধা?'

'হ্যাঁ ধাঁধা। বলতে পারলে তোমার জন্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।'

'কী পুরস্কার?'

লীনা ইংরেজিতে বলল, 'ঝড়–বৃষ্টির রাতে যে ধরনের পুরস্কারে পুরুষরা সবচে বেশি আনন্দিত হয় সেই পুরস্কার।'

আসিফ সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে সহজ গলায় বলল, 'মেয়েটা খুব ভালো অভিনয় করছে, কারণ সে আমার প্রেমে পড়ে গেছে। ধাঁধার জবাব কি ঠিক হয়েছে লীনা?'

লীনা বেশ খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। ব্যাপারটা তুমি কখন টের পেলে?'

'প্রথম দিনেই টের পেলাম। অভিনয়ের এক পর্যায়ে তার হাত ধরতে হয়। হাত ধরেছি, হঠাৎ দেখি থরথর করে তার আঙুলগুলো কাঁপছে।'

'ভয় থেকেও কাঁপতে পারে। নার্ভাসনেস থেকেও পারে।'

'তা পারে। তবে এতদিন হয়ে গেল অভিনয় করছে, এখনো তার হাত ধরলে এরকম হয়।'

লীনা চুপ করে রইল। আসিফ হেসে বলল, 'একই ব্যাপার কিন্তু তোমার বেলায়ও ঘটে। হাত ধরলে তুমিও কেঁপে ওঠ। তুমি নিজে বোধ হয় তা জান না। নাকি জান?'

লীনা গাঢ় স্বরে বলল, 'জানি।'

আসিফ বলল, 'পুষ্পের ব্যাপারে তোমার কি.

লীনা আসিফকে কথা শেষ করতে দিল না। কথার মাঝখানেই বলল, 'আজিমপুরের দিকে সত্যি–সত্যি শেয়াল ডাকে নাকি? একদিন শেয়ালের ডাক শোনার জন্যে যেতে হয়। অনেকদিন শোনা হয় নি।'

'তুমি ইন্ডিয়া থেকে ঘুরে আস, তারপর একদিন যাব।'

আসিফ বাঁ হাতে লীনার হাত মুঠো করে ধরল। লীনার আঙুল কেঁপে উঠল। আসিফ লীনার দিকে না তাকিয়েই তরল গলায় হাসল।

৮

পুষ্প থাকে পুরনো ঢাকায়।

চানখাঁর পুল থেকে ভেতরের দিকে যেতে হয়। বিরাট দোতলা বাড়ি। উপরের তলা ভাড়া দেয়া। নিচের তলায় ভাগাভাগি করে পুষ্পরা থাকে এবং পুষ্পের বড়চাচা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকেন। পুষ্পের বাবা এবং বড়চাচা দু'জনেই ওকালতি করেন। দু'জনেরই পসার নেই। পুষ্পের বাবা এজাজুদ্দিন ওকালতি ছাড়াও হোমিওপ্যাথি করেন। হোমিওপ্যাথিতে তাঁর কিছুটা পসার আছে। লোকজন বাসায় এসে ভিজিট দিয়ে ব্যবস্থাপত্র নেয়।

পুষ্পদের বাসায় অনেকগুলো ভাইবোন। নিজের এবং চাচাতো বোনদের সংখ্যা সাত। ভাই ছ'জন। এরা রাতে কে কোথায় ঘুমায় কোনো ঠিক নেই। প্রায়ই দেখা যায় অনেক রাতে এক জন পড়াশোনা শেষ করে উঠেছে। কোথায় ঘুমাবে জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

রান্না দু'বাড়িতে আলাদাভাবেই হয়, তবে কে কোন বাড়িতে খাবে তারও কোনো ঠিক নেই। পুষ্পের বড়চাচা খলিলুদ্দিন বেশিরভাগ সময়ই পুষ্পদের সঙ্গে খান। নিজের স্ত্রীর রান্না তিনি খেতে পারেন না। খেতে বসে বেশিরভাগ সময়ই খুব অপমানসূচক কথা বলেন। আজ তাই বলছেন। আজ রান্না হয়েছে তেলাপিয়া মাছ। তিনি মুখে দিয়েই থু করে ফেলে দিলেন এবং থমথমে গলায় বললেন, 'জিনিসটা কি?'

তাঁর স্ত্রী হাসিনা ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'তেলাপিয়া মাছ।'

'তেলাপিয়া মাছ রাঁধতে তোমাকে কে বলল?'

'সবাই খায়।'

'সবাই খায়? কোন শালা তেলাপিয়া মাছ খায়? বল কোন শালা খায়?'

তিনি মাছের বাটি উল্টে ফেলে গট গট করে উঠে পাশে ছোট ভাইয়ের বাসায় খেতে গেলেন। সেখানেও তেলাপিয়া মাছ রান্না হয়েছে। তবে সেখানে তিনি কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না।

পুষ্প এই দুই পরিবারেরই বড় মেয়ে। পরিবারে সবচে বড় মেয়েকে কখনো ঠিক বড় মনে হয় না। মনে হয় সে ছোটই রয়ে গেছে। পুষ্প সম্পর্কে এই ধারণা আরো কিছুদিন থাকতো, তবে এখন আর নেই। পুষ্প রিহার্সেলে রোজ শাড়ি পরে যাচ্ছে। শাড়ি পরলেই মেয়েটাকে তরুণীর মতো দেখায়।

পুষ্পের বাবা এজাজুদ্দিন ভেবেছিলেন দু'এক দিনের ব্যাপার। এখন মনে হচ্ছে দু'একদিনের ব্যাপার না। রোজই যাচ্ছে। ওরা অবশ্যি গাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছে দিয়ে যাচ্ছে। এবং দোতলার ভাড়াটে মেয়েটাও যাচ্ছে। তবু একটা অস্বস্তি থেকেই যায়। স্বভাব-চরিত্রে কোনো দাগ পড়ে গেলে মুশকিল।

এজাজুদ্দিন স্ত্রীকে ক'দিন ধরেই এই কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করছেন। গম্ভীর গলায় বলছেন, 'একটা দাগ পড়ে গেলে খুব মুশকিল। দাগ তো শরীরের কোনো অসুখ না যে থুজা টু হানড্রেড দেব আর রোগ আরাম হবে।'

এজাজুদ্দিন সাহেবের স্ত্রী মমতা তাঁর স্বামীর কোনো মতামতকেই তেমন পাত্তা দেন না। মেয়ের নাটক করার ব্যাপারে তাঁর সায় আছে। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হয়েও আছে। কেন আছে এই ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার নয়। একদিন তিনি মেয়ের অভিনয়ও দেখে এলেন। মেয়েকে শুধু বললেন, 'ছেলেটার গায়ের উপর এমন লেপ্টে পড়ে যাওয়ার দরকার কি? একটু দূরে-দূরে থাক।'

পুষ্প বলেছে, 'আচ্ছা।'

মমতা বলেছেন, 'যখন ছেলেটা হাত ধরবে, তখন হাত ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিবি। যে বউয়ের দিকে ফিরেও তাকায় না, খালি বই লেখে—তার সঙ্গে এত কি মাখামাখি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝলি, হাত ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিবি।'

পুষ্প হেসে বলেছে, 'আচ্ছা।'

'তোর স্বামী হয়েছে যে, ঐ ছেলেটা কে?'

'তার নাম আসিফ।'

'বিয়ে করেছে?'

'হুঁ।'

'বউকে তো দেখলাম না।'

'উনি এখন আসেন না। শরীর ভালো না।'

'দেখতে কেমন?'

'খুব সুন্দরী। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়।'

ছেলেটির স্ত্রী খুবই সুন্দরী, এটা শোনার পর মমতার দুশ্চিন্তা পুরোপুরি চলে যায়। থিয়েটারের লোকগুলোকে তাঁর ভালোই লাগে। বিশেষ করে মেয়েগুলোকে। এর মধ্যে এক জন—যে মায়ের ভূমিকা করে তাঁকে তাঁর খুবই মনে ধরল। দেখেই মনে হয় শক্ত ধরনের মহিলা। এরকম শক্ত ধরনের মহিলা থাকলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। মমতা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হলেন। মহিলাকে বললেন, 'আমার মেয়েটাকে একটু চোখে চোখে রাখবেন।' সেই মহিলা সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, 'সে কি, আপনার মেয়ে তো আমারও মেয়ে।' মমতা বড় শান্তি পেলেন।

পুষ্প যে পরিবার থেকে এসেছে, সেই পরিবারের সদস্যরা কোনো কিছু নিয়েই তেমন মাথা ঘামায় না। এতগুলো ছেলেমেয়ে যেখানে বড় হয় সেখানে কারো উপর তেমনভাবে নজর রাখা যায় না। কেউ অন্যায় কিছু করলেও তা মনে থাকে না। এজাজুদ্দিন সাহেব একদিন দেখলেন এ বাড়ির এক জন ছেলে রাস্তায় পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে এলেন। অপরাধী কে তা তিনি ঠিক ধরতে পারলেন না। কে ছিল? বাবলু না মহিন? অনেকক্ষণ হৈ-চৈ করার পর তাঁর রাগ কমল।

পুষ্প হৈ-চৈ কান্নাকাটি করে থিয়েটারে যোগ দেবার ব্যবস্থা করেছে। প্রথমে ব্যাপারটায় সবার খুব আপত্তি থাকলেও, এখন মনে হচ্ছে কারোর মনেই নেই। পুষ্পর চাচা একদিন রাতে গাড়ি থেকে নামতে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'কোত্থেকে আসছিস?'

পুষ্প বলল, 'থিয়েটার থেকে।'

'থিয়েটার! কিসের থিয়েটার?'

'ভুলে গেছেন চাচা? আমি একটা নাটক করছি না?'

'নাটক, কবে?'

'সামনের মাসে।'

'ও আচ্ছা-আচ্ছা। রাত-বিরাতে ফিরতে হয় নাকি? এটা তো ভালো কথা না। দশটা বাজে। দশটা পর্যন্ত নাটক করলে পড়বি কখন?'

'এই নাটকটা করে আর করব না চাচা।'

'গুড। ভেরি গুড।'

রিহার্সেল থেকে পুষ্প সব সময় হাসিখুশি হয়ে ফেরে। আজ তার মুখটা কালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন বিরাট কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। অথচ রিহার্সেলে তার সময়টা খুব ভালো কেটেছে। আজমল নামের এক জন ভারিক্কি ধরনের লোক তাকে অনেক মজার-মজার কথা বলেছে। সেই সব কথার মধ্যে একটা হচ্ছে, 'এই মেয়ে, ফস করে কাউকে বিয়ে করে বসবে না। তাহলে নাটক মাথায় উঠবে। তোমার অভিনয় খুব ভালো হচ্ছে। কিছুদিন পর দেখবে পথে বের হতে পারবে না। অটোগ্রাফ-অটোগ্রাফ বলে লোকজন মাথা খারাপ করে দেবে। অটোগ্রাফ কী করে দিতে হয় সেটাও শিখে নাও। খুব সহজ একটা সিগনেচার তৈরি কর, যাতে খুব দ্রুত অটোগ্রাফ দিতে পার। কালো চশমা পরা অভ্যেস করতে হবে। যাতে লোকজন চট করে চিনতে না পারে।'

লীনা আপাও তার সঙ্গে অনেক কথা বললেন। গায়ে হাত রেখে এত আন্তরিকভাবে কথা বললেন যে, তার চোখ প্রায় ভিজে উঠল। রিহার্সেল পুরোপুরি শেষ হবার পর সবাই মিলে যখন চা খাচ্ছে তখন তাকে বললেন, 'তোমার জন্যে কি কিছু আনতে হবে পুষ্প? আমি ইন্ডিয়া যাচ্ছি। তোমার পছন্দের কোনো জিনিস যদি থাকে তাহলে বল। আমি অবশ্যই নিয়ে আসব। তবে খুব দামি কিছু আনতে বলবে না। আমার হাতে তেমন টাকা পয়সা নেই।'

পুষ্প বলল, 'আমার জন্যে চন্দন কাঠের একটা পুতুল আনবেন।'

'অবশ্যই আনব।'

'আপনি কতদিন থাকবেন?'

'শুরুতে কথা হয়েছিল দশ দিনের। এখন শুনছি এক মাসের প্রোগ্রাম হচ্ছে। তবে আমি এতদিন থাকব না। তোমাদের নাটকের আগে অবশ্যই ফিরে আসব।'

পুষ্প বলল, 'নাটক আপনাদের খুব প্রিয়?'

'হ্যাঁ প্রিয়। খুবই প্রিয়। নাটকের একটা দল মানে—পরিবারের বাইরে একটা পরিবার।'

পুষ্প চুপ করে রইল।

লীনা বলল, 'কিছুদিন যাক, তখন তুমিও এটা বুঝবে। সবাই কিছুদিন পর-পর একসঙ্গে হতে না পারলে দেখবে ভালো লাগছে না। অস্থির-অস্থির লাগছে। গ্রুপ নাটকের কত সমস্যা, তার পরেও যে গ্রুপ নাটক টিকে আছে—কেন আছে? এই কারণেই আছে।'

বিদায় নেবার সময় লীনা আপা তার দিকে তাকিয়ে এমন মিষ্টি করে হাসল, তবু তার অসম্ভব মন খারাপ হল। কারণটা খুব অদ্ভুত।

বৃষ্টি পড়ছিল বাইরে। তারা সবাই বারান্দায়। জলিল ভাই বললেন, 'সবাইকে আমি গাড়িতে পৌঁছে দেব। দরকার হলে দু'ট্রিপ দেব। নো প্রবলেম। সবাই তাতে খুশি। আর আশ্চর্য, আসিফ ভাই বলল, 'আমাদের পৌঁছে দিতে হবে না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রিকশায় করে যাওয়ার অন্যরকম আনন্দ আছে। কাজেই শুভ রাত্রি।'

তারা সত্যি-সত্যি রাস্তায় নামল। আসিফ ভাই লীনা আপার হাত ধরে হাঁটছেন। বৃষ্টির মধ্যে দু'জন নেমে যাচ্ছে।

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে হাঁটছে! কি অপূর্ব দৃশ্য। প্রথম কয়েক মুহূর্ত পুষ্পের মন আনন্দে পূর্ণ হল। তার পর-পরই চোখে পানি এসে পড়ার মতো কষ্ট হতে লাগল।

কেন তার কষ্ট হচ্ছে এটা সে জানে। কিন্তু তার বিশ্বাস করতে মন চাচ্ছে না। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কষ্টের কারণটা সে জানে, অথচ কাউকে সে বলতে পারবে না—এও একটা বিরাট কষ্ট। ভালো এক জন বন্ধু যদি তার থাকত, তাহলে কি সে তাকে এটা বলতে পারত? না পারত না। কোনোদিন কাউকে এটা বলা যাবে না। চিরকাল গোপন রাখার মতো কিছু কিছু ঘটনা সব মানুষের জীবনেই হয়ত ঘটে। বাইরের কেউ কোনোদিন তা জানতে পারে না। বড়চাচার মেয়ে মিতুরও একটা গোপন কথা আছে, যা সে কাউকে বলতে পারবে না। শুধু পুষ্পকে একদিন কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, 'একটা গোপন কথা তোকে বলব। কাউকে না বলতে পারলে আমি মরে যাব।'

পুষ্প বলল, 'কী?'

মিতু বলল, 'কিছু না, এম্নি ঠাট্টা করছি।' বলতে বলতে আবার কেঁদে অস্থির হল। মিতুর গোপন কথা পুষ্প জানে না। মিতু বলে নি। কাউকে হয়ত সে আর বলবে না। গোপন কথা গোপনই থেকে যাবে।

পুষ্প বাড়িতে ঢুকে শান্ত ভঙ্গিতে হাত-মুখ ধুয়ে মাকে গিয়ে বলল, 'ভাত দাও মা।'

মমতা বললেন, 'তোর কী হয়েছে রে? এমন লাগছে কেন?'

'ভীষণ মাথা ধরেছে। খেয়ে শুয়ে পড়ব।'

'তোর চাচীর ওখানে গিয়ে খেয়ে আয়। ডাল ছাড়া ঘরে আর কিছু খাবার নেই।'

'ডাল দিয়েই খাব। ও ঘরে এখন আর যেতে ইচ্ছা করছে না।'

মমতা উঠে গিয়ে রান্নাঘরেই মেয়েকে ভাত বেড়ে দিলেন। পুষ্প বলল, 'তুমি খাবে না মা?'

মমতা বললেন, 'বুকে অম্বলের ব্যথা উঠেছে, এক কাপ দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ব। তোকে একটা ডিম ভেজে দেই।'

'দাও।'

মমতা ডিম ভাজতে ভাজতে বললেন, 'আজ এক কাণ্ড হয়েছে—সন্ধ্যাবেলা একটা গাড়ি করে দু'তিন জন মহিলা এসে উপস্থিত। কাউকে চিনি না। বললাম—কাকে চান?'

'মোটামতো একজন মহিলা বললেন, আমরা আপনার প্রতিবেশী, বেড়াতে এসেছি। আমার তখনি সন্দেহ হল। প্রতিবেশী হলে গাড়ি করে আসবে কেন? কেমন অস্বস্তি-অস্বস্তি ভাব। হেন তেন নানান কথার পর ফস করে বলল, আপনার বড় মেয়েটার কি বিয়ে দেবেন? চিন্তা কর অবস্থা। চিনি না জানি না এসেই বলে কি- না—বড় মেয়ের বিয়ে দেবেন?'

পুষ্প বলল, 'তুমি কী বললে?'

'আমি আবার কী বলব? আমি বললাম, জ্বি না। মেয়ের বিয়ের কথা এখনো ভাবছি না। ওমা, তার পরেও যায় না। বসেই আছে।'

পুষ্প বলল, 'চুপ কর তো মা। শুনতে ভালো লাগছে না।'

'আহা, আসল মজাটা তো শুনলি না। খুব ফর্সা করে এক জন মহিলা আছেন, উনি বললেন—বিয়ের সম্পর্ক এলে মুখের উপর না বলতে নেই আপা। প্রপোজাল শুনুন, তারপর বলুন না।'

'আমি বললাম, এম. এ পাশ করার আগে মেয়ের বাবা মেয়ের বিয়ে দেবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভদ্রমহিলা বললেন, এম. এ পাশ তো বিয়ের পরেও করতে পারে। কী যে যন্ত্রণা। কিছুতেই যাবে না।'

'তারপর বিদেয় করলে কী ভাবে?'

'শেষ পর্যন্ত বললাম, আপা, আমাদের এক জায়গায় যাবার কথা আছে। তারপর উঠল।'

পুষ্প বলল, 'তোমার মজার কথা শেষ হয়েছে, না আরো বাকি আছে?'

'আসলটাই তো বলা হয় নি। ওরা চলে গেলে দেখি টেবিলের উপর চশমা পরা একটা ছেলের ছবি। ইচ্ছা করে ফেলে গেছে। মিতুর কাছে ছবিটা আছে। দেখতে চাইলে ওকে বল।'

'আমি কেন দেখতে চাইব?'

'আহা রেগে যাচ্ছিস কেন? দেখতে না চাইলে দেখবি না। নাটক থিয়েটার করতে পারিস, একটা ছেলের ছবি দেখলে তোর মান যাবে নাকি?'

'নাটক থিয়েটার আমি আর করব না।'

'কী বললি?'

'নাটক আমি আর করব না।'

'হঠাৎ কী হল?'

'আমার ভালো লাগছে না।'

পুষ্প উঠে চলে গেল। সে রাতে মিতুর সঙ্গে শোয়। আজ নিশ্চয়ই দেশের বাড়ি থেকে কেউ এসেছে। চিড়িয়াখানা দেখবে কিংবা চিকিৎসা করাবে। কারণ মিতুর বিছানায় অপরিচিত এক জন মহিলা ঘুমুচ্ছেন। মিতুও তার স্বভাব মতো হাত পা ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। পুষ্প তার নিজের শোবার জায়গা খোঁজার জন্যে ব্যস্ত হল না। ভেতরের দিকের বারান্দায় চলে গেল। রেলিং দেয়া বারান্দার এক কোণে একটা ইজিচেয়ার। পুষ্পর বাবা এই চেয়ারে বসে রোজ সকালে খবরের কাগজ পড়েন। রাতে চেয়ারটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। আজ নেয়া হয় নি।

পুষ্প চেয়ারে এসে বসল। বৃষ্টি হচ্ছে না। ঝিঁঝি ডাকছে। ঝিঁঝি ডাকা মানে বাকি রাতটায় আর বৃষ্টি হবে না। আকাশ পরিষ্কার হয়ে চাঁদ উঠবে। চাঁদ উঠলে পুষ্পদের বাড়ির ভেতরটা খুব সুন্দর দেখা যায়। ভেতরের উঠোনে দুটো প্রকাণ্ড কামিনী গাছ আছে। সেই গাছে চাঁদের আলো পড়ে। বড়ই রহস্যময় লাগে।

পুষ্প চুপচাপ বসে আছে। বসে থাকতে থাকতে এক সময় সে ঘুমিয়েও পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চমৎকার একটা স্বপ্নও দেখল। এই স্বপ্নটি বড় মধুর ছিল, তবু সে ঘুমের মধ্যেই খুব কাঁদল।

৯

খুব ভোরে লীনার ঘুম ভাঙল। এই ভোরগুলোকেই বোধ হয় কাকভোর বলে। তারস্বরে কাক ডাকছে। ঘরের ভেতর আঁধার ও আলো। সেই আলো–অন্ধকারে মিশে পৃথিবীটাকে অন্যরকম করে রেখেছে। শহরের ভোরে পাখির ডাক শোনা যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্কশ কাক ডাকে। কাককে তো আর কেউ পাখি ভাবে না।

আসিফ পাশ ফিরে ঘুমুচ্ছে। একটা হাত মুখের উপর ফেলে রাখায় মুখ দেখা যাচ্ছে না। লীনার একবার ইচ্ছা করল, আসিফকে ডেকে তোলে। এত আরাম করে সে ঘুমুচ্ছে যে ডাকতে ইচ্ছা করল না। লীনা দরজা খুলে বাইরে এল। রান্নাঘরে খুটখুট শব্দ হচ্ছে। বেনু তার বাচ্চার জন্যে দুধ গরম করছে। লীনা রান্নাঘরে ঢুকল। চায়ের পানি চড়াবে। অনেকদিন বেড-টি খাওয়া হয় না।

বেনু মুখ তুলে লীনাকে দেখল। কিছু বলল না। বেনুর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। লীনা বলল, 'বাচ্চা জেগে গেছে?'

'জ্বি।'

'চা খাবে বেনু? আমি চা করছি।'

'চা খাব না। আজ আপনি চলে যাবেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'মন খারাপ লাগে?'

'একটু লাগে। তোমারও কি মন খারাপ? কেমন যেন লাগছে। ঝগড়া-টগড়া হয়েছে?'

বেনু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমার মনটা খুব খারাপ। খুকির বাবা কাল রাতে আমাকে চড় দিয়েছে। নিজের বাবা-মা কোনোদিন আমার গায়ে হাত তুলে নাই। আর ও কি না.   ।'

বেনুর বাচ্চা কাঁদছে। সে দুধ নিয়ে চলে গেল। লীনাকে সুন্দর ভোরবেলায় অসুন্দর একটি ছবির মুখোমুখি হতে হল। বেচারা বেনু। আজ সারাদিন খুব মন খারাপ করে থাকবে।

আগামীকাল বা পরশুও এরকম যাবে। তারপর আস্তে আস্তে সব ভুলে যাবে। স্বামীর সঙ্গে হাসবে, গল্প করবে। স্বামীর প্রয়োজনে লাজুক ভঙ্গিতে ব্লাউজের হুক খুলবে। তারপর আবার একদিন এ রকম একটা কাণ্ড ঘটবে। স্বামী চড় বসাবে কিংবা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে মেঝেতে।

লীনা দু'কাপ চা বানিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল। আসিফ একটা চাদর টেনে গলা পর্যন্ত ঢেকে নিয়েছে। বেচারার বোধ হয় শীত করছিল। ডেকে তুলে চা খেতে বলবে? না থাক, বেচারা ঘুমুক। যদিও ডেকে তুললেই ভালো হত। আজ লীনা চলে যাবে। যাবার দিনটায় যত বেশি পারা যায় গল্প করা উচিত।

লীনা আসিফের পাশে বসে চা খাচ্ছে। চা খেতে খেতে হঠাৎ তার মনে হল—তাদের দু' জনের সম্পর্কে একটা অস্বাভাবিকতা আছে। আসিফ কখনো কোনো কারণেই তার সঙ্গে রাগ করে নি। চড়া গলায় কথা বলে নি। লীনা নিজে কোনো মহামানবী নয়। আসিফের রাগ করার মতো এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে অনেক কিছুই সে করেছে। অথচ সে সব যেন আসিফকে স্পর্শই করে নি। এর কারণটা কি? এও কি এক ধরনের অভিনয় নয়?

একজন বড়ো মাপের অভিনেতা কি সব সময়ই অভিনয় করে না? এক জন দক্ষ, শুধু দক্ষ নয়—অসাধারণ প্রতিভাবান অভিনেতা নিজেকে সব সময় দখলে রাখেন। সারাক্ষণ অভিনয় করে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিনয় সব মানুষই করে। যে স্ত্রীকে অসহ্য বোধ হয়, তার সঙ্গেও সে হাসি মুখে কথা বলে। অভিনেতা সেই জিনিসটাকেই অনেকদূর পর্যন্ত নিয়ে যান।

লীনা অস্বস্তি বোধ করছে। আসিফ সম্পর্কে এ রকম ধারণা তার শুধু আজ না, অনেকবারই হয়েছে। বিয়ের দ্বিতীয় বছরে সন্দেহটা তার প্রথম হল। সে লক্ষ করল ভালবাসাবাসির সময় আসিফ একেক সময় একেক রকম আচরণ করে। যেন সে ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছে। একজন মানুষ ভিন্ন–ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন–ভিন্ন আচরণ করতে পারে, কিন্তু তার মূল সুরটি কিছুতেই কাটবে না। মূল সুর অবশ্যই বজায় থাকবে। আসিফের বেলায় তা থাকে না। পুরো ব্যাপারটাই তার বেলায় বদলে যায়। অভিনয় ছাড়া এ জিনিস সম্ভব নয়।

লীনা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে একটা হাত আসিফের গায়ে রাখল। মৃদু স্বরে ডাকল, 'এ্যাই।'

আসিফ সঙ্গে–সঙ্গে জেগে উঠল। লীনা বলল, 'হাত মুখ ধুয়ে আস, চা গরম করে আনছি।'

'আরেকটু ঘুমুতে ইচ্ছা করছে যে।'

'তাহলে ঘুমাও।'

লীনা আবার বারান্দায় চলে এল। যদিও সে জানে, আসিফ ঘুমুবে না, উঠে আসবে। সে ঠিক তাই করবে যা এক জন আদর্শ স্বামীর করা উচিত। এর বাইরে সে একচুলও যাবে না।

আসিফ সত্যি–সত্যি উঠে এল। বাথরুম থেকে হাত–মুখ ধুয়ে এসে পাশে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, 'এ তো মনে হচ্ছে একেবারে প্রত্যুষ লগ্ন।'

লীনা বলল, 'তুমি কি বেরুবে নাকি আজ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় যাবে?'

'বৃটিশ কাউন্সিলে যাব। এগারটার সময় একটা ছোটখাট ওয়ার্কসপের মতো হবে। বৃটিশ এক জন মহিলা নাটকের বিশেষজ্ঞ এসেছেন। নাটক নিয়ে কথা বলবেন, শুনে আসি। তুমি যাবে?'

'না।'

'তোমার প্লেন তো রাতে। চল না যাই।'

লীনা জবাব না দিয়ে চা আনতে গেল।

পাশের ঘরে উঁচু গলায় হাশমত আলি চিৎকার করছে, 'তুই পেয়েছিস কী? তুই ভাবস কী? তুই কি ইয়ার্কি করস? তুই আমারে চিনস না?'

গ্রাম্য ভাষা, কুৎসিত ভঙ্গির চেঁচামেচি। বেনুর গলা পাওয়া যাচ্ছে না। তবে সে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। লীনা লক্ষ করল, আসিফ খুব আগ্রহ নিয়ে ঝগড়ার কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছে। এই আগ্রহ অশোভন। অন্যদের কুৎসিত চেঁচামেচি সে এত আগ্রহ নিয়ে শুনবে কেন? লীনা রাগ করতে গিয়েও করতে পারল না। তার মনে হল—ঝগড়াটা আসিফের শোনা উচিত। এক জন অভিনেতাকে চারপাশ থেকে শিখতে হবে। ক্যারেক্টর এ্যানালাইসিস করতে হবে। ঝগড়ার সময় কোন পর্দায় চেঁচাবে, কোন ভঙ্গিতে কথা বলবে, মুখের কোন মাংসপেশী ফুলে–ফুলে উঠবে, ভুরু কোঁচকাবে কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোঁচকাবে না, এসব লক্ষ না করতে পারলে বড় হবার পথ কোথায়?

লীনা চা এনে দিল। আসিফ চায়ে চুমুক দিয়ে একটা তৃপ্তির ভঙ্গি করল। লীনা বলল, 'হাশমত সাহেবের চেঁচামেচি শুনতে কেমন লাগছে?'

'ইন্টারেস্টিং। একটা জিনিস লক্ষ করলাম—ঝগড়ার সময় বা প্রচণ্ড রাগের সময় মানুষের গলায় কোনো রকম ভেরিয়েশন থাকে না। এক স্কেলে সে কথা বলে, এবং বলে অতি দ্রুত। আমার ধারণা, তার কথা বলার স্পিড তখন তিনগুণ বেড়ে যায়।'

লীনা ক্লান্ত গলায় বলল, 'তুমি দয়া করে হাশমত সাহেবকে বল তো চুপ করার জন্যে। এই ভোরবেলায় উনি কী শুরু করেছেন? খুব খারাপ লাগছে।'

আসিফ সঙ্গে-সঙ্গে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে উঠে চলে গেল। ভারি এবং গম্ভীর গলায় ডাকল, 'হাশমত সাহেব, এই যে হাশমত সাহেব।'

'জ্বি।'

'একটু বাইরে আসুন তো ভাই।'

'কেন?'

'আসুন। আমার সঙ্গে একটা সিগারেট খান।'

হাশমত সাহেব বিরক্ত মুখে বের হয়ে এলেন, ঝাঁঝাল গলায় বললেন, 'অসহ্য, বুঝলেন ভাই। অসহ্য, কানের কাছে রাতদিন ঘ্যানঘ্যান, ঘ্যানঘ্যান। লাইফ হেল করে দিয়েছে।'

'তাই বুঝি?'

'আর বলেন কেন ভাই। আমার মাথায় রক্ত উঠে গেছে।'

'মাঝে-মাঝে মাথায় রক্ত ওঠা ভালো। এতে ব্রেইন পরিষ্কার থাকে।' বলতে- বলতে আসিফ হাশমত সাহেবের কাঁধে হাত রেখে হাসল। লীনা দূর থেকে লক্ষ করল, এই হাসি শুধু হাসি নয়, এর মধ্যে অনেকখানি অভিনয় মিশে আছে। এই হাসি দিয়েই আসিফ অনেক কিছু বলতে চাচ্ছে। বুঝিয়ে দিচ্ছে সংসারে অবুঝ মেয়েরা থাকে। তারা অনেক অন্যায় করে। এইসব অন্যায় দেখতে হয় ক্ষমা ও প্রশ্রয়ের চোখে। সব কিছু ধরতে নেই।

'নিন হাশমত সাহেব। একটা সিগারেট ধরান, তারপর এই চমৎকার সকালটা একটু দেখুন।'

'আর ভাই সকাল। রাতে ঘুমাতে দেয় নাই। খালি ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ।'

আসিফ আবার হাসল। নিজেই সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'আরেক কাপ চা খেতে ইচ্ছা করছে। ভাবিকে ডেকে বলুন তো, আমাদের দু'জনকে দু'কাপ চা দিতে। এরকম ভোরবেলায় রাগারাগি করা ঠিক হচ্ছে না। রাগারাগিটা রাতের জন্য মুলতবি থাক। রাতে আবার নতুন উদ্যমে শুরু করবেন।'

হাশমত আলি সত্যি-সত্যি খুবই সহজ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'ও বেনু, দেখি আমাদের চা দাও তো। নোনতা বিসকিট কিছু আছে কিনা দেখ। আমার আবার খালি পেটে চা সহ্য হয় না।'

বেনু চোখ মুছে চা বানাতে গেল।

আসিফ বলল, 'বুঝলেন হাশমত সাহেব, অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি ভোর নিয়ে একটা কবিতা মনে করতে। মনে করতে পারছি না। বাঙালি কবিরা ভোর নিয়ে বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতা লেখেন নি বলে মনে হচ্ছে।'

'লিখবে কোত্থেকে বলেন? কয়টা কবি ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠে? এরা রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত জাগে, ওঠে সকাল দশটার পর।'

আসিফ শব্দ করে হেসে উঠল।

হাসি ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধির চেয়েও সংক্রামক। হাশমত আলিও হাসতে শুরু করলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'ভোরের একটা কবিতা মনে পড়ছে রে ভাই—ভোর হল দোর খোল.   হা হা হা।'

বেনু চা নিয়ে এসেছে। হাশমত বলল, 'বেনু, আসিফ ভাইকে বলেছ—যে ক'দিন ভাবি থাকবে না দু'বেলা আমাদের সঙ্গে খাবে। না খেলে আমরা খুবই মাইন্ড করব। ভালো করে বলে দাও।'

'ভাইজান কি আমার কথা শুনব?'

'অফকোর্স শুনবে। আমরা থাকতে বাইরে খাবে, এটা কি কথা। ভাইসাবের উপলক্ষে ভালো-মন্দ কিছু খাব। বেনু, জিরা বাটা দিয়ে তুমি যে গোশত রাঁধ, এইটা রাঁধবে মনে কর।'

আসিফের বড় ভালো লাগছে। কিছুক্ষণ আগে কী কুৎসিত চেঁচামেচি হচ্ছিল। এখন কী চমৎকার করেই না দু'জন কথা বলছে। এরা দু'জন ভোরের আনন্দ অনেক গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

লীনা কাপড় গোছাচ্ছে। ঠিক হয়েছে, আসিফ বৃটিশ কাউন্সিলে যাবার পথে লীনার মার বাড়িতে তাকে রেখে আসবে।

লীনা বলল, 'তুমি আবার এয়ারপোর্ট উপস্থিত হয়ো না।'

'কেন?'

'তুমি একা থাকবে, আমি চলে যাব—ভাবতেই খারাপ লাগছে। শেষে কেঁদে-টেদে ফেলব। দুলাভাই এটা নিয়ে সারাজীবন ঠাট্টা করবেন। কেউ তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা করলে আমার ভালো লাগে না।'

আসিফ বলল, 'তোমার প্লেন তো সেই রাতে। সারাদিন তোমার মার বাসায় কী করবে? তার চেয়ে চল, ঐ বৃটিশ মহিলা কী বলেন শুনি। অনেক শেখার ব্যাপার থাকতে পারে।'

'শেখার ব্যাপার থাকলে তুমি শেখ। আমার আর কিছু শিখতে ইচ্ছা করছে না।'

আসিফ ইতস্তত করে বলল, 'তোমার সঙ্গে টাকা-পয়সা বিশেষ কিছু দিতে পারলাম না। কিছু মনে কর না লীনা। যা দরকার লাগে, তুমি তোমার দুলাভাইয়ের কাছ থেকে নিও, আমি পরে ব্যবস্থা করব।'

লীনা বলল, 'সঙ্গে যা আছে, যথেষ্টই আছে। ঐ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার জন্যে কী আনব বল।'

'একটা কাজ করা পাঞ্জাবি আর জয়পুরী স্যান্ডেল।'

'আর কিছু?'

'আর কিছু না।'

'নাটকের উপর বইপত্র যদি কিছু পাই, আনব না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অবশ্যই আনবে।'

লীনা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। আসিফ বলল, 'হাসছ কেন?'

'এম্নি হাসছি। এটা যদি অভিনয়ের দৃশ্য হত, তাহলে বোধ হয় হাসাটা ঠিক হত না। তাই না?'

'কী বলছ তুমি বুঝতে পারছি না।'

'আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। আজ ভোর থেকে মাথার মধ্যে শুধু আবোল-তাবোল চিন্তা ঢুকছে। দেশের বাইরে যাচ্ছি, সে জন্যেই বোধ হয়। দেশের বাইরে তো কখনো যাই নি।'

'তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

'শরীর ঠিক আছে।'

'তুমি কেন জানি আজ অতিরিক্ত রকমের গম্ভীর হয়ে আছ। কী ব্যাপার লীনা?'

লীনা বলল, 'একটু অপেক্ষা কর। ব্যাগটা গুছিয়ে নিই, তারপর হাসি মুখে তোমার সঙ্গে গল্প করব। তুমি চাইলে জানালা বন্ধ করে, দরজার পর্দা ফেলে ঘর একটু আঁধার করে নেব। তারপর দু'জনে মুখোমুখি, গভীর দুঃখে দুঃখী, আঁধারে ঢাকিয়া গেছে আর সব।'

আসিফ তাকিয়ে আছে। লীনা হাসছে তরল ভঙ্গিতে।

AMARBOI.COM

১০

বৃটিশ মহিলার বক্তৃতা আসিফের মোটেই ভালো লাগল না। প্রথমত কথা বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে প্রতিটি শব্দ তিনি খানিকক্ষণ চিবিয়ে ছোবড়া বানিয়ে বলছেন। যা বলছেন, তার সঙ্গে অভিনয়ের যোগ তেমন নেই বলেই আসিফের ধারণা। ভদ্রমহিলা বলছেন স্টেজের ব্যাকগ্রাউন্ডের আলো এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিকের সমন্বয় বিষয়ে। সবটাই মনে হচ্ছে কচকচানি থিওরি। সিমিট্রি রেখে কী করে সিমিট্রি ভাঙতে হবে, এই সব বিষয়। ডায়নামিক ড্রামা এবং স্ট্যাটিক ড্রামার সঙ্গে আলো এবং শব্দের সম্পর্ক। এক পর্যায়ে ভদ্রমহিলা ব্ল্যাকবোর্ডে হাবিজাবি ইকোয়েশন লিখতে শুরু করলেন।

আসিফের পাশে লিটল ঢাকা গ্রুপের মন্তাজ সাহেব বসেছিলেন। তিনি নিতান্ত বিরক্ত হয়ে এক পর্যায়ে বললেন, 'এই হারামজাদী তো মনে হচ্ছে বিরাট ফাজিল। এ তো দেখি অঙ্ক করছে!'

আসিফের কাছেও সমস্ত ব্যাপারটা বোগাস বলেই মনে হচ্ছে। উঠে চলে যেতে ইচ্ছা করছে। সে বসেছে মাঝামাঝি জায়গায়, এখান থেকে চলে যাওয়া মুশকিল। এক জন উঠে দাঁড়িয়েছিল, ভদ্রমহিলা তার দিকে তাকিয়ে খড়খড়ে গলায় বললেন, 'আমি কি আমার কথায় আপনাকে আকৃষ্ট করতে পারছি না? কথায় না পারলেও রূপে তো আপনাকে আটকে ফেলার কথা। আমি কি যথেষ্ট রূপবতী নই?'

চারদিকে তুমুল হাসির মধ্যে ভদ্রলোককে মুখ কাঁচুমাচু করে বসে পড়তে হল। এ রকম অবস্থায় হলঘর ছেড়ে উঠে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ভদ্রমহিলার বক্তৃতার প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্ব শেষ হল এক ঘন্টা পর। আসিফের কাছে মনে হল, সে অনন্তকাল ধরে এই চেয়ারে বসে আছে। বক্তৃতার দ্বিতীয় পর্ব শোনার মতো মনের জোর পাচ্ছে না।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, দ্বিতীয় পর্ব হল অসাধারণ। ভদ্র মহিলা কিছু ছবি বানিয়ে নিয়ে এসেছেন। অভিনয় অংশ প্রতিটিতেই এক। হুবহু এক, কিন্তু আলো এবং শব্দের মিশ্রণ একেকটা একেক রকম। শুধু এই কারণে কেমন বদলে যাচ্ছে—অর্থ অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটা ছবি দেখাতে দেখাতে ভদ্রমহিলা ব্যাখ্যা করছেন।

'দেখুন, নাটক শুরু হয় গীর্জায়। ধর্মযাজকরা গীর্জায় নাটকের মাধ্যমে লোকদের ধর্ম শিক্ষা দিতেন। তার মানে এই নয় যে, নাটক ব্যাপারটায় ঐশ্বরিক কিছু আছে। কিছুই নেই। নাটকের মাধ্যমে আমরা মানুষের মনে আবেগ তৈরি করি। নাটকের গবেষকরা এখন কাজ করছেন আবেগ তৈরির মেকানিজম নিয়ে। নাটক তার রহস্যময়তা হারাতে বসেছে। এখন আমরা আবেগের ব্যাপারটা বিজ্ঞানের চোখে দেখতে শুরু করেছি। বিজ্ঞানের কাছে হৃদয় কিন্তু একটা রক্ত পাম্প করার যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়।'

আসিফ মুগ্ধ হয়ে গেল। বারবার মনে হল, লীনা পাশে থাকলে চমৎকার হত। একটা চমৎকার জিনিস বেচারি 'মিস' করল। আসিফের খুব ইচ্ছা করছিল ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করে—আধুনিক কালের নাটকে কি অভিনেতা-অভিনেত্রীর গুরুত্ব কমে আসবে?

গুছিয়ে ইংরেজিটা তৈরি করতে পারল না বলে জিজ্ঞেস করতে পারল না। লিটল ঢাকার মন্তাজ সাহেব বলতে বাধ্য হলেন, 'শালী জানে ভালোই! শেষ দৃশ্যে এসে শালী জমিয়ে দিয়েছে। কী বলেন আসিফ সাহেব?'

আসিফ কিছু বলল না। তার মনে এক ধরনের মুগ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। কথা বলে এই মুগ্ধতা সে নষ্ট করতে চায় না।

সারাদিনেও তার মুগ্ধতা কাটল না। কানে বাজতে লাগল রূপবতী মহিলার চমৎকার ব্যাখ্যা। একের পর এক যুক্তির ইট বিছিয়ে বিশাল ইমারত তৈরি করা।

অবশ্যি মাঝে-মাঝে এইসব যুক্তিতে ভুল থাকে। ভুল যুক্তির ইটে বিশাল ইমারতও তৈরি হয়। এক সময় সেই ভুল ধরা পড়ে। সুবিশাল প্রাসাদ মুহূর্তে ধসে যায়।

আসিফের সারাদিন কিছুই করার ছিল না। অনেক দিন পর দুপুরে টানা ঘুম দিল। ঘুম থেকে জেগে উঠে মনে হল লীনার সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করে এলে কেমন হয়। এই চিন্তাও দীর্ঘস্থায়ী হল না। লীনার কাছে যাওয়া মানেই এমন অনেকের সঙ্গে দেখা হওয়া, যাদের সঙ্গ তার ভালো লাগে না। তারচে লীনা নেই, এই ধরনের বিরহ ভালো লাগছে।

বেনু যত্নের চূড়ান্ত করছে। দুপুরে সাত-আট পদের রান্না করেছে। এর মধ্যে জিরা-মাংসও ছিল। খেতে মোটেই ভালো হয় নি, তবু আসিফ যখন বলল, 'বাহ্, এরকম কখনো খাই নি তো!' এতেই বেনুর চোখে পানি এসে গেল। বড় ভালো লাগল আসিফের।

ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসবার আগেই বেনু এসে উপস্থিত। ট্রেতে করে চা-লুচি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হালুয়া নিয়ে এসেছে। তার মুখ হাসি–হাসি। তাকে দেখে কে বলবে এই মেয়ে সকালে কেঁদে–কেটে কী কাণ্ড করেছে।

চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে বেনু বলল, 'এইবার আপনাদের নাটক দেখব ভাইজান।'

'অবশ্যই দেখবেন। আমি নিয়ে যাব।'

'আপনাকে কতবার বলছি ভাইজান, আমারে তুমি করে বলবেন। আপনারে আমি বড় ভাইয়ের মতো দেখি।'

'আচ্ছা বলব। তোমাদের ঝগড়া মিটে গেছে?'

বেনু জবাব দিল না। লজ্জিত মুখে হাসল।

'লুচিটা গরম–গরম ভাজছি ভাইজান। একটু খান।'

'পেটে একদম জায়গা নেই।'

'কিচ্ছু হবে না ভাইজান, খান। একটা খান। একটা লুচিতে কী হয়? কিছু হয় না।'

সন্ধ্যা মেলাবার পরপরই আসিফ রিহার্সেলে উপস্থিত হল। আজ একটা ফুল রিহার্সেল হবার কথা। কাঁটায়–কাঁটায় সাতটায় রিহার্সেল শুরু হবে, এ রকম কথা।

আসিফ দেখল সবাই প্রায় এসে গেছে। সবার মুখই বেশ গম্ভীর। বজলু বললেন, 'বিরাট প্রবলেম হয়েছে আসিফ।'

'কী প্রবলেম?'

'ঐ মেয়েকে নিয়ে প্রবলেম। পুষ্প।'

'কী প্রবলেম?'

'মেয়ে জানিয়েছে অভিনয় করবে না।'

'সে কি!'

'এইসব চেংড়ি–ফেংড়ি নিয়ে এখন তো দেখছি গভীর সমুদ্রে পড়লাম। কী করা যায় বল তো?'

'অভিনয় করবে না কেন?'

"তাও তো জানি না। মীনা ফিরে আসার পর আমি নিজেই গেলাম, বুঝলে—আমরা যেমন অবাক, ওদের বাসার লোকজনও অবাক। আমার প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা, বুঝলে। আমার অবস্থা দেখে পুষ্পের বাবা নিজেই বললেন, 'শেষ সময়ে তুমি তাদের অসুবিধায় ফেলছ, এটা তো ঠিক না। অন্যায়। খুবই অন্যায়।"

'পুষ্প কী বলল?'

'কিছুই বলে না। মাথাটা বাঁকা করে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু বললেই বলে—না। আমার ইচ্ছা করছিল চড় দিয়ে বাঁদীর নখরামী ঘুচিয়ে দিই।'

বজলু রাগে চিড়বিড় করতে লাগলেন। থমথমে গলায় বললেন, 'তুমি একটু আমার সঙ্গে বারান্দায় আস তো। আড়ালে তোমার সঙ্গে দু'–একটা কথা বলব।'

আসিফ বারান্দায় গেল। বজলু সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, 'তুমি একবার যাও। তুমি গেলে আসবে।'

'আমি গেলে আসবে কেন?'

'তুমি গেলে সে কেন আসবে সেটা তুমি নিজেও জান, আমিও জানি। খামোখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বাড়িয়ে লাভ আছে? তুমি তাকে নিয়ে আস—তারপর এই শোটা পার হলে মেয়েটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেই হবে। এই যন্ত্রণাটা পার হোক। যাও, জলিলের গাড়ি আছে। গাড়ি নিয়ে যাও।'

'আজ থাক। আরেক দিন যাব।'

'আজই যাও। এটা ফেলে রাখার ব্যাপার না। তুমি এক্ষুনি যাও।'

'যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

'ঠিক হবে না বেঠিক হবে এটা নিয়ে পরে বিচার-বিবেচনা করা যাবে। তুমি কথা বাড়িও না, যাও।'

পুষ্পের বাবা আসিফকে বললেন, 'আপনি বসুন, আমি দেখি মেয়েকে আনা যায় কি না। সে দরজা বন্ধ করে বসে আছে। মেয়েকে অভিনয় করতে পাঠিয়েও এক যন্ত্রণার মধ্যে পড়লাম।'

আসিফ বলল, 'আমি খুব লজ্জিত, আপনাদের অসুবিধায় ফেললাম। অবস্থা এমন যে, পুষ্প না এলে আমাদের নাটক বন্ধ করে দিতে হবে। চালিয়ে নিতে পারে, এ রকম দ্বিতীয় কেউ নেই।'

'বসুন চা খান। দেখি কী করা যায়।'

চিনি দিয়ে সরবত করে ফেলা এক কাপ ঠাণ্ডা চা আসিফ শেষ করল। পুষ্পের দেখা নেই। এক সময় পুষ্পের বাবা এসে শুকনো গলায় বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, মেয়ে দরজাই খুলছে না।'

আসিফ খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'আমি কি একবার বলে দেখব? যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে।'

পুষ্পের বাবা বললেন, 'যান বলে দেখুন। রুমি, ওনাকে দোতলায় নিয়ে যা।'

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আসিফ বলল, 'পুষ্প, দরজা খোল।'

পুষ্প সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে বলল, 'আপনি এসেছেন? আপনি নিজে এসেছেন? কি আশ্চর্য, আমাকে তো কেউ বলে নি আপনি এসেছেন!'

'তুমি অভিনয় করবে না পুষ্প?'

পুষ্প ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আপনি যা করতে বলবেন, আমি তা-ই করব।'

'তাহলে মুখটা ধুয়ে নাও। চল আমার সঙ্গে।'

গাড়িতে পুষ্প সারাক্ষণই কাঁদল। একবার শুধু ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আমি কি আপনার হাতটা একটু ধরব?'

আসিফ বলল, 'অবশ্যই। কেন ধরবে না?'

রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত রিহার্সেল হল। ফুল রিহার্সেল, প্রথম দৃশ্য থেকে শেষ দৃশ্য। বজলু সাহেব হৃষ্ট চিত্তে বললেন, 'জিনিস মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে গেছে। তোমাদের কী ধারণা?'

প্রণব বাবু বললেন, 'শেষ দৃশ্য আমার কাছে একটু লাউড মনে হয়েছে।'

'লাউড তো বটেই। এটার প্রয়োজন আছে। আর কারো কোনো কথা আছে? থাকলে বল। ফ্রি ডিসকাশন হোক। আমার মন বলছে, একটা ভালো জিনিস দাঁড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে। তবে আমার ধারণা, থার্ড সিন শ্লো হয়েছে।'

'থার্ড সিন তো শ্লোই হবে।'

'এতটা হবে না। ডেলিভারিতে এতটা সময় খাওয়ার কিছু নেই। এক জন শ্লো করবে, এক জন করবে ফাস্ট। দু' জনই শ্লো করলে হবে না। ভেরিয়েশন দরকার।'

'আমার মতে থার্ড সিন ঠিকই আছে।'

'অন্য সবারও কি তাই মত? যদি তাই হয়, তাহলে দয়া করে এখনই বলেন। আমি কোনো রকম খুঁত রাখতে চাই না।'

মজনু চা নিয়ে এল। চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বজলু সাহেব বললেন, 'জিনিস দাঁড়িয়েছে কেমন, বল তো মজনু।'

মজনু দাঁত বের করে বলল, 'ফাটাফাটি জিনিস হইছে।'

'সত্যি বলছিস?'

'সত্যি না বললে আমি বাপের ঘরের না।'

বজলু সাহেব আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। যেন মজনুর কথায় তিনি খুব ভরসা পেলেন।

আসিফের বাসায় ফিরতে রাত এগারটা বেজে গেল। দরজার বেল টিপতেই লীনা এসে দরজা খুলে দিল।

আসিফ হতভম্ব হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার?'

লীনা হাসি মুখে বলল, 'কোনো ব্যাপার না। যেতে ইচ্ছা করল না।'

'যেতে ইচ্ছা করল না মানে? ওরা চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ। মা, দুলাভাই খুব রাগারাগি করছিল।'

'যাও নি কেন?'

'ঘরে আস, তারপর বলি।'

আসিফ ঘরে ঢুকল। তার বিস্ময় এখনো পুরোপুরি কাটে নি। লীনা বলল, 'আমাকে দেখে খুশি হয়েছ?'

'তুমি যাও নি কেন সেটা আগে শুনি।'

'এয়ারপোর্টে যাবার পর হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে হল একা একা বাসায় ফিরবে। একা একা শুয়ে থাকবে। মনে হতেই চোখে পানি এসে গেল। তারপর চলে এলাম।'

'এইসব কী পাগলামী লীনা!'

'তুমি কি আমাকে দেখে খুশি হও নি?'

'হয়েছি।'

'কতটুক খুশি হয়েছ?'

'অনেকখানি।'

'তাহলে তুমি এখনো আমাকে জড়িয়ে ধরছ না কেন?'

আসিফ গভীর আবেগে তার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরল।

লীনা গাঢ় স্বরে বলল, 'আজ সারাদিন আমার কী মনে হচ্ছিল জান? মনে হচ্ছিল তুমি আমাকে ভালবাস না। তোমার ভালবাসার মধ্যে অনেকখানি অভিনয় আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখনো কি সে রকম মনে হচ্ছে?'

'না।'

সারারাত দু'জন জেগে রইল। কত অর্থহীন কথা, কত অর্থহীন হাসি। বারবার লীনার চোখে পানি আসছে, সেই পানি মুছে সে হাসছে।

আসিফ বলল, 'একটা গান কর না লীনা।' লীনা শব্দ করে হাসল। হাসতে- হাসতে বলল, 'আমার গান হয় নাকি?'

'এক সময় তো গুনগুন করতে। এখনো না হয় কর।'

'মাঝে-মাঝে কী মনে হয় জান?'

'কী মনে হয়?'

'মনে হয় অভিনয় না করে গান করলে পারতাম। গানের দিকে আমার ঝোঁক ছিল। তোমার জন্যে অভিনয়ে চলে এলাম।'

'তোমার কি মনে হয় ভুল করেছ?'

লীনা তার জবাব না দিয়ে বলল, 'সত্যি গান শুনতে চাও, গাইব?'

'গাও।'

'মাত্র চার লাইন কিন্তু।'

'গান চার লাইনেই ভালো।'

লীনা মৃদুস্বরে গাইল—'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে।' চার লাইন পর্যন্ত যেতেই পারল না। কেঁদে কেটে অস্থির হল। আসিফ বলল, 'কাঁদছ কেন?'

'জানি না কেন? আমার প্রায়ই কাঁদতে ইচ্ছে করে। তোমার করে না?'

আসিফ জবাব দেবার আগেই লীনা হঠাৎ করে বলল, 'আমি না যাওয়ায় তুমি খুশি হয়েছ তো?'

'একবার তো বললাম, খুশি হয়েছি।'

'আরেকবার বল।'

'খুশি হয়েছি। খুব খুশি হয়েছি।'

'না যাবার আরেকটা কারণও আছে। এটা তোমাকে বলি নি, কারণ তোমার মনটা খারাপ হবে।'

'মন খারাপ হবে না। তুমি বল।'

'এ মাসের সতের তারিখে আমাদের বড় মেয়ের মৃত্যুদিন। এই দিনে আমরা দু'জন দু'জায়গায় থাকব, তা কী করে হয়!'

'না, তা হয় না।'

'ঐ দিন আমরা দু'জন হাত ধরাধরি করে সারাক্ষণ পাশাপাশি বসে থাকব।'

লীনা চোখের পানি মুছে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আমার মাঝে-মাঝে কী মনে হয় জান? আমরা যদি আমাদের জীবনের সবচে প্রিয় জিনিস ছেড়ে দিই, তাহলে হয়ত আমাদের এবারের বাচ্চাটা বেঁচে যাবে। এক ধরনের সেক্রিফাইস। আমার এই কথায় তুমি কি কিছু মনে করলে?'

দীর্ঘ সময় চুপচাপ থেকে আসিফ বলল, 'না, কিছু মনে করি নি। এটা একটা কথার কথা।'

'কথার কথা কেন হবে? তোমার মনের মধ্যে এটা আছে। আছে না?' লীনা চুপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে রইল।

আসিফ বলল, 'বড় তৃষ্ণা পেয়েছে। এক গ্লাস পানি খাওয়াবে?'

লীনা বিছানা থেকে নেমে বাতি জ্বালাল। আর তখনি ওয়ারড্রোবের মাথায় রাখা ছবির ফ্রেম দু'টির দিকে আসিফের চোখ পড়ল। লোপা এবং ত্রপার বাঁধান ছবি। ট্রাঙ্কে তালাবদ্ধ থাকে। কখনো বের করা হয় না। আজ বের করা হয়েছে।

লীনা ছবি দু'টির দিকে তাকিয়ে বলল, 'সতের তারিখের পর আবার লুকিয়ে ফেলব।'

আসিফ বলল, 'লুকিয়ে ফেলার দরকার কি, থাকুক। তুমি যাও, পানি নিয়ে এস।'

আসিফ তাকিয়ে রইল ছবি দু'টির দিকে। আহ্, কী সুন্দর দুই মা-মণি! এক জন আবার রাগ করে ঠোঁট উল্টে আছে। অন্যজন কেমন চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে। যেন পৃথিবীর রহস্য দেখে তার বিস্ময়ের সীমা নেই।

আসিফের বুক জ্বালা করতে লাগল। ছবি দু'টির দিকে তাকালেই তার অসহ্য কষ্ট হয়। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'ত্রপা, ত্রপা মামণি। কেমন আছ গো?'

ত্রপা জবাব দিল না, জবাব দিল লীনা। সে স্নিগ্ধ গলায় বলল, 'পানি নাও।'

আসিফ এক চুমুকে পানি শেষ করে সহজ গলায় বলল, 'আমি আর অভিনয় করব না লীনা। তোমাকে কথা দিচ্ছি। বাতি নিভিয়ে দাও, চোখে আলো লাগছে।'

'তুমি কি আমার উপর রাগ করলে?'

'না লীনা। রাগ করি নি।'

'আমি একটা কথার কথা বললাম।'

'বাতি নিভিয়ে দাও লীনা। বাতি নিভিয়ে দাও।'

লীনা বাতি নিভিয়ে দিল।

AMARBOI.COM

১১

আসিফদের শো হল না। শো-এর দিন আসিফ এবং লীনা ছাড়া দলের সবাই একত্রিত হল। মজনু বারান্দায় চায়ের কেতলি বসিয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। বজলু সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, 'কেউ গিয়ে চড় দিয়ে গাধাটাকে থামাও তো, অসহ্য!' বলতে বলতে তিনি নিজেও কেঁদে ফেললেন। এবং কাঁদলেন শিশুদের মতো শব্দ করে। তাঁকে ঘিরে মূর্তির মতো সবাই বসে রইল। কেউ একটি শব্দও করল না। শুধু পুষ্পকে দেখে মনে হল, যে কোনো মুহূর্তে এই মেয়েটি ভেঙে পড়বে। তবে সে ভেঙে পড়ল না। সাজঘরের এক কোণায় চুপচাপ বসে রইল। বজলু সাহেব যখন বললেন, 'খামোখা বসে আছে কেন সবাই? যাও, বাসায় চলে যাও।' তখনি শুধু তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কেউ এসে সান্ত্বনার হাত তার মাথায় রাখল না।

কিছুদিন পরই থিয়েটারের এই দলটি নতুন নাটকের মহড়া শুরু করল। নাটকের নাম—হলুদ নদী, সবুজ বন। মজনু আবার তার জাম্বো সাইজের কেতলিতে চায়ের পানি বসিয়ে দিল। জলিল সাহেব জমিয়ে আদিরসের গল্প শুরু করলেন। বজলু সাহেব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তেজিত ভঙ্গিতে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। সবই আগের মতো, শুধু আসিফ এবং লীনা নেই। এরা দু'জন যেন হঠাৎ উবে গেছে। অথচ সবাই জানে তারা আগের জায়গাতেই আছে, সেই আগের বাসায়। পূর্বা নাট্যদলের যেমন কোনো পরিবর্তন হয় নি, তেমনি আসিফ এবং লীনারও কোনো পরিবর্তন হয় নি। আসিফ শুধু বলেছে, সে অভিনয় করবে না। কেন অভিনয় করবে না, সমস্যাটা কি—এই কথা পূর্বা নাট্যদলের কেউ জানতে পারে নি। অনেক চেষ্টা করেও পারে নি। শুধু পুষ্প খানিকটা জানে। তাকে আসিফ একটা চিঠি লিখেছিল।

পুষ্প,

আমার খুব ইচ্ছা ছিল মুখোমুখি কিছুক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলি, কেন অভিনয় ছেড়ে দিলাম তা তোমাকে গুছিয়ে বলি। তা সম্ভব হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না, জানতে চেও না।

দেখ পুষ্প, অভিনয় আমার বড়ই শখের জিনিস। এর কারণে আমি যেমন একদিকে সব কিছু হারিয়েছি, আবার তেমনি অনেক পেয়েছিও। লীনার মতো একটি মেয়েকে পাশে পাওয়া কত বড় ভাগ্যের ব্যাপার, তা আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। আর শুধু কি লীনা? তোমাকেও কি আমি অভিনয়ের কারণেই পাই নি? লজ্জা পেও না পুষ্প, সত্যি কথাটা বলে ফেললাম। বেশিরভাগ সময়ই আমরা সত্যি কথা লুকিয়ে রাখি, তবু মাঝে-মাঝে বলতে ইচ্ছে করে।

যে কথা বলছিলাম, অভিনয় আমার জীবনের অনেকখানি, কে জানে হয়তো-বা সবখানি। সেই অভিনয় থেকে সরে আসা যে কী কষ্টের, তা মনে হয় তুমি বুঝতে পারছ। কেন সরে এলাম? পুরোটা তোমাকে বলতে পারছি না। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, আমার এবং লীনার জীবনে একটি গভীর ট্র্যাজিডি আছে। গহীন একটি ক্ষত। লীনার কেন জানি মনে হয়েছে, আমরা দু'জনই যদি বড় কোনো সেক্রিফাইস করি, তাহলে হয়তো বা ট্র্যাজিডির অবসান হবে। লীনার মনের শান্তির জন্যে এইটুকু আমাকে করতেই হবে। অভিনয় তো জীবনের চেয়ে বড় নয়, তাই না?

তোমাকে এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য কিন্তু দুঃখের কাঁদুনি গাওয়া নয়। এই জিনিস আমি কখনো করি না। তোমাকে চিঠি লেখার একটিই কারণ, তা হচ্ছে—তুমি যেন অভিনয় ছেড়ে না দাও। অভিনয়ের যে অসম্ভব ক্ষমতা নিয়ে তুমি জন্মেছ, সেই ক্ষমতাকে নষ্ট করো না। সব মানুষকে সব ক্ষমতা দিয়ে পাঠান হয় না। যাদেরকে দেয়া হয়, তাদের উপর আপনাতেই সেই বিশেষ প্রতিভার লালন করার দায়িত্ব এসে পড়ে। তুমি অনেক বড় হবে পুষ্প। অনেক অনেক বড়। এইটি আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

সত্যি-সত্যি যদি তাই হয়, তাহলে সেদিন আমার চেয়ে সুখী কেউ হবে না, এই কথাটি তোমাকে জানানোর জন্যেই আমার দীর্ঘ চিঠি। ভালো থেক, সুখে থেক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২

পনের বছর পরের কথা।

আসিফ তার স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে ঢাকা থেকে ট্রেনে করে ময়মনসিংহে আসছেন। মেয়েটির বয়স চোদ্দ। তার নাম চন্দ্রশীলা। অসম্ভব চঞ্চল মেয়ে। এক দণ্ডও সুস্থির হয়ে বসতে পারে না। ট্রেনে সারাক্ষণ বকবক করেছে। তার মাথায় একটা রঙিন স্কার্ফ বাঁধা ছিল, জানালা দিয়ে অনেকখানি মাথা বের করায় হাওয়ায় সেই স্কার্ফ উড়ে চলে গেছে। লীনা খুব রাগ করেছেন। সেই রাগ অবশ্যি চন্দ্রশীলাকে মোটেই স্পর্শ করে নি। সে বাবার গায়ে হেলান দিয়ে কি একটা বই পড়ে হেসে কুটি কুটি হচ্ছে। লীনা বললেন, 'এসব কী হচ্ছে? চুপ করে ভদ্রভাবে বস না।'

চন্দ্রশীলা বলল, 'তুমি নিজে চুপ করে ভদ্রভাবে বসে থাক তো মা, আমাকে বকবে না। এম্নিতেই স্কার্ফ হারিয়ে আমার মনটা খারাপ।'

লীনা কঠিন কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। মেয়েটার মুখের দিকে তাকালেই সব কঠিন কথা কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। মেয়েটা অবিকল ত্রপার মতো হয়েছে। কঠিন কিছু বললেই নিচের ঠোঁট উল্টে ফেলে।

আসিফ সাহেব বললেন, 'বই টই সব ব্যাগে গুছিয়ে ফেল মা, এসে পড়েছি।'

চন্দ্রশীলা বলল, 'এত তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম কেন বাবা? আমার নামতে ইচ্ছা করছে না।'

'কী করতে ইচ্ছা হচ্ছে?'

'ট্রেনেই থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে। আচ্ছা বাবা, সারাজীবন যদি আমরা ট্রেনে-ট্রেনে থাকতাম, তাহলে ভালো হত না?'

'হ্যাঁ, ভালোই হত।'

স্টেশনে অসম্ভব ভিড়। আসিফ সাহেব অনেক কষ্টে স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে নামলেন। ভিড় ঠেলে এগুতে পারছেন না, এমন অবস্থায় লীনা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার বল তো?'

আসিফ বললেন, 'মনে হচ্ছে বিখ্যাত কেউ ট্রেন থেকে নেমেছেন। লোকজনদের হাতে প্রচুর মালা-টালা দেখা যাচ্ছে।'

চন্দ্রশীলা বাবার হাত ধরে সাবধানে ভিড় ঠেলে এগুচ্ছে। সে আড়ে-আড়ে ভীত চোখে মার দিকে তাকাচ্ছে, কারণ ভিড়ের চাপে তার বাঁ পায়ের স্যান্ডেলটি সে হারিয়ে ফেলেছে। মা জানতে পারলে আবার খোঁজাখুজি শুরু করবেন। চন্দ্রশীলার ইচ্ছা খুব তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাওয়া। একটা স্যান্ডেল গিয়েছে তো কী হয়েছে? আরেক জোড়া কিনলেই হবে। এই জোড়াটা এম্নিতেও তার পছন্দ না। ক্যাটক্যাটে হলুদ রঙ। সে এবার মেরুন রঙের স্যান্ডেল কিনবে।

চন্দ্রশীলা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। হতভম্ব হয়ে যাওয়া গলায় বলল, 'বাবা দেখ, ট্রেন থেকে কে নামছেন দেখ। পুষ্প, পুষ্প। বাবা, উনি পুষ্প না? কী আশ্চর্য, আমরা এক ট্রেনে এসেছি!'

আসিফের কাছে ভিড়ের রহস্য স্পষ্ট হল। আজকের পত্রিকায় অবশ্যি ছিল—পুষ্প ময়মনসিংহ টাউন ক্লাবে যাবে। সেখানে কি একটা অনুষ্ঠান করার কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাবা, উনি কি পুষ্প?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা, উনি কি আমাকে একটা অটোগ্রাফ দেবেন?'

'এই ভিড় ঠেলে তাঁর কাছে যাবার কোনো উপায় নেই মা।'

পুষ্প বিরাট একটা কালো চশমায় চোখ ঢেকে রেখেছে। তাঁকে ঘিরে আছে বলিষ্ঠ কিছু ছেলেমেয়ে, যেন কেউ কাছে যেতে না পারে। তবু লোকজন এগুতে চেষ্টা করছে।

'বাবা একটু দেখ না, ওনার একটা অটোগ্রাফ পাওয়া যায় কি না। আমার খুব শখ। উনি দেখতেও তো খুব সুন্দর, তাই না বাবা?'

আসিফ মেয়েকে নিয়ে ভিড় ঠেলে কাছে যেতে চেষ্টা করছেন। লীনা একা-একা দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখছেন। তাঁর চোখ জ্বালা করছে। জল আসবার আগে-আগে চোখ এমন জ্বালা করে।

আসিফ মেয়েকে নিয়ে পুষ্পের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। চন্দ্রশীলা ছোট নোটবুক উঁচু করে ধরে আছে।

পুষ্প তার হাত থেকে নোটবুক নিয়ে দ্রুত কী সব লিখে নোটবুক ফেরত দিল। চোখের কালো চশমা খুলে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল আসিফের দিকে, তারপর সবাইকে হতভম্ব করে নিচু হয়ে তাঁর পা স্পর্শ করল। পরমুহূর্তেই এগিয়ে গেল সামনে। মানুষের ভিড় বড়ই বাড়ছে। স্টেশন থেকে বের হয়ে যেতে হবে। তার দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই।

চন্দ্রশীলা কান্না-কান্না গলায় বলল, 'বাবা, উনি তোমাকে চেনেন? তুমি তো কোনোদিন বল নি। তুমি এরকম কেন বাবা?'

অভিমানে তার নিচের ঠোঁট বেঁকে গেছে। চোখে জল টলমল করছে। হয়ত সে কেঁদে ফেলবে। এই বয়সী মেয়েরা অল্পতেই কেঁদে ফেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধকারের গান

১

বুলুদের এই বাড়ির মতো বাড়ি বোধহয় ঢাকা শহরে খুব বেশি নেই।

পুরানো আমলের হিন্দু বাড়ি। তুলসি মঞ্চ আছে। ছোট্ট একটা ঠাকুর ঘর আছে। ঠাকুর ঘরের দক্ষিণে গহীন একটা কুয়া। বাড়ির গেটে সিংহের দু'টি মূর্তি।

প্রায় ত্রিশ বছর আগে, ১৯৫৮ সনে বাড়ির মালিক নিত্যরঞ্জন বাবুর কাছ থেকে বুলুর বাবা মিজান সাহেব এই বাড়ি জলের দামে কিনে নিয়েছিলেন। এত সস্তায় বাড়ি পেয়ে মিজান সাহেবের আনন্দের সীমা ছিল না। পরে দেখা গেল নিত্যরঞ্জন বাবু এই বাড়ি দু'জনের কাছে বিক্রি করেছেন এবং তৃতীয় এক জনের কাছ থেকে বায়নার টাকা নিয়েছেন। নিত্যরঞ্জন বাবুর মতো ভালোমানুষ ধরনের বোকা সোকা একটা লোক যে এই কাণ্ড করতে পারে তা মিজান সাহেব স্বপ্নেও ভাবেন নি।

মিজান সাহেবকে বাড়ির দখল নেয়ার জন্যে নানান কাণ্ড করতে হল। টাকা-পয়সা দিতে হল, কোর্ট কাছারি করতে হল। নিত্যরঞ্জন বাবুর খোঁজে একবার কোলকাতায়ও গেলেন। দেখা গেল ঠিকানাটাও ভুয়া। অনেক হাঙ্গামা করে বাড়ির দখল মিজান সাহেব পেলেন কিন্তু তাঁর কোমর ভেঙে গেল। শুরুতে তাঁর কাছে এ বাড়ি যত সুন্দর লেগেছিল বাড়িতে উঠার পর তা লাগল না। বার-বার মনে হল এই বাড়িটা ভালো না, অশুভ কিছু এখানে আছে। ছেলে-মেয়ে নিয়ে এখানে আসা উচিত হয় নি।

গেটের সিংহ দু'টিকে কোনো-কোনো রাতে জীবন্ত মনে হয়। বাড়ির পেছনের কুয়া থেকে মাঝে-মাঝে গভীর রাতে তিনি পানি ছিটানোর কল কল শব্দ পান। এ রকম শব্দ হবারও কথা নয়। হয় কেন? তিনি গেটের সিংহ দু'টি ভেঙে ফেললেন। কুয়ার কিছু করতে পারলেন না।

বুলুদের অবশ্যি এই কুয়া খুব পছন্দ। তারা যখন ছোট তখন কুয়ার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলত—'টু টু টু।' কুয়া সেই শব্দ অনেকগুণে বাড়িয়ে ফেরত পাঠাত। পরে সেই 'টু-টু' খেলার অনেক রকমফের হল। দেখা গেল কুয়া শব্দ উল্টো করে ফেরত পাঠাতে পারে। 'বুলু' বলে চেঁচালে কিছুক্ষণ পরে শোনা যায়, 'লুবু-লুবু-লুবু।' খুবই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজার ব্যাপার। এক দুপুরে বুলু কুয়ার পাড়ে বসে খুব চেঁচাল—'চা-প, চা-প, চা-প।' সেই শব্দ উল্টো হয়ে ফেরত এল—'পচা, পচা, পচা।' বুলুর মহা আনন্দ।

এই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হল না। মিজান সাহেব কুয়ার ওপর ভারি পাটাতনের ব্যবস্থা করলেন। এক সময় সেই পাটাতনও গলে পচে শেষ হয়ে গেল। ততদিনে বুলুরা বড় হয়েছে। বুলুর ছোট বোন বীণা কুয়ার পাশে একটা চাঁপা গাছ লাগিয়েছে। সেই গাছও দেখতে দেখতে বড় হয়ে এক চৈত্র মাসে কিছু ফুল ফুটিয়ে ফেলল। আনন্দে বীণা গাছে হেলান দিয়ে খানিকক্ষণ কাঁদল। গাছ সম্ভবত মানুষের ভালবাসা বুঝতে পারে। কাজেই পরের বছর আরো বেশি ফুল ফুটল। তার পরের বছর আরো বেশি। একটা ডাল ঝুঁকে এল কুয়ার ওপর। কে জানে গাছেরও হয়ত নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে ইচ্ছা করে। পুকুর পাড়ের সব গাছ সে কারণেই জলের দিকে ঝুঁকে যায়।

শ্রাবণ মাসের এক মেঘলা দুপুরে মিজান সাহেব তাঁর স্ত্রী এবং দু'বছর বয়েসী বুলুকে নিয়ে কল্যাণপুরের এই বাড়িতে এসে উঠেছিলেন। শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের নোনা-লাগা বাড়ি, চারদিকে ঝোপ ঝাড়। বাড়ির বাঁ দিকে ডোবার মতো আছে। ডোবার চারপাশে ঘন কচুবন। তাঁদের চোখের সামনেই ডোবার পানি কেটে একটা খয়েরি রঙের সাপ চলে গেল।

ফরিদা আঁৎকে উঠে বললেন, 'কোথায় নিয়ে এলে? এ যে সাপ-খোপের আড্ডা।'

মিজান সাহেব বললেন, 'সব সময় ফালতু কথা বলবে না। ফালতু কথা আমার মোটেই ভালো লাগে না।'

ফরিদা থমথমে গলায় বললেন, 'চারদিকে একটা বাড়ি ঘর নেই। ডাকাত মেরে রেখে গেলেও কেউ জানবে না। তুমি থাকবে বাইরে-বাইরে আমি ছোট একটা বাচ্চা নিয়ে এত বড় বাড়িতে থাকতে পারব না। আমাকে তুমি দেশে পাঠিয়ে দাও।'

মিজান সাহেব বললেন, 'আবার ফালতু কথা শুরু করলে?'

'এখানে থাকব কী করে?'

'প্রথম দিনেই বড় যন্ত্রণা শুরু করলে তো?'

মিজান সাহেব ভুরু কুঁচকে এমনভাবে তাকালেন যে ফরিদা চুপ করে গেলেন। তবে তাঁর মনটা ভেঙে গেল। প্রথম রাতে একটা অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে ভয়ও পেলেন। বারান্দায় হাত ধুতে এসে দেখেন কুয়ার পাশে লম্বা ঘোমটা দিয়ে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বিকট চিৎকার দিলেন। মিজান সাহেব বললেন, 'ফালতু কথা বলা তোমার অভ্যাস হয়ে গেছে, জ্যোৎস্নার আলো পড়েছে আর তুমি বলছ হেন তেন।'

এক শ্রাবণ মাসের মেঘলা দুপুরে তিনি এই বাড়িতে ঢুকেছিলেন। আজ আরেক শ্রাবণ মাস। মাঝখানে চব্বিশ বছর পার হয়েছে। তাঁর সংসার বড় হয়েছে। বীণার জন্ম হয়েছে ঢাকা আসার পরের বছর। তার পরের বছর আরেকটি শিশুর জন্ম দিয়ে ফরিদার শরীর ভেঙে গেল। মাথার চুল উঠে গেল, বুকে ফিক ব্যথা। সামান্য কিছুতেই বুক ধড়ফড় করে। ফর্সা মুখ নীল হয়ে যায়।

লম্বা ঘোমটা পরা মেয়েটাকে এখনো ফরিদা হঠাৎ-হঠাৎ দেখেন তবে কাউকে কিছু বলেন না। চুপ করে থাকেন। ছেলেমেয়েরা শুনলে ভয় পাবে। কী হবে ওদের ভয় দেখিয়ে? তাছাড়া ঐ ঘোমটা দেয়া মেয়ে তো তাঁর কোনো ক্ষতি করছে না। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশরীরী মেয়ে নিজের মনে আসে। হঠাৎ–হঠাৎ দেখা দিয়ে চলে যায়।

কুয়ার ভেতরের সেই কল কল শব্দ মিজান সাহেবও মাঝে–মাঝে শোনেন। তিনিও কিছু বলেন না। চুপ করে থাকেন। সেইসব রাতে তাঁর একেবারেই ঘুম হয় না। বারান্দায় জলচৌকিতে বসে রাত কাটিয়ে দেন।

মিজান সাহেব যতটা আশা নিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন তার কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই। নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার কোনোরকম উন্নতি তিনি করতে পারেন নি। স্বাধীনতাযুদ্ধের পর পর লবণ এবং পেঁয়াজের ব্যবসা করে কিছু টাকা করেছিলেন, সেই টাকায় বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গাটায় একটা ঘর তোলা শুরু করেছিলেন। ছাদঢালাই হবার আগেই কাজ বন্ধ হয়ে গেল। চিটাগাং থেকে বুক করা দুই ওয়াগন লবণ আখাউড়া পর্যন্ত এসে উধাও হয়ে গেল। কত ছোটাছুটি, কত লেখালেখি, উকিলের চিঠি, একে ধরা, তাকে ধরা। লাভ হল না। দেশে আইন–কানুন নেই। যার যা ইচ্ছা করছে। সে অভিজ্ঞতা বড়ই তিক্ত।

এক বন্ধুর সঙ্গে কিছুদিন কন্ট্রাক্টারি করলেন। এ দেশে কন্ট্রাক্টারি করে মানুষ ধনবান হয়। তিনি হলেন নিঃস্ব। সেই বন্ধুর কল্যাণে জেলে যাবার উপক্রম হয়েছিল। পৈত্রিক জমি–জমা বিক্রি করে অনেক কষ্টে তা ঠেকালেন।

মা বাবাকে দেশের বাড়ি থেকে উঠিয়ে এখানে এনে রাখলেন। তাঁর বাবা দেশের বাড়িতে সুখেই ছিলেন। এখানে এসে বড়ই অসহায় হয়ে পড়লেন। বেশিরভাগ সময় কুয়াতলায় বসে থাকতেন। যখন তখন চিকন গলায় বলতেন, 'কোনহানে আনলিরে মিজান? ও বাপধন কোনহানে আইন্যা ফেললি? দমডা বন্ধ হইয়া যায়। খোলা বাতাস নাই।'

মিজান তিক্ত গলায় বলতেন, 'খোলা বাতাস, খোলা বাতাসের দরকারটা কি তোমার?'

'জানটা খালি শুকাইয়া আছে।'

'বড় যন্ত্রণা করছ বাবা তুমি। বড়ই যন্ত্রণা করছ।'

মিজান সাহেবের বাবা দীর্ঘদিন যন্ত্রণা দিলেন না। ভাদ্র মাসের এক দুপুরে হঠাৎ করে মরে গেলেন। তবে মেয়েদের জীবন বেড়ালের জীবনের মতো। কিছুতেই সে জীবন বের হতে চায় না। মিজান সাহেবের মা বেঁচে রইলেন। তিনি চোখে এখন প্রায় দেখতেই পান না। বোধ শক্তিও নেই। গায়ের কাপড় ঠিক থাকে না। মিজান সাহেবের সবচে ছোট ছেলে বাবলু কোনো কোনো দিন দাদীর ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'দাদী নেংটা, ছি ছি দাদী নেংটা।'

পঁচাশি বছরের বৃদ্ধা বাবলুর চেয়েও উচু গলায় চেঁচান, 'মর হারামজাদা মর। বদের বদ। শয়তানের শয়তান। মর তুই মর।' এই জাতীয় গালি শুনলে সব সময় ফরিদার গা কাঁপে তবে তাঁর শাশুড়ির গালিতে তিনি খুব একটা বিচলিত হন না। কোথায় যেন শুনেছেন রক্ত সম্পর্কের মুরব্বী যদি মর–মর করে গালি দেয় তাহলে আয়ু বাড়ে।

পঁচাশি বছরের বৃদ্ধাও বাড়ির সকলের আয়ু ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেন। শুধু মানুষ না—জীব-জন্তু, পশু–পাখির আয়ুও তিনি বাড়ান। একটা কাক হয়ত ডাকছে কা–কা। তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গালি দেবেন, 'মর হারামজাদা মর।' ভাত খাবার সময় পাশ দিয়ে একটা বেড়াল গেল, তিনি চেঁচাবেন, 'মর হারামজাদা বিলাই। তুই মর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিজান সাহেবের মাঝে–মাঝে অসহ্য বোধ হয়। তিনি তীব্র গলায় বলেন, 'চুপ।' তাঁর মা তার চেয়েও উঁচু গলায় বলেন, 'তুই চুপ। হারামজাদা ছোড লোক। আমারে বলে চুপ। মর হারামজাদা।'

মিজান সাহেবের সত্যি–সত্যি মরতে ইচ্ছা করে। সংসার বড় হচ্ছে। তিনি সামাল দিতে পারছেন না। মাঝে–মাঝে রাতে তাঁর একেবারেই ঘুম হয় না। বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করেন। মাথার দু'পাশের রগ দপদপ করে। সত্যি–সত্যি তিনি যদি মরে যান তাহলে এই সংসারটার কী হবে এটা ভাবলে শরীর অবশ হয়ে আসে। তাঁর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে না, তবু শুধু সংসারের জন্যে তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে এই চিন্তা তাঁকে কাবু করে ফেলে। তাঁর অসহ্য বোধ হয়। অসহ্য বোধ হলেও তিনি ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মে প্রতিদিন তাঁর জীবন শুরু করেন। বাজার করেন, অফিসে যান, অফিস থেকে ফিরে মার ঘরে উঁকি দিয়ে বলেন, 'কেমন আছ মা? আজ শরীরটা কেমন?' বৃদ্ধা তীক্ষ্ণ গলায় বলেন, 'মর হারামজাদা। রোজ ঢং করে।'

মিজান সাহেব বর্তমানে মেঘনা এন্টার প্রাইজেস লিমিটেডের ক্যাশিয়ার। এই প্রাইভেট কোম্পানির অনেকরকম ব্যবসা—ট্রান্সপোর্ট, ইন্ডেন্টিং, কেমিক্যালস এবং হোটেল। মিজান সাহেবের হাত দিয়ে রোজ যে পরিমাণ টাকার লেন–দেন হয় তা দেখে তিনি বিস্ময় বোধ করেন। দেশের কিছু কিছু মানুষের হাতে এত টাকা কী করে চলে আসছে তিনি তা ভেবে পান না। মেঘনা এন্টার প্রাইজেসের মালিক—ওসমান গনি। ছোট–খাটো মানুষ। বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে। থুতনীতে অল্প কিছু দাড়ি। ধবধবে একটা পাঞ্জাবি গায়ে দেন। চোখে সামান্য সুরমা দেন। রিভলভিং চেয়ারে পা তুলে বসেন। ঘন–ঘন পান খাওয়া ছাড়া তাঁর অন্য কোনো বদ অভ্যাস নেই। গলার স্বর খুবই মোলায়েম। ব্যবহারও ভদ্র। অফিসের কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা হলে তিনি সবার আগে বলেন, 'স্লামালিকুম।' চড়া গলায় কারো সঙ্গে একটা কথাও বলেন না। তবু সবাই তাঁর ভয়ে অস্থির হয়ে থাকে। এই ভয়ের উৎস গনি সাহেবের ব্যক্তিত্ব নয়—ক্ষমতা। ক্ষমতা বড়ই শক্ত জিনিস।

গনি সাহেবের কয়েকটি অফিস আছে। প্রতিটি অফিসে তাঁর একজন প্রিয়পাত্র আছেন। এই সব প্রিয়পাত্রদের প্রতিদিনই তিনি কিছুটা সময় দেন। নিজের কামরায় ডেকে নিয়ে গিয়ে নানান গল্প করেন। অন্যদের সঙ্গে তিনি কী গল্প করেন কে জানে কিন্তু মিজান সাহেবের সঙ্গে গল্পের বিষয়বস্তু একটাই। তা হচ্ছে—গনি সাহেবের বয়স হয়ে যাচ্ছে। যে কোনো একদিন মরে যাবেন। মরবার আগে দেশের জন্যে তিনি কিছু করতে চান। টোটকা–ফাটকা কিছু না। স্থায়ী কিছু। গনি সাহেব, মধুর স্বরে জানতে চান—'কী করা যায় বলুন দেখি মিজান সাহেব? স্কুল–কলেজের কথা আমাকে বলবেন না। এই জাতিকে লেখাপড়া শিখিয়ে কিছু হবে না। অন্য কিছু ভাবুন। চট করে বলার দরকার নেই। চিন্তা ভাবনা করুন। আমি নিজের কোনো নাম চাই না। আমি চাই টাকাটা কাজে লাগুক। বুঝতে পারছেন?'

বুঝতে না পেরেও মিজান সাহেব 'হ্যাঁ সূচক' মাথা নাড়েন। মাসের মধ্যে এক দু'দিন গনি সাহেবকে দেশ নিয়ে খুবই চিন্তিত মনে হয়। সুরমা পরা চোখে দেশের জন্যে মমতা ঝরে পড়ে। তিনি উদাস গলায় বার–বার বলেন, 'চিন্তা করে কিছু বের করুন। ভাবুন। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিজান সাহেব ভাবেন। তবে দেশ নিয়ে না। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেন। ইদানীং তিনি চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছেন। বুলু এইবারও পাশ করতে পারে নি। তিনবার বি.এ ফেল করলে আর কোনোবারই পাশ করতে পারে না। এটাই নাকি নিয়ম। পাশ যারা করার তারা প্রথম দু'বারেই করে। যারা করার না তারা আর করে না।

বুলু পাশ করতে পারল না অথচ বীণা এত ভালো রেজাল্ট করল। বীণার এই রকম রেজাল্টের দরকার ছিল না। দু'জন যদি কোনোমতে টেনে-টুনেও পাশ করত তিনি খুশি হতেন।

শ্রাবণ মাসের এই মেঘলা সকালে মিজান সাহেব রেজাল্টের পত্রিকা হাতে বারান্দায় জলচৌকির উপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। বুলু বোধ হয় আগেই খবর পেয়েছে। সে গতরাত থেকে বাসায় নেই। ফরিদা খানিকক্ষণ কান্নাকাটি করে এখন নিজের ঘরে শুয়ে আছেন। তাঁর বুকের ফিক ব্যথা আবার উঠেছে।

বীণা কুয়ার পাশে একা একা বসে আছে। সেও খানিকক্ষণ কেঁদেছে। বি.এ পরীক্ষায় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তৃতীয় হবার কোনো দরকার ছিল না। সে তো এমন কোনো ভালো ছাত্রী না। ম্যাট্রিকে একটা মাত্র লেটার পেয়ে ফার্স্ট ডিভিসন পেয়েছিল। অথচ তার বান্ধবীরা চারটা পাঁচটা করে লেটার পেয়েছে। ইন্টারমিডিয়েটেও অনেক কষ্টে একটা ফার্স্ট ডিভিসন। এই গুলোও কোনো কাজে লাগল না। ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষায় এ্যালাউ হল না।

বীণার খুব খারাপ লাগছে তার দাদার জন্যে। বেচারা এ বছর খুব পরিশ্রম করেছে। তবু এ রকম হল কেন কে জানে। বেচারা সোজা সরল ধরনের মানুষ। একা একা কোথায় ঘুরছে কে জানে। সে ফেল করে তার দাদা পাশ করলে আনন্দের একটা ব্যাপার হত। বাবা নিশ্চয়ই মিষ্টি আনতেন। সে তার নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে থাকত। এক সময় বাবা বলতেন, 'এত কান্নাকাটির কি আছে? পাশ ফেল ভাগ্যের ব্যাপার। পরের বছর আরেকবার দিলেই হবে।'

আবহাওয়া সহজ হয়ে যেত। বাবাকে জলচৌকির ওপর মুখ শুকনো করে বসে থাকতে হত না। ফিক ব্যথা উঠত না। বীণাকে একা একা কুয়ার পাশে থাকতে হত না।

কিংবা তারা দুই ভাই-বোনই যদি পাশ করত তাহলে কি অদ্ভুত একটা ব্যাপার হত। দু'জনে মিলে সালাম করত বাবা মাকে। বাবা গম্ভীর গলায় বলতেন, 'থাক-থাক সালাম লাগবে না।' বলতে বলতে গাম্ভীর্যের কথা ভুলে তরল গলায় নিশ্চয় বলতেন, 'ফরিদা, মিষ্টি-টিষ্টির ব্যবস্থা কর।'

বীণা এক দৃষ্টিতে কুয়ার পানির দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ নিচু করে একবার সে বলল, 'নাবী, নাবী।' কিছুক্ষণের মধ্যেই কুয়া গম্ভীর গলায় ডাকল, 'বীণা। বীণা।' কুয়া কি চমৎকার করেই না মানুষের মতো ডাকে। প্রাচীন এক জন মানুষ, যার গলার স্বরে ব্যাখ্যার অতীত কোনো রহস্যময়তা।

'আপা, এই আপা।'

বীণা পেছনে ফিরল। লীনা পা টিপে টিপে আসছে। বীণা বলল, 'কিরে?'

'বাবা চা খেতে চাচ্ছে।'

বীণা রান্নাঘরের দিকে রওনা হল। তার পেছনে পেছনে লীনা আসছে। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিস-ফিস করে বলল, 'তুমি ফার্স্ট হয়েছ আপা?'

'না।'

'পত্রিকায় তোমার ছবি উঠবে না?'

বীণা কিছু বলল না। লীনা বলল, 'ওরা তোমার ছবি কোথায় পাবে আপা?'

'জানি না। এত কথা বলিস না, ভালো লাগছে না।'

বীণা চা বানিয়ে বাইরে এসে দেখে বাবা নেই। কাউকে কিছু না বলে চলে গেছেন। খবরের কাগজটা কুচি-কুচি করে ছেঁড়া।

লীনা বলল, 'চা আমাকে দাও আপা আমি খেয়ে ফেলি।'

বীণা চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। মার জন্যে হালকা করে সাগু বানাল। সাগু খেলে ব্যথা খানিকটা কমে। ফরিদার ব্যথা কমল না। তিনি ছটফট করতে লাগলেন।

মিজান সাহেব বাসায় ফিরলেন সন্ধ্যা মিলাবার পর। তাঁর হাতে একগাদা কাগজপত্র। ক্যাশের হিসাবে গণ্ডগোল হচ্ছে। রাত জেগে হিসাব মিলাবেন। তিনি হাত মুখ ধুয়ে খাতা নিয়ে বসলেন। পাশের ঘরে ফরিদা ছটফট করছেন—তা নিয়ে মোটেই বিচলিত হলেন না। কখনো হন না।

বীণা এসে বলল, 'চা দেব বাবা?'

তিনি হ্যাঁ না কিছুই বললেন না।

বীণা চা বানিয়ে বাবার পাশে রাখল। বাবার কাছাকাছি সে বেশিক্ষণ থাকে না। খুব ভয়-ভয় লাগে। আজ অন্যদিনের চেয়েও বেশি ভয় করছে। বীণা চলে যেতে ধরেছে—মিজান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, 'বোস।'

বীণা হকচকিয়ে গেল। বসল না। মিজান সাহেব পকেট থেকে একটা ছোট্ট চৌকা বাক্স বের করে মৃদু স্বরে বললেন, 'নে।'

বীণা হাত বাড়িয়ে নিল। বাক্স খুলে মুগ্ধ হয়ে গেল। একটা সোনালি হাত ঘড়ি। বীণা কী করবে ভেবে পেল না। মিজান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, 'এত ভালো রেজাল্ট করেছিস—বাবা মাকে তো সালাম করলি না? সালাম কর মা!'

রাতে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। ঘরে ইলেকট্রিসিটি নেই। দমকা বাতাসের ঝাপটা। সারা বাড়িতে একটা মাত্র হারিকেন। মিজান সাহেব সেই হারিকেনে খাতাপত্র দেখছেন। লীনা এবং বাবলু অন্ধকার বারান্দায় বসে আছে। আপার ঘড়িটা লীনা হাতে পরেছে। তার বড় ভালো লাগছে।

বীণা রান্নাঘরে। চুলার আগুনের সামান্য আলোতেই রান্নার কাজ সারতে হচ্ছে। ফরিদা তার পাশে বসে আছেন। তাঁর ব্যথা পুরোপুরি সেরে গেছে তবে শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে।

মিজান সাহেব অনেক রাতে শুতে গেলেন। ঝড় থেমে গেছে তবু অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। শীত লাগছে, কাঁথা বের করতে হয়েছে। মিজান সাহেব বিছানায় উঠতে উঠতে বললেন, 'ফরিদা জেগে আছ নাকি?'

ফরিদা বললেন, 'হ্যাঁ।'

'বীণার হাত-টাত একেবারে খালি। ছোট-খাটো কিছু গয়না গড়িয়ে দিও। এই বয়সে শখ থাকে। আমি টাকার ব্যবস্থা করব।'

ফরিদা কিছু বললেন না। মিজান সাহেব লজ্জিত গলায় বললেন, 'কাল কিছু মিষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিপ্টি আনিও। মেয়েটা এত ভালো করেছে। পাশের বাসায় দিও।'

'আচ্ছা'

'বুলু আসে নি?'

'না।'

'জুতিয়ে হারামজাদার আমি বিষ ঝাড়ব।'

ফরিদা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ছেলেটা কোথায় ঘুরছে কে জানে। রাতে হয়ত কিছু খায়ও নি।

বীণা তার দাদীর সঙ্গে এক খাটে ঘুমায়। রাতে যখন বীণা ঘুমুতে আসে তখন এই অপ্রকৃতিস্থ বৃদ্ধা সহজ স্বাভাবিকভাবে কথা বলেন। বীণার তখন ধারণা হয় দাদী আসলে ভালোই আছেন। পাগলামী যা করেন তা বোধ হয় ভান।

আজ বীণা ঘুমুতে এসে দেখল দাদীর গায়ের ওপরের অংশে কোনো কাপড় নেই। শাড়িটা কোমরে পেঁচিয়ে রেখেছেন।

বীণা বলল, 'শাড়ি ঠিকমতো পর দাদী, বিশ্রী লাগছে।'

'গরম লাগে।'

'খুব খারাপ দেখায় দাদী।'

'দেখাইলে দেখায়। তুই ঘুমা।'

বীণা শুয়ে পড়ল। দাদী বসেই রইলেন। বীণা বলল, 'ঘুমুবে না দাদী?'

'উহু।'

'আমি পাশ করেছি দাদী।'

'বুলু ফেল হইছে?'

বীণা কিছু বলল না।

'ঐ হারামজাদা আছে কোন হানে?'

'ঘুমাও দাদী।'

দাদী শুয়ে পড়লেন। অল্পক্ষণেই তাঁর নাক ডাকতে লাগল। তাঁর ঘুম চট করে আসে আবার চট করে চলেও যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর ঘুম ভেঙে যাবে। তখন অনবরত কথা বলতে থাকবেন।

বীণার ঘুম আসছে না, শুয়ে শুয়ে সে নানান কথা ভাবছে। কাল সে মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে একা একা খানিকক্ষণ ঘুরবে। অলিকের বাসা খুঁজে বের করতে পারলে একবার যাবে দেখা করতে। অলিকের কথা তার প্রায়ই মনে হয়।

দাদীর ঘুম ভেঙে গেছে। তিনি উঠে বসলেন, টেনে টেনে বললেন, 'বুলুটা কি আবার ফেইল করল? ও বীণা, ঐ হারামজাদা আবার ফেইল করল? পর–পর তিনবার। হারামজাদার লজ্জা নাই? ও বীণা ঘুমালি?'

বীণা ঘুমায় নি কিন্তু সে জবাব দিল না। জবাব দিলে দাদী অনবরত কথা বলতে থাকবেন।

'ও বীণা। বীণা।'

জবাব দেবে না দেবে না করেও বীণা বলল, 'কি দাদী?'

'তোর বাপ তোর বিয়ার ব্যবস্থা করে না ক্যান?'

'চুপ কর তো দাদী।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোর বাপরে আমি বলব। তোর বাপটার মাথা খারাপ—এত বড় মাইয়া ঘরে....'

'চুপ কর দাদী। তুমি বিশ্রী সব কথা বল।'

'শরম লাগে?'

'ইস্‌ কি যে যন্ত্রণা। হ্যাঁ শরম লাগে।'

বুড়ি গা দুলিয়ে খিক খিক করে হাসে। মাঝে-মাঝে রাত দুপুরে তাঁর মনে ফুর্তির ভাব আসে। আজ বোধ হয় সে রকম একটা রাত। বুড়ি নিচু গলায় মেয়েদের যৌবন নিয়ে এমন একটা কথা বলল যে বীণার কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল।

২

ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর অলিকের একটা বিশ্রী অভ্যাস হয়েছে—দুপুরে ঘুমানো। তাদের সব ক্লাস দেড়টার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। একটা সাবসিডিয়ারি ক্লাস আছে—তিনটায়। সপ্তাহে একদিন। সাবসিডিয়ারির স্যার একদিন আসেন তো তিন দিন আসেন না। পড়ানোরও কোনো আগা মাথা নেই, একদিন যেটা পড়ালেন পরদিন আবার সেটাই শুরু করলেন। কেউ কোনো প্রশ্ন করলে রাগী-রাগী গলায় বলেন, 'বেশি বুঝতে চেষ্টা করবে না। যতটুকু বোঝার ততটুকুই বুঝতে চেষ্টা কর। নো মোর, নো লেস।'

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অলিকের মোহ কেটে গেছে। সাবসিডিয়ারি ক্লাসে যাওয়া সে ছেড়ে দিয়েছে। অনার্স ক্লাসও সব কটি করা হয় না। তার ধারণা একটি ক্লাস না করেও ঘরে বসে পড়ে সে চমৎকার রেজাল্ট করে বের হয়ে আসবে। তবে কোনো-কোনো টিচার রোল কল করেন। যে কারণে তাঁদের ক্লাস করতে হয়। ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাস খুব মজার হবার কথা, তা হয় না। অধিকাংশ ক্লাসই অঙ্কের ক্লাসের মতো মনে হয়। সাহিত্য এত রসকষহীন হবে জানলে সে ইকনমিক্স কিংবা সাইকোলজি নিয়ে নিত।

আজ বুধবার বি আর এর ক্লাস। এই ক্লাসটা মোটামুটি ভালোই হয়। বি আর মন্দ পড়ান না। 'প্রাইড এন্ড প্রিজুডিস' পড়তে ভালোই লাগে। যদিও উপন্যাসের চরিত্রগুলোর ওপর রাগে গা জ্বলে যায়।

অলিক ক্লাসে গিয়েছিল। ক্লাস হল না। তাদের ক্লাস রুমের ঠিক সামনে একটা বোমা ফেটেছে। মেঝেতে ভাঙা কাঁচের টুকরো ছড়ানো। বোমা ফাটার কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্যি সব শান্ত তবু বি আর ক্লাস নিলেন না। বিরক্ত মুখে বললেন, 'পড়াশোনা করে কী হবে? যাও বাড়িতে গিয়ে ঘুমাও।' অলিক স্যারের কথা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছে। বাড়িতে এসে কিছু না খেয়েই ঘুম। দরজার বাইরে হাতে লেখা নোটিশ—দয়া করে বিরক্ত করবেন না।'

কেউ তাকে বিরক্ত করল না। অবশ্যি বিরক্ত করার মানুষও এ বাড়িতে নেই। বাবা বনানী থেকে ফিরবেন রাত আটটার দিকে। বনানীতে তাদের বাড়ি তৈরি হচ্ছে। ঐ নিয়ে তিনি খুব ব্যস্ত। এ বাড়িতে অন্য যারা আছে তারা অলিককে বেশ ভয় করে। যদিও ভয় করার তেমন কোনো কারণ নেই। অলিক কারো সঙ্গেই উঁচু গলায় কথা বলে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার ঘুম ভাঙল বিকেলে। বিকেলে ঘুম ভাঙলে তার খুব অস্থির লাগে। কেন লাগে কে জানে। তখন খুব এক জন প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে। মুশকিল হচ্ছে অলিকের তেমন কোনো প্রিয়জন নেই। মাঝে-মাঝে ঘুম ভাঙা মাত্রই সে টেলিফোন তুলে চোখ বন্ধ করে ছ'টা নাম্বার ঘুরায়। বেশিরভাগ সময় কোনো শব্দ হয় না। আবার মাঝে-মাঝে রিং হয়। তখন দারুণ উত্তেজনার একটা ব্যাপার ঘটে—কে টেলিফোন ধরবে? একটি ছেলে ধরবে, না মেয়ে? যদি কোনো ছেলে ধরে তাহলে সে কেমন ছেলে? বুদ্ধিমান না ইডিয়ট শ্রেণীর? ওপার থেকে উদ্বিগ্ন গলা শোনা যায়, 'হ্যালো কে বলছেন?' হ্যালো। 'অলিক টেলিফোন নামিয়ে রাখে।'

আজ ঘুম ভাঙামাত্র অভ্যাস মতো হাত বাড়িয়ে টেলিফোন রিসিভার টেনে আনল। চোখ বন্ধ করে ছ'টা নাম্বার ডায়াল করল।। রিং হচ্ছে কেউ ধরছে না। পাঁচবার রিং হবার পর অলিক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টেলিফোন নামিয়ে রাখল। দরজা খুলে ময়নার মাকে বলল, চা এবং কিছু খাবার দিতে।

ময়নার মা ভয়ে-ভয়ে বলল, 'আপনের কাছে কে এক জন আসছে। অনেকক্ষণ হইছে।'

'ছেলে না মেয়ে?'

'মেয়ে।'

'আগে কখনো এ বাড়িতে এসেছিল?'

'না।'

'তাহলে চলে যেতে বল।'

'উনার নাম বীণা। বল্‌ছে আপনের বন্ধু।'

'চলে যেতে বল। বীণা নামের কাউকে আমি চিনি না। গায়ে কাপড় কী? শাড়ি না কামিজ?'

'শাড়ি।'

'শাড়ির রঙ কি?'

'সাদার মধ্যে নীল ফুল।'

'বড় বড় ফুল না ছোট ছোট ফুল?'

ময়নার মা মনে-মনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এই আপা বড় যন্ত্রণা করে। মাথা খারাপ করে দেয়।

'মেয়েটার চেহারা কেমন?'

'সুন্দর।'

'আমার চেয়েও সুন্দর?'

'অত জানি না আফা। আপনেও সুন্দর উনিও সুন্দর।'

অলিক নিচে নেমে এল। মেয়েটি যদি সুন্দর হয় তাহলে এক নজর দেখা যেতে পারে। সে মনে-মনে বলল—I Loved a love once, fairest among women, closed her doors on me, I must not see her,' এই কবিতাটা সে গত সপ্তাহে মুখস্থ করেছে। প্রতি সপ্তাহে সে একটা করে কবিতা মুখস্থ করার পরিকল্পনা করেছে। এই সপ্তাহে সুইনবার্নের কবিতা মুখস্থ করার কথা। এখনো কবিতা সিলেক্ট করা হয় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে বীণা তুই?'

অলিক প্রায় ছুটে গিয়ে বীণাকে জড়িয়ে ধরল। এবং সেখানেই থেমে থাকল না, বীণাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল সোফায়, তবুও ছাড়ল না। গাঢ় গলায় বলল, 'তুই আমার ঠিকানা পেলি কোথায়?'

'মালবী দিয়েছে।'

'তোর কথা আমি কত ভেবেছি। বিশ্বাস কর।'

'দম বন্ধ হয়ে আসছে। হাত ছাড়।'

'না ছাড়ব না। I loved a love once, I must not see her.'

'তুই আগের চেয়েও পাগল হয়েছিস অলিক।'

অলিক হাত ছেড়ে দিল এবং গম্ভীর হয়ে বলল, 'একটা খবর আছেরে বীণা— মা মারা গেছে।'

'সে কী!'

'I was so happy, খুবই আনন্দ হয়েছিল।'

'চুপ কর।'

'সত্যি কথা বলছি বীণা। মার মৃত্যু আমার জন্যে আনন্দের ছিল।'

বলতে বলতে অলিকের চোখে পানি এসে গেল। বীণা অবাক হয়ে বান্ধবীকে দেখছে। কি সুন্দর হয়েছে অলিক। চোখ ফেরানো যায় না, এমন সুন্দর। স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। গায়ের রঙ হয়েছে আরো উজ্জ্বল। চোখ দু'টি গভীর কালো। কালো চোখে পানি টলমল করছে। যেন তুলিতে আঁকা ছবি।

অলিক, শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে খুবই সহজ গলায় বলল, 'মাকে পুরো এগার মাস কষ্ট করতে দেখলাম। সে যে কী অমানুষিক কষ্ট—তুই বিশ্বাস করতে পারবি না। মনে হচ্ছে জীবন্ত একটা প্রাণীর গা থেকে টেনে চামড়া ছাড়িয়ে নেয়া হচ্ছে।'

'চুপ কর। শুনতে চাই না।'

'না তোকে শুনতে হবে। শেষ ক'মাস মা শুধু বলত, তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা আমাকে মেরে ফেল। প্লিজ প্লিজ।'

আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। বুঝলি, একদিন সত্যি-সত্যি মার জন্য বিষ কিনতে গেলাম। নিউ মার্কেটের একটা ওষুধের দোকানে। দোকানদার ভাবল আমি বোধহয় পাগল।'

'খালার কী হয়েছিল?'

"কেউ জানে না—কী চামড়া নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। বিলেতের ডাক্তাররা বললেন, 'এ রেয়ার স্কিন ডিজিজ।' গায়ের পুরো চামড়া পাল্টে নতুন চামড়া লাগালেই শুধু ঠিক হবে। বীণা তুই আসায় আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার কথা বলার কেউ নেইরে। আয় আমার ঘরে আয়। আমার সঙ্গে ভাত খাবি।"

'এখন ভাত খাব কী? পাঁচটা বাজে।'

'আমি দুপুরে খাই নি, বড্ড ক্ষিদে লেগেছে। আয় বীণা, না করিস না। না বললে আমার খুব খারাপ লাগবে। I might cry.'

বীণা অলিককে তার পাশের খবর দিতে এসেছিল, সে তার কোনো সুযোগ পেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। অলিক অনবরত কথা বলছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে বলছে, 'কথা বলার লোক পা
না বীণা। এই জন্যে এত কথা বলছি। রাগ করছিস না তো?'

'না, রাগ করছি না।'

'আচ্ছা তোর ঐ দাদী, এখনো বেঁচে আছেন? ঐ যে একবার দেখতে গেলাম। পা ছুঁয়ে সালাম করলাম। তুই পরিচয় করিয়ে দিলি—দাদী, আমার বান্ধবী। আর উনি আমাকে বললেন, মর হারামজাদী।'

বীণা অপ্রস্তুত গলায় বলল, 'উনার মাথার ঠিক নেই অলিক।'

'সেই জন্যেই তো উনাকে আমার এত পছন্দ। আমারো মাথার ঠিক নেই। উনি কি এখনো বেঁচে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'জানতাম বেঁচে আছেন। পাগলরা দীর্ঘজীবী হয়। আমিও অনেকদিন বাঁচব।'

অলিক সত্যি-সত্যি পাগলের মতোই হাসতে লাগল। বীণা বলল, 'তোর স্বভাব-চরিত্র এতটুকু বদলায় নি। আগে ইংরেজিতে কবিতা লিখতি, এখনো লিখিস?'

অলিক জবাব দিল না। ঠোঁট টিপে হাসছে। নিশ্চয়ই কিছু ভাবছে।

এই অদ্ভুত মেয়েটা বীণাদের কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে এসে ভর্তি হল। চশমা চোখের রোগা লম্বা একটি ধারাল চেহারার মেয়ে। কেমন যেন জড়ানো গলায় কথা বলে। কথা বলার সময় স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে। একবারও চোখের পাতা ফেলে না। প্রথম দিনেই তার নাম হয়ে গেল সর্পরাণী। কারণ সাপ চোখের পাতা ফেলে না—সাপের চোখের পাতা নেই।

সপ্তাহখানেক পর একদিন টিফিন টাইমে বীণা টিফিন খাচ্ছে, অলিক এসে উপস্থিত। চোখে পলক না ফেলে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'তোমাকে আমি বন্ধু হিসেবে নিলাম। কারণ একমাত্র তুমিই আমাকে সর্পরাণী বল নি আর সবাই বলেছে।'

বীণা কী বলবে বুঝতে পারল না। অলিক তার পাশে বসে সহজ স্বরে বলল, 'এখন আমরা বন্ধু হয়েছি। কাজেই আমি আমার জীবনের একটি গোপন কথা তোমাকে বলব। আর তুমি বলবে তোমার জীবনের গোপন কথা। ঠিক আছে?'

বীণা হকচকিয়ে বলল, 'আমার জীবনের কোনো গোপন কথা নেই।'

'আমার আছে। আমারটা আমি বলছি তোমার জীবনে যদি কখনো কোনো গোপন কথা হয় আমাকে বলবে কেমন?' এই বলেই খুবই অবলীলায় অলিক তার জীবনের কথাটা বলল—

''আমাদের বাসায় অনেকগুলো বাথরুম। কিন্তু বাথটাব আছে শুধু একটা বাথরুমে। ঐ বাথরুমটা সবার ঘরের সঙ্গে লাগানো। আমি কী করি জান? গরমের সময় সব কাপড় ছেড়ে বাথটাবের ভেতর শুয়ে শুয়ে বই পড়ি। একদিন হঠাৎ আমার মনে হল, কেউ যেন আমাকে দেখছে। অথচ দেখার কোনো উপায় নেই। কী হোল দিয়ে কিছু দেখা যায় না অথচ রোজ আমার মনে হয় কেউ আমাকে দেখছে। একদিন বুঝলাম সত্যি-সত্যি দেখছে। ইলেকট্রিকেল ওয়ারিং-এর জন্যে উপর দিয়ে যে ফুটো করা আছে সেই ফুটো দিয়ে আমাকে দেখছে। আমি শুধু লোকটার চোখ দেখতে পাচ্ছিলাম তবু তাকে চিনলাম। চোখ দেখে মানুষকে চেনা যায়। লোকটা হচ্ছে আমাদের অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দূরের আত্মীয়, সম্পর্কে আমার মামা হন, বাবার কারখানায় কাজ করেন।'

'তুমি কী করলে, সবাইকে বলে দিলে?'

'না। একদিন তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁকে বললাম, মামা আমাকে যে আপনার এত দেখতে ইচ্ছা করে তা তো জানতাম না। আমাকে বললেই হত। আপনি এত কষ্ট করে দেখেন। মানুষের শরীর তো এমন কিছু না যে কেউ দেখলেই পচে যাবে। এরপর যদি কখনো আপনার দেখতে ইচ্ছা করে আমাকে বলবেন। কষ্ট করার কোনো দরকার নেই। এই বলেই আমি চলে এলাম। তারপর আর কোনোদিন উনি উঁকি দেন নি। গল্পটা মজার না?'

বীণা মনে-মনে ভাবল, 'মেয়েটা বদ্ধ উন্মাদ। এরকম একটা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় না হওয়াই বোধহয় ভালো। বন্ধুত্বের প্রশ্নই ওঠে না।'

তবু বন্ধুত্ব হল। এরকম বন্ধুত্ব যে হাত ধরে বসে না থাকলে ভালো লাগত না। চার মাস মেয়েটি তাদের কলেজে রইল তারপর হঠাৎ একদিন ক্লাসে এসে বলল—তার মা অসুস্থ। মাকে নিয়ে সে বিলেত যাচ্ছে। এর পর আর কোনো যোগাযোগ নেই। অলিক কোনো ঠিকানা রেখে যায় নি।

বীণাকে অলিকের সঙ্গে বিকেল পাঁচটায় ভাত খেতে হল। বর্ষার সময়, দিন খারাপ করছে আকাশে মেঘ জমছে অথচ অলিক তাকে ছাড়বে না। বীণা বলল, 'অলিক, আবার আসব, আজ ছেড়ে দে। বাসায় চিন্তা করবে।'

'চিন্তা করুক। অসুবিধা কি? একদিন চিন্তা করলে মানুষ মরে যায় না।'

'তুই আমাদের বাসার ব্যাপারটা জানিস না তাই এ রকম বলছিস। আমি সন্ধ্যার আগে না ফিরলে বাবার হার্ট এ্যাটাক হবে।'

'এত সহজে মানুষের হার্ট এ্যাটাক হয় না। হার্ট খুবই শক্ত জিনিস। চোখের সামনে মা মরে গেল, আমার কিচ্ছু হয় নি। আমি ইংরেজিতে কিছু কবিতা লিখেছি—আয় তোকে শোনাব।'

সন্ধ্যা মিলাল। দিন সত্যি খারাপ করেছে, গুড়-গুড় করে মেঘ ডাকছে। অলিক শক্ত করে তাকে ধরে আছে। বোঝাই যাচ্ছে এই বাঁধন ছাড়ানো সম্ভব না। সন্ধ্যা পর্যন্ত বীণার বাইরে থাকার ব্যাপারটা যে কত ভয়াবহ অলিক সেটা বুঝতেই পারছে না। এমনিতেই বাবার মেজাজ খারাপ। অফিসে কি নাকি ঝামেলা। ভাইয়া সাত দিন ধরে উধাও। কোনোরকম খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। বাবার রাতে ঘুম হয় না। বারান্দায় পায়চারি করেন।

বীণা সন্ধ্যা সাতটার সময় কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'তোর পায়ে পড়ি অলিক। দেখ বৃষ্টি নেমে গেছে।'

'বর্ষাকালে বৃষ্টি নামবে না? এটা আবার কেমন কথা? এই কবিতাটা শোন, আমার লাস্ট জন্মদিনে লেখা। এটা হচ্ছে সনেট। এলিজাবেথিয়ান সনেট। সনেট কী জানিস তো? চৌদ্দটা লাইন থাকে। মিল হচ্ছে abab, cdcd, efef, gg............

বীণা ছাড়া পেল রাত আটটায়। অলিক বিরক্ত গলায় বলল, 'এরকম করছিস কেন? মনে হচ্ছে ফিট হয়ে পড়ে যাবি। যা বাড়ি যা।'

'কাউকে সঙ্গে দে ভাই, বাসায় পৌঁছে দিক।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাউকে সঙ্গে দেব না। তুই একা একা যাবি। কি লজ্জার কথা, এতবড় একটা মেয়ে একা বাড়ি যেতে পারছে না। ভাবতেও লজ্জা লাগছে। যা ভাগ।'

ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে একাই বীণাকে বাসায় ফিরতে হল। কেন যে গেল অলিকের কাছে? যে সব কথা সে বলতে গিয়েছিল তার কোনোটাই বলা হয় নি। তার রেজাল্টের কথাটা পর্যন্ত বলতে পারল না। এখন রাত দুপুরে একা একা ফিরতে হচ্ছে। রাস্তা অন্ধকার। রিকশাওয়ালার ভাবভঙ্গি যেন কেমন–কেমন। বার–বার পিছনে ফিরে তাকাচ্ছে। কোনো রিকশাওয়ালা তো এরকম করে তাকায় না। একবার সে রিকশা থামাল, বীণার বুক ধক্ করে উঠল। শুধু শুধু রিকশা থামাল কেন? কী চায় সে? বীণা এখন কী করবে? চিৎকার দেবে? রাস্তায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না! চিৎকার করলে কেউ কি শুনবে?

পৌছতে পৌছতে রাত সাড়ে আটটা বেজে গেল। বীণা রিকশায় বসে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। পথ যেন তার ফুরাচ্ছে না।

মিজান সাহেব সন্ধ্যা থেকেই কল্যাণপুর বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে একটা টর্চ লাইট। মাথার উপর ছাতা ধরা থাকা সত্ত্বেও তিনি কাকভেজা হয়ে গেছেন গায়ে জ্বরও আসছে। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি একটা ঘোরের মধ্যে আছেন। বীণা যখন রিকশা থেকে কাঁপা গলায় ডাকল, 'বাবা!' তখনো ঘোর কাটল না। বীণা বলল, 'উঠে আস বাবা।' তিনি উঠলেন না। একবার শুধু টর্চ ফেলে বীণার মুখের দিকে তাকালেন। তারপরই টর্চ নিভিয়ে রিকশার পেছনে পেছনে আসতে লাগলেন।

দু'ঘন্টা হয়েছে বীণা ঘরে এসেছে। মিজান সাহেব এই দু'ঘন্টায় একটি কথাও বলেন নি। কাপড় বদলে খাওয়া–দাওয়া করেছেন। বারান্দায় জলচৌকিতে বসে দুটো সিগারেট শেষ করেছেন। সমস্ত ঘরের আবহাওয়া থমথমে। ফরিদা স্বামীর পাশে পাশে আছেন। লীনা ও বাবলু খুবই উঁচু গলায় পড়ছে। যেন তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় পড়ার বইতে। মিজান সাহেব দ্বিতীয় সিগারেটটা শেষ করলেন না, বৃষ্টির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে শীতল গলায় বললেন, 'বীণাকে আমার ঘরে পাঠাও।'

ফরিদা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'মেয়ে বড় হয়েছে, মারধোর করবে না।'

'যা করতে বলছি, কর।'

বীণা মাথা নিচু করে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আতঙ্কে তার মুখ নীল। মিজান সাহেব স্ত্রীকে ঠেলে ঘর থেকে বের করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। পরবর্তী কিছু সময় পর্যন্ত মিজান সাহেবের কোনো জ্ঞান ছিল না। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখলেন বীণা মেঝেতে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে, তার ঠোঁট কেটে গলগল করে রক্ত পড়ছে। ফরিদা প্রাণপণে দরজা ধাক্কাচ্ছেন। বাবলু ও লীনা চিৎকার করে কাঁদছে। এক সময় মিজান সাহেব দরজা খুললেন। কারো মুখে কোনো কথা নেই শুধু লীনা ফুঁপিয়ে–ফুঁপিয়ে বলল, 'আপা মরে গেছে। ও আম্মা, আপা মরে গেছে।'

রাত প্রায় দুটোর মতো বাজে। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। মিজান সাহেব ঘুমান নি। জলচৌকির উপর বসে আছেন। বারান্দায় বাতি নেভানো। তবু বারান্দা পুরোপুরি অন্ধকার হয় নি। আকাশে চাঁদ আছে। তার ক্ষীণ আলোয় সব কিছুই ম্লানভাবে নজরে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিজান সাহেব জলচৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। নিঃশব্দে তার ঘরের জানালার সামনে এসে দাঁড়াতেই বৃদ্ধা বললেন, 'কী চাসরে মিজান?'

মিজান সাহেব বললেন, 'বীণা কি ঘুমুচ্ছে?'

'হ ঘুমাইতেছে। তুই কামটা কী করলি?'

তিনি জবাব দিলেন না। বৃদ্ধা বললেন, 'তোর মাথাটা খারাপ হইছে। তুই একটা তাবিজ কবচ নে। একটা ডাক্তার দেখা। তোর মইদ্যে আমি মাথা খারাপের লক্ষণ দেখি।'

তিনি চুপ করে রইলেন। তাঁর খুব ঘরে ঢোকার ইচ্ছা হচ্ছিল। ঢোকা সম্ভব নয়। দরজা খুলতে হলে বীণাকে জাগাতে হবে। বীণাকে জাগাতে ইচ্ছা করছে না।

বৃদ্ধা বললেন, 'ভিতরে আয় দরজা খোলা।'

তিনি ভেতরে ঢুকলেন।

বৃদ্ধা বললেন, 'এক কাম কর। মেয়ের মাথায় হাত দিয়া মনে-মনে মেয়ের কাছে মাফ চা। মাফ না চাইলে তুই মনে শান্তি পাইবি না। আর এর মধ্যে দোষের কিছু নাই।'

মিজান সাহেব এগিয়ে এসে মেয়ের পিঠে হাত রাখলেন।

' ও মিজান।'

'কি?'

'মেয়েটার বিয়া দে। তোর কাছে মেয়েটা কষ্ট পাইতেছে।'

মিজান সাহেব জবাব দিলেন না। তাঁর চোখে পানি এসে গেছে। তিনি লজ্জিত বোধ করছেন। ঘর অন্ধকার নয়ত আরো বেশি লজ্জা পেতেন। অবশ্যি আলো থাকলেও তাঁর মা তাকে দেখতে পেতেন না।

'ও মিজান।'

'কি?'

'যা ঘরে যা। ঘরে গিয়ে ঘুমা।'

মিজান সাহেব বের হয়ে এলেন। তিনি অবশ্যি জানতে পারলেন না যে বীণা ঘুমায় নি। জেগেই ছিল। জানলে তাঁর কেমন লাগত কে জানে।

৩

ওসমান গনির অফিস ঘরটি ছোট। তাঁর সামনে একটি মাত্র চেয়ার। তিনি একসঙ্গে বেশি মানুষের সাথে কথা বলতে পারেন না। এক জনের সঙ্গে কথা বলেন। আজ মিজান সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন—কিন্তু মিজান সাহেব এখনো এসে পৌছান নি। গনি সাহেব হাতে ঘড়ি পরেন না। তাঁর এই ঘরে কোনো ঘড়িও নেই। তবু তিনি জানেন যে এগারটার উপর বাজে।

তাঁর সেক্রেটারি মজনু মিয়া বলল, 'উনি কয়েকদিন ধরেই দেরি করে অফিসে আসছেন। পরশু এসেছেন লাঞ্চ টাইমের পরে।'

গনি সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'উনি দেরি করে আসছেন না সময়মতো আসছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই খোঁজ নেবার জন্যে তো আমি তোমাকে বলি নি। বলেছি? তোমাকে বলেছি তাঁকে খবর দিতে। তুমি তাকে পাও নি। ব্যাস ফুরিয়ে গেল। ইতং বিতং এত কথা কেন? বেশি বলা ভালো না মজনু মিয়া। কথা বলবে কম। কাজ করবে বেশি বুঝতে পারলে?'

'জ্বি স্যার।'

'এখন আমার সামনে থেকে যাও। কাজ কর।'

মজনু মিয়া বিরস মুখে বের হয়ে গেল। তাকে কাজ করতে বলা হয়েছে অথচ তার হাতে কোনো কাজ নেই। কখনো ছিলও না। তার টেবিল ফাইলশূন্য।

বড় সাহেবের ফাইলপত্রে সেক্রেটারির খানিকটা অধিকার থাকে। মজনু মিয়ার কিছুই নেই। গনি সাহেব সমস্ত ফাইল নিজে দেখেন। চিঠিপত্র ড্রাফট নিজে করেন। টেলিফোনটিও তাঁর ঘরে। সেক্রেটারি হিসেবে মজনু মিয়া যে টেলিফোন প্রথমে ধরবে সেই সুযোগও নেই। মজনু মিয়া তার গদি আঁটা চেয়ারে কাত হয়ে বসে থাকে এবং ভাবে কেন অকারণে গনি সাহেব বেতন দিয়ে তাকে পুষছেন। মাঝে-মাঝে এই চাকরি ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে। বাজার খারাপ। চাকরি ছেড়ে দিলে নতুন কিছু জোগাড় করা সম্ভব না। গনি সাহেব মালিক হিসেবে ভালো। দুই ঈদে বোনাসের ব্যবস্থা আছে। কনট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্মচারী কল্যাণ তহবিল খুলেছেন। এক জন ডাক্তারের এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন। এই ডাক্তার সপ্তাহে তিনদিন আসেন এবং এক ঘন্টা থাকেন। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী যে সব ওষুধ কেনা হয় তার অর্ধেক দাম কোম্পানি দেয়।

তার চেয়েও বড় কথা কোম্পানি বড় হচ্ছে। গনি সাহেব শিপিং বিজনেস শুরু করতে যাচ্ছেন এ রকম কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে। অবশ্যি গনি সাহেব সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না। তাঁর সম্পর্কে যা শোনা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা হয় না।

গনি সাহেব এক ঘন্টা ধরে গভীর মনোযোগে ফাইলপত্র দেখছেন। বিদেশে এলসি বিষয়ক ফাইল। তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত। একটা কিছু ঠিকমতো হয় নি বলে তাঁর মন বলছে, কিন্তু সেটা কী তা ধরতে পারছেন না। কর্মচারীদের কাউকে তিনি অবিশ্বাস করেন না আবার বিশ্বাসও করেন না। তাঁর কাছে সব সময় মনে হয় মানুষ এমন একটা প্রাণী যাকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনোটাই করা যায় না।

'স্যার আসব?'

গনি সাহেব ফাইল বন্ধ করে বললেন, 'আসুন, আসুন। বসুন। কেমন'আছেন?' মিজান সাহেব সঙ্কুচিত গলায় বললেন, 'ভালো।' তিনি ভেবেছিলেন গনি সাহেব তাঁর দেরি করে আসার ব্যাপারে কোনো কৈফিয়ত তলব করতে পারেন। আগে একদিন তাঁকে খোঁজ করে পান নি। কিন্তু গনি সাহেব কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। হাসিমুখে অন্য প্রসঙ্গ তুললেন, 'আপনার ছেলের খোঁজ পাওয়া গেছে?'

'জ্বি না স্যার।'

'ক'দিন হল?'

'পনের দিন।'

'আগেও কি বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে?'

'জ্বি না, এই প্রথম।'

'বন্ধু-বান্ধব কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করেছেন? ওরা জানে কিনা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জ্বি না।'

'বাড়ি থেকে টাকা-পয়সা বা গয়না-টয়না কিছু নিয়েছে? সাধারণত এরা এই কাজটা করে। মোটা কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মাস খানেক ঘোরে। তারপর ফিরে আসে। আপনি চিন্তা করবেন না।'

'আমি চিন্তা করছি না।'

'গুড, ভেরি গুড। আর ঐ পাশ ফেল নিয়েও চিন্তা করবেন না। আজকালকার পরীক্ষা—এর পাশও যা ফেলও তা। আমি আপনার ছেলের চাকরির ব্যবস্থা করে দেব।'

মিজান সাহেব বিস্মিত হলেন। গনি সাহেব এই জাতীয় কথা কখনও বলেন না।

গনি সাহেব বললেন, 'বুঝলেন মিজান সাহেব, আমি আসলে ফেল করা ছেলেই পছন্দ করি। ফেল করা ছেলের কোনো ক্যারিয়ার নেই। সে জানে অন্য কোথাও সে কিছু করতে পারবে না। কাজেই সে যা পায় তা নিয়েই প্রাণপণ খাটে। বুঝতে পারছেন?'

মিজান সাহেব কিছু বললেন না, তবে লোকটার বুদ্ধির প্রশংসা মনে-মনে করলেন, নির্বোধ চেহারার রোগা বেঁটে-খাটো এক জন মানুষ। অথচ লোকটির মাথা কাঁচের মতো পরিষ্কার।

'মিজান সাহেব।'

'জ্বি স্যার।'

'এইটা বলার জন্যে আপনাকে ডেকেছিলাম। আরেকটা কথা, শুনলাম ফাইলপত্র নিয়ে প্রায়ই বাড়ি যান। ফাইলে কোনো সমস্যা আছে।'

'জ্বি না।'

'হিসেবে কিছু গরমিল?'

মিজান সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'তেমন কিছু না স্যার। সামান্য।'

'সামান্য থেকে বড় কিছু হয়। নদীতে বাঁধ দেয়া হয় জানেন তো? বাঁধ ভাঙে কী করে জানেন? প্রথমে সামান্য একটা ফাটল দেখা যায়। খুবই সামান্য। হয়ত ইঁদুর গর্ত করেছে সেই গর্ত থেকে ফাটল। বাঁধ শেষ পর্যন্ত ঐ ফাটল থেকেই ভাঙে—মিজান সাহেব।'

'জ্বি।'

'ফাইল আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আমি সমস্যা কি বের করে দেব।'

'আমি নিজেই পারব স্যার।'

'নিজে পারলে তো খুবই ভালো।'

'যাই স্যার।'

'আচ্ছা যান। ছেলের জন্যে চিন্তা করবেন না। এই বয়সের ছেলে এ রকম করেই। মাসখানিক যদি বাইরে বাইরে ঘোরে সেটা ভালো হবে।'

গনি সাহেব আবার ফাইল খুললেন। গোড়া থেকে দেখা শুরু করলেন। এলসিতে ঝামেলা আছে। ঝামেলাটা তিনি ধরতে পারছেন না। বাঁধ হঠাৎ করে ভাঙে না। প্রথমে ক্ষুদ্র একটা ফাটল। ইঁদুরের গর্ত বিংবা সাপের গর্ত তারপর—তিনি গর্ত খুঁজছেন।

টেলিফোন বাজছে।

কর্মীলোক টেলিফোন বাজলে খুব বিরক্ত চোখে তাকায়। গনি সাহেব কখনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরক্ত হন না। যখনই ফোন আসে রিসিভার হাতে নিয়ে মধুর গলায় বলেন, 'আসসালামু আলায়কুম, কাকে চান?'

আজ বলার সুযোগ পেলেন না। ওপাশ থেকে তাঁর স্ত্রী বললেন, 'আপনে একটু বাসায় আসেন।'

গনি সাহেবের স্ত্রী রাহেলা বেগম স্বামীকে আপনি করে বলেন। কথাবার্তা বলেন নেত্রকোণার উচ্চারণে। একটু টেনে-টেনে। গনি সাহেব বললেন, 'কী হয়েছে?

'বাবু যন্ত্রণা করতাছে।'

'কি যন্ত্রণা?'

'জিনিসপত্র ভাঙতাছে। বড় জামাইয়ের হাতে কামড় দিছে।'

'বড় জামাই এখানে আসল কেন?'

'আমি খবর দিছি।'

'এক জনকেই খবর দিয়েছ না তিন জনকেই খবর দিয়েছ?'

'তিন জনরেই বলছি।'

গনি সাহেব অসম্ভব বিরক্ত হলেন। বিরক্তি প্রকাশ করলেন না, সহজ গলায় বললেন, 'আমি আসছি।'

রাহেলা বললেন, 'বড় জামাই আফনের সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

'আমি তো রওনাই হচ্ছি। কথা বলার কী আছে?'

'জ্বি আচ্ছা।'

গনি সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। তাঁর ছেলেমেয়ে চার জন। তিন মেয়ের পর এক ছেলে—বাবু। বাবুর বয়স এগার। বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, জড় পদার্থের মতো। অথচ মেয়ে তিনটি অসম্ভব ধুরন্ধর। বিয়েও হয়েছে তিন ধুরন্ধরের সঙ্গে। গনি সাহেবের ধারণা, তাঁর তিন কন্যা এবং তিন জামাতা কবে সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা হবে সেই দিন গুনছে।

তিনি জাহাজ কিনছেন খবর শুনে তিন জামাই একসঙ্গে এসে উপস্থিত। বিনয়ে একেকজন প্রায় মাখনের মতো গলে যাচ্ছে। তাদের তিন জনেরই বক্তব্য হচ্ছে—জাহাজ কিনলে বিরাট লোকসান হবার সম্ভাবনা। এক্সপেরিয়েন্সড লোক ছাড়া এইসব কেউ সামাল দিতে পারে না।

গনি সাহেব তাদের দীর্ঘ কথাবার্তা মন দিয়ে শোনার পর বললেন, 'জাহাজ কিনলে লোকসান হবে?'

'জ্বি, বিদেশি ক্রু রাখতে হবে। এদের বেতন দিতেই অবস্থা কাহিল। টোটাল লস হবে।'

'টোটাল লসটা কার হবে? আমার তো?'

জামাইরা চুপ করে রইল। তিনি বললেন, 'আমার লসের ব্যাপারে তোমাদের এত মাথা ব্যথা কেন?'

জামাইরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তিনি বললেন, 'কথাটা মনে থাকে যেন।'

জামাইদের এই কথা মনে থাকে না। শ্বশুরের ইনকামট্যাক্স কত দেয়া হল তারা এই খবর বের করতে চেষ্টা করে। সাভারের পঞ্চাশ বিঘা জমিতে ইন্ডাস্ট্রি হবে, না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জমি এমনি পড়ে থাকবে এই নিয়ে তাদের চিন্তার শেষ নেই।

রাহেলা বেগম তাঁর জামাইদের খুবই পছন্দ করেন। উঁচু গলায় সব সময় বলেন, 'জামাইরা যে মায়া মহব্বত তাঁকে দেখায় তার ভগ্নাংশও নিজের মেয়েরা তাঁকে দেখায় না।' কথা মিথ্যা না।

তিনটি অতিরিক্ত বুদ্ধিমতী মেয়ের পর এ রকম জড় বুদ্ধির ছেলে তাঁর কী করে হল এই নিয়ে গনি সাহেব মাঝে–মাঝে চিন্তা করেন। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েই বিষয় সম্পত্তির একটা শক্ত ব্যবস্থা তিনি করে যেতে চান। অবশ্যি সবাই বাবুকে যতটা জড়বুদ্ধি ভাবে ততটা সে নয় বলেই গনি সাহেবের ধারণা। যা আছে তা বয়সের সঙ্গে কেটে যাবে বলেও তিনি মনে করেন।

গনি সাহেব বাসায় ফিরে দেখলেন গ্লাস ও কাপের ভাঙা টুকরো বাড়িময় ছড়ানো। বাবু পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে আছে। চোখ রক্ত বর্ণ। অনেকখানি দূরে, শাশুড়ির সঙ্গে তিন জামাই দাঁড়িয়ে আছে। বড় জামাইয়ের বাঁ হাতে রুমাল বাঁধা। সে শ্বশুরকে দেখেই এগিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল, 'খুবই ভায়োলেন্ট হয়ে গেছে। আমার মনে হয় সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া দরকার। ডাক্তার এফ জামানকে কল দিয়েছি, উনি এসে পড়বেন। এফ জামান নামকরা নিউরোলজিস্ট—আমার খুব চেনা জানা।'

গনি সাহেব বড় জামাইকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বাবুর দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'বাবু, কী হয়েছে?'

'কিছু হয় নাই।'

'গ্লাস ভেঙেছ কেন?'

'ওরা শুধু আমাকে বিরক্ত করে।'

'কি করে?'

'ঠাণ্ডা পানি চেয়েছিলাম দেয় নাই।'

'তুমি নিজে ফ্রিজ খুলে ঠাণ্ডা পানি নিলে না কেন? বোতল তো পানি ভর্তি থাকে। যাও ফ্রিজ থেকে পানি নিয়ে খাও।'

বাবু শান্ত ভঙ্গিতে উঠে গিয়ে ফ্রিজ খুলল। গনি সাহেব অফিসে ফিরে গেলেন। এল–সি'র ফাইল ভালোমতো দেখতে হবে। একটা ঝামেলা আছে। সূক্ষ্ম একটা ফাঁক। সেই ফাঁকটা কী? বের করতে হবে। বসতে হবে ঠাণ্ডা মাথায়।

৪

সপ্তাহে একদিন মিজান সাহেব লীনা ও বাবলুকে নিয়ে পড়াতে বসেন। দিনটা হচ্ছে বৃহস্পতিবার। গত সপ্তাহে তিনি পড়ানোর কাজটি করেন নি। বাবলুর মনে ক্ষীণ আশা—হয়ত আজও পড়াবেন না। বাসার পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। ভাইয়া এখনো ফেরে নি। তার কোনোরকম খোঁজও নেই। বড় আপা ঐ রাতের ঘটনার পর কারো সঙ্গে কথা বলছে না। মার শরীরও খুব খারাপ। এখন বেশিরভাগ সময় বিছানাতেই থাকেন। এ রকম একটা অস্বাভাবিক পরিবেশে বাবা নিশ্চয়ই বই নিয়ে পড়াতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসবেন না। তবু বাবলুর বুক ধক-ধক করছে। সন্ধ্যা মিলানোর আগেই হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসে গেছে। পড়ছে খুব উঁচু গলায়, যাতে বাবা ধারণা করে নেন পড়াশোনা তো ভালোই হচ্ছে।

বাবলু এবার ক্লাস সেভেনে উঠেছে। তার রোল নাম্বার চার। ধর্ম পরীক্ষায় সে একশতে মাত্র চল্লিশ পেয়েছে বলে এই অবস্থা হয়েছে। ধর্ম স্যার কেন জানি বাবলুকে দেখতে পারেন না। ধর্ম মৌখিক পরীক্ষায় তাকে পঁচিশের মধ্যে মাত্র পাঁচ দিয়েছেন অথচ সে ধর্মের পাঁচটি ভিত কী বলেছে, এশার নামাজের নিয়ত বলেছে, কুলহুআল্লা সুরা বলেছে, চার সাহাবাদের নাম বলেছে। শুধু নবী কত বৎসর বয়সে নবুয়ত পেয়েছেন এটা বলতে পারে নি। দুঃখের ব্যাপার হল এটা বলতে না পারার জন্যে স্যার তাকে একটা চড় মারলেন। পরীক্ষার সময় কেউ কিছু না পারলে কি চড় মারা ঠিক? বাবলু অনেক ভেবেও বের করতে পারে নি কেন ধর্ম স্যার তাকে দেখতে পারেন না। তার অপরাধটা কী? সে তো ক্লাসে কোনো গণ্ডগোল করে না। হৈ-চৈ করে না বা হেড স্যারকে অন্যদের মতো হেড়ু বলে না।

বাবলুর ধারণা বাবাও তাকে দেখতে পারেন না। বৃহস্পতিবারে পড়তে বসা মানেই মার খাওয়া। অথচ সে সব প্রশ্নের উত্তর জানে। সে যদি না জেনে মার খেত তাহলেও একটা কথা ছিল। বাবলু ঠিক করে রেখেছে আর একটু বড় হলেই সে ভাইয়ার মতো পালিয়ে যাবে।

বাবলুর সামনে লীনা বসে আছে। তার মুখও ফ্যাকাশে। সে একটু পর পর ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। ঘড়িতে কোনোক্রমে আটটা বেজে গেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। আটটার পর বাবা আর পড়াতে বসেন না।

লীনা এ বছর ক্লাস টেনে উঠেছে। পড়াশোনায় সেও ভালো। যদিও পরীক্ষায় ভালো করতে পারে না। পরীক্ষার হলে বসলেই তার হাত কাঁপে। যে জিনিসটা জানা আছে তাও লিখতে পারে না। লীনা ফিস ফিস করে বলল, 'বাবা বোধ হয় আজ পড়াবে না। তাই নারে বাবলু? আটটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট।'

বাবলুর মুখে আনন্দের একটা আভা খেলে গেল। ঠিক তখন মিজান সাহেব ডাকলেন, 'লীনা।' লীনার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'জ্বি।'

'বীণাকে বল আমাকে এক কাপ আদা চা দিতে।'

লীনার মুখে রক্ত ফিরে এল। এটা খুবই ভালো লক্ষণ। বাবা চা খাবেন—চা খেতে-খেতে আটটা বেজে যাবে। খবরের টাইম হয়ে যাবে। তিনি আধা ঘন্টা খবর শুনবেন তারপর ভাত খাবার সময় হয়ে যাবে। লীনা বীণাকে চায়ের কথা বলতে গেল। যাবার আগে বাবলুর দিকে তাকিয়ে আনন্দের হাসি হাসল।

এমনিতেই বাবার সঙ্গে বীণার তেমন কথাবার্তা হয় না। ঐ রাতের ঘটনার পর কথাবার্তা একেবারেই বন্ধ। শুধু কথাবার্তা না, বীণা বাবার দিকে মুখ তুলে তাকায়ও না। মিজান সাহেব যতক্ষণ বাসায় থাকেন ততক্ষণ বীণা হয় তার নিজের ঘরে কিংবা রান্নাঘরে থাকে।

অন্ধকার বারান্দায় মিজান সাহেব চুপ করে বসে আছেন। বীণা বাবার পাশে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। মিজান সাহেব দেখলেন বীণার হাতে ঘড়ি নেই। কয়েকদিন ধরেই তিনি ব্যাপারটা লক্ষ করছেন। বীণা তার বাবার দেয়া ঘড়ি পরছে না। একবার জিজ্ঞেস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা যায় না—'কেন?'

মিজান সাহেব চা শেষ করে শীতল গলায় বললেন, 'লীনা বাবলু বই নিয়ে আয়।'

বীণা মার জন্যে সাগু বানাচ্ছিল। বাবলু পাংশু মুখে পাশে এসে দাঁড়াল। ফিস ফিস করে বলল, 'আপা, বাবা আমাকে মারবে।'

'মারবে কেন?'

'অঙ্ক বই হারিয়ে ফেলেছি আপা।'

'আজ অন্য পড়া পড়। অঙ্ক না করলি।'

'যদি অঙ্ক করতে বলে?'

বীণা উত্তরে কিছু বলতে পারল না। বারান্দা থেকে মিজান সাহেব কঠিন গলায় বললেন, 'বাবলু রান্নাঘরে তুই কী করছিস? এদিকে আয়।'

বাবলু অঙ্ক বই হারিয়ে ফেলেছে এটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরা পড়ল। শুধু অঙ্ক বই না, সে জ্যামিতি বাক্সও হারিয়ে ফেলেছে। জ্যামিতি বাক্স হারিয়েছে দশ দিন আগে। বাবলু ভয়ে কাউকে কিছু বলে নি।

মিজান সাহেব বাবলুকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন। ফরিদাকে বললেন, 'তুমি একটু বাইরে যাও। কোনো কথা বলবে না। বাইরে যেতে বলছি বাইরে যাও।' ফরিদা শুকনো মুখে বের হয়ে এলেন। মিজান সাহেব দরজা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে দিলেন। কঠিন শাসনের সময় তিনি সাধারণত বাতি নিভিয়ে দেন।

রান্নাঘরের কাজ ফেলে বীণা বন্ধ দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ফরিদা জলচৌকিতে বসে আছেন। লীনা এখনো চোখের সামনে বই ধরে আছে। তার মুখে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। সে অল্প অল্প কাঁপছে। তার ইচ্ছা করছে দৌড়ে দাদীর কাছে চলে যেতে। আবার কেন জানি সে সাহসও হচ্ছে না। দাদীকেও সে খানিকটা ভয় করে।

মার শুরু হয়েছে।

রাগে অন্ধ হয়ে মার।

বাবলু গোঙাতে গোঙাতে বলল, 'তুমি আমার একটা কথা শোন বাবা। তুমি আমার একটা কথা শুধু শোন।'

'কী কথা?'

'আমি আর বই হারাব না।'

'কথা শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

মার আবার শুরু হল। বাবলু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কোনোদিন বই হারাব না বাবা। কোনোদিন বই হারাব না।'

'চুপ।'

'বাবা, আমার একটা কথা শুধু শোন। একটা মাত্র কথা।'

'চুপ।'

কিছুক্ষণ মারের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। তারপর শোনা গেল বাবলুক্ষীণ স্বরে ডাকছে—'আপা, ও আপা, ও বড় আপা।'

বীণা বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশের ঘর থেকে বীণার দাদী চিৎকার করছেন, 'বিষয় কি? বিষয়ডা কি? ও হারামজাদার দল বিষয়ডা কি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ তাঁর কোনো জবাব দিচ্ছে না।

বাবলু রাতে কিছুই খেতে পারল না। তার সমস্ত গা ফুলে উঠেছে। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। বীণা এক গ্লাস গরম দুধ এনে দিয়েছিল, খানিকটা খেয়েই বমি করে ফেলল। রাত দশটার দিকে মিজান সাহেব এক জন ডাক্তার ডেকে আনলেন। হতভম্ব ডাক্তার বললেন, 'এরকম হল কীভাবে?'

মিজান সাহেব বললেন, 'আমি মেরেছি। হাড় গোড় ভেঙেছে কিনা এইটা আপনি দেখুন।'

ডাক্তার স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। বাবলুকে যখন জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যথা লাগছে খোকা?'

বাবলু বলল, 'জ্বি না।'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'এত মেরেছেন কেন? ছেলে কী করেছে?'

মিজান সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'কী জন্যে মেরেছি তা দিয়ে তো আপনার দরকার নেই ভাই। চিকিৎসা করতে এসেছেন চিকিৎসা করে চলে যাবেন।'

মিজান সাহেব ভিজিটের টাকা বের করলেন।

বীণা রাতে কিছু খায় নি। কুয়ার পাশে একা একা বসে আছে। ফরিদাও খান নি। তিনি দু'জনের জন্যে ভাত বেড়ে কুয়ার পাড়ে মেয়েকে ডাকতে এলেন।

'ভাত খাবি আয়রে বীণা।'

'ভাত খাব না মা।'

'কেন খাবি না?'

'ইচ্ছে করছে না। তাই খাব না।'

'তোর বাবার উপর রাগ করেছিস?'

'না। বাবার উপর আমি রাগ করি নি মা। রাগ করেছি তোমার ওপর। কেন তুমি বাবাকে আটকাও না? কেন এই সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক?'

ফরিদা ক্ষীণ স্বরে কী বললেন কিছু বোঝা গেল না। বীণা বলল, 'আমাকে সাধাসাধি করে কিছু হবে না মা। আমি ভাত খাব না। তুমি বরং বাবলুর কাছে যাও। বাবলুকে একটু আদর টাদর কর।'

'বাবলু ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'ঘুমিয়ে পড়লে তো ভালোই। তুমিও খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়।'

'তুই এখানে বসে থাকবি নাকি?'

'না আমিও ঘুমুব। এখানে শুধু শুধু বসে থাকব কেন?'

ফরিদা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেলেন।

বাবলু ঘুমায় নি। সে এবং লীনা এক খাটে ঘুমায়। অন্য খাটে বুলু। বুলু নেই বলে দু'জন দু'খাটে ঘুমুচ্ছে। আজ লীনা শুয়েছে বাবলুর সঙ্গে। তারা দুই ভাইবোন প্রায়ই অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে। নিচু গলায় গল্প। সেই সব গল্পের কোনো আগা নেই মাথা নেই। আজও দু'জন গল্প করছে। বেশিরভাগ কথা লীনাই বলছে। বাবলু 'হ্যাঁ হুঁ' দিয়ে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে লীনা হঠাৎ বলল, 'বেশি ব্যথা পেয়েছিলি বাবলু?'

বাবলু বলল, 'হ্যাঁ।' লীনার সঙ্গে নিশিরাতের কথা বার্তায় সে কখনো মিথ্যা বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না।

বীণা অনেক রাতে ঘুমুতে গেল।

দাদী তখনো জেগে। বীণার পায়ের শব্দ শুনেই বললেন, 'তোর বাবার মাথায় কী হইছে রে বীণা? আইজ আবার মারল? এরা হইল পাগলের বংশ বুঝলি। আমার শ্বশুরের বাপ ছিল পাগল। বদ্ধ পাগল। হেই বংশের ধারা। রক্ত বড় কঠিন জিনিস। মানুষ মইরা যায় রক্ত থাকে। বাপের কাছ থাইক্যা পায় পুলা। পুলার কাছ থাইক্যা তার পুলা। তার পুলার কাছ থাইক্যা তার পুলা। তার পুলার কাছ থাইক্যা...........'

'চুপ কর দাদী।'

'তুই চুপ কর হারামজাদী। তুই মর।'

বীণা কথা বাড়ায় না। শুয়ে পড়ে। অসহ্য গরমে তার ঘুম আসে না। জেগে জেগে শুনে বারান্দায় বাবা হাঁটাহাঁটি করছেন। এ মাথা থেকে ও মাথায় যাচ্ছেন। আবার ফিরে আসছে। বীণা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

গরম লাগছে। গা ঘেমে যাচ্ছে। ইস্ একটা ফ্যান যদি এ ঘরে থাকত।

৫

অলিকের ক্লাস ছিল এগারটায়—পোয়েট্রি ক্লাস। আজ পড়ানো হবে টেড হিউজের থট ফক্স। রাতের বেলা সে একবার পড়ল। পড়ে মনে হল—বাহ বেশ তো। সুন্দর কবিতা।

'Till with a sudden hot stink of fox
It enters the dark hole of the head.
The window is starless still: the clock ticks,
The page is printed.

'এর বাংলা কী হবে? কবির মাথায় হঠাৎ কবিতার একটা বোধ ঢুকে পড়ল। কি অদ্ভুত ভাবেই না বোধটা এল। যেন—'বোধ' হচ্ছে নিশাচর এক শেয়াল। যে শেয়াল তার গায়ের তীব্র গন্ধ নিয়ে অন্ধকার গর্তে ঢুকে পড়ে।

কবিতার বোধ জাতীয় ব্যাপারগুলো সাধারণত স্বর্গীয় বলে মনে করা হয়, কিন্তু এই কবি কী অদ্ভুত উপমাই না দিলেন। শেয়ালের গায়ের তীক্ষ্ণ গন্ধের কথা বললেন। আসলেই কি শেয়ালের গায়ে কোনো গন্ধ আছে, না, এটাও কবির কল্পনা?

ময়নার মা চা নিয়ে এসেছে। সে ভয়ে ভয়ে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আইজ ইউনিভার্সিটিতে যাইবেন আফা?'

'হ্যাঁ যাব। আচ্ছা ময়নার মা, তুমি শেয়াল দেখেছ?'

ময়নার মা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

'শেয়াল দেখ নি?'

'দেখছি আফা।'

'শেয়ালের গায়ে কি গন্ধ আছে?'

'ক্যামনে কই আফা'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঠিক আছে তুমি যাও।'

অলিকের মন খারাপ হয়ে গেল। তার একুশ বছর বয়স। অথচ সে শেয়াল দেখে নি। চিড়িয়াখানায় কি শেয়াল আছে? থাকলে একবার দেখে আসা যেত। চিড়িয়াখানায় টেলিফোন করে দেখবে নাকি? অলিক চায়ের পেয়ালা নিয়ে নিজের ঘরের দিকে রওনা হতেই বোরহান সাহেবের মুখোমুখি হয়ে গেল।

অলিকের বাবা বোরহান সাহেব ইদানীং মাথায় কলপ দিচ্ছেন। মাথার চুল হঠাৎ সব চকচকে কালো হয়ে যাওয়ায় তাঁর বয়স অনেকখানি কম মনে হয়। কম বয়েসী একটা ভাব তাঁর চলা ফেরায়ও চলে এসেছে। এখন তাঁর গায়ে নীল রঙের একটা হাওয়াই শার্ট। তিনি হাসিমুখে বললেন, 'মাই ডিয়ার মাদার, তুমি কেমন আছ?'

'ভালো আছি। তুমি যুবক সেজে কোথায় যাচ্ছ বাবা?'

বোরহান সাহেব লজ্জা পেয়ে গেলেন। অপ্রস্তুত গলায় বললেন, 'শার্টটা কি বেশি ছেলেমানুষী হয়ে গেল?'

'কিছুটা হয়েছে।'

'আগলি দেখাচ্ছে?'

'হুঁ।'

'বলিস কী—আমার কাছে তো মনে হচ্ছে সোবার কালার। আটচল্লিশ বছর বয়সে এই কালার পরা যায়।'

'আটচল্লিশ না বাবা পঞ্চাশ।'

'ও সরি। ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটে আটচল্লিশ। কাগজপত্রের বয়সটাকেই কেন জানি সব সময় সত্যি বয়স মনে হয়।'

অলিক বাবার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হালকা গলায় বলল 'বয়স কমানোর দিকে তুমি হঠাৎ এমন মন দিলে কেন? তোমার কি অন্য কোনো পরিকল্পনা আছে?'

বোরহান সাহেব হকচকিয়ে গেলেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের তুখোড় সচিবদের এক জন। যে কোনো জটিল পরিস্থিতি তিনি ঠাণ্ডা মাথায় সামলে নিতে পারেন। তাঁকে নিয়ে প্রচলিত কিছু-কিছু গল্প সচিবালয়ে প্রবাদের মর্যাদা পেয়েছে। সেই গল্পের একটি হচ্ছে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময়কার।

সচিবদের বৈঠক বসেছে। প্রেসিডেন্ট এসে ঢুকলেন এবং চুরুট হাতে বোরহান সাহেবকে দেখে শীতল গলায় বললেন, 'চুরুট ফেলে দিন।'

বোরহান সাহেব সহজ ভঙ্গিতে বললেন, 'কেন স্যার?'

'চুরুটের গন্ধ আমি সহ্য করতে পারি না।'

'একসঙ্গে কাজ করতে হলে অনেক কিছু সহ্য করতে হয় স্যার। আপনি যেমন আমাদের অনেক কিছু সহ্য করতে পারেন না আমরাও আপনার অনেক কিছু সহ্য করতে পারি না। তবু চুপ করে থাকি।'

'আমার কোন্ জিনিসটি আপনারা সহ্য করতে পারেন না?'

'ঘরের ভেতরে মিটিং চলার সময়ও আপনি সানগ্লাস পরে থাকেন এইটি।'

জিয়াউর রহমান সাহেব সানগ্লাস খুলে টেবিলে রাখলেন। বোরহান সাহেব তার চুরুট ফেলে দিলেন। মিটিং শুরু হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোরহান সাহেব মানুষটা স্মার্ট। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত স্মার্ট। তবু নিজের মেয়ের কাছে মাঝে-মাঝেই তিনি অসহায় বোধ করেন। এই মুহূর্তে করছেন। অলিক জানতে চাচ্ছে—'তোমার কি অন্য কোনো পরিকল্পনা আছে?'

তাঁর উচিত খুব সহজভাবে এর উত্তর দেয়া। কিন্তু তিনি দিতে পারছেন না। প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব না—অলিকের সঙ্গে লুকোচুরি চলবে না। তিনি খুব ভালো করেই জানেন তাঁর এই পাগলা ধরনের মেয়েটি তাঁর মতোই স্মার্ট।

বোরহান সাহেব প্রাণহীন গলায় বললেন, 'পরে তোমার সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলব।'

'ঠিক আছে।'

'আজ রাতেই কথা বলা যাবে।'

'ওকে।'

'ফাদার এন্ড ডটার, ক্লোজ ডোর টক।'

'তুমি এত নার্ভাস হচ্ছ কেন বাবা? তুমি কী বলবে আমি জানি। তুমি চাইলে এখনো কথা বলতে পার। আমার হাতে সময় আছে। আমার ক্লাস এগারটায়। মনে হচ্ছে এই ক্লাসটা করব না।'

'ক্লাস না করে কী করবে? ঘরে বসে থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

'সারাদিন ঘরে বসে কী কর?'

'কিছু করি না।'

'তোমার কি বন্ধু-বান্ধব নেই?'

'এক জন আছে।'

'মাঝে-মাঝে ওর সঙ্গে গল্প-টল্প করতে পার না?'

'আমি ওর ঠিকানা জানি না বাবা।'

'সে কী!'

'জানি না বলাটা ঠিক হচ্ছে না। এক সময় জানতাম। ওদের বাসায়ও একদিন গিয়েছিলাম। ওর দাদী আমাকে বলল, মর হারামজাদী।'

'কি সব পাগলের মতো কথা বার্তা।'

'ঠিক বলেছ বাবা। মনে হচ্ছে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

বোরহান সাহেব বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনটাই খারাপ হয়ে গেল। মেয়ের প্রতি যথেষ্ট সময় দেয়া হচ্ছে না, আরো সময় দেয়া দরকার। প্রচুর সময়। মেয়েকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে গেলে কেমন হয়? ছুটি কি পাওয়া যাবে?

টেলিফোনের শব্দে অলিকের ঘুম ভাঙল। টেলিফোন করেছেন বড় মামীর মেয়ে শিপ্রা। শিপ্রাকে অলিক পছন্দ করে না আবার করেও। অর্থাৎ শিপ্রার কিছু কিছু ব্যাপার তার ভালো লাগে তার মধ্যে একটা হচ্ছে নতুন কিছু করা। এমন কিছু যা আগে কোনো মেয়ে করে নি। মুশকিল হচ্ছে এ রকম নতুন কিছু সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। শালবনে রাত জেগে জ্যোৎস্না দেখা বা নকল দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে ছেলে সেজে ঢাকা থেকে গাড়ি করে টঙ্গি যাওয়া তেমন নতুন কিছু না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যালো অলিক কেমন আছিস?'

'ভালো।'

'ঘুমুচ্ছিস নাকি?'

'হ্যা ঘুমাচ্ছি। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কথা বলছি।'

'ভ্যাট ফাজিল—একটা একসাইটিং ব্যাপার হয়েছে। এক জন ভবঘুরের সঙ্গে পরিচয় হল।'

'কার সঙ্গে পরিচয়।'

'ভবঘুরে। তোদের ইংরেজি সাহিত্যে যাকে বলা হয় ভ্যাগাবন্ড। চলে আয়, তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। এখন বাসায় বসে আছে। এই মুহূর্তে দাড়ি চুলকাচ্ছে। ব্যাটার আবার রবীন্দ্রনাথের মতো লম্বা দাড়ি।'

'ভ্যাগাবন্ডের সঙ্গে পরিচয় করবার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ বোধ করছি না শিপ্রা।'

'তুই যা ভাবছিস তা না কিন্তু। ইংরেজ ভ্যাগাবন্ড।'

'ভ্যাগাবন্ড হচ্ছে ভ্যাগাবন্ড, সে ইংরেজই হোক আর বাঙালিই হোক।'

'অলিক, তুই বুঝতে পারছিস না, এই ব্যাটা দস্তয়োভস্কির উপন্যাস থেকে উঠে আসা চরিত্র।'

'দস্তয়োভস্কির কোনো উপন্যাস তো তুই পড়িস নি—জানলি কী করে উপন্যাসের চরিত্রগুলি কেমন?'

'তোর সঙ্গে বক-বক করতে ভালো লাগছে না। আমি ব্যাটাকে নিয়ে আসছি। ব্যাটার চোখের দিকে তাকালে তুই পাগল হয়ে যাবি—sky blue. রওনা হচ্ছি কিন্তু।'

AMARBOI.COM

অনেক রাতে বোরহান সাহেব মেয়ের ঘরে ঢুকে হাসি মুখে বললেন—'কোন এক বিদেশি নাকি এসেছিল?'

অলিক বলল, 'হ্যাঁ।'

'অনেক গল্প-টল্প করল?'

'হ্যাঁ। খুব বক-বক করতে পারে। সারা পৃথিবী ঘুরছে। আন্টার্কটিকায়ও নাকি গিয়েছিল।'

'বলিস কি?'

'হ্যাঁ সত্যি। ছবি দেখাল। পেঙ্গুইন কোলে নিয়ে ছবি—তার ধারণা পৃথিবীর সবচে সুন্দর দেশ হচ্ছে আন্টার্কটিকা।'

'সুন্দরের কী আছে? সব তো বরফে ঢাকা।'

'এই জন্যেই নাকি সুন্দর। ওখানে গেলেই নাকি পবিত্র ভাব হয়। আমি ঠিক করেছি একবার আন্টার্কটিকা যাব।'

'বেশ তো যাবি।'

'আন্টার্কটিকা যেতে কি ভিসা লাগে বাবা?'

'লাগার তো কথা না। আমি যতদূর জানি ঐটি একমাত্র মহাদেশ যেখানে পৃথিবীর সব দেশের মানুষদের অধিকার আছে।'

'বাহ খুব একসাইটিং তো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোরহান সাহেব হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'তুই একা যাবি, নাকি ঐ ইংরেজকে নিয়ে যাবি?'

'ওকে সঙ্গে নেব কেন? ও এক জন বাজে ধরনের লোক।'

'একটু আগে তো অন্যরকম বললি।'

'মোটেও অন্যরকম বলি নি। ঐ লোকটা ফস করে আমার হাত ধরল।'

'ওদের মধ্যে মেয়েদের হাত ধরা তেমন দোষণীয় কিছু না।'

'তা জানি বাবা। কিন্তু শিপ্রা যখন আমাদের ছবি তুলতে গেল তখন সে আমার কোমড় জড়িয়ে ধরে দাঁড়াতে গেল। আমি দিলাম এক ধমক।'

বোরহান সাহেব চুপ করে গেলেন। অলিক বলল, 'চমৎকার ইংরেজিতে আমি তাকে বললাম—কোনো সাদা চামড়ার লোক আমাকে জড়িয়ে ধরে, এটা আমার পছন্দ নয়। আমার গা ঘিন ঘিন করে। তুমি কালো হলে একটা কথা হত।'

'সত্যি বললি?'

'হ্যাঁ বললাম। ব্যাটার মুখটা দেখতে দেখতে ছোট হয়ে গেল। সবচে রাগ করল শিপ্রা। সে বলল, 'এইভাবে এক জনকে অপমান করার নাকি আমার কোনো রাইট নেই। বাবা আমার কি রাইট আছে?'

'অবশ্যই আছে।'

বোরহান সাহেব রাত একটা পর্যন্ত মেয়ের সঙ্গে গল্প করলেন। যে কথাগুলো বলতে এসেছিলেন সেগুলো বলতে পারলেন না। কথাগুলো তেমন জরুরি নয়। It can wait.

বাবা চলে যাবার পরও অলিক জেগে রইল। প্রতি সপ্তাহে একটি করে কবিতা মুখস্থ করার কথা। দু'সপ্তাহ বাদ গেছে। মুখস্থ করার মতো তেমন কোনো কবিতা পাওয়া যাচ্ছে না। কোনোটাই ভালো লাগছে না।

ঘুমুতে যাবার ঠিক আগে আগে অলিক আয়নার সামনে দাঁড়াল। তার গায়ে নীল রঙের সুতির নাইটি। সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নাইটির ফিতা খুলে নিজের অনাবৃত দেহের দিকে তাকিয়ে রইল। বাঁ দিকের পাঁজরের নিচে এবং নাভীর ডান পাশের চামড়া কেমন বিবর্ণ হয়ে ফুলে আছে। মার অসুখের প্রথম অবস্থায় ঠিক এই রকম হয়েছিল।

অলিকের শরীরটা বড় সুন্দর। অলিক নিজেই মুগ্ধ চোখে নিজেকে দেখেছে। এখনো দেখছে। তার দৃষ্টি বার বার ফিরে যাচ্ছে দাগ দু'টির দিকে।

এই দাগ দু'টিকে সে কী বলবে? চাঁদের কলঙ্ক? না—কলঙ্ক না। চাঁদের কলঙ্ক স্থির থাকে, এরা স্থির থাকবে না। বাড়তে থাকবে। বাড়তে বাড়তে—থাক ঐ নিয়ে ভাবতে ভালো লাগছে না। সুন্দর কিছু নিয়ে ভাবা যাক। শ্বেত শুভ্র আন্টার্কটিকা, নির্মল পবিত্র। কিংবা টেড হিউজের থট ফক্স। Till with a sudden sharp hot stink of Fox.

বাংলা অনুবাদ করা যায় না? কেন যাবে না? চেষ্টা করলেই হবে—

''জানালার ও পাশে ছিল নিস্তব্ধ আকাশ।
চারদিকে আদিগন্ত ধূসর প্রান্তর।
সময় দাঁড়িয়ে ছিল এক পায়ে, ফেলছিল ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মস্তিষ্কের লক্ষ নিওরোনে—গাঢ় অন্ধকার।
হঠাৎ উড়ে এল বোধ।
অলৌকিক স্বপ্নময় বোধ।
কবির লেখার খাতায়—গান, সুর ও স্বর।''

ব্যাপারটা কেমন হল? শেয়াল বাদ পড়ে গেল না? কোথাও একটা লাইন ঢুকানো দরকার ছিল, যেখানে ঝাঁঝাল গন্ধের নিশাচর শেয়াল গর্তে ঢুকবে।

অলিক বিছানায় শুয়ে বাতি নেভানো মাত্র বৃষ্টি শুরু হল। চমৎকার কাকতালীয় ব্যাপার। বৃষ্টিটা পাঁচ মিনিট আগে বা পরেও শুরু হতে পারত। তা হল না। বাতি নেভানো এবং বৃষ্টির শুরুটা হল একই সঙ্গে।

এ রকম কাকতালীয় ব্যাপার মানুষের জীবনে নিশ্চয়ই খুব বেশি আসে না।

কিংবা কে জানে হয়ত খুব বেশিই আসে, কেউ কখনো লক্ষ করে না। মানুষ কখনো কিছু লক্ষ করে না। তার চোখের সামনে কত কিছু ঘটে সে তাকিয়ে থাকে কিন্তু দেখে না। মানুষের দেখতে না পারার ক্ষমতা অসাধারণ।

অলিকের এখন একটা চিঠি লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে। তবে চিঠিটা লেখা হবে অন্ধকারে। মুশকিল হচ্ছে অন্ধকারে চিঠি লেখার কোনো উপায় নেই। থাকলে ভালো হত।

চিঠি কাকে লেখা যায়? কবি কিটসকে লিখলে কেমন হয়? মৃত মানুষদের কাছে চিঠিপত্র লেখার আলাদা আনন্দ আছে। চিঠির উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না।

AMARBOI.COM

৬

এটা কে?

বুলু না?

মাথা নিচু করে চা খাচ্ছে। গায়ে চেক হাওয়াই শার্ট। হাতে একটা সিগারেটও আছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। পেছনটা দেখা যাচ্ছে। মিজান সাহেব থমকে দাঁড়ালেন। কল্যাণপুর বাস ডিপোর সঙ্গের রেস্টুরেন্ট। বখা ছেলেদের আড্ডা। এদের মধ্যে এক জন আছে—অতি বদ। স্কুল ড্রেস পরা কোনো মেয়ে দেখলেই—কিছু না কিছু বলবে। কদর্য কিছু কথা যার সঙ্গে রসিকতা মেশানো। কথা শেষ হওয়া মাত্র রেস্টুরেন্টের সবাই একসঙ্গে হেসে উঠবে।

বুলু এই দলের মধ্যে বসে আছে? ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। বুলু তেমন ছেলে না। তবে কোনো বাবা-মা নিজের ছেলেমেয়েদের খুব বেশি চেনেন না। মিজান সাহেবও হয়ত চেনেন না। একটা বিশেষ বয়স পর্যন্ত তাদের চেনা যায়, তারপর আর যায় না।

মিজান সাহেব অপেক্ষা করতে লাগলেন। বুলুর হাতের সিগারেটটা শেষ হোক। বুলু সিগারেট ধরেছে এটা অবশ্যি খুবই দুঃখের কথা, কিন্তু মিজান সাহেব কেন জানি তেমন দুঃখিত বোধ করলেন না। এর কারণ কি কে জানে। হয়ত তাঁর মনে ভয় ছিল বুলুকে পাওয়া যাবে না। অবশ্যি এমন কিছু সচেতন ভাবে তিনি ভাবেন নি, তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবচেতন মন বলে একটা ব্যাপার আছে। যেই মন গোপনে অনেক কিছুই ভাবে।

বুলুকে তিনি কি বলবেন? আদরের ভঙ্গিতে বলবেন, চল বাসায় চল। নাকি ঠাণ্ডা গলায় বলবেন, বাসায় যা। তিনি নিজেও কি বুলুর সঙ্গে বাড়ি ফিরবেন, না বুলুকে ফেরার কথা বলে সহজ ভঙ্গিতে অফিসের দিকে রওনা হবেন। যেন এক মাস পর ছেলের দেখা পাওয়া তেমন কোনো ঘটনা না। কিংবা তেমন কোনো ঘটনা হলেও একে গুরুত্ব দেয়ার কিছু নেই।

বুলু সিগারেট ফেলে উঠে দাঁড়াতেই মিজান সাহেব চমকে উঠলেন—এ বুলু নয়। চোয়াড়ে ধরনের একটা ছেলে। চেহারায় বুলুর সঙ্গে কোনো মিল নেই অথচ তিনি এতক্ষণ ধরে তাকে বুলু ভাবছেন—এর কারণ কি? গায়ের শার্টটাই কি কারণ? বুলুরও এই রকম একটা শার্ট আছে। খয়েরি রঙের শার্ট।

মিজান সাহেব বাসে উঠে পড়লেন। তাঁর মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। খয়েরি রঙের চেক শার্ট পরা ছেলে এই শহরে নিশ্চয়ই অনেক আছে। তাদের সবাইকে কি তিনি এখন থেকে বুলু বলে ভুল করবেন? তিনি জানালার পাশে একটা সিট পেয়েছেন। বাসে জানালার পাশে বসলে আপনাতেই মনটা ভালো হয়। আজ হচ্ছে না।

অফিসে ঢুকবার মুখে বেয়ারা অজিত বলল, 'স্যার আফনের ছেলে ফিরছে?'

মিজান সাহেব জবাব দিলেন না। এই এক যন্ত্রণা হয়েছে। অফিসে আসামাত্র সবাই একবার জিজ্ঞেস করবে—ছেলে ফিরেছে কিনা। বুলু ফিরেছে কি ফেরে নি এই নিয়ে কারো কোনো আগ্রহ নেই। অথচ সবাই জিজ্ঞেস করে। এটা যেন একটা রুটিন কাজ। 'আপনি ভালো আছেন?' এর মতো একটা বাক্য। প্রশ্নকর্তা অভ্যাসের মতো জিজ্ঞেস করেন। ভালো থাকলেও প্রশ্নকর্তার কিছু যায় আসে না, ভালো না থাকলেও না।

নিজের ঘরে ঢোকার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে পাশের কামরার করিম সাহেব চায়ের কাপ হাতে চলে এলেন—চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, 'কোনো খবর পাওয়া গেল?'

বেয়ারা শ্রেণীর কারোর প্রশ্নের জবাব না দিলে চলে কিন্তু সহকর্মীদের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। মিজান সাহেব বললেন, 'না।'

'বলেন কি? এক মাসের মতো হয়ে গেল না?'

'জ্বি।'

'আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এদের কাছে খোঁজ করেছেন?'

'না।'

'করা দরকার, তারপর থানায় একটা জিডি করিয়ে রাখুন। সময় খারাপ, কিছুই বলা যায় না।'

মিজান সাহেব চুপ করে রইলেন। ছেলের প্রসঙ্গে কথা বলতে তাঁর ভালো লাগছে না কিন্তু উপায় নেই। অপ্রিয় বিষয় নিয়েই মানুষকে বেশি কথা বলতে হয়।

'মিজান সাহেব।'

'জ্বি।'

'চিন্তা করবেন না। চিন্তার কিছু নেই। এই বয়েসে ছেলেদের ঘর পালানো রোগ হয়। আমার নিজের ভাগ্নে এই কাজ করল। ফুফাত বোনের ছেলে। রাগ করে বাড়ি থেকে উধাও। দু'মাস ওর কোনো খোঁজ ছিল না পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, রেডিওতে বিজ্ঞাপন—বিরাট হুলুস্থুল। আর কত রকম গুজব। একবার তো খবর পাওয়া গেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লঞ্চডুবিতে মারা গেছে। বুঝেন অবস্থা, আমার বোন ঘন-ঘন ফিট হচ্ছে.....'

মিজান সাহেব ফাইলে মন দিতে চেষ্টা করলেন। মন বসছে না। ভালো লাগছে না। কিছুই ভালো লাগছে না। মাথায় একটা সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হচ্ছে।

'মিজান সাহেব।'

'জ্বি।'

'থানায় একটা জিডি করিয়ে রাখা দরকার। তাছাড়া এটা একটা নাগরিক কর্তব্য। আমার দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নে আছে মোহাম্মদপুর থানার ওসি। বলেন তো আমি নিয়ে যাব।'

মিজান সাহেব কিছু বললেন না। করিম সাহেব বললেন, 'আজ বিকেলে অফিস ছুটির পর যাওয়া যেতে পারে, যাবেন?'

'না।'

কথাবার্তা হয়ত আরো কিছুক্ষণ চলত। গনি সাহেব ডেকে পাঠালেন।

গনি সাহেবকে আজ অন্যদিনের চেয়েও গম্ভীর মনে হচ্ছে। গম্ভীর এবং চিন্তিত। তিনি সিগারেট খান না কিন্তু আজ হাতে সিগারেট। অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে টান দিয়ে খুক খুক করে কাশছেন। মিজান সাহেব বললেন, 'স্লামালিকুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন?'

'জ্বি ভালো।'

'বসুন, মিজান সাহেব বসুন।'

মিজান সাহেব বসলেন। গনি সাহেব বললেন, 'কিছু ভেবেছেন?'

মিজান সাহেব তাকিয়ে রইলেন। গনি সাহেব বললেন, 'আপনাকে বললাম না, জনহিতকর কিছু করতে চাই। টাকা কোনো সমস্যা হবে না। ঐটা মাথায় রেখে ভাববেন। বুঝতে পারছেন?'

'পারছি।'

'চা খান।'

গনি সাহেব বেল টিপে চায়ের কথা বললেন। তাঁর সিগারেট নিভে গিয়েছিল, সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'সিগারেট আমি খাই না। কে যেন একটা প্যাকেট ফেলে গিয়েছিল। একটা ধরালাম। এখন মাথা ঘুরছে। আচ্ছা ভালো কথা—গণ্ডগোলটা ধরেছেন? মানে আপনার ঐ হিসাবে?'

মিজান সাহেব চুপ করে রইলেন। গনি সাহেব বললেন, 'আমাদের হিসাব পত্রের ব্যাপারগুলি আরো আধুনিক করা দরকার। আমি ভাবছি হিসাব নিকাশের সুবিধার জন্যে একটা কম্প্যুটার রাখলে কেমন হয়? আপনি কি বলেন?'

'আমি তো স্যার ঐসব ঠিক জানি না।'

'আমি নিজেও জানি না। দিনকাল বদলাচ্ছে। আমাদেরও তো সেইভাবে বদলাতে হবে। কি বলেন, ঠিক বলছি না?'

'ঠিকই বলছেন।'

'আমি দু'তিন জন কম্প্যুটারওয়ালাদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা কি বলে জানেন? ওরা বলে হিসাবটা কম্প্যুটারে থাকলে আজ যে সমস্যা আপনার হয়েছে সেই সমস্যা হত না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জ্বি স্যার।'

'আমাদের অফিসের রহমান সাহেবের ছেলের কিডনির কী অসুখ যেন ছিল, কি হয়েছে জানেন?'

'এখন ভালো আছে।'

'আলহামদুলিল্লাহ। কিডনি ট্রান্সপ্লেন্ট হয়েছিল তাই না?'

'জ্বি। তাঁর স্ত্রী কিডনি দিলেন।'

'ভালো। ভালো। খুবই ভালো। ভাবছিলাম একবার দেখতে যাব। খোঁজ নেবেন তো বাসাটা কোথায়?'

'শান্তিনগরে বাসা।'

'ঠিক আছে। একবার যাব। অপারেশনটা হল কোথায়?'

'মাদ্রাজে।'

'বিরাট খরচান্ত ব্যাপার তো।'

'লাখ তিনেক টাকা খরচ হয়েছে স্যার।'

'তা তো হবেই। বিদেশে চিকিৎসা। লাখ তিনেক হলে তো কমই হয়েছে। নিন চা খান। চা ঠাণ্ডা হচ্ছে।'

মিজান সাহেব চা শেষ করলেন। চা খাবার ফাঁকে ফাঁকে গনি সাহেব দেশ, দেশের রাজনীতি নিয়ে কথা বললেন। মিজান সাহেব উঠে যাবার আগের মুহূর্তে বললেন, 'আমি আপনার কাগজপত্রগুলি বাসায় নিয়ে গিয়েছিলাম। ভালো করে দেখতে পারি নি। তবু মনে হল দু'লাখ পঁচাশি হাজার টাকার একটা সমস্যা আছে। তাই না?'

'জ্বি স্যার।'

'চিন্তা করে বের করুন তো কী ব্যাপার! টাকাটা বড় না—যেটা বড় সেটা হচ্ছে—।'

গনি সাহেব জবাব দিলেন না। তাঁর টেলিফোন এসেছে। তিনি টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এক ফাঁকে মিজান সাহেবকে বললেন, 'আচ্ছা এখন যান মিজান সাহেব।'

মিজান সাহেব সাধারণত নিজের চেয়ারে বসেই লাঞ্চ খান। আজ লাঞ্চের জন্যে ক্যান্টিনে চলে গেলেন। এই অফিসে ক্যান্টিন চালানোর মতো কর্মচারী নেই। ছোট একটা কামরা আলাদা করা আছে। সেখানে চা এবং বিস্কিটের ব্যবস্থা আছে। মিজান সাহেব ক্যান্টিনের এক কোণায় টিফিন বক্স নিয়ে দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। গনি সাহেব খুবই বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি দু'য়ে দু'য়ে চার মেলানোর চেষ্টা করছেন এটা যে কোনো বোকা লোকও বুঝতে পারবে। মিজান সাহেব ভেবে পেলেন না এই ব্যাপারটা তার বুঝতে এত দেরি হল কেন?

রহমান সাহেব ক্যাশ সেকশনে আছেন আজ ছ'বছর। নিতান্তই নির্বিরোধী মানুষ। কারো সঙ্গেই কোনো কথাবার্তা বলেন না। নীরবে কাজ করেন। মাঝে-মাঝে দু'হাতে মাথার রগ টিপে ধরে ঝিম মেরে বসে থাকেন। এই সময় তাঁর মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হয়। তীব্র ও অসহ্য ব্যথা। তাঁর ফর্সা মুখ লাল টকটকে হয়ে যায়। ভুরুর চারপাশে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে। কেউ যদি বলে—কি ব্যাপার রহমান সাহেব। তিনি বলেন—কিছু না। তাঁর ব্যথা কতক্ষণ থাকে কেউ জানে না, কিন্তু তাঁকে কিছুক্ষণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যেই আবার কাজ শুরু করতে দেখা যায়। এই সময় তিনি খুব ঘন–ঘন পানি খান কিছুতেই যেন তার তৃষ্ণা মেটে না। তাঁকে বড় অসহায় লাগে।

গনি সাহেব তার সেক্রেটারি মজনু মিয়াকে ডেকে পাঠিয়েছেন। মজনু মিয়া বিনা কারণে প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করছে। গনি সাহেব যখনই তাকে ডেকে পাঠান তখনই তার মনে হয় এইবার বোধ হয় তিনি বলবেন, 'কাজকর্ম তো তোমার কিছুই নেই, কাজেই তোমাকে শুধু শুধু বেতন দিয়ে পোষার মানে নেই। তুমি বিদেয় হও।' অথচ মজনু মিয়া কাজ করতে চায়। বিনা কাজে দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত অফিসে বসে থাকার যন্ত্রণা আর কেউ না জানুক সে জানে।

'মজনু মিয়া।'

'জ্বি স্যার।'

'ভালো আছ?'

'জ্বি স্যার ভালো।'

'গতকাল কেউ এক জন আমার এখানে এক প্যাকেট সিগারেট ফেলে গেছে। খুঁজে বের কর তো। প্যাকেটটা ফেরত দিতে হবে।'

মজনু মিয়া হতভম্ব হয়ে গেল। কে সিগারেট ফেলে গেছে, সে কী ভাবে খুঁজে বের করবে? এটা কি সম্ভব নাকি? তা ছাড়া এক প্যাকেট সিগারেট এমন কী জরুরি জিনিস?

'কি পারবে না?'

মজনু মিয়া মাথা চুলকাতে লাগল। গনি সাহেব বললেন, 'বের করা খুব সোজা বলেই তো আমার ধারণা। এই অফিসের কেউ আমার সামনে বসে সিগারেট খায় না—তাই না? বাইরের কেউ হবে। গতকাল আমার কাছে কে–কে এসেছে তোমার জানা আছে না? ওদের মধ্যেই কেউ হবে। খুঁজে বের কর, তারপর গাড়ি নিয়ে প্যাকেটটা দিয়ে আসবে এবং বলবে এখানে একটা সিগারেট কম আছে। আমি খেয়ে ফেলেছি। এই জন্যে আমি খুব শরমিন্দা। বলতে পারবে না?'

'পারব স্যার।'

'গাড়ি নিয়ে যাবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

গনি সাহেব পানের কৌটা বের করে একটা পান মুখে দিলেন। বাসায় টেলিফোন করলেন। টেলিফোন ধরল ছোট জামাই। তিনি টেলিফোন কানের কাছে ধরে রাখলেন—ও পাশ থেকে বার–বার শোনা যাচ্ছে, 'হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো।'

তিনি টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। নামাজের সময় হয়ে গেছে। নামাজ পড়বেন। তিনি ওজুর পানি দিতে বললেন। বাথরুমেই পানির ব্যবস্থা আছে কিন্তু তিনি সে পানি ব্যবহার করেন না। ওজুর জন্যে তিনি পুকুরের পানি ব্যবহার করেন। ড্রামে করে সেই পানি জমা রাখা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭

দুপুর বেলা চারদিক কেমন নিঝুম হয়ে থাকে।

ফরিদা বারান্দায় পাটি পেতে শুয়ে থাকেন। বাবলু, লীনা স্কুলে। বীণা সারা দুপুর কুয়াতলায় বসে কি সব বইপত্র পড়ে। সুনসান নীরবতার মধ্যে একমাত্র সরব ব্যক্তি বীণার দাদী। যদিও দুপুর বেলায় তার গলা খাদে নেমে যায়। একঘেয়ে স্বরে তিনি বিড়-বিড় করেন। সেই বিড়বিড়ানির মধ্যে ঘুম পাড়ানো কোনো সুর হয়ত আছে। শুনতে শুনতে ফরিদার ঘুম পেয়ে যায়।

আজও ঘুম পেয়ে গেল।

ঘুম ভাঙল খট্ খট্ শব্দে। গেট দুপুরে ভেতর থেকে বন্ধ থাকে। ভিখিরীর দল খানিকক্ষণ খট্ খট্ করে এক সময় বিরক্ত হয়ে চলে যায়। আজ যে এসেছে সে কিছুতেই যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে আবার শব্দ করে, ফরিদা বিরক্ত গলায় বললেন, 'বীণা একটু দেখ তো। এরা বড় যন্ত্রণা করে।'

বীণা চিঠি লিখছিল। তার চিঠি লেখার কোনো মানুষ নেই। অথচ কর্মহীন দুপুরে কেন জানি শুধু চিঠি লিখতে ইচ্ছা করে। অবিশ্যি আজকের চিঠিটি সে লিখছে মালবীকে। মালবীর সঙ্গে তার তেমন কোনো ভাব নেই। তবু মালবী তার একমাত্র বান্ধবী যে হঠাৎ করে তাকে দীর্ঘ চিঠি লিখে বসে। গতকাল মালবীর একটা চিঠি এসেছে। তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে—এই খবর জানিয়ে দীর্ঘ চিঠি। ছেলে বাংলাদেশের চায়না এ্যাম্বেসির কালচারাল সেক্রেটারি। হঠাৎ করে বিয়ে ঠিক হয়েছে। দেশ ছেড়ে মালবীকে চলে যেতে হবে এই দুঃখেই সে কাতর। চিঠির জবাব লিখতে গিয়ে বীণার নিজের কেন জানি একটু মন খারাপ লাগছে। সে খাতা বন্ধ করে গেট খুলতে গেল। ভর দুপুরে আজকাল গেট খোলাও বিপজ্জনক। হুট করে কে না কে ঢুকে পড়ে।

বীণা বলল, 'কে?'

নরম গলায় জবাব এল—'বীণা আমি। আমি বুলু। বাবা বাড়িতে?'

বীণা গেট খুলতে খুলতে বলল, 'এইসব কী কাণ্ড দাদা? কোথায় পালিয়েছিলে?'

'বাবা কি বাসায়?'

'না বাবা বাসায় নেই। একি অবস্থা তোমার, ছি ছি।'

বুলু লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল, 'বাসার অবস্থা কি একটু ঠাণ্ডা?'

'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে বক-বক করবে, না ভেতরে আসবে? ইস্ কী অবস্থা হয়েছে।'

'মৌলানা সাহেব হয়ে গেছি। কি রকম চাপদাড়ি উঠেছে দেখেছিস?'

ভেতর থেকে ফরিদা বললেন, 'কার সঙ্গে কথা বলছিসরে বীণা? কে?'

'দাদা এসেছে মা।'

ফরিদা উঠে বসলেন। কি বলবেন বা কি করবেন বুঝতে পারলেন না। এতদিন পর এসেছে। ভয়ে ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, মা হিসেবে সান্ত্বনার কিছু কথা কি বলা উচিত না? নাকি তিনিও রাগ দেখাবেন? মুখ গম্ভীর করে যেভাবে শুয়েছিলেন সেইভাবেই শুয়ে থাকবেন?

বুলু বারান্দায় চলে এল। ফরিদা চমকে উঠলেন। কী চেহারা হয়েছে ছেলের! মুখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভর্তি দাড়ি। আটাশ দিনে এত লম্বা দাড়ি হয় নাকি? চুল মনে হচ্ছে জট পাকিয়ে গিয়েছে। মুখটা শুকনো। ফরিদা বললেন, 'পায়ে কী হয়েছে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিস কেন?'

'কাঁটা ফুটেছে। মা, বাবার রাগ কমেছে?'

'রাগ না কমলে কী করবি আবার পালিয়ে যাবি?'

বুলু লাজুক ভঙ্গিতে হাসল। হাসি দেখে বড় মায়া লাগল ফরিদার। আহা বেচারা। তিনি নরম গলায় বললেন, 'মানুষ পরীক্ষায় ফেল করে না? ফেল করলে বাড়ি ঘর ছেড়ে দিতে হয়?'

'তিনবার তো কেউ ফেল করে না?'

ফরিদা বললেন, 'ছিলি কোথায়?'

'গ্রামের দিকে ছিলাম।'

'বীণা ওকে গোছলের পানি দে। সাবান দে।'

বীণার দাদী চেঁচাচ্ছেন 'হারামজাদা আইছে? ওই হারামজাদা, এদিকে আয়।'

কুয়ার পাড়ে বুলু গোছল করতে বসেছে। বীণা আছে তার পাশেই। বীণা বলল, 'পিঠ ভর্তি ময়লা দাদা। দাও, গামছাটা আমার কাছে দাও, ঘষে দেই।'

'লাগবে না লাগবে না।'

'আহা দাও না। শরীর এত নোংরা হল কী ভাবে? ইস্ কী ভাবে ময়লা উঠছে। দাদা, মাথায় আরো বেশি করে সাবান দাও তো।'

বুলু বলল, 'তোর রেজাল্ট যে কী প্রথম দুই দিন বুঝতেই পারি নি। নিজেরটা দেখেই অবস্থা কাহিল। থার্ড ডে-তে তোর রেজাল্ট দেখলাম। এত আনন্দ হল বুঝলি—একেবারে চোখে পানি এসে গেল। তোকে মাথায় নিয়ে নাচতে ইচ্ছা করছিল।'

'একবার এসে তো বললেও না।'

'বাবার ভয়ে আসি নি।'

'এখন ভয় করছে না?'

'করছে। খাওয়া-দাওয়া করে আবার পালাব......'

'পাগলামি যথেষ্ট করেছ দাদা।'

ফরিদা নিজেই ছেলের জন্যে একটা ডিম ভেজে আনলেন। খাবার তেমন কিছু নেই। ছোট মাছের তরকারি ছিল—কেমন টক্ টক্ গন্ধ ছাড়ছে। ডালও আছে সামান্য।

'মা একটা শুকনো মরিচ ভেজে দাও তো।'

ফরিদা একটা শুকনো মরিচ ভেজে আনলেন। বুলু এত আগ্রহ করে খাচ্ছে। এতদিন কোথায় ছিল, কী খেয়েছে কে জানে।

মিজান সাহেব সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে ফিরলেন। হাত মুখ ধুয়ে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বসলেন। ফরিদা বললেন, 'বুলু এসেছে।'

তিনি কিছু বললেন না। ফরিদার মনে হল, কথাটা বোধহয় শুনতে পায় নি। ফরিদা গলা উঁচিয়ে বললেন, 'বুলু এসেছে।'

মিজান সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, 'কতবার এক কথা বলবে? এসেছে ভালো কথা। এখন আমাকে করতে হবে কী? কোলে নিয়ে বসে থাকতে হবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিছু বলো না। ভয় পাচ্ছে খুব।'

মিজান সাহেব চা শেষ করেই উঠে পড়লেন। ফরিদা বললেন, 'কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

তিনি কোনো জবাব দিলেন না। ছাতা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আনন্দে লীনা ও বাবলুর চোখে প্রায় পানি এসে যাবার মতো হল। আজ বৃহস্পতিবার, বাবার বইপত্র নিয়ে বসার দিন। একবার যখন বের হয়ে গেছেন তখন বোধ হয় আর বসা হবে না।

বুলু দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেই ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার পর। গা ম্যাজ-ম্যাজ এবং জ্বর-জ্বর ভাব নিয়ে সে শুয়েই রইল। বাঁ পা-টা টাটাচ্ছে।

বীণা চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকল। এর আগেও সে কয়েকবার এসেছিল। বুলু ঘুমুচ্ছে দেখে ডাকে নি।

বুলু বলল, 'বাবা আসেন নি?'

'এসেছিলেন, আবার কোথায় যেন গেলেন।'

'আমার প্রসঙ্গে কিছু বলেছেন?'

'না।'

'চলে যাওয়া দরকার। বাবা আবার ফিরে আসার আগেই বিদায় নেয়া উচিত।'

'বাজে কথা বলবে না দাদা। যা করেছ যথেষ্ট করেছ। বড়াগুলি খাও। শুধু চা খাচ্ছ কেন?'

'গ্রামে—গ্রামে ঘুরছিলাম তো বুঝলি বীণা, অনেক কিছু দেখলাম। আমার আগে ধারণা ছিল আমরাই বোধ হয় সবচে গরীব। শুধু ভাত খাচ্ছে বুঝলি। শুধু ভাত। সাথে কিচ্ছু নেই।'

'তুমি কি ওদের নিয়ে কবিতা-টবিতা লিখলে?'

বুলু কিছু বলল না। লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। বুলুর মধ্যে কিছুদিন পর পর কবিতা লেখার একটা উৎসাহ দেখা যায়। কোনো কবিতাই সে কাউকে দেখায় না, তবে বীণা ব্যাপারটা জানে।

'তুই এম. এ পড়বি না বীণা?'

'জানি না তো। বাবা কিছু বলছে না।'

'বলাবলির কি আছে? ভর্তি হয়ে যা। এম.এ পাশ বোন বলতেই ভালো লাগবে। এম. এ জিনিসটাই অন্যরকম, তাই না?'

'কি জানি।'

'আমি যদি এম.এ পাশ করতে পারতাম তাহলে গ্রামের দিকে কোনো কলেজে মাস্টারি করতাম। ফাইন হত।'

বুলু ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। বীণা বলল, 'সেলুনে গিয়ে দাড়ি-টাড়িগুলো কামিয়ে আস দাদা, বিশ্রী লাগছে। এই নাও।'

বীণা পাঁচ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিল। বুলু হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিল। তার হাত একেবারে খালি। সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে। সিগারেটের অভ্যাসটা তার গ্রামে গিয়ে হয়েছে।

বুলু বাসা থেকে হাত খরচের কোনো টাকা পয়সা পায় না। টুক টাক খরচের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকাটা সে একটা প্রাইভেট টিউশানি করে জোগাড় করে। ওদের কাছ থেকে গত মাসের বেতন নেয়া হয় নি। বুলু ঠিক করল আজ রাতেই একবার যাবে। রাত আটটা ন'টার আগে না গেলে ছাত্রের বাবাকে পাওয়া যাবে না। টাকাটা পেলে বীণার জন্যে সামান্য কিছু উপহার কিনবে বলে সে ঠিক করে ফেলল। কী কেনা যায়

শান্তিবাগে রহমানের বাসা খুঁজে বের করতে মিজান সাহেবের অনেক দেরি হল। গলির ভেতর গলি, তার ভেতর গলি। খুঁজে পেতে যে বাড়ি পাওয়া গেল তার অবস্থা দেখে মিজান সাহেব আকাশ থেকে পড়লেন। দোতলা বাড়ির একতলা। বাড়ির এমন অবস্থা, মনে হচ্ছে এক্ষুনি গোটা বাড়ি ভেঙে পড়বে। সদর দরজার সামনেই ডাস্টবিন। রাতে সাধারণত মাছি ওড়ে না অথচ এখানে মাছি ভন-ভন করছে। দুর্গন্ধে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে।

দরজার কড়া নাড়তেই রহমান বের হয়ে এল, অবাক হয়ে বলল, 'স্যার আপনি '

'কেমন আছ রহমান

'জ্বি ভালো।'

'তোমার বাচ্চাটাকে দেখতে এলাম। ও আছে কেমন

'ভালো আছে স্যার। ও বাসায় নেই, ওর বড় মামার বাড়ি গেছে। যাত্রাবাড়িতে। স্যার ভেতরে আসুন।'

মিজান সাহেব ভেতরে ঢুকলেন। বাড়ির সাজসজ্জা দেখে মনটা খারাপ হল। কি অবস্থা। বসার ঘরে কয়েকটা কাঠের চেয়ার। এককোণে একটা চৌকি। পাটি বিছানো। পাটির ওপর ওয়ারবিহীন তেল চিটচিটে একটা বালিশ।

'স্যার একটু বসুন, আমি আমার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে আসি।'

রহমানের স্ত্রী অসম্ভব রোগা, বালিকা চেহারার একটা মেয়ে। সে শাড়ি বদলে এসেছে। পাটভাঙা শাড়ি ফুলে আছে। মেয়েটি পা ছুঁয়ে মিজান সাহেবকে সালাম করল। মিজান সাহেব খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। রহমান বলল, 'আমার স্যার। উনার কথা তোমাকে বলেছি চিনু।'

মিজান সাহেব বললেন, 'ভালো আছ তুমি করে বলে ফেললাম। আমার বড় মেয়ে তোমার বয়েসী।'

'অবশ্যই তুমি করে বলবেন চাচাজান। অবশ্যই বলবেন। আপনার বড় ছেলে কি ফিরেছে

মিজান সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ ফিরেছে। ওর কথা তুমিও জান

'জ্বি ও বলেছে। ও অফিসের সব কথা আমাকে বলে।'

রহমান শার্ট গায়ে দিয়ে বের হয়ে গেছে। খাবার দাবার কিছু কিনবে বোধ হয়। চিনু চৌকিতে বসে গল্প করছে।

'ঘর টরের এমন অবস্থা। আপনি এসেছেন খুব খারাপ লাগছে।'

'আমার নিজের বাড়ি ঘরও খুব ভালো অবস্থায় নেই।'

'ওদের অবস্থা কিন্তু খুব খারাপ ছিল না চাচা। জমিজমা ভালো ছিল। বৎসরের চাল জমি থেকে আসত। সব বিক্রি করতে হল। আড়াই লাখ টাকা জোগাড় করা সোজা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা তো না। জমিজমা বসত বাড়ি, আমার সামান্য কিছু গয়না সব গেছে, তারপরেও দশ হাজার টাকা দেনা। কিন্তু আমার কোনো আফসোস নেই। মানুষের জীবনের চেয়ে বড় তো কিছু না। তাই না চাচা? ছেলেটা তো ভালো হয়েছে।'

'তা তো বটেই।'

'আমার এক খালাতো ভাই টাকা দিতে চেয়েছিল ও নেয় নি। ওর আবার আত্মসম্মান খুব বেশি। পরের টাকায় সে ছেলের চিকিৎসা করাবে না। বলেন চাচা, আমাদের মতো মানুষের মুখে এইরকম কথা কি মানায়?'

'মানাবে না কেন? নিশ্চয়ই মানায়।'

'এত বড় ঝামেলা গেল অফিসের কেউ দেখতে আসে নাই। আপনি এসেছেন। ও খুব খুশি হয়েছে। ও অল্পতেই খুশি হয়।'

মিজান সাহেব চুপ করে বসে রইলেন। রহমান খাবার নিয়ে ফিরে এসেছে, দু'টা মিষ্টি, দু'টা সিঙ্গাড়া, চারটা নিমকি। এদের ঘরে বোধ হয় চায়ের ব্যবস্থা নেই। কেতলীতে করে চাও এসেছে।

বুলু যে ছেলেটিকে পড়ায় তাদের বাসা আদাবরে। ছেলেটি ক্লাস ফোরে পড়ে। বুদ্ধিমান ছেলে। কোনো জিনিস একবারের বেশি দু'বার তাকে বলতে হয় না, তবে হাতের লেখা খুব খারাপ। বুলু যা করত সেটা হচ্ছে রোজ চার পাঁচ পাতা করে হাতের লেখা লেখানো। এতেও কোনো লাভ হয় নি, হাতের লেখা যেমন আছে তেমনি রয়ে গেছে।

এ বাড়িতে এসে বুলুর বেশ মন খারাপ হল। বারান্দায় নতুন এক জন মাস্টার ছেলেটাকে পড়াচ্ছেন। মনে হচ্ছে কড়া ধরনের মাস্টার। ছেলেটা বুলুর দিকে তাকাতেই মাস্টার সাহেব কড়া একটা ধমক দিলেন।

ছেলেটার বাবা বাসাতেই ছিলেন। বেরিয়ে এসে শুকনো মুখে বললেন, 'আপনি যে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন আর খোঁজ নেই। শেষে নতুন এক জন মাস্টার রেখে দিলাম।'

'ভালো করেছেন।'

'মাস্টারও ভালো। কড়া ধরনের......।'

'কড়া মাস্টারই ভালো।'

'আপনার বোধ হয় কিছু টাকা-পয়সা পাওনা আছে। সামনের সপ্তাহে একবার আসুন দেখি। হিসাব টিসাব করে দেখি।'

বুলু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এক মাসের বেতন বাকি। সামান্য ক'টা টাকা, এর এত হিসাব নিকাশ কি?

'বসুন চা খেয়ে যান।'

'জ্বি না থাক।'

'সামনের সপ্তাহে একবার আসুন। বুধবারে চলে আসবেন।'

বুলু কিছু বলল না। বাঁ পায়ের ব্যথা বেশ বেড়েছে।

ভদ্রলোক বললেন, 'দাড়ি রেখেছেন ব্যাপার কি?'

'ব্যাপার কিছু না এমনি রাখলাম।'

'আচ্ছা আসুন সামনের সপ্তাহে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ির গেটের কাছে বুলুর সঙ্গে মিজান সাহেবের দেখা হয়ে গেল। মিজান সাহেব খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। বুলু ভেবেছিল—কিছু নিশ্চয়ই বলবেন।

তিনি কিছুই বললেন না। দু'জন মানুষ কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। অথচ কেউ কারো সঙ্গে কোনো কথা বলছে না। বেশ কিছু সময় পর মিজান সাহেব বললেন, 'দাড়ি রেখেছিস কেন?'

বুলু জবাব দিল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

'তোর পায়ে কী হয়েছে? খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিস কেন?'

বুলু চুপ করে রইল।

'কথা বলছিস না যে, কথা বলা ভুলে গেছিস?'

বুলু ভেবেছিল বাবা বলবেন, 'যা সেলুন থেকে দাড়ি কেটে পরিষ্কার হয়ে আয়।' তিনি তা বললেন না।

'বুলু।'

'জ্বি।'

'তোর চেহারা আমি দেখতে চাই না। তুই যেখানে গিয়েছিলি সেখানেই যা।'

'এখন চলে যাব বাবা?'

মিজান সাহেব এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন। বুলু কী করবে বুঝতে পারল না। সে কি এখনি চলে যাবে? না দু'একটা দিন অপেক্ষা করবে? বড্ড ক্লান্ত লাগছে। আজ রাতটা কি বাবা তাকে থাকতে দেবেন?

AMARBOI.COM

৮

ডারমাটোলজিস্ট প্রফেসর বড়ুয়া হাসতে হাসতে বললেন, 'এটা তো কিছুই না। এক ধরনের ফাংগাস। নিম্নশ্রেণীর এককোষী উদ্ভিদ।'

বোরহান সাহেব বললেন, 'ভাই ভালো করে দেখুন।'

'ভালো করেই দেখেছি। এইসব ফাংগাসরা অনেক জায়গায় বংশ বিস্তার করতে পারে। মানুষের চামড়া তাদের বংশ বিস্তারের জন্যে ভালো জায়গা। আমি একটা মলম দিচ্ছি গোসলের পর চামড়ায় লাগাতে হবে।'

অলিক বলল, 'লাগালেই সেরে যাবে?'

'অবশ্যই সারবে।'

'কতদিন লাগবে সারতে?'

'এই ধর সাত দিন। দাগ পুরোপুরি মেলাতে দশ পনের দিন লাগতে পারে।'

অলিক বলল, 'আপনি কি ভালোমতো দেখেছেন ডাক্তার সাহেব?'

প্রফেসর বড়ুয়া খানিকটা গম্ভীর হয়ে গেলেন। এক জন এম আর সি পি ডাক্তারকে ঘন ঘন যদি বলা হয় আপনি কি ভালোমতো দেখেছেন তাহলে খুব সঙ্গত কারণেই তাঁর রাগ হবার কথা।

বোরহান সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মা তুমি একটু বাইরে যাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি উনার সঙ্গে একটু কথা বলব।'

অলিক বলল, 'আমার সামনেই বল। তোমার এমন কোনো কথা নেই যা আমার সামনে বলা যাবে না। মার কথাই তো তুমি বলবে তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'বল। আর তোমার যদি বলতে অস্বস্তি লাগে তাহলে না হয় আমিই বলি।'

বোরহান সাহেব চুপ করে গেলেন। স্ত্রীর প্রসঙ্গে কথা বলতে আসলেই তাঁর অস্বস্তি হচ্ছে। অলিক খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বেশ সহজভাবেই বলল, 'ডাক্তার সাহেব আমার মায়ের চামড়াতেও ঠিক একই রকম হলুদ রঙের দাগ হয়েছিল, তারপর সেগুলো হয়ে গেল কালচে। এখানকার ডাক্তাররা বললেন—কিছুই না—এক ধরনের ছত্রাকের আক্রমণ। ওষুধ দিলেন। কিছুই হল না। ওষুধ বদলানো হল—কিছুই না, দাগ বাড়তে লাগল, শুরু হল যন্ত্রণা। মাকে আমরা বিলেত নিয়ে গেলাম। সেখান থেকে আমেরিকার জন হপকিন্স হাসপাতালে। ডাক্তাররা বললেন—এটা একটা অজানা চর্মরোগ। এই অসুখেই মা মারা যান।'

প্রফেসর বড়ুয়া তাকিয়ে আছেন।

বোরহান সাহেব বললেন, 'এখনো কি আপনার ধারণা আমার মেয়ের গায়ে যে দাগ সেগুলো ফাংগাসের জন্যে?'

'অবশ্যই। আপনার স্ত্রীকে আমি দেখি নি কাজেই তাঁর কী হয়েছিল আমি বলতে পারব না। এই মেয়েকে আমি দেখেছি। ওষুধ লিখে দিলাম। আচ্ছা থাক ওষুধ কিনতে হবে না, আমি দিয়ে দিচ্ছি। আমার কাছে স্যাম্পল আছে। আপনি সাত দিন পর আসবেন। অবশ্যই আসবেন।'

'আসব।'

'যে সব প্রেসক্রিপশন আপনার স্ত্রীকে ডাক্তাররা করেছিলেন সেগুলো কি আছে?'

'থাকার কথা নয়। আমি খুঁজে দেখতে পারি।'

অলিক বলল, 'ডাক্তার সাহেব আমার অসুখটা যদি আপনার কাছে এতই সহজ মনে হয় তাহলে আপনি মার প্রেসক্রিপশন খুঁজছেন কেন?'

'তোমার চিকিৎসার জন্যে খুঁজছি না। আমি খুঁজছি আমার একাডেমিক ইন্টারেস্টে। তোমার নাম কি খুকী?'

'অলিক।'

'সাত দিন পর দেখা হবে।'

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বের হয়েই অলিক বলল, 'মাত্র সাড়ে চারটা বাজে। আমার বাসায় ফিরতে ইচ্ছা করছে না বাবা। চল কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করা যাক।'

'কোথায় ঘুরবি?'

'ঢাকা শহরে কি কোথাও শিমুল গাছ আছে? আমার একটা শিমুল গাছ দেখতে ইচ্ছা করছে।'

'শিমুল গাছ?'

'হ্যাঁ। শিমুল গাছ Silk Cotton Plant. শিমুল গাছ নিয়ে অপূর্ব একটা কবিতা পড়লাম। শব্দ করে বিচিগুলো ফাটে তারপর বাতাসে ভাসতে ভাসতে তুলা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে—সত্যি বাবা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি বলতে পারছি না—আমার অবস্থাও তোর মতো, শিমুল গাছ দেখা হয় নি। বা দেখলেও কী ভাবে কি হয় জানি না।'

'কোন সময়টা তুলা বের হয় তা জান?'

'তাও জানি না। চল বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে খোঁজ নেই।'

'বাগানের সাজানো গাছ দেখতে ইচ্ছা করছে না বাবা। বাগানের সাজানো গাছ মানে পোষা গাছ। আমি দেখতে চাই বন্য গাছ।'

'তাহলে খোঁজ খবর করে একটু গ্রামের দিকে যেতে হয়।'

'বেশ তাই চল।'

'আজ তো আর হবে না।'

'আগামীকাল চল। আজ তুমি আমাকে একটা জায়গায় নামিয়ে দিয়ে বাসায় চলে যাবে। রাতে ফিরতেও পারি নাও ফিরতে পারি।'

'তার মানে।'

'যদি থাকতে ইচ্ছা করে থেকে যাব।'

'কার বাসা?'

'বীণাদের বাসা। যদি রাতে থেকে যাই তোমার আপত্তি হবে না তো?'

'আপত্তি হবে কেন? আমি বরং রাত দশটার দিকে গাড়ি পাঠাব, তোর যদি আসতে ইচ্ছা হয় চলে আসবি। আসতে ইচ্ছা না হলে গাড়ি ফেরত পাঠাবি।'

'গাড়ি পাঠাতে হবে না বাবা। তোমার ভয় নেই, রাত দশটায় আমি একা একা রওনা হব না।'

বোরহান সাহেব মেয়েকে বড় রাস্তায় নামিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'ওষুধটা আজ রাত থেকেই শুরু করিস মা।'

'করব। আজ রাতে থেকেই শুরু হবে।'

বীণাদের বাড়িতে এর আগে একবারই এসেছিল—এত বছর পর ঠিকানা ছাড়া সেই বাড়ি খুঁজে বের করা অসম্ভব ব্যাপার। ঢাকা শহর সাপের মতো বছরে একবার খোলস ছেড়ে নতুন হচ্ছে। অলিক পুরোপুরি ধাঁধায় পড়ে গেল। আগে গ্রামগ্রাম একটা ভাব ছিল, এখন রীতিমতো শহুরে এলাকা। শুধু রাস্তা বেশি বদলায় নি। রাস্তাটা চেনা যাচ্ছে।

অলিক বীণার বাবার নাম জানে না—জানলে দোকানে বা লন্ড্রিতে জিজ্ঞেস করা যেত—অমুক সাহেবের বাসা কোনটা। বীণাদের ভাইদের কারুর নাম জানলে অল্পবয়সী ছেলেদের জিজ্ঞেস করা যেত। এখন সে যা জিজ্ঞেস করতে পারে তা হচ্ছে বীণাদের বাড়ি কোনটা? সুন্দর মতো একটা মেয়ে—লম্বা, ফর্সা এবার বি.এ পাশ করেছে। পাড়ার ছেলেরা নিশ্চয়ই সুন্দরী মেয়েরা কে কোথায় থাকে জানে।

দেখা গেল কেউ জানে না। সম্ভবত এ পাড়ায় অনেকগুলো সুন্দরী মেয়ে থাকে এবং তাদের সবাই একটি বাড়িতে থাকে যে বাড়ির কর্তা এক জন উকিল। সুন্দরমতো একটা মেয়ে বলতেই সবাই বলে—'ও আচ্ছা উকিল সাহেবের মেয়েদের কথা বলছেন? উত্তরের তিন তলা বাড়িতে চলে যান।'

অলিকের মনে আছে বীণাদের বাড়ি একতলা। বাড়িতে চমৎকার একটা কুয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। কুয়ার পাড়ে একটা ফুলের গাছ। ফুল গাছের নাম মনে নেই, তবে সাদা রঙের ফুল যার গন্ধ খুবই হালকা।

অলিক এক ঘন্টার মতো হাঁটাহাঁটি করল। এক ঘন্টা হাঁটাহাঁটি করেও সে তেমন ক্লান্তি বোধ করছে না। বরং মজাই লাগছে। এক ধরনের চ্যালেঞ্জ বোধ করছে। সে ঠিক করে ফেলল সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত সে খুঁজবে। সূর্য ডুবে যাবার সঙ্গে–সঙ্গে উকিল সাহেবের বাসায় যাবে। তাঁর সুন্দরী মেয়েগুলোকে দেখে সেই বাসা থেকেই বাবাকে টেলিফোন করে বলবে গাড়ি পাঠাতে। উকিল যখন, তখন নিশ্চয়ই বাসায় টেলিফোন আছে।

অলিককে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল না—তার আগেই গুণ্ডামতো মুখ ভর্তি দাড়ি গোফওয়ালা এক ছেলে এসে বলল, 'আপনি নাকি বীণা নামের একটা মেয়েকে খুঁজছেন।'

অলিক বলল, 'আপনাকে কে বলল?'

'চায়ের দোকানে শুনলাম। আসুন আমার সঙ্গে।'

'আপনার সঙ্গে যাব কেন? আপনাকে দেখে গুণ্ডা বলে মনে হচ্ছে।'

দাড়িওয়ালা লোকটা হেসে বলল, 'আমি বীণার বড় ভাই। আমার নাম বুলু।'

'আপনি যে তার ভাই তারই বা প্রমাণ কি?'

'মুখে দাড়ি না থাকলে চিনতে পারতেন। আমরা সব ভাইবোন দেখতে এক রকম।'

'বীণা বাসায় আছে?'

'জ্বি আছে।'

'উকিল সাহেবের বাসা কোনটা জানেন?'

'কোন উকিল সাহেবের বাসা?'

'যার অনেকগুলো রূপবতী মেয়ে আছে।'

'জানি না তো।'

'সে কী, আপনি জানেন না? সবাই তো জানে। আসুন আমার সঙ্গে। আমি চিনি। ঐ বাসায় খানিকক্ষণ বসে তারপর আপনার সঙ্গে যাব।'

বুলু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এই ধরনের একটি মেয়ের সঙ্গে বীণার পরিচয় আছে এটা ভাবতেই তার অবাক লাগছে। বুলু মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

'আপনি মুখ ভর্তি দাড়ি রেখেছেন কেন?'

বুলু হাসতে হাসতে বলল, 'পরীক্ষায় ফেল করে দাড়ি রেখে ফেলেছি।'

'পরীক্ষায় ফেল করলে দাড়ি রাখতে হয় জানতাম না তো। ইন্টারেস্টিং। আপনারা না হয় দাড়ি রাখলেন। আমরা মেয়েরা কী করব? আমাদের তো দাড়ি রাখার উপায় নেই।'

'চুল কেটে ফেলতে পারেন।'

'মন্দ না। আপনি তো বেশ গুছিয়ে কথা বলেন। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন কেন। আপনার বাঁ পা টা কি শর্ট?'

'বাঁ পায়ে কাঁটা ফুটেছে।'

'কাঁটা তো গলায় ফোটে জানতাম। পায়েও ফোটে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ ফোটে।'

'আপনি খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করেন নাকি?'

বুলুর ধারণা হল মেয়েটার মাথায় ছিট আছে। এক জন সুস্থ স্বাভাবিক মেয়ে এরকম অনর্গল কথার পিঠে কথা এক জন অপরিচিত ছেলের সঙ্গে বলবে না। আশ্চর্য, এমন মজার একটি মেয়েকে বীণা চেনে অথচ কোনোদিন এই মেয়েটার কথা সে তাদের বলে নি।

উকিল সাহেব বা উকিল সাহেবের মেয়েদের কাউকেই পাওয়া গেল না। গেটে বিরাট তালা।

অলিক বলল, 'চলুন যাওয়া যাক। আপনাদের বাসা কি অনেকখানি দূর?'

'না, দূর না, কাছেই। ঐ যে চায়ের দোকানটা দেখা যাচ্ছে, ওর পেছনে।'

'আরো একটু দূর হলে ভালো হত, কথা বলতে বলতে যাওয়া যেত। আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগছে। কথা বলতে ইচ্ছা করছে।'

বুলু হকচকিয়ে গেল। এই পাগল মেয়ে বলে কি? অলিক হাসি মুখে বলল, 'আপনি এত ঘাবড়ে গেলেন কেন? মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা আপনার অভ্যেস নেই তাই না? আমার সামান্য কথা শুনেই আপনার ধারণা হয়েছে আমি আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি। শুনুন আপনাকে একটা জরুরি কথা বলি। কুড়ি পার হওয়া মেয়েরা খুব হিসেবী, তারা চট করে কারো প্রেমে পড়ে না। দাড়ি গোফের জঙ্গল হয়ে আছে এমন ছেলেকে তো নয়ই।'

বুলু স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আপনি চাইলে আমি দাড়ি গোফ কামিয়ে ফেলতে পারি।'

অলিক কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আশেপাশের সবাইকে সচকিত করে খিল খিল শব্দে হেসে উঠল। অনেকদিন এমন গাঢ় আনন্দে সে হাসে নি।

'ভালো কথা আপনি শিমুল গাছের ইংরেজি কী জানেন?'

'জ্বি না। আমি কোনো গাছের ইংরেজিই জানি না। শুধু জানি গাছ হচ্ছে ট্রি।'

'শিমুল গাছের ইংরেজি হচ্ছে Cotton seed tree. আপনি কি শিমুল গাছ দেখেছেন?'

'দেখব না কেন? আমার পায়ে যে কাঁটা ফুটেছে সেটা হচ্ছে শিমুল কাঁটা।'

'কী বললেন?'

'শিমুল কাঁটা ফুটে আমার অবস্থা কাহিল।'

'বাহ্ চমৎকার তো। কী আশ্চর্য যোগাযোগ।'

বুলু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এই মেয়েটির কথাবার্তা সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

ফরিদা খুবই বিব্রত বোধ করছেন ঘরে রাতে তেমন কিছুই রান্না হয় নি। দুপুরের ইলিশ মাছের তরকারি সামান্য ছিল ঐ দিয়েই টেনে টুনে রাতটা পার করে দেবেন ভেবেছিলেন—এখন কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। বীণা এক ফাঁকে এসে বলে গেছে, 'মা, ও রাতে এখানে থাকতে চায়।'

ফরিদা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'রাতে থাকার দরকার কি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'থাকতে চাচ্ছে, এখন কী করে বলি থাকা যাবে না।'

'থাকার দরকারটা কি?'

'ওর মাথার ঠিক নেই মা?'

'এ রকম মাথা খারাপ মেয়ের সঙ্গে তোর বন্ধুত্ব হল কী ভাবে?'

'ও খুব ভালো মেয়ে মা। ওর সঙ্গে ভালো করে না মিশলে তুমি বুঝবে না।'

'আমার এত বোঝার দরকার নেই। এখন তোর বাবা এসে কী করে সেইটাই হচ্ছে কথা। চেঁচামেচি না করলেই হল। ও ঘুমুবে কোথায়?'

'ও বলছে ঘুমুবে না। কুয়ার পাড়ে বসে সারা রাত গল্প করবে।'

'মেয়েটা কি সত্যি-সত্যি পাগল নাকি?'

ফরিদা মেয়েটিকে ঠিক অপছন্দও করতে পারছেন না। সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মিশছে। যেন এটা তার নিজের বাড়ি।

রাত আটটার দিকে মিজান সাহেব বাড়ি ফিরে অবাক হয়ে লক্ষ করলেন ফুটফুটে একটা মেয়ে বীণার শাড়ি পরে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসু চোখে ফরিদার দিকে তাকাতেই ফরিদা হড়বড় করে বললেন, 'বীণার বন্ধু, মেয়েটার মা নেই। খুব দুঃখী মেয়ে। আজ রাতটা বীণার সঙ্গে থাকতে এসেছে। তুমি রাগারাগি করবে না।'

মিজান সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'বীণার বন্ধু—এক রাত থাকবে আমি তাতে রাগ করব কেন? কি বলছ এসব?' ফরিদা অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলেন।

'ডাক মেয়েটাকে।'

ফরিদা অলিককে ডাকতে যাচ্ছিলেন, মিজান সাহেব বললেন, 'থাক পরে কথা বলব। খাওয়া-দাওয়ার কী ব্যবস্থা করেছ?'

'কিছু তো ঘরে নাই।'

'কিছু একটা কর। বীণার যেন মনটা ছোট না হয়। ও এমন মুখ কালো করে ঘুরছে কেন?'

'ভয় পাচ্ছে—তুমি যদি কিছু বল।'

'আমি কিছু বলব কেন? আমার মেয়ের এক বন্ধু এক রাত আমার বাসায় এসে থাকতে পারবে না? এতে আমি রাগ করব? এরা আমাকে ভাবে কী?'

মিজান সাহেব বড়ই বিরক্ত হলেন। বুলুকে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠালেন। যদি কিছু পাওয়া যায়।

নিজেই গিয়ে দৈ কিনে আনলেন। বারান্দায় পাটি পেতে খাবার ব্যবস্থা হল। মিজান সাহেবের ইচ্ছা—সবাই যেন এক সঙ্গে বসে। অলিক খুবই সহজভাবে মিজান সাহেবের পাশে এসে বসল এবং হাসি মুখে বলল, 'চাচা এরা সবাই আপনাকে এত ভয় পায় কেন বলুন তো? আপনার দুপাশের দু'টি থালা বাদ দিয়ে সবাই বসেছে। এরা এত ভয় পায় আপনাকে, আপনার খারাপ লাগে না?'

মিজান সাহেব সকলকে অবাক করে দিয়ে বললেন, 'খারাপ লাগে মা। খুবই খারাপ লাগে। বীণা, তুই আয়, আমার এই পাশে বোস।'

বীণা জড়সড় হয়ে বাবার পাশে এসে বসল। মিজান সাহেব অলিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি আরেকদিন এসে এখানে থাকবে মা, কেমন? আজ তোমাকে শুধু ভাত খেতে হল। আমি খুবই লজ্জিত।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতটা ছিল চমৎকার।

আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। লক্ষ লক্ষ তারা ফুটেছে। চমৎকার বাতাস। দুই বান্ধবী কুয়া তলায় বসে গল্প করছে। গল্প অবশ্যি করছে অলিক, শুনছে বীণা।

'বুঝলি বীণা, কবিতা লেখা বাদ দিয়ে আমি একটা বড় গল্প লিখব বলে ভাবছি। সেই বড় গল্পটাই তোকে শোনাতে এসেছি। গল্পের শেষটা কী হলে ভালো হয় সেটাই বুঝতে পারছি না।'

'গল্পটা শুরু হচ্ছে আমার মতো বয়েসী একটা মেয়েকে নিয়ে। চমৎকার একটি মেয়ে, রূপবতী, ইন্টেলিজেন্ট, ফুল অব লাইফ। হঠাৎ মেয়েটা জানতে পারল তার ভয়াবহ একটা অসুখ হয়েছে। তার আয়ু আছে ছ'মাসের মতো। শুরুটা কেমন রে?'

'খুব সাধারণ, লক্ষ লক্ষ এ রকম গল্প আছে। খুব ট্রাজিক শুরু।'

'আমার গল্পটা অন্য গল্পের মতো না। আমার গল্পের মেয়েটা ছ'মাস আয়ুর ব্যাপারটা বেশ সহজভাবে নিল। ঠিক করল জীবনটা মোটামুটি যতটুকু পারে ভোগ করবে। মেয়েটির কোনো যৌন অভিজ্ঞতা নেই অথচ ব্যাপারটা কী তা সে জানতে চায়......।'

বীণা বলল, 'কি সব আজে-বাজে কথা শুরু করলি। চুপ কর তো।'

'এটা আজে-বাজে হবে কেন? সারা পৃথিবী জুড়ে যে জিনিসটা নিয়ে এত মাতামাতি, মানুষের এত আগ্রহ, এত কৌতূহল সেইটা যদি একটা মেয়ে মরবার আগে জেনে যেতে চায় তাতে দোষের কী?'

'একটা শালীনতার ব্যাপার আছে না?'

'যে মেয়ে দু'দিন পর মরে যাচ্ছে তার আবার শালীনতা কি?'

'আচ্ছা বাবা ঠিক আছে, তুই তোর গল্প বল।'

'এখন মুশকিল কি হয়েছে জানিস? মুশকিল হচ্ছে মেয়েটা তার এই কৌতূহল কী ভাবে মেটাবে বুঝতে পারছে না। সে তো আর কোনো এক জনকে বলতে পারে না—ভাই আজ রাতে আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে ঘুমুবেন?'

বীণা হেসে ফেলল।

অলিক বলল, 'বাইরে থেকে মেয়েটাকে যথেষ্ট স্মার্ট মনে হলেও আসলে সে লাজুক ধরনের একটা মেয়ে এবং খুব ভালো মেয়ে।'

বীণা বলল, 'এই তোর গল্প?'

'হুঁ।'

'গল্প তোকে দিয়ে হবে না। তুই বরং কবিতাই চালিয়ে যা।'

অলিক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

বীণা বলল, 'তুই এমন মন খারাপ করে ফেললি কেন?'

'বুঝতে পারছি না। মাঝে-মাঝে আমার এরকম হয়। অল্পক্ষণের জন্যে মন খারাপ হয়। তোর হয় না?'

বীণা হেসে বলল, 'আমার বেশিরভাগ সময়ই মন খারাপ থাকে। মাঝে-মাঝে মন ভালো হয়। আমরা দু'জন সম্পূর্ণ দু'রকম।'

অলিক বলল, 'এসব কচকচানি বাদ দে, আয় একটা কবিতা শোন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোর লেখা?'

'না ডাবলিউ মরিখের লেখা। অসাধারণ।'

"He did not die in the night,
He did not die in the day,
But in the morning twilight
His spirit pass'd away,
When neither sun nor moon was bright,
And the tree were merely grey."

৯

বুলুর পা কিছুতেই সারছে না। আজ পায়ের যন্ত্রণায় তার জ্বর এসে গেল। গ্রিন ফার্মেসির ডাক্তার এক গাদা এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন—ভেতরে কাঁটা রয়ে গেছে বোধ হয়। কেটে বের করতে হবে। আপনি বরং কোনো একটা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যান। বুলু অবাক হয়ে বলল, 'সামান্য কাঁটা ফুটার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হব?'

'কাঁটাটা বের করা দরকার না? পা নিয়ে এতদিন কষ্ট করছেন। এর কোনো মানে হয়?'

কোনোই মানে হয় না তবু বুলু তার অচল পা নিয়েই আদাবরে চলে গেল। আজ বুধবার টিউশ্যানির টাকাটা যদি আদায় হয়। ছাত্রের বাবা বিরক্ত মুখে দেখা দিলেন। শুকনো গলায় বললেন, 'ও আচ্ছা আপনি? বাসায় অনেক গেস্ট। আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না মাস্টার সাহেব। বিয়ের একটা আলাপ চলছে। আপনি এক কাজ করুন, সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে চলে আসুন।'

বুলু ভেবেই পেল না বিয়ের আলাপের সঙ্গে তার বেতনের সম্পর্কটা কী? অনেক কষ্টে সে অর্ধেক পথ হেঁটে শেষ পর্যন্ত রিকশাই নিয়ে নিল। পকেটে শেষ সম্বল চারটা টাকা রিকশাওয়ালাকে দিয়ে দিতে হবে এই দুঃখে তার প্রায় কেঁদে ফেলতে ইচ্ছা করছে। তিন বার বি.এ ফেল করা ছেলে হাত খরচের টাকা চাইতে পারে না। চাওয়া সম্ভব নয়।

পায়ের ব্যথা বড়ই বাড়ছে। পা শরীরেরই অংশ অথচ মনে হচ্ছে এটা শরীরের অংশ না। পা বিদ্রোহ করে বসেছে। কে জানে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হয়ত আলাদা জীবন আছে।

ব্যথা ভুলে থাকার জন্যই বুলু রিকশাওয়ালার সঙ্গে গল্প করার চেষ্টা করল। এই রিকশাওয়ালা তেমন আলাপী না। যাই জিজ্ঞেস করা হয় সে এক অক্ষরে জবাব দিতে চেষ্টা করে।

বুলুর মনে হল—রিকশাওয়ালাদের জীবন বোধ হয় তেমন মন্দ না। তাদেরকে তিন-তিন বার বি.এ ফেল করার যন্ত্রণা পেতে হয় না। এই কষ্টের তীব্রতা সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণাই নেই। যে কোনো শারীরিক কষ্টই সহনীয়। শরীর নির্দিষ্ট মাত্রা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত কষ্ট সহ্য করবে তার চেয়ে বেশি হলে—অজ্ঞান। নিশ্চিন্ত ঘুমের মতো একটা ব্যাপার। তিনবার বি. এ ফেল করে কেউ অজ্ঞান হয় না। হতে পারলে ভালো হত।

বুলু এখন কী করবে?

আবার পরীক্ষা?

কোনো মানে হয় না।

চাকুরি?

চাকুরি তাকে কে দেবে? পিওনের চাকরির জন্যেও আজকাল এম.এ পাশ ছেলে দরখাস্ত করে বসে। ঐদিন পত্রিকায় দেখছিল স্টোর কিপারের একটা চাকরির জন্যে একুশ জন এম.এ পাশ ছেলে দরখাস্ত করেছে। তিন জনের আছে এম ফিল ডিগ্রি। অথচ চাওয়া হয়েছে ম্যাট্রিক পাশ ছেলে।

সে নিজেও একবার ইন্টারভ্যু দিয়েছিল। সরকারি চাকরির ইন্টারভ্যু। ফিল্ম এন্ড পাবলিকেশনে প্রুফ রিডার। তার ইন্টারভ্যুর সিরিয়াল হল ১৪০৩। চার দিন ধরে ইন্টারভ্যু চলছে। সে পঞ্চম দিনে বোর্ডের সামনে ঢুকল। বোর্ডের চার জন মেম্বার। চার জনেরই বিধ্বস্ত অবস্থা। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই এই চার জন একসঙ্গে পাগল হয়ে যাবে।

বুলু অনেকক্ষণ তাদের সামনে বসে রইল কেউ কোনো প্রশ্ন করে না। বুড়ো এক ভদ্রলোক তার পাশের ভদ্রলোককে বললেন, 'কিছু জিজ্ঞেস করুন।' সে মহাবিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনি করুন না কেন? আপনার অসুবিধাটা কী?' অপেক্ষাকৃত কম বয়সের এক জনকে দেখা গেল তার সামনে রাখা প্যাডে কী সব ডিজাইন আঁকছে। এবং মুখ বিকৃত করে চোখের সামনে ধরছে। বড় মায়া লাগল বুলুর। এই লোকগুলো দিনের পর দিন ইন্টারভ্যু নিয়ে যাচ্ছে। আরো কত দিন নেবে কে জানে। তাদের মনে এখন হয়ত কোনো প্রশ্নই আর আসছে না। এরা নিশ্চয়ই রাতেও ইন্টারভ্যুর দুঃস্বপ্ন দেখছে।

বুলু বলল, 'স্যার আমি তাহলে যাই?'

এই কথায় বোর্ডের সবার মধ্যেই যেন আনন্দের একটা হিল্লোল বয়ে গেল। বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, 'আচ্ছা বাবা যাও।'

ডিজাইন যে করেছিল সেও এই প্রথমবারের মতো প্রসন্ন মুখে তার ডিজাইনের দিকে তাকাল।

আজকাল ব্যবসা কথাটা খুব চালু হয়েছে। পাশ করেই ছেলেরা ব্যবসায় নেমে পড়ছে। ব্যবসা কীভাবে করতে হয় বুলু জানে না, শুধু একটা জিনিস জানে। ব্যবসা করতে টাকা লাগে। আচ্ছা বাংলাদেশে এমন কোনো ব্যবসা কি আছে যেখানে টাকা লাগে না? বুলুদের মতো ছেলেদের জন্যে এই জাতীয় কিছু ব্যবসা থাকলে মন্দ হত না।

রিকশার কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। বার-বার চেইন পড়ে যাচ্ছে। রিকশাওয়ালা তিক্ত বিরক্ত হয়ে কোত্থেকে একটা ইট এনে শব্দ করে কিসে যেন খানিকক্ষণ পেটাল। তাতেও লাভ হল না। আবার চেইন পড়ে গেল। রিকশাওয়ালা কর্কশ গলায় বলল, 'হালার রিকশা।' বুলুর ইচ্ছা হল রিকশাওয়ালাকে বলে—ভাই তোমার কোনো দোষ নেই, দোষ আমার। আমাকে রিকশায় তুলেছ বলে এই অবস্থা। আমাকে না তুলে অন্য কাউকে তুললে এতক্ষণ পৌঁছে যেতে। বেচারা রিকশাওয়ালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিকশার হাতল ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বুলু বলল, 'ভাই আমার পায়ের অবস্থা খারাপ নয়ত হেঁটে হেঁটে চলে যেতাম।' রিকশাওয়ালা জবাব দিল না। কি যেন বিড় বিড় করে বলল। সম্ভবত সেও তার ভাগ্যকে গালাগালি করছে।

ভাগ্য বেচারার জীবন গেল গালি খেয়ে। এই পৃথিবীতে এমন কেউ কি আছে যে তার ভাগ্যকে গালি দেয় না? সবাই দেয়।

বুলু তার চিন্তার স্রোত বদলাতে চেষ্টা করল। এক খাত থেকে চিন্তাটা অন্য খাতে নিয়ে যাওয়া। ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। চিন্তা নদীর স্রোতের মতো। এর গতি বদলানো কঠিন তবে বুলু পারে। দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে এটা সম্ভব হয়েছে। সে ভাবতে শুরু করল—একটা নতুন ধরনের গ্রহের কথা। যে গ্রহটা অবিকল পৃথিবীর মতো। মানুষগুলোও পৃথিবীর মানুষের মতো। তবে তাদের জীবনে অনেকগুলো ভাগ আছে। সেই গ্রহে সবারই কিছু সময় কাটে দারুণ সুখে, কিছুটা দুঃখে, কিছুটা জেলখানায়, কিছুটা দেশ-বিদেশ ঘুরে। সব রকম অভিজ্ঞতা শেষ হবার পর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'হে মানব সন্তান তোমার জীবনে কোনো অপূর্ণ বাসনা আছে?' যদি সে বলে—'হ্যাঁ আছে।' তাহলে তাকে সেই বাসনা পূর্ণ করার সুযোগ দেয়া হয়। যতদিন না তার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয় ততদিন তার মৃত্যু নেই।

বুলুর কল্পনায় অনেক ধরনের পৃথিবী আছে। সুন্দর পৃথিবীর মতো কুৎসিত পৃথিবীও আছে। সেই পৃথিবীর সব মানুষই নোংরা ও কদাকার। হৃদয়ে ভালবাসা বা মমতা বলে কিছু নেই। যা আছে তার নাম ঘৃণা। সেখানকার সব মানুষ পঙ্কিল জীবন যাপন করে। সেই পৃথিবীতে কোনো চাঁদ নেই। রাতের স্নিগ্ধতা নেই। সব সময় সেই পৃথিবীর আকাশে দু'টি গনগনে সূর্য।

'স্যার নামেন।'

বুলু নামল। রিকশাওয়ালা দরদর করে ঘামছে। শরীরের সমস্ত পানি ঘাম হয়ে বেরিয়ে আসছে। টাকা থাকলে বুলু এই বেচারাকে একটা ঠাণ্ডা পেপসি খাওয়াত। টাকা নেই। আচ্ছা, রিকশাওয়ালাদের গায়ের ঘাম নিয়ে কি কোনো কবিতা আছে? একটা চমৎকার কবিতা কি লেখা যায় না? যেমন রিকশাওয়ালার গায়ের ঘাম শুকিয়ে শরীরে লবণের পর্দা পড়েছে। যা দেখাচ্ছে দুধের সরের মতো।

চার টাকা ভাড়া ঠিক করা হয়েছিল। চার টাকা দিয়ে বুলু রিকশা থেকে নামল। তার বেশ লজ্জা করছে। পকেটে দু'টা সিগারেট আছে। দু'টা সিগারেটের একটা কি সে দেবে রিকশাওয়ালাকে? ব্যাপারটা খুব নাটকীয় হয়ে যায় না?

বুলু খানিকক্ষণ ইতস্তত করে সিগারেট এগিয়ে দিল। নরম গলায় বলল, 'নেন ভাই একটা সিগারেট নেন।'

রিকশাওয়ালা হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল। লোকটা খুশি হয়েছে। খুশি নামের ব্যাপারটাও বেশ মজার। এটা একই সঙ্গে অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। কাজেই কোনো একটি বিশেষ ঘটনায় একটা মানুষ কতটুকু খুশি হবে তা কোনোদিন বলা যাবে না।

এই রিকশাওয়ালা অসম্ভব খুশি হয়েছে। সে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে হাসি মুখে বলল, 'কি সিগারেট বানায় আইজ কাইল 'টেস' আর নাই। কী কন ভাইজান? আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বগলা সিগারেট ছিল একটা টান দিলে জেবনের শান্তি। কী ধাখ! ঠিক কইলাম না ভাইজান?'

'জ্বি ঠিকই বলেছেন।'

'ভাইজানের পায়ে হইল কি?'

'কাঁটা ফুটছে।'

'আহা কন কি? আস্তে আস্তে যান।'

রাতে বুলু কিছু খেল না।

ক্ষিধে নেই।

এক গ্লাস পানি খেয়ে শুয়ে পড়ল। পায়ের যন্ত্রণা খুব বেড়েছে। মনে হচ্ছে হাসপাতালে শেষ পর্যন্ত ভর্তি হতে হবে। হাসপাতালে কী করে ভর্তি হতে হয় কে জানে! কাউকে গিয়ে নিশ্চয়ই বলতে হবে—ভাই আপনাদের এখানে আমি ভর্তি হতে চাই। দয়া করে একটা ব্যবস্থা করে দিন। কিংবা দরখাস্ত করতে হবে। আজকাল একটা সুবিধা হয়েছে দরখাস্ত বাংলায় করলেই হয়। বুলু শুয়ে-শুয়ে দরখাস্তের খসড়া ভাবতে লাগল—

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ,

সবিনয় নিবেদন আমার পায়ে একটি কাঁটা ফুটিয়াছিল। পরবর্তীতে সেই কাঁটার কারণে কিংবা অন্য কোনো জটিলতার কারণে পা ফুলিয়া কোলবালিশ হইয়া গিয়াছে। অতএব আপনাদের হাসপাতালে যদি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে ভর্তি করিয়া আমার পায়ের একটা গতি করেন তাহা হইলে বড়ই আনন্দিত হইব।

অসুখের সময়টা বেশ অদ্ভুত। আজে-বাজে জিনিস নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে। বুলু শুয়ে শুয়ে বিভিন্ন কায়দায় হাসপাতালের চিঠি নিয়ে ভাবতে লাগল। চলিত ভাষায়, সাধু ভাষায়, বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে আবার বেশ রসিকতা করে। রসিকতার চিঠিটা ভালো আসছে না। শারীরিক যন্ত্রণা নিয়ে রস করা বেশ কষ্ট। তবু বুলু প্রাণপণ চেষ্টা করছে,

হাসপাতালের প্রিয় ভাইয়া,

ভাইজান আপনি কেমন আছেন? আমার পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছে ভাইজান। সংস্কৃতে যাকে বলে কন্টক। আচ্ছা ভাইজান এই কাঁটাটা কী তোলা যায়? কাঁটা তুলতে হয় কাঁটা দিয়ে। আপনাদের কাছে কি কাঁটা আছে?

বীণা ঘরে ঢুকল। কোমল গলায় বলল, 'দাদা ঘুমুচ্ছ নাকি?'

'না।'

'দুধ এনেছি তোমার জন্যে।'

'দুধ খাবনারে।'

বীণা ভাইয়ের মাথায় হাত রাখল। গায়ে অনেক জ্বর তবু সে কোমল গলায় বলল, 'জ্বর তো নেই।'

বুলু বলল, 'নেই তবে আসব আসব করছে।'

বীণা ভাইয়ের পাশে বসল। তার ভাব-ভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে কিছু বলতে চায়।

বুলু বলল, 'কিছু বলবি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না।'

'তাহলে বসে থাকিস না। তোকে দেখে বিরক্তি লাগছে।'

বীণা বসেই রইল।

বুলু বলল, 'যদি কিছু বলার থাকে বলে চলে যা বীণা। এ রকম পাথরের মতো মুখ করে বসে থাকবি না। চড় মারতে ইচ্ছা করছে।'

'তোমার একটা চিঠি আমার কাছে আছে দাদা। কিন্তু চিঠিটা তোমাকে দিতে ইচ্ছা করছে না।'

'কার চিঠি?'

'অলিকের চিঠি। ওর মাথার ঠিক নেই, কী লিখেছে সে নিজেও বোধ হয় জানে না।'

'তুই চিঠি পড়েছিস?'

'হ্যাঁ। খোলা চিঠি দিয়েছে পড়ব না কেন?'

'আমাকে সেই চিঠি তোর দিতে ইচ্ছে করছে না?'

'না।'

'তাহলে দেয়ার দরকার নেই।'

'ঐ চিঠি পড়লে মেয়েটা সম্পর্কে তোমার ধারণা খারাপ হতে পারে। আমি সেটা চাই না। ও খুব ভালো মেয়ে।'

'ঠিক আছে চিঠি দিতে হবে না।'

'ওর সঙ্গে যদি কোনোদিন তোমার দেখা হয় তাহলে তুমি কিন্তু বলবে চিঠি পেয়েছ।'

'আচ্ছা বলব। এখন তুই দয়া করে বিদেয় হ।'

'বাবা তোমাকে ডাকছেন দাদা।'

'বলিস কি?'

'সন্ধ্যাবেলা তোমার খোঁজ করেছিলেন—তুমি ছিলে না।'

বুলু উঠে বসল। নিচু গলায় বলল, 'বাবা কী করছেন?'

'খাতাপত্র নিয়ে বসেছেন।'

'এখন যাব?'

'যাও।'

'ভয় ভয় লাগছে। ফেল করার পর এখন পর্যন্ত সিরিয়াস কিছু বলেন নি। আজ বোধ হয় বলবেন।'

বীণা কিছু বলল না। বুলু বলল, 'আমি কী বলব বল তো?'

বীণা বলল, 'তুমি কিছুই বলবে না। চুপচাপ শুনবে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে বাবা কিছুই বলবেন না।'

মিজান সাহেব তাঁর ঘরে। বিছানায় কাগজপত্র ছড়িয়ে বসেছেন। তাঁর হাতে একটা ক্যালকুলেটর। বুলুকে দেখে মুখ তুলে তাকালেন। বুলু বলল, 'আমাকে ডেকেছিলেন?'

মিজান সাহেব কিছু বললেন না। এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন ছেলেকে চিনতে পারছেন না। তারপর চোখ নামিয়ে ক্যালকুলেটরের ফিগার দেখে কাগজে লিখলেন। আবার কয়েকটা সংখ্যা টিপলেন। বুলুর ধারণা হল বাবা তার সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন আর আগ্রহী নন। সে চলে যাবে, না আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে বুঝতে পারছে না। তার কাশি আসছে অথচ কাশতে সাহস হচ্ছে না। কাশি চাপতে গিয়েও পুরোপুরি চাপতে পারল না। সামান্য শব্দ হল। মিজান সাহেব চোখ তুলে তাকালেন। ভারী গলায় বললেন, 'কী করবে কিছু ঠিক করেছ?'

বুলু জবাব দিল না।

'আবার পরীক্ষা দেবে?'

'জ্বি।'

'গাধারাই চারবার বি.এ পরীক্ষা দেয়। তারপর অভ্যাস হয়ে যায়। অভ্যাস হয়ে যাবার পর প্রতিবার একবার করে দেয়।'

বুলু চুপ করে রইল।

মিজান সাহেব বললেন, 'তুমি একটা গাধা। তোমাকে দেখে যে কেউ একটা গাধার রচনা লিখতে পারে। মুখ ভর্তি দাড়ি কেন? গাধার মুখে দাড়ি কখনো দেখেছ?'

মিজান সাহেব তুমি তুমি করে বলছেন। প্রচণ্ড রাগের সময় ছেলে–মেয়েদের সঙ্গে তিনি তুমি তুমি করে বলেন।

'কাল সাড়ে বারটার সময় তুমি আমার অফিসে আসবে। মনে থাকবে?'

'জ্বি।'

'মুখ পরিষ্কার করে আসবে। বাংলাদেশে নাপিতের এখনো অভাব হয় নি। এখন আমার সামনে থেকে যাও।'

বুলু চলে যাবার পর–পর মিজান সাহেব বীণাকে ডেকে পাঠালেন। বীণার সঙ্গে তিনি খানিকটা ভদ্র ব্যবহার করলেন। সহজ স্বরে বললেন, 'বস। খাওয়া–দাওয়া শেষ করেছ?'

বীণা বলল, 'জ্বি।'

সে মনে মনে ঘামতে লাগল। বাবা তার সঙ্গেও তুমি তুমি করে কথা বলছেন।

'তুমি কি এম. এ পড়তে চাও?'

'জ্বি।'

'কেন চাও?'

বীণা জবাব দিল না। মিজান সাহেব বললেন, 'এম.এ কেন পড়তে চাও সেটা শুনি।'

'আপনি যদি পড়তে নিষেধ করেন পড়ব না।'

মিজান সাহেব বললেন, 'তোমরা আমাকে কী ভাব বল তো? আমি তোমাকে পড়তে নিষেধ করব কেন?'

বীণা দাঁড়িয়ে আছে, কিছু বলছে না।

মিজান সাহেব জবাবের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, 'তোমাকে একটা ঘড়ি দিয়েছিলাম। প্রথম কিছুদিন সারাক্ষণ হাতে থাকত। এখন একবারও দেখি না। যাও ঘড়িটা নিয়ে আস।'

বীণা নড়ল না। আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল।

'ঘড়িটা কী তোমার সঙ্গে নেই?'

'না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কি করেছ, হারিয়ে ফেলেছ?'

'জ্বি।'

'না, ঘড়ি তুমি হারাও নি। রাগ করে ফেলে দিয়েছ, কি, আমি ঠিক বলছি না?'

বীণা উত্তর দিল না।

মিজান সাহেব বললেন, 'আচ্ছা তুমি যাও।'

তিনি মেয়েকে ডেকেছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। বীণার একটা ভালো বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে এই নিয়ে আলাপ করতে চেয়েছিলেন করতে পারলেন না। লজ্জা লাগল। ছেলে মেয়েদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সহজ নয়। বীণার মার সঙ্গে এই নিয়ে আলাপ করা দরকার। আলাপ করতে ইচ্ছা করছে না। মূর্খ মেয়েছেলে। এদের সাথে আলাপ করা না করা সমান। কিছু বললে চারদিকে ঢাক পিটাতে থাকবে। তবু তিনি রাতে শোবার সময় বললেন, 'বীণার একটা বিয়ের প্রস্তাব এসেছে।'

ফরিদা সঙ্গে-সঙ্গে বিছানায় উঠে বসলেন। আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'ছেলে কী করে?'

'ডাক্তার।'

'ডাক্তার ছেলে? বল কি? ডাক্তার ছেলে তো খুব ভালো। প্রাকটিস কেমন? রুগী পত্তর পায় তো?'

মিজান সাহেব ঘুমুবার আয়োজন করলেন। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে তার আর ভালো লাগছে না। ফরিদা বললেন, 'ছেলে দেখেছ তুমি?'

'হুঁ।'

'দেখতে কেমন?'

তিনি জবাব দিলেন না। ফরিদা আবার ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'ছেলে দেখতে কেমন?'

মিজান সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, 'দেখতে ভালো। এখন বিরক্ত করো না তো, ঘুমাও।'

ফরিদা সারা রাত ঘুমুতে পারলেন না। অল্পতেই তাঁর মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়। আজও হয়েছে।

AMARBOI.COM

১০

গনি সাহেব বললেন, 'কী মিজান সাহেব, আপনাকে এ রকম দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ?'

'জ্বি না।'

'শরীর খারাপ হলে বাসায় চলে যান। সবারই বিশ্রাম দরকার।'

মিজান সাহেব বললেন, 'আমার স্যার শরীর ঠিক আছে।'

'তাহলে কি মন খারাপ? মন খারাপ হবার তো কোনো কারণ নেই, ছেলে ফিরে এসেছে।'

মিজান সাহেব অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, 'আমি স্যার গতকাল রহমানের বাসায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছিলাম। কথা বলেছি।'

'বাচ্চাটা ভালো?'

'জ্বি ভালো।'

'আর বাচ্চার মা?'

'সেও ভালো। স্যার আমার ধারণা হিসাবের গণ্ডগোলের সঙ্গে রহমানের কোনো সম্পর্ক নেই।'

গনি সাহেবের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। পরক্ষণেই তা স্বাভাবিক হয়ে গেল। তিনি হাসি মুখে বললেন, 'আপনি কি সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করলেন নাকি?'

'জ্বি না। তবে তারা টাকাটা কী করে জোগাড় করেছে এটা শুনলাম। খুব কষ্ট করে টাকা জোগাড় করেছে। জমি জমা, ঘর সব বিক্রি করে একটা বিশ্রী অবস্থা।'

'আহা বলেন কী!'

'আমার খুব খারাপ লাগল।'

'খারাপ লাগারই কথা।'

গনি সাহেব পান মুখে দিতে দিতে বললেন, 'তাহলে আপনার কী ধারণা? টাকাটা গেল কোথায়? আমার কাছে টাকার পরিমাণ খুবই নগণ্য। ওটা কিছুই না কিন্তু এ রকম একটা ব্যাপার তো হতে দেয়া যায় না, তাই না?'

মিজান সাহেব চুপ করে রইলেন। গনি সাহেব বললেন, 'ব্যাপারটা ঘটেছে ক্যাশ সেকসনে তাই না?'

'জ্বি।'

'রহস্য উদ্ধার হওয়া দরকার। তা নইলে ভবিষ্যতে যে আরো বড় কিছু হবে না তার গ্যারান্টি কি? ত।ই না?'

'জ্বি।'

'পুলিশের হাতে ব্যাপারটা দিয়ে দিলে কেমন হয় বলুন তো? পুলিশ কিছু করতে পারবে না জানা কথা। কখনো পারে না, তবু পুলিশ যদি নাড়াচাড়া করে তাহলে সবাই একটু ভয় পাবে। কি, ঠিক বলছি না?'

মিজান সাহেব কিছু বললেন না।

গনি সাহেব বললেন, 'আমার চিটাগাং ব্রাঞ্চের একটা খবর আপনাকে বলি। ফরেন কারেন্সিতে এগার লাখ টাকার একটা সমস্যা। আমার সবচে বিশ্বাসী যে মানুষটা চিটাগাং-এ আছে তাকেই সন্দেহ করতে হচ্ছে। বুঝতে পারছেন অবস্থাটা?'

মিজান সাহেব বললেন, 'আমার ওপর কি আপনার কোনো সন্দেহ হয়?'

'কারো ওপর আমার সন্দেহ হয় না। আবার কাউকে বিশ্বাসও করতে পারি না। বিশ্বাস করা উচিতও না। আদমের উপর আল্লাহ বিশ্বাস করেছিলেন। সেই বিশ্বাসের ফলটা কি হল বলুন? আদম গন্ধম ফল খায় নি? খেয়েছে। মিয়া বিবি দু'জনে মিলেই খেয়েছে। চা খান। চা দিতে বলি। বুঝলেন মিজান সাহেব, যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্যাশ সেকসান হল তার হার্ট। হার্টের ছোট অসুখ ধরা পড়ে না। কিন্তু এই ছোট জিনিস হঠাৎ বড় হয়ে যেতে পারে। যখন হয় ঘুমের মধ্যে মৃত্যু হয়ে যায়। কেউ বুঝতেও পারে না। ঠিক কি না, বলুন? নির্বোধ মানুষরা সাধারণত সৎ হয়। এই জন্যে ক্যাশে দরকার নির্বোধ ধরনের লোক। মুশকিল হচ্ছে কি, এই নির্বোধ ধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকদের আবার অন্যরা সহজেই ব্যবহার করে। কাজেই নির্বোধ ধরনের লোক ক্যাশে অচল। সমস্যাটা দেখতে পারছেন? ভীষণ সমস্যা।'

চা এসে গেছে। মিজান সাহেব চায়ে এক চুমুক দিয়েই কাপ নামিয়ে রাখলেন। ঠাণ্ডা গলায় আবার বললেন, 'আপনি কি আমাকে সন্দেহ করছেন?'

গনি সাহেব বললেন, 'না করছি না। আপনি আমার অতি বিশ্বাসী লোকদের এক জন। এই বৎসর থেকে আপনার বেতন পাঁচশ টাকা বাড়ানো হয়েছে। দু'এক দিনের মধ্যে চিঠি পাবেন। তবে মিজান সাহেব, ঐ যে বললাম, বাবা আদমের কাহিনী। চা খান। চা ঠাণ্ডা হচ্ছে।'

মিজান সাহেব চা খেতে পারলেন না। তাঁর বমি বমি লাগছে।

গনি সাহেব বারটার দিকে রোজ একবার বাসায় টেলিফোন করে তাঁর ছেলের খোঁজ নেন। আজও টেলিফোন করলেন। তাঁর স্ত্রী সম্ভবত টেলিফোনের কাছেই বসে থাকেন, কারণ একবার রিং হওয়া মাত্র টেলিফোন তুলে তিনি চিকন গলায় বলেন, 'আপনি কে বলছেন?'

আজ বেশ কয়েকবার রিং হবার পর তিনি টেলিফোন ধরলেন এবং যথারীতি বললেন, 'আপনি কে বলছেন?'

গনি সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'বাবু কোথায়?'

'বাসায় নাই।'

'বাসায় নাই মানে? কী বলছ এসব।'

'বড় জামাই নিয়া গেছে।'

'বড় জামাই নিয়ে গেছে মানে! এর মানে কি? কোথায় নিয়ে গেছে?'

'ফরিদপুর।'

গনি সাহেবের মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। ব্যাপারটা কি দ্রুত আঁচ করতে চেষ্টা করলেন। তেমন কিছু ধরতে পারলেন না। তাঁর কপালে ঘাম জমল। তিনি থমথমে গলায় বললেন,

'ফরিদপুর নিয়ে গেছে কেন?'

'ঐখানে এক পীর সাহেব আছেন, পীর সাহেব দোয়া পড়লে সব ভালো হয়।'

'আমি বলি নি যে, জামাইয়ের সঙ্গে বাবু কোথাও যাবে না? বলি নি?'

'এখন নিতে চাইলে আমি না করি ক্যামনে? জামাই মানুষ।'

'কখন নিয়ে গেছে?'

'সকালে। আপনি বাইরে যাওয়ার একটু পরে।'

'আমাকে এতক্ষণ বল নি কেন? কেন তোমার এত সাহস হল? কোত্থেকে এত সাহস পেলে?'

ও পাশে ফোঁস-ফোঁস শব্দ হচ্ছে। গনি সাহেবের স্ত্রী কাঁদতে শুরু করেছেন। এই কান্না অবশ্যি খুব সাময়িক। টেলিফোন রেখে দেয়া মাত্র কান্না থেমে যাবে।

গনি সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। তিনি তাঁর জামাইদের বিশ্বাস করেন না। তাঁর ধারণা বাবুকে বড় জামাই একা নিয়ে যায় নি। তিন জনই এর সঙ্গে আছে। এই নিয়ে যাবার পেছনে দীর্ঘ পরিকল্পনা থাকা বিচিত্র না। হয়ত বিকেলে বড় জামাই ফিরে এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বলবে—একটা সর্বনাশ হয়েছে। বাবু পুকুরে পড়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংবা বলবে—বাবুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি সিগারেট কিনবার জন্যে গিয়েছি—বাবু দাঁড়িয়েছিল—ফিরে এসে দেখি......

যদি এ রকম কিছু হয় তিনি কী করবেন? তিন জামাইয়ের বিরুদ্ধে পুলিশ কেইস করবেন? জামাইদের হাতকড়া বেঁধে নিয়ে যাবে—তিনি দেখবেন? পত্রিকায় ছবি ছাপা হবে। বাবু হত্যা রহস্য। অবশ্যি পত্রিকার লোক এটা নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করবে না। কোনো সুন্দরী মেয়ে হত্যার সঙ্গে জড়িত না থাকলে খবরের কাগজের লোকজন উৎসাহ পায় না। বাবু হত্যায় কেউ কোনো উৎসাহ পাবে না। অপ্রকৃতিস্থ একটা শিশুর হত্যায় কিছুই যায় আসে না। খবরের কাগজের ভেতরের দিকের পাতায় খবরটা ছাপা হতে পারে। কিংবা হয়ত ছাপাই হবে না। রোজ কত হত্যাকাণ্ড ঘটছে। হত্যার খবরে মানুষের এখন আর আগ্রহ নেই।

গনি সাহেব তার দ্বিতীয় জামাই এবং ছোট জামাইকে টেলিফোন করলেন। তিনি জানতে চান তারা ঢাকাতেই আছে না ফরিদপুর গেছে। দু'জনকেই পাওয়া গেল। শ্বশুরের টেলিফোন পেয়ে তারা গরমের দিনের মাখনের মতো গলে গেল। প্রতিটি বাক্যে তিনবার করে বলছে, 'আব্বা, আব্বা, আব্বা।'

গনি সাহেব মনে মনে বললেন, 'ফাজিলের দল, নিজের বাবাকে দিনে ক'বার আব্বা ডাকিস? ক'বার জিজ্ঞেস করিস—আব্বা আপনার শরীরটা এখন কেমন?'

গনি সাহেব শান্ত ভঙ্গিতে দু'জামাইয়ের সঙ্গেই কথা বললেন। কথার মধ্যে বাবু বা বড় জামাইয়ের প্রসঙ্গ একবারও এল না।

তিনি দুপুরে বাসায় খেতে যান।

আজ গেলেন না।

চুপচাপ বসে রইলেন। কিছুই ভালো লাগছে না।

একবার ভাবলেন মিজান সাহেবকে ডেকে খানিকক্ষণ গল্প করবেন। এই চিন্তা বাদ দিলেন। এখন টিফিনের সময়। এই সময়ে ক্ষুধার্ত এক জন মানুষকে বসিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া মানুষটা একটা ধাক্কা খেয়েছে। ধাক্কা সামলানোর সুযোগ দেয়া দরকার। ধাক্কাটা তিনি ইচ্ছা করেই দিয়েছেন। এর দরকার আছে। মনের ভেতর একটা ভয় থাকুক, ভয় মানুষকে বেঁধে রাখে।

পুলিশের খবর দেবার কথাটা তিনি এমনি বলেছেন। পুলিশের সঙ্গে কোনো ব্যাপারে তিনি যেতে চান না। পুলিশ মানেই ঝামেলা। যদিও ঝামেলার প্রয়োজন আছে।

তবে তিনি কাজ করবেন তাঁর মতো। তিনি বুঝিয়ে দেবেন যে তিনি একই সঙ্গে সন্দেহ করেন আবার ভালোও বাসেন। পাঁচ শ' টাকা বেতন বেড়ে যাচ্ছে এই বাজারে এটা কম কথা না। তাছাড়া তিনি মিজান সাহেবের ফেল করা ছেলেটাকেও চাকরি দেবেন। অবশ্যই দেবেন। বংশ পরম্পরায় কৃতজ্ঞতার জালে বেঁধে রাখবেন। ব্যবসা বড় হচ্ছে এই সময়ে বিশ্বাসী লোক দরকার। একদল বিশ্বাসী লোক তাঁর সঙ্গে থাকবে অথচ তারা জানবে তারা পুরোপুরি বিশ্বাসী নয়।

চট্টগ্রাম ব্রাঞ্চের ব্যাপারে তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন। বার লাখ টাকার কোনো ব্যাপার না। সেখানেও লাখ খানিক টাকার গণ্ডগোল। এটা খারাপ না। এটা ভালো। সবাই জানবে এত টাকার একটা সমস্যা আছে। তারা আরো সাবধান হবে। তবু কিছু গোলমাল বৎসর দুই পর–পর দেখা দেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গনি সাহেব মাথা খেলিয়ে এই পদ্ধতি বের করেছেন। এই পদ্ধতি বের করতে তাকে অনেক মাথা খেলাতে হয়েছে। এই পদ্ধতিও হয়ত সঠিক না। এর মধ্যে ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে। সব পদ্ধতিতেই আছে।

এই পদ্ধতির পুরোটা তাঁর নিজের না খানিকটা মুনিরের কাছে শিখেছেন। মুনির এই বয়সেই বিশাল কনস্ট্রাকশান ফার্মের মালিক। সে একদিন বলেছিল, 'হিসাবে একুশ লক্ষ টাকার একটা গণ্ডগোল করে রেখেছি। নিজেই করেছি। এতে লাভ কী হয়েছে জানেন, গনি সাহেব? লাভ একটাই হয়েছে—আমার সব ক'টা লোক সুঁচের আগায় বসে আছে। হা হা হা। সবাই ভাবছে যে-কোনো মুহূর্তে চাকরি চলে যেতে পারে। অথচ যাচ্ছে না। এতে কাজ হয়। ভালো কাজ হয়। আপনি আমার বন্ধু মানুষ। আপনি টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছেন বলে এত দূর উঠতে পেরেছি। আপনাকে একটা কৌশল শিখিয়ে দিলাম। সব সময় হিসাবের একটা গণ্ডগোল বাঁধিয়ে রাখবেন। তারপর দেখবেন সব কেমন ঘড়ির কাঁটার মতো চলছে। টিক টিক। টিক টিক।'

গনি সাহেব আবার মিজান সাহেবকে ডেকে পাঠালেন, মধুর স্বরে বললেন, 'খাওয়া-দাওয়া হয়েছে মিজান সাহেব?'

'জ্বি।'

'বসুন বসুন।'

তিনি বসলেন।

গনি সাহেব বললেন, 'দেশের জন্যে কিছু কাজ করতে চাই। কী ভাবে তা করা যায় কিছু ভেবেছেন?'

'জ্বি না।'

'ভাবুন। ভেবে বের করুন। আর আপনার ছেলেকে নিয়ে আসতে বলেছিলাম না? আনছেন না কেন?'

মিজান সাহেব চুপ করে রইলেন।

'আজই তো আনার কথা তাই না?'

'জ্বি।'

'যদি আসে সরাসরি আমার কাছে নিয়ে আসবেন। কম্প্যুটার সেকশনে দিয়ে দেব। ভালোমতো ট্রেনিং নিক। কম্প্যুটার কোম্পানি ট্রেনিং দিয়ে দেবে। কোনো অসুবিধা নেই। আপনার শরীরটা কি খারাপ নাকি?'

''জ্বি খারাপ।'

'যান, বাসায় চলে যান। বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করুন।'

মিজান সাহেব চলে যাবার পর পরই গনি সাহেব টেলিফোন পেলেন—বড় জামাই বাবুকে নিয়ে ফিরেছে। অনেক দিন পর বাইরে ঘুরতে পেরে বাবু খুব খুশি। পীর সাহেব তাকে একটা কবচ দিয়েছেন। জাফরান দিয়ে কোরানের আয়াত লেখা একটা প্লেট দিয়েছেন। সেই প্লেট ধোয়া পানি প্রতি বুধবার খালি পেটে খেতে হবে।

তিনি মনে মনে বললেন—হারামজাদা। গালিটা কাকে দিলেন তিনি নিজেও বুঝলেন না। নিজের জামাইদের না পীর সাহেবকে? নাকি পৃথিবীর সব মানুষদের?

তাঁর চেহারায় বিরক্তির ভাব কখনো ফোটে না। আজ ফুটেছে। তিনি টেলিফোন নামিয়ে রেখে ভ্রূ কুঁচকে খানিকক্ষণ ভাবলেন তারপর টেলিফোন করলেন রমনা থানায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমনা থানার ও সি বিগলিত গলায় বলল, 'কেমন আছেন স্যার?'

'ভালো। আপনার শরীর কেমন?'

'জ্বি আপনার দোয়া। কিছু করতে হবে?'

'জ্বি না। একটু ভয় দেখানোর দরকার হয়ে পড়ল যে ও সি সাহেব।'

'ভয় দেখানোর দরকার হলে দেখাব। হাজতে এনে প্যাঁদানি দিয়ে দেব। ব্যাপার কি?'

'ব্যাপার কিছুই না। ক্যাশের টাকা-পয়সার ব্যাপারে একটা ঝামেলা হয়েছে। কয়েকজনকে একটু ভয় দেখানো।'

'কোনো অসুবিধা নেই। আপনি একটা এফ আই আর করে রাখুন। তার পর দেখুন কি করছি।'

'না না তেমন কিছু করতে হবে না। ভদ্রভাবে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এতেই কাজ হবে।'

১১

বারটার সময় বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবার কথা। বুলু যেতে পারে নি। সকাল থেকেই তার গা আগুনে গরম। পায়ে অসহ্য ব্যথা। পায়ের নিচটা কেমন নীল হয়ে গেছে।

বীণা চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকে একটা ধাক্কা খেল। গোঙানীর শব্দ হচ্ছে। বুলুর মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। চোখ ঘোর রক্তবর্ণ। বীণা বলল, 'কি ব্যাপার দাদা?' বুলু বলল, 'একটা কুড়াল নিয়ে আয়। কুড়াল দিয়ে কোপ দিয়ে পা-টা কেটে ফেলে দে।'

বীণা ভাইয়ের গায়ে হাত দিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

বাবা অফিসে চলে যাবার পর বুলু শব্দ করে কাঁদতে লাগল। পাড়ার ডাক্তার এসে বলল, 'এখনো হাসপাতালে ভর্তি করেন নি? কী আশ্চর্য! আপনারা এত ক্যালাস কেন? এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যান।'

বুলু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'নিয়ে গেলেই হাসপাতালে ভর্তি করবে?'

'চেষ্টা চরিত্র করবেন। আপনাদের চেনা জানা কেউ নেই? দেরি করা উচিত হবে না। আমার মনে হয় গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে।'

বীণা একবার ভাবল বাবাকে অফিসে খবর দেবে। শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলাল না। নিজেই বুলুকে নিয়ে রওনা হল। ফরিদা ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন। বীণার দাদী চেঁচাতে লাগলেন—'কে কান্দে রে? বড় বউ না? বড় বউ ক্যান্দে ক্যান? ও বড় বউ?'

লীনা অসম্ভব ভয় পেয়েছে। বাবলুও ভয় পেয়েছে, তবে সে খানিকটা আনন্দিত। কারণ আজ স্কুলে যেতে হবে না। স্কুল তার একেবারেই ভালো লাগে না।

বীণা হাসপাতালে কিছুই করতে পারল না। এখানকার মানুষজন মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখে-দেখে পাথরের মতো হয়ে গেছে। একটা বয়স্ক ছেলে যে শিশুর মতো চেঁচাচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার জন্যে কারো মনে মমতার ছায়া পড়ছে না। শুধু এক জন অল্প বয়স্ক ডাক্তার বীণাকে নিয়ে খুব দৌড়াদৌড়ি করল। একসময় বলল, 'আপনি কাঁদবেন না। একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।'

সেই ছেলেও কিছু করতে পারল না। এক সময় লজ্জিত গলায় বলল, 'আপনার পরিচিত বড় কেউ নেই?'

বীণা চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'না।' বলেই তার অলিকের কথা মনে পড়ল। ধরা গলায় বলল, 'আমি কি একটা টেলিফোন করতে পারব?'

'অবশ্যই পারবেন। আপনি কাঁদবেন না প্লিজ, কাঁদবেন না।'

অলিককে পাওয়া গেল। অলিক বলল, 'ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে কাঁদছিস কেন? কী হয়েছে ঠাণ্ডা গলায় বল।'

বোরহান সাহেব মিটিং-এ ছিলেন।

ছোটখাটো মিটিং না, বড় মিটিং। স্বয়ং মন্ত্রী মিটিং চালাচ্ছেন। এর মধ্যেই বোরহান সাহেবকে বলা হল—বাসা থেকে তাঁর মেয়ে টেলিফোন করেছে। অসম্ভব জরুরি। এক সেকেন্ডও দেরি করা যাবে না। বোরহান সাহেব শুকনো মুখে উঠে দাঁড়ালেন, মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যার আমাকে তিন মিনিটের জন্যে একটু ছাড়তে হবে। বাসায় বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয়েছে। আমি তিন মিনিটের মধ্যে আসছি। আমি খুবই লজ্জিত।'

মন্ত্রী অমায়িক ভঙ্গিতে হাসলেন। বললেন, 'আপনাকে ১৫ মিনিট সময় দেয়া হল। এর মধ্যে আমরা একটা টি-ব্রেক নেব। আপনি চা মিস করলেন।'

বোরহান সাহেব টেলিফোন ধরা মাত্র অলিক বলল, 'কেমন আছ বাবা?'

বোরহান সাহেব বললেন, 'এইটাই কি তোমার জরুরি খবর?'

'হ্যাঁ। তুমি কি ভালো আছ বাবা?'

রাগ করতে গিয়েও তিনি রাগ করলেন না। নরম গলায় বললেন, 'আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?'

'ভালো না। আমার মনটা খুব খারাপ। খুবই খারাপ।'

'কেন মা?'

'আমার বন্ধুর ভাই হাসপাতালে ভর্তি হতে পারছে না। হাসপাতালের বারান্দায় বসে কাঁদছে।'

'দেশের অবস্থাই তো এরকম মা। হাসপাতালে সিট নেই, ঘরে খাবার নেই, অফিসে চাকরি নেই।'

'বাবা।'

'বল মা।'

'তুমি এক ঘন্টার মধ্যে এই ছেলেটার হাসপাতালে ভর্তি করার একটা ব্যবস্থা করবে।'

'সে কী?'

'হ্যাঁ করবে।'

'কি করে করব বল তো? তুই কী ভাবিস আমাকে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এক মিনিট কিন্তু চলে গেছে বাবা। আর মাত্র ৫৯ মিনিট আছে।'

'তুই বড় পাগলামি করিস মা।'

'বেশি দিন তো করব না বাবা। আর খুব অল্পদিন করব। তারপর আর করব না। ইচ্ছা থাকলেও করতে পারব না।'

বোরহান সাহেব বললেন, 'আমি ব্যবস্থা করছি।'

বাহান্ন মিনিটের মাথায় বুলু ভর্তি হয়ে গেল। দেড় ঘন্টার মধ্যে দু'জন বড় বড় ডাক্তার বুলুকে দেখতে এলেন।

বুলুর পাশের বেডে সবুজ শার্ট গায়ে দাড়িওয়ালা এক জন মানুষ। সে আগ্রহ নিয়ে বলল, 'ভাইজান আফনের পরিচয়?'

১২

অলিক আজ চমৎকার একটা নীল শাড়ি পরেছে। সেজেছেও খুব যত্ন করে। তাকে জলপরীর মতো লাগছে। ডারমাটোলজিস্ট প্রফেসর বড়ুয়া বললেন, 'কেমন আছ মা?'

অলিক বলল, 'আমি ভালো আছি। আপনি সাত দিন পর আসতে বলেছিলেন, আমি এসেছি।'

'দেখি, তোমার দাগের কি অবস্থা।'

'দেখুন।'

প্রফেসর বড়ুয়া দেখলেন। দাগ আরো বেড়েছে। কিছু কিছু দাগ ফ্যাকাশে হলুদ থেকে কালচে বর্ণ ধারণ করেছে। তিনি অবাক হয়ে দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অলিক বলল, 'আপনি ওষুধ বদলে এখন নতুন ওষুধ দেবেন, তাই না? আমার মার ডাক্তারও তাই করতেন।'

প্রফেসর বড়ুয়া কিছু বললেন না।

বোরহান সাহেব বললেন, 'মেয়েটিকে কি বাইরে নিয়ে যাব?'

প্রফেসর বড়ুয়া দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বললেন, 'নিয়ে যান।'

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বের হয়েই বোরহান সাহেব বললেন, 'তোর বান্ধবীর ভাইকে দেখতে যাবি নাকি?'

'না।'

'না কেন? চল দেখে আসি।'

'হাসপাতাল আমার ভালো লাগে না বাবা।'

'বাসায় চলে যাবি?'

'হুঁ। আমার কাজ আছে।'

'কি কাজ?'

'খুব জরুরি একটা কাজ।'

অলিকের কাজটা তেমন কিছু জরুরি না। ওডেনের একটা কবিতার ছায়ায় গত চারদিন ধরে সে নিজে একটা লিখতে চেষ্টা করছে। ওডেনের সেই সহজ ভঙ্গি তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতায় আসছে না। কবিতাটা কেমন কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সহজ করে লেখা এত কঠিন কেন তাই সে বুঝতে পারছে না।

বাসায় ফেরার পথে গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে সে মনে–মনে কবিতাটা আবৃত্তি করল।

He was fully sensible to the advantage of the installment plan.

And had everything necessary to the Modern Man.

A gramophone, a radio, a car a frigidare.

আচ্ছা এই মানুষটি কি সুখী ছিল?

যার জীবনের কোনো সাধই অপূর্ণ নয় সেকি সুখী? জীবনানন্দ দাশের লাশকাটা ঘরের ঐ মানুষটিও কি সুখী ছিল? ঐ মানুষটির স্ত্রী ছিল, শিশু ছিল, ভালবাসা ছিল। তবু তাকে লাশ কাটা ঘরে যেতে হল কেন? মনে হয় জীবনানন্দ দাশের ঐ মানুষটি সুখী ছিল তাহলে ওডেনের মানুষটি সুখী ছিল কি? ওডেনের ঐ মানুষটির তো কোনো অভাব ছিল না। তার একটা গাড়ি ছিল, একটা গ্রামোফোন ছিল, একটা ফ্রিজ ছিল।

১৩

মিজান সাহেব ফরিদাকে বিয়ের কথা ভেঙে কিছুই বলেন নি।

তবু ফরিদা সবই জেনে গেলেন। ছেলের এক ফুপু এসে সব রহস্য ফাঁক করে দিলেন। ছেলে দেশে থাকে না—থাকে নিউ অরলিন্সে। ডাক্তারী পাশ করেছে জন সেন্ট লুক থেকে। বয়স একত্রিশ। আমেরিকার রেসিডেন্সশিপ গত বছর পেয়েছে। সে বড় হয়েছে আমেরিকাতে। আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্র হিসেবে আমেরিকায় গিয়েছিল পনের বছর বয়সে, এর মধ্যে দেশে আসে নি। এখন তিন মাসের জন্যে এসেছে। বিয়ে করে চলে যাবে। বউ মাস তিনেক পর যাবে। ভিসা টিসা ঠিক করতে এই সময়টা লেগে যাবে।

ছেলের ফুপু নিজেও ডাক্তার। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে কাজ করেন। ডাক্তার হয়ে যাওয়া মেয়েদের কথাবার্তা খানিকটা রুক্ষ ধরনের হয়। এই ভদ্রমহিলার তা না। তিনি বেশ মজা করে কথা বলছেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর হাসছেন। তিনি বললেন, 'তৌফিককে পাঠিয়ে দেব। আপনারা কথা বলে দেখুন পছন্দ হয় কিনা। কখন পাঠাব বলে দেবেন। আমরা আপনাদের খুব কাছেই থাকি। বাড়ির নাম 'পদ্মসখা' হলুদ রঙা তিনতলা বাড়ি। দেখেছেন না?'

ফরিদা সেই বাড়ি দেখেন নি তবু মাথা নাড়লেন যেন দেখেছে। ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমাদের ছেলে কিন্তু আপনার মেয়েকে দেখেছে। ওদের মধ্যে কি সব কথাও নাকি হয়েছে। ছেলে খুবই ইমপ্রেসড। পরে যখন খোঁজ নিয়ে জানা গেল আপনার মেয়ে ছাত্রী হিসেবেও খুব ভালো তখন সে আরো ইমপ্রেসড হল। এখন বলুন ছেলেকে কখন পাঠাব?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরিদা কী বলবেন ভেবে পেলেন না। বুলুর বাবার সঙ্গে কথা না বলে কিছুই করা যাবে না। এখন অবস্থা এমন যে বুলুর বাবার সঙ্গে কথা বলার সুযোগই পাওয়া যাচ্ছে না। অফিস থেকে বাসায় এসে রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে হাসপাতালে যায়। সারা রাত থাকে হাসপাতালে। বুলুর অবস্থা নাকি ভালো না। কেন ভালো না তা ফরিদা ঠিক বুঝতে পারেন না। তিনি একবার হাসপাতালে বুলুকে দেখতে গেলেন, সে তো বেশ অনেক কথা টথা বলল। বুলু সুস্থ থাকলে বিয়ের কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়ে নেয়া যেত। অসুস্থ হয়ে হয়েছে যন্ত্রণা।

মেয়েদের বিয়ের কথাবার্তা হলে মেয়ের মায়েদের মনে তীব্র আনন্দ হয়। ফরিদারও হচ্ছে। তাঁর বুকের ব্যথা পর্যন্ত এখন হয় না। শুধু একটিই কষ্ট—বীণার বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে কারো সঙ্গেই কথা বলতে পারছেন না। অথচ কথা বলতে ইচ্ছা করে। কথা যা বলার বীণার সঙ্গেই বলেন। বীণা লজ্জা পায় তবে চুপ করে থাকে না, মার কথার জবাব দেয়। ফরিদার ধারণা বীণাকে বাইরে থেকে যতটা লাজুক মনে হয় ততটা লাজুক সে না। লাজুক হলে আগ বাড়িয়ে কোনো মেয়ে কি যুবক একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলে?

ছেলের ফুপু যখন বললেন, ওদের দু'জনের কথা হয়েছে তখনই ফরিদার মনে সামান্য সন্দেহ ঢুকেছিল এই ভদ্রমহিলা হয়ত অন্য কোনো মেয়ের কথা বলছেন। ছেলের ফুপু চলে যাবার পর পরই বীণাকে তিনি বললেন, 'সে কোনো ছেলের সঙ্গে কথা–টথা বলেছে কি না। তৌফিক নাম। বিদেশে থাকে।'

বীণা বলল, 'হ্যাঁ।' ফরিদা বললেন, 'কেন গায়ে পড়ে কথা বললি?'

'উনি আমাদের বাসার সামনে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি শুধু বললাম, 'আপনি কী চান? উনি তখন হড়বড় করে এক গাদা কথা বললেন। কেন মা?'

ফরিদা হাসি মুখে বললেন, 'এই ছেলে তোকে বিয়ে করতে চাচ্ছে। ছেলেটা কেমন বল তো? তোর কি পছন্দ হয়?'

বীণা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ফরিদা বললেন, 'মুখটা এমন শুকনো করে দিলি কেন? বয়স হয়েছে বিয়ে করবি না? পরের সংসারে কতদিন আর থাকবি? এখন নিজের সংসার হবে।' বীণা থমথমে গলায় বলল, 'এটা পরের সংসার?'

'পরের সংসার না তো কি? মেয়েদের নিজের সংসার একটাই, স্বামীর সংসার।'

বীণা কোনো কথা না বলে উঠে গেল। তবে ফরিদার মনে হল বিয়ের এই আলাপে বীণার তেমন আপত্তি নেই। ছেলেটিকে তার বোধ হয় পছন্দই হয়েছে।

ফরিদার অনুমান খুব ভুল হয় নি। ছেলেটিকে বীণার পছন্দ হয়েছে। বীণার মনে হয়েছে—ছেলেটা ভালো। কেন এরকম মনে হল সে সম্পর্কে বীণার কোনো ধারণা নেই। প্রবাসী মানুষদের মধ্যে আলগা ধরনের যে স্মার্টনেস থাকে এর মধ্যে তা নেই, কেমন যেন ঢিলাঢালা ধরনের। চোখে মোটা কাচের চশমার কারণেই বোধ হয় তার মধ্যে প্রফেসর প্রফেসর ভাব চলে এসেছে। এই ভাবটা বীণার খুব ভালো লাগে। তাদের কলেজের এক জন প্রফেসর অজিত বাবুর চশমার কাঁচ খুব মোটা। তিনি ক্লাসে ঢুকেই বলেন, 'মা জননীরা, তোমরা একটু হাস। তোমাদের হাসি দেখে ক্লাস শুরু করি।' এই অজিত বাবুকে বীণার খুবই ভালো লাগত। সেই ভালো লাগার অংশ বিশেষ মোটা চশমার কারণে তৌফিক ছেলেটা পেয়ে গেল। এক জন মানুষকে ভালো লাগা এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্দ লাগার পেছনে অনেক বিচিত্র এবং রহস্যময় কারণ থাকে।

তৌফিক ছেলেটির প্রতি ভালোলাগার পরিমাণ আরেকটু বাড়ল দ্বিতীয়বার যখন দেখা হল। বীণা হাসপাতাল থেকে ফিরছে বাড়িতে ঢোকার গলির মাথায় আসতেই দেখা। তৌফিক রাস্তার একপাশে বিব্রতমুখে দাঁড়িয়ে আছে। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার প্রথম কথা বলল বীণা। লাজুক গলায় বলল, 'কী হয়েছে?'

তৌফিক বিব্রত স্বরে বলল, 'তেমন কিছু না। গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। দেখুন না কাদায় পানিতে মাখামাখি হয়ে কী অবস্থা।'

বীণা দেখল। বাঁ পায়ের প্যান্টে থিকথিক ময়লা লেগে আছে। বীণা বলল, 'বাসায় গিয়ে পা ধুয়ে ফেলুন।'

এই বলেই বীণার মনে হল সে এত কথা বলছে কেন? এত কথা বলার কি আছে? কথা শুরু করে চট করে চলে যাওয়াও যায় না। বীণা কিছুটা অস্বস্তি এবং কিছুটা অনিশ্চয়তায় বাড়ির দিকে পা বাড়াল। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ছেলেটি তার সঙ্গে–সঙ্গে আসছে। গেটের কাছাকাছি আসার পর বীণার মনে হল তার হয়ত বলা উচিত—ভেতরে আসুন। কথার কথা। ভদ্রতার জন্যেই বলা। মুশকিল হচ্ছে বলার পর সে যদি সত্যি–সত্যি বাড়িতে ঢোকে তখন? সেটা কি ঠিক হবে?

বীণা চোখ মুখ লাল করে বলল, 'ভেতরে আসুন।'

তৌফিক হেসে বাড়িতে ঢুকল। বীণা কী করবে ভেবে পেল না।

বীণার দাদী চেঁচাতে শুরু করলেন—'কে আসল? লোকটা কে? ও বীণা লোকটা কে? কি চায় এই লোক।'

বীণা তৌফিকের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বলল, 'আমার দাদী। উনার মাথার ঠিক নেই।'

তৌফিক বলল, 'বাসায় আর কেউ নেই?'

'মা আছেন। আপনি বসুন মাকে ডেকে আনছি।'

ফরিদা মাছ কাটছিলেন। তৌফিক এসেছে শুনে এতই উত্তেজিত হলেন যে বটিতে হাত কেটে ফেললেন।

তৌফিক অনেকক্ষণ এ বাড়িতে রইল। ফরিদার সঙ্গে সহজ ভঙ্গিতে গল্প করল। বীণার দাদীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। নরম গলায় বলল, 'দাদী আপনি কেমন আছেন?'

বীণার দাদী বললেন, 'মর হারামজাদা।'

তৌফিক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শব্দ করে হেসে উঠল। এই সহজ সরল হাসি বড় ভালো লাগল বীণার।

সেইদিন বিকেলেই ছেলের ফুপু এসে বললেন, 'শুনলাম ছেলেকে আপনি দেখেছেন। আপনার কি ছেলে পছন্দ হয়েছে?'

ফরিদা বললেন, 'হ্যাঁ পছন্দ হয়েছে।'

'আমরা কি বিয়ের তারিখ নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারি? আমরা এই মাসেই কিংবা সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে চাই।'

'বীণার বাবার সঙ্গে কথা বলেন।'

'হ্যাঁ বলব। দু'এক দিনের মধ্যেই বলব। আপনার বড় ছেলেটা শুনলাম অসুস্থ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জ্বি। পায়ে কী যেন হয়েছে।'

'বাড়ির বড় ছেলে অসুস্থ এই অবস্থায় তো বিয়ের আলাপ চলতে পারে না। ও কবে নাগাদ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে কিছু জানেন?'

'জ্বি না।'

'এখন সে আছে কেমন?'

'একটু ভালো আছে।'

'একদিন যাব দেখতে। আপনার মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে।'

'আপত্তি কিসের। মেয়ে তো এখন আপনাদের।'

ফরিদা তৃপ্তির হাসি হাসলেন। আনন্দে তাঁর চোখে পানি এসে যাচ্ছিল। চোখের পানি সামলাতে তাঁকে খুব কষ্ট করতে হল।

১৪

বুলুর পায়ে গ্যাংগ্রিন ধরা পড়েছে।

দু'বার অপারেশন হল। তৃতীয় বারও সম্ভবত হবে। দু'জন ডাক্তারের এক জন কিছুতেই পা এম্পুট করতে রাজি না। সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যেতে চান। বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনীর মতো অবস্থা। এই ডাক্তারটির বয়স অল্প। হৃদয় কঠিন হতে শুরু করে নি। তিনি রাউন্ডে এসে বুলুর বিছানার সামনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়ান। বুলুর পা পরীক্ষা করেন। এই সময় গভীর বিরক্তিতে তার মুখ অন্যরকম হয়ে যায়। বুলু বলে, 'আপনি কেমন আছেন স্যার?'

তিনি কঠিন গলায় বলেন, 'ভালো।'

'আমার পা কেমন দেখলেন?'

তিনি জবাব দেন না। বুলু নিচু গলায় বলে, 'কেটে ফেলে দেবেন কবে?'

'সময় হলেই ফেলা হবে। আপনি চুপ করে থাকুন।'

বেশিরভাগ সময় বুলু চুপ করে থাকে। একটা ঘোরের মধ্যে তার সময় কাটে। তন্দ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি এক ধরনের আচ্ছন্ন অবস্থা। যে অবস্থায় চারপাশের জগৎটাকে খুবই অবাস্তব মনে হয়। তার পাশের বেডের দাড়িওয়ালা কালো মানুষটাকে এক সময় খুবই পরিচিত মনে হয় আবার পরমুহূর্তেই মনে হয়—দাড়িওয়ালা এই ছাগল কে?

এই লোকটি বুলুকে খুব বিরক্ত করে। অকারণে কথা বলে। বুলুর অসহ্য লাগে—বুলু বিরক্ত হয় এমন কাজগুলো সে নিষ্ঠার সঙ্গে করে। কাল দুপুরে কট কট শব্দ করে কী যেন খাচ্ছিল। শব্দটা চট করে বুলুর মাথায় ঢুকে গেল। মাথার ভেতর কট কট শব্দ হতে থাকল। বুলুর এই এক সমস্যা হয়েছে যে কোনো শব্দই চট করে মাথায় ঢুকে যায়। তারপর মাথার ভেতর সেই শব্দ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। লোকটা কট কট শব্দে খাচ্ছে সেই শব্দ পাক খাচ্ছে বুলুর মাথায়। বুলু বলল, 'কি খান?'

লোকটি সঙ্গে-সঙ্গে টিফিন ক্যারিয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নেন ভাইজান খান।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না আমি খেতে চাই না। আপনি নিজেই খান, তবে দয়া করে কট কট শব্দ করবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

বুলু চোখ বন্ধ করল। যখন ঘুম এসে যাচ্ছে তখন আবার কট কট শব্দ শুরু হল। দাড়িওয়ালা লোকটা খাওয়া শুরু করেছে। বুলু থমথমে গলায় বলল, 'এই যে ভাই আর একবার যদি কট কট শব্দ হয় তাহলে কিন্তু ধাক্কা দিয়ে আপনাকে জানালা দিয়ে ফেলে দেব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

দাড়িওয়ালা এই লোকটির নাম শামসু। একটা লেদ মেশিন চালায়। বুলু যখন কিছুটা ভালো থাকে তখন তার সঙ্গে অনেক কথা টথা বলে। লোকটি প্রতিটি বাক্যে খুব মিষ্টি করে একবার হলেও ভাইজান বলে। বুলুর শুনতে ভালো লাগে। লোকটির বেশিরভাগ কথাই হচ্ছে লেদ মেশিন সংক্রান্ত।

'ভাইজান লেদ মেশিন যন্ত্রটা হইল দুনিয়ার এক "আজিব চিজ"।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি ভাইজান। এই যন্ত্র যে জানে সে দুনিয়ার সবই জানে।'

'আপনি জানেন?'

'নিজের মুখে কি বলব ভাইজান আপনে ধোলাই খালে গিয়া শুধু জিজ্ঞাসা করবেন—শামসু কারিগর। দেখবেন আফনের কি খাতির।'

'আপনাদের কি কারিগর বলে নাকি?'

'না মিস্তিরি বলে। আমারে খাতির কইরা কারিগর ডাকে। আপনার সঙ্গে যখন খাতির হইল তখন আর চিন্তা নাই। কথা দিলাম আফনেরে কাজ শিখায়ে দিব।'

'আমি কাজ শিখে কী করব?'

'যন্ত্র চালাইবেন। চাকরি-বাকরি দিয়া কি হয় বলেন ভাইজান? কয় পয়সা বেতন? স্বাধীন ব্যবসার মতো জিনিস আছে?'

'আর কথা বলবেন না ভাই। যন্ত্রণাটা আবার শুরু হয়েছে। ভালো লাগছে না।'

'দমে দমে আল্লাহু বলেন ভাইজান।'

'চুপ থাকতে বললাম না।'

'নিঃশ্বাসটা নেওয়ার সময় বলেন আল্লা ছাড়ার সময় বলেন হুঁ। এতে কাজ হয়।'

'চুপ। একটা কথা না। ব্যাটা ছাগল।'

শামসু দুঃখিত চোখে তাকায়। আশ্চর্যের কথা সেই দুঃখী চোখে প্রচুর মমতাও ঝরে পড়ে।

আজ বুলুর পায়ের যন্ত্রণা খুব বেড়েছে।

নার্স এসে কড়া ধরনের কোনো পেইন কিলার দিয়েছে যা তার পায়ের ব্যথা একটুও না কমিয়ে মাথাটাকে কেমন ভোঁতা বানিয়ে দিয়েছে। কানের কাছে পিন পিন শব্দ হচ্ছে। যেন বেশ কিছু মশা দু'কানের ভেতর দিয়ে মাথায় ঢুকে গেছে।

রাত আটটার মতো বাজে। মিজান সাহেব ছেলের বিছানার পাশে বসে আছেন। আজ রাতটা তিনি ছেলের সঙ্গেই কাটাবেন। প্রায়ই কাটান। অফিস থেকে সরাসরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে চলে আসেন। খুব যেদিন বাড়াবাড়ি দেখেন সেদিন আর বাসায় যান না।

বুলু ডাকল, 'বাবা।'

মিজান সাহেব নড়ে চড়ে বসলেন। কিছু বললেন না। বুলু বলল, 'আমি পাশ না করার জন্য খুব লজ্জিত বাবা। থার্ড পেপারটা এমন খারাপ হল।'

মিজান সাহেব বললেন, 'এটা নিয়ে পরে আলাপ করব।'

'পরীক্ষার হলে খুব নকল হচ্ছিল একবার ভাবলাম—তারপর বাবা মনটা সায় দিল না।'

'এখন এইসব থাক।'

'আমি এতক্ষণ কী ভাবছিলাম জান? ভাবছিলাম যদি নকল করে পরীক্ষায় পাশ করে ফেলতাম তাহলে বাড়ি থেকে পালাতাম না। পায়ে কাঁটা ফুটত না, ডাক্তারেরা পা কেটে বাদ দিত না।'

'পা কাটার কথা এখনি ভাবছিস কেন? ডাক্তাররা তো চেষ্টা করছেন।'

'আর চেষ্টা করে কিছু হবে না।'

বুলু চোখ বন্ধ করে ফেলল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

দীর্ঘ সময় একা একা বসে থাকা যায় না। মিজান সাহেব অফিসের ফাইল খুললেন। যদি টাকাটার কোনো হদিস পাওয়া যায়। ব্যাংক থেকে ছ'বছরের স্টেটমেন্ট নিয়ে এসেছেন। মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছেন। যদি এমন কোনো চেক বেরিয়ে পড়ে যার উল্লেখ খাতাপত্রে নেই। রেকর্ড হারিয়ে গেছে। অসম্ভব তো কিছু না।

বুলুর ঘুম ভেঙেছে। সে আগ্রহ নিয়ে তার বাবাকে দেখছে। মানুষটা কি অদ্ভুত! এর মধ্যে খাতাপত্র নিয়ে মগ্ন হয়ে গেছে। বুলু মৃদু স্বরে ডাকল, 'বাবা।'

তিনি চোখ তুলে তাকালেন।

বুলু বলল, 'ফেল করায় তুমি কি রাগ করেছ?'

মিজান সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ। একমাত্র গাধারাই তিনবার বি. এ ফেল করে।'

বুলুর কেন জানি হাসি পাচ্ছে। কি অদ্ভুত মানুষ তার এই বাবা। ছেলের এই অবস্থাতেও সান্ত্বনার একটা কথাও বলছেন না। আশ্চর্য তো। বুলু তাকিয়ে আছে। মিজান সাহেব আবার হিসাব নিকাশ শুরু করেছেন।

বুলুর আবার ঘুম পাচ্ছে।

অথচ ঘুমুতে ইচ্ছা করছে না। পায়ের ব্যথা তীব্র হলেই ঘুম পায়। এই ঘুম স্বাভাবিক ঘুমের মতো নয়। অন্যরকম ঘুম। এই ঘুমের সময় আশেপাশের অনেক কিছু টের পাওয়া যায়। ঘুমের ঠিক আগে আগে মাথায় কোনো চিন্তা এলে সেই চিন্তা ঘুমের মধ্যেও থাকে। মাথার মধ্যে ক্রমাগত তা ঘুরপাক খেতে থাকে। একবার ঘুমুতে যাবার ঠিক আগমুহূর্তে মাথায় এল তিনের ঘরের নামতা। তিন চারে বার, তিন পাঁচে পনের.....। মাথায় এই নামতা থেকেই গেল। ক্রমাগত কেটে যাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো মাথার গভীরে বাজতে থাকল— তিন চারে বার, তিন পাঁচে পনের, তিন ছয় আঠার......

এই ঘুম ও জাগরণ বড় অদ্ভুত। কোন্‌টা স্বপ্ন কোন্‌টা বাস্তবে ঘটছে ঠিক বোঝা যায় না। বীণার সেই বন্ধুটি একবার তাকে দেখতে এসেছিল। সত্যি এসেছিল কিনা সে জানে না। হয়ত সে সত্যি-সত্যি আসে নি। হয়ত এটা কল্পনা। কিম্বা কে জানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যি-সত্যি হয়ত এসেছিল। অলিক ঘরে ঢুকেই বলল, 'আমার চিঠিটা কি আপনি পেয়েছিলেন?'

বুলু বলল, 'হ্যাঁ।'

'বীণা কি সত্যি-সত্যি আপনাকে চিঠি দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'চিঠি পড়ে কি আমাকে আপনার খুব খারাপ মেয়ে মনে হল?'

'না।'

'আপনি কি হ্যাঁ এবং না ছাড়া কিছু বলতে পারেন না?'

বুলু হাসল। অলিক বলল, 'এখন বলুন, আপনার পায়ের অবস্থা কেমন?'

'অবস্থা বেশি ভালো না।'

'কেটে বাদ দিয়েছে?'

'এখনো দেয় নি। শিগ্‌গিরই দেবে।'

'ঐ কাটা পা আপনি তখন কী করবেন? সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন?'

কি অদ্ভুত প্রশ্ন। অথচ মেয়েটার মুখে প্রশ্নটা মানিয়ে গেছে। মোটেই অদ্ভুত মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এটাই খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন।

'কি কথা বলছেন না কেন? কাটা পা নিয়ে আপনি কী করবেন?'

'আপনি কী করতেন?'

'আমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। আমি কি আমার শরীরের এত বড় একটা অংশ ফেলে যাব নাকি?'

বুলু হেসে ফেলল। অলিক হাসল না। সে চোখ তীক্ষ্ণ করে বলল, 'যন্ত্রণা কি খুব বেশি?'

'হ্যাঁ বেশি।'

'অসহ্য যন্ত্রণা তাই না?'

'ঠিক অসহ্য নয়। সহ্য করতে পারি তবে অন্য একটা ব্যাপার হয় যা সহ্য করা যায় না।'

'বলুন তো শুনি।'

'আপনি শুনে কী করবেন?'

'আমার দরকার আছে। এই ব্যাপারগুলো আমার জীবনেও ঘটবে, কাজেই আগে থেকে আমাকে তৈরি থাকতে হবে।'

'মাঝে মাঝে কিছু কিছু জিনিস আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে।'

'বলেন কি?'

'এখন আমার মাথায় ঘুরছে তিনের ঘরের নামতা। তিন দুগুনে ছয়। তিন ত্রিকে নয়, তিন চারে বার, তিন পাঁচে পনের......'

অলিক হেসে ফেলল।

বুলু বলল, 'হাসছেন কেন?'

'নামতার বদলে একটা মজার কিছু আপনার মাথায় ঢুকিয়ে দিলে কেমন হয় ভাবছি'

'মজার কিছু মানে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ধরুন আমি যদি এখন আপনাকে বলি—I Love You. তাহলে ভালো হয় না? আপনার মাথার মধ্যে ক্রমাগত ঘুরবে—I Love You, I Love You. নামতার চেয়ে এটা ভালো না?'

এই জাতীয় কথাবার্তা বুলুর সঙ্গে কি সত্যি হয়েছিল? না পুরোটাই তার কল্পনা কিংবা স্বপ্নে দেখা দৃশ্য। অসুস্থ অবস্থায় স্বপ্নগুলো খুব বাস্তব হয়। স্বপ্নে বর্ণ থাকে গন্ধ থাকে।

বুলু ঘুমিয়ে পড়ার আগ মুহূর্তে লক্ষ করল ডাক্তার সাহেব ঢুকছেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরে তার পা দেখলেন। বুলু বলল, 'স্যার কি অবস্থা?'

ডাক্তার শুকনো গলায় বললেন, 'আপনার কাছে কেমন মনে হচ্ছে?'

'ভালো মনে হচ্ছে না।'

'দেখি আরেকটা অপারেশন হোক!'

'কবে হবে?'

'দু'এক দিনের মধ্যেই হবে। আপনি মনে সাহস রাখুন।'

'রাখতে চেষ্টা করছি। অপারেশনে কিছু না হলে কী করবেন?'

'পা এ্যামপুট করব।'

বুলু খুব সহজ গলায় বলল, 'কাটা পা কিন্তু আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব ডাক্তার সাহেব। আপনি যেন ওটা আবার ফেলে দেবেন না।'

ডাক্তার সাহেব শীতল চোখে বুলুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। বুলু ঘুমিয়ে পড়ল। এক সময় ঘুম ভাঙল। কতক্ষণ পর ভাঙল কে জানে? বাবা এখনো খাতাপত্রের ওপর ঝুঁকে আছেন। বুলু ডাকল, 'বাবা।'

মিজান সাহেব চোখ না তুলেই বললেন, 'কি?'

বুলু মনে করতে পারল না, বাবাকে সে তুমি করে বলে, না আপনি করে বলে। তার মনে হল সে আপনি করেই বলে। বুলু বলল, 'এত কিসের হিসাব নিকাশ করছেন?'

মিজান সাহেব ফাইল বন্ধ করে বললেন, 'অফিসের একটা হিসাব। লাখ দু-এক টাকার হিসাব মিলছে না।' বুলু তাকিয়ে আছে বাবার দিকে।

মিজান সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'হিসাব মিলাতে পারছি না। গনি সাহেবের ধারণা আমি বোধ হয়—' তিনি কথা শেষ করতে পারলেন না। তাঁর মনে হল তাঁর নিজের মাথাও বোধ হয় এলোমেলো হয়ে আছে। ছেলেকে এইসব কথা বলার কী অর্থ থাকতে পারে। বুলু বলল, 'তুমি বাসায় চলে যাও বাবা। বাসায় গিয়ে ঘুমাও।'

বুলু লক্ষ করল সে তুমি করে বলছে। বাবা তাতে চমকে উঠছেন না। তার মানে সে হয়ত তুমি করেই বলত।

'বাবা।'

'কি?'

'আমি ঠিক করেছি আবার বি. এ পরীক্ষা দেব। এইবার পাশ করবই।'

'ভালো।'

'তুমি বাসায় চলে যাও। বাসায় গিয়ে আরাম করে ঘুমাও।'

'ওরা তো কেউ আসছে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চলে আসবে। আর না আসলেও কোনো অসুবিধা নেই।'

মিজান সাহেব বিড় বিড় করে বললেন, 'হিসাবটা মিলছে না, বুঝলি? কেন এ রকম হল বুঝতেও পারছি না।'

বুলু বলল, 'সব হিসাব কি আর সব সময় মেলে বাবা?'

১৫

গনি সাহেবকে আজ খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। অফিসে এসেই তিনি নিয়মের বাইরে একটা কাজ করেছেন। তাঁর সেক্রেটারিকে ধমক দিয়েছেন। অবশ্য ধমক দেয়ার পর–পরই নিজেকে সামলে নিয়ে হাসি মুখে বলেছেন, 'কাজ কর্ম কেমন চলছে?'

সেক্রেটারি শুকনো গলায় বলল, 'জ্বি স্যার ভালো।'

'তিন অক্ষরের সুন্দর একটা নাম বের কর তো।'

'কিসের নাম স্যার?'

'জাহাজের নাম। একটা জাহাজ শেষ পর্যন্ত কিনেই ফেললাম। নাম দরকার। রেজিস্ট্রেশন হবে। অনেক যন্ত্রণা আছে। মিজান সাহেব এসেছেন নাকি?'

'জ্বি স্যার।'

'যাও তাঁকে পাঠিয়ে দাও।'

মিজান সাহেব জাহাজ কেনার খবর চুপ করেই শুনলেন। কোনো রকম আবেগ বা উত্তেজনা দেখালেন না। গনি সাহেব বললেন, 'নাম দরকার মিজান সাহেব। জাহাজের নাম। সাধারণত জাহাজের নাম বেশ বড় হয় যেমন প্রাইড অব বেঙ্গল, দি সাইলেন্ট ভয়েজার......আমি চাই তিন অক্ষরের নাম।'

মিজান সাহেব এবারো কিছু বললেন না।

'তিন অক্ষরের নাম কেন চাই জানেন?'

'জ্বি না।'

'তিন সংখ্যাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এই জন্যেই তিন অক্ষরের নাম দরকার। তিন সংখ্যাটা কী রকম গুরুত্বপূর্ণ দেখুন— আমাদের স্থান হচ্ছে তিন—স্বর্গ মর্ত্য পাতাল। কালও তিন—অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। আমরা খাই তিন বেলা—সকাল, দুপুর, রাত। শিয়াল ডাকে তিনবার তিন প্রহরে। ঠিক না?'

'জ্বি স্যার ঠিক।'

'জাহাজ কত দিয়ে কিনলাম কি—এইসব তো জিজ্ঞেস করছেন না।'

'জিজ্ঞেস করে কী হবে স্যার?'

'জাহাজ তো আমার একার না। প্রতিষ্ঠানের জাহাজ। এতে আপনাদের সবার অংশ আছে। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আছে।'

মিজান সাহেব চুপ করে রইলেন। তাঁর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

গনি সাহেব বললেন, 'আপনার ছেলের অবস্থা কি?'

'এখন একটু ভালো। আরেকটা অপারেশন হয়েছে। ডাক্তার বলেছে হয়ত পা বাঁচানো যাবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'গুড। ভেরি গুড। এটা অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। তা এরকম আনন্দের সংবাদে মুখ এমন কালো করে রেখেছেন কেন? অবশ্যি এ রকম হয়—খুব আনন্দের সময় মনটা কেন জানি খারাপ লাগে। চা খান চা দিতে বলি।'

'চা খাব না স্যার।'

মিজান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'আপনি কি স্যার পুলিশ খবর দিয়েছেন?'

গনি সাহেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। যেন তিনি প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। মিজান সাহেব বললেন, "রহমানের স্ত্রী আজ ভোরে আমার বাসায় এসেছিল। সে বলল, 'পুলিশ এসে রহমানকে ধরে নিয়ে গেছে'।"

গনি সাহেব বললেন, 'তাই নাকি? কখন ধরল?'

'রাত সাড়ে এগারটার সময়।'

'এখনো ছাড়ে নি?'

'জ্বি না।'

'অন্যায়। খুবই অন্যায়। রাতেই আমাকে খবর দেয়া দরকার ছিল। তৎক্ষণাৎ ছাড়ানোর ব্যবস্থা করতাম।'

'স্যার আপনি কি পুলিশ খবর দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ ইনফর্ম করে রেখেছিলাম। একেবারে তো ছেড়ে দেয়া যায় না। ছোট সমস্যা থেকে বড় সমস্যা হয়। আপনার ছেলের ব্যাপারটা দেখুন না। সামান্য কাঁটা ফুটল সেখান থেকে এখন পা নিয়ে টানাটানি। আমি পুলিশকে বলেছি ওরা যাবে, নিজেদের মতো করে একটা ইনভেসটিগেশন করবে। কিছু হবে না জানি। তবু পুলিশে ইনফর্ম করা নাগরিক কর্তব্য। আপনি ভাববেন না এক্ষুনি আমি রহমানকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করছি। আমি একটি চিঠি লিখে দিচ্ছি আপনি চিঠি নিয়ে নিজেই চলে যান। অফিসের গাড়ি নিয়ে যান।

গনি সাহেব অতি দ্রুত চিঠি লিখতে শুরু করলেন। মিজান সাহেব বললেন, 'আমার কাছেও তো পুলিশ আসবে। আসবে না স্যার?' গনি সাহেব নরম গলায় বললেন, 'পুলিশ কি করবে না করবে বলা তো মুশকিল। এরা তো কখনো ঠিক কাজটা করে না। যেটা করার না সেটা করে। যেটা করা প্রয়োজন সেটা করে না। নিন এই চিঠি নিয়ে চলে যান।'

মিজান সাহেব বেরিয়ে যাওয়া মাত্র গনি সাহেব বেল টিপে তাঁর সেক্রেটারি মজনুকে ডাকলেন। মধুর গলায় বললেন, 'নাম পাওয়া গেছে?'

মজনু শুকনো গলায় বলল, 'জ্বি স্যার। একটা পেয়েছি।'

'বল নাম বল।'

'নাম হল—বদর।'

'কি বললে?'

'বদর।'

'নয় কোটি টাকা দিয়ে জাহাজ কিনেছি—তার নাম বদর। তুমি আমার সঙ্গে ফাজলামি কর? যাও নাম বের কর। আজ বিকেলে পাঁচটার মধ্যে এক হাজার নাম তুমি আমাকে দিবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'নামগুলি সব এ্যালফাবেটিকেলি সাজাবে। অ তে কিছু, আ তে কিছু এই ভাবে।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

লাঞ্চ টাইমের ঠিক আগে সবার কাছে একটা নোট গেল। যার বিষয়বস্তু হচ্ছে— কোম্পানি গ্রিক শিলিং মেরিনারের কাছ থেকে একটি সমুদ্রগামী জাহাজ কিনেছে। এই ঘটনা কোম্পানির উত্তরোত্তর উন্নতির পরিচায়ক। ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে কোম্পানির সকল কর্মচারীকে একটি করে ইনক্রিমেন্ট দেয়া হল। কোম্পানির উন্নতি মানেই কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের উন্নতি।

মিজান সাহেব রহমানকে নিয়ে ফিরেছেন। রহমানের সমস্ত গা ফুলে উঠেছে। ডান চোখের নিচে রক্ত জমে কালচে হয়ে আছে। মিজান সাহেব বললেন, 'তোমাকে মারল কেন?'

'রহমান নিচু স্বরে বলল, জানি না স্যার।'

'খুব বেশি মেরেছে?'

রহমান তার জবাব না দিয়ে বলল, 'স্যার আমি এখন বাসায় যাব না। আমার এই অবস্থা দেখলে চিনু খুব মন খারাপ করবে। আমার নিজেরো স্যার লজ্জা লাগছে।'

'কোথায় যেতে চাও?'

'কল্যাণপুরে আমার মামার বাসা আছে। ঐখানে নিয়ে যান স্যার দুই একদিন থেকে সুস্থ হয়ে বাসায় যাব।'

'তুমি কি এর পরেও গনি সাহেবের এখানে কাজ করবে?'

'যাব কোথায় স্যার? যাওয়ার তো কোন জায়গা নেই।'

মিজান সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'আমি চাকরি করব না বলে ঠিক করেছি।'

'কী বলছেন স্যার?'

'রেজিগনেশন লেটার লিখে অফিসে দিয়ে এসেছি। ওরা গনি সাহেবকে দেবে।'

'আপনার সংসার চলবে কী ভাবে স্যার?'

'না চললে চলবে না। তুমি কি একটা সিগারেট খাবে রহমান?'

'জ্বি না স্যার। আপনার সামনে খাব না।'

'নাও। কোন অসুবিধা নেই।'

মিজান সাহেব রহমানের পিঠে হাত রাখলেন। রহমান শব্দ করে কাঁদতে লাগল।

১৬

অনেকদিন পর ফরিদা আবার ঐ মেয়েটিকে দেখলেন। ঘোমটা দেয়া মেয়েটা, কুয়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যা মাত্র মিলিয়েছে। আকাশ মেঘে ঢাকা বলে একটু বেশি অন্ধকার। তবু তার মধ্যেও মেয়েটিকে পরিষ্কার দেখা গেল। তিনি প্রথমে ভাবলেন বীণা। পর মুহূর্তেই মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল—না এতো বীণা না। তিনি তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'কে ওখানে?' মেয়েটা চট করে চাঁপা গাছের আড়ালে চলে গেল।

তাঁর বুক ধক করে উঠল। ঘরে তিনি এবং তাঁর শাশুড়ি ছাড়া আর কেউ নেই। সবাই গেছে বুলুর কাছে। বুলুর অবস্থা খারাপ হয়েছে। আজ তার পা কেটে বাদ দেয়া হবে। অপারেশন সন্ধ্যার পর পরই হবার কথা। তিনি যেতে চেয়েছিলেন যেতে পারেন নি। সকাল থেকেই বুকের ব্যথায় কাতর হয়েছেন। আজকের ব্যথাটা অন্য যে কোনো দিনের চেয়েও তীব্র। সন্ধ্যাবেলা একটু কমেছিল। নামাজের অজু করার জন্যে বারান্দায় এসে এই দৃশ্য দেখলেন। তিনি আবার কাঁপা গলায় বললেন, 'কে কে কে?'

তাঁর শাশুড়ি বললেন, 'কি হইল বৌমা?'

ফরিদা থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'ভয় পেয়েছি। আম্মা ভয় পেয়েছি।'

'বৌমা ভয়ের কিছু নাই। আস আমার কাছে। আয়াতুল কুরসি পইড়া বুকে ফুঁ দিব। আস আমার কাছে গো মা।'

ফরিদার সমস্ত শরীর কেমন যেন জমে গেছে। তিনি নড়তে পারছেন না। চাঁপা গাছের আড়াল থেকে ঘোমটা পরা মেয়েটি আবার বের হয়ে এসেছে। ফরিদা স্পষ্ট দেখলেন মেয়েটা তার ঘোমটা ফেলে দিল। কি অসম্ভব রূপবতী একটি মেয়ে অথচ তাকে এত ভয়ংকর লাগছে কেন?

ফরিদা ক্ষীর্ণ স্বরে ডাকলেন, 'আম্মা ভয় লাগে। আম্মা ভয় লাগে।'

তাঁর শাশুড়ি ক্রমাগত ডাকছেন, 'আমার লক্ষী মা, কাছে আস। আমি বিছনা থাইকা নামতে পারতাছি নাগো মা। তুমি আমার কাছে আস।'

AMARBOI.COM

১৭

ডাক্তাররা মৃত রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে সাধারণত কোনো কথা বলতে চান না। কিন্তু এই ডাক্তার বললেন। অপারেশন থিয়েটারের বাইরের কাঠের বেঞ্চিতে বসে থাকা মিজান সাহেবের সামনে এসে স্পষ্ট গলায় বললেন, 'আমি খুবই লজ্জিত।'

মিজান সাহেব বিড়-বিড় করে বললেন, 'লজ্জিত হবার কী আছে! চেষ্টার ত্রুটি যদি হত তাহলে লজ্জার ব্যাপার ছিল। চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি।'

ডাক্তার সাহেব চলে গেলেন না দাঁড়িয়ে রইলেন। মিজান সাহেব বললেন, 'মৃত্যুর সময় বুলু কি কিছু বলেছিল?'

'জ্বি না। ওর জ্ঞান ফেরে নি।'

এই প্রথম মিজান সাহেবের চোখে পানি দেখা গেল। তিনি রুমাল বের করে চোখ মুছে সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'আমার এই ছেলেটা বড় ভালো ছিল ডাক্তার সাহেব। আমার মনে একটা ক্ষুদ্র আফসোস রয়ে গেল—আমি যে তাকে কতটা ভালবাসতাম এটা সে জানতে পারল না।'

ডাক্তার সাহেব স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন। মিজান সাহেব বললেন, 'বুলু আপনাকে একটা উপহার দিতে চেয়েছিল। ওর ইচ্ছা ছিল অপারেশনের পর জ্ঞান যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরবে তখন সে নিজের হাতে আপনাকে দেবে। আমি উপহারটা নিয়ে এসেছি। আপনি যদি উপহারটা নেন আমি খুব খুশী হব। তেমন কিছু না। সামান্য একটা কলম। অল্প দাম।'

মিজান সাহেব পাঞ্জাবির পকেটে কলম খুঁজতে লাগলেন। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আপনি আপনার বাচ্চাদের কাছে যান। ওরা খুব কান্নাকাটি করছে। আসুন। আমার হাত ধরুন।'

১৮

অলিক আমেরিকা থেকে সুন্দর একটা চিঠি লিখেছে। চিঠিতে জীবনের চমৎকার সব ঘটনা এত সুন্দর করে লেখা। বার-বার পড়তে ইচ্ছা করে।

চিঠি শেষ করবার আগে বুলুর কথা লিখল। বীণার কথা লিখল। কি সুন্দর করেই না লিখল—

বীণা, তোর ভাইটা খুব ভালমানুষ ধরনের ছিল। ভাগ্যিস তার সঙ্গে আমার বেশি দেখা টেখা হয় নি। হলে নির্ঘাৎ প্রেমে পড়ে যেতাম। আর ওইরকম কিছু ঘটলে কি হত বল তো! দু'দিন মাত্র তার সঙ্গে দেখা। অল্প কিছু কথা হল তাতেই আজ আমার এমন কষ্ট হচ্ছে। জানি না তোরা কী করে সহ্য করছিস! কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের অসাধারণ তবুও তার একটা সীমা আছে। তুই লিখেছিস জ্ঞান ফিরবার পর নানান কথার এক ফাঁকে তোর ভাই আমার চিঠিটা পড়তে চেয়েছিল।

জানতে চেয়েছিল আমি কেমন আছি। আমার বড় আনন্দ হল যে এক জন মৃত্যুপথযাত্রী অন্য এক জনের কুশল জানতে চায়। সেই এক জন হচ্ছে আমার মতো এক জন। এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে। পরকাল আছে কিনা কে জানে। যদি থাকে তাহলে তোর আদরের ভাই সেখানে পরম সুখে থাকবে। এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

তোর বিয়ের কথা হচ্ছিল—সেই বিয়ে ভেঙে গেল জেনে ভালো লাগছে। তুই বিয়ে করলে ওদের এখন কে দেখবে? তোকে এখন হাল ধরতে হবে না? আমি জানি সেই হাল তুই শক্ত করে ধরবি। মেয়েদের নরম হাত মাঝে-মাঝে বজ্রের মত কঠিন হয়ে যায়। সময়ই তা করে দেয়। তোর বেলায়ও করবে।

আমি ভালো আছি। সত্যি ভালো। ডাক্তাররা অসুখ ধরতে পেরেছেন। দাগ মুছে যাচ্ছে। চাঁদে এখন আর কোন কলঙ্ক নেই।

চিঠি শেষ করে বীণা চুপচাপ বসে রইল।

শ্রাবণ মাসের দুপুর।

আকাশ মেঘলা। মেঘলা দুপুরে সব কেমন অন্যরকম লাগে। কুয়ার কাছের চাঁপা গাছে কর্কশ স্বরে একটা কাক ডাকছে—কা-কা-। কা-কা।

বীণার দাদী বললেন, 'মর হারামজাদা মর।'

কাক তাতে উৎসাহ পেয়ে আরো শব্দ করে ডাকতে লাগল—কা-কা-কা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিজান সাহেব বারান্দায় বসে বিড়-বিড় করে হিসাব করছেন। তাঁর খানিকটা মাথার দোষ হয়েছে। এমন ভয়াবহ কিছু না। বাইরের কেউ ধরতে পারে না। সবই ঠিকমতোই করেন। শুধু যখন বাসায় থাকেন তখন হিসাব করতে থাকেন। অফিসের না-মেলা হিসাব মিলাতে চেষ্টা করেন। হিসাব মেলে না।

এখন তিনি বারান্দায় জলচৌকিতে বসে অতি দ্রুত হিসাব করছেন।

বাবলু তাঁকে দেখছে। এখন বাবাকে তার আর মোটেই ভয় করে না। বরং বড় ভালো লাগে। বাবার সঙ্গে সে নানান গল্প করে।

বাবলু বলল, 'বাবা কি করছ?'

মিজান সাহেব বললেন, 'হিসাব।'

'মিলছে বাবা?'

'প্রায়। একটু বাকি।'

মিজান সাহেব হাসেন। এই হাসি বাবলুর বড় ভালো লাগে।

সেও হাসে।

ক্লান্ত দুপুরগুলোতে বীণা বসে থাকে কুয়ার পাশে। মাঝে-মাঝে কুয়ার কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'লুবু, লুবু।' কুয়া সেই শব্দ উল্টো করে ফেরত পাঠায়। কি সুন্দর প্রতিধ্বনি—বুলু, বুলু।

বীণার কাছে গানের মতো মনে হয়। অন্ধকারের গান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রজনী

১

বাবা 'খকখক' করছেন।

এই 'খকখক' অন্যদিনের মতো নয়। আজকেরটা ভয়াবহ! যেন তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করছেন ফুসফুসের খানিকটা অংশ কাশির সঙ্গে বের করে ফেলতে—পারছেন না। আমি মনে মনে বললাম, 'আরে যন্ত্রণা!' বলেই খানিকটা অনুশোচনা হল। যাকে বলে জন্মদাতা পিতা! বেচারা কাশতে কাশতে ফুসফুস বের করে ফেলছেন। এই সময় সহানুভূতিতে পুত্রের হৃদয় আর্দ্র হওয়া উচিত। হাওয়াটাওয়া করা উচিত কিংবা ছুটে যাওয়া উচিত একজন ডাক্তারের কাছে। তা করতে পারছি না, কারণ এখন বাজছে ছ'টা তিরিশ। আমি ঘুমুতে গেছি রাত তিনটায়। আমার পক্ষে মমতা দেখানো সম্ভব না। তবু দেখাতাম—দেখাচ্ছি না, কারণ, বাবার এই খকখক সাময়িক ব্যাপার, কিছুক্ষণের মধ্যে থেমে যাবে। আবার শুরু হবে রাতে—ঘুমুতে যাবার আগে আগে। শিয়াল প্রহরে প্রহরে ডাকে, আমার বাবা ডাকেন সকালে এবং সন্ধ্যায়। বাকি সময়টা তিনি মোটামুটি সুস্থ।

আমি চাদর দিয়ে পুরোপুরি নিজেকে ঢেকে ফেললাম। মন থেকে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা দূর করে ফেললাম। ঘুমটা আবার শুরু করা যায় কি না তার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা। সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। রাতের ঘুম ভাঙলে জোড়া লাগে, ভোরবেলারটা লাগে না।

'বীরু, ওই বীরু।'

মার গলা। মটকা মেরে পড়ে থাকলে কোনো লাভ হবে না। মা কিছুক্ষণ গা ঝাঁকাবেন, টান দিয়ে চাদর ফেলে দেবেন, আদুরে গলায় ডাকাডাকি করতে থাকবেন এবং ঘুম ভাঙানোর জন্যে গায়ে মাথায় হাত বোলাবেন। একটা বিশেষ বয়সের পর পুত্ররা মার এই জাতীয় আদর খুব একটা পচ্ছন্দ করে না, কিন্তু আমার মা এই খবরটা জানেন না।

'বীরু ও বীরু।'
'শুনছি। কি ব্যাপার?'
'তোর বাবার তো দম আটকে আসছে। শেষরাত থেকে কাশছে।'
'বল কী!'
'ভয়ে আমার হাত-পা কাঁপছে। তুই একটু যাবি?'
'কোথায় যাবো?'
'ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয় না লক্ষ্মীসোনা!'

মা আবার তার শুকনো হাত আমার বুকে-পিঠে বোলাতে লাগলেন। আমি বিরক্ত গলায় বললাম, 'সুড়সুড়ি দিও না মা, যাচ্ছি। চা দিতে বল, ঘুমটা কাটুক।'

মা ছুটে গেলেন। এক্ষুনি কুৎসিত খানিকটা গরম জিনিস কাপে ঢেলে নিয়ে আসবেন। তার না আছে স্বাদ না আছে কিছু। জিনিসটা গরমও হবে না, আবার ঠাণ্ডাও না। অতিরিক্ত মিষ্টির জন্যে মুখে দেওয়া যাবে না এবং অবধারিতভাবেই দুধের সর ভাসবে। ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে মা চা বানাচ্ছেন—এখনো তিনি জিনিসটা শিখতে পারলেন না। শুধু চা কেন—এই জীবনে তিনি কিছুই শিখতে পারেন নি। আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি, তখন সূচিকর্মে তাঁর প্রবল উৎসাহ দেখা গেল। অনেক রাত্রি জাগরণের পর কী একটা জিনিস যেন তৈরি হল। সেইটি গোপনে বাঁধিয়ে বসার ঘরে ঝোলানো হল—উদ্দেশ্য বাবাকে অবাক করে দেওয়া। বাবা সেই শিল্পকর্ম দেখে গম্ভীর গলায় বললেন, 'এটা কি?' মা ক্ষীণ গলায় বললেন, 'তাজমহল।' বাবা আরো গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমার বাড়িতে তাজমহল কেন? আমি কি শাহ্‌জাহান? এক্ষুনি নামাও।'

তাজমহল অবশ্যি নামানো হল না। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল—এই দুই কবির মাঝখানে তাজমহল হাইফেনের মতো বসে রইল। এখনো আছে, তবে রবীন্দ্রনাথের ছবিটা নেই। একাত্তুরের যুদ্ধের সময় বাবা রবীন্দ্রনাথকে বিসর্জন দেন। নজরুলের ছবিটা এখনো আছে। ছবিটার দিকে তাকালে মনে হয় কবি নজরুল মুগ্ধ চোখে মার তৈরি তাজমহল দেখছেন। মার শিল্পকর্ম একজন বড় কবিকে মুগ্ধ করেছে, এটাই বা কম কী?

বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই আবার বাবা নতুন-উদ্যমে কাশি শুরু করলেন। খকখক খক্কর—খকখক খক্কর। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে বেশ একটা তালের ভাব আছে। এটাকে হয়তো 'ত্রিতাল কাশি' বলা যাবে কিংবা কে জানে এটা হয়তো ঝাঁপতাল। প্রতিভাবান ব্যক্তিদের কাশি সাধারণ মানুষদের মতো হবে কেন? একটু অন্যরকম হবে।

আমার বাবাকে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি বলা চলে। তাঁর ডিগ্রিগুলি এরকম—বি এ (অনার্স), এম এ (ডাবল), এল এল বি। নানান ধরনের ডিগ্রি অর্জন ছাড়াও অন্যান্য প্রতিভার স্ফূরণও তাঁর মধ্যে দেখা গেছে—যেমন কবিতা, নাটক এবং যন্ত্রসঙ্গীত। পড়াশোনা শেষ করবার পর চাকরিবাকরির মতো তুচ্ছ ব্যাপারে তাঁর কোনো আগ্রহ দেখা যায় নি। তিনি শিল্প-সাহিত্যের চর্চায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন। অতি অল্প সময়ে প্রায় হাজারখানেক কবিতা, দেড়টা নাটক এবং একটা পুরো উপন্যাস লিখে ফেলেন। নেত্রকোণায় আমার দাদাজানের আদি বাড়িতে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় সাহিত্য আসর বসতে থাকে। গেটের কাছে একটা সাইনবোর্ড টানানো হয়—"আলতা সাহিত্য বাসর"।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর গানের গলা না-থাকায় তিনি বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে প্রবল চেষ্টা চালান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তবলা এবং বেহালা। নেত্রকোণায় বেহালা শেখানোর মতো তেমন কোনো শিক্ষক ছিলেন না বলে তবলার উপর চাপটা একটু বেশি পড়ে। গ্রীষ্মের দুপুরগুলিতে দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘামতে ঘামতে তিনি তবলায় বোল তুলতে থাকেন—তেরে কেটে ধিনতা। তেরে কেটে ধিনতা ধিনাক ধিনাক ধিন।

এই সময় তাঁর বয়স প্রায় তিরিশ। টাকাপয়সা উপার্জনের মতো মামুলি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময় বা মানসিকতা কিছুই নেই। প্রতিভাবান ব্যক্তিরা এইসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করতে পারেন না। তাঁদের অনেক বড় জিনিস নিয়ে ভাবতে হয়। মহৎ চিন্তা করতে হয়। এইসব মহৎ জিনিস নিয়ে ভাবতে ভাবতে বাবা আরও একটি মহৎ কাজ করে ফেলেন। ত্রিশ বছর বয়সে তের বছরের এক বালিকার প্রেমে পড়ে যান। বাবার দেড় হাজার কবিতার প্রায় সব ক'টি এই বালিকাকে নিয়ে লেখা। এই বালিকার সঙ্গে বাবার বিয়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ বালিকাটি সরকারী হাসপাতালের এক হতদরিদ্র কম্পাউন্ডারের মেয়ে। কম্পাউন্ডার সাহেবের বাঁ পা ডান পায়ের চেয়ে ইঞ্চিখানেক ছোট বলে নেংচে নেংচে হাঁটেন। তাঁর বহুল পরিচিত নাম হচ্ছে নেংড়া কম্পাউন্ডার। শারীরিক অসুবিধা ছাড়াও কম্পাউন্ডার সাহেবের আরো সব অসুবিধা ছিল। স্পিরিট এবং ধেনো মদ খেয়ে তিনি মাঝেমধ্যেই নেশা করতেন। নেত্রকোণার একটি বিশেষ পাড়ার সামনে তাঁকে সেজেগুজে প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উদাস নয়নে হাঁটাহাঁটি করতে দেখা যেত।

আমার প্রেমিক-বাবা এইসব তুচ্ছ জ্ঞান করলেন এবং এক সন্ধ্যায় আমার দাদাকে গিয়ে বললেন, 'এই মেয়েটিকে বিয়ে না করতে পারলে তাঁর জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

দাদাজান একটি কথাও না-বলে বাবার বক্তব্য শুনলেন। ফরসি হুক্কায় টান দিতে-দিতে পা নাচাতে লাগলেন। বাবার বয়ান শেষ হলে গম্ভীর গলায় বললেন, 'তোমার মতো একজন জ্ঞানী মানুষের জীবন নষ্ট হওয়াটা কোনো কাজের কথা না। তোমার এত মূল্যবান জীবন বজায় থাকাই ভালো। যাও, বিবাহ কর। এবং বৌকে নিয়ে ঢাকায় গিয়ে থাক। ভয় নেই, চাল-ডাল, মশলাপাতি এখান থেকে পাঠাব। মাসে মাসে হাতখরচও পাবে। তবে আমি যত দিন জীবিত আছি, ততদিন তুমি এবং তোমার বৌ কেউই আমার সামনে পড়বে না। এখন আমার সামনে থেকে বিদায় হও।'

২

বাবার সেই তের বছরের বালিকা বধূই আমার মা। বাবার ভাগ্য প্রসন্ন ছিল, কারণ বাবার বিয়ের পরপরই দাদাজান মারা যান। দাদাজানের বিশাল সম্পত্তি তাঁর হাতে এসে পড়ে। ধানী জমি, ভাটি অঞ্চলের জমি, নেত্রকোণা শহরে দু'টি বাড়ি, ময়মনসিংহ শহরে একটি বাড়ি, একটা রাইস মিল এবং ইটের ভাটা। আমার প্রতিভাবান বাবা পাঁচ বছরের মধ্যে একটা ভেলকি দেখিয়ে দিলেন। তিনটি পুত্র কন্যার জন্ম দিলেন এবং পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে ঢাকায় চলে এলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তমানে তিনি একটি ভাড়া-বাড়িতে থাকেন। ডেলটা ইন্সুরেন্স কোম্পানির হেড ক্যাশিয়ার হিসেবে সাড়ে তিন হাজার টাকা বেতন পান। বাড়িভাড়া হিসেবে পান সতের শ' টাকা। মেডিক্যাল এলাউন্স এক শ'। তাঁর সাহিত্য প্রতিভা একেবারে জলে যায় নি। মাঝে-মাঝেই খুব তেজী ভাষায় পত্র-পত্রিকায় চিঠিপত্র লেখেন। গত রোববারের আগের রোববারে ইত্তেফাকে তাঁর একটা চিঠি ছাপা হয়েছে। চিঠির বিষয়বস্তু হচ্ছে ঢাকা শহরে মশার উপদ্রব। কঠিন ভাষা। ভাগ্যিস মশারা পড়তে জানে না। জানলে এই চিঠি পড়েই তাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যেত।

বারান্দায় দাঁড়িয়েই আমার প্রতিভাবান বাবাকে একঝলক দেখা গেল। তিনি দরজা পর্যন্ত এসে ক্ষীণ গলায় পারুলকে কী সব বলে আবার বিছানায় চলে গেলেন।

পারুল আমার ছোট বোন। ভাই এবং বোনদের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক থাকে বলে শুনেছি। আমাদের তা নেই। পারতপক্ষে আমরা দু' জন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলি না। সে আমাকে দেখলেই মুখ কুঁচকে ফেলে। কীটপতঙ্গ দেখলে আহলাদী মেয়েগুলো যেমন করে, অনেকটা সে-রকম।

পারুল বাবার ঘর থেকে বের হয়ে থমকে দাঁড়াল। শুকনো গলায় বলল, 'একটা চিঠি এসেছে, টেবিলের উপর আছে।' ভাব বাচ্যে কথা। তাও আমার দিকে না তাকিয়ে। যেন দেয়ালের সঙ্গে কথা বলছে। আমি বললাম, 'চিঠিটা কবে এসেছে?'

'গতকাল।'

'এখন দিচ্ছিস কেন?'

'দেবটা কখন? তুই ফিরেছিস রাত সাড়ে বারটায়। আমি রাত সাড়ে বারটা পর্যন্ত চিঠি কোলে নিয়ে বসে থাকব?'

এমন বিশ্রীভাবে পারুল কথা বলল যে, আমার ইচ্ছা করল বালতি থেকে এক মগ পানি এনে ওর মুখে ঢেলে দিই। গলাটা সে এমন করেছে যে, কথাগুলো শোনাচ্ছে বাবার কাশির মতো। অথচ তার গলার স্বর বেশ ভালোই।

আমাদের এ-বাসায় পারুলের কারণেই কিছু যুবকের আনাগোনা আছে। তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় সে মিষ্টি একটা গলার স্বর বের করে। সব মেয়েদের স্টকেই বেশ কয়েকরকম গলার স্বর আছে বলে আমার ধারণা। একেক সময় এককটা বার করে। আমার এই বোনটাকে মোটামুটি চলনসই সুন্দরী বলা চলে। তবে সে যতটা না সুন্দর, তার নিজের ধারণা সে তার চেয়েও সুন্দর। এটাই হচ্ছে প্রধান সমস্যা। বিয়ের যে-সব প্রস্তাব আসছে তার কোনোটাই তার মনে ধরছে না। ব্যাংকের ম্যানেজারের এক প্রস্তাব এসেছিল। ছেলে দেখতে ভালো। সামান্য বেঁটে, তবে তেমন কিছু না। কথাবার্তা অনেক দূর এগনোর পর পারুল বলল, 'আমি বারহাট্টার এক গ্রামে পড়ে থাকব। তাই তোমরা চাও? সারাটা জীবন কাটালাম ঢাকা শহরে।'

আমার মা হাসিমুখে বললেন, 'গ্রামই তো ভালো, নিরিবিলি থাকবি। টাটকা শাকসবজি খাবি।' পারুল ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমার টাটকা শাকসবজির দরকার নেই।'

বাবা দরাজ গলায় বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে, বাদ দাও। আরো দেখি?'

তারপর একজন পাওয়া গেল ঢাকা শহরের। নওয়াবপুরে তার একটা ইলেকট্রিকের দোকান আছে। পুরনো ঢাকায় নিজেদের এজমালি বাড়ি। পারুল সব শুনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থমথমে গলায় বলল, 'শেষ পর্যন্ত আমি দোকানদার বিয়ে করব?'

মা বললেন, 'দোকানদার খারাপ কিরে? দোকানদার তো ভালোই। স্বাধীন ব্যবসা। আমাদের রসুলুল্লাহ্‌ও তো ব্যবসা করতেন।'

পারুল রাগী গলায় বলল, 'তুমি যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলবে না তো মা! দেশে কি ডাক্তার–ইনজিনিয়ার নেই যে, আমাকে দোকানদার বিয়ে করতে হবে?'

এরপর থেকে আমরা ডাক্তার এবং ইনজিনিয়ার খুঁজছি। আমরা মানে আমার বাবা। তিনি নিয়মিত আমাদের সব আত্মীয়কে চিঠি ছাড়ছেন। প্রতিটি চিঠির ভাষা ও বক্তব্য এক—"পর সমাচার এই যে, আমরা কুশলে আছি। দীর্ঘদিন আপনার কোনো পত্রাদি না পাইয়া চিন্তাযুক্ত আছি। সত্বর পত্র মারফত চিন্তা দূর করিবেন। এখন আপনাদের নিকট আমার একটি আবদার। আমার কনিষ্ঠা কন্যাটিকে সুপাত্রে সমর্পণ করিতে চাই। আপনাদের সকলের সহযোগিতা ভিন্ন সম্ভব নহে। যেভাবেই হউক একটি পাত্রের সন্ধান দিবেন। পাত্র ডাক্তার বা ইনজিনিয়ার হইলে ভালো হয়।" বাবার বেশিরভাগ চিঠিরই জবাব আসে না। তবে তাঁর ধৈর্য অপরিসীম। তিনি আবার লেখেন। কয়েকদিন পর আবার। প্রথম জীবনে তিনি রবার্ট ব্রুসের কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। শেষ বয়সে করেছেন। অধ্যবসায়ের চূড়ান্ত দেখাচ্ছেন।

৩

ডাক্তারের সন্ধানে বের হলাম।

ডাক্তার হচ্ছেন আমাদের ধীরেন কাকু। দীর্ঘদিন এই পাড়ায় আছেন। উনিশ শ' পঁয়ষট্টি সালে পাক–ভারত যুদ্ধের পর দলবল নিয়ে কোলকাতায় পালিয়ে গিয়েছিলেন। সুবিধা করতে না পেরে আবার ফিরে এসেছেন। এখানেও সুবিধা করতে পারেন নি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের সমস্ত দুর্বলতা ধীরেন কাকুর আছে। তিনি আশেপাশের সবাইকে খুশি রাখতে চান। বেশিরভাগ সময়ই ভিজিট নেন না। ভিজিট দিতে গেলে তেলতেলে একটা হাসি দিয়ে বলেন, 'আরে, আপনার কাছে ভিজিট কি নেব? ভাই ভাই হিসেবে বাস করছি, কী বলেন? ঠিক না? আপনার বিপদে আমি আপনাকে দেখব, আমার বিপদে আপনি দেখবেন আমাকে। হা হা হা।'

উনিশ শ' একাত্তুরে ধীরেন কাকুকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গেল। তখন আমাদের পাড়ার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হাজি আবদুল কাদের তাঁকে অনেক ঝামেলা করে ছুটিয়ে নিয়ে এলেন, এবং এক শুক্রবারে হাজি আবদুল কাদের ধীরেন কাকুকে মুসলমান বানিয়ে ফেললেন। নতুন মুসলমান ধীরেন কাকুর নাম হল মোহাম্মদ সুলায়মান। তিনি দাড়ি রাখলেন। চোখে সুরমা দেওয়া শিখলেন। মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে লাগলেন। একদিন বেশ ঘটা করে বাজার থেকে গরুর গোশত কিনে আনলেন। শান্তি কমিটির একটা মিছিল বের হল। সেখানেও টুপি মাথায় তাঁকে দেখা গেল। দেশ স্বাধীন হবার পর ধীরেন কাকু আবার হিন্দু হয়ে গেলেন। তবে দাড়ি ফেললেন না। দাড়িতে তাকে বেশ ভালো মানায়, কেমন ঋষি–ঋষি লাগে।

ধীরেন কাকুকে বাসায় পেলাম না। কলে গেছেন। তাঁর বড় মেয়ে অতসীদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন, 'তুই বোস বীরু, বাবা এসে পড়বে। কার অসুখ?'

'পিতৃদেবের।'

'কী হয়েছে?'

'বক্কর-বক্কর করে কাশছে। মনে হচ্ছে লাংস ফুটো।'

'ছিঃ বীরু, বাবাকে নিয়ে কেউ এভাবে কথা বলে?'

অতসীদি এত কোমলভাবে কথাগুলো বললেন যে, সত্যি-সত্যি আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম। তিনি হয়তো খুব সাধারণভাবেই কথাগুলো বলেছেন। তাঁর চেহারা এবং গলার স্বরের জন্যেই সাধারণ কথাও অন্যরকম মনে হয়েছে। একজন স্নিগ্ধ চেহারার মেয়ের কর্কশ কথাও স্নিগ্ধ মনে হয়। অতসীদি এই ভোরেই গোসল সেরেছেন। তোয়ালে দিয়ে ভেজা চুল বাঁধা। চোখের দিকে তাকালে মনে হয় কিছুক্ষণ আগেই গাঢ় করে কাজল দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর কোনো কোনো মেয়েকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত করুণা করেন। চোখে জন্ম-কাজল পরিয়ে দেন।

'বীরু চা খাবি?'

'খাব।'

'চিনি নেই কিন্তু। বিনা চিনিতে।'

'বিনা চিনিতেই খাব।'

'নিয়ে আসছি, তুই বসে থাক। এ-রকম করে পা নাচাবি না তো, দেখতে বিশ্রী লাগে!'

আমি বসে থাকি। অনেক দিন পর আসছি ধীরেন কাকুর বাড়িতে। ছোটবেলায় খুব আসা হত। আমার মূল আকর্ষণ ছিল মিষ্টি। এই বাড়িতে এলেই অতসীদি বলতেন, 'হাতটা ধুয়ে আয়, সন্দেশ দেব। সাবান দিয়ে ভালো করে ধুবি, নয়তো দেব না।'

অতসীদির ছোট আরো তিন বোন ছিল। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। ধীরেন কাকু একেকজনকে কলকাতায় নিয়ে ঝামেলা পার করে এসেছেন। শুধু বড়জনকে পারেন নি। অথচ বড়জনই বোনদের মধ্যে সবচে সুন্দর। আমার মতে পৃথিবীর সবচে সুন্দর মেয়ে। শৈশবে প্রায়ই ভাবতাম, বড় হয়ে অতসীদিকে বিয়ে করব।

কে জানে মনে মনে হয়তো এখনো ভাবি, নয়তো তাঁকে দেখে এমন অস্থির লাগবে কেন?

চায়ের কাপ এবং একটা পিরিচে কী যেন একটা খাবার নিয়ে অতসীদি ঢুকলেন। রেশমের মতো কোমল গলায় বললেন, 'একটু মোহনভোগ এনেছি, খেয়ে দেখ্ তো। মিষ্টি বেশি হয়ে গেছে, তবে খেতে খারাপ না।'

'মোহনভোগ লাগবে না, তুমি চা দাও।'

'তোর চোখ এমন লাল হয়ে আছে কেন রে?'

'চোখে আলতা দিয়েছি, এর জন্য লাল হয়েছে।'

'দিন-দিন তোর কথাবার্তা খুব খারাপ হচ্ছে। গুণ্ডাপাণ্ডা হয়ে গেছিস। তোর সঙ্গে একটা ছেলে আসত না—টুকু নাম। ও দেখি খুব বদমাশ হয়েছে। মদটদ খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে। ঐ দিন রিকশা করে আসছি। আমাকে পেছন থেকে দেখেছে, চিনতে পারে নি। খুব খারাপ একটা কথা বলেছে। আমি রিকশা থেকে নেমে বললাম, কী হচ্ছে রে টুকু? ওম্নি পালিয়ে গেল। ও করে কী এখন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মেয়েদের হাত থেকে গলার হার, হ্যান্ডব্যাগ এইসব ছিনিয়ে নেয়।'

'তুই সবসময় এ রকম ঠাট্টা করিস কেন?'

'ঠাট্টা না। সত্যি কথা বলছি। ওর পেশা হচ্ছে ছিনতাই।'

আমি অতসীদির হাতে হাত রাখলাম। কী রকম ঠাণ্ডা একটা হাত! ধবধবে ফর্সা। তাকালেই পবিত্র একটা ভাব হয়।

অতসীদি হাত সরিয়ে নিলেন না। অন্য কোনো মেয়ে হলে নিত। অতসীদি অন্য কোনো মেয়ে নয় বলেই সহজ গলায় বললেন, 'তোর হাত এ-রকম হয়েছে কেন? রগ-ওঠা হাত। বানরের থাবার মতো লাগছে।'

'মনে হয় বানর হয়ে যাচ্ছি। আমাদের পূর্বপুরুষরা বানর থেকে মানুষ হয়েছিল, আমরা মানুষ থেকে বানর হয়ে ঋণ শোধ করছি।'

'সব সময় উল্টাপাল্টা কথা বলিস কেন? আচ্ছা শোন, টুকুর সঙ্গে তোর দেখা হয়?'

'হয় মাঝে-মাঝে।'

'একবার বলিস তো আমার কাছে আসতে। কী রকম ছোট্ট ছিল! সব সময় নাক দিয়ে সর্দি পড়ত।'

আমি চায়ের কাপ নামিয়ে হঠাৎ করে বললাম, 'একটা মজার কথা শুনবে অতসীদি?'

'তোর তো সব কথাই মজার, নতুন করে আর মজার কথা কি শোনাবি? সব মজার কথাই তো কয়েকবার করে শোনা।'

'এটা বিশেষ মজার।'

'বল্ শুনি।'

'আমি এবং টুকু—আমরা দু'জন ছোটবেলায় ঠিক করেছিলাম বড় হয়ে তোমাকে বিয়ে করব।'

অতসীদি খিলখিল করে হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে তাঁর চোখে পানি এসে গেল। তিনি সেই পানি মুছলেন না। কী অদ্ভুত দৃশ্য! অতসীদি হাসছে। আর টপটপ করে তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে।

'আমাকে বিয়ে করতে চাইতি কেন? মিষ্টি খাওয়ার লোভে?'

'জানি না। হয়তো।'

'আগে কোনোদিন আমাকে বলিস নি কেন?'

'বললে কী হত?'

অতসীদি জবাব দিলেন না। আবার হাসতে শুরু করলেন। তাঁর হাসির মাঝখানেই আমি বললাম, 'আমার কিন্তু এখনো তোমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করে।'

অতসীদির হাসি থেমে গেল। তিনি অবাক হয়ে তাকালেন। তাঁর চোখ দু'টি কী যে অদ্ভুত! মনে হয় জল থৈথৈ করছে। যেন এক্ষুনি কেঁদে ফেলবেন। কেঁদে ফেলবার মতো আমি কি কিছু বলেছি? অতসীদিকে এমন কিছু বলার প্রশ্নই ওঠে না।

অতসীদি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'সব সময় ঠাট্টা করা ভালো না বীরু।' বলেই তিনি মাথায় আঁচল তুলে দিলেন। হিন্দু মেয়েরা মাথায় আঁচল দিলে কেমন যেন লাগে।

'তুই চলে যা বীরু। বাবা এলে পাঠিয়ে দেব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতসীদি ছোট-ছোট পা ফেলে চলে গেলেন। রান্নাঘর থেকে খুটখুট শব্দ হতে লাগল। এ ছাড়া চারপাশ কি নীরব! আমি চলে গেলাম না। বসে বসে ধীরেন কাকুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ধীরেন কাকু এলেন অনেকক্ষণ পরে। তাঁকে যতবারই দেখি, ততবারই মনে হয় আগের চেয়ে বুড়ো হয়ে গেছেন। ক্লান্ত জরাগ্রস্ত মানুষের মতো চলাফেরা। কথাবার্তায়ও প্রাণের স্পর্শ বলে কিছু নেই। যেন একটা রোবট—যার ব্যাটারি ডাউন হয়ে যাওয়ায় কাজকর্ম শ্লথ হয়ে গেছে। তিনি আমাকে খুব ভালো করেই চেনেন, তবু বললেন, 'কে?'

'আমি। আমি বীরু।'

'ও, আচ্ছা। ঠিক আছে। কার অসুখ?'

'বাবার।'

'ও, আচ্ছা আচ্ছা। চল যাই। চল।'

ধীরেন কাকু ডাঙায় তোলা মাছের মতো ঘন-ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। তাঁকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার সুযোগ দেওয়া উচিত। আমি না থাকলে হয়তো অতসীদি বাবাকে পাখা দিয়ে হাওয়া করতেন। ঠাণ্ডা পানির গ্লাস এনে সামনে রাখতেন। ধীরেন কাকু রাস্তায় নেমেই নিচু গলায় বললেন, 'আমার নিজেরও শরীরটা খারাপ।'

ডাক্তাররা যখন বলেন, শরীরটা খারাপ তখন গোটা চিকিৎসা-শাস্ত্রটার উপর কেমন যেন সন্দেহের ভাব এসে পড়ে।

বাসায় ফিরে দেখি—অল কোয়ায়েট ইন দা ইস্টার্ন ফ্রন্ট। পূর্ব দিগন্ত নিশ্চুপ। বাবার বিখ্যাত কামান-দাগানো কাশি বন্ধ হয়েছে। তিনি বারান্দার ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন—চোখে-মুখে প্রশান্ত ভাব। শেভ করেছেন। চুল আঁচড়ানো হয়েছে। চায়ের কাপে টোস্ট ডুবিয়ে মুখে দিচ্ছেন। সামনে আজকের খবরের কাগজ। যে-রকম মনযোগের সঙ্গে কাগজ দেখছেন, তাতে মনে হচ্ছে আজও সম্ভবত তাঁর কোনো চিঠি ছাপা হয়েছে। নাগরিক কোনো সমস্যা নিয়ে জ্বালাময়ী কোনো চিঠি—ঝিকাতলা অঞ্চলে বখাটেদের যন্ত্রণা বিষয়ে কঠিন বক্তব্যের চিঠি।

ধীরেন কাকু বললেন, 'আবার কী হল?'

'ঐ কাশি। বড্ড বেড়েছিল। রাতে ঘুম হয় নি।'

'এখন কী অবস্থা?'

'এখন ভালোই। বয়স হয়েছে তো। বয়সের অসুখ।'

'ডায়াবেটিস আছে কি না দেখান। ইউরিনটা টেস্ট করেন।'

'হয়েছে কাশি, ইউরিন টেস্ট করাব কেন?'

'চেকআপের জন্য আর কী। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটার সঙ্গে একটার যোগ আছে।'

'কাশিটার কী করবেন?'

'ক্রনিক অসুখে কবিরাজী খুব কাজ করে। পুরোনো ঘি বুকে মালিশ করে দেখতে পারেন। আমার কাছে এক শ' বছরের পুরোনো ঘি আছে। পাঠিয়ে দেব।'

'ওষুধপত্র কিছু দেবেন না?'

'উহুঁ। ঘিটা মালিশ করে দেখেন। ওতেই আরাম হবে। উঠি তাহলে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে না, উঠবেন কী? বসেন, চা খান। কথাটথা বলি। মেয়ের বিয়ের কিছু হল?'

'নাহ্। দেখি, পূজার সময় কোলকাতায় যাব। আমার এক শ্যালক আছে ধর্মতলায়, তাকে চিঠি দিয়েছি। খোঁজখবর করছে।'

'দেশে কিছু হচ্ছে না?'

ধীরেন কাকু জবাব না-দিয়ে দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন। আমি চলে গেলাম নিজের ঘরে। আপাতত কিছু করার নেই। এক শ' বছরের পুরোনো ঘি আনবার জন্যে আরেকবার যেতে হবে। সেটা এখনই না আনলেও হবে। যে ঘি এক শ' বছর অপেক্ষা করতে পেরেছে, সে আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে পারবে।

টেবিলের উপর একটা চিঠি পাওয়া গেল। পারুল চিঠিটা এমনভাবে রেখেছে যেন চট করে চোখে না পড়ে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে চিঠি খুলে সে পড়েছে। খামের মুখ দ্বিতীয় বার বন্ধ করা। আমি বিরক্ত মুখে খাম খুললাম।

চিঠি পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে বিরক্তি কেটে গেল। গোপনে আমার চিঠি পড়ার জন্যে পারুলকে ক্ষমা করে দিলাম। খকখক কেশে আমার ঘুম ভাঙানোর জন্য ক্ষমা করলাম বাবাকে। জোর করে আমাকে ধীরেন কাকুর বাসায় পাঠাবার যে অপরাধ মা করেছেন, তার জন্য মাকেও ক্ষমা করা গেল।

"তোমার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে। খুবই জরুরি। তুমি সোমবার সকাল দশটা পাঁচ মিনিটে সায়েন্স ল্যাবোরেটোরির পুলিশ বক্সের সামনে অপেক্ষা করবে। আবার ভুলে যেও না। ইতি তোমার—এ"

তোমার—'এ' মানে তোমার এশা। এশা চিঠিপত্রে কখনো তার পুরো নাম লেখে না। যার কাছে চিঠি যাচ্ছে তার নামও থাকে না। এ ছাড়াও আরো কিছু ব্যাপার থাকে। যেমন, এই চিঠিতে সময় দিয়েছে দশটা পাঁচ মিনিট। দশটা লিখলেই হত, তা লিখবে না। গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য সঙ্গে পাঁচ মিনিট লাগিয়ে দিয়েছে। অপেক্ষা করবার জায়গাটাও চমৎকার—পুলিশ বক্সের সামনে। পুলিশ বক্সের সামনে কেউ অপেক্ষা করে?

কেউ করে না। কিন্তু এশা করে। তার স্বভাবই হচ্ছে অদ্ভুত কিছু করা। একবার সে বলল, 'বুড়িগঙ্গায় নৌকায় কিছু ভাতের হোটেল আছে, তুমি জান? খুবই নাকি ভালো রান্না। চল না, দু'জন মিলে খেয়ে আসি।'

যেতে হল। বুড়িগঙ্গায় নৌকার হোটেলে এশা মহানন্দে ভাত খেল। মোটা মোটা ভাত। টকটকে রঙের কী একটা মাছের ঝোল। ঝাল এমন দিয়েছে যে, চোখে পানি এসে যায়। কিন্তু এশার ধারণা, এমন চমৎকার রান্না সে জীবনে খায় নি। প্রতি সপ্তাহে একবার এসে খেয়ে যাওয়া উচিত।

ভাগ্যিস দ্বিতীয় বার তার এই শখ হয় নি। নৌকার খাবার খেয়ে আমার নিজের পেট নেমে গেল। ডায়ারিয়ার মতো হল।

আজ এশার কী পরিকল্পনা, কে জানে! আজই সোমবার। ভাগ্যিস চিঠিটা খুলেছিলাম। চিঠি পড়ার ব্যাপারে আমার আগ্রহ একটু কম। একবার একটা চিঠি এক সপ্তাহ পর খুলেছিলাম। খামের উপরের লেখাটা পছন্দ ছিল না বলে খোলা হয় নি।

দশটা বাজতে এখনো অনেক দেরি তবু আমার মনে হল, প্রস্তুতি পর্ব শুরু করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়া দরকার। বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে একটির পর একটি ঝামেলা লাগে। আজ বিশেষ দিন। ঝামেলা লাগবেই। দাড়ি কামাতে গিয়ে দেখব ব্লেডে ধার নেই। শার্ট গায়ে দেবার পর দেখা যাবে পেটের কাছের বোতাম নেই। সমস্ত বাড়ি খুঁজেও রুমাল পাওয়া যাবে না। কিংবা এর চেয়েও ভয়াবহ কিছু ঘটবে—মার কলিক পেন উঠবে এবং তাঁকে ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতেই মার কলিক পেন ওঠে। বাঁধা নিয়ম।

অনার্স সেকেন্ড পেপারের দিন এই অবস্থা। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে চোখ-টোখ উল্টে মা এমন এক নাটক শুরু করলেন, পরীক্ষা মাথায় উঠল। বাবা চিঁ-চিঁ করে বলতে লাগলেন, 'হাঁ করে দেখছিস কি? তোর মাকে হাসপাতালে নিয়ে যা।'

আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'আমার পরীক্ষা।'

বাবা চোখ লাল করে বললেন, 'চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব হারামজাদা। মানুষ মারা যাচ্ছে, আর বলে কী!'

প্রয়োজনের সময় কিছুই পাওয়া যায় না। একটা বেবি ট্যাক্সি জোগাড় করতে লাগল আধঘন্টা। সেই বেবি ট্যাক্সিও এমন যে, দু'মিনিট পরপর স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। ড্রাইভারকে কার্বুরেটার খুলে ময়লা পরিষ্কার করতে হয়। মেডিক্যাল কলেজের গেটে এসে মার কলিক পেন কমে গেল। তিনি বোকার মতো হাসতে লাগলেন।

আজও নিশ্চয়ই এ-রকম কিছু হবে। ঘর থেকে পা বাইরে ফেলবার সময় মা চিকন গলায় ডাকবেন, 'ওরে বীরু রে! গেলাম রে!'

আর আমার স্ত্রী-ভক্ত বাবা ব্যস্ত হয়ে উঠবেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে হাসপাতালে পাঠানোর জন্যে। তিনি নিজে কিন্তু যাবেন না। এর আগের বারও যান নি। হাসপাতালের ফিনাইলের গন্ধ তাঁর সহ্য হয় না। ডাক্তারদের দুর্ব্যবহার সহ্য হয় না। টেনশান সহ্য হয় না। কিছুই সহ্য হয় না।

ইদানীং হয়তো জীবনটাও অসহনীয় হয়েছে। সকাল এবং সন্ধ্যায় প্রবলবেগে খকখক করে তাই জানান দিচ্ছেন। আমি গুনগুন করে বললাম, 'আমরা কাশির শব্দে ঘুমিয়ে পড়ি, কাশির শব্দে জাগি।' পারুল আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে কঠিন চোখে তাকাল। আগেকার আমলের মুনি-ঋষিরা হয়তো ঠিক এরকম চোখের দৃষ্টি দিয়ে মানুষকে ভস্ম করে দিতেন।

আশ্চর্য কাণ্ড, দাড়ি কাটার পর্ব বিনা ঝামেলায় পার হল! থুতনির কাছের ভয়াবহ ব্রনটাকে আহত না-করে চমৎকার একটা শেভ করে ফেললাম। ইস্ত্রি করা একটা চেক শার্ট পাওয়া গেল যার সব ক'টি বোতাম অক্ষত। তোষক উল্টে একটা রুমাল পাওয়া গেল। মোটামুটি পরিষ্কার। ভদ্রসমাজে বের করলে কেউ সরু চোখে তাকাবে না।

মার কলিক পেন এখনো শুরু হয় নি। তিনি একতলার বারান্দায় চালের গুঁড়ো নিয়ে বসেছেন। মনে হচ্ছে ভাপা পিঠা হবে। ক'দিন আগে বাবা ভাপা পিঠার কথা কী যেন বলেছিলেন। এটা হচ্ছে তারই ফলোআপ। আমরা "ভাপা পিঠা, ভাপা পিঠা" বলে লক্ষবার চেঁচালেও কিছু হবে না, কিন্তু বাবা মুখ দিয়ে একবার উচ্চারণ করলেই অন্য ব্যাপার। টুনা-টুনীর গল্প আর কি। টুনা কহিল টুনী পিঠা তৈরি কর...।

আমি দোতলা থেকে খুব সাবধানে পা ফেলে নিচে নামলাম। সিঁড়িতে কে যেন দুধ ফেলে দিয়েছে, যে-কোনো মুহূর্তে রেলগাড়ি ঝমাঝম পা পিছলে আলুর দম হবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভাবনা।

বাবা বারান্দায়। গলায় মাফলার। কোলে খবরের কাগজ। হাতে লাল নীল পেনসিল। ইদানীং তিনি খবর আন্ডার লাইন করা শুরু করেছেন। হত্যা, রাহাজানি, ধর্ষণ এইসব লাল রঙে দাগাচ্ছেন, পলিটিক্যাল খবরগুলো নীল রঙে। আমার জন্যে বেশ সুবিধা হয়েছে। আমি দাগ দেয়া খবর বাদ দিয়ে কাগজ পড়ি। পলিটিক্স–ফলিটিক্স আমার ভালো লাগে না।

বাবা চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকালেন। এমনভাবে তাকালেন যেন আমাকে চিনতে পারছেন না, তবে চেনা–চেনা লাগছে। তিনি গলা পরিষ্কার করলেন। ঠিকমতো পরিষ্কার হল না। কফ–জমা ভারি স্বরে বললেন, 'আমার জিনিসটা নিয়েছিস?'

'আপনার কোন জিনিস?'

'ইউরিন স্যাম্পল। সুগার আছে কি না দেখবে। বাথরুমের তাকে আছে। একটা পলিথিন পেপার দিয়ে মুড়ে নিয়ে যা।

আমি স্তম্ভিত। যাচ্ছি এশার কাছে পকেটে থাকবে পলিথিনে মোড়া ইউরিন স্যাম্পল। পিতৃদেবের মূত্র।

'অন্য কাউকে দিয়ে পাঠান বাবা, আমি একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি। খুবই জরুরি।'

'আমার কাজটা তাহলে তোমার কাছে তেমন জরুরি মনে হচ্ছে না? ভালো, ভালো, খুবই ভালো।'

বাবার মুখ অন্ধকার। চশমা আরো খানিকটা ঝুলে পড়েছে। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে জ্যেষ্ঠ পুত্রের হৃদয়হীনতায় তিনি মর্মাহত। আমি ইতস্তত করে বললাম, 'বাবলুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিন বাবা, ও ছাদে ক্যারাম খেলছে।'

বাবা খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাকে পাঠাব তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি তোমার অত্যন্ত জরুরি কাজটি সেরে আস।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।'

'তোমাকে নিতে হবে না।'

'আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন কেন?'

'তোমার সঙ্গে আমি এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বলতে চাই না।'

আমি খুব আহত হবার ভান করে বললাম, 'যাচ্ছি একটা চাকরির ব্যাপারে। পকেটে ইউরিন–ফিউরিন এই জন্যেই নিতে চাচ্ছিলাম না। না বুঝেই রাগ করেন।'

লক্ষ করছি, বাবা অপ্রস্তুত বোধ করতে শুরু করেছেন। মুখ কেমন লম্বা ধরনের হয়ে যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে বোকাটে। তিনি নিচু গলায় বললেন, 'কিসের ইন্টারভ্যু?'

বেক্সিমকো বলে একটা কোম্পানি।

'তোর তো এমএ–র রেজাল্টই এখনো হয় নি!'

'রেজাল্টের আশায় বসে থাকলে আরো তিন বছর লাগবে। এখনো ভাইভা হয় নি। ভাইভা হবে, তারপর টিচাররা দয়া করে খাতা দেখবেন, আবার এক মাস ঘুম। তারপর চলে যাবেন বিদেশ। আর তাঁর কোনো খোঁজখবর পাওয়া যাবে না। আমাদের রেজাল্টও বন্ধ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা তাঁর মুখ করুণ করে ফেললেন। বেচারাকে দেখে এখন মায়াই লাগছে। পুত্রের প্রতি সহানুভূতিতে তাঁর হৃদয় আর্দ্র।

'ইউরিন স্যাম্পলটা কোথায় রেখেছেন বাবা? বাথরুমের তাকে?'

'থাক থাক। তোকে নিতে হবে না।'

'কোনো অসুবিধা নেই।'

'আহা, বললাম তো নিতে হবে না! যাচ্ছিস একটা শুভ কাজে।'

আমি প্রায় জোর করেই ইউরিন স্যাম্পল নিয়ে নিলাম। অপরাধবোধে বাবা এখন জর্জরিত। সারাক্ষণ অস্বস্তিতে ভুগবেন। দুপুর বেলা ভালো করে খেতেও পারবেন না। অথচ আর একটু হলেই উল্টো ব্যাপার ঘটত। আমি যদি বোতলটা না নিয়ে আসতাম, তাহলে অপরাধবোধ আমাকে কাবু করে ফেলত। বারবার মনে হত, বুড়ো বাবার সামান্য একটা কাজ!

ঘর থেকে পা ফেলবার ঠিক আগ-মুহূর্তে মা বললেন, 'ধীরেন বাবুর কাছ থেকে পুরোনো ঘিটা দিয়ে যাস তো বাবা।'

'এক্ষুনি লাগবে?'

'হুঁ। বুক ঘড়ঘড় করছে। মালিশ করে দেব।'

'আমি তো তেমন কোনো ঘড়ঘড় শুনতে পেলাম না।'

'যা বাবা নিয়ে আয়, কতক্ষণ আর লাগবে?'

মার চোখ এখন দেখাচ্ছে অবিকল গরুর মতো। ছলছল করছে, যেন এক্ষুনি পানি উপচে পড়বে। চোখের এই আবেগ অগ্রাহ্য করা অত্যন্ত কঠিন। তবে ইদানীং অনেক কঠিন কাজ বেশ সহজ ভঙ্গিতে করতে পারছি। আমি মার দিকে না তাকিয়ে বললাম, 'বিকেলে ফেরার পথে নিয়ে আসব। তুমি কোনো চিন্তা করবে না। বাবার কামান দাগা সন্ধ্যার আগে শুরু হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

মা আমার সঙ্গে-সঙ্গে আসছেন। তার মানে মার পেটে আরো কিছু কথা রয়ে গেছে। ঘর থেকে বেরুবার পর তিনি তা উগরে দেবেন। কী বলবেন তাও আঁচ করতে পারছি। নাখালপাড়া যেতে বলবেন। আজ মাসের চব্বিশ। এই সময়ে আমাকে নাখালপাড়া যেতে হয়। আমার বড় বোনের শ্বশুরবাড়ি। তার কাছ থেকে কিছু টাকাপয়সা আনতে হয়। পরের মাসের তিন-চার তারিখে আমাকেই সেটা ফেরত নিয়ে যেতে হয়। গত মাসে টাকা ফেরত দেওয়া হয় নি, আবার এ মাসে যাওয়া!'

'বাবা বীরু।'

'বলে ফেল।'

'অনুর কাছে আজ একবার যেতেই হবে। তিন শ' টাকা নিয়ে আসবি। বাবা, মানিক।'

'পাগল হয়েছ মা! আগামী এক সপ্তাহ নাখালপাড়ার দিকে যেতে পারব না।'

'একটা পয়সা ঘরে নেই।'

'বাবাকে বল—বাবার দায়িত্ব। সংসার চালানোর দায়িত্ব তোমাকে মাথায় নিতে কে বলেছে?'

মাকে দ্বিতীয় কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আমি রাস্তায় নেমে পড়লাম। চমৎকার একটা দিন। ঝকঝকে রোদ। বাতাস মধুর এবং শীতল। এই বাতাস আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারাদিনেও হয়তো তেতে উঠবে না। তবে এশাকে না পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা। তখন সবই অসহ্য বোধ হবে।

'এই বীরু, যাচ্ছিস কোথায়?'

আমি কয়েক মিনিট চিন্তা করলাম, জবাব দেব কী দেব না। টুকু নর্দমার পাশে পেচ্ছাব করতে দাঁড়িয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে সেখান থেকেই কথা বলছে। তার ছোটখাটো মুখে বিশাল এক গোঁফ। কুৎসিত দেখাচ্ছে।

'ব্যাপার কী, সাউন্ড দিচ্ছিস না কেন? যাচ্ছিস কোথায়?'

'ঠিক নেই কিছু।'

'তোর কাছে দশটা টাকা হবে নাকি?'

'না।'

'পাঁচটা হবে কি না দেখ্। শালা পকেট একেবারে ইয়ে।'

'হবে না।'

'তাহলে একটা সিগারেট খাওয়া দোস্ত। রিকোয়েস্ট।'

আমি দুটো সিগারেট কিনলাম। সিগারেট দিয়ে যদি সহজে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এই আশাতেই কেনা। টুকু ছোঁ মেরে সিগারেট নিয়ে হাসিমুখে বলল, 'একটা চায়ের পয়সা দিয়ে যা দোস্ত। তোর পায়ে ধরি।'

টুকু সত্যি-সত্যি পা ধরতে এল। গুণ্ডামি করলেও টুকু জাতে ওঠে নি। কেউ তাকে পাত্তা দেয় না। বিনা পয়সায় চা-সিগারেট খাওয়ায় না। নগদ পয়সা দিতে হয়।

'দোস্ত, আমার রিকোয়েস্টটা রাখ্। একটা পাত্তি ছেড়ে দে।'

'তুই অতসীদিকে কী বলেছিলি?'

টুকু দপ করে নিভে গেল। মুখ আমশি করে বলল, 'মিসটেক হয়ে গেছে, বুঝতে পারি নি। আমি ভাবলাম নতুন কেউ। এমন লজ্জা পেয়েছি! আর বলিস না। রাতে ঘুম হয় নি।'

'অতসীদি তোকে যেতে বলেছে।'

'সত্যি?'

'হুঁ।'

'যাব কী করে, বল?'

'হেঁটে হেঁটে যাবি। আর কীভাবে যাবি? তোর জন্যে পালকি লাগবে?'

'অতসীদি আর কী বলল?'

'উনি আর কিছু বলেন নি—আমি বললাম।'

'কী বললি?'

'বললাম, তুই ঠিক করে রেখেছিলি বড় হয়ে অতসীদিকে বিয়ে করবি।'

টুকু ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে তাকে।

'আর কী বললি?'

'জিজ্ঞেস করল, তুই আজকাল কী করিস। আমি বললাম, ছিনতাইয়ের কাজ করে। পার্ট-টাইম কাজ। ফুল-টাইম কাজ হচ্ছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা, পরিচিত কাউকে পেলে ভিক্ষা চাওয়া।'

'ব্লাফ দিচ্ছিস, ঠিক না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ব্লাফ দেব কেন, ব্লাফ দেবার আমার দরকারটা কি? হাত ছাড়, আমার জরুরি কাজ আছে।'

টুকু আমার হাত ছাড়ল না সঙ্গে-সঙ্গে আসতে থাকল। তার গা থেকে বিকট গন্ধ আসছে। আমি বললাম, 'আজকাল গাঁজা খাচ্ছিস নাকি? গন্ধে নাড়িভূঁড়ি উল্টে আসছে।'

টুকু বিড়বিড় করে বলল, 'কী যে বলিস দোস্ত! ভদ্রলোকের ছেলে না আমি? সস্তার সিগারেট, এই জন্যেই গায়ে গন্ধ হয়ে গেছে। আচ্ছা দোস্ত, সত্যি কথাটা বল্, অতসীদি কি যেতে বলেছে?'

'হুঁ।'

'ঐদিনের ব্যাপারটায় মাইন্ড করেছে, তাই না?'

'হুঁ। এখন হাত ছাড়্। তুই আমার হাত গান্ধা বানিয়ে ফেলেছিস। অতসীদির কাছে যাবার আগে গরম পানি দিয়ে গোসল করিস।'

টুকু হাত ছেড়ে দিয়ে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল। চায়ের পয়সা চাইল না। তার মুখের সিগারেটও নিভে গেছে। সে তা বুঝতে পারছে না। নেভানো সিগারেট প্রাণপণে টানছে। আমি বললাম, 'কী যন্ত্রণা, এখনো সঙ্গে-সঙ্গে আসছিস কেন?' টুকু ফিসফিস করে বলল, 'হাজার পাঁচেক টাকা জোগাড় করে এনে দিতে পারবি? এক মাসে ডাবল করে রিটার্ন দেব। আপ অন গড।'

'করবি কী টাকা দিয়ে?'

'কাউকে বলিস না দোস্ত। একটা পিস্তল কিনব। জার্মান জিনিস।'

'তোর দৌড় ব্লেড পর্যন্ত। পিস্তল দিয়ে করবি কী? হাত ছাড়্।'

টুকু হাত ছেড়ে দিয়ে আবার রাস্তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ব্যাটার বহুমূত্র হয়েছে কি না কে জানে। সব সময় দেখি রাস্তার পাশে প্যান্টের জিপার খুলে দাঁড়িয়ে আছে।

AMARBOI.COM

পুলিশ বক্সের সামনে এশা নেই।

মৈনাক পর্বতের সাইজের এক পুলিশ অফিসার পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন সে চাচ্ছে, এ-শহরের সবাই তার দু' পায়ের ফাঁক দিয়ে হামাগুড়ি দিক। সার্জেন্টের হাতে ওয়াকি টকি। কার সঙ্গে যেন খোশগল্প করছে। ঘন-ঘন বলছে, 'আরে ব্যাটা বুদ্ধু, সহজ কথা বুঝলি না?' আমার জায়গায় মাসুম হলে পুলিশ সার্জেন্টকে দুম করে এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসত। হয়তো বলত, 'এই যে ব্রাদার, আপনি এত মোটা কী করে হলেন, কাইন্ডলি আমাকে বলবেন?' অ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্টে প্রশ্নটা করছি। আমি ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশনের ছাত্র। প্রশ্ন শুনে সার্জেন্টের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যেত। জবাব দেবার আগেই মাসুম দ্বিতীয় প্রশ্ন করত। সেটি হত প্রথমটির চেয়েও ভয়াবহ।

পাবলিক লাইব্রেরিতে মাসুমের সঙ্গে গিয়েছি। মাসুমের কাজে। লাইব্রেরির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। কী একটা বই সে ঘন্টা খানিক ধরে খুঁজল। না পেয়ে মহা বিরক্ত। বিরক্তি কাটাবার জন্যেই বোধহয় আমাকে বলল, 'চল লাইব্রেরিয়ান ব্যাটাকে ভড়কে দিই।' গেলাম তার সঙ্গে। লাইব্রেরিয়ান বেচারা বুড়ো মানুষ। কেমন ভালোমানুষ ভালোমানুষ চেহারা। মাসুম তাঁর কাছে গিয়ে নিচু গলায় বলল, 'স্যার, মানুষ খুন করার সহজ পদ্ধতি, এই জাতীয় কোনো বইপত্র আছে? আমাদের বিশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরকার।'

লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছেন। কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। মাসুম গলার স্বর আরো খানিকটা নামিয়ে বলল, 'ছুরি, বোমা দিয়ে মানুষ মেরে তো স্যার কোনো থ্রিল নেই। আমরা চাচ্ছি নতুন ধরনের কিছু। হাইলি সাইন্টিফিক ধরনের। মডার্ন।'

মাসুমের মতো কিছু-একটা করতে ইচ্ছে হচ্ছে। দু' পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশটাকে আর সহ্য করা যাচ্ছে না। আমি পুলিশ অফিসারটিকে চমকে দিয়ে বললাম, 'আচ্ছা ভাই, এখানে কি একটি মেয়েকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন?'

পুলিশ সার্জেন্ট সত্যি-সত্যি চমকাল। অবাক হয়ে বলল, 'আমাকে বলছেন?'

'হ্যাঁ, আপনাকে। লম্বা একটা মেয়ে কোঁকড়ানো চুল। সাধারণত তার কাঁধে চটের একটা ব্যাগ ঝোলানো থাকে। পুলিশ-বক্সের সামনে তার অপেক্ষা করার কথা।'

'এত জায়গা থাকতে পুলিশ-বক্সের সামনে কেন?'

'পুলিশদের আশেপাশে ঝামেলা কম থাকে, এই জন্যেই বোধহয়। আপনি তাহলে দেখেন নি?'

লোকটি হেসে ফেলল। বেশ অন্তরঙ্গ হাসি। হাসতে-হাসতেই বলল, 'চা খাবেন?'

এবার আমার চমকাবার পালা। এ আমাকে চা খেতে বলছে কেন? যেভাবে বলছে, তাতে মনে হচ্ছে না ঠাট্টা করছে।

'আমি আপনাকে চিনি, আপনার নাম বীরু। শহীদুল্লাহ হলে আপনি রুম নাম্বার দুই হাজার তিরিশে মাঝে-মাঝে ঘুমাতেন।'

'এখনো ঘুমাই।'

'পাস করেন নি?'

'পরীক্ষাই হয় নি, পাস করব কীভাবে? ইউনিভার্সিটি থেকে বেরুতে আগে চার বছর লাগত, এখন দশ-বার বছর লাগে। আপনি কি শহীদুল্লাহ হলে ছিলেন নাকি?'

'জ্বি। দুই হাজার তেইশে। অনার্স কমপ্লিট করে ঢুকে গেলাম পুলিশে। সারদায় দু'বছর ট্রেনিং নিয়ে এখন সার্জেন্ট।'

'ভালো করেছেন।'

'একটু দাঁড়ান, চা নিয়ে আসছি। বাসা থেকে ফ্লাস্কে করে নিয়ে আসি। চা খেতে খেতে অপেক্ষা করুন, এর মধ্যে হয়তো আপনার রোগা লম্বা, চটের ব্যাগ কাঁধের মেয়ে চলে আসবে।'

বাসায় তৈরি চা, কিন্তু দোকানের চায়ের চেয়েও বিস্বাদ। তার উপর ঠাণ্ডা মেরে আছে। এ-রকম একজন জবরদস্ত পুলিশ সার্জেন্টের চোখের সামনে চা ঢেলে রাস্তায় ফেলে দেওয়া ঠিক হবে না। আমি বিরক্ত মুখে চায়ে চুমুক দিচ্ছি। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, যদি এশার দেখা পাওয়া যায়।

'বীরু সাহেব।'

'জ্বি, বলুন।'

'আপনারা এখনো এম.এ. পাশ করতে পারেন নি, ভাবাই যায় না। আমি চাকরিতে জয়েন করে ভালোই করেছি, কী বলেন?'

'খুব ভালো করেছেন। মিলিটারিতে ঢুকতে পারলে আরো ভালো করতেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঠাট্টা করছেন?'

'হ্যাঁ ভাই, করছি। পুলিশের সঙ্গে ঠাট্টা করে দেখলাম কেমন লাগে।'

সে হেসে ফেলল। তাকে এখন আর আগের মতো ভয়াবহ মনে হচ্ছে না। তার দাঁড়িয়ে থাকার যে–ভঙ্গিটি এতক্ষণ অসহ্য মনে হচ্ছিল, এখন সেটাকেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে পুলিশদের এভাবেই দাঁড়াতে হয়।

'বীরু সাহেব।'

'জ্বি, বলুন।'

'খুব টেনশনের চাকরি। টেনশনে শরীর ফুলে এ–রকম হয়েছে।'

'বলেন কী! আমার তো ধারণা ছিল উল্টোটা হয়।'

একেক জনের বেলায় একেক রকম হয়। টেনশনে হরমোন ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যায়, তার থেকে এই হয়। কেউ শুকিয়ে যায়, কেউ আমার মতো হয়।'

'বাহ্ ইন্টারেস্টিং তো!'

'আমি যদি কিছু নাও খাই, ফুলতে থাকব। এই যে এত বেলা হয়েছে, আমি কিন্তু চার কাপ চা ছাড়া কিছু খাই নি। ভাত খেতে খেতে দু'টা বেজে যাবে।'

'খিদে লাগে না?'

'লাগে না আবার! এখন মনে হচ্ছে একটা বেবি ট্যাক্সি খেয়ে ফেলি। হা হা হা।'

আমি হাসিতে যোগ দিলাম না। এশার উপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। এ–রকম করার মানে কি? কতক্ষণ আমি অপেক্ষা করব? শহীদুল্লাহ হলের এই প্রাক্তন ছাত্র মনে হচ্ছে অতিরিক্ত রকমের মাইডিয়ার। তার তেলতেলে ধরনের ব্যবহার এখন আর ভালো লাগছে না। ভাড়া ঠিক না–করেই আমি একটা খালি রিকশায় উঠে বললাম, 'চলি, কেমন?'

'আবার আসবেন। সকালবেলায় আমি এইখানেই থাকি। আর যদি আমাকে না দেখেন, তাহলে জিজ্ঞেস করবেন—সার্জেন্ট শামসুদ্দিন কোথায়? ওরা ওয়াকি টকিতে ইনফরমেশন দিয়ে দেবে।'

আমি হেসে ফেললাম। সার্জেন্ট শামসুদ্দিন এমনভাবে কথা বলছে, যে শিগগিরই আমি তার বিরহে ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসব পুলিশ–বক্সে। ওয়াকি টকির চল্লিশ মাইল ব্যাসার্ধে বারবার বলা হবে, "সার্জেন্ট শামসুদ্দিন, আপনার বন্ধু আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন, চলে আসুন। হ্যালো, হ্যালো, সার্জেন্ট শামসুদ্দিন..."।

'বীরু সাহেব!'

'জ্বি বলুন।'

'আবার দেখা হবে, কেমন?'

'তা তো হবেই। মিছিল নিয়ে যখন আসব তখন দেখা হবে। পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দেব।'

সার্জেন্ট শামসুদ্দিনের মুখ কেমন হয়ে গেল। সে যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। বিড়বিড় করে বলল, 'এসব কী বলছেন ভাই!'

'সত্যি কথাই বলছি। দি ট্রুথ। আমরা আপনাদের পেটাব, আপনারা আমাদের। আমরা ঢিল ছুঁড়বো। আপনারা আমাদের উপর ট্রাক তুলে দেবেন। টিয়ার গ্যাস, গুলি এইসব চলবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমাদের এ–সব বলছেন কেন? আমাদের দোষটা কোথায়?'

'ঠাট্টা করছি রে ভাই, ঠাট্টা। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে রসিকতা।'

'ও তাই বলুন।'

সার্জেন্ট শামসুদ্দিন হেসে ফেলল। তার দাঁতগুলো চমৎকার। টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন হয়। নতুন ধরনের কোনো বিজ্ঞাপন কি দেয়া যায় না? একজন পুলিশ সার্জেন্ট টুথব্রাশ হাতে নিয়ে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিচে লেখা—"শান্তির এই প্রহরীর হাসিটিও প্রশান্তির। কারণ ইনি ব্যবহার করেন পিয়া টুথপেস্ট। পিয়া টুথপেস্ট এখন নতুন মোড়কে পাওয়া যাচ্ছে।"

বাতাস আর মধুর মনে হচ্ছে না। রোদ ঝাঁ–ঝাঁ করছে। আকাশ ধূসর বর্ণ। কড়া রোদে আকাশ ধূসর হয়ে যায়। তাকালেই বমি–বমি ভাব হয়। এশা সঙ্গে থাকলে এই ধূসর আকাশই হয়তো অন্যরকম লাগত। আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম—এশার সঙ্গে অনেক দিন পরপর আমার দেখা হয়।

রিকশাওয়ালা ঘাড় ঘুরিয়ে বারবার আমাকে দেখছে। সার্জেন্টের সঙ্গে আমার খাতির দেখে সম্ভবত আক্কেল গুড়ুম হয়েছে। ভাড়া নিয়ে কোনো ঝামেলা করবে না। যা দেব তাই সোনা মুখ করে নেবে। অনেক দিন ধরেই পকেটে একটা তাপ্পি মারা পাঁচ টাকার নোট পড়ে আছে। চালানো যাচ্ছে না। এই রিকশাওয়ালার উপর একটা অ্যাটেম্পট নেয়া যেতে পারে।

'স্যার, কই যাইবেন?'

তাই তো, কোথায় যাওয়া যায়! রিকশায় উঠলেই আমার একটা সমস্যা হয়। হঠাৎ মনে হয় আমার যেন কোথাও যাবার জায়গা নেই। বাসে এই সমস্যা নেই। বাসের একটা নির্দিষ্ট গন্তব্য আছে। রিকশার নেই। রিকশায় উঠে গন্তব্যের কথা বলে দিতে হয়।

'স্যার, কোন দিকে যাইবেন?'

'আরে বাবা, তুমি চালাও না! এত অস্থির হয়ে গেলে কেন?'

রিকশাওয়ালা ঘাড় ফিরিয়ে কুৎসিত চোখে আমাকে দেখল, যেন আমরা একে অন্যের শত্রু। তারপর প্যাডেল চাপতে লাগল নিতান্ত অনিচ্ছায়। এক শত্রু অন্য শত্রুকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—ব্যাপারটা মন্দ নয়। আমি সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগলাম, কোথায় যাওয়া যায়। যাত্রাবাড়ির দিকে গেলে কেমন হয়? যাত্রাবাড়ি হচ্ছে এশাদের বাড়ি। এশার বাবা অন্য এক জনের জমি জবরদখল করে দু'তিনটা ঘর তুলে দিব্যি আছেন। হাফ বিল্ডিং। পাকা দেয়াল। উপরে টিন।

যাত্রাবাড়িতে গেলে এশাকে অবশ্যি পাওয়া যাবে না। এশা এমন মেয়ে, যাকে কোথাও পাওয়া যায় না। ওদের নিজের বাড়িতে তো নয়ই। আমি কখনো গিয়ে পাই নি।

রাত দশটায় একবার ওদের বাড়িতে গিয়ে শুনি, এশা এখনো ফেরে নি। কোথায় গিয়েছে কেউ বলতে পারে না। একটি মেয়ে যে এত রাত পর্যন্ত বাইরে, তা নিয়েও কাউকে চিন্তিত মনে হল না। এশার বাবা বিকট একটা হাই তুলে বললেন, 'তোমার খুব দরকার থাকলে অপেক্ষা কর, চলে আসবে।'

'কোথায় গেছে সে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বলে যায় নি তো!'

'এত রাতে একা–একা ফিরবে?'

তিনি নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, 'কেউ দিয়ে যাবে নিশ্চয়ই।'

বিন্দুমাত্র উদ্বেগ আমি লোকটার মধ্যে দেখলাম না, যেন এশা রাতে বাড়ি না–ফিরলেও তাঁর ঘুমের তেমন অসুবিধা হবে না।

'কি, তুমি চলে যাবে, না থাকবে?'

'বসি কিছুক্ষণ।'

'তুমি কি ওর সঙ্গে পড়?'

'জ্বি।'

'ভালো খুব ভালো।'

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। এ–বাড়িতে অপেক্ষা করাও যন্ত্রণা। বসার ঘরটা খুপরির মতো ছোট। ভাদ্র মাসের অসহ্য গরম। ঘরের আধখানা জুড়ে এক চৌকি। সেই চৌকিতে আশ্রয় নিয়েছেন লোমশ শরীরের এক ভদ্রলোক। ঘুমিয়ে পড়েছেন কি না বোঝা যাচ্ছে না। নাকের ডাক শোনা যাচ্ছে। আবার এদিকে দেখি হাত পাখাও চলছে। ভদ্রলোকের পাশে এশার সবচে ছোট বোনটি। তার মাথার নিচে বালিশ নেই। কাঁথা গুঁজে বালিশের মতো করে দেওয়া। মেয়েটি গরমে ঘুমুতে পারছে না। মাঝে–মাঝে উঠে বসছে।

রাত এগারটায় এশার বাবা একটা ভেজা গামছা গায়ে জড়িয়ে বসার ঘরে ঢুকে বললেন, 'তুমি চলে যাও, আজ বোধহয় ও আসবে না।'

'আসবে না তো যাবে কোথায়?'

'মীরপুরে ওর খালার বাড়ি। মনে হচ্ছে, ওখানেই থেকে যাবে। মাঝে–মাঝে রাত বেশি হলে থেকে যায়।'

'খবর দেয় না?"

'কীভাবে দেবে, ও বাড়িতে কি টেলিফোন আছে?'

'আপনার চিন্তা হচ্ছে না?'

ভদ্রলোক এমনভাবে তাকালেন যেন আমার বেয়াদবিতে স্তম্ভিত হয়েছেন। তিনি কী বলবেন মনে–মনে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। খুব রেগে গেলে মানুষ মজার–মজার সব কথা বলে। অবশ্যি ভদ্রলোক মজার কিছু বললেন না। বড় রকমের একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাড়ি চলে যাও, নয়তো বাস পাবে না। লাস্ট বাস সাড়ে এগারটায়।'

বাস সত্যি–সত্যি পেলাম না। তিন মাইলের মতো হেঁটে একটা রিকশা জোগাড় করতে হল। রিকশায় ওঠামাত্র রিকশাওয়ালা যে কথা বলল, তার সারমর্ম হচ্ছে—"কলেজ গার্ল" লাগবে কি না। তার সন্ধানে প্রচুর "কলেজ গার্ল" আছে। ভালো ফ্যামিলির মেয়ে। অভাবে পড়ে এই লাইনে এসেছে।

আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। রিকশাওয়ালা আমার জন্যে "কলেজ গার্ল" জোগাড় করে ফেলেছে এই জন্যে নয়। এরা একটা চক্রের সঙ্গে আছে। এদের হাতে যেমন "কলেজ গার্ল" আছে, তেমনি গুণ্ডাপাণ্ডাও আছে। পেটে ছুরি বসিয়ে আমাকে নর্দমায় ফেলে দেওয়া এদের কাছে ছেলেখেলা। আমি রিকশাওয়ালাকে খুশি রাখবার জন্যেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরাসরি না বললাম না। বললাম, 'খরচপাতি কীরকম লাগবে?'

'রেইট হইল গিয়া আফনের ঘন্টা হিসাবে। পঞ্চাশ আছে, ষাইট আছে, আবার ধরেন গিয়া এক শ' আছে। যেমুন জিনিস তেমুন দাম।'

'আরে সর্বনাশ, আমার কাছে আছেই মাত্র দশ টাকা। আরেক দিন আসা যাবে।'

'বাস স্ট্যান্ডের বগলে দোকানে আমার নাম কইয়েন, তাইলে খবর পাইবেন।'

'কি নাম তোমার?'

'বদিউল।'

'ঠিক আছে বদিউল, তোমাকে খুঁজে বের করব। দু'একদিনের মধ্যেই আসব। তবে খরচপাতি অনেক বেশি।'

'সেইটা আমি দেখমু। খরচপাতির জইন্যে চিন্তা করবেন না।'

আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যাত্রাবাড়ির দিকে আর আসছি না।

বদিউল নামের রিকশাওয়ালা আমাকে চিনে ফেলতে পারে। চিনে ফেললে হয়তো চেপে ধরবে। ঘন্টা হিসেবে এক জন "কলেজ গার্ল" জুটিয়ে দেবে। সেই কলেজ গার্ল নিয়ে আমি করব কী? যাব কোথায়? ঢাকা শহর গিজগিজ করছে মানুষে। একটা গর্ত খুঁড়লে সেই গর্ত দেখার জন্যে হাজার-হাজার মানুষ জমে যায়। একটা মাইক ফিট করে হ্যালো ওয়ান টু থ্রি বললে চার-পাঁচ হাজার লোক দাঁড়িয়ে যায়। এখানে নিরিবিলি কোথায় যে কলেজ গার্লের সঙ্গে দু'একটা মিষ্টি কথা বলব? এশার সঙ্গে তিন বছর ধরে আমার পরিচয়, এখনো একটু নিরিবিলি পাই নি যে, হাত ধরে গাঢ়স্বরে দু'একটা কথা বলব কিংবা ঠোঁট এগিয়ে নিয়ে যাব। ভালবাসার মেয়েকে চুমু খেতে কেমন লাগে কে জানে?

AMARBOI.COM

৪

আমার এই রিকশা নিশ্চয়ই যাত্রাবাড়ি পর্যন্ত যাবে না। তবু একবার জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। আমি বললাম, 'এই, যাত্রাবাড়ি যাবে?'

'না।'

'না কেন? যাত্রাবাড়িতে অসুবিধা কি?'

'যামু না—যামু না। ব্যাস ফুরাইল।'

'এত সহজে ফুরালে তো হবে না। কেন তুমি যাবে না সেটা বল।'

রিকশাওয়ালা রিকশা থামিয়ে আমার দিকে তাকাল। লোকটা বয়সে সম্ভবত আমার বাবার কাছাকাছি। তাকাচ্ছেও আমার বাবার মতো করে, যেন আমার আচরণে মর্মাহত। আমাকে নিয়ে কী করবে বুঝতে পারছে না। রাগে যে সে কাঁপছে তা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। এক জন মানুষকে রাগিয়ে-রাগিয়ে ব্রেকিং পয়েন্টে নিয়ে যাওয়ার একটা আলাদা মজা আছে। আমি অনেকটা সময় নিয়ে সিগারেট ধরালাম। কায়দা করে ধোঁয়া ছাড়লাম এবং বরফ-শীতল গলায় বললাম, 'চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছ কেন? বল, তুমি কেন যাবে না?'

'রিকশা বদলির টাইম হইছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ও, এই ব্যাপার। আমি ভাবলাম আমাকে বোধহয় তোমার পছন্দ হচ্ছে না, এই জন্যে যেতে চাচ্ছ না। আচ্ছা এখন বল রিকশা বদলির কথাটা তুমি আগে কেন বললে না।'

'কি কইলেন?'

'রিকশা বদলির টাইম হয়েছে এই কথাটা তুমি আগে কেন বললে না। আগে বলতে কি অসুবিধা ছিল?'

'এমুন করতাছেন ক্যান ভাইজান? আমি আপনেরে কী করছি?'

লোকটির গলা শুনে মনে হল সে এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে। এই শ্রেণীর লোকরা ব্রেকিং পয়েন্টে এসে রুখে দাঁড়ায়। এর বেলায় অন্যরকম হচ্ছে। এ কেঁদে ফেলতে যাচ্ছে। শহরের খাঁটি রিকশাওয়ালা সে এখনো হয়ে ওঠে নি। হয়তো কিছুদিন আগেও পান্তাভাত খেয়ে সূর্য ওঠার আগে জমি চাষ করতে যেত। এর গায়ে এখনো শস্যের গন্ধ লেগে আছে। আমি রিকশা থেকে নেমে পকেটে হাত দিলাম। তাপ্পি মারা নোট, না তাকে আমি চকচকে নোটই দেব। যা ন্যায্য ভাড়া, তার সঙ্গে বকশিশ হিসেবে দু'টি টাকা ধরে দেব।

রিকশাওয়ালা ভাড়া নিল না। পকেট থেকে হাত বের করবার আগেই সে দ্রুত প্যাডেল চাপতে শুরু করল। একবারও পিছনে ফিরল না। "এ্যাই এ্যাই" করে দু' বার তাকে আমি ডাকলাম। সে আমাকে পুরোপরি উপেক্ষা করে বিপজ্জনকভাবে একটা বেবি ট্যাক্সিকে ওভারটেক করল। এই রিকশাওয়ালাটা অভিমানী। কে জানে। হয়তো ইতিমধ্যে তার চোখে পানি এসে গেছে।

এই রিকশাওয়ালার সঙ্গে নিশ্চয়ই আরো অনেকবার আমার দেখা হবে—কিন্তু তাকে চিনতে পারব না। আমরা রিকশাওয়ালার চেহারা কখনো ভালো করে দেখি না। তাদের পেছনটাই দেখি।

এক জন রিকশাওয়ালা ভাড়া না নিয়ে চলে গিয়েছে এটা এমন কোনো বড় ব্যাপার নয়। অনেক রিকশাওয়ালা আমাকে ঠকিয়েছে। ভাংতি হিসেবে অচল নোট দিয়েছে। জোর করে বেশি আদায় করেছে। এক জন তো দল পাকিয়ে আমাকে মারতে পর্যন্ত এসেছিল। সেইভাবে হিসেব করলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু হচ্ছে না।

এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে ঢাকা শহরে আমার যাবার কোনো জায়গা নেই। বাবার ইউরিন-ভর্তি শিশি পকেটে নিয়ে আমি ঢাকার রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াব। এই বোধহয় আমার নিয়তি। বাবার পেচ্ছাবের শিশি পকেটে আছে বলেই কি এ-রকম হচ্ছে? অসম্ভব নয়। সব জিনিসেরই কিছু-না-কিছু আছর আছে। There are many things in heaven and earth..... স্বয়ং শেক্সপিয়ারের কথা। শিশিটা পকেট থেকে ফেলে দিলে কেমন হয়? এটা তো এমন মহামূল্যবান কিছু নয়। কালও জোগাড় করা যেতে পারে। এবং সেটাই বোধহয় ভালো হবে। ফ্রেশ জিনিস নিয়ে ডাক্তারের কাছে পৌঁছে দেব। এম্নিতেই তো এই বস্তু অনেকক্ষণ পকেটে আছে, বাসি হয়ে যাবার কথা। তবে কে জানে মলমূত্র হয়তো যত বাসি হয় ততই ফ্রেশ হয়।

আমি শিশিটা নর্দমায় ফেলে দিলাম। আশ্চর্য কাণ্ড ফেলে দেবার পরপর মনে হল আমি একটা অন্যায় করেছি। বেচারা বাবা হয়তো অপেক্ষা করে থাকবে।

অল্প সময়ের মধ্যেই অপরাধবোধ আমাকে কাবু করে ফেলল। এর হাত থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁচবার একমাত্র উপায় হচ্ছে কোনো–একটা সৎকাজ করা। অন্ধকে হাত ধরে রাস্তা পার করে দেওয়া জাতীয় কিছু। কিংবা মার কথামতো নাখালপাড়া চলে যাওয়া। বাবার কাজটি করতে না–পারার অপরাধ মোচন হবে মার কাজটি নিখুঁতভাবে যদি করা যায়।

নাখালপাড়া যাওয়াটা কোনো সমস্যা নয়। গুলিস্তানে গেলেই টেম্পো পাওয়া যাবে। চমৎকার জিনিস। আধুনিক ঢাকার যানবাহনের জগতে বিপ্লব। একের মধ্যে কুড়ি। ইদানীং আবার মহিলারা উঠতে শুরু করেছেন। আগে উঠত মাতারিশ্রেণীর মহিলা। ওদের দেখে–দেখে ভরসা পেয়ে আধুনিকারা উঠতে শুরু করেছেন। এম্নিতে তাঁদের গায়ের সঙ্গে একটু ছোঁয়া লাগলেই ছ্যাৎ করে ওঠেন। টেম্পোতে অন্য ব্যাপার। গায়ের সঙ্গে গা লেপ্টে থাকে, তবু আধুনিকারা শব্দ করেন না। চোখে চোখ পড়লে বড় বোনসুলভ হাসি দেন। মেয়ে যাত্রী যেভাবে বাড়ছে তাতে মনে হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে মহিলা টেম্পো চালু হবে। এরশাদ সাহেবের মহিলাবিষয়ক কোনো মন্ত্রী এসে শুভ উদ্বোধন করবেন। গলা কাঁপিয়ে একটি ভাষণ দেবেন—এ দেশের নির্যাতিত অবহেলিত নারীজাতির জন্যে আজ একটি ঐতিহাসিক দিন, বাংলাদেশের ইতিহাসে এই দিনটির কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মহিলাদের স্বাধিকার অর্জনের একটি ধাপ হচ্ছে এই মহিলা টেম্পো। আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা জনগণের চোখের মণি আলহাজ্ব হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ মহিলাদের জন্যে যা করেছেন, তা অতীতে কেউ করেন নি, ভবিষ্যতেও কেউ করবে না। এই যে কুৎসিত যৌতুক প্রথা......

মহিলা বিষয়ক মন্ত্রীর ভাষণ সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে আমি একটি টেম্পোতে উঠে পড়লাম। টেম্পো ছাড়বার সঙ্গে–সঙ্গে রাজনীতি শুরু হয়ে গেল। দেখা গেল প্রাণপ্রিয় নেতার দিন যে শেষ, এই বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। একজন খবর দিল লন্ডনে একটি হোটেল কেনা হয়েছে। নেতা দেশ ছেড়ে দিয়ে সরাসরি হোটেলের ম্যানেজারি শুরু করবেন। সেই হোটেলে উন্নতমানের বাংলাদেশি খাবার সরবরাহ করা হবে।

ঘড়িতে বাজছে বারটা দশ। অনু আপার বাড়ি পৌছতে পৌছতে সাড়ে বারটা বেজে যাবে। এটা বেশ ভালোই হল। দুলাভাই নামক প্রাণীটির সঙ্গে দেখা হবে না। তিনি থাকবেন অফিসে। দুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা হবে না, এই আনন্দেই টেম্পোযাত্রার কষ্ট সহ্য করা যায়।

আমার দুলাভাই লোকটি অতি ভদ্র। তাঁর আচার–ব্যবহার সবই মোলায়েম। তাঁর সবকিছুই সূক্ষ্ম। রুচিবোধ সূক্ষ্ম, বুদ্ধি সূক্ষ্ম, চিন্তা–ভাবনা সূক্ষ্ম এমনকি তার গোঁফ জোড়াটাও সূক্ষ্ম। জোৎস্না দেখবার জন্যে তিনি ছাদে বসে থাকেন। মাসে এক বার গ্রুপ থিয়েটারের নাটক দেখেন। গ্রন্থমেলা থেকে কবিতার বই ছাড়া কিছু কেনেন না। বাসায় রবীন্দ্রনাথের বিরাট ছবি। ২৫শে বৈশাখ এবং ২২শে শ্রাবণ এই দু'দিন রবীন্দ্রনাথের ছবিতে মালা দেয়া হয়।

দুলাভাইয়ের তুলনায় অনু আপার সব কিছুই স্থূল ধরনের। বুদ্ধি স্থূল। আচার–আচরণও সেই রকম। শরীরও মোটা। অবশ্য মোটাটা ইদানীং হয়েছে। আগে ছিল ছিপছিপে ধরনের। বুদ্ধির অভাব অনু আপা রূপ দিয়ে বহুগুণে পুষিয়ে দিয়েছিল। কাটা–কাটা চোখ–মুখ। বইপত্রে কাঁচাহলুদ বর্ণের যে–সব নায়িকাদের কথা থাকে, তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবার চেয়েই অনু আপা সুন্দর। সুন্দরী মেয়েদের বোকা-বোকা কথাও শুনতে ভালো লাগে, এটা বোধহয় সত্যি। অনু আপার মুগ্ধ ভক্ত প্রচুর জুটে গেল। বিরাট যন্ত্রণা! অনু আপা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে গেছে। তাকে নকল সাপ্লাই দেবার জন্যে সঙ্গে গেল এ পাড়ার ছ'সাত জন ভক্তের একটা জঙ্গীদল। কোন খাতা কার কাছে যাবে, সেই খবরও এক জন নিয়ে এল। এত করেও লাভ হল না। অনু আপা ম্যাট্রিক পাশ করতে পারল না।

তাতে অসুবিধা তেমন হল না।

বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে লোকজন আসতেই লাগল। প্রায় বিকেলেই দেখা যেত বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে। সেই গাড়ি থেকে মোটা ধরনের গয়নায় মোড়া মহিলারা বের হচ্ছেন। তাঁদের সবার মুখে তেলতেলে একটা ভাব। বাংলাদেশে রূপবতী মেয়েদের যে আকাল যাচ্ছে, তা এই প্রথম আমরা বুঝলাম। প্রফেসর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আর্মি অফিসার। কত রকম ঝোলাঝুলি, ধরাধরি। বিশ্রী ব্যাপার!

বাবা খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। অহঙ্কারী-অহঙ্কারী একটা ভাব চলে এল তাঁর মধ্যে। এ রকম রূপবতী একটি কন্যাকে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন—অহঙ্কার হবারই কথা। তাঁর কথাবার্তার ধরন পর্যন্ত বদলে গেল। পাত্রপক্ষের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলবার সময় তাঁর গলার স্বর কেমন সরু হয়ে যেতে শুরু করল।

'আপনাদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে ভালো কথা। শুনে সুখী হলাম। আমাদের তো ছেলে পছন্দের একটা ব্যাপার আছে। বংশ দেখতে হবে, আচার-ব্যবহার দেখতে হবে। একটা মেয়েকে জন্মের মতো দিয়ে দেব—না দেখেশুনে দেই কীভাবে?'

বাবার দেখাশোনা এবং বাছাবাছি চলতেই লাগল। কাউকে পছন্দ হয়, কথাবার্তা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসে—তখন বাবা বললেন, 'উঁহু, বংশে গণ্ডগোল আছে। সব কিছুর রুট হচ্ছে বংশ। ঐ জায়গায় গণ্ডগোল থাকলে সবই গণ্ডগোল।'

আমরা দিন কাটাচ্ছি আতঙ্কের মধ্যে। গুজব রটে গেছে কে নাকি অ্যাসিডের বোতল নিয়ে ঘুরছে। সুযোগমতো অনু আপার মুখে ঢালবে। সুযোগ পাচ্ছে না। অনু আপার বন্দিজীবন কাটছে। ঘর থেকে বেরুনো বন্ধ। জানালার পাশে যাওয়া বন্ধ। বারান্দায় দাঁড়ানো বন্ধ। বেচারি শুধু কাঁদে আর হয়তো মনে-মনে ভাবে—একটা বিয়ে হোক, ঝামেলা শেষ হোক।

আমার প্রতিভাবান বাবা অনেক দেখেশুনে যে চিজটিকে বের করলেন, তার নাম ইসমাইল হোসেন। শ্রাবণ মাসে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের সাত দিন পর অনু আপা ফিরাযাত্রায় এল। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'বর কেমন রে?'

অনু আপা মুখ শুকনো করে বলল, 'ভালোই। কিন্তু মারধোর করে।' মা আকাশ থেকে পড়লেন, 'মারধোর করে মানে! কী সর্বনাশের কথা! মারধোর করবে কেন?'

'জানি না মা'

বাবা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বেকুব মেয়ে, কী বুঝতে কী বুঝেছে! গায়ে ধাক্কাটাক্কা লেগেছে বোধহয়।'

অনু আপা ঠিকই বুঝেছিল। লোকটা অসুস্থ—নির্বিকার মারধোর করে। অথচ কথা বলবার সময় কী মিষ্টি-মিষ্টি কথা। হারামজাদা ছোটলোক।

'কেমন আছিসরে আপা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনু আপা বলল, 'আমি ভালো আছি, তোর কী হয়েছে? এ-রকম লাগছে কেন তোকে?'

'কী রকম লাগছে?'

'অসুখ অসুখ লাগছে।'

'আমার শরীর ঠিকই আছে। বাবার অবস্থা কাহিল।'

'সে কী! কী হয়েছে?'

'ভয়াবহ কাশি। শ'তিনেক টাকা থাকলে দে। চলে যাব। সময় নেই।'

'দিচ্ছি, তুই বোস।'

আমি অনু আপার বসার ঘরে বসে রইলাম। অনু আপা অদৃশ্য। এদের বাড়িটা এজমালি। তিন ভাই এবং দু'বোনের মধ্যে ভাগ হয়ে অনু আপাদের ভাগে দু'তলার একটা বড় ঘর, একতলার দু'খানা ছোট ঘর এবং দু'তলার বারান্দার খানিকটা অংশ পড়েছে। দু'তলার বড় ঘরটা দু'ভাগ করে বসার এবং শোবার ঘর করা হয়েছে। বারান্দায় রান্নার ব্যবস্থা। বিয়ের আগে বলা হয়েছিল সমস্ত বাড়িটাই আমার দুলাভাইয়ের। বাবাকে তারা বাড়ি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখিয়েছে। বাবা আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে আমাদের এসে বলেছেন, 'রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি! বিরাট খানদানী ব্যাপার। অনুর কপাল ফিরে গেল।'

'এই নে বীরু, খা।'

অনু আপা প্লেটে করে দু'খানা ভাজা ইলিশমাছের ডিম নিয়ে এল।

'গরম-গরম ভেজেছি, খেয়ে ফেল্। টপ করে মুখে ফেলে দে।'

'টপ করে ফেলা যাবে না, আগুন-গরম। চামুচ আন, ধীরে সুস্থে খাই।'

অনু আপা প্লেট নামাবার সঙ্গে-সঙ্গে অন্য হাতে অতি দ্রুত আমার পকেটে টাকা চালান করে দিল। এর মানে দুলাভাই বাড়িতেই উপস্থিত।

'দুলাভাই বাসায়?'

'হুঁ। অফিসে যায় নি। বীরু, ময়না ভাই, তুই ওকে রাগিয়ে দিস না।'

'আরে পাগল, আমি রাগাব কেন?'

'তুই ইচ্ছা করে ওকে রাগাস, পরে খুব যন্ত্রণা করে।'

'যন্ত্রণা করলে তুমিও যন্ত্রণা করবে। তোমাকে একটা চড় দিলে তুমি একটা চড় লাগাবে। সে যদি বাঁ পায়ে লাথি বসায় তুমি বসাবে ডান পায়ে। ফ্রি-স্টাইল পদ্ধতি।'

'আস্তে কথা বলতো!'

'আমি উঠি আপা, অনেক কাজ।'

'ওর সঙ্গে দেখা না করে চলে যাবি—কী যে অদ্ভুত কথাবার্তা তুই বলিস। ও রাগ করবে না।'

'ঠিক আছে, বসছি। পাঠাও দুলাভাইকে। তোমার পুত্র কোথায়।'

'শাশুড়ির কাছে আছে। নিয়ে আসব?'

'কোনো দরকার নেই। শিশু জিনিসটাই আমার অসহ্য।'

দুলাভাই হাসিমুখে ঢুকলেন। দু'-এক দিনের মধ্যে চুল কাটিয়েছেন বলে মনে হল। দেখাচ্ছে অবিকল বানরের মতো। যতই দিন যাচ্ছে লোকটার চেহারা ততই কুৎসিত হচ্ছে। রহস্যটা কী, কে জানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বড় শ্যালক, খবর কি?'

'খবর ভালোই।'

'শ্বশুরসাহেবের অসুখ শুনলাম। সিরিয়াস নাকি?'

'না, সিরিয়াস কিছু না। আপনাকে এমন অদ্ভুত লাগছে কেন দুলাভাই? চুল কেটেছেন নাকি?'

'হুঁ। বেশি ছোট করে ফেলেছে। খুব খারাপ লাগছে?'

'লাগছে। বাঁদরের মতো দেখাচ্ছে। দিন সাতেক ঘর থেকে বেরুবেন না। ঘরেই থাকুন। ঘরে বসে কলাটলা খান।'

কথাগুলো মুখ ফসকেই বলে ফেললাম। দুলাভাই সামনে থাকলে আমার নিজের উপর কোনো কন্ট্রোল থাকে না। কঠিন-কঠিন কথা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বলতে থাকি। আজকের ঠাট্টাটা মনে হচ্ছে একটু কড়া হয়ে গেছে। দুলাভাইয়ের মুখ থমথমে। ভাস্যিস অনু আপা সামনে নেই। থাকলে সে কী করত কে জানে! হয়তো কেঁদে-টেঁদে ফেলত। তবে দুলাভাই ব্যাপারটা ভালোই হজম করলেন। স্বাভাবিকভাবেই বললেন, 'অসুখের খবর দেবার জন্যে এসেছ, না অন্য কোনো উদ্দেশ্য?'

'আরেকটা উদ্দেশ্যও আছে। আপনার কাছে কিছু টাকা হবে দুলাভাই?'

'কিছু মানে কত?'

'এই ধরুন হাজার পাঁচ।'

'মাথা খারাপ হয়েছে? দশ-বিশ হলে দিতে পারি।'

'বেশ, তাই না হয় দিন।'

দুলাভাই বিরস মুখে একটি কুড়ি টাকার নোট বের করলেন। আমি বললাম, 'উঠি দুলাভাই?'

এই বাড়িতে ঢোকা এবং বের হওয়া দুইই বিরক্তিকর। নানান ঘর-দুয়ার পার হতে হয়। অপরিচিত সব মহিলারা সামনে পড়ে যায়। তারা এমনভাবে তাকায়.... বিশেষ করে দুলাভাইয়ের এক বোন মলিনা না ফলিনা কী যেন নাম! আমার সঙ্গে তার অনেক বারই দেখা হয়েছে। দেখা হওয়ামাত্র সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, ভ্রূ কোঁচকায়। সামনে থেকে বিশ্রী ভঙ্গিতে উঠে চলে যায়। এ রকম ভাবে উঠে যায়, যে নিজিকে খুব ছোট মনে হয়।

আজও বেরুবার সময় মেয়েটিকে দেখলাম। বারান্দায় মোড়ায় বসে আছে, হাতে মোটা একটা বই। আমাকে দেখেই সে বই বন্ধ করে চোখ কুঁচকে ফেলল। যেন মহা বিরক্ত। অনু আপা আমাকে এগিয়ে দিতে আসছিল। আমি উঁচু গলায় বললাম, 'আপা, তোর শ্বশুরবাড়ির সবার মুখ কেমন যেন লম্বাটে। ছুঁচোর মতো। তোর পুত্রও এ রকম হয়েছে। ব্যাপারটা কি বল তো?'

বলেই আমি আর দাঁড়ালাম না। লম্বা-লম্বা পা ফেলতে শুরু করলাম। মনে-মনে আশা করছি ঘাটা ঠিক জায়গায় গিয়ে লাগবে। একবার পিছন ফিরে দেখতে পারলে হত। সাহসে কুলুচ্ছে না।

মাথার উপর রোদ চড়চড় করছে।

কোথায় যাওয়া যায়? ভর-দুপুরে যাবার মতো জায়গা আমার খুব বেশি নেই। শহীদুল্লাহ হলের দিকে যাওয়া যায়। রমিজের কাছে। রমিজ তার নিজের রুমেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রান্না-বান্না করে। ভালোই করে। রুমভর্তি রান্না-বান্নার আয়োজন। শিলপাটা পর্যন্ত আছে। একটা কাজের মেয়ে মাঝে-মাঝে এসে মশলা পিশে দিয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর চমৎকার সব ব্যবহার হচ্ছে। কোনো-কোনো রুম ভাড়া দেওয়া হয়েছে বাইরের ব্যাচেলর চাকুরিজীবীদের কাছে। তারা দিব্যি মাসের পর মাস থাকছে। ভাড়া, ছাত্রদের কোনো একটা বিশেষ দলের কাছে চলে যাচ্ছে। সুন্দর সিসেটম।

রাহাজানি-ছিনতাইয়ের দল তাড়া খেলে ঢুকে পড়ছে হলে। হল হচ্ছে অত্যন্ত পবিত্র জায়গা। এখানে পুলিশ ঢুকবে না। যে-কেউ এখানে কিছু দিন নিশ্চিন্তে থাকতে পারে।

রমিজকে তার ঘরে পাওয়া গেল। আমি বললাম, 'রান্না কী?'

রমিজ বিরক্ত মুখে বলল, 'ইলিশ-সর্ষে। তুই ঠিক খাওয়ার আগে আগে আসিস কেন বল তো? ভাত সর্ট পড়বে।'

'পড়ুক।'

'গোসল করবি? গোসল করলে সেরে আয়। খিদেয় প্রাণ যাচ্ছে এক্ষুনি ভাত নিয়ে বসব।'

হলের গেটের সামনে তুমুল হৈচৈ হচ্ছে। ফট করে একটা ফাঁকা গুলি হল। এক জন হকিস্টিক নিয়ে দৌড়াচ্ছে। হকিস্টিকের মতো অচল অস্ত্র নিয়ে এই বেকুব কী করছে, কে জানে। আমি বললাম, 'গোলমাল হচ্ছে কিসের? কোনো সমস্যা আছে? রুম ভাঙাভাঙি হবে?'

'না, অন্য ব্যাপার। তেমন কিছু না। একটা গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করেছে। মালিককে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। আটক আছে। টাকা দিলে ছাড়া হবে।'

'কোন পার্টি ধরল?'

'জানি না। জাগ্রত ছাত্র সমাজ হবে। বেচারার অবস্থা কাহিল। হেভি মারধোর হচ্ছে।'

'স্যাররা আসছেন না।'

'পাগল হয়েছিস! স্যাররা এখন বেরুবে? সব ঝামেলা মিটলে দু'-এক জন উঁকি দেবে। জাগ্রত ছাত্র সমাজকে ধমক দেবে, এমন সাহস কোনো স্যারের নেই। সব ভেড়ুয়া। ঝামেলা লাগলে স্ত্রীর আঁচলের বাতাস খায়।'

অ্যাক্সিডেন্টে যে আহত হয়েছে, সে হলের ছাত্র নয়। বাইরের লোক। সে বাড়ি চলে গেছে। গাড়িওয়ালাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে। এই ক্ষতিপূরণ কার কাছে যাবে কেউ জানে না।

আমি বন্দিকে এক নজর দেখতে গেলাম। ঠোঁট কেটে বিশ্রী অবস্থা। চোখ রক্তবর্ণ। সে খালিগায়ে শুধুমাত্র একটা আন্ডারওয়ার পরে বসে আছে। লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় বলল, 'আমি কিছুই করি নি। ফকির কিসিমের একটা লোক লাফ দিয়ে গাড়ির সামনে পড়ে গেছে। আমার অপরাধ কি বুঝলাম না। আর অপরাধ যদি হয়ে থাকে, বিচার হবে। আইন আছে। আদালত আছে।'

এক জন ছাত্র এগিয়ে এসে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে কর্কশ গলায় বলল, 'মানুষ মেরে বড়-বড় কথা। আইন দেখায়!'

'মানুষ তো মরে নি ভাই!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চুপ থাক।'

'আপানারা কী করতে চান? মেরে ফেলতে চান?'

'চুপ থাক শালা! কুড়ি হাজার টাকা ফেল, তারপর কথা। সন্ধ্যার মধ্যে কুড়ি হাজার না পাওয়া গেলে পেট্রল দিয়ে গাড়ি পুড়িয়ে ফেলব। এই, পেট্রল নিয়ে আয়। মানুষ মেরে কথা বলে!'

'যান, গাড়ি পুড়িয়ে ফেলুন। একটা পয়সা দেব না।'

'তোর বাপ দেবে।'

'সাট আপ।'

রোগামতো একটি ছেলে এসে আচমকা লোকটিকে একটা ধাক্কা দিল। সে গড়িয়ে পড়ে গেল। আমি সরে এলাম। সময় বদলে যাচ্ছে, এইসব এখন তুচ্ছ মনে হয়। কিছু দিন পর হয়তো দেখব পকেটমার ধরা পড়েছে—তার চোখ তুলে ফেলা হচ্ছে। ছেলেবুড়ো খুব আগ্রহ নিয়ে সেই দৃশ্য দেখছে। ঘন-ঘন হাততালি পড়ছে। এর নাম সময়। সময়কে গাল দেওয়া যাবে না। "তোমরা সময়কে গাল দিও না। আমিই সময়।" স্বয়ং আল্লাহ্ এই কথা বলেছেন। সময়কে কোনো দোষ দেয়া যাবে না।

ভাত খেতে খেতেই বুঝতে পারলাম একটা মিটমাট হয়েছে। লোকটা চলে যাচ্ছে। তাকে একজন কে নিতে এসেছে। লোকটা তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে-দিয়ে যাচ্ছে। তার দৃষ্টি ভাবলেশহীন। এক জন ছাত্র বেশ মাই-ডিয়ার ভঙিতে বলল, 'গাড়ি ঠিকমতো বুঝে নিন, গাড়িতে টাচ করা হয় নি। যেমন ছিল তেমন আছে। নিন চাবি। এরপর থেকে গাড়ি সাবধানে চালাবেন। পাবলিকের হাতে পড়লে জান শেষ করে দিত। আমরা ধরে নিয়ে এসেছি বলে বেঁচে গেলেন।'

লোকটি একটি কথারও জবাব দিচ্ছে না।

রমিজ বলল, 'সর্ষে-বাটা কেমন লাগছে?'

'ভালো।'

'পাঁচফোড়ন ছিল না। পাঁচফোড়নের একটু টাচ দিলে দেখতি কী হত।'

আমি অবাক হয়ে রজিমকে লক্ষ করলাম। একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা তাকে মোটেও স্পর্শ করে নি। সে ঐ প্রসঙ্গে কোনো কথাই বলছে না।

'বীরু।'

'কী'

'এশা তোকে খুঁজছিল। খুব নাকি দরকার। আমার কাছে এসে তোর বাসার ঠিকানা চাইল।'

'বাসার ঠিকানা তো জানে। তোর কাছে আসার দরকার কি?'

'কীভাবে যেতে হয় জানে না। ডিরেকশন দিয়ে দিলাম। মসজিদের পাশে গলি। বাড়ির সামনে শিউলি গাছ। ঠিক আছে না?'

'আমাকে খুঁজছে কেন?'

'জানি না। বোধহয় এইবার প্রেম করতে চায়।'

রমিজ গলা টেনে-টেনে হাসছে। এক সময় হাসি থামিয়ে বলল, 'অন্য কোনো ব্যাপারও হতে পারে। একটু চিন্তিত চিন্তিত মনে হল।'

আমি বললাম, 'এশার কথা থাক। পরীক্ষার ডেট পড়েছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হুঁ।'

'হুঁ মানে? সত্যি পড়েছে?'

'ইয়েস। সামনের মাসের সাত, আট আর নয়। তোর রোল নম্বর আগের দিকে, তোর সাত তারিখে হয়ে যাবে।'

'এই খবর এতক্ষণে দিচ্ছিস!'

'ইম্পর্টেন্ট খবর না, কাজেই দিচ্ছি না। ডেট পিছাবে। আবার নতুন ডেট পড়বে। ইতিমধ্যে কোনো-একটা গণ্ডগোল হবে। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। তুই নিশ্চিন্ত মনে এশার সঙ্গে চালিয়ে যা। বন্ধু, তুমি এগিয়ে চল, আমরা আছি তোমার সাথে।'

রমিজ শব্দ করে হাসতে লাগল। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'শুধু শুধু হাসছিস কেন?'

'হাসি আসছে, কাজেই হাসছি। তোর কাঁদতে ইচ্ছে হলে কাঁদতে পারিস। নো প্রবলেম।'

হাত ধোবার সময় দেখলাম হলের প্রভোস্ট সাহেব আসছেন। হাসিহাসি মুখে ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলছেন। ছোটখাটো মানুষ। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবিতে চমৎকার লাগছে। আটক করা গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এই আনন্দেই তিনি উল্লসিত। এক জন ছাত্র বলল, 'মানুষ মেরে পার পেয়ে যাবে, তা তো হয় না স্যার। কী বলেন?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

প্রভোস্ট সাহেব তৃপ্তির হাসি হাসছেন। তিনি ঝামেলার হাত থেকে বেঁচে গেছেন। এরচেয়ে বড় সুসংবাদ কিছু হতে পারে না। এই সময়ে কেউ ঝামেলা সহ্য করতে পারে না। সবাই চায় ঝামেলাবিহীন দিন। প্রভোস্ট সাহেবের সঙ্গে দু' জন চ্যাংড়ামতো স্যার। তাঁদের চোখে-মুখে গভীর বিতৃষ্ণা, অথচ হাসিমুখে কথা বলতে চেষ্টা করছেন।

AMARBOI.COM

৫

হলে মন টিকল না। আবার বেরুলাম। এই সময় কোথাও মন বসে না।

যাবার জায়গা ঠিক করা নেই। খানিকক্ষণ হাঁটাহাটি করব। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ যদি কোথাও যাবার ইচ্ছা জাগে, তখন দেখা যাবে।

কড়া রোদ। আগুন-গরম বাতাস বইছে। রাস্তাঘাট ফাঁকা। ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে, কারণ রাস্তার পিচ গলে আঠালো হয়ে আছে। স্যান্ডেলের সঙ্গে বেঁধে যাচ্ছে।

কড়া রোদে পথে নামলে অবধারিতভাবে আমার এশার কথা মনে হয়। তার সঙ্গেই রোদে হাঁটাহাঁটির ব্যাপারটা আমার রপ্ত হয়েছে। একদিন সে হঠাৎ এসে বলল, 'হাঁটতে তোমার কেমন লাগে?'

'খুব খারাপ। গাড়ি নেই এবং রিকশা ভাড়া নেই বলেই হাঁটি।'

'কড়া রোদে কখনো হেঁটে দেখেছ?'

'দেখব না কেন?'

'উঁহু, শখের হাঁটা না। দু' ঘন্টা তিন ঘন্টা অনবরত হাঁটা। অদ্ভুত! অপূর্ব! প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণ খারাপ লাগবে। কান ঝাঁ-ঝাঁ করবে। চোখে ঝাপসা দেখবে। তারপর দেখবে অন্যরকম লাগছে। সম্পূর্ণ অন্যরকম।'

'অন্যরকম মানে?'

'অন্যরকম মানে হচ্ছে—অন্যরকম। এস, আজ পরীক্ষা হয়ে যাক। নিজেই দেখ।'

'পাগল। আমি এই রোদে বেরুচ্ছি না। সান স্টোক হয়ে যাবে। এম এ পাশ করবার আগে মারা গেলে বাবা-মা শোকে হার্টফেল করবেন। তারা এম এ পাশ পুত্র দেখতে চান!'

'তুমি এস তো আমার সঙ্গে!'

যেতে হল। এশাকে অগ্রাহ্য করার মতো সাহস বা ইচ্ছা কোনোটাই আমার নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার, সত্যি-সত্যি অন্যরকম লাগল। মনে হল অপরিচিত কোনো শহরে আমরা চলে এসেছি। যার সবকিছুই অন্যরকম। ক্রমাগত তিন ঘন্টা হেঁটে বাসায় ফিরেই জ্বরে পড়লাম। জ্বরের মধ্যে মনে হত—হাঁটছি। শুধুই হাঁটছি। সেই জ্বর সারতে এক সপ্তাহ লাগল।

এর পরেও এশার সঙ্গে গিয়েছি। ভরদুপুরেই যাওয়া। পুরোনো ঢাকার গলিতে-গলিতে হেঁটেছি। আমার ক্লান্তি লাগলেও তার ক্লান্তি নেই। আমি যদি বলি, 'চল, কোথাও বসে একটু রেস্ট নিই।' এশা অবাক হয়ে বলে, 'এখনই টায়ার্ড? সবে তো যাত্রা শুরু!'

'প্লিজ, আর পারছি না।'

'চল, তাহলে, কোনো চায়ের দোকানে বসি।'

কত বিচিত্র ধরনের চায়ের দোকানে এশাকে নিয়ে গিয়েছি। রাস্তার পাশে, বট গাছের নিচে, সিঁড়ির নিচের খুপরিতে। একবার এক চায়ের দোকানি বলল, 'এইখানে মেয়েছেলে নিয়ে আসা যাবে না। অন্যখানে যান।'

এশা বলল, 'মেয়েছেলে কী দোষ করল?'

'অসুবিধা আছে।'

'অসুবিধাটা কী সেটা বলুন। না বললে আমি যাব না। চিৎকার দেব।'

দোকানদার বিস্মিত হয়ে বললে, 'চিৎকার দিবেন? চিৎকার দিবেন ক্যান?'

'আমাকে বসতে দিচ্ছেন না, এই জন্যে চিৎকার দেব। যে-সব জায়গায় ছেলেরা বসতে পারে সেখানে মেয়েরাও যেতে পারে। সমান স্বাধীনতা।'

দোকানী বিরক্ত হয়ে বলল, 'আসেন, বসেন। চা খাইয়া বাড়িত যান।'

সেই চায়ের দোকানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় লাগিয়ে আমরা চা খেলাম। এশা নানান কথা নিচু গলায় বলতে বলতে হাসতে লাগল। এ সব সে করছে দোকানদারকে রাগিয়ে দেবার জন্য। দোকানদারটা সত্যি-সত্যি রাগী-রাগী চোখে তাকাচ্ছে? কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, সে আমাদের কাছ থেকে চার কাপ চায়ের দাম নিল না। আমি বললাম, 'চায়ের দাম নেবেন না কেন?'

'আমার ইচ্ছা আমি নিমু না। বড় যন্ত্রণা করছেন। অখন যান, বিদায় হন।'

এর পরেও আমরা অনেকবার গিয়েছি। দোকানি প্রতিবারই বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু কোনোবার পয়সা নেয় নি। কেন নেয় নি কে জানে! সব মানুষের মধ্যেই অনেক রকমের রহস্য থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

রোদের তেজ মরে আসছে। এখন আর হাঁটতে ভালো লাগছে না। ঐ চায়ের দোকানটায় গেলে কেমন হয়? এক কাপ চা এখন নিশ্চয়ই খাওয়া যেতে পারে। আজ সে পয়সা নেবে কি না কে জানে। হয়তো নেবে। এশা সঙ্গে থাকলে নিত না। এই পরীক্ষাটাও হয়ে যাক। এশাবিহীন অবস্থায় কী হয়।

চায়ের দোকানির নাম রমজান। গোলগাল মুখ, মাথাভর্তি বাবরি চুল। চোখ দু'টি আরো বড়-বড় হলে মধ্যবয়সের কবি নজরুল হিসেবে চালিয়ে দেয়া যেত। রমজান আমার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকাল। হাই তুলে বলল, 'মুনশি, ইনারে চা দে।'

চা খাবার সময় লক্ষ করলাম, সে একবারও আমার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। একটা টাকা দিলাম চায়ের দাম। সে নির্বিকার ভঙ্গিতে ক্যাশবাক্সে রেখে দিল। আমি বললাম, 'এশা কি এর মধ্যে এসেছিল? ঐ যে মেয়েটা আসে আমার সঙ্গে—রোগা, লম্বা, কাঁধে সব সময় একটা ব্যাগ।'

'আসে মাঝে-মইধ্যে।'

'একা?'

'না, চশমাওয়ালা একজন থাকে সাথে।'

'ছেলে না মেয়ে?'

'ছেলে। সুন্দর মতো একজন।'

এই বলেই রমজান একটা উপহাসের হাসি হাসল। বোধহয় সে ভেবেছিল এটা শোনার পর আমি 'উ' বলে চিৎকার করে বুকে হাত দিয়ে বসে পড়ব। রমজান তাকাচ্ছে ট্যারা চোখে। আমি বললাম, 'চশমা পরা ছেলে? খুব ফর্সা?'

'হ।'

'ও হচ্ছে তার স্বামী। ওর নাম মুনীর।'

রমজানের মুখ এবার হাঁ হয়ে গেল। এটা শোনার জন্যে সে বোধহয় প্রস্তুত ছিল না। মানুষকে পুরোপুরি বেকুব বানানোর একটা অন্যরকম মজা আছে। কেমন ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছে ব্যাটা।

'উনার বিহা হইছে?'

'হবে না? বয়স তো কম হয় নি। একটা ছেলে আছে, দু' বছর বয়স—মন্টু নাম।'

'আফনে উনার কে হন?'

'কেউ হই না। খাতিরের লোক।'

লোকটির দিকে তাকিয়ে চোখ টেপার একটা ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পারা গেল না। এই টেকনিকটা শিখতে পারি নি। চোখ টিপলে দু'চোখ একসঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়।

আমি বেরিয়ে এলাম। রমজান ব্যাটাকে পুরোপুরি বেকুব বানানো যায় নি। সে গল্পটি বিশ্বাস করে নি। একটা ছেলে আছে বলে আমি ঘটনাটা কাঁচিয়ে ফেলেছি। ঐটা না বললে সে বিশ্বাস করত।

বিশ্বাসযোগ্যভাবে মিথ্যা কথা বলা খুব কঠিন কাজ। আমার চেনাজানার মধ্যে এই কাজটা সবচে ভালো পারে মাসুম। মাসুমের চোখ বড়-বড়। সমস্ত চেহারায় ভালোমানুষি একটা ভাব আছে। সে চট করে নিজের চোখে পানি নিয়ে আসতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা সবাই জানি মাসুমের স্বভাবই হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা। তবু সে যখন কিছু বলে আমরা সঙ্গে–সঙ্গে বিশ্বাস করে ফেলি।

একদিন থার্ড ইয়ারের ক্লাস হচ্ছে। নবী স্যার ক্লাস নিচ্ছেন। মাসুম দরজার সামনে এসে বলল, 'স্যার, একজন অ্যাকসিডেন্ট করেছে। পিজিতে আছে, খুবই খারাপ অবস্থা—ব্লাড দিতে হবে। বীরুকে একটু ছুটি দিন স্যার। বীরুর রিলেটিভ।' বলতে–বলতে মাসুমের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। নবী স্যারের মুখ অসম্ভব করুণ হয়ে গেল। তিনি আমাকে ক্লাস থেকে বাইরে নিয়ে এসে বললেন, 'ডিপার্টমেন্টের সামনে আমার গাড়ি আছে। ড্রাইভারকে আমার কথার বল, তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। দেশের কী যে অবস্থা, প্রাণ হাতে নিয়ে পথে নামতে হয়! যাচ্ছি কোথায় আমরা?'

আমি নিজেও তখনো বুঝতে পারি নি যে ব্যাপারটা পুরোপুরি রসিকতা। আমার হাত–পা কাঁপছে। আমি ধরেই নিয়েছি, এ আর কেউ না—নির্ঘাৎ বাবা, তিনি একটা কাণ্ড করেছেন। রিকশা থেকে ঝাঁকুনি খেয়ে পড়ে গেছেন। তখন হয়তো পেছন থেকে একটা ট্রাক এসেছে। ঘাতক ট্রাক। শহর ভর্তি ঘাতক ট্রাকে।

রিকশা থেকে গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে বাবার নামডাক আছে। বিনা ঝাঁকুনিতেও তিনি গড়িয়ে পড়ে যান। গত মাসেই এই কাণ্ড করে চশমা ভেঙেছেন। সাড়ে তিন শ' টাকা লেগেছে চশমা সারাতে। এই টাকার চাপ সামলানোর জন্যে বাড়িভাড়া দেওয়া হয় নি। এখন চাপ দিচ্ছেন বাড়িওয়ালা। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা—তিন বেলা নিজে আসছেন কিংবা তাঁর ভাইস্তাকে পাঠাচ্ছেন। প্রতিবারই মা তাঁদের খুব সমাদর করছেন। চা–বিসকিট এইসব পাঠাচ্ছেন। দরজার আড়াল থেকে বলছেন, 'সামনের মাসের দুই তারিখে দু' মাসেরটা একসঙ্গে মিটিয়ে দেব। এই মাসে একটু ঝামেলা হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না। এরকম তো কখনো হয় না। উনি বাড়িভাড়ার ব্যাপারে খুব সাবধান।'

ইতং বিতং কত কথা মার। এইসব ঝামেলার কথাগুলি আমরা সবাইকে মাকে দিয়ে বলাই। পারুল একবার একটা ঝামেলা বাধালো—পাড়ার নাটকে অভিনয় করবে। আমাদের গুষ্ঠিতে কেউ অভিনয়ের 'অ' জানে না, কিন্তু সে পেয়ে গেল নায়িকার পার্ট। নাটকের নাম ''নয়া ফসল''। খুবই বিপ্লবী জিনিস। মোড়ল–মারা নাটক। শেষ দৃশ্যে জাগ্রত জনতা গ্রামের মোড়লকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। তখন নাটকের নায়িকা আলুথালু বেশে স্টেজের মাঝখানে ছুটে এসে বলে—এত অল্প রক্তে হবে না। চাই চাই, আরো রক্ত চাই। রক্তের নদী চাই, রক্তের সাগর চাই...ইত্যাদি।

রোজ রিহার্সেল। বিকেলে শুরু হয়, শেষ হতে হতে সন্ধ্যা। একদিন রিহার্সেলে কী হয়েছে কে জানে, পারুল কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরল। নাটক করবে না। নাট্য নির্দেশক, রোজ বাসায় এসে বসে থাকে। পারুল নিজে তার সঙ্গে কথা বলে না, মাকে পাঠায়। মা চিকন গলায় বলেন, 'ওর তো বাবা, গায়ে জ্বর। হামের মতো গুটি–গুটি বের হয়েছে। ধীরেন বাবু ওষুধ দিচ্ছেন। তোমরা অন্য কাউকে দিয়ে নাটক করাও। ধীরেন বাবু বলেছেন—ওকে মাসখানিক রেস্ট নিতে হবে।'

মাসুমের কথায় ফিরে যাই। ব্যাটা তো আমাকে বের করে নিয়ে এল। আমি ঠিকমতো পা পর্যন্ত ফেলতে পারছি না। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি হাসপাতালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেড়ে বাবা লম্বা হয়ে পড়ে আছেন। স্যালাইন–ট্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। মা ঘন–ঘন ফিট হচ্ছেন।

মাসুম বলল, 'তোর কাছে সিগারেট আছে?'

তখন বুঝলাম, ব্যাপারটা রসিকতা। মাসুম গলা নামিয়ে বলল, 'নবী স্যারের গাড়ি নিয়ে যাবি?'

'কোথায়?'

'ইয়াকুবের বাসায়। 'ব্লু' দেখব। মারাত্মক জিনিস! খালি বাসা। আমি, তুই আর ইয়াকুব। গেলে চল, সময় নষ্ট করতে পারব না।'

স্যারের গাড়ি নিয়ে আমরা পিজি পর্যন্ত গেলাম। ড্রাইভারকে বললাম, 'থ্যাংক্‌স্ ভাই, স্যারকে বলবেন বড় উপকার হয়েছে। আমরা প্রায় দৌড়ে পিজিতে ঢোকার একটা ভঙ্গি করলাম। শেষ পর্যন্ত অবশ্যি ইয়াকুবের বাসায় যাওয়া হল না। মাসুম উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। কোনো পরিকল্পনাই সে দীর্ঘসময় পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে না। উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

পিজি থেকে বের হয়ে পাশের একটা দোকানে ঢুকে লাচ্ছি খেলাম। লাচ্ছি শেষ করবার পরপরই মাসুম হাই তুলে বলল, 'দূর, ভালো লাগছে না, বাসায় চলে যাব। ঘুম আসছে।'

'তুই আমাকে খামোখা ক্লাস থেকে বের করে নিয়ে এলি কেন?'

'এখন চলে যা, তা হলেই তো হয়! ঘ্যানঘ্যান করছিস কেন?'

'ইডিয়ট।'

'তুই শালা আরো বড় ইডিয়ট।'

আমাকে আর দ্বিতীয় কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মাসুম লম্বা–লম্বা পা ফেলে বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেল। শিস দিয়ে কী একটা গান গাইছে—''ইয়ে মেরা সাংদিল''। সাংদিল ব্যাপাটা কী কে জানে!

আমার তেমন কোনো বন্ধু–বান্ধব নেই। মাসুমকে মাঝে–মাঝে বন্ধু বলে মনে হয়। সেটা বোধহয় ঠিক নয়। সে সবারই বন্ধু—বিশ্ববন্ধু। প্রথম দিনের আলাপেই সে তুমিতে চলে যায়। এবং অবলীলায় বলে—একটা টাকা যদি থাকে দাও তো! বাসভাড়া নেই। অল গন! দ্বিতীয় দিন দেখা হলে সে তুই সম্বোধন করে। এক টাকার জায়গায় পাঁচ টাকা চায়। দিতে না–চাইলে পা ধরতে আসে।

এশার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় মাসুমের মাধ্যমে। টিএসসিতে গিয়েছি কি একটা কাজে, আমাকে দেখে মাসুম ছুটে এল, 'দোস্ত, আমাকে উদ্ধার কর। গভীর সমুদ্রে পড়েছি। ডিপ ওয়াটার।'

'কী হয়েছে?'

'একটা মেয়েকে কবি শামসুর রাহমানের বাসায় নিয়ে যা। আমার নিয়ে যাওয়ার কথা। যেতে পারছি না। আটকা পড়ে গেছি।'

'শামসুর রাহমান সাহেবের বাসা কোথায়?'

'আমি কী করে জানব কোথায়? কবি–সাহিত্যিকদের খোঁজ আমি রাখি নাকি। ঐসব হচ্ছে হাই থটের ব্যাপার।'

'ঐ মেয়েও কি হাই থটের নাকি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে দূর দূর। কবিতা লিখেছে—পড়াতে চায় শামসুর রাহমান সাহেবকে। ভাই তোর পায়ে ধরছি, নিয়ে যা—রিকশা ভাড়া দেব!'

'কবি-মেয়ে নিয়ে যাব। পথে কোন বিপদে পড়ি কে জানে? যদি কবিতা শোনাতে চায়?'

'আরে দূর দূর, মেয়েমানুষ আবার কবি হয় নাকি? আয় পরিচয় করিয়ে দিই—ঐ দেখ পিচপিচ করে থুথু ফেলছে। কী সুন্দর করে থুথু ফেলছে দেখছিস? এই মেয়ের থুথু ফেলা দেখেই যে-কোনো ছেলে ওর প্রেমে পড়ে যাবে। কি, প্রেম-প্রেম লাগছে না।?'

আমি মাসুমের সঙ্গে এগুলাম। মাসুম হাসিমুখে বলল, 'এশা, আমার এই বন্ধু তোমার প্রেমে পড়ে গেছে। গভীর প্রেম।'

এশা মাথার চুল ঠিক করতে করতে বলল, 'কী দেখে প্রেমে পড়ল?'

'তোমার থুথু ফেলা দেখে। কাইন্ডলি আরেকবার ফেল।'

এশা সত্যি-সত্যি থুথু ফেলল। খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আরো ফেলতে হবে, না একটাতেই হবে?' আমি জবাব খুঁজে পেলাম না। ধারালো, অথচ সুন্দর জবাব চট করে মাথায় আসে না। আসে অনেক পরে। এশার এই প্রশ্নের তিনটি চমৎকার উত্তর পরদিন আমার মাথায় এসেছিল, অথচ সেই সময়ে বোকা ধরনের একটি হাসি দিয়ে মাসুমের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি ফেললাম। মাসুম সেই দৃষ্টি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে হাসিমুখে বলল, 'বীরু তোমাকে কবির বাড়িতে নিয়ে যাবে। বিখ্যাত লোকজনদের বাড়িঘর ওর মুখস্থ।' এই বলেই সে হাওয়া।

কবির বাসা খুঁজে পেলাম না। আমি নিজেই অবশ্য বাসা খুঁজে পাবার ব্যাপারে তেমন কোনো উৎসাহ দেখাই নি। হয়তো বাসায় যাব, ভদ্রলোক কথাই বলবেন না। কিংবা মেয়েটির মুখের উপর বলবেন 'কিচ্ছু হয় নি। কবিতা চট করে লেখা যায় না। সাধনা দরকার। বেশি-বেশি করে কবিতা পড়বে। চিন্তা করবে। চোখ-কান খোলা রাখবে।' কবিরা উঠতি কবি দেখলেই চমৎকার একটা ভাষণ দেন। সেই ভাষণ শুনলে গা-জ্বালা করে। বলতে ইচ্ছে করে—'দূর শালা, কবিতাই লিখব না।'

এটা অবশ্যি আমার কথা না। মাসুমের কথা। সে নাকি এ-রকম একটি ভাষণের পর এক কবিকে এই কথা বলে চলে এসেছিল। মাসুম একজন উঠতি কবি। এশার সঙ্গে সেই সূত্রেই খাতির। কবিতে-কবিতে ধুল পরিমাণ।

কবির বাসা খুঁজে না পেয়ে ফিরে আসছি। এশা বলল, 'আপনি কি কবিতা পড়েন?'

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ কিছুই পড়ি না। পড়বার ইচ্ছাও নেই।'

এশা খিলখিল করে হেসে উঠল। আরো অনেকের মতো আমিও হাসি শুনেই এশার প্রেমে পড়ি। ওর থুথু ফেলা দেখে নয়। এত সুন্দর করে যে কেউ হাসতে পারে, আমার ধারণা ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭

মাসুমের খোঁজে গেলে কেমন হয়?

ব্যাটা থাকে সব সময় বাইরে–বাইরে, কিন্তু আমি যে ক'বার তার বাসায় গিয়েছি তাকে পেয়েছি। তার বাসায় যাওয়াও খুব সোজা—মগবাজারের বাসে উঠে পড়লেই হয়। টঙ্গি ডাইভারশান রোডে নেমে দক্ষিণ দিকে মিনিট দশেক হাঁটা।

যাব নাকি মাসুমের কাছে? নাকি বাসায় ফিরে যাব? নাকি দু'টার কোনোটাই না–করে অন্য কোথাও যাব? মাসুমের কাছে গেলে সময়টা অবশ্যি ভালো কাটবে। সত্যি–মিথ্যা মেশানো মজার–মজার কিছু গল্প শোনা যাবে। এবং এশার ব্যাপারেও হয়তো কিছু জানা যাবে।

মাসুমকে বাসায় পাওয়া গেল না। তার মামা ঘর থেকে বেরুলেন। খুবই অভদ্র গলায় বললেন, 'তুমি কে?'

অন্য কেউ হলে আমি নরম গলায় বলতাম, 'আমি একজন মানব–সন্তান।' কিন্তু এই ভদ্রলোককে এটা বলা যাবে না। তিনি মাসুমের একমাত্র গার্জিয়ান। বড় সরকারী চাকরি করেন। জয়েন্ট সেক্রেটারি বা এই জাতীয় কিছু। এঁকে চটিয়ে দেবার কোনো অর্থ হয় না। আমি বিনীত গলায় বললাম, 'আমি ওর একজন ক্লাসফ্রেন্ড। বন্ধু বলতে পারেন।'

'কী রকম বন্ধু?'

'বেশ ভালো বন্ধু।'

'তোমরা কি রকম বন্ধুবান্ধব এই জিনিসটা আমাকে বল।'

'ব্যাপারটা কী, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আজকের খবরের কাগজ দেখ নি? তোমার বন্ধুর ছবি ছাপা হয়েছে। ফ্রন্ট পেইজে ছবি।

'আমি খবরের কাগজ পড়ি না।'

'ভালো কথা। খুব ভালো কথা। আমি ভেবেছিলাম খবরের কাগজ পড়ে তারপর এসেছ। নাও, এইখানে আছে। আগে পড়, তারপর কথা বল।'

খবরটা পড়লাম। ছবিও সত্যি–সত্যিই ছাপা হয়েছে। তবে বলে না দিলে বোঝা মুশকিল যে, এ মাসুম। আরো তিনটি ছেলে এবং গোটা দশেক মেয়ের সঙ্গে তোলা গ্রুপ ছবি। অসামাজিক কার্যকলাপের জন্যে পুলিশ এদের ধরেছে।

'পড়লে নিউজটা?'

'জ্বি, পড়লাম।'

'আমার বাবা ছিলেন মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল। সারাজীবনে একটা মিথ্যা কথা বলেন নি। এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা করেন নি। কারোর কি এই ঘটনা জানতে বাকি থাকবে, তুমিই বল। সারা বাংলাদেশের লোক এই ছবি দেখবে না?'

'সব পত্রিকায় ছাপা হয়েছে?'

'না, এই একটাতেই ছাপা হয়েছে। পত্রিকাটাই হচ্ছে ফাজিল ধরনের। আজেবাজে নিউজ দিয়ে ভর্তি থাকে। এই নিউজ কি ফার্স্ট পেইজে আসার মতো নিউজ? নিউজ করেছিস করেছিস, এত বড় একটা ছবি দেয়ার দরকার কি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সান্ত্বনার সুরে বললাম, 'মাসুমকে কিন্তু ছবিতে চেনা যাচ্ছে না। আপনি বলে না-দিলে চিনতে পারতাম না।'

ভদ্রলোক কিছুটা আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হল। গলার স্বর খানিকটা নামিয়ে বললেন, 'তোমার অনার্সের রেজাল্ট কি?'

এটা হচ্ছে আমাকে যাচাই করবার একটা চেষ্টা। আমি কী ধরনের ছাত্র। মাসুমের লেভেলের না উঁচু লেভেলের সেটা জেনে নেওয়া।

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, 'খুব একটা ভালো করতে পারি নি। অবশ্যি ফার্স্ট ক্লাস ছিল।' এই সরল মিথ্যাটি বললাম ভদ্রলোককে আরো ঠাণ্ডা করে দেবার জন্যে। আশা করা যাচ্ছে মাসুমের প্রতিও তিনি খানিকটা সদয় হবেন। ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া ছেলে তার ভাগ্নের বন্ধু, কাজেই ভাগ্নে খুব-একটা খারাপ হতে পারে না।

'ফার্স্ট ক্লাস ছিল?'

'জ্বি।'

'গুড, ভেরি গুড। তোমরা থাকতে পর এই অবস্থা কেন বল দেখি। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। ঘরে আমার বড়-বড় মেয়ে। খবরের কাগজ তো তারাও পড়েছে। কি ভাবছে কে জানে। তুমি বস, দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

আমি বসলাম।

'বেলের সরবত খাবে? আমার স্ত্রী বানাচ্ছে। খাও একটু। পেট ঠাণ্ডা থাকবে। খুব উপকারী জিনিস।'

তের-চৌদ্দ বছরের সুন্দর একটা মেয়ে এসে বেলের বরবত দিয়ে গেল। মাসুমের মামা অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে কথা বলতে লাগলেন, 'আমার স্ত্রী কমপ্লেইন করত, সে প্রায়ই নাকি মাসুমের মুখ থেকে মদের গন্ধ পায়। উল্টা আমি তাকে ধমক দিতাম। আমি বলতাম—মদের গন্ধ তুমি চেন নাকি? এখন তো মনে হচ্ছে সবই সত্যি! গাঁজাটাজাও বোধহয় খায়।'

'জ্বি-না, গাঁজা খায় না।'

'খায়, খায়। একদিন আমি নিজে তার ঘরে ঢুকে বিকট গন্ধ পেলাম। নাড়ি উল্টে আসে।'

'সস্তা সিগারেট খায় তো! ঐ সিগারেটের গন্ধ। নন-স্মোকারদের কাছে ঐ গন্ধই মনে হয় গাঁজার গন্ধ।'

'তাই-বা খাবে কেন? নেশার পেছনে এই বয়সেই সে পয়সা খরচ করবে কেন? এ হচ্ছে আমার বড় বোনের ছেলে। অল্পবয়সে তিনটা বাচ্চা নিয়ে বোন বিধবা হল। সেভেন্টি ওয়ানের বিধবা। সবাই ধরে-বেঁধে আবার বিয়ে দিল। এই হাজব্যান্ড বাচ্চাগুলি দেখতে পারে না। কী আর করব? আমরা ভাগাভাগি করে বাচ্চাগুলি নিয়ে নিলাম। এই হারামজাদাটা পড়ল আমার ভাগে। অথচ যখন প্রথম আনি—তখন কী শান্ত ছিল! লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত।'

আমি চুপ করে রইলাম। মাসুম সম্পর্কে এইসব তথ্য কিছুই জানতাম না। মাসুমের মামা বলছেনও বেশ সুন্দর করে। শুরুতে লোকটাকে যত খারাপ মনে হচ্ছিল, এখন দেখছি তা নয়। লোকটা ভালো মানুষ।

'মাসুম কি এখনো হাজতেই আছে নাকি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে না! হাজতে থাকবে কি! সকালে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছি। ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি। আজ অফিস কামাই হয়ে গেছে।'

'ও গেছে কোথায়?'

'যাবে আবার কোথায়? মোড়ের চায়ের দোকানে বসে আছে। দুপুরে ভাত খাবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে, আসে নি। তেজ দেখাচ্ছে। চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দিলে তেজ কমবে। হারামজাদা!'

'মামা, আমি তাহলে উঠি—দেখি ওকে পাই কি না।'

আমার মামা ডাকে ভদ্রলোক একেবারে গলে গেলেন। আমাকে এগিয়ে দেবার জন্যে গেট পর্যন্ত চলে এলেন। নিচু গলায় বললেন, 'বুঝিয়ে-সুজিয়ে পাঠিয়ে দিও। আর তোমার বন্ধু-বান্ধবরা সৎ পরামর্শ দিও। বাপ-নেই ছেলে। মাও তো বলতে গেলে নেই।'

৮

মাসুম মুখ লম্বা করে বসে আছে। আমাকে দেখে উঠে এল না। যেভাবে বসেছিল সেভাবেই বসে রইল। তার সামনে চায়ের কাপ। চায়ে চুমুক দেয় নি। ভরা কাপে দু'তিনটা সিগারেটের টুকরো ভাসছে। আমি তার সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, 'তুই তো বিখ্যাত হয়ে গেলি! ফ্রন্ট পেইজে ছবি চলে এসেছে।'

মাসুম ফিক করে হেসে ফেলল। যেন আমার কথায় মজা পেয়ে গেছে। সে হাসিমুখেই বলল, 'পাকেচক্রে আটকে পড়ে গেলামরে দোস্ত। ভিক্টোরিয়া পার্কে ব্যাপারটা ঘটল। আমি দরদাম কী করে হয় ঐটা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছি। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। দুই ধরনের মেয়ে আছে। এক ধরনের মেয়েদের হচ্ছে ফিক্সড্ প্রাইস, অন্য আরেক ধরন আছে মাছের দামের মতো। দরাদরি হতে থাকে। আমি হাঁ করে দেখছি। ফট করে এসে পড়ল পুলিশ। কুড়িটা টাকা পকেটে থাকলে পুলিশের হাতে দিয়ে চলে আসতে পারতাম, কিন্তু এমনই কপাল, পকেটে পয়সা ছিল না।'

আমি বললাম, 'পুলিশ কি তোকে ধোলাই দিল নাকি?'

'তেমন না। অল্পস্বল্প। পেটে একটা মাইল্ড ঘুসি। মুখেও দু'একটা মারল—সফ্‌ট্‌ ধরনের।'

'ঠোঁট তো মনে হচ্ছে ফাটিয়ে দিয়েছে। হাঁসতে এখন বোধহয় অসুবিধা হয়। হয় না?'

'তুই শালা রসিক আছিস। চা খাবি?'

'না।'

'এরা আফিং দিয়ে চা বানায়—খেয়ে দেখ এক কাপ। নেশা লেগে যাবে।'

'আফিং দিয়ে চা বানায় মানে?'

'কী-একটা যেন দেয়, খালি খেতে ইচ্ছা করে। আমি একবার পরপর আট কাপ চা খেয়েছি। তারপর দেখি মাথা ঘুরছে।'

'আবার মিথ্যা কথা বলছিস?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মিথ্যা বলব কেন?'

'তোর সামনেই তো এক কাপ চা পড়ে আছে। মুখেই তুলিস নি বলে মনে হচ্ছে।'

'মনটা ভালো নেই দোস্ত। মলিনার জন্যে খারাপ লাগছে। খুবই খারাপ লাগছে।'

'মলিনা কে?'

ধরা পড়েছে আমাদের সাথে। বড় ভালো মেয়ে। কী রকম ঠাণ্ডা চেহারা। চোখগুলির উপর ছায়া পড়ে আছে, এ-রকম মনে হয়। আর গলার স্বর কী যে অদ্ভুত! শুধু শুনতে ইচ্ছে করে। অল্প কিছুক্ষণ ওর কথা শুনলে নেশা ধরে যায়, মনে হয় খালি কথাই শুনি।'

'তুই তো দূরে দাঁড়িয়ে দরদাম করা দেখছিলি। এত কথা শুনলি কখন?'

'হাজতে কথা হয়েছে।'

'হাজতে তো যতদূর জানি ছেলেদের আর মেয়েদের আলাদা-আলাদা রাখে।'

মাসুম চুপ করে রইল। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

'উঠি রে মাসুম। বাসায় যা, তোর মামা মনে হচ্ছে পেরেশান। বাসায় গিয়ে ভাতটাত খা।'

মাসুম আমার সঙ্গে-সঙ্গে এল। নিচু গলায় বলল, 'এই কদিন আর কোথাও বেরুব-টেরুব না। ভাইভার ডেট দিলে জানাবি। শিগগির দেবে নাকি?'

'দিয়ে দিয়েছে।'

'দিয়ে দিয়েছে মানে?'

'দিয়ে দিয়েছে মানে দিয়ে দিয়েছে। সাত, আট, নয়।'

'সে কী! তাহলে তো আন্দোলন করতে হয়।'

'কি আন্দোলন?'

'পরীক্ষা পেছানোর অন্দোলন। পাশ করে করবটা কী? বেকার হবার চেয়ে ছাত্র থাকা ভালো না? কত রকম ফেসিলিটি।'

'কি ফেসিলিটি?'

মাসুম জবাব দিল না। বাস-স্ট্যান্ডে দু'জন খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। মোটামুটি ফাঁকা বাস একটা দাঁড়িয়েছিল। সেটায় উঠলাম না। কেন উঠলাম না কে জানে। পরের বাসটায় হয়তো গাদাগাদি ভিড় থাকবে। ঠেলাঠেলি করে তাতেই উঠব। আমরা সবাই কেমন অন্যরকম হয়ে গেছি। শুধু উল্টো কাজ করতে ইচ্ছা করে।

একটা মিছিল যাচ্ছে। নির্জীব ধরনের মিছিল। কোনোরকম উৎসাহ-উত্তেজনা নেই। কার চামড়া যেন তুলে নিতে চাচ্ছে, কিন্তু এমনভাবে বলছে যেন চামড়া তুলে নেয়াটা একটা আরামদায়ক ব্যাপার। মিছিলের পেছনে-পেছনে একটা পুলিশের গাড়ি। গাড়ির জানালায় মোটাসোটা একজন পুলিশ অফিসারের মুখ। ভদ্রলোককে খুবই ক্লান্ত মনে হচ্ছে। হাই তুলছেন।

'মাসুম।'

'বল্।'

'এশার সঙ্গে কি তোর ইদানীং দেখা হয়েছে?'

'পরশু হয়েছে।'

'ওর খবর কি বল তো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খবর কিছু জানি না। সিরাজের সঙ্গে খুব খাতির জমিয়েছে।'

'সিরাজটা কে?'

'মালদার পার্টি, এশার একটা কবিতার বই বের করে দিয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'হুঁ। আমার কাছে এক কপি বেচতে নিয়ে এসেছিল। পুশিং সেল। আমি বললাম—মাগনা দিলেও আমি এই বই নেব না।'

'সত্যি বই বের করেছে?'

'হুঁ।'

'আমার তো মনে হয় তুই আবার মিথ্যা কথা বলছিস।'

'মাঝে–মাঝে সত্যি কথাও বলি।'

'বইটার নাম কি?'

'নাম জানি না। আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই।'

মাসুম আগ্রহ নিয়ে মিছিলের দিকে তাকাচ্ছে। মিছিল দেখলেই সে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করে। এখনো করছে সম্ভবত। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ঢুকে পড়বে।

মাসুম পিচ করে এক দলা থুথু ফেলে বলল, 'মাদি মার্কা একটা মিছিল বের করেছে। নেতাটাকে দেখছিস? পান খাচ্ছে, আঙুলে আবার চুন। এই শালা মিছিল করবে কি? কিছু একটা করা দরকার বীরু।'

'কী করবি?'

'পুলিশের জীপে দুটা ইটের চাক্কা মারলেই খেল জমে যাবে। আয় না!'

'পাগল।'

'দেশটা কেমন ঝিম মেরে গেছে। উত্তেজনা নেই। ফায়ার নেই। ঐ শালা নেতার দিকে তাকিয়ে দেখ্—হারামজাদা এখন সিগারেট ধরাচ্ছে—দাঁড়া খেল জমিয়ে দিই। ভেলকি লাগিয়ে দেব। পটকা–ফটকা থাকলে ভালো হত।'

আমি উদ্বিগ্ন গলায় বললাম, 'আমি বাসে উঠে বিদায় হয়ে নিই, তারপর যা ইচ্ছা করিস।'

'তাড়াতাড়ি চলে যা। হেভি গ্যাঞ্জাম লাগিয়ে দেব।'

আমি দ্রুত বাসে উঠে পড়লাম। মাসুম চোখমুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে কাণ্ড কিছু একটা করবে। আমার বাস চলে না–যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে কি না কে জানে। আমি বাসের জানালা গলে হাত নাড়লাম। মাসুম দেখল কি না বুঝলাম না, মুখ শক্ত করে আগের মতোই দাঁড়িয়ে রইল। বাস ছেড়ে দিল। দেখতে দেখতে ঝড়ের গতি। প্রতিটি বাস এবং ট্রাকের ড্রাইভাররা সম্ভবত নিয়তিবাদী। যা হবার হবে এই রকম একটা ভাব করে এক্সিলেটার চাপতে থাকে। সামনে বড় রকমের জটলা থাকলে হয়তো–বা চোখও বন্ধ করে ফেলে। মতি মিয়া নামের একজন ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে আমার খানিকটা আলাপ আছে। তার কাছে শুনেছি, ঢাকা শহর নাকি একজন 'কামেল আদমির' কন্ট্রোলে আছে। সেই 'কামেল আদমির' হুকুম ছাড়া কিছু হবার উপায় নেই। কাজেই সাবধান হয়ে ট্রাক চালালে যে–কথা, অসাবধান হয়ে চালালেও সেই একই কথা। অ্যাকসিডেন্ট হবার হলে হবেই।

সেই কামেল আদমির ঠিকানাও মতি মিয়া জানে। একদিন আমাকে নিয়ে যাবে, এ-রকম কথা আছে। ভেবে রেখেছি যাব। দেখে আসব। পৃথিবীতে দেখার জিনিসের শেষ নেই। অনেক কিছুই তো দেখলাম, একজন কামেল আদমিও দেখে আসি। মনে-মনে ভদ্রলোকের একটা চেহারাও কল্পনা করে রেখেছি। তিন মণের মতো ওজন (এখন পর্যন্ত কোনো রোগা পীর আমার চোখে পড়ে নি। ঐশ্বরিক ব্যাপার-স্যাপার এবং শরীরের মেদ—এই দুয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে বলে আমার ধারণা)। ভদ্রলোকের গা থেকে নিশ্চয়ই ভুরভুর করে আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে। চোখে সুর্মা দেওয়ায় চোখ দু'টি দেখাবে কোমল। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরও হবে মোলায়েম—যাকে বলে সিল্কি ভয়েস। এঁদের সব কিছুই মোলায়েম থাকে। গলার স্বর মোলায়েম, কথাবার্তা মোলায়েম, শরীর মোলায়েম—শুধু অন্তরটি কঠিন। একাত্তুরে তাই দেখা গেছে।

বাস বড় রকমের একটা ঝাঁকুনি খেয়ে হঠাৎ চলতে শুরু করল, আর ঠিক তখন এশাকে দেখলাম। রাস্তা পার হচ্ছে। তার রাস্তা পার হবার টেকনিকটি চমৎকার। ডান-বাম কোনো দিকেই তাকাবে না। মাথা নিচু করে ছোট-ছোট পা ফেলবে। ভাব দেখে মনে হবে সে অন্ধ এবং বধির। গাড়ির হর্ন, রিকশার টুনটুন কিছুই তাকে স্পর্শ করবে না। একদিন রাগ করে বলেছিলাম, কী সব ছেলেমানুষী কর! কোনো অসাবধান ড্রাইভার যদি তোমার উপর গাড়ি তুলে দেয়, তখন?'

'তুলবে না।'

'তুলবে না। এ রকম মনে করার কারণ কি?'

'কারণ হচ্ছে, ওরা যখন দেখবে খুবই অসাবধান একটি মেয়ে রাস্তা পার হচ্ছে, তখনি সাবধান হয়ে যাবে।'

'ওরা নাও তো দেখতে পারে।'

'উঁহুঁ দেখবেই। কারণ আমি একজন রূপবতী মেয়ে। রূপবতী একটি মেয়েকে দেখবে না, তা কি হয়! আর যদি গাড়ি তুলেই দেয়, রাস্তায় মরে পড়ে থাকব। বিখ্যাত একজন কবি রাস্তায় মরে পড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে একটা মিল পাওয়া যাবে।'

'বিখ্যাত কবিটা কে?'

'জীবনানন্দ দাশ।'

আমি অবলীলায় বললাম, 'সে আবার কে?' এশা আহত গলায় বলল, 'ঠাট্টা করছ?'

'না, ঠাট্টা করব কেন? নামও শুনি নি।'

'সত্যি নাম শোন নি?'

'উঁহুঁ।'

'একজন শিক্ষিত ছেলে হয়ে তুমি এসব কী বলছ?'

'আমি শিক্ষিত—এই কথাটা তোমাকে বলল কে?'

এশা ফোঁস করে বলল, 'আমার হাত ছাড়।'

আমি হাসিমুখে বললাম, 'আমি তোমার হতে ধরে নেই। হাত ছাড়ার কথা উঠছে কেন?' এশা একটু যেন লজ্জা পেল। আর আমার মনটা হল খারাপ। এশা যেভাবে বলল, আমার হাত ছাড়—তা থেকে মনে হয় অনেকেই নিশ্চয়ই এশার মন খারাপ করে দেবার মতো কিছু কথাবার্তা তার হাত ধরে রেখেই বলে। তখন এশা বলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার হাত ছাড়। বলতে-বলতে এটা তার অভ্যেস হয়ে গেছে।

যে-কেউ এশার হাত ধরতে পারে। এশা তাতে কিছুই মনে করে না।

জীবনানন্দ দাশের নাম আমি কেন শুনব না? আমাদের কাজই হচ্ছে বিখ্যাত লোকদের নাম শোনা। প্রতিভাবান ব্যক্তিদের প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হওয়া। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবা, আহা রে—আমি কেন এ-রকম হতে পারলাম না! ঈশ্বরের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ যদি কখনো হয়, তাহলে অবশ্যই তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হবে—জনাব, আপনি অল্প কিছু মানুষকে প্রতিভা দিয়ে পাঠালেন আর আমাদের বানালেন ভেজিটেবল। এই কাজটি উচিত হল? সাম্যবাদী স্পিরিট আপনার মধ্যে কেন এল না বলুন তো?'

এশাকে অবাক করে দেবার জন্যে জীবনানন্দের দু'টা কবিতা মুখস্থ করে ফেললাম। তেমন কোনো সুযোগ পেলে আবৃত্তি করা যাবে। তিন মাসের মধ্যে কোনো সুযোগ পাওয়া গেল না। এশার সঙ্গে বেশ কয়েক বার দেখা হল। দু'বার গুলিস্তানের মোড়ে, এক বার এলিফেন্ট রোডে, বেশ কয়েক বার মধুর ক্যান্টিনে। এইসব জায়গায় নিশ্চয় বলা যায় না—

"ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে
শিয়রে বৈশাখ মেঘ—শাদা শাদা যেন কড়ি শঙ্খের পাহাড়
নদীর ওপার থেকে চেয়ে রবে—কোন এক শঙ্খবালিকার
ধূসর রূপের কথা মনে হবে........

অবশ্যি একবার কবিতা শোনাবার সুযোগ তৈরি হল। এশার সঙ্গে রিকশা করে যাচ্ছি। মেঘলা দুপুর। মোটামুটি ফাঁকা রাস্তা। রিক্‌শাওয়ালাও বুড়ো—আমাদের কথাবার্তা কিছু শুনছে বলে মনে হচ্ছে না। এশার মন খুব তরল অবস্থায় আছে বলেও মনে হল। আমি কবিতাটা মনে-মনে এক বার আবৃত্তি করে নিলাম, যাতে ঠিক সময়ে আটকে না যায়—

'ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে
শিয়রে... ....।'

দ্বিতীয় লাইনে গণ্ডগোল হয়ে গেল। শিয়রে কী, তাই ভুলে গেলাম। বৈশাখ মাস, নাকি ভাদ্র মাস? মনে হচ্ছে শিয়রে খুব সম্ভবত আষাঢ় মাস। কারণ এই মাসটা নিয়েই কবিদের মাতামাতি বেশি।

এশাকে কবিতা শোনানো হল না। ভালোই হল—হয়তো সে হেসে ফেলত। তার পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। মুনিরুজ্জামান নামের এক ছোকরা অধ্যাপক একবার এশাকে প্রেম নিবেদন করেছিল। গদগদ গলায় বলেছিল, 'এশা, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

এশা তৎক্ষণাৎ বলেছে, 'আমিও আপনাকে ভালবাসি। কাজেই শোধবোধ হয়ে গেল। এখন আর ঐ নিয়ে কথা বলবেন না।'

মুনিরুজ্জামান পরবর্তী সময়ে এশাকে নিয়ে অনেক আজেবাজে কথা রটিয়েছিল। এশা তাতে খুব মজা পেয়েছে।

এত কাছ দিয়ে এশা চলে গেল, অথচ তাকে ডাকা গেল না। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। সারাদিন তাকে খুঁজছি, এখন দেখা পেলাম অথচ ডাকতে ইচ্ছা হল না। আমরা বড় অদ্ভুত প্রাণী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসায় ফিরলাম পাঁচটায়।

ধীরেন কাকু বারান্দায় মুখ শুকনো করে বসে আছেন। বারান্দায় ডাক্তার বসে থাকা মানেই কিছু-একটা ঝামেলা হয়েছে। মার সেই ব্যথা কিংবা বাবার কাশি। তবে গুরুতর কিছু নয়। সে-রকম হলে ডাক্তার বারান্দায় বসে চুকচুক করে চা খেত না। ধীরেন কাকু বললেন 'বীরু, কোথায় ছিলে সারাদিন?'

'একটা ইনটারভ্যু ছিল কাকা।'

'তোমার বাবাও তাই বলছিলেন, এদিকে তো যমে-মানুষে টানা-টানি হচ্ছিল। তোমার বাবার কথা বলছি। হঠাৎ কাশি—সেই কাশির সঙ্গে হলুদ রঙের ডিসচার্জ কিছু ব্লাডও আছে।'

'বলেন কী?'

'এখন একটু ভালো, ঘুমুচ্ছেন। শোন বীরু, আমার তো মনে হয় তাঁকে হাসপাতালে ট্রান্সফার করা দরকার। তোমার চেনাজানা কেউ আছে?'

'জ্বি-না।'

'ধরাধরি ছাড়া তো কিছু হবে না। হাসপাতালের গিয়ে একটু খোঁজ নিয়ে দেখ। অনেক সময় টাকাপয়সা দিয়েও কাজ হয়। যাও, ভেতরে যাও। আমি আছি কিছুক্ষণ। ঘুম ভাঙুক। ভয়ের কিছু নেই।'

আমি পা টিপে-টিপে ভেতরে ঢুকলাম। আমি ভেবেছিলাম মা এবং পারুল দু' জনেই আমাকে দেখামাত্র মুখ কঠিন করে ফেলবে। এমন একটা ভঙ্গি করবে, যেন মহা পাষণ্ড এইমাত্র বাড়ি ফিরছে—যার বাবা মারা যাচ্ছে, অথচ এ নিয়ে যার কোনো মাথা ব্যথা নেই, বুকে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাস্তবে তা হল না। মা আমাকে দেখে অসম্ভব খুশি হয়ে গেলেন। আনন্দে তাঁর মুখ ঝলমল করতে লাগল। এই আনন্দ ভরসা ফিরে পাওয়ার আনন্দ। আমাকে হাত ধরে রান্নাঘরে টেনে নিয়ে গেলেন। ফিসফিস করে বললেন, 'এখন ভালো। খুব ভালো। ঘুমাচ্ছে।'

'শুরু হল কখন?'

'তুই যাওয়ার পরপরই। পানি খেতে চাইলেন, পানি দিলাম। পানি খাওয়া শেষ করেই কাশি। প্রথমে অল্প, তারপর চোখটোখ উল্টে যাবার মতো অবস্থা!'

'বল কী!'

'যা ভয় পেয়েছিলাম না বীরু!'

'ভয়ের কী আছে? মানুষের অসুখ হয় না? অসুখ হয়, চিকিৎসা করলে সুস্থ হয়।'

'তুই যা, তোর বাবাকে দেখে আয়। শব্দ করিস না, উঠে পড়বে।'

আমি পা টিপে-টিপে বাবার ঘরে ঢুকলাম। গা কেমন যেন শিরশির করছে। খুব জ্বর আসবার আগে যেমন হয়, তেমন। গলা বুক শুকিয়ে কাঠ।

বাবাকে পরিষ্কার দেখা গেল না। ঘর অন্ধকার। বাবার উপর একটা মশারি ফেলে দেওয়া। মাছির উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্যে এই ব্যবস্থা। দিনের বেলা ঘুমালেও বাবা মশারি ফেলে দেন। পারুল, হাতপাখা নিয়ে মশারির ভেতর বসে আছে। ক্রমাগত হাওয়া করছে। কতক্ষণ ধরে করছে কে জানে। এ-ঘরে একটা সিলিং-ফ্যান আছে। কয়েল পুড়ে যাওয়ায় ফ্যান ঘুরছে না। সামান্য ক'টা টাকা হলেই কয়েল ঠিক করা যায়। টাকাটার ব্যবস্থা বাবা সম্ভবত করে উঠতে পারছেন না। আমি পা টিপে-টিপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রান্নাঘরে চলে এলাম!

মা রান্না চাপিয়েছেন। হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। তিনি অতি দ্রুত বেগুন কুটছেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আজ দুপুরে কারো খাওয়া হয় নি, বুঝলি। কী যে ঝামেলা গিয়েছে! মুনিরের মাকে দিয়ে একটা মুরগীর বাচ্চা আনিয়ে ছদকা দিলাম। জানের বদলে জান।'

'ভালো করেছ।'

'ডাক্তারবাবু যা করেছেন বলার না! তুই এটা খুব খেয়াল রাখবি বীরু! উনার কোনো বিপদ হলে জান দিয়ে পড়বি।

মা চোখ মুছলেন। 'লোকটা যা করেছে—কেউ কারো জন্যে এ-রকম করে না।'

'খারাপ ডাক্তাররা মানুষ হিসেবে ভালো হয় মা।'

'ছিঃ, এটা কী রকম কথা! খারাপ ডাক্তার হবে কী জন্যে?'

'এমনি বলছি। ঠাট্টা করছি।'

'এ-রকম ঠাট্টা আর করবি না বীরু!'

'আর করব না।'

'ডাক্তারবাবুকে এখন বল চলে যেতে। কতক্ষণ বেচারা বসে থাকবে! তোর বাবার ঘুম ভাঙলে খবর দিয়ে নিয়ে আসবি।'

ধীরেন কাকু ঝিমুচ্ছিলেন। আমার কথা শুনে বাসায় চলে যেতে রাজি হলেন। শুকনো গলায় বললেন, 'হাসপাতালের ব্যবস্থাটা কর। আমি অবস্থা ভালো দেখছি না। হার্টের বিট রেগুলার না, ইরেগুলার। মাঝে-মাঝে কেমন যেন থেমে-থেমে যাচ্ছে।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত বাবা ঘুমুলেন। এই সময়টার মধ্যে আমি মার কাছে অন্য একটা খবরও পেলাম।

'তোর কাছে একটা মেয়ে এসেছিল রোগা-পাতলা, খুবই মিষ্টি চেহারা।'

'কখন এসেছিল?'

'তোর বাবাকে নিয়ে যখন যমে-মানুষে টানাটানি হচ্ছে তখন। কোনো কথাই বলতে পারি নি। কথা আর কি বলব বল, আমার নিজের কি তখন হুঁশ-জ্ঞান আছে? বাড়িওয়ালার বৌ এসেছিল, সে বলছে—আপা মাথা উত্তর-দক্ষিণ করে দিন।'

'মাথা উত্তর-দক্ষিণ করে দিতে হবে কেন?'

'মরবার সময় তাই করার নিয়ম।'

'এই অবস্থা হয়েছিল নাকি?'

'হয়েছিল।'

সন্ধ্যা মিলাবার আগেই মা এবং পারুল ভাত নিয়ে বসে গেল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে তারা অসম্ভব ক্ষুধার্ত। আমি বাবার ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালালাম, বাবা জেগে উঠে বললেন, 'কে?'

'বাবা, আমি। আমি বীরু।'

'বাতি নিভিয়ে দে।'

বাতি নিভিয়ে খাটের কাছে এগুতে গিয়ে কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেলাম। ঝনঝন শব্দে কী যেন নিচে পড়ল।

বাবা ভারি গলায় বললেন, 'কে, বীরু?'

'হুঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ইন্টারভ্যু কেমন হয়েছে রে?'

'ভালো।'

'কী রকম ভালো?'

'বেশ ভালো। মনে হচ্ছে লেগে যাবে।'

'পেরেছিলি সব?'

'হ্যাঁ। দু' একটা মিস হয়েছে।'

আশ্চর্য! মিথ্যা কথা বলতে আমার মোটেও আটকাচ্ছে না। অবলীলায় মিথ্যা বলছি। মনে হচ্ছে মাসুমের চেয়েও ভালো বলছি। মিথ্যাটাকে আমার নিজের কাছেই সত্যি বলে মনে হচ্ছে।

'কোনটা পারিস নি?'

'রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর তারিখ জিজ্ঞেস করল, ঐটা পারি নি।

'২২শে শ্রাবণ। পারিস নি কেন?'

'মনে ছিল না বাবা।'

'খুব অন্যায়। গ্রেটম্যানদের মৃত্যুর তারিখ জন্মের তারিখ সব মুখস্থ থাকা দরকার।'

'অন্য সব পেরেছি। ইন্টারভ্যু বোর্ডের চেয়ারম্যান জিজ্ঞেস করলেন মফস্বলে পোস্টিং দিলে আপনার আপত্তি আছে'?

'তুই কী বললি?

'বললাম—না।'

'খুব ভালো করেছিস। পোস্টিং একবার হলে ট্রান্সফার করা কঠিন না।'

'তা ঠিক।'

বাবা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তোর আজকের ইন্টারভ্যু ভালো হবে জানতাম। সব খারাপ জিনিসের সাথে একটা ভালো জিনিস থাকে। অসুখটা যখন খুব বেড়ে গেল, তখনি বুঝলাম তোর ইন্টারভ্যু ভালো হচ্ছে।'

বাবা আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি পা টিপে-টিপে আমার নিজের ঘরে চলে এলাম। পারুল কিছুক্ষণ পর চা নিয়ে ঢুকল। সে খুব ভয় পেয়েছে। মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে আছে। সে টেবিলে চা নামিয়ে রেখে বলল, 'ভাইয়া ঐ মেয়েটা বলে গেছে আজ সন্ধ্যাবেলা নিউমার্কেটে বইয়ের দোকানগুলোর সামনে তুমি যেন যাও। খুব নাকি দরকার।'

'কী দরকার কিছু বলে নি?'

'না। কিন্তু ভাইয়া, তুমি ঘরে ছেড়ে যাবে না। বাবার অবস্থা খুবই খারাপ। তুমি আগে দেখ নি, তাই কিছু বুঝতে পারছ না। বুঝলে?'

'হ্যাঁ, বুঝলাম।'

'মেয়েটা কে?'

'আমাদের সঙ্গে পড়ে।'

'মেয়েটার সঙ্গে কোনো কথাই বলতে পারি নি। তাকে আরেক দিন আসতে বলবে?'

আমি হ্যাঁ-না কিছু না-বলে শার্ট গায়ে দিলাম। পারুল তীক্ষ্ণ গলায় বলল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কোথায় যাচ্ছ?'

'ধীরেন কাকু বলেছেন হাসপাতালে একটু খোঁজ নিতে, সিট পাওয়া যায় কি না।'

পারুল আমার কথা বিশ্বাস করল না। তার চোখ দিয়ে ঘৃণা ফুটে বেরুচ্ছে। আমার ইচ্ছা করছে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিতে। কারণ আমি সত্যি-সত্যি হাসপাতালেই যাচ্ছি। যাবার আগে দু' এক মিনিটের জন্যে নিউমার্কেটে হয়তো থামব। সেটা বিরাট কোনো অন্যায় নিশ্চয়ই হবে না।

টুকু লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে।

যখন কারো সঙ্গেই কথা বলতে ইচ্ছ করে না তখনই টুকুর সঙ্গে দেখা হয়। তার হাত থেকে সহজ নিষ্কৃতি বলে কোনো কথা নেই। গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে কথা বলবে। চলে যেতে চাইলে হাত চেপে ধরবে। পেছনে পেছনে আসবে।

টুকু সরু গলায় ডাকল, 'দোস্ত।' আমি না শোনার ভান করলাম।

'দোস্ত একটা কথা শুনে যা।'

'আমার কাছে টাকা-পয়সা নেইরে টুকু। দোস্ত-দোস্ত বললে কোনো লাভ হবে না।'

'টাকাপয়সার দরকার নেই। আল্লাহ্র কসম। বিশ্বাস কর্ আমার পকেটভর্তি টাকা। দরকার হলে তুই কিছু নে সত্যি বলছি নে।'

টুকু একগাদা এক শ' টাকার নোট বের করল। চকচকে নোট। আমি হকচকিয়ে গেলাম।

'দোস্ত তুই নে। কত লাগবে বল?'

'লাগবে না কিছু।'

'লাগবে লাগবে। চাচাজানের কথা শুনেছি। পানির মতো টাকা খরচ হবে। ডাক্তার-ফাক্তার কত হাঙ্গামা! তার উপর ধর—আল্লাহ্ না করুক সত্যি-সত্যি যদি কিছু হয় তখন তো.....

আমি বহু কষ্টে নিজেকে সামলালাম। টুকুর উপর রাগ করা অর্থহীন। কেন রাগ করছি তা বোঝার ক্ষমতা তার নেই। আমি কঠিন স্বরে বললাম, 'পথ ছাড় টুকু, কাজ আছে।'

'এক মিনিট দোস্ত। জাস্ট ওয়ান মিনিট। একটা খুবই জরুরি কথা। তোর পায়ে ধরছি দোস্ত, শুনে যা।'

টুকু সত্যি-সত্যি নিচু হয়ে আমার পা চেপে ধরল।

'বল কী বলবি।'

'টাকা কীভাবে পেয়েছি সেটা বলব।'

'বলার দরকার নেই। বুঝতে পারছি।'

'তুই যা ভাবছিস, তা না দোস্ত। আপঅন গড। মজুমদার সাহেব আমাকে টাকাটা দিয়েছেন। সন্ধ্যাবেলা ডাকিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর একটা খামের মধ্যে করে দিয়ে দিলেন। তিন হাজার এক শ' টাকা।'

'কেন দিল?'

'সেটা বলে নি। বলেছে—টুকু, আমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললাম—দেব। তখন মজুমদার সাহেব খামটা দিলেন।'

'কাজটা কি?'

'সেটা তো দোস্ত বলে নি। পরে বলবে। অ্যাডভান্স পেমেন্ট। রাত আটটার সময় যেতে বলেছে।'

'ভালোই তো, যা।'

'কিন্তু দোস্ত মনটা খারাপ। কী কাজ কে জানে!'

'মানুষ-মারা কাজ। কাউকে মেরে ফেলতে বলবে।'

টুকু হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, 'পথ ছাড়। কাজ আছে।'

'টাকাটা কি ফিরিয়ে দেব দোস্ত?'

'তোর ইচ্ছা।'

'ফেরত দেব কীভাবে? হাজার টাকার মতো খরচ হয়ে গেছে। একটা গরম শাল কিনলাম।'

'ভালোই করেছিস, অস্ত্রপাতি লুকিয়ে রাখার জন্যে শাল হচ্ছে চমৎকার জিনিস।'

টুকু ছোট করে নিঃশ্বাস ফেলল। নিচু গলায় বলল, 'তুই কিছু টাকা রেখে দে দোস্ত। তোর কাছ থেকে এক টাকা দু'টাকা করে মেলা নিয়েছি।'

'আমার লাগবে না। যাই রে টুকু।'

টুকু আমার সঙ্গে-সঙ্গে আসতে লাগল। সে আসবেই। রিকশায় না-ওঠা পর্যন্ত সে আসবে। রিকশায় ওঠার পরও সে অনেকক্ষণ রিকশা ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

'দোস্ত একটা বুদ্ধি দে। কী করব—যাব মজুমদারের কাছে?'

'টাকা নিয়েছিস, যাবি না মানে? না গেলে মজুমদার তোকে ছাড়বে?'

'যদি সত্যি-সত্যি মানুষ মারার কথা বলে, তখন কী করব?'

'একটা লম্বা ছুরি সাথে করে নিয়ে যা। তোর নতুন শালের আড়ালে লুকিয়ে রাখবি। মানুষ মারার কথা বললে ছুরিটা বের করে ওর ভুঁড়ির মধ্যে বসিয়ে দিবি।'

'ঠাট্টা করছিস কেন রে দোস্ত? একটা সিরিয়াস প্রবলেম।'

'ঠাট্টা করছি তোকে বলল কে? ওকে মারতে পারলে তোর আগের সব পাপ কাটা যাবে।'

টুকু ফ্যাকাসেভাবে হাসতে লাগল। তার কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। থরথর করে ঠোঁট কাপছে। একটা হাত প্যান্টের পকেটে। এক শ' টাকার চকচকে নোটগুলি সে নিশ্চয়ই এই হাতে ধরে আছে। নতুন নোটের স্পর্শের মতো আরামদায়ক আর কিছুই নেই। আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, 'চলি রে টুকু।'

৯

নিউমার্কেটে এশার সঙ্গে দেখা হল।

কী সুন্দর তাকে লাগছে! এশা হচ্ছে সেই রকম মেয়ে, যাকে যেদিন দেখা যায় সেদিনই মনে হয় সে সাজের নতুন কোনো কায়দা করেছে—যার জন্যে তাকে অন্য যে-কোনো দিনের চেয়ে সুন্দর লাগছে। আজ তাকে লাগছে ইন্দ্রাণীর মতো। হালকা নীল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রঙের একটা শাড়ি। সেই নীলের ছায়া যেন চোখেও পড়েছে। যেমন নীল–নীল লাগছে তার চোখ। সে নরম গলায় বলল, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি আসতে পারবে না। তোমার বাবার শরীর কেমন?'

'ভালো।'

'সত্যি ভালোতো? আমি খুব খারাপ দেখেছিলাম।'

'এখন চমৎকার! খাওয়াদাওয়া করে বারান্দায় বসে আছেন।'

'আশ্চর্য তো!'

'একে বলে মিরাকুলাস রিকভারি। ধীরেনবাবু বলে আমাদের একজন ডাক্তার আছেন, তিনি যাকে বলে সাক্ষাৎ নীলরতন রায় কিংবা এই জাতীয় কিছু। এক ডোজ কী খাইয়ে দিয়েছেন—বাবা উঠে বসে বললেন, 'হুক্কা বোলাও।'

'ঠাট্টা করছ?'

'আরে না! বাবা অসুস্থ থাকলে আসতাম নাকি?'

'আমার কেন জানি মনে হয় অসুস্থ থাকলেও তুমি আসতে। পুলিশ–বক্সের সামনে যেতে বলেছিলাম। গিয়েছিলে, তাই না?'

'হুঁ।'

'তুমি যাবার কিছুক্ষণ পরই আমি গেলাম। এক পুলিশ অফিসার আমাকে খুব যত্ন করল। তোমার নাকি খুব বন্ধু।'

'বোসম ফ্রেন্ড। পুলিশের কোনো হেল্প লাগলে বলবে, ব্যবস্থা করে দেব। ডেকেছ কেন, ব্যাপারটা কি?'

'এক জায়গায় আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'বলছি। খুব তৃষ্ণা লেগেছে। দাঁড়াও, পানি খেয়ে নিই। খুব ঠাণ্ডা পানি খেতে ইচ্ছা করছে।'

'ঠাণ্ডা পানি এখানে পাবে কোথায়?'

'পাব। ওষুধের দোকানগুলোতে ফ্রিজ থাকে। ওরা ফ্রিজে ঠাণ্ডা পানি রাখে। মিষ্টি করে চাইলে দেয়।'

এশা এত মিষ্টি করে পানি চাইল যে, ফার্মেসির ছেলেটি বলল, 'আপা বসুন, পানি দিচ্ছি।'

'বসব না ভাই। এক জায়গায় যেতে হবে।'

এশা পানি খেল অনেক সময় নিয়ে। যেন পানি না—চা খাচ্ছে। তার কপালে খুব সূক্ষ্ম ঘাম। ঠোঁট দু'টি ফ্যাকাসে। কিছু একটা নিয়ে সে মনে হচ্ছে খুব চিন্তিত।

আমি বললাম, 'আমরা যাব কোথায়?'

'মগবাজারের দিকে।'

'ব্যাপারটা কি?'

'বলব। যেতে–যেতে বলব। একটা রিকশা নাও। রোগা দেখে একজন রিকশাওয়ালা নেবে, যে খুব আস্তে–আস্তে যাবে। যত দেরিতে পৌঁছানো যায় ততই ভালো। আমার ভয় করছে।'

কোনো রিকশাওয়ালা মগবাজারে যেতে রাজি না। সেখানে নাকি বিরাট গণ্ডগোল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে। বাস পুড়েছে, পুলিশের জিপ পুড়েছে। দোকান ভাংচুর হয়েছে। একটা ঘড়ির দোকান লুট হয়েছে। পুলিশের গুলিতে দু'জন নাকি মারাও গেছে।

নির্ঘাত মাসুমের কাণ্ড। একটা কিছু সে নিশ্চয় ঘটিয়েছে। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, মগবাজারে এত বড় কাণ্ড ঘটল, তার কোনো ছাপ এখানে নেই। দিব্যি দোকানপাট খোলা, ব্যবসাবাণিজ্য চলছে।

এক বুড়ো রিকশাওয়ালাকে পাওয়া গেল। সে সম্ভবত মগবাজারের গণ্ডগোলের কথা জানে না। ভাড়াও চাইছে কম। বুড়ো রিকশাওয়ালাগুলো খুব কম ভাড়া চায়। এত কষ্ট করে রিকশা টানে যে, শেষ পর্যন্ত দু'টা টাকা বাড়তি দিতে হয়, তার পরেও মনে অনুশোচনা গেঁথে থাকে বুড়ো লোকটাকে কষ্ট দেবার জন্যে।

এশা বলল, 'হুড নামিয়ে দাও। হাওয়া খেতে-খেতে যাই।'

রিকশাওয়ালা এতই কমজোরি যে, হুড নামাতে গিয়েই পরিশ্রমে সে হাঁপাচ্ছে।

১০

আমি হালকা গলায় বললাম, 'তোমার কবিতার বই চলছে কেমন?' এশা অবাক হয়ে বলল, 'কি কবিতার বই?'

মাসুম বলল, 'কী-একটা বই নাকি বের হয়েছে? জনে-জনে সেই বই জোর করে বিক্রি করছ।'

এশা তরল গলায় হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বলল, 'মাসুমটা এত মিথ্যা কথা বলে কেন বল তো? তার লাভটা কী? কী আনন্দ পায়?'

'বই তাহলে বের হয় নি?'

'না। তবে একদিন নিশ্চয়ই হবে। আমার প্রথম বইটার নামও ঠিক করে রেখেছি। নাম জানতে চাও?'

'না।'

'না চাইলেও বলছি—নাম হচ্ছে রজনী। নামটা কেমন?'

আমি তার উত্তর না দিয়ে বললাম, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা বল।'

'বলছি। এক মিনিট লাগবে বলতে। তার আগে বল রজনী নামটা কেমন?'

'শরৎচন্দ্র মার্কা।'

'আমারও তাই মনে হয়। তবে প্রথম কবিতার নামে বইটার নাম! প্রথম কবিতাটার নাম হচ্ছে 'রজনী'। ভরা দুপুরের রোদে হাঁটলে আমার কেন জানি মনে হয় এটা দুপুর না, গভীর রাত। কড়া রোদটাকে এক সময় মনে হয় চাঁদের আলো। ঐ নিয়ে লেখা। খুব সুন্দর হয়েছে।'

'সুন্দর হলে তো ভালোই।'

'বলব কয়েকটা লাইন? শুনবে?'

'না।'

'আহ্, শোন না। ভালো না লাগলেও তো অনেকে অনেক কিছু করে। এই যে তুমি তোমার অসুস্থ বাবাকে ফেলে আমার সঙ্গে যাচ্ছ, তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগছে না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু তো তুমি যাচ্ছ। কি, যাচ্ছ না?'

'কোথায় যাচ্ছি সেটা বল।'

এশা তা বলল না, নিচু গলায় তার রজনী কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল। তার গলা ভার-ভার হয়ে গেল। মনে হচ্ছে তার চোখে জল টলমল করছে। তার কবিতায় নিশ্চয়ই এমন কিছু দুঃখের ব্যাপার নেই। অন্য কোনো দুঃখের কান্না সে এই কবিতা বলার ফাঁকে কেঁদে নিচ্ছে।

আমি এশার হাতে হাত রাখলাম। অনেক দিন পরপর এশার সঙ্গে আমার দেখা হয়। তার হাতে হাত রাখার মতো সুযোগ প্রায় কখনোই হয় না।

এশা কবিতা আবৃত্তি থামিয়ে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল, 'মানুষ হিসেবে তুমি বেশ অদ্ভুত। এতক্ষণ পর তুমি আমার হাতে হাত রাখলে? তাও ধরলে বাঁ হাত।'

আমি চমকে হাত সরিয়ে নিলাম। এশা ফিসফিস করে বলল, 'হাত সরিয়ে নিও না। আমি জানি আজই শেষ। আর কোনোদিন তুমি আমার হাতে হাত রাখবে না। পাশাপাশি হাঁটবে না।'

'এর মানে কি?'

'মানে কিছু নেই। এমনি বললাম। আমরা এসে গেছি। রিকশা ছেড়ে দাও। এখান থেকে হেঁটে হেঁটে যাব।'

স্ট্রিট-লাইট নেই। রাস্তাঘাট গণ্ডগোলের জন্যেই হয়তো অতিরিক্ত ফাঁকা। আমার নিজেরই ভয়ভয় লাগছে, এশার কেমন লাগছে কে জানে। তার ভাবভঙ্গিতে কিছু প্রকাশ পাচ্ছে না। আমরা মূল রাস্তা ছেড়ে একটা গলির ভেতর ঢুকে পড়লাম। এশা আমার হাত ধরে ছোট-ছোট পা ফেলছে। এক সময় সে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার জীবনটা খুব কষ্টে-কষ্টে কেটেছে। ছোটবেলায় বাবা মরে গিয়েছিলেন। মা আবার বিয়ে করলেন। মার সঙ্গে নতুন সংসারে চলে এলাম। অচেনা-অজানা একজন নির্বোধ মানুষকে বাবা ডাকতে লাগলাম। নতুন সংসারে তিনটা ভাইবোনের জন্মের পর মা মারা গেলেন। আমার অবস্থাটা চিন্তা করে দেখ। এমন একটা সংসারে বড় হচ্ছি, যার সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই। বুঝলে বীরু, খুব ছোটবেলা থেকেই আমি স্বাধীনভাবে বড় হতে চেয়েছি। নিজেকে অন্যরকম করতে চেয়েছি। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে আলাদা, এটা আমি কখনো মেনে নিতে চাই নি। সহজভাবে মিশি ছেলেদের সঙ্গে। চমৎকার কিছু ছেলেদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, সেই সঙ্গে কিছু আজেবাজে ধরনের ছেলেদের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে।'

এশা চুপ করল। বড় করে শ্বাস টানল। আমার যে-হাত এতক্ষণ ধরে ছিল, সেই হাত ছেড়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আমার পেটে একটা বাচ্চা আছে। তাকে নষ্ট করে ফেলতে হবে।' আমার একা খুব ভয় লাগছে। তুমি অল্প কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে থাক। যদি মরেটরে যাই তুমি বাসায় খবর দিও। এই জন্যেই তোমাকে এনেছি।'

এশা কথাগুলো বলল খুব সহজ ভঙ্গিতে। যেন খুবই সাধারণ একটা খবর দিচ্ছে। কথা শেষ করে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। গাঢ় বেদনার কোনো ছায়া সে নিঃশ্বাসে নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১

আমরা দাঁড়িয়ে আছি একটা ক্লিনিকের সামনে। এশা আমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। এক সময় কালো মোটা একজন নার্স এসে আমাকে বলল, 'আমাদের ওয়েটিং রুম আছে। আপনি ভেতরে এসে বসুন। সময় লাগবে।'

আমি রাত এগারোটা পর্যন্ত বসে রইলাম। রাত এগারটায় এক জন ডাক্তার এসে বললেন, 'আপনি এখন চলে যেতে পারেন। রুগী ভালো আছে, ঘুমুচ্ছে। আজ রাতটা এখানে থাকতে হবে।'

আমি বললাম, 'রুগীকে কি একটু দেখতে পারি?'

'হ্যাঁ, পারেন। আসুন আমার সঙ্গে।'

এশা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। কম পাওয়ারের একটা টেবিল ল্যাম্প তার মাথার কাছে। সেই আলোয় কী সুন্দরই না তাকে দেখাচ্ছে! মাথার পাশের জানালাটা খোলা। সাদা পর্দা থরথর করে কাঁপছে। জানালার ওপাশে বিপুল অন্ধকার।

আমি নিচু হয়ে এশার হাত স্পর্শ করলাম। আমি কোনো দিন এশার হাতে হাত রাখব না, এশা এই কথাটি ঠিক বলে নি। আমি আবার তাকে ছুঁয়েছি।

নার্স অদ্ভুত চোখে আমাকে দেখছে। আমি বললাম, 'সিস্টার, আমি কি এখানে কিছুক্ষণ বসতে পারি?'

১২

আমি চুপচাপ বসে আছি। আকাশে মেঘ ডাকছে। জানালার পর্দা কাঁপিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। ঝমঝম শব্দ হচ্ছে। বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। নিশ্চয়ই আজ সারা রাত প্রবল বর্ষণ হবে। আমি বসেই আছি। রাত বাড়ছে। আমি অপেক্ষা করছি। কিসের অপেক্ষা? আমি জানি না।

মানুষ হয়ে জন্মানোর সবচে বড় কষ্ট হচ্ছে মাঝে-মাঝে তার সবকিছু পেছনে ফেলে চলে যেতে ইচ্ছা করে কিন্তু সে যেতে পারে না। তাকে অপেক্ষা করতে হয়। কিসের অপেক্ষা তাও সে ভালোমতো জানে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাঁদের আলোয় কয়েকজন যুবক

"When I am dead, dearest,
Sing no sad songs for me;
Plant thou no roses at my head,
Nor shady cypress tree.

আসুন, আপনাদের কয়েকজন যুবকের একটি গল্প বলি।

গল্পটি মিথ্যা, তবে যে শহর নিয়ে এই গল্প সেই শহরটি সত্যি। যে চাঁদের আলোয় গল্প সাজানো হয়েছে, সেই চাঁদের আলোও সত্যি। যাদের নিয়ে এই গল্প তারাও আছে এবং গল্পের ঘটনাটিও সত্যি-সত্যি ঘটেছিল। তাহলে শুরুতে কেন বললাম গল্পটি মিথ্যা? এরকম বলার কারণ হচ্ছে চাঁদের আলো। ঘটনাটি ঘটেছিল এক আশ্বিন মাসের রাতে—উথাল-পাথাল জোছনায়। উথাল-পাথাল চাঁদের আলো একটি অদ্ভুত ব্যাপার। এই আলোয় এক ধরনের ভ্রান্তি মিশে থাকে। সেই ভ্রান্তির কারণে সত্যিকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্যি বলে মনে হয়। আসুন তাহলে গল্প শুরু করি। প্রথমেই গল্পের যুবকদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেই। প্রথম যুবকটির নাম আলম।

১

শামসুল আলম।

সে তিন বছর আগে সোসিওলজিতে এম. এ. পাশ করেছে। তার বয়স পঁচিশ। একহারা গড়ন। লম্বাটে মুখ। চোখ দু'টি বড় বড় বলেই সব সময় সে বিস্মিত হয়ে চেয়ে আছে—এরকম মনে হয়। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে ডাকা হত 'খোকা বাবু' বলে। এই নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তার চরিত্রে শান্ত ভাবটি প্রবল।

তিন বছর ধরে শামসুল আলম চাকরি খুঁজছে। এই তিন বছরে একবার সে চাকরির নিয়োগপত্র পেল। একটি প্রাইভেট কোম্পানির সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ।

চাকরির শর্ত হচ্ছে, নিয়োগের আগে দু'জন গেজেটেড অফিসারের ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট এবং জামানত হিসেবে নগদ কুড়ি হাজার টাকা জমা দিতে হবে। কুড়ি হাজার টাকার ব্যবস্থা না হওয়ায় চাকরি হল না। ভাগ্যিস হয় নি! কারণ কোম্পানিটা ছিল ভূয়া। আলমের পরিচিত এক জন কুড়ি হাজার টাকা জমা দিয়েছিল। তাকে কাগজপত্র দিয়ে চিটাগাং অফিসে যেতে বলা হল। দেখা গেল টিচাগাং-এর ঠিকানায় একটা রেস্টুরেন্ট চলছে। ঐ কোম্পানির নামও কেউ শোনে নি।

আলমের বাবা সাইফুদ্দিন সাহেব ছোটখাটো মানুষ। তিনি একটি ইনস্যুরেন্স কোম্পানির মাঝারি ধরনের অফিসার। ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে যারা চাকরি করে, তারা সহজে কারো উপর রাগ করে না। সাইফুদ্দিন সাহেবও করতেন না—শান্তশিষ্ট নির্বিরোধী মানুষ ছিলেন তবে ইদানীং তাঁরও ধৈর্য-চ্যুতি হয়েছে। তিনি প্রায়ই বলছেন যে, আলমের মতো বড় গাধা তিনি তাঁর জীবনে দেখেন নি। তিন বছরে যে একটা চাকরি জোগাড় করতে পারে না সে তো গাধারও অধম। অবশ্যি এই কথাগুলো তিনি সরাসরি আলমকে বলেন না, কারণ, তাঁর বড় ছেলেকে তিনি বেশ পছন্দ করেন।

শেষ পর্যন্ত আলম একটা চাকরি পেল। কোনোরকম ইন্টারভ্যু ছাড়াই চাকরি। ফরিদপুর আবু নসর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। স্কুল কমিটির সেক্রেটারি তাকে জানালেন যে, স্কুলটি অতি মনোরম স্থানে অবস্থিত। স্কুলের আর্থিক অবস্থাও ভালো। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহেই বেতন হয়। শিক্ষকদের থাকার জায়গা আছে। পল্লী বিদ্যুতায়ন প্রকল্পে অতিসত্বর স্কুলে বিদ্যুৎ চলে আসবে, ইত্যাদি।

আলমের এই চাকরি নেবার কোনো ইচ্ছা নেই। তার মন বলছে, একবার এই চাকরিতে ঢুকলে আর বের হওয়া যাবে না। তবে সাইফুদ্দিন সাহেব তাকে প্রবল চাপের মধ্যে রাখছেন। রোজই বোঝাচ্ছেন—স্কুল মাস্টারি খারাপ কী? এডুকেশন লাইন হচ্ছে বেস্ট লাইন, দেশের সেবা হবে। পড়াশোনা নিয়ে থাকবি। স্কুল টিচারদের এখন নানান রকম সুযোগ-সুবিধা। গ্রামের মধ্যে টাকা খরচের জায়গা নেই। বেতন যা পাবি সবটাই জমবে। শহরের পাঁচ হাজার টাকা আর গ্রামের দু'হাজার টাকা হচ্ছে ইকুভেলেন্ট। তাছাড়া মাস্টারি করতে করতে বি. সি. এস-এর প্রিপারেশনও নিতে থাক। বইপত্র সঙ্গে নিয়ে যা। নিরিবিলিতে পড়বি। এদিকে খোঁজ খবরতো আমরা করছি। আমেরিকাতে তোর ছোট মামাকে বলা আছে, কোনো ব্যবস্থা করতে পারলে তোকে নিয়ে যাবে।

আমেরিকার ছোট মামা হচ্ছে আলমদের পরিবারের বাতিঘর। কোনো সমস্যা হলেই তাঁর কথা সবার মনে পড়ে। সবার ধারণা, তাঁকে চিঠি লিখলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। চিঠি লেখা হয়—কখনো কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। ছোট মামা নববর্ষ উপলক্ষে চমৎকার সব কার্ড পাঠান। সেই সব কার্ডের কোণায় লেখা থাকে— 'কার কী লাগবে জানাও।' এই পর্যন্তই।

সাইফুদ্দিন সাহেব আলমকে সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা এই তিন বেলা বোঝাতে চেষ্টা করেন, স্কুল মাস্টারি ব্যাপারটা যে কত ভালো। সকালের যুক্তি বিকাল এবং সন্ধ্যাতেও দেন। আলম মাথা নিচু করে শোনে। কিছু বলে না।

'বিসমিল্লাহ বলে জয়েন করে ফেল। একবার মাস্টারি শুরু করলেই যে সারাজীবন করতে হবে এমনতো কথা নেই। আমিওতো মাস্টারি দিয়ে শুরু করেছিলাম। দু'মাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাস্টারি করেছি। এই দুই মাস ছিল আমার জীবনের বেস্ট পার্ট। বেতন ছিল ত্রিশ টাকা। তোকে কত দিবে?'

'একুশ শ'।'

'মেলা টাকা। গ্রামে থাকবিতো, কাজেই দেখবি পুরো টাকাটা সেভ হয়ে গেছে। মন খারাপ করিস না। আল্লাহর নাম নিয়ে চলে যা।'

'আচ্ছা।'

'দশটা টাকাও যদি সংসারে আসে তাহলেও সংসারে সুসার হয়। অবস্থাতো নিজের চোখেই দেখছিস। দেখছিস না?'

'দেখছি।'

সংসারের অবস্থা আলম দেখবে না কেন দেখছে, সে তো অন্ধ না। সংসারের অবস্থা ভয়াবহ। আগে এ রকম ছিল না, দেখতে দেখতে হয়ে গেল। আলমের ছোট ভাই কামরুল বি. এ. পরীক্ষার দু'মাস আগে প্রায় ছ'ফুট লম্বা, ভীষণ ফর্সা এক মেয়ে নিয়ে এসে উপস্থিত। মেয়েটিকে সে না–কি কোর্ট ম্যারেজ করেছে। না করলে উপায় ছিল না। মেয়েকে জোর করে তার বাবা–মা বিয়ে দিয়ে দিচ্ছিল।

সাইফুদ্দিন সাহেব হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'হারামজাদাকে জুতিয়ে বাড়ি থেকে বের কর। হারামজাদার ছায়া যেন আমি না দেখি।'

তাঁর সংহার মূর্তি দেখে জড়সড় হয়ে থাকা লম্বা মেয়েটি কেঁদে–কেটে অস্থির। সাইফুদ্দিন সাহেবের হৃদয়ে এই দৃশ্যও কোনো ছায়াপাত করল না। তিনি হুংকার দিয়ে বললেন, 'লম্বুকে নিয়ে এক্ষুনি বের হ। এক্ষুনি। ইমিডিয়েট।'

তারা অবশ্যি কোথাও গেল না। যাবে কোথায়? যাবার জায়গা নেই। কামরুল শুধু পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল। নতুন মেয়েটি দেখা গেল কাঁদার ব্যাপারে খুব এক্সপার্ট। সারাক্ষণই কাঁদছে। এই ঘটনার তিন মাসের মধ্যে খুলনা থেকে আলমের বড় বোন রীতা এসে উপস্থিত।

তার সঙ্গে চারটা বড় বড় স্যুটকেস এবং তিন মেয়ে। রীতা এম্নিতেই বেশ হাসি–খুশি। দেখা গেল তার এবারের হাসি–খুশির মাত্রা অন্যবারের চেয়েও বেশি। সব কিছু নিয়েই হাসছে, মজা করছে। মাকে বলল, 'তোমার সঙ্গে কয়েক মাস থাকব মা। খুলনার লোনা পানি সহ্য হচ্ছে না।'

মা বললেন, 'বেশতো থাকবি। তোর মেয়েদের স্কুলের ক্ষতি হবে না তো?'

'না। ওদের বাবা এসে ওদের নিয়ে যাবে।'

'তুই থাকবি?'

'হুঁ।'

'তুই একা থাকবি কী ভাবে?'

'বললামতো মা, খুলনার লোনা পানি সহ্য হচ্ছে না। মাথার চুল পড়ে যাচ্ছে। এক সময় দেখবে মাথায় টাক পড়ে যাবে।'

'তোর কী হয়েছে সত্যি করে বলতো?'

'বললামতো কিছু হয় নি। লোনা পানি সহ্য হচ্ছে না।'

রীতা কিছু না বললেও জানা গেল ব্যাপার জটিল। বেশ জটিল। রীতার স্বামী কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজার মুখলেস সাহেব দু'মাসের মধ্যে কোনো খোঁজ খবর করলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু মনি অর্ডার করে রীতার মার নামে আড়াই হাজার টাকা পাঠালেন। রীতা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'এই টাকা যদি তোমরা রাখ তাহলে আমি ট্রাকের সামনে লাফিয়ে পড়ব। আল্লাহর কসম আমি ট্রাকের সামনে ঝাঁপ দেব।' টাকা ফেরত গেল। কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজার মুখলেস সাহেব আর কোনোরকম খোঁজ খবর করলেন না। সাইফুদ্দিন সাহেব উকিলের চিঠির মারফত জানতে পারলেন, চারিত্রিক দোষের কারণে মুখলেসুর রহমান তাঁর স্ত্রী মাসুদা রহমান ওরফে রীতাকে ইসলামী বিধি মোতাবেক তালাক দিয়েছেন। তার তিন কন্যা বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মাসুদা রহমানের সঙ্গেই থাকবে এবং তাদের খরচপত্র দেয়া হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সাইফুদ্দিন সাহেব হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন।

প্রথমবার বি. এ. ফেল করার পর কামরুল দ্বিতীয়বারও ফেল করল। যেদিন রেজাল্ট হল তার পরদিন তার স্ত্রী দু'টি জমজ বাচ্চা প্রসব করে মর-মর হয়ে গেল। মেয়ে মানুষের জীবন সহজে বের হয় না বলেই সে কোনোক্রমে টিকে গেল। কামরুলের বর্তমানে একমাত্র কাজ হচ্ছে দুই বাচ্চাকে কোলে করে ঘুম পাড়ানো এবং রাতে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করা। ঝগড়ার এক পর্যায়ে বলা, 'খবরদার আমি কিন্তু খুন করে ফেলব। সত্যি খুন করে ফেলব। খুন করে ফাঁসি যাব।'

তার স্ত্রী এই কথার উত্তরে খুবই ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'দয়া করে তাই কর। খুন করে দেখাও যে একটা কাজ তুমি করতে পার। একেবারে অপদার্থ তুমি না।'

'কি আমাকে অপদার্থ বললি?'

'হ্যাঁ বললাম। অপদার্থকে অপদার্থ বললে দোষ হয় না।'

ঘরে তখন হুটোপুটির শব্দ শোনা যায়। জমজ বাচ্চা দু'টি এক সঙ্গে কাঁদতে থাকে। সাইফুদ্দিন সাহেব চটি ফটফটিয়ে এগিয়ে আসেন। দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলেন, 'হচ্ছে কী এসব? এই হারামজাদা জুতিয়ে তোকে ঠাণ্ডা করব। এক্ষুনি তুই তোর লম্বুকে নিয়ে বেরিয়ে যা। এই মুহূর্তে। খোল হারামজাদা, দরজা খোল।'

কামরুল দরজা খোলে না। তবে হুটোপুটির শব্দ থেমে যায়। জমজ বাচ্চা দু'টি শুধু চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কাঁদে। সাইফুদ্দিন সাহেব চোখে অন্ধকার দেখেন। আলমও অন্ধকার দেখে। গাঢ় অন্ধকার।

আজ আশ্বিন মাস।

বারই আশ্বিন। পূর্ণিমার সন্ধ্যা। শহরে পূর্ণিমার চাঁদ সন্ধ্যা মেলাবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় না। বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। শহরের মানুষ পূর্ণিমার চাঁদ নিয়ে মাথা ঘামায় না। পূর্ণিমা অমাবস্যা শহুরে ব্যাপার নয়।

আলম আজকের পূর্ণিমার ব্যাপারটা বুঝতেই পারল না। সন্ধ্যা মেলাবার পর সে যথারীতি প্রাইভেট টিউশনিতে বেরিয়ে গেল। তাদের বাসার কাছেই তিথি নামের একটা মেয়েকে সে ইংরেজি পড়ায়। মেয়েটি দু'বছর ধরে এস. এস. সি. দিচ্ছে। এইবার নিয়ে হবে তৃতীয় দফা। মনে হচ্ছে এবারও কোনো উনিশ-বিশ হবে না। তিথির চেহারাটা মিষ্টি, তার চোখের মণি দু'টিতে এক ধরনের স্নিগ্ধতা আছে। সে কথাও বলে গানের মতো সুরে। মাঝে-মাঝে মাথা নিচু করে এমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসে যে, আলমের ইচ্ছে করে তার পিঠে হাত রেখে বলতে— 'এই কী হয়েছে? এত হাসি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিসের?'

আলম তিথিকে পড়াতে গেলেই ভাবে—এরকম চমৎকার একটা মেয়ে পড়াশোনায় এত গাধা হল কী করে? দু'মাস ইংরেজি টেনস পড়াবার পরেও আমি ভাত খাই—এর ইংরেজি সে লেখে—I am rice eating.

আলম তিথিদের বাড়ির দরজার কলিং বেলে হাত রাখার আগেই তিথি বেরিয়ে এসে বলল, 'আজতো স্যার পড়ব না।'

'পড়বে না কেন?'

'আজ পূর্ণিমা!'

'পূর্ণিমাতে পড়া যায় না না-কি?'

'যায়। যাবে না কেন? তবে আমার মামাতো বোনরা সবাই এসেছে। আমরা ঠিক করেছি শাড়ি পড়ে আজ সারা রাত ছাদে বসে গান করব।'

'তুমি গানও জান?'

'আমিতো স্যার ছায়ানটে গান শিখি। আমার এবার থার্ড ইয়ার। থার্ড ইয়ারে আমি ফার্স্ট হয়েছি।'

'পড়াশোনা ছাড়া আর সবই দেখি তুমি ভালো জান।'

তিথি মিষ্টি করে হাসল। আলম বলল, 'আমি কি তাহলে চলে যাব?'

'স্যার, এক মিনিট দাঁড়ান। আপনার বেতন আব্বা আমার কাছে দিয়ে গেছেন।'

'মাসতো এখনো শেষ হয় নি।'

'আব্বা সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন, পনেরদিন পরে ফিরবেন।'

টাকা নেবার সময় তিথির আঙুলের ছোঁয়া লেগে গেল। তিথি এমন চমকে উঠল যে আলম অবাক হয়ে তাকাল। তিথি মাথা নিচু করে আছে। তার শরীর কাঁপছে। তিথি ক্ষীণ স্বরে বলল, 'স্যার একটু চা খেয়ে যান।'

'না থাক।'

'চা বানানোই আছে। যাব আর নিয়ে আসব। একটু বসুন। আমার মামাতো বোনেরা আপনাকে দেখতে চায়।'

আলম বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমাকে দেখতে চায় কেন?'

তিথির ঠোঁটে ক্ষীণ একটা হাসির রেখা। কিছু একটা বলতে গিয়েও সে বলল না। আলম বলল, 'আজ আমার একটু কাজ আছে। আজ যাই। তোমরা যাও ছাদে বসে গান কর।'

'আমরা স্যার আজ সারারাত গান করব। আমার ফুফাতো বোনরাও আসবে।'

'ভালো। খুব ভালো।'

তিথিদের বাড়ি থেকে বের হয়েই আলম টাকা গুনল। তিনশ টাকা করে দেবার কথা। প্রায়ই টাকা কম থাকে। গত মাসে বিশ টাকা কম ছিল। এর আগের মাসে ছিল দশ টাকা কম। দশ বিশ টাকা কম হলে সেটা আর বলা যায় না। মেজাজ শুধু অসম্ভব খারাপ হয়ে যায়। আজ হিসেব ঠিক আছে। দু'টা একশ টাকার নোট, দুটা পঞ্চাশ টাকার নোট। আলম একটা পঞ্চাশ টাকার নোট আলাদা করে রাখল। বাকি টাকাটা মাকে দিয়ে দিতে হবে। ঘরে টাকা পয়সার অবস্থা খুবই খারাপ। সকালে পুরানো খবরের কাগজ এবং টিনের কৌটা বিক্রি করে বাজার হয়েছে। তাও চিনি কেনা হয় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিনির অভাবে ভোরবেলা চা হয় নি।

বাড়িতে পা দিতেই আলমের মা বললেন, 'তোর কাছে টাকা আছে নাকিরে আলম! বৌমার বাচ্চাগুলির দুধ শেষ হয়ে গেছে। বাকির দোকানে পাঠিয়েছিলাম। বাকি দিচ্ছে না। তোর বাবা নিজে গিয়েছিলেন। দোকানদার তাকে কী সব বলেছে, ঘরে এসে উনি কামরুলের সঙ্গে আজে-বাজে সব কথা বললেন। বউটা তখন থেকে কাঁদছে।'

'কী বলেছেন বাবা?'

'সব সময় যা বলেন তাই বলেছেন। কামরুলকে বলেছেন—তুই তোর তালগাছ নিয়ে বেরিয়ে যা। নিজের পথ দেখ। বউটা তখন থেকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে। তুই কোনোখান থেকে কিছু টাকা আনতে পারবি?'

আলম আড়াই শ' টাকা মার হাতে দিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'আমি একটু বাইরে যাচ্ছি মা। ফিরতে দেরি হবে।'

'যাবি কোথায়?'

'এই রাস্তায় ঘুরব। যাব আবার কোথায়?'

'তুই কি স্কুলের চাকরিটা নিবি?'

'জানি না। নিতেও পারি।'

'নিয়ে নে বাবা। না নিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে—এদিকে রীতার আবার.......

তিনি কথা শেষ করলেন না। আলম বলল, 'বড় আপার আবার কী হয়েছে?'

'না কিছু না। তুই কি রাতে ভাত খাবি?'

'হ্যাঁ, খাবার ঢাকা দিয়ে রেখো।'

আলম এসে বারান্দায় এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। লম্বা মেয়েটা বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার গাল ভেজা, ভেজা গালে চাঁদের আলো পড়েছে। সমস্ত মুখ চিক-চিক করছে। আলমের ইচ্ছা হল বলে—তুমি বাবার কথায় কিছু মনে করো না। অভাবে অনটনে বাবার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি তোমার বাচ্চা দু'টির কাছে যাও।

কথাগুলো বলা হল না। এই মেয়েটির সঙ্গে আলমের কখনো কথাবার্তা হয় না। কেমন যেন লজ্জা লজ্জা লাগে।

আলম রাস্তায় নেমেই পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিল পঞ্চাশ টাকার নোটটা ঠিক আছে কি-না। ঠিক আছে। নোটটা খরচ করা যাবে না। এ মাসের কয়েকটা দিন এবং সামনের মাসের ত্রিশ দিন পড়ে আছে।

আলম আকাশের দিকে তাকাল। তখনি প্রথম বারের মতো চোখে পড়ল আকাশে বিশাল চাঁদ উঠেছে। চট করে যে কথাটা তার মনে হল তা হচ্ছে—তিথিরা কি গান শুরু করেছে?

আলম হাঁটছে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। সে কোথায় যাবে এখনো ঠিক করে নি। হয়ত কোথাও যাবে না। রাস্তায় রাস্তায় হাঁটবে। একা হাঁটতে ইচ্ছা করছে না। মজিদের কাছে গেলে কেমন হয়? মজিদের কাছে গেলে সময়টা ভালো কাটবে। তবে মজিদ অনেকটা দূরে থাকে। উত্তর শাহজাহানপুরে। এত দূরে সে যাবে? যাওয়া যায়। মজিদের কাছে গেলে ভালো লাগবে। মনটা কেমন হয়ে আছে। মজিদের সঙ্গে গল্প গুজব করলে মনটা ভালো হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

দ্বিতীয় যুবকের নাম মজিদ। আবদুল মজিদ। আবদুল মজিদের কাছে এলে তার বন্ধু-বান্ধবদের সময় ভালো কাটে এই তথ্য মজিদের ফুপু এবং ফুপা দু'জনের কেউই জানেন না। তারা মজিদকে চেনেন এক জন অপদার্থ, অকর্মণ্য স্বল্পবুদ্ধির মানুষ হিসেবে—ইতোমধ্যেই চোর হিসেবে যার কিঞ্চিৎ অখ্যাতি রটেছে।

মজিদ ছোটখাটো এক জন মানুষ। সাধারণত ছোটখাটো মানুষের স্বাস্থ্য ভালো হয়, মজিদের তা না। সে বেশ রোগা। স্কুলে তার নাম ছিল স্ক্রু ড্রাইভার। এই বিচিত্র নামের তেমন কোনো ইতিহাস নেই। স্কুলে প্রতিভাবান ছেলে হিসেবে তার খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা দুই-ই ছিল। তবে তার প্রতিভা পড়াশোনার খাতে বয় নি। তার প্রতিভার সবটাই ছিল অনুকরণে। সে যে কোনো মানুষের চরিত্র একটি কথা বা ক্ষুদ্র একটি ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলতে পারত। আর পারত উল্টো কথা বলতে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে উল্টো করে জবাব দিত এবং তা এত দ্রুত বলে দিত যে মনে হত সে এই ভাবেই কথা বলে। যেমন কেউ যদি বলত, 'কেমন আছিস মজিদ।' সে বলত, 'লোভা, ইতু নমকে।' অর্থাৎ ভালো, তুই কেমন?

তার উল্টো কথা বলার খ্যাতি স্কুলের হেড স্যারের কানেও পৌঁছেছিল। তিনি তাকে একদিন ডাকিয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ তার উল্টো কথা বলার বিদ্যা পরখ করলেন এবং শেষ মেষ বললেন, 'তুই একটা অসাধারণ ছেলে। ভালো মতো পড়া লেখা করিস। আর কোনো অসুবিধা হলে আমাকে বলিস।'

মজিদ ঘাড় কাত করে চলে এল তবে তার অসুবিধার কথা স্যারদের বা বন্ধু-বান্ধবদের কাউকে বলল না। যে দিন তার বাবা মারা গেল তার পরদিনও সে স্কুলে এল এবং অন্যান্য দিনের চেয়েও অনেক বেশি হাসি তামাশা করতে লাগল। 'সেদিন দু'জনে দুলেছিনু বনে' গানটি সঠিক সুরে উল্টো করে গেয়ে সারা স্কুলে একটা হৈ-চৈ ফেলে দিল।

তার এত প্রতিভা তেমন কাজে লাগল না। মেট্রিক পরীক্ষায় পর-পর দু'বার ফেল করার পর মজিদের ফুপা তাকে তাঁর রেশন সপে ঢুকিয়ে দিলেন। বর্তমানে তার কাজ হচ্ছে চাল, চিনি এবং গম ওজন করা এবং তার ফুপা জমির সাহেবের কাছে গাল খাওয়া। জমির সাহেবের ধারণা মজিদের মতো বড় গাধা বাংলাদেশে আর জন্মে নি। ভবিষ্যতেও যে জন্মাবে সেই সম্ভাবনাও ক্ষীণ।

ইদানীং তাঁর মনে হচ্ছে মজিদ শুধু যে গাধা তাই নয় খানিকটা হাত-টানের অভ্যাসও আছে। মাঝে-মধ্যে রেশন সপে চিনি কম পড়ছে। একবার কম পড়ল পাঁচ সের, আরেকবার তিন সের। তার কিছু দিন পর দেখা গেল আটার একটা বস্তা উধাও।

তিনি মজিদের হাতে একটা কোরাণ শরীফ দিয়ে বললেন, 'সত্যি কথা বল হারামজাদা। সত্যি কথা না বললে তোকে খুন করে ফেলব। বস্তা গেল কোথায়?'

মজিদ নিরীহ ভঙ্গিতে বলল, 'আমি জানি না।'

'হাতে কোরাণ শরীফ আছে, খবরদার মিথ্যা কথা বলবি না।'

'মিথ্যা কথা শুধু শুধু কেন বলব?'

'তুই বস্তা বিক্রি করে দিস নাই?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না।'

'সত্যি কথা বল।'

'বলেছি তো।'

'বস্তা কোথায় গেল তুই জানিস না?'

'জ্বি না।'

জমির সাহেব আর রাগ সামলাতে পারলেন না, প্রচণ্ড একটা চড় কষালেন। মজিদ উল্টে পড়ে গেল। মজিদের ফুপু বললেন, 'থাক বাদ দাও।'

জমির সাহেব বললেন, 'বাদ দাও মানে? একটা আটার বস্তায় কত আটা থাকে তুমি জান? এই হারামজাদা আমাকে শেষ করবার জন্যে এসেছে। এই শোন, তুই এক্ষুনি বিদায় হ। এক্ষুনি। তোকে যেন এই বাড়ির ত্রিসীমানায় না দেখি।'

মজিদ মেঝে থেকে উঠতে উঠতে বলল, 'জ্বি আচ্ছা।'

জমির সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 'আবার জ্বি আচ্ছা বলে? এত বড় সাহস আবার বলে জ্বি আচ্ছা।'

তিনি আরেকটি চড় কষালেন। এই চড়ের জন্যে মজিদ প্রস্তুত ছিল বলে সে পড়ল না।

'বেরিয়ে যা, এক্ষুনি বেরিয়ে যা। বিছানা বালিশ নিয়ে যা। চোরের চোর। আমার দোকান ফাঁক করে দিচ্ছে।'

মজিদ বিছানা-বালিশ নিয়ে বের হয়ে গেল। রাতটা কাটাল রেশন সপের বারান্দায়। পরদিন যথারীতি কাজ করতে লাগল। রেশন কার্ডে দাগ দিয়ে-দিয়ে জিনিস ওজন করা। জমির সাহেব কিছু বললেন না। মজিদকে বিদায় করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। তার জন্যে তাকে কোনো বেতন দিতে হয় না। মজিদ কোনো হাত খরচ চায় না। সাপ্তাহিক ছুটি চায় না। মাঝে-মাঝে জমির সাহেব যখন নতুন কাপড় কিনে দেন সে এমন ভঙ্গি করে যেন নিজের সৌভাগ্য সে বিশ্বাস করতে পারছে না। নতুন কাপড় পড়ে প্রতিবারই সে ফুপা এবং ফুপুকে কদমবুসি করে।

ছলছল চোখে তাকায় যেন সে আনন্দে কেঁদে ফেলবে। ফুপা ফুপুর প্রতি তার ভক্তি শ্রদ্ধার কোনোরকম ঘাটতি দেখা যায় না। তবে রাতে ঘুমুতে যাবার আগে সে বেশ কয়েকবার বলে, 'নখু রেক বলফে' যার মানে 'খুন করে ফেলব।'

আজ আশ্বিনের এই পূর্ণিমার রাতে মজিদের হাতে কোনো কাজ ছিল না। রেশন সপ শুক্র, শনি এই দুই দিন বন্ধ থাকে। আজ হচ্ছে শনিবার।

মজিদ বারান্দায় বসেছিল। আকাশের চাঁদের দিকে তার চোখ ছিল না। সে তাকিয়ে ছিল তার বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে। গতকাল পাল্লার দড়ি ছিড়ে দশ কেজি ওজনের বাটখারা তার নখে এসে পড়েছে। নখ একেবারে থ্যাতলে গেছে। গাঁদা ফুলের পাতা চিবিয়ে নখে বেশ কয়েক বার দেয়া হয়েছে। লাভ হয় নি। বাঁ পা আজ খানিকটা ফুলেছে। যন্ত্রণাও হচ্ছে প্রচণ্ড। মজিদ দু'হাতে বাঁ পা চেপে ধরে মুখ কুঁচকে বুড়ো আঙুলের নখটার দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক এই সময় আলম বাইরের গেট থেকে ডাকল, 'এই মজিদ!'

মজিদ মুখ না তুলেই বলল, 'রেতভি য়আ' (অর্থাৎ ভিতরে আয়)। আলম বলল, 'কী করছিস?' মজিদ বলল, 'দেখছিস না কী করছি? পা ধরে বসে আছি। একেই বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কপাল। নিজের পা নিজেকে ধরতে হয়।'

আলম বলল, 'তোর পায়ে কী হয়েছে?'

'ছুকি না (কিছু না)।'

'চল বের হই।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে মজিদ উঠে দাঁড়াল। আলম তার অনেক দিনের বন্ধু। স্কুলে তারা এক সঙ্গে পড়েছে। তারা যখন রাস্তায় নামল ঠিক তখন ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের একটি ডি.সি. টেন ঢাকার আকাশে চক্কর দিচ্ছে। নামবার জন্যে ট্রাফিক কনট্রোলের অনুমতি চাচ্ছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার আকাশের জোছনা ফিকে হয়ে আসছে। অতি দ্রুত মেঘ জমছে। আশ্বিন মাসে মাঝে-মাঝে এ রকম হয়। অতি দ্রুত ঝড় এসে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়। এই ঝড়ের সঙ্গে কালবোশেখীর কিছুটা মিল আছে।

দুই বন্ধু রাস্তায় হাঁটছে। মজিদ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'লাশা।'

আলম বিরক্ত গলায় বলল, 'উল্টো করে কথা বলিসনাতো, চড় খাবি।'

'আচ্ছা আর বলব না। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে—তুই আমাকে কোলে নিয়ে নে। অনেকদিন কারো কোলে উঠি না।'

আলম হো হো করে হেসে উঠল।

মজিদও হাসছে।

দুই বন্ধু হাসাহাসি করে খানিকটা এগিয়ে যাক আমরা এই ফাঁকে ডি. সি. টেন বিমানের ভেতর থেকে একটু ঘুরে আসি। বিমানের এক জন যাত্রীর সঙ্গে এই গল্পের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। যাত্রীর নাম মির্জা করিম। এই গল্পে আমরা তাঁকে মির্জা সাহেব বলব।

AMARBOI.COM

৩

মির্জা সাহেব কোমল গলায় ডাকলেন, 'এই পলিন, এই!' পলিনের ঘুম ভাঙ্গল না। ঘুমের মধ্যেই বড় করে নিঃশ্বাস নিল। একটু যেন চমকাল। শীতের রাতে গায়ের উপর থেকে লেপ সরে গেলে যেভাবে শিশুরা চমকে উঠে আবার নিথর হয়ে যায় ঠিক সেরকম।

'পলিন মা, আমরা এসে গেছি।'

এয়ার হোস্টেস ঢাকা শহরের তাপমাত্রা বলছে, বায়ুর আর্দ্রতা বলছে। টেম্পারেচার টুয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস, হিউমিডিটি সিক্সটি ওয়ান পারসেন্ট, ক্লাউডি স্কাই। ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের প্লেন, ইংরেজ এয়ার হোস্টেস অথচ কথা বলছে বাঙালি উচ্চারণে। এই উচ্চারণের আরেকটি নাম আছে, 'ইন্ডিয়ান একসেন্ট ইংলিশ।'

'পলিন মা, আমাদের নামতে হবে তো।'

পলিন চোখ মেলল। এদিক-ওদিক তাকাল। ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে তাকে একটু যেন লজ্জিত মনে হচ্ছে। সে নিচু গলায় বলল, 'এটাই কি বাংলাদেশ?'

'হুঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখন থেকে বাংলায় কথা 'চলতে' হবে?'

'চলতে হবে না মা—চালাতে হবে। কিংবা বলতে হবে। চলতে শব্দটা এখানে হবে না।'

পলিন মিষ্টি করে হাসল। মির্জা সাহেব তার সিট-বেল্ট খুলে দিচ্ছেন। তাঁর মোটা-মোটা আঙুল সিট-বেল্ট খুলতে গিয়ে কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। দেখতে এত ভালো লাগছে।

'তোমার শরীরটা কি এখন ভালো লাগছে মা?'

'হুঁ।'

'জ্বর নেই তো?'

'না। ক'টা বাজে?'

'বুঝতে পারছি না। সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটা হবে।'

তিনি পলিনের কপালে হাত রাখলেন, গা ঠাণ্ডা। নাকের কাছটা ঘামছে—জ্বর নেমে গেছে। প্লেনের দরজা খোলা হয়েছে। দরজার পাশে প্রচণ্ড ভিড়, যেন সবাই ঠিক করেছে এক সঙ্গে নামবে। পলিন বলল, 'আমরা সবার শেষে পড়লাম বাবা।'

'তাইতো দেখছি।'

'শেষে নামাই ভালো।'

'কেন ভালো?'

'এম্নি বললাম। মনে হল তাই বললাম।'

পলিন ইংরেজিতে কথা বলছে। বাংলায় ভুল ধরিয়ে দেয়ায় এটা হয়েছে। লজ্জা পেয়েছে। দীর্ঘ সময় এখন সে ইংরেজিতে কথা বলবে। তারপর হঠাৎ এক সময় বাংলায় কথা শুরু করবে। ছোট ছোট বাক্য। ক্রিয়াপদগুলো মাঝে-মাঝে এলোমেলো হয়ে যাবে। বিশেষণপদগুলো ঠিক মতো বসবে না অথচ শুনতে অপূর্ব লাগবে। বাংলা ভাষাটাই হয়ত এরকম যে এলোমেলো করে বললে ভালো লাগে। গতবছর মিনেসোটা থেকে বাল্টিমোর যাবার পথে গাড়ির চাকা পাংচার হল। তিনি জ্যাক লাগিয়ে গাড়ি উঁচু করছেন। পলিন বসে আছে তার পাশে। অন্ধকারে কাজ করতে হচ্ছে। ইমার্জেন্সি লাইট কাজ করছে না। পলিন হঠাৎ বলল, 'আজ বিশেষ অন্ধকার—তাই না বাবা?'

মির্জা সাহেব বললেন, 'বিশেষ অন্ধকার কথাটা ঠিক হবে না মা। খুব অন্ধকার বা গাঢ় অন্ধকার বলতে পার।'

পলিন লজ্জা পাওয়া গলায় বলল, 'তাহলে বিশেষটা কখন বলব?'

মির্জা সাহেব তার উত্তর দিতে পারেন নি। গাড়ি চালু হবার পর তিনি সারাপথ ভাবলেন, কিন্তু 'বিশেষ' শব্দটি দিয়ে একটি বাক্যও মনে পড়ল না। দীর্ঘদিন বাংলা ভাষার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। কে জানে এক সময় হয়ত তাঁর নিজের বাংলাও এলোমেলো হয়ে যাবে।

প্লেন ফাঁকা হয়ে গেছে। হুইল চেয়ারে করে এক বুড়িকে নামানো হচ্ছে। এই অথর্ব ব্রিটিশ বৃদ্ধা হুইলচেয়ারে করে বাংলাদেশে এসেছেন কেন কে জানে?

মির্জা সাহেব মেয়ের হাত ধরে এগুচ্ছেন। দরজা পর্যন্ত যাবার পর মনে মনে বললেন, 'আমার মনটা আজ 'বিশেষ' ভালো নেই।' এই এক যন্ত্রণা হয়েছে, কারণে-অকারণে 'বিশেষ' শব্দটি ব্যবহার করে বাক্য রচনা করেন অথচ প্রয়োজনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় একটি সাধারণ বাক্য মনে আসে নি। মিনেসোটা থেকে বাল্টিমোরের দীর্ঘপথ তাঁকে বিষণ্ন থাকতে হয়েছে।

আকাশ মেঘলা। মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাংলাদেশের আকাশ কি এই সময় মেঘলা থাকে? আজ অক্টোবর মাসের সতের তারিখ। বাংলা মাসটা কী কে জানে। ইংরেজি মাস দিয়ে কিছু বোঝা যায় না। বাংলা মাস মানেই ছবির মতো দৃশ্য। শ্রাবণ—টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। কুচুগাছের রঙ কোমল সবুজ। এখানে-ওখানে পানি জমে আছে। আকাশ ধূসরবর্ণ। চৈত্র মাস—ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ, আকাশ ঘন নীল, চোখের দৃষ্টি পিছলে যাবার মতো স্বচ্ছ, আকাশে চিল উড়ছে।

'শরীরটা কি এখন ভালো লাগছে মা?'

'হ্যাঁ ভালো। ঐ বুড়ো মহিলা বাংলাদেশে কেন এসেছেন বাবা?'

'জানি না তো। হয়ত ট্যুরিস্ট। শেষ বয়সে পৃথিবী দেখতে বের হয়েছে। পয়সাওয়ালারা তাই করে।'

'আমার কাছে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। ট্যুরিস্টরা নতুন দেশে এলে খুব আগ্রহ নিয়ে চারদিকে তাকায়—বুড়ি কেমন ঝিম ধরে আছে।'

'হয়ত শরীরটা ভালো লাগছে না।'

'আমি কি উনাকে জিজ্ঞেস করব?'

'সেটা কি মা ঠিক হবে? উনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক-গলানো উনি হয়ত পছন্দ করবেন না।'

'উল্টোটাও তো হতে পারে। উনি হয়ত খুশিই হবেন। আগ্রহ করে জবাব দেবেন।'

'বেশ তো যাও— জিজ্ঞেস করে আস।'

পলিন গেল না। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। এয়ারপোর্টের মূল ভবন পঞ্চাশগজের মতো দূরে। হেঁটেই যাওয়া যায় কিন্তু সবাই অপেক্ষা করছে ট্রানজিট বাসের জন্যে। হুইল চেয়ারে বসা বুড়ি পানির একটা বোতল খোলার চেষ্টা করছে। বুড়ির একটা হাত সম্ভবত অচল। সে বোতলটা বাঁ হাতে খোলার চেষ্টা করছে। হুইল চেয়ারের পেছনে এক জন অল্পবয়স্ক এয়ার হোস্টেস। সে দৃশ্যটি দেখছে কিন্তু সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসছে না।

'বাবা!'

'কি মা?'

'উনি পানির বোতলটা খুলতে পারছেন না।'

'তাইতো দেখছি।'

'সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। কেউ সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে আসছে না।'

'সাধারণত অথর্ব বুড়ো-বুড়িরা খুব খিট খিটে মেজাজের হয়। কেউ সাহায্য করতে গেলে রেগে যায়।'

'তবু ভদ্রতা করে হলেও কারো উচিত সাহায্য করতে যাওয়া। আমি কি যাব?'

'তোমার ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই যাবে।'

পলিনের যেতে হল না। বুড়ি পানির বোতলের মুখ খুলে ফেলেছে। এক ঢোক পানি খেয়েই আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বোতলের মুখ লাগানোর জন্যে। ট্রানজিট বাস এসে পড়েছে। পলিন এগিয়ে গেল বুড়ির দিকে। ছোট্ট করে বাউ করে বলল, 'গুড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফটারনুন ম্যাডাম।’

বুড়ি ছলছলে ঘোলা চোখে তাকাল—কোনো উত্তর দিল না। পলিন জবাবের জন্যে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। কোনো জবাব নেই। পলিনের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। পলিনের বয়স তের। তের বছরের বালিকারা অল্পতেই আহত হয়।

মির্জা সাহেব ঘটনাটা লক্ষ করলেন কিন্তু তিনি যে লক্ষ করেছেন তা পলিনকে জানতে দিলেন না। রাগে তাঁর শরীর জ্বলছে। তাঁর নিজের দেশে, তাঁর মেয়েকে অপমান করার অধিকার এই বিদেশিনী বৃদ্ধার নেই। কিন্তু এটা কি তাঁর নিজের দেশ? তাঁর পকেটে আমেরিকান নীলরঙ পাসপোর্ট। এই পাসপোর্ট হাতে পাবার আগে কোর্টে দাঁড়িয়ে বলতে হয়েছে—মহান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান মেনে চলব... মাতৃভূমির মর্যাদা... মেয়েকে তিনি তাঁর দেশ দেখাতে এনেছেন। যে সাতটা দিন তিনি এখানে থাকবেন— তিনি চান না, এই সাত দিনে কেউ তাঁর মেয়ের মনে আঘাত করার মতো কিছু করে। কারণ সামান্য মন খারাপ হলে পলিন অনেক দিন পর্যন্ত বিষণ্ন থাকে।

ইমিগ্রেশনে মনে হচ্ছে অনেক সময় লাগবে। প্রচণ্ড ভিড়। তিনি শুনে এসেছিলেন বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন নাকি খুব ঝামেলা করে। বাস্তবে সেরকম দেখছেন না। ছেলেগুলো ভদ্র ব্যবহার করছে। এক জন এক ডজন পন্ড্স্ ক্রিম নিয়ে এসেছে। তাকে ইমিগ্রেশনের বাচ্চামতো ছেলেটি বলল, ‘এই ক্রিম তো দেশেই তৈরি হচ্ছে। এতগুলো আনলেন কেন? আর এটা কি নাইলনের দড়ি? ব্যান্ড আইটেম। এইসব আজে বাজে জিনিস দিয়ে স্যুটকেস ভর্তি করেছেন। ব্যাপার কী ভাই?’

উত্তরে লোকটি বোকার মতো দাঁত বের করে হাসছে। ছেলেটি স্যুটকেসে চক দিযে সাইন করে বলল, ‘যান।’ মির্জা সাহেব মুগ্ধ হলেন। কী সব ভয়ঙ্কর গল্পই না প্রচলিত। এরা নাকি জাঙ্গিয়া পরিয়ে উঠবস করায়। কসমেটিকস অর্ধেক রেখে দেয়। নিচু গলায় বলে, ‘কিছু ডলার ছেড়ে দিন।’

এইসব গল্প বাঙালিদের কাছ থেকেই শোনা। প্রথম প্রথম আমেরিকায় আসার পর বাঙালিরা নিজের দেশ সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা উগরে দেয়। ভয়াবহ একটি ছবি আঁকে। মনে হয় সেটা জঙ্গুলে একটা দেশ। যে দেশের সব মানুষ ঠগ, ফাঁকিবাজ। যে দেশে কিছুই পাওয়া যায় না। ঘুষ খাওয়ার জন্যে সবাই হা করে থাকে। রাত আটটার পর রাস্তায় বের হওয়া যায় না।

গল্পগুলো এমন ভাবে করা হয় যাতে মনে হয় দেশটা বঙ্গোপসাগরে তলিয়ে গেলেই তাঁরা সবচে খুশি হবেন।

এরা কেন এরকম করে? অপরাধ বোধের কারণে? দেশ ছেড়ে চলে এসেছে—সেই গ্লানি জমে আছে মনে। গ্লানি আড়াল করবার জন্যেই নিশ্চয়ই বলা। নিজেকেই সে বোঝায়।

‘ম্যাডাম, আপনার পাসপোর্ট?’

পলিন হেসে ফেলল। আনন্দ ঝলমলে গলায় পরিষ্কার বাংলায় বলল, ‘আমাকে ম্যাডাম বলছেন কেন? আমার বয়স তের।’ মীর্জা সাহেব লক্ষ করলেন, মেয়ের বিষণ্ন ভাব কেটে গেছে। কী চমৎকার বয়স। মেঘ ও রৌদ্র অনবরত খেলা করে। এই অন্ধকার এই আলো। পলিনের মনে বিদেশিনীর স্মৃতি এখন আর নিশ্চয়ই নেই। মির্জা সাহেব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাস্টমস-এর এই যুবকটির প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলেন। একটা কিছু উপহার এই ছেলেটিকে দিতে ইচ্ছা করছে। সেটা সম্ভব নয়।

'আপনাদের আমেরিকান পাসপোর্ট?'

'জ্বি।'

'অনেকদিন পর দেশে ফিরছেন?'

'জ্বি। প্রায় একুশ বছর পর।'

'ডিক্লেয়ার করার মতো কিছু কি আছে?'

'জ্বি না।'

মির্জা সাহেব তাঁর স্যুটকেস খুললেন। ছেলেটি স্যুটকেসের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'একুশ বছরে সব বদলে গেছে। কিছু চিনতে পারবেন না।'

মির্জা সাহেব বললেন, 'আমি নিজে কিছু দেখতে আসি নি মেয়েকে দেশ দেখাতে এনেছি। মেয়ের নাম পলিন।' মির্জা সাহেব দু'টি ভুল কথা বললেন। তিনি মেয়েকে দেশ দেখাতে আনেন নি। নিজেই দেখতে এসেছেন। মেয়ের নাম পলিন নয়। নাম 'পোওলেন'। তার মায়ের রাখা নাম। তিনি পলিন করে নিয়েছেন। নামটাকে বাঙালি করা হয়েছে। ই-কার যুক্ত শব্দগুলো কেন জানি বাংলা-বাংলা মনে হয়।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। টেম্পারেচার বোধহয় হঠাৎ খানিকটা নেমে গেছে। আশে পাশে শিলাবৃষ্টি হলে হঠাৎ করে ঠাণ্ডা পড়ে। পলিন অল্প অল্প কাঁপছে। মির্জা সাহেব ট্যাক্সির কাঁচ উঠিয়ে দিলেন। পলিন বলল, 'কাঁচ নামানো থাকুক দেখতে-দেখতে যাই।'

'তোমার তো ঠাণ্ডা লাগছে। শীতে কাঁপছ।'

'তেমন ঠাণ্ডা লাগছে না।'

'দেশটা কেমন লাগছে মা?'

'ভালো। তবে তুমি যে বলেছিলে খুব সবুজ। তেমন সবুজ তো না।'

'বৃষ্টি হচ্ছে তো তাই বুঝতে পারছ না।'

মির্জা সাহেব, ট্যাক্সি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই রাস্তাটি কি নতুন করা হয়েছে?'

ট্যাক্সি ড্রাইভার মাথা না ঘুরিয়ে বলল, 'না।'

পৃথিবীর সব দেশের ড্রাইভাররা কথা বলতে ভালবাসে। একটা প্রশ্ন করলে হড়বড় করে একগাদা কথা বলে। এই ড্রাইভার সে রকম নয়। সমস্ত পৃথিবীর উপর সে বিরক্ত বলে মনে হচ্ছে। গাড়ি চালাচ্ছে খুব দ্রুত। বিপজ্জনক কয়েকটা ওভারটেক করল। বৃষ্টি-ভেজা পিচ্ছিল রাস্তায় সে যা করছে তা ঠিক না। কিন্তু লোকটা ওভারটেক করে মজা পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। এটিই হয়ত তার জীবনের একমাত্র আনন্দ। পৃথিবীর সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা প্রতীকী ব্যাপার আছে।

'বাবা।'

'কি মা?'

'ঐ ব্রিটিশ মহিলা, আমার কথার জবাব দিলেন না কেন?'

'তিনি হয়ত তোমার কথা শুনতে পান নি।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলিন চোখ বন্ধ করে গা এলিয়ে পড়ে আছে। নতুন দেশ। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখার কথা। পলিন দেখছে না। তার কি ভালো লাগছে না? মির্জা সাহেবের মন খারাপ হয়ে গেল।

ট্যাক্সি একটা বড় ধরনের ঝাঁকুনি খেল। ড্রাইভার বলল, 'জিয়ার আমলে করা।'

মির্জা সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না। দীর্ঘ সময় পর ড্রাইভার প্রশ্নের জবাব দিল। এতক্ষণ কি সে এই প্রশ্ন নিয়ে ভাবছিল? মনে করতে পারছিল না—কার আমলে রাস্তা হয়েছে? হয়ত বা।

পলিন চুপচাপ আছে। চোখ বন্ধ। ঘুমুচ্ছে হয়ত। জ্বর আসে নি তো? তিনি পলিনের গায়ে হাত দিলেন। গা গরম লাগছে। বেশ গরম।

মেয়েটির এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার। 'ফার্গস ফল্‌স্‌' এলাকা থেকে বেরুলেই শরীর খারাপ। যতক্ষণ সে ফার্গস ফল্‌স্‌-এ আছে ততক্ষণ ভালো। স্কুলে যাচ্ছে, খেলছে, পড়াশোনা করছে শহরের গণ্ডি পেরুলেই জ্বর।

মির্জা সাহেব একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে কথা বলেছেন। সাইকিয়াট্রিস্ট একগাদা থিওরি কপচিয়েছেন। সেই সব থিওরির মূল কথা হচ্ছে—পলিন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। নিজের বাড়ির কাছাকাছি যখন থাকে তখন এটা কম থাকে। বাইরে গেলেই বেড়ে যায়। ব্রোকেন ফ্যামিলির ছেলেমেয়েদের মধ্যে এটা খুব দেখা যায়। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, 'অনেক ব্রোকেন ফ্যামিলির ছেলেমেয়েদের আমি দেখেছি। তাদের কারোর মধ্যে এই ব্যাপার কিন্তু দেখি না।'

'সবার মানসিক গঠন তো এক রকম নয়। এক জন মানুষ যে অন্য এক জন মানুষের চাইতে কত আলাদা তা আমরা সবচে ভালো জানি।'

'স্যার আসছি। নামেন।'

মির্জা সাহেব ড্রাইভারের এই কথায় খুব অপ্রস্তুত বোধ করলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার তিনি নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হোটেলের গাড়ি-বারান্দায় ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খোলা। রাজা-বাদশাদের মতো জমকালো পোশাকপরা হোটেলের দারোয়ান অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। তিনি এবং তাঁর কন্যা—দু'জনই গভীর ঘুমে।

বৃষ্টি পড়ছে অঝোর ধারায়। বাতাসও দিচ্ছে। এত অল্প সময়ে আবহাওয়ার একি পরিবর্তন! হোটেলের ভেতর ঢুকতেই সব আবার অন্যরকম হয়ে গেল। কে বলবে বাইরে এমন দুর্যোগ?

ফাইভ স্টার হোটেলগুলোর একটা মজা আছে। দেশের সঙ্গে এদের কোনো যোগ থাকে না। সব একরকম। হোটেলগুলোই যেন আলাদা একটা জগৎ। বাংলাদেশের একটা হোটেলের ভেতরটায় যে গন্ধ ভেসে বেড়ায় সেই একই গন্ধ পাওয়া যায় লস এঞ্জেলস্‌-এর হোটেলে। রিসিপশনিস্টরা মাছের মতো ভাবলেশহীন চোখে ধাতব গলায় কথা বলে। সব মানুষের ভেতরই এক জন রোবট থাকে। বড় হোটেলগুলো সেই সব রোবটদের বের করে নিয়ে আসে।

'স্যার আপনাদের কি রিজার্ভেশন আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

'আপনাদের পাসপোর্টগুলো কি দেখতে পারি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অবশ্যই পারেন। তার আগে দয়া করে এক জন ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে পারবেন? আমার মেয়েটি অসুস্থ।'

'আপনারা ঘরে চলে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার যাবেন। রুম নাম্বার দু'শ এগার।'

'ধন্যবাদ।'

হোটেলের রুমে ঢুকে প্রথম যে জিনিসটা দেখতে ইচ্ছা করে সেটা হচ্ছে—বাথরুম। বাথরুম দেখা হবার পর ইচ্ছা করে জানালার পর্দা সরিয়ে শহর দেখতে। মির্জা সাহেব প্রথমটা করলেন না তবে জানালার পর্দা সরিয়ে শহর দেখতে চেষ্টা করলেন। কিছুই দেখতে পেলেন না। গোটা শহর ঘন অন্ধকারে ঢাকা। এই হোটেলের নিশ্চয়ই নিজেদের পাওয়ার জেনারেটার আছে।

বাইরে হাওয়ার মাতামাতির কিছুই এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না। এয়ার কুলারের শব্দে সব ঢাকা পড়েছে। এয়ার কুলার বন্ধ করে জানালার একটা পাট কি খুলে ফেলা যায়?

হোটেলের ডাক্তার বিদেশি। চেহারা দেখে মনে হয় হংকং বা থাইল্যান্ডের কেউ হবেন। এরা কি বাংলাদেশি কোনো ডাক্তার খুঁজে পায় নি?

ডাক্তার সাহেব ঔষধপত্র কিছুই দিলেন না। গরম স্যুপ খেয়ে পলিনকে ঘুমিয়ে পড়তে বললেন। ডাক্তারের ধারণা ভ্রমণের ক্লান্তিতে এমন হয়েছে। বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে।

ডাবল রুম।

পাশের খাটে পলিন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। গলা পর্যন্ত চাদর টানা। ধবধবে সাদা রঙের চাদর। সাদা চাদরে ঢাকা একটি বালিকার মুখ দেখতে ভালো লাগে না। সাদা চাদরের সঙ্গে কোথায় যেন মৃত্যুর সম্পর্ক আছে। সাদা কফিনের দীর্ঘ সংস্কার কাটানো মুশকিল। মির্জা সাহেব খুব সাবধানে নীলরঙ একটা উলের চাদর মেয়েটির গায়ে দিয়ে দিলেন। ঘুমের মধ্যেই পলিন একটু যেন চমকাল।

ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে। রাত এগারটা পাঁচ। রাস্তায় নামলেই বাংলাদেশ দেখা যাবে। বাইশ বছরে কী হল দেশটার বোঝা যাবে। তাতে তাঁর কিছু কি আসে যায়? না আসে যায় না। কিছুই আসে যায় না।

মির্জা সাহেব রুম সার্ভিসকে খবর দিয়ে একটা স্যান্ডউইচ এবং গরম এক কাপ কফি খেয়ে শুয়ে পড়লেন। কফি খেলে বেশিরভাগ লোকই ঘুমুতে পারে না। তাঁর ক্ষেত্রে উল্টোটা হয়। ঝিমুনি আসে। ঘুমুতে ইচ্ছা করে।

কফি খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেই হল। আজও যে সে রকম হবে তেমন কথা নেই। জেট লেগ হয়েছে। শরীরের নির্দিষ্ট ঘুমের সাইকেলে গণ্ডগোল হয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে হয়ত জেগে থাকতে হবে।

তাঁর একটু শীত-শীত লাগছে। আরামদায়ক শীত যা ঘুম নিয়ে আসে। গায়ের উপর চাদর টেনে বাতি নিভিয়ে দিলেন। বাতি নেভানোর সঙ্গে-সঙ্গে ঘুম কেটে গেছে। মাথা দপদপ করতে লাগল। ইনসমনিয়ার পূর্ব লক্ষণ। এখন তৃষ্ণা পাবে। পানি খাবার সঙ্গে-সঙ্গে বাথরুমে যেতে হবে। আবার তৃষ্ণা পাবে। আবার পানি। আবার বাথরুম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি বাতি জ্বালাতেই পলিন বলল, 'বাবা।'

'ঘুম ভেঙে গেছে?'

'হুঁ।'

'শরীর কেমন?'

'শরীর ভালো। ক্ষিধে পেয়েছে বাবা।'

'ক্ষিধে পেলে বুঝতেই হবে শরীর ভালো। কী খাবে? স্যান্ডউইচ ছাড়া তো আর কিছু পাওয়া যাবে না।'

'স্যান্ডউইচ ছাড়া—আর যাই পাওয়া যায় তাই খাব।'

'রুম সার্ভিসকে জিজ্ঞেস করে দেখি।'

'আমেরিকায় এখন ক'টা বাজে বাবা?'

'ঠিক বলতে পারছি না—সকাল আটটা-ন'টা হবে। মার সঙ্গে কি কথা বলতে ইচ্ছা করছে?'

পলিন হ্যাঁ না কিছুই বলল না। মির্জা সাহেব বললেন, 'দাঁড়াও একটু খোঁজ করছি, ডিরেক্ট ডায়ালিং কি-না তাও তো জানি না।'

জানা গেল ডিরেক্ট ডায়ালিং। দ্বিতীয় বার ডায়াল ঘুরাবামাত্র পাওয়া গেল। মির্জা সাহেব মেয়েকে কথা বলার সুযোগ দেবার জন্যে বাইরে চলে গেলেন। বলে গেলেন, 'সিগারেট শেষ হয়ে গেছে মা, সিগারেট কেনার জন্যে যাচ্ছি।'

পলিন কোমল গলায় বলল, 'কেমন আছ মা?'

পলিনের মা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'আমি কেমন আছি তা মোটেই জরুরি নয়। তুমি কেমন আছ?'

'ভালো।'

'ভালো থাকার তো কথা না। নিশ্চয়ই শরীর খারাপ করেছে। ঘর থেকে বেরুলেই তোমার শরীর খারাপ করে। সব জেনে শুনেও তোমার বাবা তোমাকে নিয়ে এত দূরে গিয়েছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই দেখি মানুষটা মূর্খ হচ্ছে।'

'আমি ভালো আছি মা।'

'বাজে কথা বলবে না। আমি তোমার গলা শুনেই বুঝতে পারছি। তোমার শরীর ভালো না। বল সত্যি করে—জ্বর আসে নি?'

'এসেছিল। এখন ভালো।'

'তুমি ফিরে আসা মাত্র আমি যা করব তা হচ্ছে তোমাকে আমার কাস্টডিতে নিয়ে আসা। পিটার খুবই বদমেজাজী কিন্তু সে তোমার বাবার মতো অবিবেচক নয়। অভিভাবক হিসেবে তোমার বাবার চেয়ে সে ভালো হবে।'

'আমি বাবার সঙ্গেই ভালো আছি।'

'তুমি মোটেও ভালো নেই। এই তো কাশির শব্দ শুনছি। তোমার কি কাশিও হয়েছে?'

মির্জা সাহেব সিগারেটের জন্যে যান নি। দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। হোটেলটার একুয়াস্টিকস ভালো। দরজা সামান্য খোলা তবুও কিছুই শোনা যাচ্ছে না। তিনি হোটেলের লবিতে নেমে এলেন।

পকেটে সিগারেট নেই। এক প্যাকেট সিগারেট পেলে ভালো হত। এখানে ভেন্ডিং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেশিন জাতীয় কিছু নেই। বারে নিশ্চয়ই সিগারেট পাওয়া যাবে। বার কোথায় কে জানে? কাউকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে না।

লবি থেকে সদর দরজা ঠেলে তিনি হোটেলের বাইরে পা রাখলেন। দারোয়ান যথারীতি স্যালুট দিল।

'আশে পাশে ছোটখাটো দোকানপাট আছে? যেখানে পান সিগারেট বিক্রি হয়।'

'সিগারেট হোটেলে পাবেন স্যার।'

'পান? পান নিশ্চয়ই পাওয়া যায় না?'

'জ্বি না।'

'দেখি কিছু পাওয়া যায় কি-না।'

'ট্যাক্সি ডেকে দিব।'

'না, ট্যাক্সি লাগবে না।'

সন্ধ্যায় যে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল তার চিহ্নমাত্র নেই। আকাশ পরিষ্কার। ঝকঝকে চাঁদ উঠেছে। ভেজা রাস্তার এখানে-ওখানে পানি জমে আছে। পানিতে চাঁদের ছবি। চমৎকার দৃশ্য। তাঁর মনে হল, এক শহরের চাঁদের সঙ্গে অন্য শহরের চাঁদের কিচ্ছু মিল নেই।

হাঁটতে চমৎকার লাগছে। রাস্তা ফাঁকা। মাঝে-মাঝে দ্রুত গতিতে কিছু গাড়ি যাওয়া-আসা করছে। রাত বারটা এখনো বাজে নি। ঝড়-বৃষ্টি হবার কারণেই হয়ত রাস্তায় লোকজন তেমন নেই। রাস্তাঘাট একই সঙ্গে পরিচিত এবং অপরিচিত লাগছে। একবার মনে হচ্ছে তিনি নিতান্তই অচেনা একটা শহরে আছেন। পরমুহূর্তেই মনে হল তাঁর সারাজীবন এই শহরেই কেটেছে।

তিনি গুনগুন করে গানের কিছু কলি বলছেন। যার প্রথম লাইন—প্রজাপতি প্রজাপতি রে।

AMARBOI.COM

৪

স্টেডিয়ামের যে রেস্টুরেন্টে আলম এবং মজিদ বসে আছে সেখানেও আলো নেই। ক্যাশিয়ারের টেবিলে একটি মাত্র ইমার্জেন্সি বাতি জ্বলছে। আর একটি মোমবাতি জ্বলছে হাত ধোয়ার জায়গায়। বাইরের ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেলেও ইলেকট্রিসিটি এখনো আসে নি। রেস্টুরেন্টের সামান্য আলোতেও খাওয়া-দাওয়া চলছে। মজিদ দু' প্লেট বিরিয়ানি এবং ঠাণ্ডা পেপসির অর্ডার দিয়েছে। আলম বলল, 'টাকা কোথায় পেলি?'

মজিদ গম্ভীর গলায় বলল, 'রিচু করেছি।'

'রিচু করেছিস মানে?'

'চুরি করেছি। ফুপার একটা আটার বস্তা বেচে দিয়েছি।'

'বলিস কি!'

'চিনির বস্তা মনে করে ঝেড়ে দিয়েছিলাম, অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারি নি। শেষে দেখি শালা আটার বস্তা। গ্রেট লস।'

'ধরতে পারে নি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পারবে না কেন? ধরেছে।'

আলম চিন্তিত মুখে বলল, 'তোকে কিছু বলল না?'

'না। কোলে নিয়ে আদর করেছে। গালে চুমু খেয়েছে।'

তাদের খাওয়া শেষ হবার আগেই ইলেকট্রিসিটি চলে এল। মজিদ বিরিয়ানির সঙ্গে রেজালার অর্ডার দিল।

আলম বলল, 'তোর পায়ের ব্যথাটা কি কমেছে।'

মজিদ বলল, 'ছেমেক, ছেমেক।'

'আবার উল্টো করে বলছিস, শালা চড় খাবি কিন্তু।'

মজিদ ভুরু কুঁচকে ফেলেছে—হঠাৎ চিন-চিনে ব্যথা হচ্ছে।

আলম বলল, 'এই এরকম করছিস কেন?'

'কী রকম করছি?'

'মুখ-টুখ কুঁচকে বসে আছিস। ব্যথা হচ্ছে?'

'হুঁ।'

'ডাক্তার-টাক্তার দেখানো দরকার। সেপটিক-ফেপটিক হয়ে গেছে কি-না কে জানে।'

মজিদ বিরক্ত স্বরে বলল, 'খাওয়া শুরু কর। বিরিয়ানি খেতে হয় গরম গরম। এই যে ভাইয়া, ঝাল দেখে কাঁচা মরিচ দিতে পারেন? কী কাঁচা মরিচ দিয়েছেন খেতে মিষ্টি আলুর মতো লাগছে।'

তারা সেক্রেটারিয়েটের সামনে দিয়ে প্রেস ক্লাবের দিকে এগুচ্ছে। দু'জনের হাতে দু'টা সিগারেট। মজিদ সিগারেট খায় না। একেকটা টান দিচ্ছে আর খুক-খুক করছে। প্রোটিন হাউজ পার হয়ে তারা চায়নিজ রেস্টুরেন্টের কাছাকাছি চলে এল। আর তখন আলম খুশি খুশি গলায় বলল, 'মাহিন শালাকে পাওয়া গেছে। শালার কারবারটা দেখ না।'

মাহিন অদ্ভুত কিছুই করছে না। একটা সেলুনে চুল কাটাচ্ছে। চুল কাটানো হয়ে গেছে। নাপিত এখন মাথা মালিশ করছে। আরামে মাহিনের চোখ বন্ধ হয়ে আছে।

মজিদ বলল, 'শালা রাত দুপুরে চুল কাটাচ্ছে ব্যাপারটা কি? চলতো চুপি-চুপি গিয়ে শালার গালে ঠাস করে একটা চড় মারি, দেখি শালা কী বলে।'

আলম বলল, 'কিছুই বলবে না। টাকা ধার চাইবে।'

মাহিনের সম্প্রতি এই রোগ হয়েছে, বন্ধু-বান্ধব কারোর সঙ্গে দেখা হলেই চোখ-মুখ করুণ করে টাকা ধার চাইবে। অথচ তাদের বন্ধু মহলে মাহিনের অবস্থাটা সবচে ভালো। তার বাবা পুলিশের রিটায়ার্ড ডি. এস. পি। মাহিনের বড় দুই ভাইয়ের এক জন কাস্টমস ইন্সপেক্টর, অন্যজন জগন্নাথ কলেজের ইকনমিক্সের প্রফেসর। ভাই-বোন সবার মধ্যে মাহিন ছোট। আলমের সঙ্গে সে এম.এ. পাশ করেছে। এখনো চাকরি-বাকরি কিছু হয় নি। অস্ট্রেলিয়া চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কী একটা লাইন না-কি পাওয়া গেছে। লাইনটা কী তা সে ভেঙে বলছে না।

মাহিনের স্বাস্থ্য চমৎকার, চেহারা তারচেয়েও চমৎকার। দারুণ আড্ডাবাজ। একটাই দোষ সে হাড় কেপ্পন। পুরো বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সে কাউকে এক কাপ চা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিনে খাওয়ায় নি এ রকম একটা গুজব প্রচলিত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনটা সে পার করে দিয়েছে অন্যের উপর দিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নববর্ষে ছাত্রদের নামের টাইটেলে সে যে সব নাম পেয়েছে সেগুলো হচ্ছে—রক্তচোষা, চিনেজোঁক, পরগাছা, দি বেগার।

আলম এবং মজিদ নাপিতের দোকানে ঢুকে পড়ল। মাহিন চোখ মেলে দেখল। তার মুখের ভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হল না। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'দোস্ত দশটা টাকা দিতে পারবি? দশটা টাকা হলে মাথাটা শ্যাম্পু করিয়ে ফেলি। বাড়িতে গিয়ে তাহলে আর গোসলের ঝামেলা করতে হয় না।'

আলম বলল, 'বাড়িতে যাওয়া-যাওয়ি নেই, তুই চল আমাদের সাথে।'

'কোথায়?'

'রাস্তায় হাঁটব।'

'রাস্তায় হাঁটবি? পাগল হলি না-কি? আমি এর মধ্যে নেই, আমাকে দশ মিনিটের মধ্যে বাসায় ফিরতে হবে। ভাইয়ের ব্যাটার জন্যে গ্রাইপ ওয়াটার নিয়ে যেতে হবে। ব্যাটা পেটের ব্যথায় পোঁ-পোঁ করে কাঁদছে।'

'কাঁদুক। কাঁদলে হার্ট স্ট্রং হয়।'

'ভাবি আমাকে ছেঁচে ফেলবে। তোরা আছিস সুখে। তোদের ফ্যামিলিতে তো আর বড় ভাইয়ের স্ত্রী নেই। আমার কপালে দুই খান। এক জন আবার ইংরেজির ছাত্রী। মিষ্টি সুরে ইংরেজিতে এমন কঠিন কঠিন কথা বলে যে.......

মজিদ বলল, 'আমাদের সঙ্গে থাকলে কুড়ি টাকা পাবি, রাজি আছিস কি-না বল।'

'একশ টাকা দে—ভেবে দেখি। বিরাট ক্রাইসিস যাচ্ছে।'

'পঁচিশ পাবি, ভেবে দেখ। আছেই মোটে পঁচিশ।'

'তাহলে তোরা বস এখানে। গ্রাইপ ওয়াটারটা কিনে দিয়ে চলে আসব। দে, টাকাটা দে।'

'পাগল, তোকে আমরা চিনি না—একবার গেলে তোর আর টিকির দেখা পাওয়া যাবে না।'

মাহিনের মুখ বিমর্ষ হয়ে গেল।

বিমর্ষ ভাব দীর্ঘস্থায়ী হল না। রাস্তায় নেমেই তাঁর মধ্যে ফুর্তির ভাব দেখা গেল—সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুপার একটা চাঁদ মামা উঠেছে। দেখেছিস?'

আলম বলল, 'আমরা দেখেছি, তুই দেখ।'

'কবির দল বোধহয় কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেছে, কী বলিস?'

'জানি না।'

মাহিন চাঁদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'মামা ভাগ্নেদের কথা মনে রেখ।'

তারা এগিয়ে যাচ্ছে কাকরাইলের দিকে। মজিদের পায়ের ব্যথা এখন অনেক কম। স্যান্ডেল পায়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল বলে সে বাঁ পায়ের স্যান্ডেল খুলে ফেলে দিয়েছে। এক পায়ে স্যান্ডেল পরে সে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছে। বন্ধুরা ব্যাপারটা দেখেও কেউ কিছু বলল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজিদ বলল, 'মাহিন তোর অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার কী হল?'

'হবে।'

'কখন হবে?'

'ধর মেরে-কেটে এক মাস। আগেও হতে পারে। ইমিগ্রেশন ভিসার জন্যে এপ্লাই করেছি।'

'আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবি?'

'তুই ওখানে গিয়ে করবি কী? শালা অশিক্ষিত মূর্খ।'

'ঐ দেশে সবাই মহাজ্ঞানী?'

'মহাজ্ঞানী না হলেও তোর মতো মূর্খ কেউ নেই—শালা তুই মেট্রিক পাশ করতে পারলি না। তোর সঙ্গে হাঁটাওতো লজ্জার ব্যাপার।'

মজিদ কিছু বলল না।

মাহিন সিগারেট ধরাল। তার প্যান্টের পকেটে ছ'টা সিগারেট। প্যাকেট সে বের করে নি। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ম্যাজিসিয়ানদের মতো একটা সিগারেট বের করে এনেছে। বন্ধু-বান্ধবদের সামনে সে কখনো প্যাকেট বের করে না। প্যাকেট বের করা মানে এক ধাক্কায় সব শেষ। যে খাবে না সেও হাত বাড়াবে।

মাহিন বলল, 'আমার কথায় রাগ করলি না-কি, এই শালা?'

'না।'

'রাগ করেছিস। তোর মুখ দেখেই মনে হচ্ছে তুই রাগ করেছিস।'

মজিদ বলল, 'রাগ করলে ক্ষুর দিয়ে তোর পেটটা ফাঁক করে দিতাম।' বলতে বলতে মজিদ প্যান্টের পকেট থেকে চকচকে একটা ক্ষুর বের করল। খাপ থেকে খুলে চাঁদের আলোয় উঁচু করে ধরল। দলটা থমকে দাঁড়াল।

আলম বলল, 'তুই ক্ষুর পেলি কোথায়?'

'আমার সাথেই থাকে।'

'সাথেই থাকে? ফাজলামীর জায়গা পাস না। তুই এটা নাপিতের দোকান থেকে গাপ করেছিস।'

'হুঁ।'

'তুইতো বিরাট চোর হয়ে গেছিসরে ব্যাটা।'

'হুঁ।'

'হুঁ হুঁ, করছিস কেন? ক্ষুর চুরি করলি কেন?'

'দাড়ি কামাব। রোজ রোজ দাড়ি কামাবার পয়সা পাব কই?'

মাহিন বলল, 'দোস্ত ক্ষুরটা বন্ধ করে রাখ। ভয়-ভয় লাগছে।' মজিদ সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষুর খাপে ঢুকিয়ে পকেটে রেখে দিল। মাহিন বলল, 'তুই কি না আমার উপর রেগে আছিস। আচ্ছা তোকে সত্যি কথাটা বলি, অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপারটা বোগাস।'

'বোগাস?'

'হুঁ। কোথাও কিছু হচ্ছে না বলতে লজ্জা লাগে—তাই অস্ট্রেলিয়ার কথা বলি।'

'মন্দ না।'

'আমার কথা শুনে অনেকের আবার হিংসাও হয়। খুব মজা লাগে। খুব অশান্তিতে আছিরে দোস্ত।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোর আবার অশান্তি কি?'

'আছে। বলে শেষ করা যাবে না। দুই রোজগারী ভাইয়ে ভাইয়ে লেগে গেছে—ধুন্ধুমার অবস্থা। দু'জনেই আলাদা বাসা করছে। আমাদের অবস্থা যে কী হবে অনলি গড নোজ।'

'তোর বাবারতো টাকা-পয়সা আছে।'

'বাবার টাকা-পয়সা কোত্থেকে আসবে? তাঁর অনেস্ট বাতিক ছিল। ঘুষ নিতেন না। আসলে ভীরু টাইপের লোক ছিলেন। ঘুষ নিতে সাহস লাগে। সাহস ছিল না, বাইরে প্রচার করেছেন—অনেস্ট। পেনসনের টাকা-পয়সা দিয়ে মিরপুরে জমি কিনেছেন। সেই জমির দখল পাচ্ছেন না। পুলিশের লোক হয়েও জমির দখল পাচ্ছেন না, বুঝে দেখ অবস্থা। ঐ দিন দেখে এসেছি ঐ জমিতে তিন তলা ফাউন্ডেশন দিয়ে একখানা বাড়ি তুলছে। বিরাট সমস্যায় খাবি খাচ্ছি। বুঝলি।'

তারা চুপচাপ হয়ে গেল। তিনজনেই নিঃশব্দে এগুচ্ছে। রাত এগারটার মতো বাজে। রাস্তা নির্জন। এই দিকে রিকশার চলাচল এম্নিতেই কম। আজ আরও কমে গেছে। মাঝে-মাঝে হুম করে অতি দ্রুত এক আধটা প্রাইভেট কার চলে যাচ্ছে।

আলম বলল, 'কেমন যেন ভয়ভয় লাগছে। ছিনতাই পার্টির হাতে পড়তে পারি।'

মজিদ বলল, 'তোর আছে কী যে ছিনতাই পার্টির হাতে পড়বি?'

'রিস্টওয়াচ আছে।'

মজিদ বলল, 'সাথে ক্ষুর আছে, আমরাই এখন ছিনতাই পার্টি। দাঁড়িয়ে দেখ এক্ষুনি একটা ছিনতাই করব।'

'পাগলামী করিস না মজিদ।'

'ছিনতাই না করলেও ভয় দেখিয়ে দেই। ভয় দেখাতে তো অসুবিধা নেই।'

'বাদ দে। বরং চল করিমের ওখানে তাস খেলব।'

মজিদ বলল, 'দুনিয়ার এক নম্বর মজা কিসে হয় জানিস? এক নম্বর মজা হল ভয় দেখানোয়। পৃথিবীর মানুষ সারাক্ষণ এক জন আরেক জনকে ভয় দেখায় কেন? মজা পায় বলেই ভয় দেখায়। ভয়ের মধ্যেই আসল মজা।'

কাকরাইলের দিক থেকে হুডতোলা একটি রিকশা আসছে। আলম বা মাহিন কিছু বুঝবার আগেই মজিদ রাস্তায় নেমে তীব্র গলায় বলল, 'যায় কেডা? থাম দেহি।'

তার গলার স্বর সে কর্কশ করে ফেলেছে। পুরান ঢাকার ছেলেপুলেদের মতো ঢাকাইয়া স্বর বের করেছে। রিকশাওয়ালা হকচকিয়ে থেমে গেল।

মজিদ বলল, 'আতের মইদ্যে এইটা কী, ক দেহি? এই জিনিসের নাম কি?'

চাঁদের আলোয় ক্ষুরের ফলা চক-চক করতে লাগল। রিকশাওয়ালা বুড়ো। সে রিকশা থেকে নেমে গামছা দিয়ে মুখের ঘাম মুছছে। শুরুতে একবার মাত্র মজিদের দিকে তাকিয়েছিল, এখন আর তাকাচ্ছে না। মনে হয় এ রকম পরিস্থিতিতে এর আগে সে আর পড়ে নি।

পুরো ব্যাপারটাই এত আকস্মিক যে আলম এবং মাহিন হকচকিয়ে গিয়েছে। আলম ভীত স্বরে ডাকল, 'এই মজিদ এই।' সেই স্বর এতই ক্ষীণ যে মজিদের কানে পৌঁছল না।

মজিদ হুংকার দিল, 'রিকশার বিতরে কোন্ হালা? মাতা বাইর কর। চাঁন মুখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খান দেহি।'

রিকশার আরোহী দু'জন। মধ্য বয়স্ক এক জন ভদ্রলোক সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। তার বয়স উনিশ–কুড়ির বেশি হবে না। এই মেয়েটি ভয়ে ও আতংকে সাদা হয়ে গেছে। পুরুষটি নামতে চেষ্টা করতেই মেয়েটি সজোরে তার হাত আকড়ে ধরল। পুরুষটি বেশ বলশালী। পরনে স্ট্রাইপ দেয়া হাফ শার্ট। মাথার চুল ছোট–ছোট করে কাটা। সে ভয় পেলেও চেহারায় তা বোঝা যাচ্ছে না। সে মোটামুটি স্বাভাবিক গলায় বলল, 'ভাই আপনি কী চান?'

'নামতে কইতাছি কথা কানে ঢুকে না? না–কি ক্ষুর হান্দাইয়া দিমু?'

লোকটি স্ত্রীর সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে রিকশা থেকে নেমে পড়ল। নিচু গলায় বলল, 'টাকা বিশেষ কিছু আমাদের সঙ্গে নাই ভাই সাহেব।' বলেই সে পকেটের মানিব্যাগ বের করল।

মজিদ খেঁকিয়ে উঠল, 'ট্যাকা–পয়সা তোর কাছে চাইছিরে হারামী? তুই মানিব্যাগ বাইর করলি কোন কামে?'

'ভুল হয়ে গেছে কিছু মনে করবেন না।'

'আমার ওস্তাদ ঐখানে খাড়াইয়া আছে ওস্তাদরে সালাম দে।'

লোকটি আলমের দিকে তাকিয়ে সালামের মতো ভঙ্গি করল। মুখে বিড় বিড় করে কী যেন বলল।

মজিদ বলল, 'ওস্তাদ পিস্তলডা বাইর করেন। এই হালা ফকিরের পুলা পিস্তল দেখবার চায়।'

রিকশায় বসে থাকা মেয়েটি এইবার ফুঁপিয়ে উঠল। রিকশাওয়ালা অসহায় ভাবে একবার মেয়েটির দিকে একবার মজিদের দিকে তাকাচ্ছে। দূরে গাড়ির হেড লাইট দেখা গেল। লোকটি প্রবল আশা নিয়ে হেড লাইটের দিকে তাকাচ্ছে। গাড়ি কিন্তু থামল না। হুস করে বের হয়ে গেল। মজিদ বলল, 'রিকশার মইদ্যে ঐ মাইয়া কে?'

'আমার স্ত্রী।'

'বিহা করা ইসতিরি?'

'জ্বি।'

'লাইছেন আছে? বিহার লাইছেন আছে।'

'ভাই আমার সাথে তিন শ' টাকা আছে এইটা নেন আর আমার স্ত্রীর একজোড়া কানের দুল আছে খুলে দিচ্ছি। এইগুলি নিয়ে আমাদের যেতে দিন ভাই—আমার এক আত্মীয়ের অসুখের খবর পেয়ে যাচ্ছি। নয়ত এত রাতে স্ত্রীকে নিয়ে বের হতাম না।'

'হারামী তুই কচ কী? ট্যাকা–পয়সা তোর কাছে চাইছি? কানের দুল চাইছি? ঐ হারামজাদা আমার একটা ইজ্জত নাই?'

'ভাই, কী চান বলেন?'

'তুই কানে ধর। কানে ধইরা মাফ চা।'

'জ্বি, কী বললেন?'

'কী কইলাম হুনস নাই—কানে ধর।'

লোকটি কানে ধরল। রিকশায় বসে থাকা মেয়েটি ক্রমাগত ফুঁপাচ্ছে। রিকশাওয়ালা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'শব্দ কইরেন না আম্মা, আল্লাহর নাম নেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হারামজাদা কানে ধরছস?'

'জ্বি।'

'তুই কী করস?'

'রেলওয়েতে চাকরি করি।'

'রেলওয়ের মইদ্যে সব চোরের আড্ডা। তুইও হালা চোর। হুনছস কী কইলাম?'

'জ্বি।'

'আর চুরি করিস না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'যা অখন ভাগ।'

লোকটি মজিদের কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। এখনো কান ধরে আছে।

'কথা কানে ঢুকে না? কী কইলাম তোরে? বউ লইয়া ভাগ। অমন ছুন্দর বৌ লইয়া বাইর হবি না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আমার দুই ওস্তাদরে সেলাম দে। সেলাম দিয়া ভাগ।'

লোকটি স্পষ্ট স্বরে দু'বার বলল, 'স্লামালিকুম।' তারপর রিকশায় উঠে বসল। রিকশায় উঠার সঙ্গে–সঙ্গে মেয়েটি তার গায়ে এলিয়ে পড়ে গেল। বুড়ো রিকশাওয়ালা ঝড়ের চেয়ে দ্রুত গতিতে রিকসা নিয়ে উড়ে গেল।

দীর্ঘ সময় তিন বন্ধু কোনো কথা বলল না। আলম এবং মাহিন দু'জনেই খুব ঘামছে। বুক ধড়ফড় করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ।

প্রথম কথা বলল মাহিন। প্রায় ফিস ফিস করে বলল, 'শালা তুইতো ভেল্কি দেখিয়ে দিলি। এখনো আমার শরীর কাঁপছে।'

মজিদ বলল, 'মজা পেয়েছিস কি–না বল?'

'মজা, এর মধ্যে মজা কী?'

'তুই বুকে হাত দিয়ে বলতো—তোর মজা লাগে নাই?'

মাহিন কিছু বলল না, প্যান্টের জিপার খুলে রাস্তার পাশে দাঁড়াল—প্রস্রাবের প্রচণ্ড বেগ হচ্ছে। তার পাশে আলমও দাঁড়াল।

আলম বলল, 'গলা শুকিয়ে গেছে। কোথাও গিয়ে চা খাই চল। এইখানে বেশিক্ষণ থাকাও ঠিক না। পুলিশ আসতে পারে।'

মজিদ বলল, 'পুলিশ আসবে কেন?'

'ওরা গিয়ে নিশ্চয়ই পুলিশে খবর দিয়েছে।'

'পাগলের মতো কথা বলিসনাতো। পুলিশ? দেশে পুলিশ বলে কিছু আছে নাকি?'

কাকরাইল মসজিদের কাছে রাস্তার পাশের একটা চায়ের দোকান পাওয়া গেল। দোকানী সব গুটিয়ে চলে যাচ্ছিল, কাস্টমার দেখে বিরক্ত মুখে কাপ ধুতে বসল।

আলম বলল, 'চা খেয়ে তারপর কী করবি? করিমের ওখানে যাবি নাকি?'

মাহিন বলল, 'না, ঐ শালা আমাকে দেখতে পারে না।'

করিম ওদের বন্ধুদের কেউ না। করিমের সঙ্গে তাদের পরিচয় রহমানের মারফত। রহমান ছিল তাদের অতি প্রিয় বন্ধুদের এক জন। সে কী করে জানি এক সোনাচোরাচালানীর সঙ্গে ভিড়ে যায়। ব্যাংককে ধরা পড়ে। ঐখানের জেলেই এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। চার বছরের কয়েদ হয়েছে। রহমানের সঙ্গে তাদের এখন কোনো যোগাযোগ নেই। রহমানের বাসায় গেলে তার বড়বোন বের হয়ে আসে এবং অতি কঠিন গলায় বলে, 'কী চাও তোমরা?'

'রহমানের কোনো খবর আছে?'

'না, কোনো খবর নেই।'

এই বলে খট করে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয়। যেন তারা একদল ভিখিরি। ভিক্ষা চাইতে এসেছে।

রহমানই তাদের করিমের আড্ডায় বেশ কয়েকবার নিয়ে এসেছে। চমৎকার জায়গা। ব্যবস্থাও চমৎকার। আঠার তলা একটা বিল্ডিং-এর তিন তলায় করিমের থাকার ব্যবস্থা। বিল্ডিং-এর বাইরের স্ট্রাকচার সবে তৈরি হয়েছে। এখন কাজ বন্ধ আছে। করিমের দায়িত্ব হচ্ছে পাহারাদারির। পুরো জায়গাটা করোগেটেড টিন দিয়ে ঘেরা। ঘেরার ভেতর দু'টি কংক্রিট মিকচার, রড সিমেন্টের স্তূপ। তিন জন দারোয়ান নিয়ে এইসব পাহারা দেয় করিম। ইসলাম ব্রাদার্স নামের যে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি বাড়িটা তৈরি করছে করিম হচ্ছে তার মালিকের দূর সম্পর্কের বোনের ছেলে। মালিকপক্ষীয় হাঁক-ডাক তার গলায় থাকলেও দারোয়ান তাকে মোটেই পাত্তা দেয় না।

পৃথিবীতে কিছু মানুষ এমন থাকে যারা কারো কাছেই পাত্তা পায় না। করিম তাদেরই এক জন। অতি অল্পতেই সে অসম্ভব রেগে যেতে পারে আবার সামান্য ধমকে ভয়ে কুঁকড়ে যায়। জগন্নাথ কলেজে নাইট সেকশানে সে পড়ে। বি. এ. সেকেন্ড ইয়ার তবে অনেকদিন কলেজে যাচ্ছে না। কারণ বেশ কিছু রড চুরি হয়েছে। ইসলাম ব্রাদার্সের মালিক নুরুল ইসলাম তাকে বলে দিয়েছেন এক মিনিটের জন্যেও যেন সে জায়গা না ছাড়ে। নুরুল ইসলাম সাহেবের কথা তার কাছে ঈশ্বরের আদেশের মতো। সে গত সাতদিন সত্যি-সত্যি এক মিনিটের জন্যেও বাইরে যায় নি।

তার সময় খুব যে খারাপ কেটেছে তাও না। ইসলাম সাহেবের বড় ছেলে মীরন তার ঘরে একটা ব্লাক লেভেলের বোতলের অর্ধেকের বেশি রেখে গিয়েছিল। ঐ বোতল শেষ করে দিয়েছে। মীরন এসে হয়ত চিৎকার চেঁচামেচি করবে। মীরনের বয়স মাত্র উনিশ। এর মধ্যেই ফুর্তির নানান কায়দা-কানুন তার জানা হয়ে গেছে। গত মাসে পনের-ষোল বছরের একটা মেয়ে নিয়ে এসে উপস্থিত। ঝি শ্রেণীর মেয়ে, নাম কুসুম। কুসুম একটা ওড়নায় সারাক্ষণ মুখ ঢেকে রেখেছিল। মীরন করিমকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, 'আপনার ঘরটা ঘন্টা খানেকের জন্যে একটু ছেড়ে দেন না করিম ভাই।'

করিম ইতস্তত করে বলল, 'মামার কানে যদি যায়.....'

সঙ্গে-সঙ্গে মীরন তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'কানে গেলে কী হবে? আমাকে গিলে খাবে? যান আপনি গিয়ে বাবাকে বলে আসুন।'

'আরে না—বলাবলির ব্যাপার না মানে....

'আপনি খালি প্যাচাল পারেন করিম ভাই। প্যাচাল আমার ভালো লাগে না।'

'মেয়েটা কে?'

'মেয়েটা কে তা দিয়ে আপনার দরকার কি? ওর নাম কুসুম। আপনি একটা কাজ করুন তো আমাদের জন্যে কাবাব নিয়ে আসুন। মিরপুর রোডে একটা কাবাবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোকান আছে। বটি কাবাব আনবেন অন্য কিছু না।'

মীরন পাঁচ শ' টাকার চকচকে একটা নোট বের করল। এই ছেলেটার হাত দরাজ। বাপের মতো পয়সা কামড়ে থাকে না। কিছু একটা কিনতে দিলে কখনো টাকা ফেরত চায় না।

তবে ছেলেটির মেজাজ বাপের চেয়েও খারাপ। রেগে গেলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। নুরুল ইসলাম সাহেবের চেয়ে তার ছেলেকে করিম বেশি ভয় পায়। মীরন যখন দু'একজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তার ঘরে আসে সে আতঙ্কে অস্থির হয়ে থাকে। সবচে বড় আতঙ্ক হচ্ছে ছেলের এইসব ব্যাপার ইসলাম সাহেবের কানে গেলে তিনি কী করবেন? তখন তার গতিটা কী হবে?

আলমরা যখন করিমের ঘরে ঢুকল তখন করিম কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। গায়ে প্রবল জ্বর। আলম বলল, 'আপনার হয়েছে কী?'

'জ্বর। গায়ে গোটা-গোটা কী যেন উঠেছে। মনে হচ্ছে জল বসন্ত।'

'এখন জল বসন্ত হয় কী ভাবে? কী যে বলেন!'

'হয়ে গেলে আমি কী করব। এই দেখেন না।' করিম শার্ট উঁচু করে দেখাল। সত্যি সারা গায়ে লাল গুটি গুটি কী যেন উঠেছে।

মাহিন বিরক্ত মুখে বলল, 'আমরা এসেছিলাম আপনার সঙ্গে তাস-টাস খেলব।'

করিম বলল, 'আপনারা নিজেরা খেলেন, আমি দেখি।'

'পাগল হয়েছেন, আপনার ঘর থেকে জল বসন্তের জীবাণু নিয়ে যাব?'

'একটু বসেন। চারদিন ধরে শুয়ে আছি কথা বলার লোক নাই। দারোয়ান এসে খাবার দিয়ে যায়। দারোয়ানের সঙ্গে কতক্ষণ কথা বলা যায়? ভাই রিকোয়েস্ট, একটু বসেন।'

মজিদ বিকৃত মুখে বলল, 'ইতু রম লাশা।'

করিম দুঃখিত গলায় বলল, 'অসুস্থ মানুষকে এই সব কী বলছেন ভাই? মরার গালি দেয়া ভালো না।'

মজিদ বলল, 'মরার গালি দিলে কী হয় জানেন না? আয়ু বাড়ে, আপনার আয়ু বাড়াবার জন্যে মরার গালি দিয়েছি। এখন যাই।'

'যাচ্ছেন কোথায়?'

'যাব আর কোথায়? চাঁদের আলোয় খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করব।'

আপনারা কি সুখেই না আছেন। আমার কোনো খানে যাওয়ার উপায় নেই। শরীর ভালো থাকলেও এইখানে থাকতে হবে। মামার হুকুম।'

'তাহলে তাই করেন। মামার হুকুম পালন করেন।'

করিম বলল, 'ঘরে একটা জিনের বোতল আছে। মীরন রেখে গেছে। খাবেন? খেলে বের করে দেই। কথা বলার লোক নেই ভাই, বড় কষ্টে আছি।'

মজিদ অন্যদের দিকে তাকাল। তার জিনিসটা চেখে দেখতে ইচ্ছা করছে। সে অন্যদের দিকে তাকাল। কাউকেই তেমন উৎসাহী মনে হচ্ছে না। মাহিন বলল, 'আমি মাফ চাই ভাই। এই জিনিস আমার পেটে যদি যায় আর বাসায় যদি কেউ টের পায় আমার চামড়া খুলে নেবে। সেই চামড়া দিয়ে সবাই এক জোড়া জুতা বানাবে। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর মধ্যে নেই। তোদের ইচ্ছা হলে তোরা খা। আমি বাবা ভদ্রলোকের ছেলে।'

মজিদ বলল, 'এই সবতো ভদ্রলোকেরই খাবার জিনিস।'

'ভদ্রলোকে-ভদ্রলোকে বেশ-কম আছে। আমরা হচ্ছি পীর বংশ। তুই আর আলম তোরা দু'জন খা যদি ইচ্ছা হয়।'

আলম বলল, 'না আমার ভালো লাগে না। মাথা ধরে।'

করিম বলল, 'এইটায় মাথা ধরে না। ফরেন জিনিস একটু খেয়ে দেখেন।'

আলম বলল, 'আমার অসুবিধা আছে।'

করিম বলল, 'মজিদ ভাই আপনি তাহলে থাকেন। ওরা যাক গিয়ে। দুই জনে সুখ-দুঃখের গল্প করি।'

'না থাক। অন্য আরেক দিন।'

'অন্য আরেক দিন এই জিনিস থাকবে না। মীরন সব সময় রেখে যায় না।'

'রাখবে। না রেখে যাবে কোথায়?'

দলটি বের হয়ে গেল। রাস্তায় নেমেই মজিদ বলল, 'একটা খুন করতে ইচ্ছা করছে। আয় একটা খুন করি।'

বাকি দু'জন হেসে ফেলল।

মজিদ বলল, 'কি অদ্ভুত ব্যাপার। অস্ত্র হাতে নিলেই হাত নিশপিশ করে।'

আলম বলল, 'তুই ছাগলের মতো কথা বলিস নাতো। ক্ষুর আবার একটা অস্ত্র নাকি? তুই যদি ক্ষুর দিয়ে কাউকে মারিস লোকে তোকে মার্ডারার বলবে না, বলবে ক্ষৌরকার। এই অপমানের চেয়ে মরে যাওয়া ভালো না?'

দলের সবাই আবার এক সঙ্গে হেসে উঠলো আর তখনি মির্জা সাহেবকে তাদের চোখে পড়ল।

মজিদ বলল, 'পোশাক-আশাক দেখে মনে হচ্ছে ফরেন মাল। একা একা ঘুরছে, ব্যাটার সাহসতো কম না। ব্যাটাকে ভয় দেখালে কেমন হয়।'

মাহিন বলল, 'বাদ দেতো। এক জিনিস বার বার ভালো লাগে না। ভয়তো একবার দেখালি।'

'আবার দেখাব। অন্যরকম ভয়। শালার কলজে নড়িয়ে দেব। তারপর কাপড়-চোপড় খুলে নেংটা করে ছেড়ে দেব। যা ব্যাটা নেংটা বাবাজি ঘরে যা।'

'তোর মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে রে মজিদ।'

'মাথা খারাপ হবে কেন? ফাজিলটার কাণ্ড দেখ না—এই গরমে স্যুট পরে হাঁটছে। শালা স্যুট দেখাবার জায়গা পাও না। আমাদের কাছে মামদোবাজি। শুধু আন্ডারওয়ার পরে যখন বাসায় উঠবি তখন বুঝবি কত ধানে কত চাল।'

'বাদ দে তো মজিদ।'

'তুই মজাটা দেখ না। এরকম করছিস কেন? গরমের মধ্যে স্যুট পরার অপরাধে ব্যাটাকে আমি কানে ধরে এক শ' বার উঠ-বোস করাব। আমার সাথে ফাজলামী।'

আলম বলল, 'স্যুটের উপর তোর এত রাগ কেন?'

মজিদ সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'শুধু স্যুট না সব কিছুর উপর আমার রাগ। কেউ একটা ভালো শার্ট গায়ে দিলে আমার রাগে গা জ্বলে যায়। কোনো বাড়ি থেকে রান্নার সুন্দর গন্ধ এলেও আমার রাগ লাগে। একটা সুন্দর গাড়ি যখন রাস্তা দিয়ে যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনো রাগে শরীর কাঁপতে থাকে।'

'তুইতো শালা কম্যুনিস্ট হয়ে যাচ্ছিস।'

মজিদ বলল, 'গরীব দেখলেও আমার রাগ লাগে। ঐদিন কী হয়েছে শোন। এক ফকিরনী আমাকে বলল, 'বাজান দুই দিন না খাওয়া।' রাগে আমার মুখ তেতো হয়ে গেল। বললাম, ভাগো। তুমি দুই দিন না খাওয়াতো আমার কী?'

বলতে বলতে মজিদ মির্জা সাহেবের দিকে এগিয়ে গেল। বাকি দু'জন বাধা দেবার সময় পেল না। অবশ্যি বাধা দেবার তেমন ইচ্ছাও তাদের ছিল না—চাঁদের আলোয় সামান্য মজা করলে অসুবিধা কী? তাছাড়া এই গরমে ঐ ব্যাটা স্যুট পরবেই বা কেন?

৫

মির্জা সাহেব ঘড়ি দেখলেন।

দু'টা চল্লিশ। তিনি খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। দু'টা চল্লিশ হবে কেন? ঘড়ির সময় কি বদলানো হয় নি? এ রকমতো কখনো হয় না। তিনি ঘড়ির ব্যাপারে খুব সজাগ। আজ নিশ্চয়ই পলিনের কারণে সব এলোমেলো হয়ে গেছে। তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় জুড়ে আছে মেয়েটি।

মির্জা সাহেব চারদিকে তাকালেন, কাউকে পেলে সময় জিজ্ঞেস করা যেত। রাত বেশি হলে হোটেলে ফিরে যাবেন। মেয়েটা একা আছে, ফিরে যাওয়াই উচিত অথচ ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। এমন অদ্ভুত চাঁদের আলো তিনি অনেকদিন দেখেন নি। কেমন যেন নেশার মতো লাগছে। অস্থির লাগছে আবার এক ধরনের প্রশান্তিও বোধ করছেন।

কে একজন এগিয়ে আসছে। মির্জা সাহেব বললেন, 'ক'টা বাজে বলতে পারবেন?'

লোকটি অপ্রস্তুত গলায় বলল, 'সাথে ঘড়ি নাই। আন্দাজ এগারটা।'

'আপনাকে ধন্যবাদ।'

লোকটি অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। মির্জা সাহেবের মনে পড়ল, কথায়-কথায় ধন্যবাদ দেয়ার রেওয়াজ বাংলাদেশে নেই। এটি পশ্চিমী ব্যাপার। বাংলাদেশে কেউ কোনো ধন্যবাদের কাজ করলে তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসা হয়। এই হাসিতেই ধন্যবাদ লুকানো থাকে।

মির্জা সাহেব অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। অন্যমনস্ক না হলে লক্ষ করতেন তিনটি যুবক তার দিকে এগিয়ে আসছে। তিন জনের হাতেই জ্বলন্ত সিগারেট, তিন জনই কী নিয়ে যেন হাসাহাসি করছিল। হঠাৎ এক সঙ্গে তাদের হাসি থেমে গেল। হাসি এবং কান্না এমন জিনিস যে হঠাৎ করে থেমে গেলে অন্যমনস্ক মানুষের কানেও একটা ধাক্কা লাগে, ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে। মির্জা সাহেব সচকিত হলেন। লক্ষ করলেন, তিন যুবকের মধ্যে এক জন বেশ খাটো। সে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছে এবং তার এক পায়ে স্যান্ডেল অন্য পায়ে কিছু নেই।

ছেলেটি তার হাতের সিগারেট অনেক দূরে ছুঁড়ে ফেলল। সঙ্গে–সঙ্গে অন্য দুই জনও একই ভঙ্গিতে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল। দৃশ্যটি অস্বাভাবিক। সিগারেটের জ্বলন্ত অংশ আমরা আশে পাশেই ফেলি, এত দূরে ফেলি না। এক জন যে জায়গায় যে ভাবে সিগারেট ফেলবে অন্য দুই জনও ঠিক তাই করবে এটাই বা কেমন? এই তিন জনের মনে কিছু একটা আছে। সেই কিছুটা কী?

বেঁটে যুবকটি তার দিকে এগিয়ে আসছে। অন্যেরা দাঁড়িয়ে পড়েছে। বেঁটে যুবকটির হাতে লম্বা কোনো একটা জিনিস যা সে গোপন করতে চেষ্টা করছে। আশে পাশে কোনো স্ট্রিট ল্যাম্প নেই বলেই যুবকটির মুখের ভাব ধরা যাচ্ছে না। চাঁদের আলো যত তীব্রই হোক মানুষের মুখের ভাব তাতে ধরা পড়ে না।বেঁটে যুবকটি মেয়েদের মতো রিনরিনে গলায় বলল, 'আছেন কেমুন?'

মির্জা সাহেব বিস্মিত গলায় বললেন, 'আমাকে জিজ্ঞেস করছ?'

'জ্বি না। আফনেরে না। আফনের কান্ধে যে দুই ফিরিস্তা আছে তাহারে জিগাই।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'সব কিছু কি বোঝা যায় চাচামিয়া? কিছু বোঝা যায়, কিছু যায় না। এই হইল জগতের নিয়ম।'

মির্জা সাহেবের বিস্ময় আরো বাড়ল তবে তিনি তা প্রকাশ করলেন না। এই যুবকরা আসলে কী চায় তা তিনি বুঝতে চেষ্টা করছেন। বেঁটে যুবকটি তার সঙ্গে রসিকতা করার চেষ্টা করছে। নেশা করে আসে নি তো? এলকোহলের তিনি কোনো গন্ধ পাচ্ছেন না। এলকোহল ছাড়াও আরো সব নেশার জিনিস আছে। তেমন কিছু না তো? এমিটোফিন জাতীয় কোনো ড্রাগ। ঢাকা শহরে এসব কি চলে এসেছে?

তিনি সহজ স্বরে বললেন, 'কী ব্যাপার বলতো?'

বেঁটে যুবকটি বলল, 'য়ভ য়পা না খিদে লাহা।'

তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। এই যুবকটি কি কোনো সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করছে?

বাকি দু'জন যুবকও এবার এগিয়ে আসছে। মির্জা সাহেব বললেন, 'তোমরা কারা?'

স্বাস্থ্যবান যুবকটি বলল, 'তুমি তুমি করছেন কেন? আপনার কি ধারণা আমরা কচি খোকা।'

'অবশ্যই তোমরা কচি খোকা নও। আমার বয়স অনেক বেশি সেই কারণেই তুমি বলছি।'

'আপনি কথা বেশি বলেন। নো টক।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

বেঁটে যুবকটি বলল, 'পেটের ভিতর যখন ক্ষুর হান্দাইব তখন বুঝবি বিষয় কি! হালা তুমি তুমি করে। হালার কত বড় সাহস।'

লম্বামতো জিনিসটা যে একটা ক্ষুর তিনি তা আন্দাজে বুঝে নিলেন। সামান্য একটা ক্ষুর হাতে এই তিন যুবক তাঁকে ঘিরে ধরে আছে। এরা মাগার। পথচারীর টাকা–পয়সা ছিনিয়ে নেয়। অস্ত্রপাতির বল তেমন নেই। ক্ষুরের মতো সামান্য জিনিস নিয়ে পথে নেমেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা কি ঢাকা শহরের স্বাভাবিক কোনো দৃশ্য? তাঁর কাছে রাতের নিউইয়র্ক বলে মনে হচ্ছে। তিনি নিউইয়র্কে দু'বার মাগারদের হাতে পড়েছেন। দু'বারই ওদের হাতে ছিল আট ইঞ্চি ছোরা। প্রথমবার দু'জন কালো ছেলে এসে পথ আটকে দাঁড়াল। এক জন নেশার কারণে দাঁড়াতে পারছিল না। ঢলে পড়ে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় জন নেশা করে নি। সে শীতল গলায় বলল, 'একটা ডলার দিতে পার। খুবই প্রয়োজন।'

তিনি ওয়ালেট বের করলেন এবং নিশ্চিন্ত হলেন ছেলেটি ওয়ালেট ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে পালাবে। তা সে করল না। শান্ত ভঙ্গিতে ডলারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। মির্জা সাহেব ডলার বের করে দিলেন। ছেলেটি বলল, 'ধন্যবাদ। আমার এই বন্ধুকে কি তুমি এক শ' ডলার দিতে পার? ওর এক শ' ডলারের খুব প্রয়োজন।'

তিনি বললেন, 'এক শ' ডলার আমার সঙ্গে নেই। সে এই ওয়ালেটটি নিতে পারে।'

'ধন্যবাদ। ঘড়িটা খুলে দাও।'

তিনি ঘড়ি খুলে দিলেন। তখনি ছেলেছি প্রচণ্ড একটা ঘুঁষি তার পেটে বসিয়ে দিল। তিনি ছিটকে রাস্তায় পড়ে গেলেন। ছেলেটি ফিরেও তাকাল না। যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে শিস দিতে দিতে এগিয়ে গেল। একবার পিছনে ফিরেও তাকাল না। ভয়ংকর যে খুনী সেও অন্তত একবার তার খুনকরা মৃত দেহটির দিকে তাকায়।

এরাও কি সেই কালো ছেলেটির মতো? মনে হচ্ছে না। এদের চেহারা ভদ্র। অবশ্যি ঐ কালো ছেলেটির চেহারাও ভদ্র ছিল। কি সুন্দর করে কথা বলছিল।

মির্জা সাহেবকে চমকে দিয়ে বেঁটে ছেলেটি বলল, 'কিরে হালা কতা কচ না ক্যান?'

বেঁটে জন বা হাতটায় একটা ঝাঁকি দিতেই খচ করে শব্দ হল। ক্ষুরের ফলা খুলে গেল। মির্জা সাহেব এই প্রথম বুঝলেন—ক্ষুর একটা ভয়াবহ অস্ত্র।

'তোর পকেটে কী আছে?'

'ট্রাভেলার্স চেক। তোমরা এই চেক ভাঙাতে পারবে না।'

মির্জা সাহেবের পেছনে দাঁড়ানো ছেলেছি বলল, 'চাচামিয়া তাইলে ফরেন মাল। আবুধাবি? না কি কুয়েত?'

বেঁটে ছেলেটি খিকখিক শব্দ করছে। হায়নার হাসির সাথে এই শব্দের একটা মিল আছে। মির্জা সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, 'তোমরা আমার ঘড়িটা নিতে পার। দামি ঘড়ি বিক্রি করলে কিছু পাবে।'

তাঁর নিজের শান্ত গলার স্বরে তিনি নিজেই চমকে গেলেন। তিনি যেন বেশ মজা পাচ্ছেন কথা বলতে। চাঁদের আলোয় এই তিন যুবককে কেন জানি মোটেই ভয়াবহ মনে হচ্ছে না। একটা খালি রিকশাকে এই সময় আসতে দেখা গেল। বুড়ো রিকশাওয়ালা, তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ রিকশার গতি দ্রুত করে দিল। এ রকম দৃশ্য সে মনে হয় আরো দেখেছে। এবং সে জানে এই সব ঘটনাকে পাশে রেখে দ্রুত এগিয়ে যাওয়াই নিয়ম। পেছনের ছেলেটি মির্জা সাহেবের কাঁধে হাত রাখল। আগের মতো মেয়েলি গলায় বলল, 'চাচা মিয়া, চলেন এট্টু সামনে। আপনের লগে একখান কতা আচে।'

'কী কথা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কথাটা হইল ব্যাঙের মাথা। কী ব্যাঙ? সোনা ব্যাঙ। কী সোনা.....

ছেলেটির কথা শেষ হল না। হাসতে হাসতে তার প্রায় গড়িয়ে পড়ার উপক্রম হল। যেন এ রকম মজার দৃশ্য অনেক দিন সে দেখে নি। মির্জা সাহেব বললেন, 'চল যাওয়া যাক।'

এই কথায় যুবকদের মধ্যে একটু দ্বিধার ভাব দেখা গেল। বেঁটে যুবকটি বলল, 'তবসিমু লইহ।'

আবার সেই সাংকেতিক ভাষা। মির্জা সাহেব আবার বললেন, 'চল কোথায় যাবে?'

স্বাস্থ্যবান যুবকটি ধমকে উঠল, 'আবার তুমি?'

'তোমরা বয়সে আমার অনেক ছোট এই জন্যেই তুমি বলছি। অন্য কিছু নয়। তবে তোমাদের যদি অপমান বোধ হয় তাহলে আর বলব না।'

বেঁটে যুবকটি চাপা গলায় বলল, 'নো টক। হাঁট। কুইক মার্চ। লেফট রাইট। লেফট।'

যুবকরা দ্রুত পা ফেলছে। তিনিও প্রায় সমান তালে পা ফেলছেন। এই সব ক্ষেত্রে আচার-আচরণ খুব স্বাভাবিক রাখতে হয়। কথাবার্তা বলে টেনশান কমিয়ে দিতে হয়। তাই নিয়ম। এই তিনটি যুবকের মানসিকতা তিনি জানেন না। এরা কী পরিমাণ নিষ্ঠুর হতে পারে তাও জানা নেই। দীর্ঘ দিন পর দেশে ফিরেছেন। এই দীর্ঘ সময়ে অনেক কিছুই ঘটে গেছে। এখন হয়ত এ রকম দলছুট তরুণেরা চাঁদের আলোয় অকারণেই মানুষের পেটে ক্ষুর বসিয়ে দেয়।

পলিনের জন্যে তিনি তেমন কোনো দুশ্চিন্তা বোধ করছেন না। পলিন কী করবে তিনি জানেন। মার সঙ্গে কথা শেষ করে বাথরুমে ঢুকে খানিকক্ষণ কাঁদবে। তারপর চোখ মুছে ডায়েরি লিখবে। ডায়েরি লিখতে অনেক সময় নেবে যদিও লেখা হবে একটা কি দুটো লাইন। সেই লাইনগুলোও তিনি জানেন—'মা মণি তুমি এত ভালো। বাবাও এত ভালো। অথচ দু'জন একসঙ্গে থাকতে পারলে না কেন?' এই লাইন ক'টি লিখে সে আবার কিছুক্ষণ কাঁদবে। তারপর চোখ মুছে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বে। এখন সম্ভবত সে ঘুমুচ্ছে।

মির্জা সাহেব বললেন, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

বেঁটে যুবকটি সঙ্গে-সঙ্গে বলল, 'শ্বশুর বাড়ি।' বলেই খিকখিক করে হাসতে লাগল। তার হাতে এখন ক্ষুর নেই। অস্ত্রটা সে তার প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছে।

বাইশ বছর পর দেশের কী হয়েছে তিনি দেখতে এসেছেন। ভালো সুযোগ পাওয়া গেল প্রথম রাতেই। তবে তিনটি যুবককে দিয়ে পুরো দেশ সম্পর্কে আঁচ করা যায় না। এই তিনটি যুবক হচ্ছে র‍্যান্ডম স্যামপ্লিংয়ের একটি স্যাম্পল। বাইশ বছর আগেও এরকম যুবকরা চাঁদের আলোয় শহরের পথে পথে ঘুরত। হাতে অবশ্যি ক্ষুর থাকত না। তিনি নিজেই কত রাতে বন্ধুদের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে আনন্দ করেছেন। এরা যা করছে তাও এক অর্থে আনন্দ। তাঁদের রাতে হাঁটা বাতিক হয়েছিল ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার পর। এগারটার সময় চা খেতে যাওয়া হত নীলক্ষেতে। সামান্য এক কাপ চা খেতে লাগত এক ঘন্টা। চা শেষ করার পর কেউ-না-কেউ বলত—খানিকক্ষণ হাঁটা-হাঁটি করলে কেমন হয়? দুটো দল হয়ে যেত সঙ্গে-সঙ্গে। এক দল ফিরে গিয়ে পড়াশোনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে চায়। অন্যদল হাঁটতে যেতে চায়। শেষ পর্যন্ত সবাই মিলেই হাঁটতে যেত। এক সময় ক্লান্ত হয়ে রেসকোর্সের মাঠে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকা। শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুম এসে যেত। বদরুল একবার পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়ল। মজা করবার জন্যে তাকে ফেলে রেখে সবাই চলে এসেছিল।

এখনকার ছেলেরা কি এরকম করে? তিনি জানেন না। দেশের সঙ্গে তাঁর প্রায় কোনো যোগাযোগ নেই। মামাদের সংসারে মানুষ হয়েছিলেন। তিন মামার কেউই তাঁকে সহ্য করতে পারতেন না। স্কুলের বেতন, নতুন বই-খাতা, পরীক্ষার ফিস, এইসব যোগাড় করবার জন্যে একেক মামার কাছে তিনবার চারবার করে যেতে হত। পরীক্ষার ফিস হয়ত তিরিশ টাকা। এক সময় বড় মামা বিশ টাকার একটা নোট ফেলে দিয়ে বলতেন, 'যা-যা আর বিরক্ত করিস না। টাকার দরকার হলেই বড় মামা। মামা কি আর নেই নাকি? আরেকবার আমার কাছে আসলে টান দিয়ে কান ছিঁড়ে ফেলব হারামজাদা।' বাকি দশটা টাকার তখনও যোগাড় হয় নি। কী ভাবে হবে বা শেষ পর্যন্ত হবে কি-না কে জানে। ছেলেবেলার জীবনটা তাঁর অসম্ভব দুঃখ-কষ্টে কেটেছে। তবে মামারা তাকে পুরোপুরি ত্যাগ করেন নি। আমেরিকা যাবার ভাড়া এগার হাজার টাকা তাঁরাই যোগাড় করলেন। সেই জন্যে মেজো মামীর কানের দুল বিক্রি করতে হল। বড় মামী তার বাবার কাছ থেকে ছ'হাজার টাকা ধার আনলেন। যাবার দিন তিন মামাই এয়ারপোর্টে এলেন। বড় মামা এক ফাঁকে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'মনের মধ্যে কিছু পুষে রাখিস না। অনেক যন্ত্রণা দিয়েছি। সুখে থাকিস।' এই বলেই ভীষণ কান্নাকাটি করতে লাগলেন। দরিদ্র মামাদের ঋণ মির্জা সাহেব শোধ করতে পারেন নি। সব কিছু কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। চিঠি দিলে মামারা কেউ জবাব দেন না। বিদেশে চিঠি পাঠানোর বাড়তি খরচটা কেউ করতে চান না বোধ হয়। এক সময় তাঁরা তাঁদের ঝিকাতলার বাড়ি বিক্রি করে ফেললেন। টাকা ভাগাভাগি করে আলাদা হয়ে পড়লেন। মির্জা সাহেবও কয়েকবার ঠিকানা বদল করলেন। যোগাযোগ কিছুই রইল না। দেশ থেকে আসা এক জনের কাছে শুনলেন মেজো মামী মারা গেছেন। মেজো মামার মাথার দোষ হয়েছে। মামাদের এই সংসার জলে ভেসে যাচ্ছে। বড় দুই ছেলে গুণ্ডামি মাস্তানি করে। তাদের পড়াশোনা কিছুই হয় নি।

মির্জা সাহেব সাহায্য করবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু তাঁর সঙ্গতি ছিল না। নিজেরই তখন ঘোর দুর্দিন। পাশ করে বসে আছেন। চাকরি জোটাতে পারছেন না। গ্রিন কার্ড নেই। বিদেশিদের চাকরি দেবার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি। ভিসার মেয়াদও গেছে শেষ হয়ে। লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে হয়। এই বন্ধুর বাড়িতে কিছু দিন ঐ বন্ধুর বাড়িতে কিছু দিন। সেই সময় কেরোলিনের সঙ্গে পরিচয়। পরিচয় থেকে বিয়ে। আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দার সময় তখন। গ্রিন কার্ড পাওয়ার পরও চাকরি হয় না। গুছিয়ে উঠতে উঠতে অনেক সময় চলে গেল। দেশের কে কোথায় তা নিয়ে ভাববার অবকাশই হল না।

এখন ভাববেন। কাল ভোরেই তিনি মামাদের খোঁজে বের হবেন। খুঁজে বের করা খুব একটা জটিল সমস্যা হবে না।

মির্জা সাহেব বললেন, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' বেঁটে যুবকটি বলল, 'নো কট।' সঙ্গে-সঙ্গে তিনি সাংকেতিক ভাষার অর্থ উদ্ধার করলেন। ছেলেটি উল্টো করে বলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নো কট হচ্ছে—নো টক। বেঁটে ছেলেটির নামও তিনি জেনেছেন। তার নাম মজিদ। লম্বা ছেলেটি আলম। অন্যজনের নাম তিনি এখনো জানেন না।

নাম না জানা ছেলেটি বলল, 'সিগারেট দরকার। সিগারেট শেষ হয়ে গেছে।'

মজিদ মির্জা সাহেবকে বলল, 'আপনার কাছে সিগ্রেট আছে?'

'না।'

'ধূমপান করেন না?'

'এককালে করতাম। এখন করি না।'

'ক্যানসারের ভয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'এত বেঁচে থাকার শখ?'

মির্জা সাহেব দু'টি ব্যাপার লক্ষ করলেন, ছেলেটা কথার ধরন বদলেছে। ভদ্র স্বর বের করেছে। তাই হয়ে থাকে। পাশাপাশি কিছু সময় থাকা মানেই পরিচয়। নিতান্ত অপরিচিত এক জনের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করা যায় কিন্তু পরিচিত কারোর সঙ্গে করা যায় না। সাইকোলজিস্টরা যে কারণে বলেন, 'খারাপ প্রকৃতির মানুষের হাতে পড়লে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। তারা যা বলে তাতেই রাজি হতে হবে। এবং চেষ্টা করতে হবে কথা বার্তা বলার। তাদের কেউ যদি বলে, আমরা এখন তোমাকে গুলি করে মারব, তখন ভয়ে অস্থির হওয়া চলবে না। ভয় খুব সংক্রামক। তোমার ভয় দেখে সেও ভয় পাবে। একজন ভীতু মানুষ ভয়ংকর কাণ্ড করে। পৃথিবীতে হত্যার স্টেটিসটিকস নিলে দেখা যাবে যে বেশিরভাগ খুনগুলো করেছে ভীতু মানুষেরা। কাজেই কেউ তোমাকে হত্যা করতে চাইলে তুমি সময় চাইবে। যাকে বলে কালক্ষেপণ। শুধু কথা বলবে। তুমি যদি নন স্মোকারও হও তবু বলবে, আমাকে মেরে ফেলতে চান, আমার কিছু করার নেই। দয়া করে আমাকে একটা সিগারেট দিন। একটা সিগারেট হাতে পাওয়া মানে পাঁচ মিনিট সময় বেশি পাওয়া। খেয়াল রাখবে, পাঁচ মিনিট অনেক সময়। এই সময়টা কাজে লাগাবে। এমন ধরনের কথা বলবে যার জন্যে হত্যাকারী প্রস্তুত নয়। যেমন, তুমি তার শার্টের দিকে তাকিয়ে বলতে পার—আপনার এই হাওয়াই শার্টের রঙটা চমৎকার। আমার অবিকল এরকম একটা ছিল। এক লোকের হাতের জ্বলন্ত সিগারেটে শার্টটা ফুটো হয়ে গেছে। তোমার কথায় লোকটা হকচকিয়ে যাবে। তার শার্টের মতো তোমারও একটা শার্ট ছিল এটা শোনার পর তার সঙ্গে তোমার একটি সূক্ষ্ম বন্ধন তৈরী হবে। তোমার শার্টটি নষ্ট হয়ে গেছে এতে সে তোমার প্রতি খানিকটা সহানুভূতি বোধ করবে। এই সহানুভূতি খুবই সূক্ষ্ম। তবে সূক্ষ্ম হলেও কাজের।'

মির্জা সাহেব বললেন, 'একটা দোকান খোলা দেখা যাচ্ছে। ওখানে কি সিগারেট পাওয়া যাবে?'

তারা জবাব দিল না কিন্তু খোলা দোকানটির দিকে হাঁটতে লাগল। দোকানের নাম রূপা স্টোর। সাড়ে বত্রিশ ভাজা ধরনের দোকান। বিদেশি কসমেটিকস থেকে আইসক্রিম পর্যন্ত আছে। সঙ্গে কনফেকশনারি। দু'জন কর্মচারী। এরা দু'জনই দোকান বন্ধ করায় ব্যস্ত। তারা ঢোকা মাত্র বিরক্ত গলায় বলল, 'দোকান বন্ধ।'

মাহিন বলল, 'পুরোপুরি বন্ধতো এখনো হয় নাই ভাই। এক প্যাকেট সিগারেট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিব। ফাইভ-ফাইভ আছে।'

'আছে বিক্রি হবে না।'

'কেন হবে না?'

'একবার বললাম শুনলেন না, দোকান বন্ধ করে দিয়েছি।'

মজিদ তীব্র চোখে তাকিয়ে রইল। কিছু বলল না। আলম বলল, 'ভাই রাত হয়ে গেছে সিগারেট পাওয়া যাবে না। আপনার কাছে আছে দিয়ে দেন চলে যাই।'

সারাদিন বেচাকেনা করে কর্মচারী দু'জনেরই মেজাজ খুব খারাপ। রোগা হাড় জিড়জিড়ে যে জন, সে-ই কট-কট করছে। অন্যজন বেশ বলশালী। সে এতক্ষণ কথা বলে নি। এখন বলল, 'মালিক ক্যাশ নিয়ে দোকান বন্ধ করতে বলে দিয়েছে। আপনারা সিগারেটের দাম দিবেন আমি ভাংতি দিতে পারব না।'

মাহিন বলল, 'যা দাম হবে তাই দিব ভাংতি দিতে হবে না।'

মোটা কর্মচারী এক প্যাকেট সিগারেট বের করে বলল, 'পঞ্চাশ টাকা দেন।'

মাহিন বলল, 'বাজারেতো পঁয়তাল্লিশ টাকা, আপনি পঞ্চাশ চাচ্ছেন কেন?'

'বাজারে পঁয়তাল্লিশ হলে বাজার থেকে নেন।'

সে প্যাকেট ঢুকিয়ে রাখল। আলম বলল, 'প্যাকেটটা ঢুকিয়ে রাখলেন কেন ভাই সাহেব? কিনব না এমন তো বলি নাই। হয়তো পঞ্চাশ টাকা দিয়েই কিনব।'

আলম পঞ্চাশ টাকার নোটটা এগিয়ে দিল।

রোগা কর্মচারীটি সঙ্গে-সঙ্গে বলল, 'নোটটা বদলে দেন ছেড়া আছে।'

'কোথায় ছেড়া?'

'এই যে দেখেন স্কচ টেপ মারা।'

মির্জা সাহেব এক দৃষ্টিতে আলমের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি খুব অস্বস্তি নিয়ে লক্ষ করলেন, ছেলেটির ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠছে। যতদূর মনে হচ্ছে এর কাছে এই পঞ্চাশ টাকার নোটটা ছাড়া আর কিছু নেই। সম্ভবত তার বন্ধুদের কাছেও নেই। মির্জা সাহেব পরিষ্কার বুঝলেন ঘটনা এখন অন্যদিকে মোড় নেবে। তিনি কি কিছু করতে পারেন? তাঁর কাছে বাংলাদেশি টাকা নেই। টাকা থাকলে চকচকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট কাউন্টারে রেখে দিতেন। এতে অবশ্যই কাজ হত।

আলম বলল, 'এই নোট রাখবেন না?'

বলতে গিয়ে তার গলা কেঁপে গেল। মোটা কর্মচারীটি বলল, 'রেখে দেরে লিটু। ঝামেলা শেষ কর।'

তার কথা শেষ হবার আগেই লিটু উল্টে পড়ে গেল। আলম প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটেছে যে আলম নিজেও ঠিক বুঝতে পারল না, কী ঘটে গেল। সে তাকিয়ে দেখল লিটু নামের লোকটা দু'হাতে তার নাক চেপে ধরে আছে। তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়ছে।

মোটা লোকটা বলল, 'এইটা কী করলেন?'

মজিদ ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল, 'হারামজাদা তুই কানে ধর।'

'কী কন আপনে?'

'হারামী কানে ধর।'

খুট করে শব্দ হল। মজিদ খাপ থেকে তার ক্ষুর বের করে ফেলেছে। মোটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। মজিদ হিস-হিস করে বলল, 'কানে ধর কানে ধর।'

মোটা কর্মচারীটির চোখে ভয় ঘনিয়ে এল। ভয় ঘনিয়ে আসাই স্বাভাবিক। মজিদের পুরো চেহারা পাল্টে গেছে। তার চোখে উন্মাদ দৃষ্টি। এই দৃষ্টি চিনতে কারোর ভুল হবার কথা নয়।

আলম লিটুর দিকে এখনো তাকিয়ে আছে। হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত পড়ছে। এই দৃশ্য তাকিয়ে দেখা যাচ্ছে না আবার দৃষ্টিও ফিরিয়ে নেয়া যাচ্ছে না। লিটু বিড়-বিড় করে কি যেন বলল, মজিদ তার দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'নখু, রেক বলফে।'

লিটু কিছুই বুঝল না। কিন্তু মির্জা সাহেবের গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। মাহিন কাউন্টারের এক পাশে রাখা ক্রিকেট ব্যাটের স্তূপের দিকে এগিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বিকট শব্দ হল। সে ব্যাট দিয়ে বাড়ি মেরে কাউন্টারের কাচের দেরাজ গুড়িয়ে ফেলেছে। ঘরময় কাচের টুকরা।

মোটা কর্মচারীটি প্রায় ফিস-ফিস করে বলল, 'মাফ করে দেন ভাইজান। মাফ চাই। মাফ '

মজিদ চাপা গলায় বলল, 'নখু রেক বলফে।' মোটা কর্মচারী আবার বলল, 'ভাইজান মাফ করে দেন। ও লিটু ভাইজানের পায়ে ধরে মাফ চা।'

লিটু সঙ্গে-সঙ্গেই রক্তমাখা হাতে মজিদের প্যান্ট চেপে ধরল। মজিদ প্রচণ্ড লাথি দিয়ে তাকে কাচের টুকরোর উপর ফেলে দিল। আবার একটি শব্দ হল। মাহিন কাচের আরেকটি দেরাজ ভেঙ্গেছে।

মোটা কর্মচারীটি ভীতু গলায় বলল, 'লা-ই লাহা ইল্লা আনতা সোবাহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজজুয়ালেমিন। লা-ই লাহা ইল্লা আনতা সোবাহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজজুয়ালেমিন।'

মজিদ চড়া গলায় বলল, 'নখু রেক বলফে।'

'ভাইজান মাফ করে দেন। ভাইজান মাফ করে দেন।'

'নখু রেক বলফে।'

'জানে মাইরেন না ভাইজান। আমার ছোট-ছোট দুইটা বাচ্চা।'

মোটা কর্মচারীটি কেঁদে ফেলল। মির্জা সাহেবের আত্মা কেঁপে উঠল। লোকটি ভয় পাচ্ছে। অসম্ভব ভয় পাচ্ছে। এই ভয় সংক্রামক। এই ভয় ঢুকে যাবে মজিদের ভেতর তখন ভয়ংকর কিছু হয়ে যাবে।

'মাফ করে দেন ভাইজান। মাফ করে দেন।'

'আর কোনো দিন কাস্টমারের সাথে খারাপ ব্যবহার করবি?'

'না ভাইজান না।'

'এরপর থেকে কাস্টমাররে বাপ ডাকবি?'

'জ্বি ভাইজান ডাকব।'

'আর মেয়ে কাস্টমার হইলে মা ডাকবি?'

'জ্বি ভাইজন ডাকমু।'

ওরা বেরিয়ে এল। মির্জা সাহেব পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলেন, যদিও তাঁর ধারণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার কথা এখন আর তাদের মনে নেই। তারা কিছু দূর এগিয়ে একটা লাইট পোস্টের নিচে দাঁড়াল। এখন বেশিরভাগ লাইট পোস্টেই সোডিয়াম ল্যাম্প। এইটির তা নয়। সাদা টিউব লাইট জ্বলছে।

আলম বলল, 'মজিদ তোর সারা গায়ে রক্ত। এত রক্ত এল কোথেকে?'

মজিদ তাকিয়ে দেখল, সত্যি রক্তে প্রায় মাখামাখি। সে শীতল গলায় বলল, 'দেখি সিগারেট দে।'

আলম বলল, 'সিগারেটের প্যাকেটতো আনা হয় নি। আসল জিনিসই রয়ে গেছে। আবার যাবি?'

মজিদ জবাব দিল না।

মির্জা সাহেব বললেন, 'আবার যাওয়া ঠিক হবে না। এতক্ষণে খবর হয়ে গেছে। লোকজন চলে এসেছে।'

মজিদ তীব্র গলায় বলল, 'আসুক না। ভয় পাই না-কি। আবদুল মজিদ কোনো শালাকে ভয় পায় না। উল্টো সব শালা আবদুল মজিদকে ভয় পায়।'

আলম বলল, 'ক্ষুরটা খাপে ঢুকিয়ে রাখ মজিদ। দেখে ভয় ভয় লাগছে।'

'লাগুক ভয়। এই ক্ষুর দিয়ে আজ কোনো এক শালাকে আমি কাটব। না কাটলে মনে শান্তি হবে না। এই যে চাচা মিয়া আপনার নাম কি?'

'আমার নাম মির্জা।'

'তোমাকে আমি কাটব। কাটাকুটি খেলা হবে।'

'আমি অপরাধটা করেছি কী?'

'তুই শালা গরমের মধ্যে কোট পরেছিস। শালা ফুটানি দেখাচ্ছিস।'

'তোমরা যদি বল তাহলে কোট খুলে ফেলি।'

'শালা আবার তুমি করে বলে।' মজিদ আচমকা এক চড় বসিয়ে দিল।

মির্জা সাহেব প্রথমবারের মতো সত্যিকার অর্থে ভয় পেলেন। তাঁর মনে হল দোকানে ঢুকবার আগে এরা যা ছিল এখন তা নেই। এখন তার সামনে অন্য একদল ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। এরা যে কোনো মুহূর্তে ভয়ংকর কিছু করতে পারে।

মজিদ বলল, 'চল করিমের ওখানে যাই।'

আলম বলল, 'করিমের ওখানে কেন?'

'ঐখানে গিয়ে এই চাচামিয়াকে কোরবাণী দিয়ে দিব। চাচা মিয়া কোট পরে ফুটানি দেখাচ্ছে।'

আলম জবাব দিল না।

দলটি হাঁটতে শুরু করল। মীর্জা সাহেব লক্ষ করলেন মজিদ ছেলেটি এখন আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটছে না। অর্থাৎ সে এই মুহূর্তে কোনো শারীরিক ব্যথা-বেদনা অনুভব করছে না। তিনি ঘড়ি দেখলেন। তাঁর ঘড়িতে এখন তিনটা বাজে। অর্থাৎ মাত্র আধ ঘন্টা সময় পার হয়েছে। এদের সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন বেজে ছিল আড়াইটা। বাংলাদেশ সময় এখন কত? আলম ছেলেটির হাতে ঘড়ি আছে। তাকে কি সময় জিজ্ঞেস করবেন? জিজ্ঞেস করাটা কি ঠিক হবে?

মির্জা সাহেব আলমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কটা বাজে?'

উত্তর দিল মজিদ। চাপা গলায় বলল, 'চুপ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মির্জা সাহেব নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলেন। আকাশের চাঁদ জোছনার ফিনকি ছড়াচ্ছে। চারদিকে দিনের মতো আলো।

৬

মজিদ বলল, 'রেসকোর্সের মাঠে যাবি না–কি?'

কেউ জবাব দিল না। মনে হচ্ছে সবাই কিছুটা ক্লান্ত। মাহিন বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। তার পিছিয়ে পড়াটা ইচ্ছাকৃত। সিগারেট খেতে হবে প্যান্টের পকেটে চারটা ইমার্জেন্সি সিগারেট আছে। তারই একটা সে ধরাল। অন্যরা টের পেলে মুশকিল হবে। মাহিন সিগারেটের আগুন হাত দিয়ে আড়াল করে টানছে। তেমন আরাম পাওয়া যাচ্ছে না। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হচ্ছে। মজিদ টের পেলে খ্যাচাং শুরু করবে।

মজিদ বলল, 'কি তোরা যাবি রেসকোর্সের মাঠে?'

আলম বলল, 'ঐখানে আছে কি?'

মজিদ চাপা গলায় বলল, 'ফূর্তির জায়গাই হচ্ছে রেসকোর্সের মাঠ। গাছ বড় হয়েছে। অন্ধকার–অন্ধকার ভাব। এই সব অন্ধকারে মজার মজার জিনিস দেখবি।'

'দূর বাদ দে।'

'বাদ দেব কেন? ঢাকার লাইফ দেখব না? আমাদের সঙ্গে ফরেন চাচামিয়া আছে। ফরেন চাচামিয়াকে দেখিয়ে দেই। কি ফরেন চাচামিয়া, দেখতে চান না?'

মির্জা সাহেব সহজ গলায় বললেন, 'না।'

'বিলাতি মেম সাহেব ছাড়া মন বসে না? নিচে কার্পেট উপরে ঝাড় বাতি। মেম সাহেবের কোমরে হাত দিয়ে নাচ।'

'সবাই যে এ রকম করে তা কিন্তু না।'

'চাচামিয়া বুঝি করেন না?'

'না।'

'চাচামিয়া কি মৌলানা না–কি?'

মির্জা সাহেব জবাব দিলেন না। দলটি রেসকোর্সের দিকে এগুতে লাগল। মজিদ এখন দলপতি। পছন্দ না করলেও সবাই তার পেছনে–পেছনে যাবে। ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন পরিস্থিতিতে হয়ত এদের মধ্যে অন্য কেউ দলের নেতৃত্ব নেবে। তবে আজকের রাতটা মজিদের। সময় নেতা তৈরি করে। ঠিক সময়ে ঠিক নেতা এই কারণেই বের হয়ে আসে।

আলম বলল, 'পানির তৃষ্ণা হচ্ছে। খাওয়ার পানি আছে না–কি।'

মজিদ বলল, 'রেসকোর্সে পুকুর আছে।'

'ঐ জার্ম ভর্তি পানি আমি খাব, বলিস কি?'

'দরকার হলে খাবি। সে রকম তৃষ্ণা হলে সব খাওয়া যায়।'

মির্জা সাহেব লক্ষ করলেন মজিদ ছেলেটা অনেকক্ষণ উল্টো করে কথা বলছে না। সে কি স্বাভাবিক হয়ে আসছে। ঘোর কেটে যাচ্ছে? সব বড় ক্রাইম এক ধরনের ঘোরের মধ্যে করা হয়। ঘোর কেটে গেলে ক্রিমিন্যালরা কিছু করতে পারে না। তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন সাধারণ মানুষের চেয়েও তরল অবস্থায় চলে যায়, অল্পতেই তারা আবেগে অভিভূত হয়। মন্টানা শহরের সেই কুখ্যাত খুনীর কথাই ধরা যাক। কী নাম ছিল যেন—জন-রেমন্ড? না-কি জেনি-রে। জেনি-রেই হবে। মেয়েলি ধরনের নাম। ঘোরের মধ্যে চলে গেলে গলায় বেল্ট পেঁচিয়ে খুন করত। নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ কোনো বাছ বিচার ছিল না। ধরা পড়বার পর পুলিশ যখন জানতে চাইল, 'কেন খুন করতে?' সে পাইপ টানতে-টানতে হাসিমুখে বলেছিল, ' মরবার সময় লোকগুলি কেমন অদ্ভুত চোখে তাকাত, দেখতে বড় ভালো লাগত।'

'অদ্ভুত চোখ বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ?'

'তাদের চোখের দৃষ্টিতে ভালবাসা মাখানো থাকত।'

'ভালবাসা?'

'হ্যাঁ। ভালবাসা। গভীর ভালবাসা। তুমি না দেখলে বুঝতে পারবে না। মৃত্যু পথযাত্রীর চোখ বড় মায়াময়।'

এই জেন-রেই সুস্থ থাকা অবস্থায় লাল নীল কাগজে মজার মজার ছড়া লিখে ছোট-ছোট বাচ্চাদের বিলাতো।

"Dick dick dick
My dog is sick
Her dog is long
Sing sing a song."

এক পাবলিশার আবার এই সব ছড়া জোগাড় করে এক বই ছাপিয়ে ফেলল। বইটির নাম Black Rhymes- কালো ছড়া। আমেরিকা হচ্ছে পাগলের দেশ।

মাহিনের সিগারেট শেষ হয়েছে। সে এসে দলে যোগ দিয়েছে। তার একা-একা সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারটা কেউ লক্ষ করে নি দেখে সে বেশ খুশি। সে ফুর্তিবাজের গলায় বলল, 'কি মারাত্মক চাঁদ উঠেছে দেখেছিস না-কি রে মজিদ?'

মজিদ জবাব দিল না। আকাশের দিকে তাকালও না। এক দলা থুথু ফেলল। মাহিন বলল, 'সুকান্ত বেঁচে থাকলে এই চাঁদ দেখে আরেকটা বিপ্লবী কবিতা লিখে ফেলত। থ্যাংক গড যে মারা গেছে।'

মজিদ এবারো জবাব দিল না। আবার এক দলা থুথু ফেলল, মাহিন বলল, 'কথা বলছিস না কেন?'

'স্বার্থপর ছোটলোকের বাচ্চার সঙ্গে আমি কথা বলি না।'

'আমি স্বার্থপর?'

'ইচ্ছা করে পেছনে পড়ে গেলি হারামজাদা ছোটলোক।'

'আরে একটা সিগারেট কেমন করে জানি পকেটে ছিল আমি জানতাম না—আপ অন গড।'

'আবার মিথ্যা কথা বলছিস? প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে আবার প্যাকেটে রেখে দিলি...

'একটাই সিগারেট ছিল। বিশ্বাস কর খালি প্যাকেট। আপ অন গড।'

'খালি প্যাকেট কোনো শালা পকেটে রাখে?'

মির্জা সাহেব বিস্মিত হলেন। মজিদের মধ্যে নেতার গুণাবলি চলে এসেছে। দলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। কে কী করছে না করছে তা সে এখন জানে।

মাহিন থমথমে গলায় বলল, 'সিগারেট যদি প্যাকেটে থেকেই থাকে তাতে অসুবিধা কি? আমি কি তোর পয়সায় সিগারেট কিনেছি। গালাগালি করছিস কেন? ফস করে হারামজাদা বলে ফেললি। শালা তুই হারামজাদা বানান জানিস?'

আলম বিরক্ত মুখে বলল, 'কী শুরু করলি তোরা। চল হাঁটি।'

মাহিন বলল, 'আমি হাঁটাহাটির মধ্যে নেই। বাসায় চলে যাব।'

আলম বলল, 'এখন বাসায় যাবি কি? মাত্র বারটা চল্লিশ বাজে। নাইট ইজ স্টিল ইয়াং।'

'বারটা চল্লিশ বাজুক বা তেরটা চল্লিশ বাজুক আমি চললাম।'

'সত্যি যাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ সত্যি।'

আলম বলল, 'চল সবাই মিলে চলে যাই। পুলিশে ধরলে মুশকিল। হাজতে চালান করে দিবে। মজিদ, চল যাওয়া যাক।'

'তোরা যেতে চাইলে যা।'

'তুই একা-একা কী করবি?'

'বললাম না একটা খুন করব। দাঁড়িয়ে আছিস কেন চলে যা।'

'তুই যাবি না?'

'না।'

'আর এই ভদ্রলোককে কী করবি?'

'নখু বরক, নখু বরক।'

মির্জা সাহেব চমকে উঠলেন। উল্টো কথা আবার ফিরে এসেছে। ছেলেটা কথাও বলছে তীক্ষ্ণ স্বরে, আগের পাগলামী কি আবার ফিরে আসছে। সঙ্গের ছেলে দু'টি চলে গেলে ঝামেলা হবে।

মজিদ বলল, 'দাঁড়িয়ে আছিস কেন? চলে যা।'

ওরা গেল না দাঁড়িয়ে রইল। মজিদ রেসকোর্সের দিকে হাঁটতে শুরু করা মাত্র তারাও পেছনে-পেছনে আসতে লাগল। মির্জা সাহেব লক্ষ করলেন মজিদ এখন আর পা টেনে-টেনে হাঁটছে না। ব্যথা বোধ নিশ্চয়ই নেই। সে তাহলে ঘোরের মধ্যে আছে, ঘোর কাটছে না।

রেসকোর্সের ময়দানে ঢোকা হল না। বৃষ্টিতে কাদা হয়ে আছে। কাদার উপর হাঁটাহাটি কারো পছন্দ হল না। তাছাড়া জায়গাটা জনশূন্য। বৃষ্টি হবার করণেই হয়ত কেউ নেই। মজিদ বলল, 'চল ফিরে যাই। করিমের কাছে যাওয়া যায়।'

আলম বলল, 'করিমের কাছে কী জন্যে? জিন খাবি?'

'হুঁ।'

সবাই আবার ফিরে চলল। কেউ কোনোরকম আপত্তি করল না। মাহিন আবার তার ইমার্জেন্সি স্টক থেকে সিগারেট বের করেছে। এবার সে একা ধরায় নি—অন্য দু'জনকেও দিয়েছে। মাহিন মনে-মনে আশা করছিল মজিদ রাগ করে সিগারেট নেবে না। তা হয় নি। মজিদ সহজ ভাবেই সিগারেট নিয়েছে।

দলটা দ্রুত গতিতে হাঁটছে। এত দ্রুত যে মির্জা সাহেব ঠিক তাল মিলাতে পারছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। বার–বার পিছিয়ে পড়ছেন। মাহিন তার সঙ্গে–সঙ্গে আসছে।

মাহিন নিচু গলায় কথা বলা শুরু করল। মির্জা সাহেবের কথা বলতে ইচ্ছা করছে না তবু বলছেন।

'আমেরিকায় আপনি কী করেন?'

'একটা ফার্মের সঙ্গে যুক্ত আছি।'

'কী ফার্ম?'

'রিসার্চ ফার্ম। ওরা ওয়াটার সলুবেল পলিমার নিয়ে গবেষণা করে। নতুন নতুন প্রডাক্ট তৈরি করে।'

'আপনি কি সাইনটিস্ট না–কি?'

'হ্যাঁ, তা বলা যেতে পারে।'

'বেতন কত পান।'

'অনেক।'

'অনেকটা কত সেটা বলেন? না–কি বলা যাবে না।'

'বলা যাবে না কেন। নিশ্চয়ই বলা যাবে। বৎসরে তিরানব্বই হাজার ডলার পাই।'

'ট্যাক্স কাটে না?'

'সব কেটে–কুটে এই পাই।'

'তিরানব্বই হাজার ডলার মানে বাংলাদেশি টাকার কত?'

'জানি না কত।'

'হিসেব করে বের করেন কত। বত্রিশ দিয়ে গুণ দেন। ডলার এখন বত্রিশ করে যাচ্ছে।'

মির্জা সাহেব প্রায় সঙ্গে–সঙ্গেই বললেন, 'প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা।'

'এক বৎসরেই ত্রিশ লক্ষ পান?'

'হ্যাঁ।'

'করেন কী এত টাকা দিয়ে?'

মির্জা সাহেব জবাব দিলেন না। মাহিন বলল, 'আপনার গাড়ি আছে?'

'আছে।'

'একটা না দু'টা?'

'দু'টা আছে।'

'বাড়ি কিনেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ক'টা রুম সেই বাড়িতে?'

'বলতে পারছি না। দোতলা বাড়ি বেশ কিছু রুম আছে।'

'নিজের বাড়িতে ক'টা রুম তাও বলতে পারছেন না?'

মির্জা সাহেব চুপ করে গেলেন। তিনি মাহিনের গলার উত্তাপ টের পাচ্ছেন। ছেলেটা রেগে যাচ্ছে। চাপা রাগ। চাপা রাগ যে কোনো মুহূর্তে ভয়ংকর রূপে ফুটে বেরুতে পারে।

'বাড়িতে সুইমিং পুল আছে?'

'আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রাজার হালে আছেন তাহলে।'

'আর দশটা বিত্তবান আমেরিকানদের মতোই আছি।'

'আপনার লজ্জা লাগে না?'

'লজ্জা?'

'হ্যাঁ লজ্জা। দেশের মানুষ না খেয়ে আছে আর আপনি সুইমিং পুলে সাঁতার কাটছেন।'

'তোমার কি ধারণা আমি সুইমিং পুলে সাঁতার কাটা বন্ধ করলে দেশের লোক খেতে পাবে?'

মজিদ হুংকার দিয়ে উঠল, 'চুপ কর শালা আবার তর্ক করে।'

'আমি তর্ক করছি না। প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি।'

'শালা তোকে প্রশ্নের জবাব দিতে কে বলেছে? এই লালটুস শালাকে খুন না করলে আমি শান্তি পাচ্ছি না। শালার মুখের দিকে তাকালে গা কাঁপছে। শালা ত্রিশ লাখ টাকা কামাই করে আমাদের মানুষ মনে করছে না। হারামজাদা বজ্জাত।'

মির্জা সাহেবের বুক কেঁপে উঠল। মজিদের উন্মাদ রাগ তিনি টের পাচ্ছেন। এই রাগ বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা নদীর প্রবল জলধারার মতো পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। যে কোনো সময় নিজেই পথ বের করে নেবে।

উনিশশ বাষট্টি সনে নিজেই এ রকম অন্ধ রাগের একটি দৃশ্য দেখেছেন। নীলক্ষেতের লেপ তোষকের দোকানগুলোর কাছে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। এক ভদ্রলোক তার স্ত্রী এবং ছোট মেয়েকে নিয়ে লালরঙের একটা ভোক্সওয়াগনে করে দ্রুত যাচ্ছেন। একটা ছোট বাচ্চা কোনোদিকে না তাকিয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হতে গেল। গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল। প্রচণ্ড ব্রেক কষে ভদ্রলোক গাড়ি থামালেন। দরজা খুলে ছুটে গেলেন বাচ্চাটির কাছে। বাচ্চাটাকে রাস্তা থেকে টেনে তোলার আগেই লোকজন তাকে ধরে ফেলল। ঝাকড়া চুলের গলায় হলুদ রঙের মাফলার জড়ানো এক যুবক অন্ধ রাগে চেঁচাতে লাগল—'হারামজাদা না দেখে গাড়ি চালায়। হারামজাদার চোখ গেলে দেন। হারামজাদার চোখ দুটো গেলে দেন...।' ছেলেটার সঙ্গে-সঙ্গে আরো অনেকে চেঁচাতে লাগল—'চোখ গেলে দাও। চোখ গেলে দাও।'

মির্জা সাহেবের মতো আরো অনেকের চোখের সামনে ভয়াবহ ঘটনাটা সত্যি-সত্যি ঘটে গেল।

আজো এ রকম কিছু ঘটবে। অন্ধ রাগের ছায়া মজিদের চোখে মুখে। তার প্যান্টের পকেটে ভয়াবহ একটি অস্ত্র।

৭

দলটি আবার ঢুকল ইসলাম ব্রাদার্সের আঠারতলা দালানের চত্বরে। ঢোকার মুখে স্তূপ করে রাখা রডে পা বেঁধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মজিদ। যে কোনো পতনের দৃশ্য হাস্যরস তৈরি করে। এই দৃশ্যটি করল না। বরং সবাই মিলে খানিকটা শংকিত বোধ করল। মাহিন বলল, 'ব্যথা পেয়েছিস?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজিদ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'না, আরাম পেয়েছি।' অন্য সময় এই কথায় প্রচুর হাসাহাসি শুরু হয়ে যেত আজ হল না। আজ দলটির অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল।

মজিদ সিঁড়ি বেয়ে তিন তলার দিকে রওনা হল। করিমের কাছে যাবে এইটুকু সে জানে। কেন যাবে তা জানে না। কতক্ষণ থাকবে তাও জানে না। শেষ পর্যন্ত নাও যেতে পারে। তিন তলায় উঠার পর হয়ত আর করিমের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা থাকবে না। সে ফিরে যাবে। দলের অন্যরা কিছুই ভাবছে না। তারা মজিদকে অনুসরণ করছে। মজিদ যা করবে তারা তাই করবে।

তাদের তিন তলা পর্যন্ত উঠতে হল না। দোতলার সিঁড়িতে পা দেয়া মাত্র করিম নেমে এল। তার গায়ে সাদা একটা কম্বল। তাকে দেখাচ্ছে ভালুকের মতো। তার জ্বর সম্ভবত আরো বেড়েছে। মুখ কেমন যেন লালচে দেখাচ্ছে। সে উঁচু গলায় বলল, 'স্টপ স্টপ। আপনারা যান কোথায়?'

দলটা থমকে দাঁড়াল। সিঁড়িতে বাতি জ্বলছে। সিঁড়ির বাতি মাত্র চল্লিশ ওয়াটের। বাতি এই মুহূর্তে করিমের মাথার উপর বলে তাকে দেখা যাচ্ছে। সে অন্যদের দেখতে পাচ্ছে না। সে যে কোনো কারণেই হোক অসম্ভব ভীত। মজিদরা থমকে দাঁড়াল। করিম বলল, 'কে আপনারা?'

মজিদ বলল, 'আমরা।'

'আমরা মানে কে?'

মজিদ জবাব না দিয়ে আরো দু'টা ধাপ পার হল। করিম চেঁচিয়ে বলল, 'স্টপ স্টপ।'

মাহিন বিস্মিত গলায় বলল, 'করিম আমরা এখানে ব্যাপার কি?'

করিম থতমত খাওয়া গলায় বলল, 'উপরে উঠবেন না ভাই, প্লিজ।'

'ব্যাপার কি?'

'অসুবিধা আছে।'

'কী অসুবিধা?'

'চলেন নিচে যাই। নিচে গিয়ে বলি।'

'এখানেই বল কী অসুবিধা।'

করিম কাঁপা কাঁপা বলায় বলল, 'ঘরে মীরন ভাই আছে। অন্য সময় আসেন।'

মজিদ বলল, 'ফুর্তি করতে এসেছে?'

করিম জবাব দিল না।

আলম বলল, 'ফুর্তিবাজ একটা ছেলে তার সঙ্গে দেখা না করে গেলে ভালো দেখায় না।'

'নো নো। স্টপ।'

'অসুবিধা আছে?'

'বললামতো অসুবিধা আছে।'

মজিদ বলল, 'ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে কথা বলব। আলাপ পরিচয় হবে। এর মধ্যে অসুবিধা কি? সেকি মেয়েছেলে নিয়ে এসেছে?'

'না না—এসব কিছু না।'

'মেয়েছেলে থাকলে অন্য ব্যাপার ছিল। যখন নাই তখন দেখা করতে অসুবিধা কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে নিয়ে খানিকটা ঘুরব। দলে ফুর্তিবাজ একটা ছেলে থাকলে ভালো লাগে।'

করিম কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'ভাই আপনাদের পায়ে ধরি আপনারা চলে যান। কেন আমাকে বিপদে ফেলছেন? আমি গরীব মানুষ। এখান থেকে বের করে দিলে না খেয়ে মরব।'

আলম বলল, 'চল চলে যাই। যথেষ্ট হয়েছে।'

করিম সঙ্গে-সঙ্গে বলল, 'জ্বি ভাই চলে যান। কাল আসবেন। কাল আপনাদের জন্যে ভালো জিনিস যোগাড় করে রাখব। প্রমিস ভাই প্রমিস।'

মজিদ বলল, 'মীরন ভাইয়ার সঙ্গে দেখা না করে চলে যাব এ কেমন কথা। সঙ্গে মেয়েছেলে থাকলে অন্য কথা।'

করিম ফ্যাস ফ্যাসে গলায় বলল, 'সঙ্গে মেয়ে ছেলে আছে ভাই। আজ চলে যান। রিকোয়েস্ট। আপনার পায়ে ধরি ভাই। আই টাচ ইয়োর ফিট।'

করিম সত্যি-সত্যি পা ধরবার জন্যে এগিয়ে গেল। মজিদ মুখ বিকৃত করে বলল, 'থাক থাক পা ধরতে হবে না। চলে যাচ্ছি।'

'থ্যাংকস ভাই। মেনি থ্যাংকস।'

মজিদ দু' ধাপ সিঁড়ি নেমে গেল। নেমে থমকে দাঁড়াল। করিম বলল, 'দাঁড়িয়ে আছেন কেন ভাই চলে যান।'

মজিদ কড়া গলায় বলল, 'ব্যাপারটা কি বলেন তো। ঠিকমতো বলেন। না বললে এই জিনিস পেটের মধ্যে ঢুকে যাবে। এই যন্ত্ররে চিনেন? এই যন্ত্রের নাম ক্ষুর। সান রাইজ ক্ষুর।'

করিম সিঁড়িতে বসে পড়ল।

সে এই দলটিকে কিছুতেই তার ঘরে যেতে দিতে পারে না। ঘরে বিরাট সমস্যা। মীরন বেকুবের মতো এক কাণ্ড করে বসেছে। রাস্তায়-রাস্তায় ফুল বিক্রি করে এরকম একটা দশ-এগার বছরের মেয়েকে গাড়ি করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে এসেছে। মেয়েটার রোগা ভোগা চেহারা। কিন্তু দেখতে সুশ্রী। মীরন তাকে কী বলে ভুলিয়ে এতদূর এনেছে সেই জানে—কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠবার মুখে মেয়েটি বেঁকে বসল, 'আফনে আমারে কই নেন?'

মীরন তার হাত চেপে ধরে বলল, 'চুপ থাক। টাকা পাবি। মেলা টাকা পাবি।' মেয়েটা হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'আফনে আমার কই নেন? আফনে আমারে কই নেন?'

হৈ-হৈ শুনে ঘুম ভেঙ্গে করিম নেমে এসে দেখে এই কাণ্ড। সে ভীত গলায় বলল, 'মীরন কী কর তুমি!'

মীরন ভারী গলায় বলল, 'আপনি এসে এর আরেকটা হাত ধরেন তো। বড় যন্ত্রণা করছে।'

'মীরন ছেড়ে দাও। ঝামেলা হবে।'

'আরে দূর দূর।'

'মীরন ভাই তোমার পায়ে ধরি।'

'আমার পায়ে ধরতে হবে না। আপনি এর হাতটা ধরেন। হারামজাদীর কত বড় সাহস। আমার হাতে কামড় দিয়েছে। রক্ত বের করে দিয়েছে। হারামজাদীকে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচিত শিক্ষা দেব।'

'মীরন ভাই কথা শোন।'

'ধুত্তোরী যন্ত্রণা। হাতটা ধরেন।'

মীরনের মুখ দিয়ে ভক-ভক করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। চোখ ঘোলাটে। মনে হচ্ছে রেগে যাচ্ছে। রেগে গেলে এই ছেলে চণ্ডাল। করিম এসে মেয়েটির হাত ধরল। হাত ধরা মাত্র মেয়ে সেই হাতে কামড় দিল। মহা বিচ্ছু মেয়ে।

এই বিচ্ছু মেয়ে প্রায় আধ ঘন্টা ধরে করিমের ঘরে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। সেখানে কী হচ্ছে একমাত্র আল্লা মাবুদই জানে। প্রথম কিছুক্ষণ বিকট গোঙানী শোনা গেছে। সেই শব্দ কমে এসেছে। সম্ভব মুখ চেপে ধরার কারণে। তারপর আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

করিম ক্রমাগত দোয়া ইউনুস পড়ে যেতে লাগল। 'হে আল্লা বিপদ থেকে উদ্ধার কর। এই হারামজাদা মীরন কী বিপদে ফেলল? বিপদের এই চাকরি আর ভালো লাগে না। এরচে গুলিস্তানে ভিক্ষা করা ভালো। হে আল্লা দয়া কর।'

আল্লাহ দয়া করেন নি। বিপদ কমে নি উল্টো বিপদ আরো বেড়েছে। মজিদ ভাইয়ের মতো ঠাণ্ডা ছেলে হাতে ক্ষুর নিয়ে উপস্থিত। এখন কোন্ ঝামেলা বেঁধে যায় কে জানে।

সঙ্গে কোট পরা ভদ্রলোকই বা কে? কে জানে। পুলিশের আই. বি-র লোক নাতো। আই. বি-র লোকগুলো এই রকমইতো থাকে।

মজিদ বলল, 'কথা বলছেন না বিষয় কি করিম ভাইয়া। মেরা পেয়ারা ভাই দিমু জিনিস পেটে হান্দাইয়া?'

মজিদ সিঁড়ি বেয়ে তিন ধাপ এগিয়ে এল। করিম ফ্যাঁস-ফ্যাঁসে গলায় বলল, 'বলছি ভাই। পুরোটা ভেঙ্গে বলছি। শালার কী যন্ত্রণার মধ্যে যে পড়লাম। আপনাদের সাথে ইনি কি পুলিশের লোক?'

'বাজে প্যাঁচাল বন্ধ কইরা আসল কথা কহেন বাহে। সময় নাই।'

করিম মূল ঘটনা অতি দ্রুত বলে গেল। মনে হল কেউ এক জন দাড়ি কমা ছাড়া রিডিং পড়ছে। দম নেবার জন্যেও থামছে না। করিম চুপ করা মাত্র মির্জা সাহেব কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়েটি কি মারা গেছে?'

'জানি না স্যার। আমি কিছুই জানি না। সারাক্ষণ আমি বাইরে ছিলাম।'

'কতক্ষণ আগের ব্যাপার?'

'ঘন্টা খানেক আগের ব্যাপার। বেশিও হতে পারে। আমার স্যার শরীর খারাপ। জল বসন্ত—মাথার কোনো ঠিক নাই।'

'তুমি কি মীরন নামের ছেলেটিকে এর মধ্যে একবারও ডেকে জিজ্ঞেস কর নি—কী ব্যাপার?'

'করেছি।'

'সে জবাব দেয় নি?'

'জ্বি না।'

মজিদ ক্ষুরের ফলাটা টেনে বের করল। মির্জা সাহেব কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। মজিদের ভঙ্গি, আচার আচরণে এই মুহূর্তে যে কোনো মানুষ বলে দেবে—মজিদ

ঘোরের মধ্যে আছে। এই ঘোর কাটবে না। এই ঘোর কাটবার নয়।

হুড়মুড় শব্দ হল। কারো কিছু বুঝবার আগেই মজিদের প্রায় গা ঘেঁসে ছুটে নেমে গেল করিম।

মজিদ নড়ল না। করিমের প্রতি সে কোনো আগ্রহ বোধ করল না।

আলম প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। চল ভেগে যাই।'

মাহিন বলল, 'আমার মতে এটাই বেস্ট পসিবল এ্যাকশান। করিম হারামজাদার ভাব ভঙ্গি থেকে বোঝা যাচ্ছে এখানে মার্ডার–ফার্ডার হয়ে গেছে। উপস্থিত থাকলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

মজিদ বলল, 'চলে যেতে চাইলে যা।'

'তুই যাবি না। ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে তুই করবি কী?'

'তোদের চলে যেতে বলছি তোরা চলে যা।'

আলম বলল, 'দোস্ত এটা মাথা গরম করার সময় না। এখানে থাকলেই মার্ডার কেইসে পড়ে যাবি।'

'তুই চলে যা।'

আলম এবং মাহিন সিঁড়ি ভাঙ্গতে লাগল। তারা নেমে যাচ্ছে তবে একটু পর–পর পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। মির্জা সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বেশ স্পষ্ট স্বরেই বললেন,

'মজিদ তুমি কী করতে চাও?'

'নখু রেক বলফে।'

'ঐ ছেলেটিকে খুন করতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। যদি সত্যি–সত্যি এখানে কোনো হত্যাকাণ্ড হয়ে থাকে আমরা দেখব যেন পুলিশ এসে ছেলেটাকে ধরে। যেন বিচার হয়, আমরা চাই যেন শাস্তি হয়।'

'পয়সাওয়ালা মানুষদের শাস্তি এদেশে হয় না।'

'এটা শুধু এ দেশের জন্যে সত্যি নয়, এটা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের জন্যে সত্যি। তবু আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেন আইন নিজের পথে চলে। তুমি যা করতে যাচ্ছ তার ফল ভয়াবহ। তুমি ফাঁসিতে ঝুলবে, তুমি পয়সাওয়ালা নও। কেউ তোমাকে বাঁচাবে না।'

'নখু রেক বলফে।'

'তুমি ক্ষুরটা ফেলে দাও। তারপর আমার সঙ্গে হোটেলে চল। হোটেলের লাউঞ্জে বসে হট কফি খেতে খেতে গল্প করব। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, এ দেশ ছেড়ে যাবার আগে আমি তোমার একটা ব্যবস্থা করে যাব। তুমি কি আমেরিকা যেতে চাও? যেতে চাইলে সেই ব্যবস্থাও করা যাবে। মানি ক্যান ডু ওয়াণ্ডারফুল ট্রিকস।'

'নখু রেক বলফে।'

'তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে মজিদ। বেশ পছন্দ হয়েছে। আমেরিকায় তুমি আমার সঙ্গে থাকতে পার। আমার মেয়েটা একা–একা থাকে। সে এক জন সঙ্গী পাবে। জীবন চমৎকার একটা জিনিস মজিদ। ইউ ক্যান নট গ্যামবল উইথ ইট। লিসন টু মি। বি রিজনেবল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মির্জা সাহেব মজিদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে আসতে মজিদ হুংকার দিয়ে উঠল—'স্টপ।'

মির্জা সাহেব থমকে দাঁড়ালেন।

'যান হোটেলে চলে যান। যান বলছি।'

মির্জা সাহেব সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলেন। মজিদ তরতর করে তিন তলায় উঠে গেল। করিমের দরজায় টোকা দিতেই দরজা খুলে গেল।

মজিদ নিচু গলায় বলল, 'মীরন ভাই ভালো আছেন?'

মীরন ভয়ার্ত গলায় বলল, 'আপনি কে?'

মজিদ তার উত্তর না দিয়ে আগের চেয়েও নরম গলায় বলল, 'ভাই সাহেব মেয়েটা কি মরে গেছে?'

মীরন কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'বুঝতে পারছি না। শরীরতো এখনো গরম। আপনি কে?'

'আমার নাম আবদুল মজিদ।'

'আপনার হাতে এটা কি?'

'এটা কিছু না। এর নাম ক্ষুর।'

'ক্ষুর দিয়ে কী করবেন?'

মজিদ মধুর স্বরে হাসল। হাসতে হাসতেই নরম স্বরে বলল, 'নখ্ বরক—খুন করব।'

মজিদ নিচে নেমে এসে দেখে মির্জা সাহেব অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে। মজিদ বলল, 'আপনি যান নি?'

'না।'

'আপনি কি দয়া করে আমাকে বাসায় পৌছে দেবেন।'

'নিশ্চয়ই পৌছে দেব।'

'ফুপা-ফুপুর সঙ্গে একটু দেখা করব। রাতটা থাকব। সকালে পুলিশের কাছে ধরা দেব। আমার বাসা কিন্তু বেশ দূর। আপনাকে অনেক হাঁটতে হবে।'

'অসুবিধা নেই আমি হাঁটব। তুমি ঠিকমতো পা ফেলতে পারছ না। মজিদ আমি কি তোমার হাত ধরব?'

'না হাত ধরতে হবে না। চলুন রওনা হই।'

তারা দু'জন পথে নামল। মজিদ ছোট-ছোট পা ফেলতে ফেলতে এক সময় বলল, 'স্যার আপনার মেয়েটার নাম কি?'

'ওর নাম পলিন।'

'ও নিশ্চয়ই খুব সুন্দর।'

'হ্যাঁ সুন্দর। তুমি কি ওর ছবি দেখবে। আমার মানি ব্যাগে ওর ছবি আছে।'

মির্জা সাহেব ছবি বের করে মজিদের হাতে দিলেন।

মজিদ বলল, 'স্যার আপনার মেয়েটা পরীর মতো সুন্দর।'

তারা হাঁটছে। ঘুমন্ত শহরের পথে জোছনার আলো। এই চাঁদের আলো বড় অদ্ভুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিনিস। এই আলোয় চেনা পৃথিবী অচেনা হয়ে যায়। পিচ ঢালা কালো কঠিন রাজপথকে মনে হয় ভাদ্র মাসের শান্ত নদী।

তারা হাঁটছে। পায়ের নিচে নদী। মাথার উপর অন্য এক রকম আকাশ। চারপাশে থৈ-থৈ জোছনা। যে জোছনা মানুষকে পাল্টে দেয়। যে জোছনায় সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বলে ভ্রম হয়।

৮

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর মজিদের ফুপা দরজা খুললেন। তিনি কিছু বলার আগেই মজিদ বলল, 'ভালো আছেন ফুপা?'

জমির সাহেব থমথমে গলায় বললেন, 'রাত দুপুরে এটা কী ধরনের রসিকতা?'

মজিদ উদাস গলায় বলল, 'রসিকতা না ফুপা। কিছুক্ষণ আগে একটা খুন করে আসলাম। ফুপুকে ডেকে তোলেন। সাবান আর পানি দিতে বলেন। হাতে রক্ত লেগে আছে। হাত ধুতে হবে।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনম জনম

১

তিথি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

কেন দাঁড়িয়ে আছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্যি আঠার-উনিশ বছরের মেয়েরা বিনা কারণেই আয়নার সামনে দাঁড়ায়। তিথির বয়স একুশ। সেই হিসেবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার একটা অর্থ করা যেতে পারে। এই বয়সের মেয়েরা অন্যের মাঝে নিজের ছায়া দেখতে ভালবাসে। সে কারণে পুকুর দেখলেই পুকুরের পানির ওপর ঝুঁকে পড়ে। আয়নার সামনে থমকে দাঁড়ায়। নিজেকে দেখতে বড় ভালো লাগে।

তিথির বয়স একুশ হলেও এইসব যুক্তি তার বেলায় খাটছে না। কারণ ঘর অন্ধকার। আয়নায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। যদিও বাইরে শেষ বেলার আলো এখনো আছে। সেই আলোর খানিকটা এ ঘরে আসা উচিত—কিন্তু আসছে না। বৃষ্টির জন্যে দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বর্ষণ হয়েছে। এখন বৃষ্টি নেই। দরজা-জানালা অবশ্যি খোলা হয় নি। কারণ আবার বৃষ্টি আসবে। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে।

এই ঘরে সে ছাড়াও আরো একজন মানুষ আছে, তার বাবা—শিয়ালজানি হাই স্কুলের রিটায়ার্ড অ্যাসিসটেন্ট হেডমাস্টার জালালুদ্দিন সাহেব। জালালুদ্দিন সাহেব চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন। খানিকক্ষণ আগে তাঁর ঘুম ভেঙেছে। তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখে সমস্যা আছে। চোখ প্রায় নষ্ট। কিছুই দেখতে পান না। কড়া রোদে আবছা-আবছা কিছু দেখেন। সত্যি দেখেন না কল্পনা করে নেন তা বোঝা মুশকিল। আজ তাঁর কাছে মনে হচ্ছে তিনি তাঁর বড় মেয়েকে এই অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছেন। শ্যামলা মেয়েটির বালিকাদের মতো সরল মুখ, বড়-বড় চোখ সব তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। কি আশ্চর্য কাণ্ড!

জালালুদ্দিন সাহেব প্রচণ্ড উত্তেজনা বোধ করলেন। তাঁর চোখ কি তাহলে সেরে গেল নাকি? গত সাতদিন ধরে একটা কবিরাজী ওষুধ তিনি চোখে দিচ্ছেন—'নেত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুধা'। অষুধটা মনে হচ্ছে কাজ করছে। জালালুদ্দিন চিকন গলায় ডাকলেন—'ও তিথি।'

তিথি বাবার দিকে ফিরে তাকাল। কিছু বলল না।

'চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি রে মা। তোর পরনে একটা লাল শাড়ি না? পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।'

তিথি বলল, 'শাড়ির রঙ নীল।' বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আজ সে বাইরে যাবে। বাইরে যাবার আগে কারো সঙ্গে কথা বলতে তার ভালো লাগে না।

তিথি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল—আবার বৃষ্টি আসবে কি-না বুঝতে চেষ্টা করল। বৃষ্টি আসুক বা না আসুক—তাকে বেরুতেই হবে। সে রান্নাঘরে ঢুকল। রান্নাঘরে তিথির মা মিনু চুলা ধরানোর চেষ্টা করছেন। কাঠ ভেজা। কিছুতেই আগুন ধরছে না। বোতল থেকে কেরোসিন ঢাললেও লাভ হয় না। দপ্ করে জ্বলে উঠে কিছুক্ষণ পর আগুন নিভে যায়। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া বেরুতে থাকে। তিথি একটা মোড়ায় বসে মাকে দেখছে। মিনু বিরক্ত গলায় বললেন, 'তুই বসে বসে ধোঁয়া খাচ্ছিস কেন? বারান্দায় গিয়ে বোস।' তিথি নিঃশব্দে উঠে এল। বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আবার বৃষ্টি হচ্ছে। টিনের চালে ঝমঝম শব্দ। ঘোর বর্ষা।

তাদের বাসাটা কল্যাণপুর ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে। জায়গাটার নাম সুতাখালি। পুরোপুরি গ্রাম বলা যায়। চারদিকে ধানি জমি। তবে ঢাকা শহরের লোকজন বেশিরভাগ জমিই কিনে ফেলেছে। তিন ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘিরে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে—দিস প্রপার্টি বিলংস টু....দেয়াল ঘেরা অংশে পানি থৈ-থৈ করে। পানির বুক চিরে যখন তখন হলুদ রঙের সাপ সাঁতরে যায়। জায়গাটায় সাপখোপের খুব উপদ্রব। তবে অবস্থা নিশ্চয়ই এ রকম থাকবে না। তিন-চার বছরের মধ্যেই চার-পাঁচতলা দালান উঠে যাবে। ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস চলে আসবে। সন্ধ্যাবেলা চারদিক ঝলমল করবে। তিন কামরার একটি বাড়ির ভাড়া হবে তিন-চার হাজার টাকা। তিথিদের এই বাড়িটির ভাড়া মাত্র ছ'শ। রান্নাঘর ছাড়াই তিনটা কামরা আছে। এক চিলতে বারান্দা আছে। করোগেটেড টিনের শিটের বেড়া দিয়ে ঘেরা। রান্নাঘরের পাশে তিনটা পেঁপে গাছ আছে। তিনটা গাছেই প্রচুর পেঁপে হয়। ছ'শ টাকায় এই বা মন্দ কি?

মিনু চায়ের কাপ দিয়ে বারান্দায় এসে বিরক্ত মুখে বললেন, 'আবার বৃষ্টি নামল! এই বৃষ্টির মধ্যে যাবি কীভাবে?' তিথি জবাব দিল না। আকাশের মেঘের দিকে তাকাল। মেঘ দেখতে সব মেয়েরই বোধ হয় ভালো লাগে। তিথির চোখে-মুখে এক ধরনের মুগ্ধতা।

মিনু বললেন, 'চায়ে চুমুক দিয়ে দেখ মিষ্টি লাগবে কি-না।'

'চা খাব না মা। বাবাকে দিয়ে দাও।'

'তোর বাবার জন্যে তো বানিয়েছি তুই খা।'

'ইচ্ছা করছে না।'

'শরীর খারাপ নাকি রে?'

'না। শরীর ভালোই আছে। টুকু ঘরে আছে কি-না দেখ তো মা। আমাকে এগিয়ে দেবে।'

টুকু ঘরে ছিল। বাবার সাথে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছিল। মিনু চাদর সরিয়ে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিলেন, 'হারামজাদা বাঁদর। সন্ধ্যাবেলায় ঘুম। টান দিয়ে কান ছিঁড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলব।'

জালালুদ্দিন বিড়বিড় করে বললেন, 'ঘুমন্ত অবস্থায় মারধর করা ঠিক না। ব্রেইনে এফেক্ট করে।'

মিনু তীব্র গলায় বললেন, 'তুমি চুপ করে থাক। তোমাকে মারধর করা হয় নি। সামনে চায়ের কাপ আছে ফেলে একাকার করবে না।'

বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছবার আগেই হীরুকে দেখা গেল—পানিতে ছপছপ শব্দ করতে করতে আসছে। হীরু তিথির এক বছরের বড়। মুখ ভর্তি গোঁফ দাড়ির জঙ্গলের জন্যে বয়স অনেক বেশি মনে হয়। হীরুর এক হাতে দড়িতে বাঁধা ইলিশ মাছ। অন্য হাতে টর্চ। ব্যাটারি ফুরিয়ে যাওয়ায় ঝাপসামতো আলো বেরুচ্ছে। হীরু পাঁচদিন আগে আধমণ চাল কিনবার টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল—আজ ফিরছে। তিথি না-দেখার ভান করল।

হীরু গম্ভীর গলায় বলল, 'তোরা কোথায় যাচ্ছিস?'

তিথি জবাব দিল না। যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটতে লাগল। যেন সে এই মানুষটাকে চেনে না। এ যেন রাস্তার একজন মানুষ। পরিচিত কেউ নয়।

'কি রে, কথা বলছিস না কেন?'

'তোর সঙ্গে কথা বলার কিছু আছে?'

'আরে কি মুশকিল, এত রেগে আছিস কেন? বৃষ্টি-বাদলার দিনে এত রাগ ভালো না। বাসায় চল।'

'বাসায় গিয়ে কী হবে?'

'হবে আবার কি? গরম-গরম ভাত আর ইলিশ মাছ ফ্রাই খাবি। চল্লিশ টাকা দিয়ে কিনলাম। এমনিতে সত্তর টাকা দাম। বৃষ্টি-বাদলা বলে বাজারে লোক নেই। পানির দরে সব ছেড়ে দিচ্ছে।'

'তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস না। বাসায় যা। বাসায় গিয়ে ইলিশ মাছ ভাজা খা।'

'রাতে ফিরবি তো? ফিরলে কখন ফিরবি বলে যা, বাস স্ট্যান্ডে থাকব। দিন-কাল ভালো না।'

'আমার জন্যে কাউকে দাঁড়াতে হবে না। আর একটা কথা বললে আমি কিন্তু চড় লাগাব। ফাজিল কোথাকার। চোরের চোর।'

'আরে কি মুসিবত, মুখ খারাপ করছিস কেন? আমি তোর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করছি, তুই আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবি। আমি কি গালাগালি করছি?'

'চুপ কর।'

'ধমক দিচ্ছিস কেন? তোর বড় ভাই হই মনে থাকে না? সংসারকে দুটা পয়সা দিয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিস। পয়সা কীভাবে আনছিস সেটা বুঝি আমি জানি না? এই শর্মা মায়ের বুকের দুধ খান না। সব বুঝে। তোর ঐ পয়সায় আমি পেচ্ছাব করে দেই। আই মেক ওয়াটার। বুঝলি—ওয়াটার। আমার স্ট্রেইট কথা। পছন্দ হলে হবে। না হলে—নো প্রবলেম।'

তিথি দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। সে কিছু-একটা বলতে গিয়েও বলল না। হীরু লম্বা-লম্বা পা ফেলে বাড়ির দিকে রওনা হল।

বারান্দায় উঠেই সে সহজ গলায় বলল, 'মা, মাছটা ধর তো।' তার বলার ভঙ্গি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে মনে হতে পারে যে সে কিছুক্ষণ আগে মাছ কেনার জন্যেই গিয়েছিল। কিনে ফিরেছে।

মিনু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে। হীরু মার দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল, 'ঘরে সর্ষে আছে মা? যদি থাকে, সর্ষে বাটা লাগিয়ে দাও। কুমড়ো পাতা খোঁজ করছিলাম। পাই নি। পেলে পাতুরি করা যেত। বর্ষা-বাদলার দিনে পাতুরির মতো জিনিস হয় না।'

মিনু শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'তুই বেরিয়ে যা।' হীরু অবাক হয়ে বলল, 'কোথায় বেরিয়ে যাব?'

'যেখানে ইচ্ছা যা। এই বাড়িতে তোকে দেখতে চাই না।'

'ঠিক আছে যেতে বলছ যাব।'

'এক্ষুনি যা।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। মাছটা শখ করে এনেছি, রান্নাবান্না কর খেয়ে তারপর যাই। এক ঘন্টা আগে গেলেও যা পরে গেলেও তা।'

মিনু মাছ উঠোনের কাদার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। হীরু উঁচু গলায় বলল, 'আমার ওপর রাগ করছ কর মাছের ওপর রাগ করছ কেন? এই বেচারা তো কোনো দোষ করে নি। একের অপরাধে অন্যের শাস্তি—এটা কী রকম বিচার?'

মিনু রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'ঘরে ঢুকলে বঁটি দিয়ে তোকে চাকা-চাকা করে ফেলব। খবরদার!' হীরুর তেমন কোনো ভাবান্তর হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই হীরুকে দেখা গেল গামছা লুঙ্গির মতো করে পরে বঁটি নিয়ে অন্ধকার বারান্দায় মাছ কুটতে বসেছে। কথা বলছে নিজের মনে। এমনভাবে বলছে যেন রান্নাঘর থেকে মিনু শুনতে পান—

'সব কিছু না শুনেই রাগ। আরে আগে ঘটনাটা কি ঘটেছে শুনতে হবে না? না শুনেই চিৎকার, চেঁচামেচি। চাল কিনতে বাজারে ঢুকেছি। নাজিরশাল চাল। দেখেশুনে পছন্দ করলাম। বস্তার মধ্যে নিলাম বিশ সের। টাকা দিতে গিয়ে পকেটে হাত দিয়ে দেখি—পরিষ্কার। সাফা করে দিয়েছে। চাল না নিয়ে বাসায় ফিরি কীভাবে? চক্ষু-লজ্জার ব্যাপার আছে না? গেলাম রশীদের কাছে টাকা ধার করতে। সেইখানে গিয়ে দেখি রশীদ শালা টেম্পোর সঙ্গে একসিডেন্ট করে এই মরে সেই মরে.... গেলাম হাসপাতালে, দিলাম ব্লাড। ব্লাড দেয়ার পরে দেখি নিজের অবস্থা কাহিল—ভিরমি খেয়ে পড়ে যাচ্ছি, সিস্টার এসে ধরল......'

মিনু রান্নাঘর থেকে জ্বলন্ত চ্যালাকাঠ নিয়ে বের হলেন। শীতল স্বরে বললেন, 'আর একটা কথা না।' হীরু চুপ করে গেল।

জালালুদ্দিন নিচু গলায় বললেন, 'খালি পেটে চা খাওয়াটা ঠিক হবে না। আলসার-ফালসার হয়। ঘরে আর কিছু আছে?'

'মুড়ি আছে। মুড়ি মেখে দেব?'

'থাকলে দাও। ক্ষিধে-ক্ষিধে লাগছে।'

'ঐ একটা জিনিসই তো তোমার লাগে—ক্ষিধা। সকালে ক্ষিধা, বিকালে ক্ষিধা, সন্ধ্যায় ক্ষিধা।'

মিনু আবার রান্নাঘরে ঢুকলেন। চাপা স্বরে বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'এর নাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংসার। সুখের সংসার। স্বামী–পুত্র–কন্যার সংসার। এত সুখ আমার কপালে। আমি হলাম গিয়ে সুখের রানী—চম্পাবতী।'

জালালুদ্দিনের চোখ এখন বন্ধ। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে করকর করে। চোখ দিয়ে পানি পড়ে। তিনি হাতড়ে হাতড়ে চায়ের কাপ নিলেন। চুমুক দিয়ে তৃপ্তির একটা শব্দ করলেন। নরম স্বরে ডাকলেন, 'ও টুকু। টুকুন রে।'

টুকু জবাব দিল না। বিনা কারণে মার খেয়ে তার মন খুব খারাপ হয়েছে। সে বসে আছে গম্ভীর মুখে। জালালুদ্দিন আবার ডাকলেন, 'ও টুকু। ও টুকুন।'

'কি?'

'চোখটা মনে হচ্ছে সেরেই গেছে। খানিকক্ষণ আগে তিথিকে দেখলাম। পরিষ্কার দেখলাম। শাড়ির রংটা অবশ্যি ধরতে পারি নি।'

টুকু কিছুই বলল না।

তিনি তাতে খুব একটা ব্যথিত হলেন না। এ বাড়ির বেশিরভাগ লোক তাঁর সঙ্গে কথা বলে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না। তার এখন অভ্যেস হয়ে গেছে।

'ও টুকু?'

'কি?'

'মাগরিবের আযান হয়েছে?'

'জানি না।'

'চা খাবি? পিরিচে ঢেলে দেই? জ্বরের মধ্যে চা ভালো লাগবে। ওষুধের মতো কাজ করবে। পাতার রসটা ডাইরেক্ট আসছে। কুইনিন কী জিনিস? গাছের বাকলের রস। গাছের রস খুবই উপকারী।'

টুকু কোনো কথা না বলে খাট থেকে নেমে গেল। তার বয়স তের। কিন্তু দেখে মনে হয় নয়–দশ। শরীর খুবই দুর্বল। কিছুদিন পরপরই অসুখে পড়ছে। আজ জ্বরের জন্য সে অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

বারান্দায় বালতিতে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা। টুকু মগ ডুবিয়ে পানি তুলছে। বরফ শীতল সেই পানিতে মুখ ধুতে গিয়ে শীতে কেঁপে কেঁপে উঠছে। নিশ্চয়ই এখনো গায়ে জ্বর আছে। নয় তো পানি এত ঠাণ্ডা লাগত না। মুখে পানি ঢালতে ঢালতে সে তিথির দিকে তাকাল। আপাকে কী সুন্দর লাগছে! আপা আর একটু ফর্সা হলে কী অদ্ভুত হত।

তিথি বলল, 'টুকু আমাকে বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিবি?'

টুকু মাথা নাড়ল। ভেতর থেকে জালালুদ্দিন ডাকলেন, 'তিথি, শুনে যা তো মা।'

তিথি বারান্দা থেকে নড়ল না। সেখান থেকে বলল, 'কি বলবে বল।'

'এই সন্ধ্যাবেলা কোথায় বেরুচ্ছিস? কী রকম ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে দেখছিস না।'

'আমার কাজ আছে।'

'ঝড় বৃষ্টির মধ্যে কিসের কাজ? বাদ দে।'

সে জবাব দিল না। জালালুদ্দিন বললেন, 'খবরদার বেরুবি না। কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে থাক। মানুষ কি পিঁপড়া নাকি যে রাতদিন কাজ করবে।'

মিনু ঝাঁঝাল গলায় বললেন, 'চুপ কর। সব সময় কথা বলবে না।'

'এই বৃষ্টির মধ্যে যাবে নাকি?'

'তোমাকে এটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বৃষ্টিতে ভিজে একটা জ্বরজারি বাঁধাবে..... সিজন চেঞ্জ হচ্ছে।'

'বললাম তো তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

তিথি যখন বেরুল তখন সন্ধ্যা নেমে গেছে। চারদিক অন্ধকার। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। সে ঘর থেকে বেরুবার সময় কাউকে কিছু বলে বেরুল না। মিনু বারান্দাতেই ছিলেন—তাঁর দিকে তাকিয়ে একবার বললও না—মা, যাচ্ছি। যেন সে তাঁকে দেখতেই পায় নি।

ঘরে ছাতা নেই। তিথি মোটা একটা তোয়ালে মাথায় দিয়ে রাস্তায় নেমেছে। খালি পা। স্যান্ডেল জোড়া হাতে। কাঁচা রাস্তা, খুব সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। টুকু আগে আগে যাচ্ছে। তার মাথায় কিছু নেই। বৃষ্টিতে মাথার চুল এর মধ্যেই ভিজে জবজবে। তিথি বলল, 'বাসায় গিয়ে ভালো করে মাথা মুছে ফেলবি। নয় তো জ্বরে পড়বি।'

টুকু মাথা কাত করল। মৃদু গলায় বলল, 'রাতে ফিরবে না আপা?'

'না।'

'সকালে আসবে?'

'হুঁ। এবার বর্ষা আগেভাগে এসে গেল তাই নারে টুকু। মনে হচ্ছে শ্রাবণ মাস। তাই না।'

'হুঁ।'

'গতবারের মতো এবারও ঘরে পানি উঠবে কি-না কে জানে। তোর কি মনে হয় উঠবে?'

টুকু জবাব দিল না। তার গা কাঁপিয়ে জ্বর আসছে। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

কলাবাগানের ভেতরের দিকে একটা বাড়ির সামনে তিথি এসে উপস্থিত হয়েছে। তার শাড়ি-কাদা-পানিতে মাখামাখি। হোঁচট খেয়ে স্যান্ডেলের ফিতা ছিঁড়ে গেছে। নখের খানিকটা ভেঙে যাওয়ায় রক্ত পড়ছে। অনেকক্ষণ কড়া নাড়বার পর মাঝবয়েসি এক লোক দরজা খুলল। তার খালি গা। হাঁটু পর্যন্ত উঁচুতে লুঙ্গি উঠে আছে। পরার ধরন এমন যে মনে হয় যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যাবে। তার কোলে তিন-চার বছরের একটি বাচ্চা। ভদ্রলোক বাচ্চাকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করছেন। বাচ্চা ঘুমুচ্ছে না। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ঝিম ধরে থাকে আবার মাথা তুলে 'হিক' জাতীয় বিচিত্র শব্দ করে।

তিথি বলল, 'নাসিম ভাই কেমন আছেন?' নাসিম বিরক্ত গলায় বলল, 'এই তোমার বিকাল পাঁচটা, ক'টা বাজে তুমি জান?'

তিথি চুপ করে রইল।

নাসিম বলল, 'আটটা পঁচিশ।'

তিথি হালকা গলায় বলল, 'দূরে থাকি। ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। তাই দেরি হল।'

'দূরে তুমি একা থাক নাকি? অন্যরা থাকে না? কতবার বললাম খুব ভালো পার্টি হাজার খানিক টাকা পেয়ে যাবে। বেশিও দিতে পারে। নতুন পয়সা-হওয়া পার্টি। এদের টাকার মা-বাপ আছে? উপকার করতে চাইলে এই অবস্থা।'

'ভেতরে আসতে দিন নাসিম ভাই, বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হচ্ছে জ্বর এসে যাচ্ছে।'

'আস আস, ভেতরে আস। পা কেটেছে নাকি?'

'হুঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ইশ, রক্ত বের হচ্ছে দেখি। যাও, বাথরুমে ঢুকে শাড়ি বদলে ফেল। তোমার ভাবিকে বল শাড়ি দেবে। আজ রাতে তো আর কিছু পাওয়া যাবে না। ভালো একটা পার্টি চলে গেল।'

'আজ তাহলে চলে যাব?'

'ঝড় বৃষ্টির মধ্যে যাবে কোথায়? কথা বলে সময় নষ্ট করছ কেন? বুকে ঠাণ্ডা বসে গেলে মুশকিলে পড়বে।'

'নাসিম ভাই, এখানে কোনো জায়গা থেকে একটা টেলিফোন করা যাবে?'

'কোথায় টেলিফোন করবে।'

তিথি চুপ করে রইল। নাসিম বলল, 'শোন তিথি একটা কথা বলি মন দিয়ে শোন—পার্টির সাথে বাড়তি খাতির রাখবে না। যত দূরে থাকা যায়। ফেল কড়ি মাখ তেল। এর বেশি কিছু নয়।'

'সে রকম কিছু না নাসিম ভাই।'

'সে রকম কিছু না হলেই ভালো।'

নাসিম গলা উঁচিয়ে বলল, 'রীনা, কই চা দাও দেখি। ঘরে স্যাভলন-ট্যাভলন আছে? বাথরুমের তাকে দেখ তো। আর এক বান্দরের বাচ্চা তো ঘুমুচ্ছে না। ইচ্ছা করছে আছাড় দিয়ে পেটটা গালিয়ে দেই। চুপ—কানবি না। একদম চুপ।'

রীনা এসে বাচ্চাটিকে নিয়ে গেল। একবার শুধু সরু চোখে দেখল তিথিকে। আগেও অনেকবার দেখেছে—কখনো কথা হয় নি। আজও হল না। রীনার বয়স ষোল সতের। এর মধ্যে দু'টি বাচ্চার মা হয়েছে। তৃতীয় বাচ্চা আসার সময়ও প্রায় হয়ে এল। রোগা শরীরের কারণে তার সন্তানধারণজনিত শারীরিক অস্বাভাবিকতা খুবই প্রকট হয়ে চোখে পড়ে।

নাসিম বলল, 'এখনো দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও, ভেতরে গিয়ে শাড়ি বদলে আস। পায়ে কিছু দাও।'

'শাড়ি বদলাব না—চলে যাব।'

'এত রাতে?'

'রাত বেশি হয় নি। বাস আছে।'

'রাতবিরাতে এরকম চলাফেরা ভালো না, কখন কোন্ বিপদ হয়।'

রীনা চা নিয়ে এসেছে। এত দ্রুত সে চা বানাল কী করে কে জানে। মেয়েটা খুবই কাজের। তিথির চা খেতে ইচ্ছা করছে না। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। জ্বর আসবে কি-না কে জানে। নাসিম পিরিচে ঢেলে বড়-বড় চুমুকে চা খাচ্ছে। প্রতিবার চুমুক দিয়ে আহ্ করে একটা শব্দ করছে। সামান্য চায়ে এত তৃপ্তি। কিছু কিছু মানুষ খুব অল্পতে সুখী হয়।

'তিথি।'

'জ্বি।'

'থাকতে চাইলে থাক, অসুবিধা কিছু নেই। খালি ঘর আছে।'

'না থাকব না।'

'পরশু তরশু একবার এস। দেখি যদি এর মধ্যে কোনো পার্টি পাই। ফরেনার পাওয়া গেলে ভালো—এদের দরজি দিল। খুশি হলে হুঁশ থাকে না। তবে সব না। কিছু আছে বিরাট খচ্চর। চামড়া সাদা হলেই যে দরাজ দিল হয় এটা ঠিক না। সাদা চামড়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যেই খচ্চর বেশি।'

নাসিম নিজেই ছাতা হাতে তিথিকে বাসে তুলে দিতে গেল। যাবে—জানা কথা। যে অল্প কিছু ভালো মানুষের সংস্পর্শে তিথি এসেছে—নাসিম তার মধ্যে একজন। সে বাসে তিথিকে শুধু যে উঠিয়েই দিয়ে আসবে তাই না বাসের ড্রাইভারকে বলে আসবে—একটু খেয়াল রাখবেন ভাইসাব, একা যাচ্ছে।

বৃষ্টি ধরে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। রাস্তায় জায়গায় জায়গায় পানি উঠে গেছে। পানি ভেঙে যেতে হচ্ছে। নাসিম বলল, 'এক ফোঁটা বৃষ্টি হলে দুই হাত পানি হয়ে যায়। এই রহস্যটা কি বুঝলাম না।' তিথি কিছু বলল না। নাসিম বলল, 'তোমার ভাই চাকরি-বাকরি কিছু পেয়েছে?'

'না।'

'মোটর মেকানিকের কাজ শিখবে নাকি জিজ্ঞেস করো তো। লাগিয়ে দেব। ভালোমতো কাজ শিখতে পারলে কাঁচা পয়সা আছে, জিজ্ঞেস করো।'

'আচ্ছা জিজ্ঞেস করব।'

'টেলিফোন করতে চেয়েছিলে—কার কাছে টেলিফোন?'

'চেনা একজন।'

'পাওয়ারফুল কেউ হলে যোগাযোগ রাখবে—কখন দরকার হয় কিছুই বলা যায় না।'

বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছানো মাত্র বাস পাওয়া গেল। ফাঁকা বাস। পেছনের দিকে তিন-চারজন মানুষ বসে আছে। নাসিম বাসের ড্রাইভারকে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'ভাইজান একটু দেখেশুনে নামাবেন, মেয়েছেলে একা যাচ্ছে।'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা এগিয়ে দিল। নাসিম সিগারেট খায় না, অন্যকে দেবার জন্যে সব সময় সঙ্গে রাখে।

তিথির হাতে সে একশ' টাকার একটা নোট গুঁজে দিল। এটা হচ্ছে ধার। হাতে টাকা এলে শোধ দিতে হবে।

বাস না ছাড়া পর্যন্ত নাসিম ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রইল। তিথি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল—এই মানুষটা তার চমৎকার একজন বড় ভাই হতে পারত। কেন হল না?

২

হারিকেন জ্বালাতে গিয়ে মিনু দেখলেন তেল নেই। অথচ কাল হারিকেনে তেল ভরার পরও বোতলে চার আঙুলের মতো অবশিষ্ট ছিল। গেল কোথায়? টুকু ফেলে দিয়েছে? সকালবেলা কেরোসিনের বোতল নিয়ে কী যেন করছিল। মিনুর বিরক্তির সীমা রইল না। টুকু বাড়ি নেই। সকালে টুকুকে তিনি কিছু শাস্তি দিয়েছেন। দু'বার চুল ধরে দেয়ালে মাথা ঠুকে দিয়েছেন। সে নিঃশব্দে কেঁদেছে কিন্তু কিছু বলে নি। তিনি একাই চেঁচিয়েছেন—কঠিন-কঠিন বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন। টুকু শুধু শুনে গেছে, মাঝে-মাঝে এমন ভঙ্গিতে তাকিয়েছে যাতে মনে হয় পৃথিবীর হৃদয়হীনতায় সে খুব অবাক হচ্ছে। এতে মিনুর রাগ আরও বেড়েছে। সেই রাগের চরমতম প্রকাশ তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখালেন দুপুরে ভাত খাবার সময়। টুকুর সামনে থেকে ভাতের থালা সরিয়ে দিয়ে কর্কশ গলায় বললেন, 'যা তোর ভাত নেই।'

টুকু মায়ের দিকে কয়েকবার ভয়ে-ভয়ে তাকাল। উঠে গেল না। বসেই রইল। সে ক্ষিধে সহ্য করতে পারে না। মিনু কঠিন গলায় বললেন—'ওঠ, নয় তো পিঠে চ্যালাকাঠ ভাঙব।' টুকু তবু বসে রইল। তিনি সত্যি-সত্যি হাতে চ্যালাকাঠ নিলেন। টুকু উঠে বারান্দায় জলচৌকিতে বসে রইল। তার মনে ক্ষীণ আশা—কিছুক্ষণের মধ্যেই খাওয়ার ডাক আসবে। বিশেষ করে আপা আজ বাসায় আছে। সে নিশ্চয়ই তাকে ফেলে খাবে না। টুকু অবাক হয়ে দেখল—আপা তাকে রেখেই ভাত খেল। খাওয়ার শেষে বারান্দায় হাত ধুতে এসে বলল, 'টুকু আমাকে মোড়ের দোকান থেকে একটা পান এনে দে। বমি-বমি লাগছে।'

টুকু পান এনে দিয়ে আবার এসে বসল বারান্দায়। অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করল, মা রান্নাঘরের ঝামেলা শেষ করে দরজায় শিকল তুলে দিচ্ছেন। এই বাড়ির একজন যে না খেয়ে আছে, এই কথা তিনি বোধ হয় সত্যি ভুলে গেছেন। টুকু তবুও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। ভয়ে ভয়ে শোবার ঘরে উঁকি দিল—মা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। হয়ত ঘুমিয়েই পড়েছেন। সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টুকু ভীতু ধরনের ছেলে। সাধারণত সন্ধ্যার আগেই ফেরে। আজ এখনো ফিরছে না। দিন খারাপ করেছে। আজও হয়ত ঝড় বৃষ্টি হবে। ক'দিন ধরে রোজ সন্ধ্যায় বৃষ্টি হচ্ছে। মিনু তেলশূন্য হারিকেন নিয়ে তিথির ঘরে এলেন।

তিথি চাদর গায়ে বিছানায় বসে আছে। তার গায়ে জ্বর। ঐদিন বৃষ্টিতে ভেজার পর থেকেই সে জ্বরে পড়েছে। এখন জ্বর খানিকটা বেড়েছে। খোলা জানালা দিয়ে যে বাতাস আসছে তা তেমন ঠাণ্ডা নয় তবু তিথির গা শিরশির করছে। উঠে জানালা বন্ধ করতে ইচ্ছা করছে না।

মিনু ঘরে ঢুকেই বললেন, 'চার আঙ্গুল তেল ছিল বোতলে। কোথায় গেল জানিস।' তিথি বলল, 'জানি না।'

'বাতাসে তো উড়ে যায় নাই।'

'বিড়াল ফেলে দিয়েছে হয়ত।'

'এখন কাকে দিয়ে তেল আনাই।'

'টুকু আসে নি এখনো।'

'না।'

'ও এলে এনে দেবে। তুমি জানালাটা বন্ধ করে দাও তো মা, ঠাণ্ডা লাগছে।'

'এই গরমে ঠাণ্ডা লাগছে? জ্বর নাকি? দেখি।'

মিনু তিথির কপালে ছুঁয়ে দেখতে গেলেন। তিথি একটু সরে গিয়ে বলল, 'গায়ে হাত দিও না মা।' মিনু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'গায়ে হাত দিলে কি?'

'কিছু না। আমার ভালো লাগে না।'

'মা গায়ে হাত দিলে ভালো লাগে না, এটা কী ধরনের কথা? বলছিস কি এসব?'

'তোমার সঙ্গে বকবক করতেও ইচ্ছা করছে না। জানালাটা বন্ধ করে চলে যাও।'

মিনু জানালা বন্ধ করে চলে গেলেন। তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঝমঝম করে বৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরু হল। সমস্ত বাড়ি অন্ধকার। রান্নাঘরে চুলায় আগুন জ্বলছে। বাড়িতে এইটুকুই আলো।

মিনু রান্না চড়িয়েছেন। আয়োজন তেমন কিছু না। গতকালের ঝড়ে একটা পেঁপে গাছ পড়ে গেছে। সেই পেঁপের একটা তরকারি আর ডাল। চাল ক'জনের জন্যে নেয়া হবে তা তিনি বুঝতে পারছেন না। তিথির জ্বর এসেছে, সে নিশ্চয়ই রাতে কিছু খাবে না। হীরু আসবে কী আসবে না কে জানে। গত তিন দিন ধরে রাতে খাওয়ার সময় আসছে। আজও হয়ত আসবে। টুকু এখনো ফেরে নি তবে সে অবশ্যই ফিরবে তার যাবার জায়গা নেই। একদিন যখন হীরুর মতো কোথাও জায়গা হবে তখন সেও আসা বন্ধ করবে।

জালালুদ্দিন রান্নাঘরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আজ তাঁর চোখের যন্ত্রণাটা একটু কম। আগের কবিরাজি ওষুধ বাদ দিয়ে পদ্মমধু দিচ্ছেন—এতে সম্ভবত কাজ হচ্ছে। তবে চোখ আঠা-আঠা হয়ে থাকে—এই যা কষ্ট।

জালালুদ্দিন নিচু গলায় বললেন, 'এক ফোঁটা চা হবে?' মিনু ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'না।'

'চুলা বন্ধ?'

'হুঁ।'

'বৃষ্টি-বাদলায় গলাটা খুসখুস করে। কর একটু চা। আদা-চা।'

জালালুদ্দিন খানিকটা দূরত্ব রেখে স্ত্রীর কাছে বসলেন। আজ তাঁর চোখের যন্ত্রণা কম থাকায় মনটা বেশ ভালো। মিনুর সঙ্গে গল্পসল্প করতে ইচ্ছে করছে। প্রথম যৌবনে তাদের যখন নতুন সংসার হল—সোহাগী স্টেশনের কাছে বাসা নিয়েছিলেন। রান্নাঘর অনেক দূরে। মিনু একা রান্না করতে করতে ভয় পেত। তখন কতই বা তার বয়স? তের কিংবা চৌদ্দ। নিতান্তই বাচ্চা মেয়ে। তাকে রাতের বেলা রান্নার সময় সারাক্ষণ স্ত্রীর পাশে বসে থাকতে হত। রান্না হবার পর খাওয়া-দাওয়া শেষ করে একবারে শোবার ঘরে আসা। কত মধুর স্মৃতি। কত বর্ষার রাত রান্নাঘরে পাশাপাশি বসে কেটেছে। অর্থহীন কত গল্প হাসি তামাশা। মান-অভিমান। আজকের এই কঠিন মিনু সেদিন কোথায় ছিল?

জালালুদ্দিন ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস গোপন করে বললেন, 'চোখের যন্ত্রণা একেবারেই নেই। এই যে আগুনের দিকে তাকিয়ে আছি—চোখ কিন্তু কড়মড় করছে না।'

'না করলে তো ভালোই।'

'দেখি একটু আগুন। সিগারেট খাই একটা। হীরু একটা প্যাকেট দিয়ে গেল।'

মিনু দেয়াশলাই এগিয়ে দিলেন। জালালুদ্দিন সিগারেট ধরিয়ে হৃষ্টচিত্তে টানতে লাগলেন। নরম গলায় বললেন, 'পদ্মমধু আসলে খুব ভালো মেডিসিন। তবে খাঁটি জিনিস হতে হবে। দুনিয়া ভর্তি ভেজাল। পাবে কোথায় খাঁটি জিনিস?'

মিনু জবাব দিলেন না। ডাল চড়িয়েছিলেন, ডালের হাঁড়ি নামিয়ে এলুমিনিয়ামের একটা মগ চুলায় বসিয়ে দিলেন। চা হচ্ছে। জালালুদ্দিনের চোখ চকচক করছে। তিনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে খুশি-খুশি গলায় বললেন, 'চোখ সত্যি সেরে গেলে প্রাইভেট টিউশ্যানি ধরব। দু'তিনটা ছেলেকে পড়ালেই হাজার বার শ' টাকা চলে আসবে। ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরে প্রাইভেট টিউটরের খুবই অভাব। নাই বললেই হয়। তুমি কী বল।'

মিনু কিছু বললেন না, বিচিত্র একটা ভঙ্গি করলেন। জালালুদ্দিন চোখের অসুখের কারণে সেই ভঙ্গি দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলে তাঁর খুব মন খারাপ হত। তিনি বললেন, 'সংসারটা তখন ঠিকঠাক করা যাবে। তারপর হীরু একটা দোকান নেয়ার কথা বলছে, যদি সত্যি সত্যি দেয়—টাকা আসবে পানির মতো।'

'দোকান দিচ্ছে?'

'বলল তো। কালই বলল।'

'দোকানের টাকা পাচ্ছে কোথায়?'

'বন্ধু-বান্ধব আছে। ঢাকা শহরে বুঝলে মিনু টাকা কোনো সমস্যা না, তবে কায়দা-কানুন জানা থাকা চাই। ঢাকা শহরের বাতাসে পয়সা ওড়ে। কেউ ধরতে পারে কেউ পারে না।'

মিনু চায়ের কাপ স্বামীর দিকে এগিয়ে দিলেন। জালালুদ্দিন চায়ে চুমুক না দিয়েই বললেন, 'চমৎকার! তুমিও এক কাপ খাও। বৃষ্টি-বাদলার দিন ভালো লাগবে।'

মিনু বিরক্ত গলায় বললেন, 'তোমার খাওয়া তুমি খাও। আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না।'

তিনি তিথির জন্যে লেবুর শরবত নিয়ে শোবার ঘরে গেলেন। ঘর নিকষ অন্ধকার। এই অন্ধকারে তিথি এখনো ঠিক আগের মতোই বসে আছে।

'লেবুর শরবত এনেছি—নে।'

তিথি বলল, 'কিছু খাব না, খেতে ইচ্ছে করছে না। টুকু এসেছে?'

'না।'

'বৃষ্টির মধ্যে ভিজছে বোধ হয়। আবার একটা বড় অসুখ বাঁধাবে।'

মিনু তীব্র গলায় বললেন, 'আজ আসুক আমি হারামজাদার বিষ ঝাড়ব।' তিথি শীতল গলায় বলল, 'বিষ ঝেড়ে ঝেড়ে তো হীরুর এই অবস্থা করেছ। আর না হয় নাই ঝাড়লে।'

মিনু তিথিকে একটা কঠিন কথা বলতে গিয়েও বললেন না। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন।

উঠোনে ছপছপ শব্দ হচ্ছে। মিনু বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন—টুকু এসেছে বোধ হয়। টুকু না হীরু এসেছে। সে তার মায়ের মুখের ওপর টর্চ ফেলে বলল, 'চারদিক এমন ডার্ক করে রেখেছ—ব্যাপার কি?'

তিনি জবাব দিলেন না। হীরু মাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'বাতি-টাতি জ্বালাও। কারো কোনো সাড়াশব্দও পাচ্ছি না। সব ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? রাত তো বেশি হয় নি। আপা বাসায় আছে?'

সে এই কথার জবাবও পেল না। এ বাড়িতে তার অবস্থাও তার বাবার মতো। বেশিরভাগ কথারই কেউ কোনো জবাব দেয় না। জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করে না।

হীরু অন্ধকারেই গোসল সেরে ফেলল। কেরোসিনের অভাবে বাতি জ্বলছে না জেনেও তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। সে অতি উৎসাহে তিথিকে বলতে শুরু করল কী করে সে আজ ব্রান্ড নিউ একটা ছাতা জোগাড় করে ফেলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বুঝলি তিথি, বাস থেকে নামার সময় হঠাৎ দেখি আমার পায়ের কাছে একটা ছাতা। আমার পাশে এক গর্দভ নাম্বার ওয়ান বসে ছিল। ছাতা না নিয়েই ঐ শালা বৃষ্টির মধ্যে নেমে পড়েছে।'

'তুই ঐ ছাতা নিয়ে চলে এলি?'

'হ্যাঁ। আমি না নিলে অন্য কেউ নিত। কি—নিত না? ব্রান্ড নিউ জিনিস। লেবেলটা পর্যন্ত আছে।'

'আমার সামনে থেকে যা, বকবক করিস না। মাথা ধরেছে।'

'যার কাছেই যাই সেই বলে সামনে থেকে যা। আমি যাবটা কোথায়? একদিন বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাব তখন বুঝবি।'

'চলে যা। তোকে ধরে রাখছে কে?'

'যাবই তো। কয়েকটা দিন। জাস্ট ফিউ ডেজ। একদিন হঠাৎ দেখবি ফুড়ুৎ। পাখি নেই। নো বার্ড।'

হীরু সিগারেট ধরাল। সিগারেটের আলোয় দেখা গেল সে দাড়ি কেটে ফেলেছে। তবে গোঁফ এখনো আছে। তিথি বলল, 'তুই মোটর মেকানিকের কাজ শিখবি?'

হীরু অবাক হয়ে বলল, 'আমি মোটর মেকানিকের কাজ শিখব? ইয়ার্কি করছিস? চোর–ছ্যাঁচড়ের কাজ শিখব আমি? অন্য কেউ এ কথা বললে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতাম। নেহায়েত তুই বলে এক্সকিউজ করে দিলাম।'

হীরু কেরোসিন নিয়ে এসেছে। আশেপাশে খানিকটা খুঁজেও এসেছে। টুকু নেই। এই নিয়ে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ দেখা গেল না। ভাত খাবার সময় অত্যন্ত সহজভাবে বলল, 'দুই–এক রাত বাইরে না কাটালে ছেলেপুলে শক্ত হয় না। থাকুক বাইরে। হার্ড লাইফ সম্পর্কে ধারণা হোক। মেয়ে হলে ভয়ের কথা ছিল। মেয়ে তো না।'

মিনু একটি কথাও বললেন না। যথা নিয়মে খাওয়া–দাওয়া করলেন। বাসন–কোসন ধুয়ে রান্নাঘরে শিকল উঠিয়ে দিলেন। রান্নাঘরের কাজ রাতের মতো শেষ হল। আবার ভোরবেলায় খোলা হবে। গভীর রাতে বন্ধ হবে। এই ছোট্ট ঘরটার পেছনে জীবন কেটে যাবে।

তিথির জ্বর বেশ বেড়েছে। রাতে সে কিছুই খায় নি। মিনু দু'টি আটার রুটি বানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে বিরক্ত হয়ে বলেছে, 'রুটি বানাতে তোমাকে বলেছেটা কে?'

'না খেয়ে থাকবি?'

'হ্যাঁ, না খেয়ে থাকব। তুমি যাও—ঘুমাও।'

'আমার সঙ্গে এরকম করে কথা বলছিস কেন?'

'ভালো করে কথা বলা ভুলে গেছি। এখন আমি শুধু বাইরের মানুষের সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারি। খুব মিষ্টি করে বলি।'

মিনু ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলেন। উঠোনের পানি বেড়ে বারান্দা ছুঁয়েছে। এবারো কি আগের বছরের মতো ঘরে পানি উঠবে? এবারো হয়ত ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হবে। কিন্তু যাবেনই বা কোথায়?

মিনু সারারাত বারান্দায় বসে কাটালেন। টুকুর জন্যে অপেক্ষা? হয়ত বা তাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে টুকু বাড়ি না-ফেরায় তাঁকে খুব কাতর মনে হল না। তিনি ছেলে প্রসঙ্গে তেমন কোনো দুশ্চিন্তাও করলেন না। শুধু বসেই রইলেন। শেষ রাতে মেঘ কেটে আকাশে চাঁদ উঠল। সুন্দর জ্যোৎস্না। একা একা জ্যোৎস্না দেখতে তাঁর ভালোই লাগল।

অথচ হীরু যখন প্রথম কাউকে কিছু না বলে বাইরে রাত কাটাল কি অসম্ভব দুশ্চিন্তাই না তিনি করেছিলেন। ঘরের একটি মানুষও ঘুমায় নি। এখন সময় পাল্টে গেছে। টুকুর বাড়ি না-ফেরায় কারো কিছু যাচ্ছে আসছে না। নিতান্তই যেন স্বাভাবিক ব্যাপার। যেন সবাই ধরে নিয়েছে এরকম হবেই। আগামীকাল ভোরে যথা সময়ে সবার ঘুম ভাঙবে। দিনের কাজকর্ম শুরু হবে। আবার রাত আসবে। এর মধ্যে টুকু ফিরে এলে ভালোই, ফিরে না এলেও কিছু আসে যায় না। কে জানে হয়ত বা ভালোই হয়। তখন হাঁড়িতে চাল কিছু কম দিলেও চলবে।

যখন আকাশ ফরসা হল ঠিক তখন মিনু বারান্দা ছেড়ে উঠলেন। অনেক দিন পর ফজরের নামাজ পড়লেন। এ বাড়ি থেকে ধর্মকর্মও উঠে গেছে। ধর্ম সুখী মানুষদের জন্যে, যাদের ইহ জগতের কামনার পরও পরবর্তী জগতের জন্যে কামনা থাকে। তাঁর এখন কোনো কামনা-বাসনা নেই। শুধু বেঁচে থাকা। তিনি রান্নাঘরে ঢুকলেন। চুলা ধরাতে খুব বেগ পেতে হল। শুকনো কাঠ নেই। এবারের বর্ষা তাঁকে খুব কষ্ট দেবে।

তিথির ঘুম ভেঙেছে। মুখ না ধুয়েই সে এসেছে রান্নাঘরে। সে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'টুকু বাড়ি ফেরে নি?'

মিনু খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, 'না। তোর জ্বর কমেছে।'

তিথি বলল, 'তুমি এত সহজ ভঙ্গিতে কথা বলছ কী করে? তোমার চিন্তা লাগছে না?'

'আমার এত চিন্তা-টিন্তা নেই।'

'তাই তো দেখছি।'

'তোর কাছে শ' খানিক টাকা হবে? চাল কিনতে হবে।'

'ঐদিন না কিনলে?'

'কিনেছি—শেষ হয়েছে। আমি একা খেয়ে শেষ করি নি। বুড়ো বয়সে কি আর শুধু-শুধু চাল চিবিয়ে খাওয়া যায়?'

'এসব কেমন ধরনের কথা, মা?'

'মুখ ধুয়ে আয়। চা খা। আজ কোনো নাশতা নেই। শুধু চা।'

জালালুদ্দিন সাহেব যখন শুনলেন আজ শুধু চা তখন একটা হৈচৈ বাঁধাবার চেষ্টা করলেন। মিনু বরফশীতল গলায় বললেন, 'কোনোরকম ঝামেলা করবে না। একবেলা নাশতা না খেলে কিছু হয় না।'

জালালুদ্দিন ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'সকালের নাশতাটা হচ্ছে সারারাতের উপবাসের পর প্রথম খাওয়া। দুপুরে না খেলে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু সকালে...'

'চুপ।'

তিনি চুপ করে গেলেন। টুকু ফিরেছে কি ফিরে নি এই ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না দুপুরের আগে কিছু খেতে পারবেন না—এই চিন্তাটাই তাকে অস্থির করে ফেলল।

তিথি এক শ' টাকা দিয়েছে। এই টাকায় দুপুরের বাজার হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাল কিনতে মিনু নিজেই গেলেন। হীরুকে টাকা দিয়ে পাঠানোর কোনো মানে হয় না। ঘন্টাখানেক পর এসে শুকনো মুখে বলবে—গ্রেট ট্র্যাজেডি। পকেট সাফা করে দিয়েছে। অল গন। দেশটা হয়ে গেছে চোরের। সবাই থিফ। গ্রেট থিফ। কিংবা দশ কেজি চাল এনে বলবে পনের কেজি। এই সংসারের বাজার অনেক দিন থেকেই মিনু করেন। এই বয়সেও পনের কেজি চালের ভারী বস্তা টেনে এনে বাকি সময়টা শরীরের ব্যথায় নড়তে পারেন না। রান্নাঘরে মাদুর পেতে শুয়ে থাকেন। দিনের বেলায় তিনি কখনো শোবার ঘরে ঘুমুতে যান না। দিনের বেলায় রান্নাঘরই তাঁর শোয়ার ঘর।

হীরু মায়ের সঙ্গে-সঙ্গে যাচ্ছে। মিনু একবার বললেন, 'তুই আমার সঙ্গে-সঙ্গে আসছিস কেন?'

'এমনি আসছি।'

'না, তুই আসবি না।'

'আরে কি মুশকিল, এটা পাবলিকের রাস্তা। যার খুশি যাবে। যার খুশি যাবে না। তুমি বলার কে?'

'বলছি তো তুই আমার সঙ্গে আসবি না।'

' আরে এ তো বড় যন্ত্রণা দেখি, বাজারে গিয়ে টুকুর খোঁজখবর করব না? সারা রাত ধরে একটা ছেলে মিসিং। চিন্তা হয় না?'

'আমি দাঁড়াচ্ছি। তুই যা। তুই যাবার পর আমি যাব। সঙ্গে-সঙ্গে যাব না।'

'আমি সঙ্গে গেলে কি তোমার মান যাবে নাকি? কি মুশকিল—এরকম করে তাকাচ্ছ কেন? আচ্ছা বাবা চলে যাচ্ছি। নো হার্ড ফিলিংস।'

হীরু চলে যাবার পরও তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। কাঁচা রাস্তা পানিতে ডুবে গেছে। বাজারে রওনা হয়েছেন খালি পায়ে। থকথকে নোংরা কাদায় পা ফেলে যেতে হচ্ছে। এককালে তাঁর শুচিবায়ুর মতো ছিল। নোংরা দেখলেই গা ঘিনঘিন করত।

যে শাড়ি পরে রাতে ঘুমুতেন ভোরবেলা উঠেই সেটা খুলে ফেলতেন। কোথায় গেছে শুচিবায়ু। এখন নোংরা আবর্জনা পাশে নিয়েও হয়ত ঘুমুতে পারবেন।

তিথি বেরুচ্ছিল। জালালুদ্দিন বললেন, 'তুই বাইরে যাচ্ছিস?' অর্থহীন কথা। জবাব দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবু তিথি বলল, 'হুঁ।'

'আমার চোখটা বেশ ভালোই লাগছে। রোদের দিকে তাকাতে পারছি। পদ্মমধু জিনিসটা অসাধারণ।'

তিথি কিছু বলল না। জালালুদ্দিন বললেন, 'একটু দেখ তো মা—হীরু মনে হয় সিগারেটের প্যাকেট ফেলে গেছে। প্যাকেটটা দিয়ে যা। সিগারেট জিনিসটা খারাপ হলেও মাঝে-মাঝে মেডিসিনের মতো কাজ করে। সব খারাপ জিনিসের একটা ভালো দিক আছে। ইংরেজি একটা কথা আছে না—এভরি ক্লাউড হ্যাজ এ সিলভার লাইনিং।'

হীরু সত্যি-সত্যি প্যাকেট ফেলে গেছে। বেশ দামি সিগারেট—বেনসন অ্যান্ড হেজেস। চারটা সিগারেট আছে। জালালুদ্দিন একটা ধরালেন। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তিথি শীতল গলায় বলল, 'টুকু যে বাড়ি ফেরে নি তুমি জান?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জানব না কেন, জানি।'

'চিন্তা লাগছে না তোমার?'

'চিন্তা তো লাগছেই! চিন্তা লাগবে না কেন? খুবই চিন্তা লাগছে।'

'দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে—সুখেই আছ।'

'চিন্তা করে হবেটা কী? হীরুর বেলায় তো কম চিন্তা করি নি। তাতে লাভটা কী হয়েছে?'

'তা ঠিক। কোনো লাভ হয় নি।'

'মাঝে মাঝে তোর বেলায়ও তো এরকম হয়। রাতে বাড়ি ফিরিস না। তোর বেলাতেই যদি...'

জালালুদ্দিন কথা শেষ করলেন না। তাঁর সিগারেট নিভে গিয়েছিল। তিনি সিগারেট ধরাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। তিথি বলল, 'আমি যাচ্ছি বাবা। ভয় নেই। রাতে ফিরে আসব। তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।' তিনি তার জবাব দিলেন না। সিগারেটটা ধরছে না। এত দামি সিগারেট অথচ বর্ষায় কেমন ড্যাম্প মেরে গেছে। চুলার পাশে রেখে দিলে হত। সিগারেটের সঙ্গে এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করছে। তিথিকে বললে লাভ হবে না। সে এখন আর রান্নাঘরে ঢুকবে না। মিনু কখন ফিরবে কে জানে। বাজারে গেলে দেরি করে।

তিথি এখনো যায় নি। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। জালালুদ্দিন চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। তবু তাঁর মনে হচ্ছে মেয়েটাকে খুব সুন্দর লাগছে। চেহারা কেমন মায়া-মায়া। তবে স্বভাব কঠিন হয়েছে। বয়সকালে এই মেয়ে তার মায়ের চেয়েও কঠিন হবে। তিথি বলল, 'বাবা।'

'কি?'

'তোমাকে একটা কথার কথা জিজ্ঞেস করি—ধর, আমি যদি কোনোদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাই এবং আর ফিরে না আসি তাহলে কী হবে?'

'জালালুদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কোথায় যাবি তুই? এসব কী ধরনের কথা?'

তিথি জবাব না দিয়ে উঠোনে নামল। উঠোনে অনেক পানি। স্যান্ডেল জোড়া হাতে নিতে হয়েছে। অসম্ভব কাদা। বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত খালি পায়ে যেতে হবে। কি বিশ্রী অবস্থা।

৩

তিথি কখনো তার সঙ্গের পুরুষের দিকে ভালো করে তাকায় না। সব পুরুষকেই তার কাছে এক রকম মনে হয়। একদল কদাকার হাঁসের ছানার মতো। সব একই রকম। কাউকে আলাদা করা যায় না। তবে তিথি তার আজকের সঙ্গীকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে। যদিও খুঁটিয়ে দেখার মতো কিছু এই লোকটির নেই।

এর বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। কিছু বেশিও হতে পারে। গোঁফ অর্ধেকের বেশি পাকা—অবশ্যি মাথার চুল পাকে নি। হয়ত মাথায় কলপ দিয়েছে। গোঁফে দেয় নি। কিংবা দিয়েছিল—বারবার ধোয়ার কারণে উঠে গেছে। লম্বাটে মুখ। খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাড়া নাক। চোখে বেমানান এক চশমা। চশমা সাধারণত চোখের সঙ্গে লেগে থাকে—নাকের কারণে এর চশমা চোখ থেকে অনেকখানি দূরে। লোকটির মাথায় চুল খুব পাতলা। কপালের অনেকখানি পুরোপুরি ফাঁকা। সে রুমাল দিয়ে বারবার সেই ফাঁকা জায়গাটা ঘষছে। নার্ভাস একজন মানুষ। হয়ত আগে কখনো অপরিচিত মেয়ে নিয়ে বের হয় নি। এই ধরনের পুরুষ বেশ ভালো। এরা কিছুতেই জড়তা কাটাতে পারে না। অসম্ভব ঘাবড়ে যায়। এবং এক সময় বিব্রত গলায় বলে, তুমি চলে যাও—আমার কিছু লাগবে না। কেউ-কেউ আবার হঠাৎ করে মহাপুরুষ সেজে ফেলে। গম্ভীর গলায় বলে, 'তোমার মতো মেয়ে এই লাইনে কেন? এই সব ছেড়ে বিয়ে-টিয়ে করে সংসারী হও। এখনো সময় আছে।' তারপর বলে, 'বাড়িতে আছে কে? ফ্যামিলি মেম্বার কত? এই লাইনে আসবার কারণটা কি? না—সোসাইটিটা একবারেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

এই লম্বামুখো মানুষটা কী বলবে কে জানে। উদ্ভট কিছু করবে কি? বিচিত্র নয়। নার্ভাস ধরনের পুরুষ প্রায় সময়ই উদ্ভট কাণ্ডকারখানা করে। বুড়ো ধরনের এক লোক একবার কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'কিছু মনে করো না। তুমি আমার মেয়ের মতো।' বিশ্রী অবস্থা। এ জাতীয় বিশ্রী অবস্থা মনে হচ্ছে এবারও হবে।

লোকটি একটির পর একটি সিগারেট টেনে যাচ্ছে। তার ধোঁয়া টানার ভঙ্গি, সিগারেটের ছাই ফেলার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে এ সিগারেট খায় না। তারা মগবাজারের একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে মুখোমুখি বসে আছে। এগুলোকে বলে ফ্যামিলি রুম। বেলা তিনটা চারটার দিকে ফ্যামিলি রুমগুলো ভর্তি হয়ে যায়। বয় পর্দা টেনে দেয়। হুট করে ঢুকে পর্দা-ঘেরা মানুষগুলোকে বিরক্ত করে না। যার জন্যে মোটা বকশিস পাওয়া যায়।

লোকটি চোখ থেকে চশমা নামিয়ে রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছছে। কিছু-একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা। এর বেশি কিছু না।

'তোমার নাম কি?'

সে প্রশ্নটা করল তিথির দিকে না তাকিয়ে। তিথি বলল, 'আমার নাম দিয়ে তো আপনার কোনো দরকার নেই।' লোকটি এই উত্তর হয়ত আশা করে নি। কেমন হকচকিয়ে গেল।

'আমি আগে কখনো এভাবে কারো সঙ্গে আসি নি। আমার ইচ্ছাও ছিল না। আমি একজন ফ্যামিলি ম্যান। আমার কোনো বদ অভ্যাস নেই। মাঝে-মধ্যে সিগারেট খাই। আগে পান খেতাম জর্দা দিয়ে। ডাক্তার বলল জর্দাটা হার্টের জন্যে খুব খারাপ। সিগারেটের চেয়েও খারাপ, তাই পানও ছেড়ে দিয়েছি। অবশ্যি এমনিতে পানটা কিন্তু খারাপ না, ভিটামিন সি আছে। ভিটামিন সি-টা শরীরের জন্যে খুবই দরকার।'

তিথি বলল, 'আমাকে এসব কথা কেন বলছেন?'

লোকটি অস্বস্তিতে রুমাল দিয়ে নাক ঘষতে লাগল। যেন খুব ধাঁধায় পড়ে গেছে। কি করবে—কি বলবে বুঝতে পারছে না।

'তুমি গান জান?'

'না, জানি না। আর জানলেও আপনি নিশ্চয়ই চান না এখানে আমি একটা গান শুরু করি। না-কি চান?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না না, তা চাই না। সব কিছুরই একটা সময় আছে। তুমি বস। আমি সিগারেট নিয়ে আসি। সিগারেট শেষ হয়ে গেছে।'

'একজন বয়কে বললেই এনে দেবে। আপনার যেতে হবে না।'

'না থাক, আমিই যাচ্ছি।'

লোকটি দ্রুত বের হয়ে গেল। তার চলে যাবার ভঙ্গি দেখে মনে হল সে আর ফিরবে না। না ফিরলে মন্দ হয় না। তিথির ঘুম পাচ্ছে। সে মনে–মনে ঠিক করল মিনিট দশেক অপেক্ষা করে চলে যাবে। না লোকটি চলে যায় নি। সিগারেট নিয়ে ফিরছে। মুখ ভর্তি পান। তার গায়ের ধবধবে সাদা পাঞ্জাবিতে পানের পিকের দাগ। অথচ একটু আগেই বলছিল—পান খায় না। তিথি বলল, 'আপনি কি আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবেন? নাকি সারাক্ষণ এখানেই কাটাবেন?'

লোকটি খুবই অবাক হয়ে বলল, 'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। কোথায় নিয়ে যাব তোমাকে?'

'সে তো আপনি ঠিক করবেন। কোনো হোটেলে কিংবা আপনার বাসায়।'

'কি সর্বনাশের কথা! বাসায় আমার স্ত্রী আছে—বড় মেয়ে ক্লাস সেভেনে পড়ে। আজিমপুর গার্লস স্কুলে। ফরিদা যদি এইসব ব্যাপারে কিছু জানতে পারে তাহলে সে আমাকে কিচ্ছু বলবে না। সোজা ছাদে উঠে ছাদ থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে যাবে। ফরিদা হচ্ছে আমার স্ত্রীর নাম।'

'বুঝতে পারছি।'

'খুবই চমৎকার মেয়ে। আদর্শ মা, আদর্শ স্ত্রী। এখন অবশ্যি শরীরটা খুবই খারাপ। বছর তিনেক ধরে বিছানায় পড়ে আছে। একেবারে কঙ্কাল। ডাক্তার খুব খারাপ ধরনের অসুখ বলে সন্দেহ করছে। বাঁচবে না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ তাই। ইয়ে তোমার নামটা কিন্তু বল নি।'

'আমার নাম পরী।'

'বাহ্ সুন্দর নাম।'

'এটা আমার আসল নাম না। নকল নাম।'

'নামের আবার আসল–নকল আছে নাকি?'

'কেন থাকবে না। মানুষের মধ্যেও তো আসল মানুষ নকল মানুষ আছে। যেমন আমি একজন নকল মানুষ।'

ভদ্রলোক মনে হচ্ছে খুব ধাঁধায় পড়ে গেছে। সে বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে আচমকা বলল, 'তুমি ঠাণ্ডা কিছু খাবে? ফান্টা কিংবা পেপসি?'

'না।'

'খাও, একটা ফান্টা খাও। এই বয়, দুটা ফান্টা দাও। আমি আবার ফান্টা ছাড়া কিছু খেতে পারি না। কোক পেপসি এইসব আমার কাছে ওষুধের মতো লাগে। আমার নাক আবার খুব সেনসেটিভ। ফরিদাও আমার মতো। মানে ওর নাকও খুব সেনসেটিভ। দুধের কোনো জিনিস খেতে পারে না, গন্ধ লাগে। অথচ দুধটা এখন তার খাওয়া দরকার। আচ্ছা, তুমি কি দুধে গন্ধ পাও?'

তিথি হেসে ফেলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটি বিব্রত স্বরে বলল, 'আমি খুব আবোল-তাবোল কথা বলছি তাই না?'

'না ঠিক আছে। বলুন, যা বলতে ইচ্ছা করে। শুধু ছ'টার আগে-আগে ছেড়ে দেবেন। আমি অনেক দূরে থাকি।'

'কোথায় থাক?'

'তা দিয়ে তো আপনার দরকার নেই। আপনি নিশ্চয়ই আমার বাসায় বেড়াতে যাবেন না। না-কি যাবেন?'

'তুমি ঐসব মেয়েদের মতো না। তুমি অন্যরকম।'

'আপনি কি ঐসব মেয়েদের সঙ্গে আগেও মিশেছেন?'

'না।'

'তাহলে বুঝলেন কী করে, ঐসব মেয়েরা কেমন?'

'না মানে—যে রকম ভেবেছিলাম তুমি সে রকম না। অন্যরকম।'

'কী রকম ভেবেছিলেন?'

লোকটি জবাব দিল না। রুমাল দিয়ে মাথা ঘষতে লাগল। তিথি বলল, 'গল্প করতে চাচ্ছিলেন গল্প করুন। চুপ করে বসে আছেন কেন?'

'না মানে ওঠা দরকার, ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। পাঁচটার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। তোমাকে ওরা টাকা দিয়ে দিয়েছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'ভালো, খুব ভালো। খুবই ভালো।'

'চলুন, তাহলে উঠি। পাঁচটা বাজতে দেরি নেই।'

'আরেকটু বস। এই ধর দশ মিনিট। অবশ্যি তোমার যদি কোনো কাজ না থাকে।'

'আমার কোনো কাজ নেই।'

লোকটি ভয়ে ভয়ে তার একটা হাত তিথির ডান হাতের উপর রাখল। রেখেই সরিয়ে নিল। মনে হচ্ছে এই কাজটি করে সে খুব লজ্জা পেয়েছে।

তিথি বলল, 'আপনার টাকাটা তো মনে হচ্ছে জলে গেল।'

লোকটি নিচু গলায় বলল, 'তুমি একটি চমৎকার মেয়ে।'

'আমি চমৎকার মেয়ে, এটা আপনাকে বলল কে?'

'বোঝা যায়। চেহারা দেখে বোঝা যায়।'

'আচ্ছা আপনি কী করেন?'

'ছোটখাটো ব্যবসা করি। তেমন কিছু না। তবে খারাপও না। গত বছর গাড়ি কিনলাম একটা। তবে আমি অবশ্যি গাড়িতে চড়ি না। কেমন যেন দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে। রিকশাটা এদিক দিয়ে ভালো। হাওয়া খেতে খেতে যাওয়া যায়।'

'পাঁচটা বেজে গেছে—চলুন উঠি।'

'তুমি আগে যাও, আমি পরে আসছি।'

'কেউ দেখে ফেলবে সেজন্যে?'

লোকটি তার জবাব দিল না। তিথি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'আপনি কি আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারেন? আমি এসএসসি পাস করেছি।'

'কী রকম চাকরি?'

'যে কোনো চাকরি। টাইপিস্টের চাকরি বা এই জাতীয় কিছু।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'টাইপিং জান?'

'জ্বি–না তবে আমি শিখে নিতে পারব। আমি খুব দ্রুত শিখতে পারি।'

'আমার কাছে কোনো চাকরি নেই। আমার অফিসে অল্প কিছু কর্মচারী আছে। নতুন লোক নেওয়ার অবস্থা অফিসের নাই। তাছাড়া....'

'তাছাড়া কি?'

'হঠাৎ করে সুন্দরী একটা মেয়েকে চাকরি দিলে নানান কথা উঠবে। আমার স্ত্রী শুনতে পেলে মনে কষ্ট পাবে। আমাকে অবশ্যি কিছু বলবে না।'

'ছাদ থেকে লাফিয়েও পড়তে পারেন, তাই না?'

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে মানিব্যাগ থেকে ভিজিটিং কার্ড বের করে নিচু গলায় বলল, 'এইখানে ঠিকানা আছে, দবির উদ্দিন বি. এ.। দবির ইন্ডাস্ট্রিজ ৩১/৩ জিগাতলা, তুমি মাস তিনেক পর একবার খোঁজ নিও।'

'মাস তিনেক পর খোঁজ নিতে বলছেন কেন? আপনার কি ধারণা মাস তিনেকের মধ্যেই আপনার স্ত্রীর ভালোমন্দ কিছু হয়ে যাবে?'

লোকটি শীতল গলায় বলল, 'তোমাকে যথটা ভালো মেয়ে আমি ভেবেছিলাম ততটা ভালো তুমি না। তোমার মতো মেয়ে যে রকম সাধারণত হয় তুমিও সে রকমই। আলাদা কিছু না।'

তিথি হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, 'আমাকে রাগিয়ে দেয়াটা কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি। কার্ডে আপনার বাসার ঠিকানা আছে। সেই ঠিকানায় যদি হঠাৎ উপস্থিত হয়ে যাই তখন কী হবে?'

দবির উদ্দিন জবাব দিল না। চোখ বড়–বড় করে তাকিয়ে রইল।

তিথির ঠোঁটে এখন আর হাসি নেই। সে কঠিন চোখে তাকাচ্ছে। দবির এই মেয়েটির দ্রুত ভাবান্তরের রহস্য ধরতে পারছে না। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

তিথি নিচু গলায় বলল, 'পুরো টাকাটা জলে ফেলবেন কেন? কিছুটা অন্তত উসুল হোক—ব্লাউজ খুলে ফেলছি, আপনি আমার বুকে হাত দিন। আর যদি তাও না চান অন্তত তাকিয়ে দেখুন। আপনার অসুস্থ স্ত্রীর বুক নিশ্চয়ই আমার বুকের মতো সুন্দর না।'

দবিরের চেহারা ছাইবর্ণ হয়ে গেছে। সে অল্প–অল্প কাঁপছে। তিথির মুখের কঠিন ভাঁজগুলো হঠাৎ সহজ হয়ে গেল। সে বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম। আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনি চমৎকার মানুষ। চলুন, আমরা যাই।'

৪

হীরুকে ঘন্টাখানিক ধরে একতলা একটা টিনের ঘরের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখা যাচ্ছে। এই এক ঘন্টায় বাড়ির কাছাকাছি এসে কয়েকবার তীক্ষ্ণ শিস দিয়েছে। দু'বার ইটের টুকরা চালে ফেলেছে। এসব হচ্ছে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা। চেষ্টায় কোনো ফল হচ্ছে না। কেউ বেরুচ্ছে না বা জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে না।

বাড়িটা ইসমাইল সাহেবের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসমাইল সাহেব মিরপুর কৃষি ব্যাংকের ক্যাশিয়ার। তাঁর ছয় মেয়ে। এই ছ'মেয়ের তৃতীয়জনের নাম এ্যানা। এ্যানা এই বছর এস এস সি পরীক্ষা দিয়েছে। রেজাল্ট হয় নি। এখন রেজাল্টের জন্যে অপেক্ষার কাল চলছে। হীরুর শিস এবং চালে ঢিল সবই এ্যানার উদ্দেশে। তৃতীয় দফায় ঢিল এবং শিস দেবার সঙ্গে-সঙ্গে বসার ঘরের একমাত্র খোলা জানালাও বন্ধ হয়ে গেল। হীরু চাপা গলায় বলল, 'হারামজাদী।' রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছে। এ্যানার কাণ্ডকারখানা সে ঠিক বুঝতে পারছে না। হারামজাদী আজ বেরুচ্ছে না কেন? বাবা বাসায় আছে নাকি?

হীরু রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পরপর তিনটা স্টার সিগারেট খেয়ে ফেলল। বুক পকেটে একটা বিদেশি ফাইভ-ফাইভ আছে। সে ঠিক করে রেখেছিল—এ্যানা বের হলে এটা ধরানো হবে। এখন মনে হচ্ছে হারামজাদী বেরুবে না। অবশ্যি তার হয়ত দোষ নেই। ছোটলোক বাপ হয়ত ঘরে বসে আছে। এই ছোটলোকটা প্রায়ই অফিস কামাই করে। ঘরে বসে বসে ঝিমায়। যার ছ'টা মেয়ে এবং সাত নম্বর মেয়ে স্ত্রীর পেটে বড় হচ্ছে তার ঝিমানো ছাড়া গতি কি? হীরু কয়েকবার দেখেছে এ্যানার মাকে। রোগা কাঠি। শ্যাওড়া গাছের ডালে এলোচুলে বসে থাকলেই এ মহিলাকে বেশি মানাত। তা না করে তিনি কল্যাণপুরের একটা টিনের ঘরে বাস করেন এবং ভাঙা গলায় সারাক্ষণ ছয় কন্যাকে বকাঝকা করেন। হীরু নিজেও একবার বকা খেয়েছে।

এ্যানাদের বসার ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সে একবার ছোট্ট করে শিস দিতেই এই মহিলা জানালা দিয়ে মুখ বের করে বললেন, 'এই ছেলে তুই কী চাস?'

হীরু হতভম্ব!

এই যুগে তার বয়েসী কোনো ছেলেকে কোনো মেয়ের মা যে 'তুই' করে বলতে পারে তা সে কল্পনাও করে নি। সে এতই অবাক হল যে মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ভদ্রমহিলা তার ভাঙা গলায় দ্বিতীয়বার বললেন, 'চাস কী তুই? রোজ জানালার সামনে শিস! জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব।'

হীরু থতমত খেয়ে বলল, 'কিছু চাই না ম্যাডাম। একটা অ্যাডড্রেস খুঁজছি। সতের বাই তিন। ইকবাল সাহেবের বাসা। এটা কি ইকবাল সাহেবের বাসা?'

ভদ্রমহিলা খট করে জানালা বন্ধ করে দিলেন। হীরুর প্রায় ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো অবস্থা। একি যন্ত্রণা!

এই বাড়ির মেয়েগুলোও হয়েছে মায়ের মতো। সব ক'টা মেয়ে পুরুষদের মতো গলায় কথা বলে। চেহারাও পুরুষদের মতো। হাবভাবও সে রকম। হীরু যে এদের একজনের জন্যে রোজ এতটা সময় নষ্ট করে এতেই এদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। হীরুর ধারণা 'নরম্যাল পদ্ধতিতে' এদের একটারও বিয়ে হবে না। প্রেম-ট্রেম করে যদি দু'একটা পার পায়। অথচ বাপ-মা এই জিনিসটাই বোঝে না।

এ্যানার বাবা ইসমাইল সাহেবের কাজকর্ম একজন জেলের সুপারিনটেনডেন্টের মতো। যতক্ষণ বাসায় থাকবেন কোনো মেয়ে ঘর থেকে বেরুতে পারবে না। উঁকি-ঝুঁকি দিতে পারবে না। ঘরের জানালা থাকবে বন্ধ। আজকের লক্ষণও সে রকম। হীরু ঠিক করল মিরপুর গিয়ে দেখে আসবে ভদ্রলোক অফিসে গেছে না ছুটি নিয়ে বাসায় বসে আছে। যদি অফিসে না গিয়ে থাকে তাহলে তো কিছুই করার নেই। আর যদি দেখা যায় ভদ্রলোক অফিসেই আছেন তাহলে আরেকটা এটেম্পট নেয়া যায়। এত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহজে হাল ছেড়ে দেয়া ঠিক না।

ভদ্রলোক অফিসেই আছে। বিশাল চেহারা। ব্যাঙের চোখের মতো বড়-বড় চোখ। কচকচ করে পান খাচ্ছে। হীরু মনে মনে বলল, 'খা ব্যাটা পান খা। আর প্রতি বছর একটা করে মেয়ে পয়দা কর।' বলেই হীরুর মনে হল বলাটা ঠিক হল না। তার শ্বশুর হবার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা এই কোলা ব্যাঙের আছে। হবু শ্বশুর সম্পর্কে এরকম মন্তব্য করা ঠিক না। শ্বশুরদের সম্পর্কে ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকা দরকার। তবে এই লোক তার শ্বশুর হলেও বিপদ আছে। ঈদের দিন কোলাকুলি করতে হবে।

হীরু একটা রিকশা নিয়ে নিল। মিরপুর থেকে কল্যাণপুর ফেরার এই সময়টায় বাসে গাদাগাদি ভিড় থাকে। এ্যানার সঙ্গে দেখা হবে ভেবে ইস্ত্রি করা শার্ট পরে এসেছে। চাপাচাপিতে শার্ট ভর্তা হয়ে যাবে। রিকশা ভাড়ায় বাড়তি টাকা চলে যাচ্ছে। উপায় আর কি?

এ্যানার সঙ্গে তার পরিচয় দীর্ঘদিনের নয়। আড়াই মাসের মতো। পরিচয় পর্বটা খারাপ না। এসএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন। হীরু মিরপুর রোডে এসে দাঁড়িয়েছে—কী করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। বছর তিন চারেক আগে এই সময়ে মেয়েদের স্কুলে নকল সাপ্লাই করত। বয়সের কারণে এটা এখন মানায় না তবু পরীক্ষার সময় গম্ভীর মুখে একবার ঘুরে আসে। অনেক দিনের অভ্যাস। চট করে ছাড়া মুশকিল।

হীরু ভাবছিল কোন স্কুলে যাবে। আশেপাশের সব ক'টা সেন্টার ঘুরে দেখা দরকার। রোজ-রোজ একই সেন্টারে যাবার কোনো মানে হয় না। এই রকম যখন তার মনের অবস্থা তখনি এ্যানাকে তার চোখে পড়ল। বেচারি রিকশা পাচ্ছে না। কোনো রিকশা নেই। যাও আছে—যাত্রী বোঝাই। মেয়েটা ছোটাছুটি করছে রিকশার জন্যে। ব্যাপারটা দেখতে হীরুর বেশ মজাই লাগছে। মেয়েটা দারুণ ভয় পেয়েছে। তার হাত থেকে এক সময় জ্যামিতি বাক্স পড়ে গেল। চাঁদা, কম্পাস এইসব ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সে বসে বসে এইসব তুলছে এবং চোখ মুছছে।

একটা রিকশাওয়ালাকে পাওয়া গেল—সে দশ টাকা ভাড়া চায়। মেয়েটার সঙ্গে বোধ হয় দশ টাকা নেই। সে অনুনয়-বিনয় করছে সাত টাকায় যাবার জন্যে।

হীরুর এতক্ষণ বেশ মজাই লাগছিল এখন খানিকটা খারাপ লাগল—সব এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে কয়েকজন করে আত্মীয়স্বজন থাকে। ও যাচ্ছে একা এবং সঙ্গে দশ টাকাও নেই।

হীরু তখন এগিয়ে গেল। গলার স্বর যথাসম্ভব গম্ভীর করে বলল, 'খুকী আমার কাছ থেকে দশটা টাকা নিয়ে নাও। এক সময় দিয়ে দিলেই হবে। আমি এই দিকেই থাকি।'

মেয়েটি শীতল চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমার কাছে টাকা আছে। আর যদি নাও থাকে আপনার কাছ থেকে নেব কেন?'

হীরু হতভম্ব। নিজেকে সামলে নিতে সময় লাগল। মেয়েটি বলল, 'পাঁচ টাকা ভাড়া হয় আমি শুধু-শুধু তাকে দশ টাকা দেব কেন?'

'তা তো বটেই। তবে দেরি হয়ে যাচ্ছে না?'

'হোক দেরি।'

'তোমার কোন্ স্কুলে সিট পড়েছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটি জবাব না দিয়ে বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে গেল। একটা বাস এসে থেমেছে। বাসে যথেষ্ট ভিড়। বাস স্ট্যান্ডেও অপেক্ষমাণ ছোটখাটো জনতা। মেয়েটি সেই ভিড় কাটিয়ে বাসে উঠে পড়ল।

দূর থেকে হীরু মনে মনে বলল—'শাবাশ।' বলেই তার খেয়াল হল যে তার পকেট ফাঁকা একটা টাকাও নেই। মেয়েটা যদি তখন বলত—দিন দশটা টাকা, তাহলে উপায়টা কী হত?

মেয়েটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হতে বেশি সময় লাগল না। দেখা হলে সে কথা বলে। হীরু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দু' একটা রোমান্টিক কথাও বলেছে—তেমন কোনো রিঅ্যাকশান অবশ্যি তাতে বোঝা যায় নি। এর মধ্যে একটা ডায়ালগ ছিল এ রকম—'আজ তো তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।'

মেয়েটি হেসে ফেলে বলেছে, 'শুধু শুধু মিথ্যা কথা বলেন কেন? যে সুন্দর না তাকে সুন্দর বললে তার খুব খারাপ লাগে—এটা আপনি জানেন?'

মেয়েটার এইটাই হচ্ছে একটা সমস্যা। ফটফট করে কথা বলে। বেশি চালাক। মেয়েছেলের বেশি চালাক হওয়া ঠিক না।

হীরু এ্যানাদের বাসার ঠিক সামনে রিকশা থেকে নামল। রিকশায় আসতে-আসতে সে ঠিক করে রেখেছে—এ্যানাদের বসার ঘরের জানালার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কয়েকবার কাশবে। যক্ষ্মারুগীর কাশি না—ভদ্র কাশি। যাতে এ্যানা ভেতরে থেকে শুনতে পেয়ে বের হয়ে আসে।

হীরুকে কাশতে হল না। সে দেখল এ্যানা বাসার সামনের দোকান থেকে কী যেন কিনছে। এদের বাড়িতে কোনো কাজের লোক নেই বলে দোকানের টুকটাক বাজার মেয়েদেরই করতে হয়। হীরু এগিয়ে গেল।

এ্যানা আধ কেজি চিনি কিনছে। গম্ভীর মুখে দোকানদারকে বলল, 'পাল্লাটা ঠিকমতো ধরেন ভাইজান। পাল্লায় ফের আছে? নগদ পয়সায় পাবলিক জিনিস কিনবে আর আপনি পাবলিককে ঠকাবেন তা তো হয় না।'

এ্যানা বলল, 'নগদ পয়সায় কিনছি না। বাকিতে কিনছি।'

বলেই হীরুকে দ্বিতীয় কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সে চিনির ঠোঙা হাতে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল। যেন হীরুকে সে চেনে না। যেন হীরু রাস্তার একটা ছেলে। হীরু মনে মনে বলল, 'হারামজাদী।'

তার মন খারাপ হয়ে গেল। আজ দিনটাই তার জন্য খারাপ। হাতও পুরোপুরি খালি। যে সামান্য কিছু টাকা ছিল তার সবটাই রিকশা ভাড়ায় চলে গেছে। শ'খানেক টাকা সঙ্গে না থাকলে কেমন অস্থির-অস্থির লাগে। কোথায় পাওয়া যায় টাকা? হীরু দ্রুত চিন্তা করতে লাগল—ঢাকায় ধার চাওয়ার মতো আত্মীয়স্বজন কে কে আছে যাদের কাছ থেকে এখনো ধার চাওয়া হয় নি। তেমন কারোর নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। উত্তর শাহজাহানপুরে দূর-সম্পর্কের এক মামা আছেন। তাঁর কাছে যাওয়া যায়। তবে ঐ ভদ্রলোকের নিজেরই দিনে আনি দিনে খাই অবস্থা। ধার চাইতে গিয়ে কোন্ বিপদে পড়তে হয় কে জানে।

হীরু জমা করে রাখা বিদেশি সিগারেটটা বের করল। জমা করে রাখার কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থ হয় না।

সে সিগারেট ধরিয়ে দু'টা টান দিয়েছে তখন দেখা গেল এ্যানা আবার আসছে। এবং তার কাছেই যে আসছে এটাও নিশ্চিত। হীরু ঠিক করে রাখল কোনো কথা বলবে না। যে মেয়ে তাকে অপমান করে, দেখতে পেয়েও না দেখার ভান করে চলে যায় তার সঙ্গে কথা বলার কোনো মানে হয় না।

এ্যানা এসে হীরুর সামনে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটাকে হীরুর সত্যি-সত্যি সুন্দর লাগছে। যতই দিন যাচ্ছে মেয়েটা কি ততই সুন্দর হচ্ছে? তা কেমন করে হয়?

এ্যানা বলল, 'এরকম বিশ্রী করে শিস দিচ্ছিলেন কেন? কতবার না বললাম এ রকম করবেন না। আর ছাদে ঢিল মারলেন কেন? এইসব কি?'

'কথা না বলার প্রতিজ্ঞা টিকল না। হীরু বলল, 'মন-মেজাজ খুব খারাপ মাথার ঠিক নাই। কি করতে কি করি।'

'মাথার ঠিক নাই কেন?'

'আর বলো না, ছোট ভাই মিসিং হয়ে গেছে। দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি সব তো আমার ঘাড়ে। বড় ছেলে হবার বিরাট যন্ত্রণা।'

'আপনার ছোট ভাই হারিয়ে গেছে নাকি?'

'হুঁ, পালিয়ে গেছে। যাকে বলে...'

হীরু থেমে গেল। সে পালিয়ে গেছের একটা ইংরেজি বলতে চেয়েছিল—বলতে পারছে না। কারণ পালিয়ে গেছের ইংরেজি তার জানা নেই।

এ্যানা বলল, 'পুলিশে খবর দিয়েছেন?'

'না পুলিশে-ফুলিশে হবে না। পীর সাহেবের কাছে যেতে হবে। কলতা বাজারের পীর। জ্বিন সাধনা আছে। আমার সঙ্গে খুবই খাতির। অত্যন্ত স্নেহ করেন।'

এ্যানা বলল, 'আপনাকে স্নেহ করেন? আপনাকে স্নেহ করার কি আছে?'

হীরুর বিস্ময়ের সীমা রইল না। এই মেয়ে বলে কি? কষে একটা চড় দিতে ইচ্ছা করছে। যেসব চমৎকার কথা বলবে বলে হীরু এসেছিল তার সবই এলোমেলো হয়ে গেল। হীরু বলল, 'যাই তাহলে?'

'আচ্ছা।'

'দিন পনের দেখা হবে না। ঢাকার বাইরে যাচ্ছি। বিজনেসের ব্যাপারে।'

'যান, বিজনেস করে আসুন।'

'তোমার ঠিকানাটা লিখে দাও তো, সময় যদি পাই একটা চিঠি-ফিটি ছেড়ে দেব।'

'চিঠি দিতে হবে না। বাবা জানলে আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।'

হীরুর মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

মন খুব বেশি খারাপ হলে সে সাধারণত পীর সাহেবের কাছে যায়। আজ তাও যাওয়া হবে না, হাত একেবারে খালি। পীর সাহেব টাকা-পয়সা কিছু নেন না তবে বিদেশি সিগারেট দিলে খুশি হন। এক প্যাকেট বেনসনের দাম কম হলেও পাঁচ পঞ্চাশ টাকা—এই টাকাটা সে পাবে কোথায়?

হীরু ভেবে পেল না তার এবং এ্যানার ব্যাপারটা সে পীর সাহেবকে বলবে কি বলবে না। লজ্জা-লজ্জা করে তবে একবার বলে ফেললে চির জীবনের জন্যে নিশ্চিন্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাছাড়া টুকুর জন্যেও যাওয়া দরকার। হারানো মানুষ বাড়ি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে এই পীর হচ্ছে এক নাম্বার। পীর সাহেবের এগারটা জ্বিন আছে। জ্বিনের মারফত খবর পান।

হীরু খালি হাতেই পীর সাহেবের সন্ধানে রওনা হল।

৫

টুকু পার্কের একটা বেঞ্চিতে শুয়ে আছে।

তার সমস্ত শরীরে এক ধরনের আরামদায়ক আলস্য। শুধু মাথাটা কেমন যেন ফাঁকা–ফাঁকা লাগছে। এসব হচ্ছে প্রবল জ্বরের লক্ষণ। সে বুঝতে পারছে তার গায়ে জ্বর। অনেকখানি জ্বর। জ্বরের জন্যেই শ্রাবণ মাসের পড়ন্ত দিনের রোদ তার কাছে এত আরামদায়ক মনে হচ্ছে। রোদটা আরেকটু কড়া হলে ভালো হত। শীত–শীত ভাবটা দূর হত।

টুকু চোখ মেলল। আকাশ অনেকখানি নিচে নেমে এসেছে। সকালে প্রথম যখন জ্বরের ভাবটা টের পেল তখন থেকেই সে লক্ষ করছে আকাশ ক্রমেই নেমে আসছে। বাসায় যখন জ্বর আসত তখনো এমন হত। মনে হত ছাদটা নিচে নেমে এসেছে। এখন মাথার উপর ছাদ নেই। চকচকে আকাশ। সে আকাশ এত দ্রুত নিচে নামছে যে তার ভয়–ভয় করছে। টুকু চোখ বন্ধ করে ফেলল।

আজ নিয়ে দু'দিন সে পানি ছাড়া কিছুই খায় নি। ইচ্ছা করলে খেতে পারত। তার পকেটে সতের টাকা আছে। এই জীবনের পুরো সঞ্চয়। এই টাকার সবটাই সে পেয়েছে তিথির কাছ থেকে। যতবার সে তিথিকে বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেছে ততবার বাসে উঠবার আগে হাত ব্যাগ খুলে তিথি তাকে একটা টাকা দিয়ে বলেছে—নে রেখে দে। টুকু প্রতিবারই বলেছে—লাগবে না। তিথি বলেছে, না লাগলেও রেখে দে। টুকুর একচল্লিশ টাকার মতো জমেছিল। বাকি টাকাটা খরচ হয়েছে গ্রিন বয়েজ ক্লাবের চাঁদায়।এই ক্লাবটা নতুন হয়েছে। ক্লাবের সেক্রেটারি বজলু ভাই। উকিল সাহেবের বাড়ির গ্যারেজে ক্লাবের অফিস ঘর এবং লাইব্রেরি। লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা একশ' আটান্ন। লাইব্রেরিতে ভর্তি হবার নিয়ম হল—একটা বই দিতে হবে এবং ভর্তি ফি দশ টাকা দিয়ে মেম্বার হতে হবে। মেম্বার হয়ে গেলে প্রতি মাসে চাঁদা তিন টাকা।

টুকু এই লাইব্রেরির প্রথম সদস্য। শুধু তাই না—গ্রিন বয়েজ ক্লাবের মাসিক মুখপত্র 'নতুন দেশ'–এর সে একজন চিত্রকর। এই খবর টুকুদের বাসার কেউ জানে না। কেউই জানে না টুকু শুধু যে একজন চিত্রকর তাই না সে গল্পও লেখে। একটি গল্প ইত্তেফাকের কচিকাঁচার আসরে ছাপা হয়েছে। গল্পের নাম 'রাজকন্যা চম্পাবতী'। রূপকথা। রূপকথা লিখতেই টুকুর ভালো লাগে। তার মাথায় এই জিনিসই ঘুরে বেড়ায়।

ভোরবেলায় সে যখন বাড়ি থেকে বের হল তখনো তার মাথায় ছিল একটা রূপকথার গল্প। যেন সে একজন রাজকুমার। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বের হয়েছে। বের হবার কারণ ভয়ংকর একটা দৈত্য। দৈত্যটার নাম 'করুবেক'। এই করুবেক দৈত্যের ভয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্ত পৃথিবী থরথর করে কাঁপছে। একে কেউ মারতে পারছে না। কারণ করুবেক অমর। শুধু একজন পারে করুবেককে মারতে—সেই একজন হচ্ছে সে নিজে। তবে তার জন্যে তাকে সাধনা করতে হবে। সাতদিন উপবাস। উপবাসের অষ্টম দিনে তার কাছে আসবেন একজন দেবদূত। তিনি নরম গলায় বলবেন, 'হে বালক! তোমার সাধনায় তুষ্ট হয়েছি। তুমি কী চাও বৎস? তিনটি বর তুমি প্রার্থনা কর।' সে তখন চাইবে করুবেককে হত্যার অস্ত্র।

টুকুর উপবাসের আজ দ্বিতীয় দিন।

প্রথম দিন যে কষ্টটা হচ্ছিল আজ তা হচ্ছে না। টুকুর ধারণা আগামী দিন আরো কম হবে। বাসায় থাকলে কষ্ট হত। ক্ষিধের এই ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। বাসায় থাকলেই ক্ষিধে বেশি লাগে এবং যখন জানা যায় ঘরে খাবার নেই তখন হঠাৎ করে ক্ষিধের কষ্ট লক্ষগুণ বেড়ে যায়। জগৎ-সংসার অন্ধকার মনে হয়।

এরকম কষ্ট অবশ্যি টুকুকে খুব বেশি করতে হয় নি। এই জীবনে মাত্র তিনবার। প্রথমবার যখন ব্যাপারটা হল তখন কষ্টের চেয়েও বিস্ময় প্রধান হয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা রান্না হল না। টুকুর বাবা বারান্দায় বসে বারবার বলতে লাগলেন—'ভেরি ব্যাড টাইম। যাকে বলে দুঃসময়। কী করা যায়? না খেয়ে তো থাকা সম্ভব না। ও মিনু, করা যায় কী বল তো?'

টুকুর মা রান্নাঘরের বারান্দায় মোড়াতে বসা ছিলেন। সেখান থেকে তিনি তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'তুমি কথা বলবে না।'

জালালুদ্দিন বিস্মিত গলায় বললেন, 'কথা না বললে হবে কি করে? একটা বুদ্ধি বের করতে হবে না? চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে থাকলে হবে।'

'খবর্দার একটা কথা না।'

'তোমাকে নিয়ে বড় যন্ত্রণা হল তো! সমস্যা বুঝতে পারছ না। মানব জীবনে সমস্যা আসবেই। সেই সমস্যার সমাধান ঠাণ্ডা মাথায় বের করতে হবে। কুল ব্রেইনে ভাবতে হবে।'

'সমস্যার সমাধান বের করা আছে। তোমাকে ভাবতে হবে না।'

জালালুদ্দিন উৎসাহী গলায় বললেন, 'কি সমাধান?'

'ঘরে ইঁদুর মারার বিষ আছে। ঐ খানিকটা করে খেয়ে শুয়ে থাক।'

'পাগল হয়ে গেলে নাকি মিনু?'

'পাগল হই নি, পাগল হব কেন?'

'আত্মহননের চিন্তা যে মাথায় এসেছে—এটাই হচ্ছে পাগলামির সবচেয়ে বড় লক্ষণ। বড়-বড় মনীষীদের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে। বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে।'

'আর একটা কথা যদি তুমি বল জোর করে তোমাকে বিষ খাইয়ে দেব। সব সময় ফাজলামি।'

জালালুদ্দিন চুপ করে গেলেন।

টুকুরও ভয়-ভয় করতে লাগল। মার চেহারা কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে। রূপকথার ডাইনিদের মতো লাগছে।

হীরু বাড়ি এল সন্ধ্যার আগে-আগে। মুখ ভর্তি পান। হাতে সিগারেট। দুপুরে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে খাওয়া হয় নি শুনে সে চোখ কপালে তুলে বলল, 'বিগ প্রবলেম মনে হচ্ছে।'

জালালুদ্দিন বললেন, 'তোর কাছে টাকা-পয়সা কিছু আছে নাকি রে হীরু?'

'আমার কাছে টাকা-পয়সা থাকবে কেন? কিছুই নেই। বিশ্বাস না হয় পকেটে হাত দিয়ে চেক করতে পার। পাঁচটা টাকা ছিল এক প্যাকেট সিগারেট কিনে ফেললাম।'

জালালুদ্দিন ক্লান্ত গলায় বললেন, 'দেখি একটা সিগারেট দে। সিগারেটের ক্ষিধে নষ্ট করার ক্ষমতা আছে।'

জালালুদ্দিন বসে বসে সিগারেট টানতে লাগলেন। তার সামনেই বসল হীরু। কিছুক্ষণ পরপর সে বড়-বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। কপালের রগ টিপে ধরছে। তার ভাব-ভঙ্গি দেখে জালালুদ্দিন বলতে বাধ্য হলেন—'এত চিন্তা করছিস কেন? এত চিন্তার কি আছে? রিজিকের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ স্বয়ং। সেই রিজিক নিয়ে বেশি চিন্তা করার মানেই হচ্ছে আল্লাহকে বিশ্বাস না করা। মহাপাপের শামিল।'

আল্লাহর উপর প্রবল বিশ্বাস রেখে তিনি হীরুর কাছ থেকে নিয়ে পরপর তিনটি সিগারেট খেয়ে ফেললেন। আশ্চর্যের ব্যাপার—দেখা গেল স্বয়ং আল্লাহ জালালুদ্দিনের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখলেন। মিনু কোনো-এক গভীর গোপন থেকে গলার একটা হার বের করলেন। কী করে এটা অবশিষ্ট রয়ে গেল কে জানে। দু'ভরি থেকে আড়াই ভরির মতো ওজন।

জালালুদ্দিন একগাল হাসলেন। হৃষ্টচিত্তে বললেন, 'কি বলেছিলাম না। সব সমস্যার সমাধান আছে। বিশ্বাস তো কর না।'

হীরু গয়না নিয়ে বেরুল। আগেরগুলোও তার হাতেই বিক্রি হয়েছে। তার নাকি কোনো-এক চেনা দোকান আছে। ভালো দাম দেয়। খাদের জন্য কিছুই কাটে না।

জালালুদ্দিন বললেন, 'ঐ সঙ্গে সপ্তাহের বাজার করে আনবি, বুঝলি। চাল, ডাল, চা, চিনি। নোনা ইলিশ পাস কি-না দেখবি। কচুর লতি দিয়ে নোনা ইলিশের কোনো তুলনা হয় না। একেবারে বেহেশতি খানা—বুঝলি।' হীরু গয়না নিয়ে বেরুল আর ফিরল না।

বেঞ্চে শুয়ে-শুয়ে টুকু পুরনো কথা ভাবছে। ভাবতে বেশ মজা লাগছে। হীরু ভাইয়া না ফেরায় বাবা ঐ রাতে কি অবাকই না হয়েছিলেন। রাত এগারটার দিকে ভয় পাওয়া গলায় বললেন, 'ও মিনু গয়না নিয়ে পালিয়ে গেল নাকি?'

মিনু সহজ গলায় বললেন, 'হ্যাঁ।'

'এখন কী করব?'

'ঘুমিয়ে পড়। আর কী করবে?'

'বল কী তুমি!'

মিনু সত্যি-সত্যি ঘুমুবার আয়োজন করলেন। মশারি ফেলতে-ফেলতে বললেন, 'ঘুমুতে না চাও জেগে থাক। রিজিকের জন্যে আল্লাহকে ডাক। তিনি ব্যবস্থা করবেন।'

ক্ষুধার্ত মানুষ ঘুমুতে পারে না বলে প্রচলিত যে ধারণা আছে তা ঠিক না। ক্ষুধা পেটে ঘুম ভালো হয়। ঐ রাতে শোয়া মাত্র টুকু ঘুমিয়ে পড়ল। রাত তিনটার দিকে তার ঘুম ভাঙানো হল। ভাত-ডাল রান্না হয়েছে। আগুন গরম ভাত ফুঁ দিয়ে তার বাবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাচ্ছেন। তাঁর মুখে বিমলানন্দ। জানা গেল দু'বেলার মতো খাবার ঘরে ছিল। সামনের দিন কেমন যাবে তা বোঝার জন্যে মিনু এই ব্যবস্থা করেছেন। সবাই আকণ্ঠ খেল। শুধু তিথি ভাতের থালা সামনে নিয়ে বসে রইল। কিছু মুখে দিল না। জালালুদ্দিন বললেন, 'খাচ্ছিস না কেন রে মা?'

তিথি বলল, 'রুচি হচ্ছে না বাবা। তোমরা খাও।'

'দু' এক নলা মুখে দে। তাহলেই দেখবি রুচি হচ্ছে। ডাল কাঁচামরিচ দিয়ে ডলা দে দেখবি কী রকম টেস্ট হয়। মিনু ওকে একটা পেঁয়াজ দাও। ঘরে পেঁয়াজ আছে না?'

তিথি বলল, 'না-খাওয়া অভ্যাস করি বাবা। সামনের দিনগুলোতে তো না খেয়েই থাকতে হবে।'

সে থালা সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। মিনু একবারও তাকে খেতে ডাকলেন না।

আজ সকাল থেকে টুকুর মাথায় এসব ঘটনা ছবির মতো আসছে। পাশাপাশি আসছে রূপকথার গল্পটা। টুকুর পায়ের কাছে এক ঠোঙা ঝালমুড়ি নিয়ে কে-একজন এসে বসল। টুকুর মনে হল এ করুবেকের গুপ্তচর। তার সাধনা ভাঙাতে এসেছে। ঝালমুড়ির লোভ দেখাচ্ছে। যাতে সে লোভে পড়ে ঝালমুড়িওয়ালাকে ডেকে দু'টাকার মুড়ি কিনে ফেলে। একবার কিনে ফেললেই সব শেষ। করুবেককে হত্যা করা তখন আর সম্ভব হবে না।

লোকটি একবার তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী হইছে?'

টুকু জবাব দিল না। চোখ বন্ধ করে ফেলল। লোকটি দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না। এই দুঃসময়ে কেউ বেশি প্রশ্ন করে না। বেশি প্রশ্ন করলেই যদি কাঁধে দায়িত্ব এসে পড়ে। দায়িত্ব খুব খারাপ জিনিস। এর থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো।

টুকু একবার ভাবল—কেউ কি তাকে খুঁজতে বের হবে? সেই সম্ভাবনা কতটুকু? খুব বেশি না। খোঁজাখুঁজির যন্ত্রণায় কেউ যাবে না। একজন মানুষ কমে গেলেই সংসারের জন্যে ভালো। তবে বজলু ভাই খবর পেলে নিশ্চয়ই বের হবেন। এবং খুঁজে বের করতে পারলে খুশি-খুশি গলায় বলবেন, 'তুই যে ঘর থেকে পালাতে পারলি এটা খুবই শুভ লক্ষণ। সব গ্রেটম্যানরাই কোনো না কোনো সময়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম রবি ঠাকুর। বাড়ি থেকে পালান নি বলেই তাঁর লেখায় পুতুপুতু ভাবটা বেশি। বাড়ি থেকে পালালে অভিজ্ঞতা হয়। নানান ধরনের মানুষের সঙ্গে মেশা যায়। গুড ম্যান, ব্যাড ম্যান সব ধরনের মানুষ। পরবর্তী সময়ে এইসব অভিজ্ঞতা কাজে লাগে। তোর জন্যে এটা তো খুবই দরকার। লেখালেখি লাইনে যখন আছিস। আমাদের দেশের লেখকরা বড় হতে পারল না কেন? অভিজ্ঞতার অভাবে। ম্যাক্সিম গোর্কির অভিজ্ঞতা ক'জনের আছে তুই বল? একজনেরও নেই। আমাদের দেশের লেখকরা কী করে। খায় দায় ঘুমায় আর আড্ডা দেয়। এদের একবিন্দু অভিজ্ঞতা নেই। আমি খুব খুশি যে তোর অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে গেল।'

মজার ব্যাপার হচ্ছে টুকুর তেমন কোনো অভিজ্ঞতা হয় নি। সে নিজের মনে সময় কাটিয়েছে। বেশিরভাগ সময় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়েছে, কেউ তাকে বিরক্ত করে নি। শুধু একবার একটা বুড়ি তাকে বলেছে, 'এই ছ্যামড়া তোর হইছে কী? শইলে কি জ্বর?'

বুড়ির গলায় স্নেহ-মমতার লেশমাত্র নেই। টুকু সেই প্রশ্নের জবাব দেয় নি। চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধ করে ফেলেছে। বুড়ি আবার বলেছে, 'এই ছ্যামড়া উইঠ্যা ব দেহি। তোর বাড়ি কই?'

টুকু বিরক্ত হয়ে উঠে গেছে। নিজের পরিবারের মানুষদের বাইরে গত দু'দিন এই বুড়ি এবং ঝালমুড়ির ঠোঙা হাতে লোক—এদের দু'জনের সঙ্গেই কথা হয়েছে। বিরাট কোনো অভিজ্ঞতা নয়।

সন্ধ্যার ঠিক আগে-আগে টুকু উঠে বসল। আকাশটা অনেকখানি নেমে আছে। আকাশের রঙ ঘন লাল। সন্ধ্যাবেলা আকাশ খানিকটা লাল হয়। এতটা লাল হয় নাকি? তার ধারণা হল জ্বর খুব বেড়েছে। এতটা বাড়তে দেয়া ঠিক হয় নি। সে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ঘুরে নিচে পড়ে গেল। মুড়ির ঠোঙা হাতে লোকটি তাকিয়ে দেখল। কিছুই বলল না। তার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে ঠোঙা ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল। অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে সে হাঁটছে। একবারও পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে না। দিনকাল বদলে যাচ্ছে। কেউ এখন আর বাড়তি ঝামেলায় যেতে চায় না।

৬

দেখতে দেখতে ছ'দিন হয়ে গেল—টুকুর খোঁজ নেই। মিনু প্রায়ই দুপুরবেলা নিজেই ছেলেকে খুঁজতে বের হন। কাউকে তা বলেন না। টুকুর প্রসঙ্গে কোনোরকম কথাবার্তায় তিনি অংশগ্রহণ করেন না। যেন টুকু নামে তাঁর কেউ ছিল না।

এই ক'দিন তিথি টুকুর প্রসঙ্গ তোলে নি। আজ তুলল। হীরুকে বলল, 'থানায় খবর দিয়েছিস?'

হীরু অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলল, 'না।'

'না কেন?'

'আরে থানায় খবর দিয়ে হবেটা কি? নাথিং। কিছুই হবে না। উল্টা শালাদের টাকা খাওয়াতে হবে।'

'টাকা খাওয়াতে হবে কেন?'

'পুলিশের কাছে যাবি আর টাকা খাওয়াবি না—এটা একটা কথা হল নাকি। পুলিশ সম্পর্কে তুই কিছুই জানিস না। থানায় খবর দেওয়ার ব্যাপারটা তুই ফরগেট করে ফেল।'

'আমরা কিছু করব না? হাত গুটিয়ে বসে থাকব?'

'তোকে এই নিয়ে চিন্তা করতে হবে না—ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।'

'কী ব্যবস্থা?'

'ঐসব জেনে তুই কী করবি? আমার উপর ছেড়ে দে।'

'তোর ওপর ছেড়ে দিয়ে তো এই অবস্থা...'

হীরু কোনো উত্তর না দিয়ে খাওয়া শেষ করে উঠে গেল। হাতমুখ ধুয়ে তাকে এখন সিগারেট কিনতে যেতে হবে। টুকু না থাকায় এই একটা সমস্যা হয়েছে—ছোট-ছোট কাজে নিজেকেই যেতে হচ্ছে। ভরা পেটে হাঁটতে ভালো লাগে না।

টুকুকে নিয়ে যে তিথি চিন্তা করছে এতেও সে বেশ মজা পাচ্ছে। পীর সাহেবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা মতো দশ দিনের দিন টুকুর ফিরে আসার কথা। আসবে সেটা তো প্রায় নিশ্চিত। কাজেই ছোটাছুটি হৈচৈ এর কোনো দরকার নেই। সিগারেট কিনতে-কিনতে হীরুর মনে হল আজ কি একবার যাবে পীর সাহেবের কাছে? এম্নি গিয়ে একটু কদমবুসি করে আসা আর কি?

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পরপরই মিনু বের হয়ে গেলেন। একটা ভবঘুরে কেন্দ্রের খোঁজ পেয়েছেন। পুলিশ ট্রাক ভর্তি ভিখিরী নিয়ে ঐখানে আটকে রাখে বলে শুনেছেন। কে জানে টুকুকেও রেখেছে কি-না।

তিনি ফিরলেন সন্ধ্যা মেলাবার পর। ঘর অন্ধকার। বারান্দায় তার বড় মেয়ে অরুর বর আব্দুল মতিন বসে আছে। রাগে মিনুর গা জ্বলে গেল। এ ছেলেকে দেখলেই তাঁর এ রকম হয়।

আব্দুল মতিনের হাতে সিগারেট। শাশুড়িকে দেখে সিগারেট লুকাবার একটা ভঙ্গি করে উঠে এল। সিগারেট হাতেই পা ছুঁয়ে সালাম করল।

'কেমন আছেন আম্মা?'

মিনু শুকনো গলায় বললেন, 'তুমি কখন এলে?'

'চারটার সময়। দেখি কেউ নাই। তখন থেকে একলা-একলা বসে আছি। বাসায় আর লোকজন কোথায়?'

'জানি না কোথায়।'

আব্দুল মতিন বিস্মিত হয়ে বলল, 'ঘর খালি রেখে সব চলে গেছে—কি আশ্চর্য ব্যাপার। যে তালা দিয়েছেন এটা তো আম্মা বাতাস লাগলে খুলে যাবে।'

'খুলে গেলে কী আর করা। ঘরে আছেই বা কী যে সিন্দুকের তালা লাগাতে হবে। অরু আছে কেমন?'

'আছে মোটামুটি।'

'মোটামুটি কেন?'

'আরেকটা সন্তান হবে এই জন্যেই শরীরটা একটু ইয়ে। ডাক্তার বলেছে রক্তের অভাব। আয়রন ট্যাবলেট দিয়েছে। ঐ খাচ্ছে দিনে তিনটা করে।'

'তুমি ঢাকায় এসেছ কী জন্যে, কোনো কাজে না এম্নি...'

'বিনা কাজে কি আর আম্মা আমার মতো মানুষ আসা-যাওয়া করতে পারে? ঢাকা-কুমিল্লা যেতে আসতেই পঞ্চাশ টাকা খরচা। কাজেই এসেছি।'

'কাজটা কি?'

'জ্বি বলব। একটু চা দিতে পারবেন? গত রাতে এক ফোঁটা ঘুম হয় নাই, শরীরটা একেবারে ইয়ে হয়ে গেছে। গোসল করব ভেবেছিলাম। বাথরুমে দেখি সাবান নাই...'

'কী আর করবে সাবান ছাড়াই গোসল কর।'

মিনু রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন।

ঘরে কিছু নেই। শুধু চা দিতে হল। তার জন্যে মিনু কোনোরকম সংকোচ বোধ করলেন না।

মতিন চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'টাকাটার জন্যে আসলাম আম্মা। বিপদে পড়েছি। যার টাকা তাকে দিতে হয়। রোজ তাগদা দিচ্ছে।' মিনু বিস্মিত হয়ে বলল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিসের টাকা?'

'ঐ যে গত মাসে হীরু গিয়ে নিয়ে আসল।'

'হীরু টাকা নিয়ে এল? কিসের টাকা?'

'আব্বার চোখ অপারেশনের টাকা। আমার হাত তখন একেবারে খালি। তা অরু এমন কান্নাকাটি শুরু করল। আমি কী আর করব ধার করে জোগাড় করলাম। এম্নিতে তো কেউ টাকা দেয় না সুদ কবুল করে ধার। তা ভাবলাম কি আর করা—চোখ বলে কথা।'

'কত টাকা?'

মতিন অবাক হয়ে বলল, 'কত টাকা আপনি জানেন না?' মিনু বিরক্ত গলায় বললেন, 'জানলে তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম? জানি না বলেই জিজ্ঞেস করছি। কত টাকা এনেছে?'

'দুই হাজার।'

'কি সর্বনাশ বল কী তুমি!'

'আপনি কিছুই জানেন না? এ তো দেখি আরেক মুসিবত হয়ে গেল। হীরু মনে হচ্ছে ফাটকি মেরে টাকা নিয়ে এসেছে। এখন কী করি আমি?'

'হীরু আসুক হীরুকে বল। যাকে টাকা দিয়েছ তার ঘাড় ধরে টাকা আদায় কর। আমার কাছে কী?'

'আপনার কাছে কি মানে? এইসব আপনি কী বলছেন আম্মা?'

'সত্যি কথাই বলছি। হীরুর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।'

'এ তো বিরাট সমস্যায় পড়লাম। হীরুকে কি আমি টাকা দিয়েছি নাকি? টাকা দিলাম আপনাদের। রাত দশটার ট্রেনে ফিরব—এর মধ্যে যা হোক একটা ব্যবস্থা করেন। পুরোটা না হলেও অন্তত হাজারখানিক। নয়ত বিরাট বেইজ্জত হব।'

'বললেই তো হবে না। টাকা পাব কোথায়? টাকা গাছ তো বাবা পুঁতা নাই। সংসারের হাল অবস্থা তো জান। জেনেশুনে এ রকম অবুঝের মতো কথা বললে হবে নাকি?'

'আমি কি অবুঝের মতো কথা বললাম? পুরো বেইজ্জত হব লোকের সামনে—'

'না হয় শ্বশুর বাড়ির জন্যে খানিকটা বেইজ্জত হলেই।'

'আম্মা আপনি ব্যাপারটাই বুঝতে পারছেন না।'

মিনু ক্লান্ত গলায় বললেন, 'এ টাকার আশা তুমি ছেড়ে দাও বাবা।'

আব্দুল মতিন চোখ কপালে তুলে ফেলল।

'ছেড়ে দেব? কী বলছেন?'

'যা সত্যি তা বললাম।'

আব্দুল মতিন খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থেকে উঠে চলে গেল। কোথায় যাচ্ছে মিনু কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। যাক যেখানে ইচ্ছা। পুরোপুরি চলে গেলেই ভালো। তবে পুরোপুরি চলে যায় নি। হ্যান্ড ব্যাগ ফেলে গেছে। হ্যান্ড ব্যাগের জন্য আসবে। সম্ভবত হীরুর খোঁজে গিয়েছে।

তিথি সন্ধ্যার একটু পরই বাড়ি ফিরে দেখে হুলস্থুল কাণ্ড। দুলাভাই এবং মা দু'জনেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। কী নিয়ে কথা হচ্ছে বোঝার কোনো উপায় নেই। তিথি বলল, 'এসব কী হচ্ছে দুলাভাই?'

মতিন চোখ লাল করে বলল, 'কী হচ্ছে তুমি জান না?'

'জ্বি না।'

'বাজে কথা বলবে না। কী হচ্ছে তোমরা সবাই জান। এখন ভালো মানুষ সেজেছ। ভাইকে পাঠিয়ে টাকা আনবার সময় মনে ছিল না। এখন অস্বীকার যাচ্ছ।'

'কিছুই অস্বীকার যাচ্ছি না। আগে আপনি আমাকে ব্যাপারটা গুছিয়ে বলুন। এরকম রাগ করছেন কেন?'

মতিন পুরোপুরি গুছিয়েও বলতে পারল না। কথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। তবু মূল ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে। তিথি ক্লান্ত গলায় বলল, 'আপনার টাকা দিয়ে দেব। এক সঙ্গে সবটা না পারলেও ভাগে-ভাগে দেব। প্লিজ চিৎকার করবেন না। আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে দুলাভাই?'

মতিন কি-একটা বলতে গেল, বলতে পারল না। রাগে তার মুখে কথা আটকে যাচ্ছে। সে হ্যান্ড ব্যাগ হাতে নিয়ে নিয়েছে। তিথি বলল, 'যাচ্ছেন কোথায় দুলাভাই?'

মিনু বললেন, 'যেখানে ইচ্ছা যাক। তুই কথা বলিস না। ফাজিলের ফাজিল।'

মতিন বাড়ি থেকে বের হবার আগে তীব্র গলায় বলল, 'এর ফল ভালো হবে না। এর ফল কিন্তু ভালো হবে না। তখন কিন্তু আমাকে দুষবেন না।'

তিথি বলল, 'কাজটা কি ভালো করলে মা? দুলাভাই গিয়ে আপার ওপর শোধ তুলবে।'

'তুললে তুলুক। মুখে অ্যাসিড মারুক। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিক—যা ইচ্ছা করুক।'

'হয়েছে কী তোমার?'

'কিছু হয় নি।'

'বাবা কোথায় মা?'

'জানি না কোথায়। যাক যেখানে ইচ্ছা।'

তিথি এক দৃষ্টিতে মাকে দেখছে। বোঝার চেষ্টা করছে। যতই দিন যাচ্ছে মা বদলে যাচ্ছে। পরিবর্তন অতি দ্রুত হচ্ছে বলে খুব চোখে লাগছে।

তিথি লক্ষ করল মা শান্ত ভঙ্গিতে নিজের জন্য চা বানিয়ে জলচৌকিতে বসে খাচ্ছে। তার চেহারায় কোনোরকম বিকার নেই।

৭

জালালুদ্দিন হীরুর সঙ্গে তার পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। পীর-ফকিরের প্রতি তাঁর কোনোরকম বিশ্বাস নেই তবু এসেছেন। কারণ ঘর থেকে বের হতে ইচ্ছে করছে। তাঁর মনে ক্ষীণ আশা ছিল যেহেতু চোখে দেখতে পান না হীরু হয়ত একটা রিকশা ভাড়া করবে। অন্ধ বাপকে তো আর হাঁটিয়ে নেবে না।

হীরু রিকশার ধার দিয়েও গেল না। ঠেলেঠুলে এক বাসে তুলে ফেলল। সেই বাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যেও বসার জায়গা করে ফেলল। জানালার পাশে বসেছে এমন একজন মানুষকে খুঁজে বের করল যাকে দেখে মনে হয় এর হৃদয়ে দয়ামায়া আছে, অনুরোধ করলে ফেলবে না। হীরু তার কাছে গিয়ে বিনয়ে প্রায় গলে গিয়ে বলল, 'ব্লাইন্ড পারসন নিয়ে এসেছি ভাই—জায়গা দিন। ব্লাইন্ড এবং সিক দুটাই এক সঙ্গে। যায়-যায় অবস্থা বলতে পারেন।'

সঙ্গে-সঙ্গে জায়গা হল। হীরু বলল, 'থ্যাংকস ভাই। মেনি থ্যাংকস।' হীরুর কাছে মনে হল আজকের দিনটা খারাপ না। শুভ। পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে। সব দিন দেখা হয় না। লোকজনের ভিড় থাকে। কোনো কোনো দিন পীর সাহেব চিল্লায় বসেন। চিল্লা ব্যাপারটা কী সে জানে না। তবে তার ধারণা ব্যাপারটা খুবই জটিল কিছু। কারণ পীর সাহেব যেদিন চিল্লায় বসেন সেদিন তাঁর খাদেমরা ইশারায় কথা বলেন। তখন কোনোরকম শব্দ করা নিষিদ্ধ।

যা ভাবা গিয়েছিল তাই। যাওয়া মাত্র পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা হল। যে কোনো কারণেই হোক আজ লোকজন একেবারেই নেই। পীর সাহেব বারান্দায় বিমর্ষমুখে একা-একা বসে আছেন। অনেকটা দূরে দু'জন বোরকা পরা মেয়ে। মেয়ে দুটি কাঁদছে। পীর সাহেব বললেন, 'খবর কিরে তোর?'

হীরু বলল, 'আপনার দোয়া স্যার। আমি আমার ফাদারকে নিয়ে এসেছি। আপনার খুব ভক্ত।'

পীর সাহেব নিস্পৃহ গলায় বললেন, 'ভালো করেছিস। খুব ভালো করেছিস।'

'ছোট ভাইয়ের ব্যাপারটাও স্যার একটু মনে করিয়ে দিতে আসলাম। খুবই চিন্তাযুক্ত আছি। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ।'

পীর সাহেব বড় করে হাই তুললেন।

হীরু বাবার কানে কানে বলল, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? পা ছুঁয়ে সালাম কর।' জালালুদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, 'পা দেখতেই পাচ্ছি না, সালাম করব কি?'

'হীরু পীর সাহেবের দিকে তাকিয়ে হাত কচলাতে-কচলাতে বলল, 'বাবার চোখে একটা সমস্যা আছে স্যার। বলতে গেলে ব্লাইন্ড। একটু দয়া করে যদি দেখেন।'

পীর সাহেব হীরুর দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'চোখ ঠিক হয়ে যাবে।' হীরু তার বাবার কানে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'এক কথায় ঝামেলা মিটিয়ে দিলাম। এখন বাড়িতে গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাও।' জালালুদ্দিন বিশেষ ভরসা পেলেন বলে মনে হল না। ফিসফিস করে বললেন, 'কাঁদছে কেরে?' হীরু বলল, 'মেয়েছেলে কাঁদছে। ওরা কাঁদবেই। মেয়েছেলে মানেই কান্দন পার্টি।'

৮

যাদের সঙ্গে তিথির সময় কাটাতে হয় তাদের কারোর চেহারাই তার মনে থাকে না। যেন স্বপ্নদৃশ্য। ঘুম ভাঙলে স্বপ্নদৃশ্যের কাঠামো মনে থাকে, কিন্তু যাদের নিয়ে দৃশ্য তাদের চেহারা মনে থাকে না।

তিথি হ্যান্ড ব্যাগ থেকে কার্ড বের করল। ইংরেজিতে লেখা কার্ড। তিনটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেলিফোন নম্বর দেয়া। বেশ পয়সাওয়ালা মানুষ নিশ্চয়ই। লোকটির চেহারা মনে পড়ছে না—লম্বা না বেঁটে, রোগা না মোটা কিছুই মনে নেই। তবে নার্ভাস ধরনের মানুষ ছিল এটা খুব মনে আছে। বারবার তার স্ত্রীর কথা বলছিল। স্ত্রীর নাম ফরিদা। বড় মেয়ে আজিমপুর গার্লস স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ে তাও মনে আছে, কিন্তু লোকটির চেহারা মনে নেই। কার্ডে লেখা—মোঃ দবিরউদ্দিন বি.এ. (অনার্স)। কারখানার ঠিকানা এবং বাসার ঠিকানা দুটোই দেয়া আছে। তিথি ঠিক করল বাসাতেই যাবে। এই সময় ভদ্রলোককে বাসাতেই পাওয়া যাবে। ন'টা এখনো বাজে নি। এত ভোরে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কারখানায় চলে যান নি। তাছাড়া বাসায় যাবার অন্য একটা উদ্দেশ্যও আছে। অদৃশ্য চাপ সৃষ্টি করা। বাসায় গিয়ে তিথি যদি বলে, আপনি আমাকে একটা চাকরি দেবেন বলেছিলেন, তখন ভদ্রলোক হকচকিয়ে যাবেন। চেষ্টা করবেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে বিদেয় করতে। চাকরির প্রসঙ্গে ভদ্রলোক হয়ত বলবেন, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ব্যবস্থা করছি। তুমি কাল আমার অফিসে এস।

তুমি করে নাও বলতে পারে। হয়ত আপনি করে বলবে। না চেনার ভানও করতে পারে। তবে এই লোক তা করবে না। এ নার্ভাস ধরনের ভীতু একজন মানুষ। নার্ভাস এবং ভীতু মানুষ চট করে মিথ্যা বলতে পারে না। মিথ্যা বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু বলার সময় সত্যি কথাই বলে। সে যে ভুল করে সত্যি কথা বলছে তা নিজে শুরুতে বুঝতে পারে না। যখন বুঝতে পারে তখন সে আরো নার্ভাস হয়ে যায়। তিথি নিজের মনেই খানিকক্ষণ হাসল। কেন জানি তার খুব মজা লাগছে। যদিও মজা লাগার মতো কিছু হয় নি।

বাসা খুঁজে পেতে দেরি হল না। দোতলা একটা বাড়ি। তিনতলার কাজ চলছে। বাড়ির সামনে ইট, সিমেন্ট, রড গাদাগাদি করে রাখা। ছ'সাত জন মিস্ত্রী কাজ করছে। চৌবাচ্চার মতো একটা জায়গার চারপাশে গোল হয়ে বসে ইট পরিষ্কার করছে। ব্রাশ দিয়ে ইট ঘষে পানি ঢালছে। সেই ইট মাথায় করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দোতলার ছাদে। তিথি বলল, 'এটা কি দবির সাহেবের বাসা?' ছুঁচাল দাড়ির এক মিস্ত্রী বিরক্তমুখে বলল, 'জানি না কার বাসা। আফনে জিগান গিয়া।' এই বলে সে নিচু গলায় আরো কি যেন বলল। কোনো কুৎসিত ইঙ্গিত কিংবা কোনো অশ্লীল রসিকতা। কারণ সঙ্গী সবাই শব্দ করে হেসে উঠল। দু'জন আড়চোখে তাকাল তিথির দিকে। মেয়ে হয়ে জন্মানোর অনেক সমস্যা। কুৎসিত ইঙ্গিত বা কুৎসিত রসিকতা সব সময় মেয়েদের নিয়েই করা হয়। পুরুষদের নিয়ে নয়।

তিথি ছুঁচাল দাড়ির মিস্ত্রীটির দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় বলল, 'তুমি কী বললে?' মিস্ত্রী এই প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিল না। সে আমতা-আমতা করতে লাগল। তিথি বলল, 'তোমার দাড়ি ধরে আমি এই পানির মধ্যে চুবিয়ে ধরব বুঝতে পারছ?'

মিস্ত্রীদের কেউ কোন কথা বলল না। তারা ইট পরিষ্কারের ব্যাপারে এখন অতিরিক্ত মনোযোগী। ওদের একজন লজ্জিত গলায় বলল, 'কিছু মনে লইয়েন না আফা। এইডা দবির স্যারের বাসা। ডাইন দিকে যান।'

তিথি এগিয়ে যাচ্ছে। দাড়িওয়ালা মিস্ত্রীটি কী বলেছিল কে জানে। তার জানতে ইচ্ছা করছে। অনেক কিছুই আমাদের জানতে ইচ্ছা করে, শেষ পর্যন্ত জানতে পারি না। এটা এক দিক দিয়ে ভালো। সবচে খুশি মানুষ তারাই যারা সবচে কম জানে। এটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিথির বাবা জালালুদ্দিন সাহেবের কথা। জালালুদ্দিন সাহেব এক সময় দার্শনিকের কথাবার্তা বলতেন। এখন বলেন না। তাঁর এখনকার সব কথা নিজের চোখ নিয়ে এবং খাদ্যদ্রব্য নিয়ে। আজও তিথি বেরুবার সময় অনেকক্ষণ বকবক করলেন।

'একজন বড় চোখের ডাক্তারের কাছে আমাকে নিয়ে যা তো মা। বাঁ চোখটায় এখন আর কিছুই দেখতে পাই না। আগে কিছুটা দেখতাম, হীরুর পীরের কাছে যাওয়ার পর থেকে একেবারে সাড়ে সর্বনাশ। এই দেখ, ডান চোখ বন্ধ করে তোর দিকে তাকাচ্ছি। তোকে দেখছি না। কিচ্ছু না—অন্ধকার। ঐ শালা পীরের কাছে কেন যে গেলাম।'

'ডানটা কি ঠিক আছে?'

'এখনো আছে আর কিন্তু বেশিদিন থাকবে না। একটা গেলে অন্যটা যায়—এটাই নিয়ম।' তিথি অন্যমনস্ক স্বরে বলল, 'তুমি দেখি অনেক নিয়ম-কানুন জান।' তার উত্তরে জালালুদ্দিন কিছু বলেন নি। অদ্ভুত চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়েছেন। তিথি বলেছে, 'সামনের সপ্তাহে একজন বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।'

'দেরি হয়ে যাবে তো।'

'দেরি হলেও কিছু করার নেই। হাত খালি। ডাক্তার বিনা পয়সায় তোমাকে দেখবে না। নগদ একশ' টাকা দিতে হবে।' জালালুদ্দিন নিচু গলায় বললেন, 'আমার কাছে কিছু আছে।'

তিথির জন্যে এই খবরটা অবাক হবার মতো। রান্না হয় নি, খাওয়া-দাওয়া হয় নি এমন দিনও তাদের গেছে। জালালুদ্দিন শব্দ করেন নি। শুকনো মুখে উপোস দিয়েছেন। অথচ তাঁর কাছে টাকা ছিল। তিথি বলল, 'কত টাকা আছে?'

তিনি জবাব দেন নি। চোখ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। একটা হাত একবার ডান চোখের সামনে ধরছেন একবার বাঁ চোখের সামনে। তিথি বলল, 'কত টাকা বল? আমি তো নিয়ে যাচ্ছি না।'

'আছে কিছু।'

'সেই কিছুটা কত?'

'এই ধর শ' পাঁচেক।'

'এতগুলো টাকা নিয়ে ঘাপটি মেরে ছিলে? তুমি তো বেশ মজার মানুষ বাবা। দাও আমাকে এক শ' টাকা ধার দাও। ভয় নেই, ফিরিয়ে দেব।' তিনি না-শোনার ভান করলেন। খাট থেকে নেমে হাতড়ে-হাতড়ে রওনা হলেন বাথরুমের দিকে। তিথি বাড়ি থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত তিনি বেরুলেন না।

তের-চৌদ্দ বছরের রোগা একটা মেয়ে দরজা খুলে দিল। মেয়েটির চেহারা খুব মায়াকাড়া। ভারি কোমল চোখ। গোলাকার মুখ। যেন কেউ কাঁটা কম্পাস দিয়ে মুখ এঁকেছে। পাতলা ঠোঁট। এত পাতলা যে মনে হয় তীক্ষ্ণ চোখে তাকালে রক্ত চলাচল দেখা যাবে।

'দবির সাহেবের বাসা?'

'জ্বি।'

'উনি আছেন?'

'জ্বি। গোসল করছেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কে হন তোমার?'

'আমার বাবা'

'আমি উনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'বসুন। বাবা বের হলে বলব। উনার বের হতে অনেক দেরি হয়।'

'তোমার নাম কি?'

'অজন্তা।'

'বাহ্ খুব সুন্দর নাম তো।'

'আমার ভালো নামটা খুব খারাপ।'

'ভালো নাম কি?'

অজন্তা কিছু বলল না আগ্রহ নিয়ে সে তিথিকে দেখছে। মনে মনে বলছে, এই মেয়েটার গলার স্বর এত মিষ্টি কেন? শুধু শুনতে ইচ্ছা করে। তার একটু মন খারাপও হল। অজন্তার ধারণা তার গলার স্বরটা খুব বাজে। কর্কশ, কানে লাগে। এই জন্যে বাইরের মানুষের সামনে সে কথাবার্তা একেবারেই বলে না। তবু এই মহিলাটির সঙ্গে সে অনেক কথা বলে ফেলেছে। এখন মন খারাপ লাগছে। তার ধারণা এই মহিলা মনে মনে বলছেন—অজন্তা মেয়েটা এত সুন্দর কিন্তু তার গলার স্বর এরকম কাকের মতো কেন? তিথি বলল, 'তোমার আজ স্কুল নেই অজন্তা?'

'উঁহু।'

'কিসের ছুটি?'

'এসএসসি পরীক্ষার ছুটি। আমাদের স্কুলে সিট পড়েছে।'

'তুমি ক্লাস সেভেনে পড়, তাই না?'

অজন্তা অবাক হয়ে বলল, 'কী করে বুঝলেন?' তিথি হাসিমুখে বলল, 'চেহারা দেখে আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি। এখন যাও দেখ তোমার বাবা বের হয়েছেন কি না।'

'বের হন নি।'

'কি করে বুঝলে?'

'বাথরুমের দরজা খুলেই তিনি আমাকে ডাকেন লেবুর শরবত দেবার জন্যে। গোসল শেষ করে তিনি এক গ্লাস লেবুর শরবত খান। ভিটামিন সি আছে শরবতে। বেশি করে ভিটামিন সি খেলে মাথায় চুল ওঠে।'

তিথি হেসে ফেলল। অজন্তা সঙ্গে–সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল। নিজের উপর তার খুব রাগ লাগছে। কাকের মতো গলায় সে এতক্ষণ ধরে কথা বলেছে। কি লজ্জা—জিভটা কেটে ফেলতে পারলে বেশ হত। ভেতর থেকে ভারি গলা ভেসে এল, 'অজু, মা অজু।' অজন্তা মুখ কালো করে বলল, 'বাবা আমাকে আদর করে অজু ডাকেন। কি বিশ্রী যে লাগে শুনতে।' দবির সাহেব খালি গায়ে, কাঁধে শুধু একটা ভেজা গামছা জড়িয়ে বসার ঘরে ঢুকেই পাথরের মূর্তির মতো হয়ে গেলেন। তিথি উঠে দাঁড়াল। তিনি ভাঙা গলায় বললেন, 'বস বস।' তিথি বলল, 'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন...'

'হুঁ।'

'আমার নাম মনে আছে আপনার?'

'না, নাম মনে নাই। আমার কোনো মানুষের নাম মনে থাকে না। চেহারা মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে। একবার কাউকে দেখলে সারা জীবন মনে থাকে। তুমি বস, আমি একটা শার্ট গায়ে দিয়ে আসি।'

'আমি কি আপনাকে কোনো অস্বস্তিতে ফেলেছি?'

'হুঁ, তা তা তা কিছুটা··· কী জন্যে এসেছ?'

'আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন।'

'আমি, আমি আসতে বলেছিলাম? বল কি!'

'একটা কার্ড দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই ঠিকানা পেলাম।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা।'

'বলেছিলেন আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দেবেন।'

'চাকরি? চাকরি আমি কোথায় পাব?'

'তা তো জানি না। আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন, তাই এসেছি। চলে যেতে বললে চলে যাব।'

'না না বস। একটু বস। চা খাও। আমি একটা শার্ট গায়ে দিয়ে আসছি। ঘরে কোনো কাজের লোক নেই। চারজন ছিল। গত সোমবার একসঙ্গে চারজনকে বরখাস্ত করেছি। ছাব্বিশ ইঞ্চি একটা কালার টিভি চুরি হয়েছে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া সেটা সম্ভব না। আমার ধারণা, ওরা ধরাধরি করে টিভিটা চোরের রিকশায় তুলে দিয়ে এসেছে। আই অ্যাম পজিটিভ।'

দবির উদ্দিন শার্ট গায়ে দেবার জন্যে দোতলায় চলে গেলেন। তাঁর ঘর তাঁর স্ত্রী ফরিদার ঘরের পাশে। এক সময় তারা দু'জন এক খাটে ঘুমুতেন। এখন তা সম্ভব না। ফরিদার গায়ে একটু হাত রাখলে সে ব্যথায় নীল হয়ে যায়। দীর্ঘদিন বিছানায় শুয়ে থেকে–থেকে তার পিঠে দগদগে ঘা হয়েছে। সেখান থেকে কটু গন্ধ আসে। দবির উদ্দিন সেই গন্ধ সহ্য করতে পারেন না। সমস্ত শরীর পাঁক দিয়ে ওঠে। মনে হয় বমি করে ফেলবেন। বহু কষ্টে বমির চাপ সামলাতে হয়। সামলাতে না পারলে খুব খারাপ ব্যাপার হবে। ফরিদা মনের কষ্টেই মরে যাবে।

দবির উদ্দিন ফরিদার ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় থমকে দাঁড়ালেন। সকাল বেলার এই সময়টায় সে আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে থাকে। কিছু জিজ্ঞেস করলে কথা বলে না। তাকায় না পর্যন্ত কথা বলতে শুরু করে বিকেলের দিকে। আজ অন্যরকম হল। ফরিদা ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকলেন, 'এই শোন।' দবির উদ্দিন ঘরে ঢুকলেন। দরজার ও–পাশ থেকে বললেন, 'কি?'

'ঐ মেয়েটা কে?'

'কোন্ মেয়েটা?'

ফরিদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বললে।' দবির উদ্দিন ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন। ফরিদা বললেন, 'মেয়েটাকে আমার এখানে একটু আসতে বল। আমি কথা বলব।'

তিথি অনেকক্ষণ কিছু দেখতেই পেল না। জানালা ভারি পর্দায় ঢাকা। ঘরের তিনটি দরজার দুটোই বন্ধ। যেটা খোলা, সেখানেও জানালার মতোই ভারি পর্দা। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসার আগেই তিথি শুনল কেউ–একজন তীক্ষ্ণ গলায় বলছে, 'ভেতরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসে দাঁড়াও। পর্দা ধরে দাঁড়িও না। পর্দার কাঠ আলগা হয়ে আছে, মাথার উপর পড়বে।'

তিথি খানিকটা এগুলো, এগুতেও ভয় লাগছে। কোনো কিছুর সঙ্গে হয়ত ধাক্কা লাগবে।

'তোমার বাঁ দিকে চেয়ার আছে, তুমি চেয়ারে বস।'

সে বসল না। দাঁড়িয়ে রইল। চোখে অন্ধকার সয়ে গেছে। ঘর দেখা যাচ্ছে। পুরনো আমলের পালংক দেখা যাচ্ছে। পালংকে শুয়ে থাকা মহিলাকে দেখা যাচ্ছে। খুব রুগ্ন মানুষকে আমরা কঙ্কাল বলি। এই মহিলাটি তাও নয়। তার কঙ্কালও যেন শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে। হাঁটু পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। মাথার উপর শ্লথগতিতে একটা ফ্যান ঘুরছে। ঘরের ভেতর চাপা এক ধরনের গন্ধ।

'বসতে বললাম, বসছ না কেন?'

তিথি বসল। তাকিয়ে রইল দেয়ালের দিকে। ফরিদা বললেন, 'চেয়ারটা ঘুরিয়ে বস। তোমার মুখ দেখতে পারছি না।' তিথি চেয়ার ঘুরিয়ে বসল।

'তোমার চেহারা তো বেশ ভালো। বেশ্যাদের এত সুন্দর চেহারা থাকে জানতাম না। আমি শুনেছি ওদের শরীর ভালো থাকে, চেহারা ভালো থাকে না।' তিথি তাকিয়ে রইল। কিছু বলল না।

'তোমাকে বেশ্যা বলায় রাগ করলে নাকি? ও আমাকে তোমার বিষয়ে বলেছে। ও আমাকে সব কিছু বলে। কোনো কিছু লুকিয়ে রাখতে পারে না।'

'আপনি মনে হচ্ছে খুব ভাগ্যবতী।'

'ঠাট্টা করলে নাকি?'

তিথি কিছু বলল না। ফরিদা বললেন, 'আমি অবশ্যি শুনেছি তোমার মতো মেয়েরা খুব ঠাট্টা-তামাশা করতে পারে।

'আমাদের সম্পর্কে এত খবর জানলেন কীভাবে?'

'ইচ্ছা করলেই জানা যায়। একে-ওকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি।'

তিথি বলল, 'আপনার কথা কি শেষ হয়েছে—আমি এখন উঠব?'

'না বস। আরো খানিকক্ষণ বস। তোমার কাজের ক্ষতি হলেও বস, আমি পুষিয়ে দেব।'

'কিভাবে পুষিয়ে দেবেন? ঘন্টা হিসেবে টাকা দেবেন?'

'হ্যাঁ দেব। তুমি বস। চা খেয়েছ তুমি? চা দিয়েছে?'

'না দেয় নি। চা খেলে আপনার কাপ নোংরা হয়ে যাবে না?'

'হবে। আমার এত শুচিবায়ু নেই। আচ্ছা তুমি বল তোমার সঙ্গে কী কী করেছিল?'

'আপনার স্বামী আমার সঙ্গে কী কী করেছিল তা শুনতে চান?'

'হুঁ।'

'উনি আপনাকে কিছু বলেন নি?'

'বলেছে। তবু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। তুমি বল। আমি তোমাকে টাকা দেব।'

'এটা বলার জন্যে আপনি আমাকে টাকা দেবেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ দেব। ও ভীষণ লাজুক। ওর মতো লাজুক একটা মানুষ তোমার মতো সুন্দরী একটা মানুষ নিয়ে কী করল তাই জানতে চাই।'

'আপনিও তো এক সময় সুন্দরী ছিলেন। আপনাকে নিয়ে উনি কী কী করেছিলেন?'

'আমি আর তুমি এক হলাম?'

'এক না? আমাদের দু'জনের শরীরই তো এক রকম? তাই নয় কি?'

'তুমি খুবই ফাজিল একটা মেয়ে।'

'আমার মতো মেয়েরা ফাজিলও হয়—এই খবরটা বোধ হয় আপনি জানেন না। অন্য মেয়েদের সঙ্গে আমরা খুব ফাজলামি করি আবার ছেলেদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার। এখান থেকে যাবার সময় আমি করব কি জানেন? আপনার মুখে থুথু দিয়ে যাব। আপনার শরীরের যে অবস্থা আপনি আমার সেই থুথু মুখে মেখে শুয়ে থাকা ছাড়া কিছু করতে পারবেন না।'

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার ফরিদা এই কথায় রাগ করলেন না, বরং তার মুখের রেখাগুলো কোমল হয়ে গেল। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, 'তোমার নাম কি?'

'আমার দশটা নাম আছে। কোন্‌টা আপনাকে বলব?'

'সত্যি নামটা বল।'

'সত্যি নাম আমার নেই। আমার সবই নকল নাম।'

'তুমি আমার উপর খুব রাগ করেছ। আমি খুবই অসুস্থ একজন মানুষ। আর অল্প কিছু দিন বেঁচে আছি। এরকম একজন মানুষের উপর রাগ করা ঠিক না।'

'আপনার মতো রুগীরা সহজে মরে না। আপনি দীর্ঘদিন বাঁচবেন। এই বাড়ির প্রতিটি মানুষের হাড় ভাজা-ভাজা করবেন। এই বাড়ির প্রতিটি মানুষ এক দিন মনে মনে আপনার মৃত্যু কামনা করবে—তবু আপনি মরবেন না।'

ফরিদা বললেন, 'তুমি সত্যি কথাই বলেছ। তুমি আমার আরো কাছে আস তো তোমাকে ভালো করে দেখি। জানালার একটা পর্দাও সরিয়ে দাও। ঘর বেশি অন্ধকার হয়ে আছে। আজ এত অন্ধকার কেন বল তো? ঝড় বৃষ্টি হবে নাকি? আকাশে কি মেঘ আছে?' তিথি একটি প্রশ্নের জবাবও দিল না। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। শান্ত স্বরে বলল, 'যাই।' ফরিদা বললেন, 'থুথু দিয়ে গেলে না।' তিথি তার জবাব না দিয়ে নিচে নেমে গেল। দবির উদ্দিন বারান্দায় মেয়ের মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলেন। তিথি তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে উঠোনে নামল। দবির উদ্দিন শংকিত চোখে তাকিয়ে রইলেন কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। অজন্তা বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'এই মেয়েটা কে বাবা?' দবির উদ্দিন মেয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। কিছু একটা বলতে গেলেন, গলা দিয়ে শব্দ বের হল না। গলার মধ্যে আটকে গেল।

৯

টুকু অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুঝতেই পারল না সে কোথায় আছে। অন্ধকার এবং অপরিচিত একটা ঘর। সে শুয়ে আছে মেঝেতে। তার গায়ে দুর্গন্ধ মোটা একটা কাঁথা, সে শুনল ইনিয়ে-বিনিয়ে অল্প বয়েসি একটা বাচ্চা কাঁদছে। কান্নার শব্দ শুনতে শুনতে টুকু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখ বন্ধ করল। এই মুহূর্তে সে কিছু ভাবতে চায় না। ঘুমুতে চায়। আরামে তার শরীর অল্প-অল্প কাঁপছে। ঘুম এত আরামের হয় সে আগে কখনো ভাবে নি। এখানে সে কিভাবে এল? নিজে-নিজে নিশ্চয়ই আসে নি। কেউ এসে দিয়ে গেছে। কতদিন আগে দিয়ে গেছে? এক দিন, দু'দিন না সাত দিন? বাড়ি থেকে যেদিন সে বের হল সেদিন কী বার ছিল? সোমবার না মঙ্গলবার? এটা কোন্ কাল? শীত না গ্রীষ্ম? কিছুই মনে পড়ছে না।

গায়ের ওপর রাখা মোটা কাঁথা থেকে দুর্গন্ধ আসছে। ঘুমের মধ্যেও সেই দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আরো যেন বেশি পাওয়া যাচ্ছে। পেটের ভেতর পাক দিয়ে উঠছে। বমি-বমি লাগছে।

টুকু দ্বিতীয়বার চোখ মেলল। সঙ্গে-সঙ্গে মোটা একটা গলা শোনা গেল, 'নাম কি তোর? এই নাম কি রে?'

টুকু জবাব দিল না। জবাব দেবার আগে লোকটাকে দেখতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু লোকটা বসেছে এমনভাবে যে তাকে দেখতে হলে মাথা ঘুরিয়ে তাকাতে হয়। মাথা ঘুরাতে ইচ্ছা করছে না।

'এই পোলা, এই! কিছু খাবি? খাবি? কথা কস না ক্যান? বোবা নাহি। এই এই।'

টুকু কথা না বলাই ভালো বিবেচনা করল। কথা বলতে শুরু করলেই এরা অসংখ্য প্রশ্ন করবে। বাড়ি কোথায়? বাবার নাম কি? থাক কোথায়? পড়াশোনা কর? কী হয়েছে তোমার?

এরচে এই যে চুপচাপ পড়ে আছে এটা কি ভালো না? টুকু আগ্রহ করে আশেপাশের জীবনযাত্রা দেখছে। যে লোকটি তার সঙ্গে কথা বলছে তার চেহারা সে এখনো দেখে নি। তার কথা শুনে মনে হচ্ছে বুড়ো কেউ হবে। কথার সঙ্গে-সঙ্গে সে খুব কাশছে।

'এই পোলা, ভুখ লাগছে? কিছু খাবি? ও মতির মা, এই পুলারে খাওন দেও।'

মতির মা ঘরে ঢুকল। হাতে এলুমিনিয়ামের বাটি এবং চামচ। বাটিতে তরল সবুজ রঙের কি একটা জিনিস। মতির মার পরনে গাঢ় সবুজ রঙের একটা শাড়ি। বয়সও খুব কম। একে দেখে মনে হয় না মতি বলে তার কোনো ছেলে আছে।

'মতির মা, এই পুলার জবান বন্ধ। তার মুখে তুইল্যা চাইরডা খাওয়াইয়া দাও।'

মতির মা চামচে করে সবুজ রঙের ঐ জিনিস টুকুর মুখের কাছে ধরল। মতির মার মুখ ভাবলেশহীন। এই ছেলে কিছু খাক না খাক তাতে তার কিছু যায় আসে না। টুকু আগ্রহ করে খেল। জিনিসটা খেতে ভালো। টকটক এবং প্রচণ্ড ঝাল। মতির মা যতবার চামচটা মুখের কাছে ধরছে ততবারই হাতের চুড়ি টুনটুন করে বাজছে। মেয়েটির হাত ভর্তি গাঢ় লাল রঙের চুড়ি। সবুজ শাড়ি পরা একটি মেয়ের যদি হাত ভর্তি লাল চুড়ি থাকে তাহলে দেখতে অন্যরকম লাগে।

বুড়ো কাশতে কাশতে ডাকল,

'ও মতির মা!'

'কি?'

'এই পুলার তো জবান বন্ধ। তারে ঘরে আইন্যা তো দেহি আরেক বিপদে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়লাম।'

'ফালাইয়া দিয়া আহ।'

'পুলার গায়ে জ্বর আছে কি–না দেহ দেহি।'

মতির মা টুকুর গায়ে হাত না দিয়েই বলল, 'জ্বর নাই।'

'আর একটা দিন দেখি তারপরে যেখানে থাইক্যা আনছি হেইখানে ফালাইয়া থুইয়া আসমু।'

'যা ইচ্ছা কর।'

টুকু আগ্রহ করে চারদিক লক্ষ করছে। এটা নিশ্চয়ই বস্তির কোনো–একটা ঘর। চৌকি–টৌকির কোনো ব্যবহার নেই। ঘরের এ–মাথা ও–মাথা পর্যন্ত চাটাই বিছানো। যখন যার ইচ্ছা হচ্ছে এসে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে যাচ্ছে। রান্না এবং খাওয়ার ব্যবস্থা বারান্দায়। বিরাট একটা হাঁড়িতে কী যেন রান্না হয়েছে। বাড়ির লোকজন নিজের নিজের ইচ্ছামতো খেয়ে চলে যাচ্ছে। এই পরিবারের লোক ক'জন টুকু ধরতে চেষ্টা করল। পারল না। মনে হচ্ছে অনেকগুলো মানুষ। এতগুলো মানুষ মেঝেতে ঘুমুবার জায়গা হয় কী করে কে জানে? এর মধ্যে একটি মেয়ের মনে হয় নতুন বিয়ে হয়েছে। সবাই তাকে নয়া বৌ নয়া বৌ বলছে। মেয়েটা বেশ সেজেগুজে আছে।

বিকেলের দিকে টুকু উঠে বসল। ঘোর বর্ষা। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। এই ঘরে একটা ফোঁটা বৃষ্টির পানি পড়ছে না—এই আনন্দেই বাড়ির মানুষগুলো উল্লসিত। আধবুড়ো একটা লোক বারবার বলছে, 'পলিথিনের কাগজ দিয়ে কেমুন মেরামত করলাম দেখছ? পঁচিশ টাকা খরচ হইছে কিন্তু আরাম হইছে কত টেকার? পঁচিশ হাজার টেকার আরাম।'

নয়া বৌ এই কথায় খিলখিল করে হাসল। বুড়ো টুকুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'শইলডা এখন কেমন লাগে?'

টুকু কিছু বলল না। ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে রইল।

'পেশাব–পায়খানা করবি নাকি? এই পুলা?'

টুকু তাকিয়ে রইল। চোখের পলক ফেলল না।

বুড়ো দুঃখিত মুখে বল ়, 'আহা জবানডা বন্ধ। ঐ পুলা থাক শুইয়া থাক।'

টুকু সঙ্গে–সঙ্গে শুয়ে পড়ল। কে তাকে এখানে এনেছে তা জানতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু কাউকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে না। কেউ তাকে কিছু বলছেও না। জবান বন্ধ অবস্থায় থাকার খুব মজা আছে।

নয়া বৌ–এর স্বামী শ্যামলী সিনেমা হলের গেটম্যান। সে বাড়ি ফিরল রাত বারটায়। টুকুকে দেখে বলল, 'হারামজাদা এখনো আছে?'

বুড়ো বলল, 'গাইলমন্দ করিস না। এই পুলার জবান বন্ধ। গুংগা পুলা।' লোকটি বাড়ি ঢুকেই শাড়ি টানিয়ে ঘরের কোণায় পর্দা ঘেরা একটা জায়গা তৈরি করে ফেলল। এই ঘরের ছোট ক'টা বাচ্চা ছাড়া সবাই প্রায় জেগে আছে। সে এই সব অগ্রাহ্য করে পর্দা ঘেরা জায়গায় চলে গেল।

পর্দার ভেতরে একটা কুপি জ্বলছে বলে এদের দু'জনের কালো ছবি পর্দায় পড়ছে। এরা কী করছে না করছে সব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বাড়ির অন্যদের সঙ্গে টুকুও খুব আগ্রহ নিয়ে পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে। সমস্ত ব্যাপারটা তার এত অদ্ভুত লাগছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরো ব্যাপারটা অবশ্যি দেখা গেল না। বুড়ো বিরক্ত গলায় বলল, 'ঐ হারামজাদা পুলা। বাতি নিভা। তাড়াতাড়ি বাতি নিভা।'

বাতি নিভে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। অপূর্ব ছায়াছবির শেষটা দেখা গেল না বলে টুকুর মনটাই খারাপ হয়ে গেল। সারারাত বৃষ্টি হল। তুমুল বৃষ্টি। ঘরের দরজা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট আসছে। তাতে কারো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। টুকুর ঘুম আসছে না। তার চমৎকার লাগছে। মজার-মজার সব চিন্তা মাথায় আসছে। সেই সব চিন্তার একটা হচ্ছে—এটা যেন বস্তির কোনো ঘর না। এটা হচ্ছে সমুদ্রগামী জাহাজ। ঝড়ে এই জাহাজের কলকব্জা নষ্ট হয়ে গেছে, জাহাজ ভেসে যাচ্ছে নিরুদ্দেশের পথে। জাহাজের যাত্রীরা সবাই মরণাপন্ন। কারণ জাহাজে খাদ্য নেই, পানি নেই। জাহাজের তলানিতে একটা ফুটো হয়েছে। সেই ফুটো দিয়ে কলকল করে পানি আসছে। ফুটো বন্ধ করার চেষ্টা করেও লাভ হয় নি। এখন সবাই হাল ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। দুলতে দুলতে জাহাজ এগুচ্ছে।

টুকু সত্যি-সত্যি এক ধরনের দুলুনি অনুভব করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। আকাশ খানিকটা আলো হয়েছে। মেঘ নেই। বৃষ্টি ভেজা টাটকা একটা দিন। টুকু সাবধানে ঘুমন্ত মানুষদের ডিঙিয়ে ঘর থেকে বেরুল। হাঁটা শুরু করল। একবারও পেছনে তাকাল না।

একটা সময় আছে যখন আমাদের পেছনে ফিরতে ইচ্ছা করে না।

AMARBOI.COM

১০

পীর সাহেব বলেছিলেন টুকু দশদিনের মাথায় ফিরে আসবে। কিন্তু সত্যিই যে দশদিনের মাথায় টুকু এসে উপস্থিত হবে এই বিশ্বাস হীরুর ছিল না। কাজেই ভোর বেলা দরজা খুলে টুকুকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখে সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছে। মনে মনে দু'বার বলল, 'এ ভেরি গ্রেট পীর সাহেব। এ ভেরি গ্রেট পীর সাহেব।'

মুখে সে অবশ্যি রাগ এবং বিরক্তির ভঙ্গি ফুটিয়ে বলল, 'টুকু নাকি? একি চেহারা হয়েছে! তুই তো দেখি কঙ্কাল হয়ে গেছিস। স্কেলিটন। শরীরে তো হাড্ডি ছাড়া কিছু দেখছি না। ছিলি কোথায়?'

টুকু জবাব দিল না। কথা না-বলা তার অভ্যেস হয়ে গেছে।

হীরু বলল, 'বাসার সবাই একটা গ্রেট চিন্তার মধ্যে ছিল। আমি অবশ্যি চিন্তা করছিলাম না। পীর সাহেব চিন্তা করতে নিষেধ করেছিলেন। কলতা বাজারের পীর। তোকে একদিন নিয়ে যাব। হেভি পাওয়ার লোকটার। আমার ধারণা শ' খানেক জ্বীন তাঁর হাতে আছে। বেশিও হতে পারে।'

টুকুকে ফিরতে দেখে বাসায় কেউ কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না। মিনু একটি কথাও বললেন না।

সকালে খিচুড়ি নাশতা হল। সেই খিচুড়ির এক থালা টুকুর সামনে রেখে তিনি কঠিন গলায় বললেন, 'খা। খেয়ে আমাকে উদ্ধার কর।' টুকুর সঙ্গে এই হল তাঁর প্রথম কথা।

তিথি ভাইকে দেখল কিন্তু কিছু বলল না, হাসল। সেই হাসি চিন্তা দূর হবার হাসি। যা পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় টুকু ফিরে আসায় সে খুশি হয়েছে।

জালালুদ্দিন রাগী গলায় খানিকক্ষণ বকাঝকা করলেন। বকাঝকার ফাঁকে ফাঁকে উপদেশ দিলেন—বাড়ি পালান হচ্ছে একটা অসুখ। সব অসুখের চিকিৎসা আছে কিন্তু বাড়ি পালান অসুখ এবং ক্যানসার এই দু'এর কোনো চিকিৎসা নেই। একবার যার বাড়ি পালান রোগ হয়েছে সে দু'দিন পরপর পালাবে। এটা জানা কথা।

তিনি বেশিক্ষণ উপদেশ দিতে পারলেন না। তাঁর প্লেটের খিচুড়ি শেষ হয়ে গেছে। শূন্য থালা সামনে নিয়ে কথা বলতে তার ভালো লাগে না। তিনি নিচু গলায় বললেন, 'ও মিনু, খিচুড়িটা তো অসাধারণ হয়েছে। আতপ চাল ছিল তাই না? আতপ চাল ছাড়া এই জিনিস হয় না। আছে নাকি আরো?'

মিনু বললেন, 'না।'

'এক হাতা দাও দেখি। মুখের ক্ষিধেটা যাচ্ছে না। পেট অবশ্যি ভর্তি। তবু মুখের ক্ষিধের একটা ব্যাপার আছে।'

'বললাম তো নাই।'

'ও আচ্ছা, ঠিক আছে। না থাকলে কী আর করা। আজ দুপুরেও খিচুড়ি করলে কেমন হয়? আতপ চাল কি আরো আছে?'

'চুপ কর তো। খাওয়া, খাওয়া আর খাওয়। খাওয়া ছাড়াও তো আরো জিনিস আছে।'

'সেই জিনিসটা কি?'

'চুপ কর।'

জালালুদ্দিন চুপ করতে পারলেন না। টুকুকে আবার উপদেশ দিতে শুরু করলেন—'বুঝলি টুকু, ঘর হচ্ছে মানুষের মা। শিশু থাকে মায়ের পেটের ভেতর। আমরা থাকি ঘরের পেটের ভেতর। সেই জন্যে ঘর হচ্ছে আমাদের মা। ঘর থেকে পালান মাকে অপমান করা। এই কাজ খবর্দার করবি না। মায়ের পেট থেকে যে বের হয়ে যায় সে আর মায়ের পেটে ঢুকতে পারে না। তেমনি ঘর থেকে যে বের হয়ে যায় সে আর ঘরে ঢুকতে পারে না। বুঝলি?'

টুকু মাথা নাড়ল। যেন সে এই জটিল ফিলসফি বুঝে ফেলেছে। তার মাথা নাড়া জালালুদ্দিন দেখতে পেলেন না। তবে টুকু যখন নিজের থালার খিচুড়ি বাবার থালায় ঢেলে দিল তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। চিকন গলায় বললেন, 'তুই খাবি না?'

'না।'

'না কেন? জিনিসটা তো ভালো হয়েছে।'

'ক্ষিধে নেই।'

'এইটুকু খিচুড়ি খেতে ক্ষিধে লাগে নাকি? এ তো দেখি পাগলের প্রলাপ। ও মিনু, একটা শুকনা মরিচ পুড়িয়ে এনে দাও তো।'

টুকু বসে বসে বাবার খাওয়া দেখল। তার বড় ভালো লাগল। দুপুরে গেল বজলু ভাইয়ের খোঁজে।

বজলু তাকে দেখে আঁৎকে উঠে বলল, 'কি সর্বনাশ, তোর একি অবস্থা! কোথায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলি?' টুকু সহজ গলায় বলল, 'এক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম।'

"বেড়াতে যাবি, বলে যাবি না? তোর বড় ভাইকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম—টুকু কোথায়? সে বলল, 'আমি কী করে বলব কোথায়? আমি কি ডিটেকটিভ?' কী কথার কি উত্তর। তা তোর স্বাস্থ্যের এই অবস্থা কেন?"

'জ্বর হয়েছিল।'

'কাজের সময় জ্বরজ্বারি বাঁধিয়ে দিস, আশ্চর্য। তোর জন্যে শ্রাবণ সংখ্যা দেয়াল পত্রিকা বের হল না। শিল্প সাহিত্য এইসব তো ছেলেখেলা না। এক দিন করবি দশ দিন করবি না তা তো হবে না। কমিটমেন্ট দরকার।'

দুপুর থেকেই টুকু কাজে লেগে গেল। এবারে শ্রাবণ সংখ্যা দেয়াল পত্রিকা নতুন আঙ্গিকে বেরুচ্ছে। পুরো দেয়াল পত্রিকা পলিথিনের কাগজে মুড়ে বৃষ্টির মধ্যে রেখে দেয়া হবে। শ্রাবণ সংখ্যা পড়তে হলে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে পড়তে হবে। এই অসাধারণ আইডিয়া বজলুর মাথাতে এসেছে। এরকম আইডিয়া তার প্রায়ই আসে।

সন্ধ্যা না মেলানো পর্যন্ত টুকু দেয়াল পত্রিকার কাজ করল। সন্ধ্যা মেলাবার পরপর কাউকে কিছু না বলে চলে গেল বস্তির ঐ ঘরে।

বুড়ো লোকটি বারান্দায় বসে কাঠের চেয়ারে বেতের কাজ করছিল। সে টুকুকে দেখে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল—'ও মতির মা, ও মতির মা! ঐ পুলা আবার আইছে। জবান বন্ধ পুলা। ঐ হারামজাদা তুই কৈ গেছিলি? আমরা চিন্তায় চিন্তায় অস্থির! ঐ পুলা দেহি এদিকে আয়।'

শুধু মতির মা না, ঘরের সবাই বের হয়ে এল। টুকু এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন সে কিছুই বুঝতে পারছে না। মতির মা বলল, 'নয়া বৌ এই পুলাডার খাওন দাও। এ না খাইয়া সারাদিন কই কই যেন ঘুরছে।'

নতুন বৌ তৎক্ষণাৎ ভাত বেড়ে ফেলল। ভাত এবং ডাঁটা দিয়ে রান্না করা ছোট মাছের তরকারি। তরকারিতে এমন ঝাল দেয়া হয়েছে যে মুখে দিলেই চোখে পানি এসে যায়। টুকু সেই আগুন ঝাল তরকারি তৃপ্তি করে খেল। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে। তার ঘুমের জন্যে জায়গাও করে দেয়া হয়েছে। তবে সে ঘুমুচ্ছে না, অনেক কষ্টে জেগে আছে। তার এখানে আসার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে—শাড়ি দিয়ে ঘেরা অংশে নতুন বৌ এবং তার স্বামীর অভিনীত অংশটা দেখা। টুকু মনে মনে আশা করছে আজো যেন কুপি নেভাতে ওরা ভুলে যায়।

১১

হীরু বলল, 'মনটা খুবই ব্যাড হয়ে আছে।'

এ্যানা হেসে ফেলল।

হীরু রাগী গলায় বলল, 'হাসলে কেন?'

'আপনি বললেন মনটা খুব ব্যাড হয়ে আছে—এই শুনে হাসলাম। বললেই হয় মনটা খারাপ হয়ে আছে।'

হীরু গম্ভীর হয়ে গেল। এই মেয়ে ইদানীং উল্টাপাল্টা কথা বলে তাকে কষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিচ্ছে। অবশ্যি এটাই মেয়েদের নেচার। কোনো না কোনোভাবে মানুষকে কষ্ট দেয়া।

ওরা দু'জনে বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনের দেখা হয়ে গেছে কাকতালীয় ভাবে। হীরু যাচ্ছিল পীর সাহেবের কাছে। বাস স্টপে এসে দেখে—এ্যানা। চার-পাঁচদিন চেষ্টা করেও তার সঙ্গে দেখা করতে পারে নি। পরশু দিন তো প্রায় গোটা দিন এ্যানাদের বাসার সামনে হাঁটাহাঁটি করে কাটাল। লাভ হল না।

আর আজ কি-না দেখা হয়ে গেল বাস স্টপে। একি যোগাযোগ! সে মধুর স্বরে বলল, 'যাচ্ছ কোথায় এ্যানা?'

'যাত্রাবাড়িতে। আমার ছোট চাচার বাড়িতে।'

'যাত্রাবাড়িতে যাচ্ছ? বল কি! আমিও তো ঐ দিকে যাচ্ছি। আমার এক ফ্রেন্ডের বাসা। ক্লোজ ফ্রেন্ড। জন্ডিস হয়ে পড়ে আছে। খবর পাঠিয়েছে যাবার জন্যে। মেইন রোডে বাসা।'

এ্যানা হেসে ফেলল।

হীরু বলল, 'হাসলে কেন?'

'আপনি যে সারাক্ষণ মিথ্যা কথা বলেন এই জন্যে হাসলাম।'

'কি মিথ্যা বললাম?'

'যাত্রাবাড়িতে বন্ধুর কাছে যাওয়ার ব্যাপারটা পুরো মিথ্যা। আমি যদি বলতাম, আমি বাসাবো যাচ্ছি, তাহলে আপনি বলতেন আপনিও বাসাবো যাবেন। আপনার এক বন্ধু আছে বাসাবোতে। তার জন্ডিস। এখন-তখন অবস্থা।'

হীরু এ্যানার বুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। একটু মন খারাপও হল। এরকম একটা বুদ্ধিমতি মেয়েকে বিয়ে করে শেষে কোন্ যন্ত্রণা হয় কে জানে। বিয়ে না করেও তো উপায় নেই। প্রেম যখন হয়ে গেছে।

বাসগুলোতে অসম্ভব ভিড়।

পরপর দুটা বাস মিস হল—চেষ্টা করেও তারা উঠতে পারে না। হীরুর খুব ইচ্ছা একটা রিকশা নিয়ে দু'জনে চলে যায়। গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। তার ওপর আছে এ্যানার গা ঘেঁষে বসার আনন্দ। সমস্যা হচ্ছে তার কাছে আছে মাত্র দশটা টাকা। সত্তর টাকা ছিল। পীর সাহেবের জন্যে এক প্যাকেট বেনসন কিনতে গিয়ে ষাট টাকা বের হয়ে গেল। অবশ্যি কোনো-একটা দোকানে বেনসনের প্যাকেট বেচে দেয়া যায়। চল্লিশ টাকা বললে ওরা লুফে নেবে।

'এ্যানা।'

'কি।'

'চল একটা রিকশা নিয়ে নেই। এক দানে যাওয়া যাবে না। ভেঙে ভেঙে যেতে হবে। এখান থেকে নিউ মার্কেট। নিউ মার্কেট থেকে গুলিস্তান—তারপর গুলিস্তান থেকে যাত্রাবাড়ি।'

হীরুকে অবাক করে দিয়ে এ্যানা বলল, 'রিকশা নিয়ে নিন।'

'সত্যি বলছ? ট্রুথ?'

'হুঁ, সত্যি।'

রিকশা নেবার আগে হীরু বেনসনের প্যাকেট বিক্রি করল পঁয়তাল্লিশ টাকায়। তার মনে একটু খচখচানি লেগে রইল—পীর সাহেবের জন্যে কেনা জিনিস বিক্রি করা ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল না।

রিকশায় উঠে খচখচানি দূর হয়ে গেল। এত ভালো লাগল এ্যানাকে পাশে নিয়ে বসতে। এ্যানা একটা হাত রেখেছে হীরুর ডান পায়ের ওপরে। একটা মেয়ে তার হাত রেখেছে হীরুর হাঁটুতে এতেই এত আনন্দ হচ্ছে কেন? হীরুর চোখে পানি এসে যাচ্ছে। হীরু বলল, 'মনটা খুব খারাপ এ্যানা। খুবই খারাপ।'

'কেন?'

'টুকুকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'টুকু আবার কে?

'আমার ইয়ংগার ব্রাদার।'

'সে তো অনেক আগেই গেছে।'

'এসেছিল। সকালে এসে সারাদিন থাকল সন্ধ্যাবেলা আবার গন।'

'কোথায় গেছে?'

'জানি না কোথায়। পীর সাহেবের কাছে যাব। দেখি উনি কী বলেন।'

'কিছু একটা হলেই আপনি পীর সাহেবের কাছে চলে যান, তাই না?'

'সাংঘাতিক পাওয়ার উনার। তোমাকে একদিন নিয়ে যাব।'

'পীর সাহেবের কাছে যাবার আমার কোনো শখ নেই। পীর আবার কি? শুধু টাকা নেওয়ার ফন্দি।'

'তওবা কর এ্যানা, এক্ষুনি তওবা কর। ইমিডিয়েট।'

'চুপ করুন তো। আমি তওবা-টওবা করতে পারব না।'

'তওবা না করলে আমি কিন্তু নেমে যাব।'

এ্যানা বলল, 'নেমে যান। আপনাকে কে আটকাচ্ছে? আমি কি দড়ি দিয়ে আপনাকে বেঁধে রেখেছি?'

হীরুর রাগ উঠে যাচ্ছে। রাগটা কনট্রোল করার জন্যে সে সিগারেট ধরাল। এ্যানা বলল, 'সিগারেট ফেলুন তো। চোখে ছাই পড়ছে।'

'ছাই পড়লে অসুবিধা কি? চোখ কি ক্ষয়ে যাচ্ছে নাকি?'

'হ্যাঁ, ক্ষয়ে যাচ্ছে।'

'তুমি বড় যন্ত্রণা করছ এ্যানা।'

'আপনি নিজেই যন্ত্রণা করছেন। ফেলুন সিগারেট।'

মেয়েছেলের কথায় ফস করে সিগারেট ফেলে দেয়া খুবই অপমানের ব্যাপার। তবু হীরু সিগারেট ফেলে দিল। দুনিয়াটাই এ রকম যে মেয়েছেলের মন রক্ষা করে চলতে হয়।

এ্যানা বলল, 'নামার কথা বলে আবার দেখি বসে আছেন। আপনার লজ্জা নেই?'

'এইসব করলে কিন্তু সত্যি-সত্যি নেমে যাব।'

'বেশ তো নেমে যান। এই রিকশা থাম তো উনি নামবেন।'

রিকশা থামল। হীরু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। বোঝা যাচ্ছে এই মেয়ে তাকে যন্ত্রণা দেবে। একে বিয়ে করলে জীবনটা ভাজা-ভাজা হয়ে যাবে। কিন্তু বিয়ে না করেই বা উপায় কি? প্রেম বলে কথা। প্রেম না থাকলে এতক্ষণে একটা চড় দিয়ে সে নেমে পড়ত। প্রেমের কারণে চড়টা দেয়া যাচ্ছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ্যানা বলল, 'কই নামলেন না?'

'মেয়েছেলে একা-একা যাবে এই জন্যে বসে আছি।'

'একা-একা যাওয়া আমার অভ্যাস আছে। আপনি নেমে যান। নেমে গেলেই ভালো।'

'ভালো কেন?'

'আপনাকে আমার অসহ্য লাগছে।'

'অসহ্য লাগার এমন কী করলাম? সিগারেট ফেলতে বলেছ। ফেলে দিয়েছি। মামলা ডিসমিস।'

'কেন খালি খালি কথা বাড়াচ্ছেন? এত বকবক করা শিখলেন কার কাছে? আপনার পীর সাহেবের কাছে?'

এর পরে আর বসে থাকা যায় না।

হীরু নেমে গেল।

তার মনে ক্ষীণ আশা, রিকশা থেকে নামা মাত্র এ্যানা তার ভুল বুঝতে পারবে এবং মধুর গলায় বলবে, 'উঠে আসুন হীরু ভাই।' হীরু অবশ্যি সঙ্গে-সঙ্গে উঠবে না। এতে মান থাকে না। এ্যানা তখন বলবে, 'না হয় একটা ভুল করেছি তাই বলে আপনি এমন করবেন?' তখন হীরু উঠবে। কারণ মেয়েছেলের ওপর বেশিক্ষণ রাগ করে থাকা ঠিক না। মেয়েছেলের কাজই হচ্ছে ভুল করা। তারা ভুল করবেই। বিবি হাওয়া তাদের পথ দেখিয়ে গেছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার—এ্যানা কিছুই বলল না। রিকশা ফরফর করে এগিয়ে চলল। রাগে হীরুর ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। সে মনে মনে তিনবার বলল, 'হারামজাদী, হারামজাদী, হারামজাদী।' রাগ এতে পড়ে গেল। তিন সংখ্যার এই গুণ। রাগ করে তিনবার কোনো একটা কথা বললে রাগ পড়ে যায়। মন শান্ত হয়ে আসে।

হীরুর মন এখন শান্ত। বেশ অনুশোচনাও হচ্ছে, রিকশা থেকে নেমে পড়াটা বিরাট বোকামি হয়েছে। ইংরেজিতে যাকে বলে গ্রেট মিসটেক। বেচারীর কাছে রিকশা ভাড়া আছে কি-না কে জানে। মনে হচ্ছে নেই। বেচারী রিকশা থেকে নেমে মনটা খারাপ করবে। রিকশাওয়ালার সঙ্গে খচাখচি করবে। আজকাল রিকশাওয়ালারা মেয়েছেলের সম্মান রেখে কথা বলে না। মেয়েছেলেদের সঙ্গে ইচ্ছে করে যেন আরো খারাপ ব্যবহার করে।

হীরু একটা চায়ের স্টলে ঢুকে পড়ল। সারাটা দিন কী করে কাটাবে তার একটা পরিকল্পনা করা উচিত। সন্ধ্যাবেলায় আরেকবার এ্যানার খোঁজে গেলে কেমন হয়? সঙ্গে একটা চিঠি নিয়ে যাবে। একটা মাত্র লাইন সেখানে লেখা থাকবে। এমন লাইন যে পড়া মাত্র মনটা উদাস হয়ে যায়। চোখ হয় ছলোছলো—এ রকম লাইন খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্ট। চা খেতে খেতে এটা নিয়ে ভাবা যেতে পারে।

আজ হীরুর ভাগ্যটাই খারাপ। কাপ থেকে চা ছলকে পড়ল পাঞ্জাবিতে। চায়ের এই দাগ সহজে উঠবে না। দুধ দিয়ে ধুয়ে দিতে পারলে হয়ত উঠত। এখানে দুধ পাবে কোথায়? হীরু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। এ রকম যে হবে সে জানত। পীর সাহেবের নামের কেনা সিগারেট সে বিক্রি করে দিয়েছে। কাজেই একের পর এক অঘটন ঘটবে। এ্যানা যে তাকে রিকশা থেকে নামিয়ে দিল এর কারণ তো আর কিছুই না—পীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহেবের বদদোয়া। এই জন্যেই পীর–ফকিরের সঙ্গে মেলামেশা কম করতে হয়। সব জিনিসের ভালো–মন্দ দুটা দিকই আছে। পীর–ফকিরের সঙ্গে খাতির থাকা যেমন ভালো আবার তেমনি মন্দ। এখন মনে হচ্ছে মন্দটাই বেশি।

হীরু উদাস ভঙ্গিতে দ্বিতীয় কাপ চায়ের অর্ডার দিল।

১২

জালালুদ্দিন বললেন, 'কে?'

তিনি বারান্দায় বসে আছেন। সকাল ন'টার মতো বাজে। বাড়িতে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। মিনু গেছেন বাজারে। তিথি কোথায় গেছে তিনি জানেন না। যাবার আগে তাঁকে বলে যায় নি। হীরু গত রাতে বাড়ি ফেরে নি। টুকু অবশ্যি রাতে বাড়িতেই ছিল। ভোরবেলা কোথায় বেরিয়ে গেছে। এই ছেলে বড় যন্ত্রণা করছে। কখন আসছে কখন যাচ্ছে কোনো ঠিক নেই। শক্ত মারধর করতে পারেন না—এই একটা সমস্যা। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয় মারের দায়িত্বটা তাকেই নিতে হবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নিতে হবে।

টুকু থাকলে সুবিধা হত। এই যে লোকটা এতক্ষণ এসেছে। কথাবার্তা বলছে না—দাঁড়িয়ে আছে, তার ব্যাপারটা কি তা টুকু চট করে ধরে ফেলত। লোকটা কোনো বদ মতলবে এসেছে কি–না কে জানে।

জালালুদ্দিন আবার বললেন, 'কে?'

লোকটি এইবার কথা বলল। তার গলার স্বর নরম এবং সে ইতস্তত ভঙ্গিতে কথা বলছে। কাজেই লোকটা সম্ভবত খারাপ না। খারাপ লোক এইভাবে কথা বলে না।

'আমার নাম দবির। আমার ছোটখাটো ব্যবসা আছে। আপনি আমাকে চিনবেন না। আপনার সঙ্গে আগে আমার দেখা হয় নি।'

'দেখা হলেও চিনতাম না। আমি চোখে দেখি না।'

'তাই নাকি?'

জালালুদ্দিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বিরাট যন্ত্রণায় আছি ভাই। আপনি বাইরের মানুষ। ভেতরের কথা আপনাকে কি বলব? সামান্য চিকিৎসা করালেই অসুখ সারে। সেটা কেউ করাবে না। আপনি কার কাছে এসেছেন?'

দবির ইতস্তত করে বললেন, 'পরী কিংবা তিথি বলে কেউ কি এখানে থাকেন?'

'পরী বলে কেউ থাকে না। তবে তিথি আছে। আমার দ্বিতীয়া কন্যা। ভালো নাম ইশরাত জাহান। ও কোথায় যেন গেছে।'

'কোথায় গেছে জানেন?'

'জ্বি না। আমাকে কিছু বলে যায় নি। আগে বলত এখন আর বলে–টলে না। সম্ভবত ওর মাকে বলে গেছে। বসুন, ওর মা এসে পড়বে। ওর মা কাঁচা বাজারে গেছে। ঘরে কাজের লোক নেই। নিজেদেরই সব করতে হয়। ঐখানে একটা জলচৌকি আছে। টেনে নিয়ে বসুন। ঘরের ভেতর চেয়ার আছে, ঘরে তালা দিয়ে গেছে—এই জন্যে চেয়ার দিতে পারছি না। নিজগুণে ক্ষমা করবেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দবির বলল, 'আমি বসব না। কাজ ফেলে এসেছি। আপনি দয়া করে তিথিকে বলবেন, আমি এসেছিলাম। নাম বললেই হবে। আমার নাম দবির। তাকে একটু বলবেন যেন আমার বাসায় যায়। আমার স্ত্রীর কিছু কথা আছে তার সঙ্গে। জরুরি কথা।'

'বলব। অবশ্যই বলব। বাসার ঠিকানা কি তিথি জানে?'

'জ্বি জানে। তাছাড়া এই কার্ডটাও রেখে গেলাম। কার্ডে ঠিকানা লেখা আছে।'

'বলব। তিথি আসলেই বলব। তা এসেছেন যখন খানিকক্ষণ বসেই যান। আমার স্ত্রী এসে পড়বেন। তখন চা খেতে পারবেন। কষ্ট করে এসেছেন শুধু মুখে যাবেন এটা কেমন কথা।'

'জ্বি–না। আজ আর বসব না।'

জালালুদ্দিন খানিকক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত থেকে বললেন, 'ভাইসাব আপনার কাছে সিগারেট আছে? প্যাকেটটা রয়েছে ভেতরে। আমার স্ত্রী ঘরে তালা দিয়ে চলে গেলেন। চাবিটাও নেই। থাকলে আপনাকে বলতাম না।'

দবির বললেন, 'সিগারেট তো আমি খাই না তবে এনে দিচ্ছি।'

'তাহলে দরকার নেই। বাদ দেন। সঙ্গে থাকলে ভিন্ন কথা।'

'কোনো অসুবিধা নেই।'

জালালুদ্দিন এই অপরিচিত লোকটির ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। লোকটা এক প্যাকেট ফাইভ–ফাইভ এবং একটা দিয়াশলাই কিনে দিয়ে গেছে। শুধু তাই না— একটা সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে গেছে। এ রকম একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে তার মেয়ের পরিচয় আছে—ভাবতেই ভালো লাগছে। এমন চমৎকার একজন মানুষকে চা খাওয়ানো গেল না। এই দুঃখে তিনি খুবই কাতর হয়ে পড়লেন। পরের বার এলে চা এবং চায়ের সঙ্গে দুটা মিষ্টি দিতে হবে। এইটুকু ভদ্রতা না করলে খুবই অন্যায় হবে।

মিনু চলে এসেছেন। তার পায়ের শব্দ কানে যেতেই জালালুদ্দিন সিগারেটের প্যাকেট লুকিয়ে ফেললেন। মেয়েদের মন থাকে সন্দেহে ভরা। হাজারটা প্রশ্ন করবে। কি দরকার? তিনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'বাজার কী আনলে মিনু?'

মিনু জবাব দিলেন না। স্বামীর প্রশ্নের জবাব দেয়া তিনি ইদানীং ছেড়েই দিয়েছেন।

'মাছ–টাছ কিছু পাওয়া গেল?'

মিনু সেই প্রশ্নেরও উত্তর দিলেন না। বাজার নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। জালালুদ্দিন তাতে মন খারাপ করলেন না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, 'এক ফোঁটা চা দিও তো মিনু। বুকে কফ বসে গেছে। চা কফের জন্যে খুবই উপকারী। আমার কথা না। বড়–বড় ডাক্তাররা বলেন।'

মিনু এই কথায় ঝাঁঝিয়ে উঠলেন না। এটা খুবই ভালো লক্ষণ। হয়ত চা পাওয়া যাবে। চা এলে চায়ের সঙ্গে একটা সিগারেট ধরাতে হবে। সব জিনিসের একটা অনুপান আছে। চায়ের অনুপান হচ্ছে সিগারেট। দৈ–এর অনুপান মিষ্টি।

তিথির অবাক হবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে।

কিছুতেই সে এখন আর অবাক হয় না। হীরু যদি তাকে কোনোদিন এসে বলে, দেখ তিথি আমি এখন আকাশে উড়তে পারি। এবং সত্যি–সত্যি যদি খানিকক্ষণ উড়ে দেখায়, তাহলেও বোধ হয় তিথি অবাক হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথচ দবির উদ্দিনের রেখে যাওয়া কার্ড দেখে সে অবাক হল। এই লোক তার ঠিকানা পেল কোথায়? সে তো কোনো ঠিকানা রেখে আসে নি। তার ঠিকানা জানার কথা নয়। দবির উদ্দিনের স্ত্রী তার সঙ্গে কথা বলতে চান। এই খবরটিও অবাক হবার মতো। তবে তাতে তিথি অবাক হল না। ভদ্রমহিলা অসুস্থ, তার নিশ্চয়ই সময় কাটে না। গল্পগুজব করবার জন্যে তার কিছু মজার চরিত্র দরকার। তিথির মতো মজার চরিত্র তিনি আর কোথায় পাবেন।

ঐ বাড়িতে তিথির যেতে ইচ্ছা করছে না। তবু সে হয়ত যাবে। দবির উদ্দিন নামের ঐ লোক তার ঠিকানা কোথায় পেল এটা জানার জন্যেই তাকে যেতে হবে। আর যেতে যখন হবে তখন আজ গেলে কেমন হয়?

তিথি কাপড় বদলাল।

হালকা রঙের একটা শাড়ি পরল। চুলে বেণী করল। আয়নার দিকে তাকিয়ে ভাবল একটু কাজল কি দেবে? চোখের পল্লব ঘেঁষে হালকা রেখা—যা চোখে পড়বে না আবার পড়বেও।

মিনু ঘরে ঢুকে দেখলেন তিথি খুব সাবধানে চোখে কাজল দিচ্ছে। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিথি বলল, 'তুমি কিছু বলবে?'

'না।'

'তাহলে দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলে যাও।'

মিনু ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'তুই কি আমাকে দেখতে পারিস না তিথি?' তিথি মার দিকে না তাকিয়ে বলল 'না। পারি না।'

'আমি কী করেছি? আমার দোষটা কি?'

'তোমাকে কি আমি কোনো দোষ দিয়েছি? দোষ ছাড়াই তোমাকে দেখতে পারি না।'

মিনু খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আগের চেয়েও ক্ষীণ গলায় বললেন, 'অরু চিঠি দিয়েছে।'

তিথি কিছু বলল না।

মিনু বললেন, 'তোর টেবিলের ওপর রেখেছি।'

'আমার টেবিলের ওপর রেখেছ কেন? আমি ঐ সব চিঠি-ফিঠি পড়ব না। ভাল্লাগে না।'

মিনু চলে গেলেন। তিথি অবশ্যি ঘর থেকে বেরুবার আগে বোনের চিঠি পড়ল। একবার না দু'বার পড়ল। খুবই সংক্ষিপ্ত চিঠি। মার কাছে লেখা।

মা,

আমার সালাম নিও। আমি বুঝতে পারছি তোমরা ওর টাকাটা দিতে পারছ না কিংবা দিচ্ছ না। আমি ঐ নিয়ে আর কিছু বলব না। কিন্তু মা তোমার পায়ে পড়ি আমাকে কিছুদিন তোমাদের কাছে এনে রাখ। এখানে আমি মরে যাচ্ছি। হীরুকে পাঠাও মা, আমাকে নিয়ে যাক।

তোমার অরু।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এত সংক্ষিপ্ত চিঠি অরু কখনো লেখে না। তার চিঠি হয় দীর্ঘ। চিঠির শেষের দিকে এসে বাবার বাড়ির সবার সম্পর্কে কিছু না কিছু লেখা থাকে। এই চিঠিতে সে সব কিছুই নেই। তিথি ভাবতে চেষ্টা করল—বড় আপা কী ধরনের কষ্টে আছে? কষ্টের নমুনাটা কি? বড় আপার কষ্টের সঙ্গে তার নিজের কষ্টের কি কোনো মিল আছে? সম্ভবত নেই। সে যে জাতীয় যাতনা বোধ করছে বড় আপার সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই, ধারণা থাকার কথাও না। তার বয়স তখন কত? পনের না কি ষোল? এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে, তখনো রেজাল্ট হয় নি—বাবা তাকে পাঠালেন মনজুর সাহেবের কাছে। বাবার দূর-সম্পর্কের ভাই। তিথি তাঁকে কখনো দেখে নি। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এ জি অফিসে কাজ করেন। থাকেন সরকারী কোয়ার্টারে। তাঁকে একটা চিঠি দিতে হবে। চিঠিটা বাবার জবানীতে লিখেছে তিথি। চিঠির বিষয়বস্তু খুবই সাধারণ—জালালুদ্দিন সাহেব তাঁর ফুপাতো ভাইকে জানাচ্ছেন যে তিনি সাময়িকভাবে খুবই অসুবিধায় পড়েছেন। যদি দু'শ টাকা তাকে দেয়া হয় তাহলে তিনি চির কৃতজ্ঞ থাকবেন। টাকাটা তিনি সামনের মাসে যে করেই হোক ফেরত দেবার ব্যবস্থা করবেন। তিনি নিজেই আসতেন—ইদানীং চোখের একটা সমস্যার জন্যে আসতে পারছেন না।

চিঠি নিয়ে যাবার কথা হীরুর। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'এটা তো ভিক্ষা চাওয়া চিঠি। যাকে বলে বেগিং। আমি বেগিং বিজনেসে থাকতে পারব না।' জালালুদ্দিন কিছুতেই তাকে রাজি করাতে পারলেন না। শেষটায় মেয়েকে বললেন, 'তুই যাবি তিথি? গভর্মেন্ট কোয়ার্টার। খুঁজে বের করতে কোনোই অসুবিধা হবে না। পারবি মা?'

তিথি বলল, 'উনি যদি চিনতে না পারেন?'

'বলিস কি তুই? চিনতে পারবে না মানে! পরিচয় পেলে দেখবি কত খাতির-যত্ন করে।'

'টাকা যদি না দেন তাহলে তো বাবা খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।'

'তোর কিসের লজ্জা? তুই তো আর টাকা চাস নি। আমি চেয়েছি। লজ্জা হলে আমার হবে।'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে উনি খুব খারাপ ব্যবহার করবেন। বিরক্ত হবেন।'

'আহা গিয়ে দেখ না। বিশিষ্ট ভদ্রলোক।'

'যদি চিনতে না পারেন?'

মনজুর সাহেব তাকে চিনতে পারলেন। হাসিমুখে বললেন, 'তোমাকে খুব ছোটবেলায় দেখেছি। তোমার মনে নেই। তবে তোমার বড় বোনের নিশ্চয়ই মনে আছে। কি নাম যেন তার? অরুণিমা না?'

'জ্বি। ডাকনাম অরু।'

'তোমার বাবার তো আবার খুব কাব্যিক নাম রাখার বাতিক। তোমার নাম কি?'

'তিথি।'

'বাহ্ খুব সুন্দর নাম'। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন। তিথিদের অবস্থা শুনে খুবই দুঃখিত হলেন এবং আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, 'এই সাময়িক সাহায্যে তো কিছু হবে না। স্থায়ী কিছু করতে হবে। কীভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে কথা। তোমার ভাইকে পাঠিয়ে দিও। আমার কিছু জানাশোনা আছে দেখি কোথাও লাগিয়ে দেয়া যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি-না।' তিথির মনে যে চাপা উদ্বেগ ছিল তা দূর হয়ে গেল। বাবার এই ফুফাতো ভাইকে তার পছন্দ হল। ছোটখাটো মানুষ। সারাক্ষণ পান খাচ্ছেন। একটু পরপর পানের রস গড়িয়ে পড়ছে। সরুয়া টানার মতো সেই রস টেনে নিচ্ছেন। মাথায় এক গাছিও চুল নেই। চকচকে টাক। কিছুক্ষণ পরপর টাকে হাত বুলাচ্ছেন। তখন তাঁর মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হয় টাকে হাত বুলিয়ে তিনি খুব আরাম পাচ্ছেন। তিথি খানিক গল্পগুজবও করল। সহজ স্বরে বলল, 'বাসায় আর কেউ নেই কেন? চাচী কোথায়?'

'ও থাকে গফরগাঁয়ে। ছেলেমেয়েরা ঐখানেই স্কুল-কলেজে পড়ে। ঢাকার এত খরচ চালানো কি সোজা ব্যাপার। সরকারী বাসা পাওয়ায় রক্ষা হয়েছে। অর্ধেক সাবলেট করে দিয়েছি। আমি দুটা ঘর নিয়ে থাকি।'

'একা-একা খারাপ লাগে না আপনার?'

'না। সপ্তাহে-সপ্তাহে যাই। বৃহস্পতিবার দুপুরে চলে যাই শনিবার সকালে আসি। খানিকটা কষ্ট হয়। কি আর করা বল।'

'খাওয়া-দাওয়া কোথায় করেন?'

'বেশিরভাগ সময় নিজেই রাঁধি। বাইরেও খাই।'

তিনি তিথিকে সুজির হালুয়া রেঁধে খাওয়ালেন। দু'শ' টাকা দিয়ে নিজে এসে একটা রিকশা ঠিক করে রিকশা ভাড়াও দিয়ে দিলেন। তিথিকে বললেন, 'একা একা ঢাকা শহরে ঘুরাফিরা করা ঠিক না। তোমার বাবাকে বলবে আর যেন তোমাকে এভাবে না পাঠান।'

তিথিকে পরের মাসে আবার আসতে হল। এবারের আবেদন এক শ' টাকার। যে করেই হোক দিতে হবে।

মনজুর সাহেব টাকা দিয়ে দিলেন এবং সেদিনও সুজির হালুয়া রেঁধে খাওয়ালেন। তবে ঐ দিনের মতো গল্পগুজব হল না বা এগিয়ে এসে রিকশা ঠিক করে দিলেন না।

তার পরের মাসে তিথি আবার এল। সারাপথ কাঁদতে কাঁদতে আসল। টাকা চাইতে হবে এই দুঃখে তার মরে যেতে ইচ্ছা করছে। বাসে বসে তার মন চাইছিল একটা ট্রাকের সঙ্গে এই বাসটার অ্যাকসিডেন্ট হোক। সেই অ্যাকসিডেন্টে সে যেন মারা যায়। সে মরল না। এক সময় মনজুর সাহেবের বাসার কড়া নাড়ল। মনজুর সাহেব দরজা খুললেন তবে তাকে দেখে খুব অবাক হলেন না। শুকনো গলায় বললেন, 'কি খবর?' তিথি মাথা নিচু করে বলল, 'বাবা একটা চিঠি দিয়েছেন।'

'আবার চিঠি। এস ভেতরে এস।' তিথি ভেতরে এসে বসল। মনজুর সাহেব বললেন, 'এইবার কত টাকা চেয়েছে?'

'এক শ'।'

তিথির ধারণা ছিল এবারে তিনি টাকা দেবেন না। কিন্তু তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। তিনি পঞ্চাশ টাকার দুটা নোট তিথির হাতে দিলেন এবং বললেন, 'ঘেমে-টেমে কি হয়েছ ফ্যানের নিচে বস। বিশ্রাম কর।'

'জ্বি-না। তাড়াতাড়ি বাসায় যেতে হবে। টুকুর খুব জ্বর। ডাক্তার আনতে হবে।'

'দু'তিন মিনিট বসে গেলে ক্ষতি হবে না।' তিনি হাতে ধরে তিথিকে তার পাশে বসালেন। পরমুহূর্তেই তিথিকে জড়িয়ে ধরলেন। তিথি ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। কোনোমতে বলল, 'ছাড়ুন চাচা। আমাকে ছেড়ে দিন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি আহ্ বলে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। তিথিকে ছাড়লেন না। তিথি চিৎকার করতে চেষ্টা করল—গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হল না। সিগারেটের গন্ধ ভরা, পান খাওয়া একটা মুখ তার মুখের উপর লেপ্টে রইল। দু'টি হাত মাকড়সার মতো তার সারা শরীরে কিলবিল করতে লাগল। এর পর কি কি ঘটল সে মনে করতে পারে না। শুধু যা মনে আছে তা হচ্ছে সে বেতের সোফায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মনজুর সাহেব একটা বাটিতে সুজির হালুয়া বানিয়ে এনে তাকে বলছেন, 'এই তিথি, নাও হালুয়া খাও। এর পরেও অনেকবার তিথিকে তার কাছে আসতে হয়েছে। প্রতিবারেই মনজুর সাহেব তাকে টাকা দিয়েছেন। এবং বলেছেন, দরকার হলেই আসবে। কোনো অসুবিধা নেই।

তিথি বড় আপার চিঠি টেবিলে রাখতে-রাখতে মৃদু স্বরে বলল, 'তুমি তো সুখেই আছ আপা। কত সুখে আছ তুমি জান না। জানলে এ রকম চিঠি লিখতে না।'

এ হচ্ছে নিজের সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলা। নিজের সঙ্গে কথা বলার এই অদ্ভুত অসুখ তিথির ইদানীং হয়েছে। মনে মনে ভাবা কথাগুলো সশব্দে বের হয়ে আসে। রিকশায় আসতে-আসতে একবার এরকম হল। রিকশাওয়ালা তিথির বিড়বিড় শুনে চমকে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। অবাক হয়ে বলল, 'কি কন আফা?' এগুলো কি পাগল হবার লক্ষণ? এক সময় সে কি পাগল হয়ে যাবে? হয়ত হবে। কিংবা কে জানে এখনি হয়ত সে খানিকটা পাগল।

বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে হীরুর সঙ্গে দেখা। হীরু বলল, 'তিথি যাচ্ছিস কোথায়? তোর সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে, ভেরি আর্জেন্ট।'

তিথি বলল, 'আমার কোনো জরুরি কথা নেই। বিরক্ত করিস না তো।'

হীরু সঙ্গে-সঙ্গে আসতে লাগল। তিথি বলল, 'কেন বিরক্ত করছিস?'

'তুই আমাকে থ্রি থাউজেন্ড টাকা জোগাড় করে দিতে পারবি?'

'না।'

'এর জন্যে তুই আমাকে তোর পা ধরতে বলিস আমি তোর পা ধরে বসে থাকব। টাকাটা আমার খুবই দরকার।'

'দরকার হলে চুরি কর। ছিনতাই কর। কানে দুল পরে মেয়েরা যায়। ঐ সব দুল টান দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে যা।'

'তুই কি পাগল হয়ে গেলি তিথি? আমি ভদ্রলোকের ছেলে না?'

'হ্যাঁ, ভদ্রলোকের ছেলে। তুইও ভদ্রলোকের ছেলে, আমিও ভদ্রলোকের মেয়ে। আমি টাকা কীভাবে আনি তুই জানিস? নাকি তোর জানা নেই?'

হীরু চুপ করে গেল। তিথি বলল, 'আমি কীভাবে টাকা আনি সেটা কেউ জানে না। আবার সবাই জানে। মজার একটা খেলা। তুই আমার পেছনে পেছনে আসবি না। যদি আসিস তাহলে ধাক্কা দিয়ে নর্দমায় ফেলে দেব।'

হীরু দাঁড়িয়ে পড়ল। তিথিকে বিশ্বাস নেই—এই কাণ্ড সে সত্যি-সত্যি করে বসতে পারে। একবার নর্দমায় পড়ে গেলে চৌদ্দবার গোসল করলেও গন্ধ উঠবে না। হীরুর মন খারাপ হয়ে গেল। তিথির কাছ থেকে সে টাকা পাবে না—এটা জানত। টাকা চাওয়ার উদ্দেশ্য ভিন্ন। হীরুর ধারণা ছিল টাকার কথা শুনেই তিথি বলবে—এত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকা দিয়ে তুই কী করবি? তখন হীরু কারণটা ব্যাখ্যা করবে।

কারণটা বেশ অদ্ভুত।

আজ হাঁটতে হাঁটতে সে পীর সাহেবের কাছে গিয়েছে। খালি হাতে গিয়েছে, এই জন্যে সে আর তাঁর সঙ্গে দেখা করল না। উঠোনে মাথা কামানো এক লোকের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। মাথা কামানো লোকটির নাম সবুর। তার বাড়ি কালিয়াকৈর। মাস তিনেক আগে বিয়ে করেছে। গত সপ্তাহে তার বৌ হঠাৎ পালিয়ে গেছে। অনেক জায়গায় খোঁজখবর করেও সে কোনো সন্ধান না পেয়ে পীর সাহেবের কাছে এসেছে। পীর সাহেবের সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি। হীরু বলল, 'ঠিক জায়গায় এসে পড়েছেন ভাইজান। মোটেই চিন্তা করবে না, এক মিনিটের মামলা। পীর সাহেব ফড়ফড় করে সব বলে দেবেন।'

'সত্যি।'

'সত্যি মানে? আমার নিজের ইয়ংগার ব্রাদার মিসিং হয়ে গেল। নাম তার টুকু। পীর সাহেবকে বললাম। উনি বললেন—চিন্তা করিস না। এক সপ্তাহের মধ্যে ফিরবে।'

'ফিরল এক সপ্তাহের মধ্যে?'

'ফিরবে না মানে? পীর সাহেবের সঙ্গে ইয়ার্কি চলে না। ডাইরেক্ট অ্যাকশান। আপনি খালি হাতে আসেন নি তো?'

'এক শ' টাকা এনেছি—গরিব মানুষ।'

'টাকা-পয়সা পীর সাহেব নিবেন না। টাকা-পয়সা উনার কাছে তেজপাতা। সিগারেট দিতে হবে, বিদেশি সিগারেট।'

'বিদেশি কী সিগারেট।'

'ধরেন ডানহিল, বেনসন। মোড়ের দোকানে গিয়ে বললেই হবে—পীর সাহেবের সিগ্রেট। ওরা জানে। বাজারের চেয়ে কম রেইটে পাবেন। যান সিগ্রেট নিয়ে আসেন। পীর সাহেবকে কদমবুসি করে সিগ্রেটের প্যাকেটটা বাম দিকে রাখবেন।'

সবুর মিয়া সিগ্রেট আনতে গেল আর তখনি বাড়ির ভেতর থেকে পীর সাহেব খালি পায়ে বের হয়ে এলেন। বারান্দায় এবং উঠানে এতগুলো লোক বসা, কাউকে কিছু না বলে হীরুকে হাত ইশারা করে ডাকলেন। হতভম্ব হীরু ছুটে গেল। পীর সাহেব বললেন, 'তুই বিসমিল্লাহ বলে একটা ব্যবসা শুরু কর। ব্যবসায় তোর তরক্কি হবে। স্বয়ং নবী করিম (সাঃ) ব্যবসা করতেন।' হীরু কাঁপা গলায় বলল, 'কিসের ব্যবসা করব?' পীর সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন,'তোর ব্যবসা হবে গরম জিনিসের। একটা চায়ের দোকান দিয়ে দে।' এই বলেই পীর সাহেব আবার ঘরে ঢুকে গেলেন। আর কি আশ্চর্য যোগাযোগ—তার পরদিনই সে কল্যাণপুরের বশীর মোল্লার চায়ের দোকানে চা খেতে গেছে, বশীর মোল্লা বলল, 'দোকান বেচে দিব হীরু ভাই। খদ্দের যদি পান একটু বলবেন।'

হীরু গম্ভীর হয়ে বলল, 'বেচবেন কেন? চালু দোকান।'

'চালু কোথায় দেখলেন? দিনে পঞ্চাশ কাপ চা বেচতে পারি না। বিশ-পঁচিশ কাপ পাড়ার ছেলেরা খায়। দাম চাইলে বলে খাতায় লিখে রাখেন।'

'দাম কত চান দোকানের?'

'দশ হাজার পাইলে রাখমু না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দশ হাজার? দোকানে আপনার আছে কি? দুইটা কেতলি, পনের-বিশটা কাপ। হাজার তিনেক হলে আমাকে বলবেন ক্যাশ দিয়ে নিয়ে যাব। নো প্রবলেম।'

বশীর মোল্লা আর কিছু বলল না। চিন্তিত মুখে দাঁত খুঁচাতে লাগল। এই সবই হচ্ছে যোগাযোগ। এরকম যোগাযোগ আপনা-আপনি হয় না। ওপরের নির্দেশ লাগে। পীর সাহেবের দোয়ায় অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে। এঁরা হচ্ছেন অলি মানুষ—এঁদের দোয়া কোরামিন ইনজেকশনের মতো। সঙ্গে-সঙ্গে অ্যাকশন।

হীরুর ইচ্ছা ছিল টাকা চাওয়ার উপলক্ষে পুরো ঘটনাটা তিথিকে বলবে। তিথি সেই সুযোগ দিল না। পীর সাহেবের দোয়ার ফল তো সে একা ভোগ করবে না। সবাই মিলে ভোগ করবে। তার টাকা-পয়সা হলে সে কি ভাইবোন ফেলে দেবে? অবশ্যই না। ভাই-বোন, ফাদার-মাদার এরা থাকবে মাথার ওপরে।

১৩

ফরিদার চোখ দু'টি আজ যেন আরো উজ্জ্বল আরো তীক্ষ্ণ। চুলার গনগনে কয়লার মতো ঝকঝক করছে। তাঁর পরনের শাড়িটাও লাল। মাথার চুলগুলোও কেন জানি লালচে দেখাচ্ছে। শুধু মুখের চামড়া আরো হলুদ হয়েছে। এমন হলুদ যে মনে হয় হাত দিয়ে ছুঁলে হাতে হলুদ রঙ লেগে যাবে। ফরিদা বললেন, 'বস তিথি। চেয়ার টেনে বস।'

তিথি বলল, 'আপনি আমাকে ডেকেছেন?'

ফরিদা চুপ করে রইলেন তবে খুব আগ্রহ নিয়ে তিথির দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর জ্বলজ্বলে চোখের মণিতে এক ধরনের কৌতুক। এক সময় হাসিমুখে বললেন, তুমি কি চোখে কাজল দিয়েছ না-কি?'

তিথি শান্ত স্বরে বলল, 'হ্যাঁ দিয়েছি। কেন, আমার মতো মেয়ের কি চোখে কাজল দেয়া নিষেধ?'

ফরিদা তিথির প্রশ্নের প্রতি মোটেই গুরুত্ব দিলেন না। নিজের মনে বললেন, 'বিয়ের আগে আমারও চোখে কাজল দেয়ার শখ ছিল। খুব কাজল দিতাম। একদিন আমার মামা আমাকে বললেন, চোখে কাজল দেয়া ঠিক না। কাজল হচ্ছে কারবন। কারবনের সূক্ষ্ম কণা চোখের ক্ষতি করে। ঐ মামার কথা আমরা খুব বিশ্বাস করতাম...'

তিথি ফরিদাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি আমাকে কী জন্যে ডেকেছেন?'

'গল্প করার জন্যে। কেন তুমি কি রাগ করছ? আমি পুষিয়ে দেব।'

'কীভাবে পুষিয়ে দেবেন? গল্পের শেষে টাকা দেবেন ঘন্টা হিসেবে?'

ফরিদা হেসে ফেললেন। যেন তিথি খুব মজার কিছু বলেছে। তিথি বিস্মিত হল। ফরিদা কেন হেসে ফেলেছে তা বুঝতে না পেরে খানিকটা বিব্রতও বোধ করল।

ফরিদা বললেন, 'ঐদিন তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ। তারপর থেকে আমার মনটা খারাপ ছিল। নিজের পরিচিত মানুষজন, আত্মীয়স্বজন যদি রাগ করে খারাপ লাগে না। তুমি বাইরের একটি মেয়ে। তুমি কেন আমার ওপর রাগ করবে?'

'আপনি কি এটা বলার জন্যে ডেকেছেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ। আমার আরেকটা উদ্দেশ্যও আছে। সেটা তোমাকে পরে বলছি। তার আগে তোমার জন্যে একটা ধাঁধা আছে। এখানে একটা ছবি আছে। এই ছবিতে তিনটি মেয়ে বসে আছে। এই তিনজনের একজন আমি। সেই একজন কে তুমি বের করে দেবে।'

'যদি বের করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই টাকা-পয়সা দেবেন?'

'তুমি চাইলে দেব কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে এমন কঠিন ভাষায় কথা বলছ কেন? খানিকক্ষণ সহজভাবে আমার সঙ্গে কথা বল। অসুস্থ একজন মানুষের এই কথাটা রাখ।'

তিথি ছবিটা হাতে নিল। দেখেই মনে হচ্ছে তিন স্কুল বান্ধবী কোনো উপলক্ষে প্রথম শাড়ি পরেছে। তিন জনই হাত ধরাধরি করে বসে আছে। পেছনে গোলাপ ঝাড়ে অনেক গোলাপ ফুটে আছে। ফটোগ্রাফার নিশ্চয়ই ভেবেচিন্তে এই কম্পোজিশন বের করেছেন।

'দেরি করছ কেন? বল কোন্ মেয়েটি আমি?'

'বলতে পারছি না।'

'মেয়েগুলো দেখতে কেমন?'

'রূপবতী।'

'কী রকম রূপবতী সেটা বল।'

'খুবই রূপবতী।'

'এই তিনটি মেয়ের মধ্যে আর কোনো মিল দেখতে পাচ্ছ?'

'না।'

'খুব ভালো করে দেখ। আলোর কাছে নিয়ে দেখ।'

'আমি আর কোনো মিল দেখতে পাচ্ছি না। তিনটি মেয়ের মুখ তিন রকমের।'

'আরেকটা মিল আছে। এই তিন জনের চিবুকের কাছে তিল আছে। ছবিতেও বোঝা যায় আমরা খুব বন্ধু ছিলাম। গলায়-গলায় বন্ধু। ধর আমাদের মধ্যে একজনের অসুখ হয়েছে সে স্কুলে যায় নি। আমরা দু'জন স্কুলে গিয়ে যখন দেখতাম একজন আসে নি তখন আমরাও স্কুল ফেলে বাসায় চলে আসতাম।'

'আপনাদের চিবুকে তিল ছিল বলেই আপনাদের এত বন্ধুত্ব ছিল?'

'শুধু তিল না আরো অনেক মিল ছিল আমাদের মধ্যে। আমরা তিন জনেই বেশ ভালো ছাত্রী ছিলাম। এক জন তো ছিল খুবই ভালো। স্কুলে বরাবর ফার্স্ট সেকেন্ড হত। অথচ ম্যাট্রিক রেজাল্ট বের হলে দেখা গেল তিন জনই সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছি।'

'তাই নাকি?'

'কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময়ই তিন জনের বিয়ে হয়ে গেল। তার পরেও মিল আছে। বল তো মিলটা কী?'

'আপনারা তিন জনই এখন অসুস্থ?'

'না। দু'জন মারা গেছে। আমি শুধু বেঁচে আছি। এই বাঁচা তো মৃতের মতোই। তাই না?'

'হ্যাঁ তাই! আপনার ঐ দুই বান্ধবী কীভাবে মারা গেলেন?'

'প্রথম মারা গেল তৃণা। বাচ্চা হতে গিয়ে মারা গেল। তারপর মারা গেল বরুণা। ম্যানিনজাইটিস হয়েছিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলতে বলতে ফরিদা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। হাতের ইশারায় তিনি তিথিকে পানির গ্লাস আনতে বললেন। তিথি পানি এনে দিল। সবটা খেতে পারলেন না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন। তিথি বলল, 'আপনার কি কষ্ট হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'কোনো ওষুধপত্র কি আছে যা খেলে কষ্ট কমবে?'

'না।'

'আমি কি চলে যাব? নাকি আপনি আমাকে আরো কিছু বলবেন?' ফরিদা চোখ না মেলেই বললেন, 'যাও।' তিথি বলল, 'আপনার কি খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে?'

'হুঁ।'

'আমি বরং আপনার পাশে বসে থাকি। ব্যথা যখন আরেকটু কমবে তখন যাব।'

'ব্যথা কমবে না। তুমি যাও।'

তিথি উঠে দাঁড়াতেই ফরিদা বললেন, 'একটু বস।' তিথি বসল না দাঁড়িয়েই রইল। ফরিদা চোখ মেলে তাকালেন। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, 'তোমার নিজের চিবুকেও তিল আছে—এটা কি তুমি কখনো লক্ষ করেছ?' তিথি কিছু বলল না। ফরিদা কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'তোমার ভাগ্যও আমার মতোই হবে।'

'হলে কি আপনি খুশি হন?'

'না খুশি হই না।'

তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন। তাঁর বন্ধ চোখের পাতা উপচে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। মানুষের মন বড় বিচিত্র। তিথি ফরিদার চোখের পানি দেখে হঠাৎ অভিভূত হয়ে গেল। তার নিজের বুক ঠেলে কান্না উঠে আসতে লাগল।

ফরিদা বললেন, 'তুমি কি একটু অজন্তার বাবাকে ডেকে আনবে? পাঁচটার মধ্যে সে আসে। এখন পাঁচটা দশ বাজে। সে নিচে আছে।' তিথি দবির উদ্দিনকে পেল না। বসার ঘরে অজন্তা একা-একা বসে ছিল। সে বলল, 'বাবা ছিলেন, আপনি এসেছেন শুনে শার্ট গায়ে দিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন।' বলতে বলতে অজন্তা মুখ টিপে হাসল। এবং একটু যেন লজ্জাও পেল। এই লজ্জার কারণ তার নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়।

১৪

ভাদ্র মাসের শুরুতে অরু এসে উপস্থিত। হাতে একটা স্যুটকেস। তাকে নিয়ে এসেছে সদ্য গোঁফ ওঠা মুখচোরা ধরনের এক ছেলে। ভীতু চাউনি, একবারও মাথা উঁচু করে তাকাচ্ছে না। স্যুটকেস নামিয়ে রেখেই সে উধাও হয়ে গেল। মিনু বললেন, 'ব্যাপার কী রে?'

অরু মরাকান্না জুড়ে দিল।

কান্নার ফাঁকে ফাঁকে ভাঙা ভাঙা কথা থেকে যা জানা গেল তা হচ্ছে—স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সে পালিয়ে এসেছে। যে তাকে পৌঁছে দিয়েছে তার নাম সাঈদ। কলেজে আই কম পড়ে। পাশের বাড়িতে লজিং থাকে। মিনু কঠিন গলায় বললেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? পেটে ছয় মাসের বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে চলে এলি? তার আগে বিষ খেয়ে মরতে পারলি না। বাজারে বিষ পাওয়া যায় না?'

অরু শুকনো গলায় বলল, 'সব কিছু না শুনেই তুমি এই কথা বললে? বেশ, বিষ এনে দাও আমি খাব। সময় তো শেষ হয়ে যায় নি।'

জালালুদ্দিন বললেন, 'কী শুরু করলে মিনু, মেয়েটা একটু ঠাণ্ডা হোক। সব আগে শুনি। না শুনেই বকাঝকা।'

মিনু ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'সব কিছুর মধ্যে কথা বলবে না। কথা শোনাশুনির এখানে কি আছে? বোকার বেহদ্দ মেয়ে। পেটে ছ'মাসের বাচ্চা নিয়ে চলে এসেছে। কী সর্বনাশের কথা।

জালালুদ্দিন বললেন, 'একটা ব্যবস্থা হবেই। এত চিন্তার কী? বিপদ দেবার মালিক যিনি, বিপদ ত্রাণ করার মালিকও তিনি। তুমি এক কাপ গরম চা মেয়েটিকে দাও। মুড়ি থাকলে তেল-মরিচ দিয়ে মেখে দাও। অরু মা, তুই আয় আমার কাছে, ঘটনা কি শুনি।' মিনু বললেন,

'তোমাকে কোনো ঘটনা শুনতে হবে না।'

তিনি মেয়ে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'এখন বল কী হয়েছে? তোর এত বড় সাহস কেন হল শুনি।' অরু কিছুই বলল না, মাকে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। সমস্ত দিনেও এই কান্না থামল না।

তিথি এল চারটার দিকে। তিথিকে দেখে অরুর কান্না আরো বেড়ে গেল। জালালুদ্দিন বললেন, 'মেয়েটা কিছুই খায় নি। তিথি মা দেখ তো কিছু খাওয়াতে পারিস কি-না। বিরাট সমস্যা হয়ে গেল। বেশি কান্না ভালো না। চোখের ক্ষতি হয়।'

হীরু এল সন্ধ্যার আগে আগে। সে কিছু না শুনেই খুব লাফঝাঁপ দিতে লাগল—দুলাভাই বলে রেয়াত করব না। চটি জুতা দিয়ে পিটিয়ে চামড়া ঢিলা করে দেব। দাঁত সব ক'টা খুলে ফেলব। শালাকে ডেনটিস্টের কাছে গিয়ে দাঁত বাঁধতে হবে।' তিথি এসে ধমক দিয়ে হীরুকে থামাল। এবং বুঝিয়ে সুঝিয়ে টেলিগ্রাম করতে পাঠাল। টেলিগ্রাম করা হবে আব্দুল মতিনকে। সেখানে লেখা থাকবে—"অরু এখানে আছে। চিন্তার কোনো কারণ নাই।"

হীরু টেলিগ্রাম করে টাকা নষ্ট করার তেমন কোনো প্রয়োজন অনুভব করল না। বললেই হবে—টেলিগ্রাম করা হয়েছে। চিঠি যদি মিস হতে পারে তাহলে টেলিগ্রামও হতে পারে। বর্তমানে হাত একেবারেই খালি। টেলিগ্রাম উপলক্ষে পাওয়া বিশ টাকার নোটটা কাজে লাগবে। হীরু চলে এল ঢাকা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে।

এ্যানার মা চারদিন হল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বেশিরভাগ সময় রাতে এ্যানা তার সঙ্গে থাকে। ভাগ্য ভালো হলে আজও হয়ত সেই আছে।

অবশ্যি হাসপাতালে গিয়েও লাভ হবে না। ভদ্রমহিলার এখন-তখন অবস্থা। সারাক্ষণই নাকে অক্সিজেনের নল ফিট করা। মাকে এই অবস্থায় ফেলে মেয়ে নিশ্চয়ই তার সঙ্গে বকবক করবে না। তবু চেষ্টা করতে তো দোষ নেই।

ফিমেল ওয়ার্ডের দোতলায় জানালা ঘেঁষে এ্যানার মার বেড। ফিমেল ওয়ার্ডে যাবার ব্যাপারে খানিকটা কড়াকড়ি আছে। হীরুর তেমন সমস্যা হল না। কলাপসেবল গেটের দারোয়ানকে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'ভাই আমার মা ছিলেন হাসপাতালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারা গেছেন—এ রকম সংবাদ পেয়ে এসেছি। একটু যদি কাইন্ডলি...

হাসপাতালের লোকজনও মৃত্যুর খবরে বিচলিত হয়। দারোয়ান তাকে ছেড়ে দিল। হীরু চলে এল দোতলায়। আশ্চর্য ব্যাপার—এ্যানা বারান্দাতেই আছে! রেলিং-এ ভর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কাঁদছে নাকি? তার মার কি ভালো-মন্দ কিছু হয়ে গেল? তেমনি কিছু হলে চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তোলার কথা। হাসপাতালে বোধ হয় সে রকম কিছু করার নিয়ম নেই।

'এই এ্যানা?'

এ্যানা চমকে তাকাল। বিরক্ত গলায় বলল, 'আবার হাসপাতালে চলে এসেছেন? পরশু দিন না বললাম হাসপাতালে আসবেন না।'

'তোমার কাছে তো আসি নি। আমার এক ক্লোজ ফ্রেন্ড ইমতিয়াজ, ব্যাটার হঠাৎ পেটে ব্যথা, অ্যাপেনডিসাইটিস-ফাইটিস হবে। হাসপাতালে নিয়ে এসেছি, ব্যাটার এখন অপারেশন হচ্ছে। অপারেশন হওয়া পর্যন্ত থাকতে হবে। কাজেই ভাবলাম খোঁজ নিয়ে যাই। তোমার মা, তার মানে বলতে গেলে আমারো মা।'

'আপনার মা হবে কেন? কি-সব উল্টাপাল্টা কথা বলেন! এইসব আর বলবেন না। রাগে গা জ্বলে যায়।'

'উনি আছেন কেমন?'

'তা দিয়ে আপনার দরকার কি? মার খোঁজে তো আপনি আসেন নি।'

'তোমার মার খোঁজে আসি নি—তাহলে এলাম কেন?'

'এসেছেন আমাকে বিরক্ত করতে।'

হীরু অতি দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল, নিচু গলায় বলল, 'এখানে সিগারেট খাওয়া যায় এ্যানা?'

'না, খাওয়া যায় না। আপনি এখন চলে যান তো।'

'তুমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'মা ঘুমুচ্ছে তাই দাঁড়িয়ে আছি।'

'তুমি ঘুমাও কোথায়?'

'ঘুমাবো আবার কোথায়? এখানে কেউ কি আমার জন্যে বিছানা করে রেখেছে?'

'সারা রাত জেগে থাক?'

'হুঁ, অনেকেই বারান্দায় চাদর পেতে ঘুমায়। আমি পারি না। ঘেন্না লাগে।'

বলতে বলতে এ্যানা হাই তুলল। বেচারীর শরীর খারাপ হয়ে গেছে, ভেজাভেজা চোখ। মুখ শুকিয়ে কেমন হয়ে গেছে। হীরুর মনটা মায়ায় ভরে গেল। সে কোমল গলায় বলল, 'চা খাবে নাকি এ্যানা?'

'কী-সব কথাবার্তা আপনার। এখানে চা খাব কোথায়? এটা কি রেস্টুরেন্ট?'

হাসপাতালের গেটের ভেতর এক বুড়ো চা বিক্রি করছে। চা খেলে তোমার রাত জাগতে সুবিধা হবে। চল না।'

'এক কাপ চা খেলেই আপনি চলে যাবেন?'

'চলে যাব না তো কি? আমার ঐ ফ্রেন্ডের অপারেশনের কী হল খোঁজখবর করে বাসায় যেতে হবে। বিরাট সমস্যা বাসায়। আমার বড় বোন পালিয়ে চলে এসেছে। হেভি ক্রাইং হচ্ছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনার বাসাটা তো খুব অদ্ভুত। সব সময় কেউ পালিয়ে যাচ্ছে। কিংবা পালিয়ে আসছে।'

হীরু এর উত্তর দিল না। তার বড় ভালো লাগছে। রাতের বেলা এ্যানাকে পাশে নিয়ে চা খাওয়া, এত আনন্দ সে রাখবে কোথায়? মেয়েটা যে তার দিকে কী রকম 'উইক' এই ঘটনায় তাও প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। এক কথায় চা খেতে চলল। এদিকে তার মা এখন–তখন অবস্থা। মুখে অবশ্যি এই মেয়ে সারাক্ষণ উল্টো কথা বলছে। তা বলুক, এটা মেয়েছেলের ধর্ম। সোজা কথা সোজাভাবে বললে আর মেয়েছেলে রইল কোথায়?

চায়ে চুমুক দিয়ে এ্যানা বলল, 'চা–টা তো ভালো।' হীরু দরাজ গলায় বলল, 'ভালো লাগলে আরেক কাপ খাও।'

এ্যানা হেসে ফেলল। এত সুন্দর লাগল মেয়েটার হাসিমুখ। আজ আবার শাড়ি পরেছে। ছাপা শাড়ি। পরীর মতো লাগছে দেখতে। আল্লাহতালা মেয়েগুলোকে এত সুন্দর করে পাঠিয়েছেন কেন কে জানে। মেয়েদের সবই সুন্দর। এরা রাগ করলেও ভালো লাগে, অপমান করলেও ভালো লাগে। ভালবাসার কথা বললে কেমন লাগবে কে জানে। এ্যানার মুখ থেকে ভালবাসার একটা কথা শুনতে ইচ্ছা করে।

'এ্যানা।'

'বলুন কী বলবেন?'

'আমি নিজে চায়ের দোকান দিচ্ছি। ভেরি সুন।'

'খুব ভালো।'

'নাম একটা মনে মনে ঠিক করে রেখেছি এখনো ফাইন্যাল করি নি। নাম হচ্ছে—এ্যানা টি স্টল।'

এ্যানা চায়ে চুমুক দিয়েছিল। হঠাৎ হাসি এসে যাওয়ায় বিষম খেল। হীরু অপ্রস্তুত গলায় বলল 'হাসির কি হল?'

'কিছু হয় নি, এম্নি হাসছি।'

'পীর সাহেবের কথামতো দিচ্ছি। পীর সাহেব বলে দিলেন।'

'চায়ের দোকান দিতে বললেন?'

'হুঁ।'

'পীর সাহেবের কথা ছাড়া আপনি কিছুই করেন না?'

'না।'

'তাহলে উনার কাছে আমি একদিন যাব।'

হীরু উৎসাহিত হয়ে উঠল। উৎসাহটা প্রকাশ করল না। মেয়েটা ঠাট্টা করছে কি–বুঝতে পারল না। ঠাট্টা হবারই সম্ভাবনা।

'উনার কাছে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে যেতে হবে তাই না?'

'হুঁ। টাকা–পয়সা নেন না। টাকা–পয়সা উনার কাছে তেজপাতা।'

'দিনে ক' প্যাকেট সিগারেট পান?'

'অনেক। ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ।'

'একটা মানুষ কি এত সিগারেট খেতে পারে?'

হীরু সাবধান হয়ে গেল। প্রশ্ন কোন দিকে যাচ্ছে বুঝতে পারল না। এই মেয়ে বড়ই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধুরন্ধর। এই মেয়েকে বিয়ে করলে জীবনটা শেষ হয়ে যাবে।

এ্যানা বলল, 'আপনার পীর সাহেব এই সব সিগারেট বাজারে বেচে দেয়। এখন বুঝলেন ব্যাপারটা? পঞ্চাশ প্যাকেট সিগারেট একটা লোক খেতে পারে না, তাই না?'

'পীর–ফকির সম্পর্কে সাবধানে কথা বলবে এ্যানা। কখনো ফট করে বদদোয়া করলে লেগে যাবে।'

'লাগুক।'

এ্যানা চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। হীরুর বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। এখন নিশ্চয়ই চলে যাবে। ইশ আরো খানিকক্ষণ যদি আটকে রাখা যেত।

এ্যানা গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। তারও সম্ভবত রুগ্ন মায়ের পাশে সারাক্ষণ থাকতে ভালো লাগে না।

'আপনার চায়ের দোকান কবে স্টার্ট হচ্ছে?'

'শিগগিরই—ক্যাপিটেলের অভাবে আটকা পড়ে আছে। হাজার পাঁচেক টাকা পেলেই ধাঁ করে বেরিয়ে যেতাম।'

'টাকার জোগাড় হচ্ছে না?'

'হয়ে যাবে। পীর সাহেব বলে দিয়েছেন। ঐ নিয়ে চিন্তা করি না।'

'আপনি এত বোকা কেন?'

হীরু আহত চোখে তাকিয়ে রইল। রাগ হবার কথা। কিন্তু রাগ লাগছে না। মনটা খারাপ হয়ে গেছে। চোখে পানি এসে যাচ্ছে। এ্যানা বোধ হয় ব্যাপারটা টের পেল। সে কোমল গলায় বলল, 'আরেক কাপ চা খাব?'

হীরুর মন খারাপ ভাবটা সঙ্গে–সঙ্গে কেটে গেল। সে মনে–মনে বলল, 'অসাধারণ মেয়ে। অসাধারণ। এই মেয়ে পাশে থাকলে চোখ বন্ধ করে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়া যায়। বাঘের মুখের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দেয়া যায়।'

এ্যানা চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলব।'

'কি কথা?'

'আমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।'

'কী বলছ এই সব।'

'মার খুব ইচ্ছা। মরবার আগে মেয়ের বিয়ে দেখতে চায়।'

'তোমার বড় বোনেরই তো বিয়ে হয় নি?'

'ওদের সম্বন্ধ আসে না। আমার এসেছে। ছেলে আরব বাংলাদেশ ব্যাংকে কাজ করে। অফিসার। বড় অফিসার। আগে একটা বিয়ে করেছিল। বউ মরে গেছে। ছেলেপুলে কিছু নেই।'

'এইসব পাগলামি চিন্তা একদম করবে না। স্টপ। কমপ্লিট স্টপ।'

এ্যানা তরল গলায় বলল, 'কষ্ট করতে ভালো লাগে না। বড়লোকের বউ হতে ইচ্ছা করে। রোজ গাড়ি করে ঘুরব।'

'ঠাট্টা করছ, তাই না?'

'ঠাট্টা ভাবলে ঠাট্টা। আমি এখন যাচ্ছি। মার বোধ হয় ঘুম ভেঙেছে। ঘুম ভেঙে আমাকে না দেখলে পাগলের মতো হয়ে যায়।'

'বিয়ের ব্যাপারটা ঠাট্টা না সত্যি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঠাট্টা ভাবলে ঠাট্টা। সত্যি ভাবলে সত্যি।'

এ্যানা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে শাড়ির আঁচলে ঠোঁট মুছল। হীরুর দিকে না তাকিয়ে বলল, 'যাই।' হীরু কিছু বলতে পারল না। তার মনে হল সে ঠিকমতো নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। যতটা বাতাস তার দুই ফুসফুসের জন্যে দরকার ততটা বাতাস এখন নেই। চায়ের বুড়ো দোকানদারের সামনে হীরু দাঁড়িয়ে রইল, নড়ল না। তার কেবলি মনে হচ্ছে এক্ষুনি এ্যানা নেমে এসে বলবে—আপনার সঙ্গে তামাশা করছিলাম। আপনি এমন বোকা কেন? মেয়েদের কোনো কথা চট করে বিশ্বাস করতে নেই—বুঝলেন সাহেব।

এক ঘন্টা পার হল, এ্যানা নামল না। হীরুর মনে হল নির্ঘাত মার ঘুম ভেঙে গেছে। মাকে খাইয়ে-টাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে তারপর নামবে।

অপেক্ষা করতে করতে রাত এগারটা বাজল। এ্যানা নামল না।

চায়ের দোকানদার এক সময় বলল, 'আর কত চা খাইবেন? বাড়িত যান। চা বেশি খাওয়া ঠিক না। ভাইজান আপনের চা হইছে তেরটা। আপনের এগারটা আপার দুইটা। তের টাকা পাওনা।'

হীরু টাকা বের করে দিল। হাসপাতালের গেট পার হয়ে খোলা রাস্তায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একজন রিকশাওয়ালা বলল, 'স্যার ভাড়া যাবেন?' সে বিনা বাক্যব্যয়ে রিকশায় উঠে বসল। পরক্ষণেই নরম গলায় বলল, 'না আমি যাব না। ভাই আপনি কিছু মনে করবেন না। এক্সকিউজ করে দেন।'

রিকশায় উঠেই তার মনে হয়েছে, এ্যানা নেমে এসে তাকে না দেখে ফিরে যাচ্ছে। তার চেয়েও বড় কথা, এ্যানার মার যদি এই রাতে ভালোমন্দ কিছু হয় তাহলে তো বেচারী বিরাট প্রবলেমে পড়বে। এ্যানা তাকে যাই বলুক রাতটা তার থেকে যাওয়াই উচিত।

হীরু দ্বিতীয়বারে ফিমেল ওয়ার্ডে ঢুকতে পারল না। কলাপসেবল গেট অবশ্যি খোলা। দু'জন দারোয়ান সেখানে বসে আছে। তারা পাস না দেখে কাউকে ছাড়বে না। রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান ডিউটিতে আছেন। তিনি খুবই কড়া লোক। পাস ছাড়া কাউকে দেখলে তাদের না-কি চাকরি চলে যাবে।

হীরু রাত একটার দিকে হেঁটে-হেঁটে বাড়ি ফিরল। সারা পথ প্রতিজ্ঞা করতে করতে এল—এই জীবনে মেয়েছেলের সঙ্গে সে কোনো কথা বলবে না। মেয়েছেলের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে কাঁচা গু খাওয়া ভালো।

অরু বিছানা থেকে নেমে বারান্দায় গিয়ে বসল। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। অরুর চোখ আবার ভিজে উঠতে শুরু করল। বড় খারাপ লাগছে। সুমনের জন্যে বুকের মাঝখানে সন্ধ্যা থেকেই যন্ত্রণা হচ্ছিল। সেই যন্ত্রণা এখন তীব্র হয়ে তাকে অভিভূত করে দিচ্ছে।

সুমনের বয়স তিন। এই বয়সেই সে সব কথা বলতে পারে। তিনটা ছড়া জানে। তালগাছ ছড়াটা বলার সময় কেমন এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পুরো ছড়াটা সে এক পায়ে দাঁড়িয়ে বলতে চেষ্টা করে, শেষ পর্যন্ত অবশ্যি পারে না। ধুপ করে পড়ে যায়। তখন ছলোছলো চোখে বলে, 'আম্মা, তালগাছ ব্যথা দেয়।'

অরুকে তখন বলতে হয়, 'আহারে ময়না সোনা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনের মধ্যে কতবার যে ধুপ করে এসে তার কোলে বসবে মিষ্টি–মিষ্টি গলায় বলবে, 'আদর খাও আম্মা। আদর খাও।'

তখন অরুকে হামহুম করে আদর খাওয়ার ভঙ্গি করতে হয় আর হেসে লুটুপুটি খায় সুমন। হাসির মধ্যেই সুমন বলে, 'আরো আদর খাও আম্মা। আরো খাও।'

'তুমি বড় বিরক্ত করছ সোনামণি। এখন যাও খেলা কর।'

'না আম্মা তুমি আদর খাও।'

সুমনের ছোট হল রিমন। বয়স দেড় বছর। এমন শান্ত বাচ্চা এ পৃথিবীতে আর জন্মেছে বলে অরুর মনে হয় না। ক্ষিধে পেলেও কাঁদবে না। মুখে চুকচুক শব্দ করতে থাকবে। একবার খাইয়ে দিলে হাত–পা এলিয়ে ঘুমুবে কিংবা নিজের মনে খেলা করবে।

বিছানায় চার জনের এক সঙ্গে জায়গা হয় না। সুমন ঘুমায় তার দাদীর সঙ্গে। রাতের বেলা চুপিচুপি উঠে এসে অরুর পায়ের কাছে গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকে। একদিন দু'দিন না, এই কাণ্ড হয় রোজ রাতে। আজ বেচারা কার সঙ্গে ঘুমিয়েছে? ঘুম ভেঙে সে কি অরুকে খুঁজছে না?

অরুর চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল।

তিথি এসে অরুর সামনে দাঁড়াল। কোমল গলায় বলল, 'আপা।'

অরু চোখ তুলে তাকাল। কিছু বলল না। সে কান্না থামাতে চেষ্টা করছে, পারছে না। কান্না বন্যার জলের মতো বাঁধ দিতে চেষ্টা করলেই যেন বড় বেশি ফুলে ওঠে।

'এস আপা বিছানায় শুয়ে গল্প করি।'

অরু ধরা গলায় বলল, 'সুমনের জন্যে মনটা ভেঙে যাচ্ছে রে তিথি।'

'খুব বেশি খারাপ লাগলে ফিরে যাও।'

'না–রে ফিরে যাওয়া যাবে না।'

'এখানে থাকলে তুমি যে কষ্ট পাবে তারচে বেশি কষ্ট কি দুলাভাইয়ের ওখানে? ওখানে তো তোমার সুমন, রিমন আছে। এখানে কে আছে। আমরা তোমার কেউ না আপা। এস ঘুমুতে এস।'

অরু উঠে এল, এখন সে শান্ত। এখন আর কাঁদছে না। কাঁদারও হয়ত সীমা আছে। সীমা অতিক্রম করার পর কেউ কাঁদতে পারে না। সে শুয়েছে তিথির সঙ্গে। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে। আবার উঠে বসে। খাট থেকে নেমে বারান্দায় যায়, জলচৌকির ওপর গিয়ে বসে। তিথি এক সময় বলল, 'বড় বিরক্ত করছে আপা।'

'ঘুম আসছে না।'

'চুপচাপ শুয়ে থাক। ছটফট করে লাভ হবে কিছু?'

অরু ক্ষীণ গলায় বলল, 'এখানে এসে ভুল করেছি তাই না?'

'ভুল করেছ কি শুদ্ধ করেছ তা জানি না। কোন্‌টা ভুল কোন্‌টা ভুল না, তা এখন আর আমি জানি না।'

'তোরা সবাই বদলে গেছিস।'

তিথি তরল গলায় হেসে উঠল। অরু তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'হাসছিস কেন?'

'সিরিয়াস সিরিয়াস সময়ে আমার কেন জানি হাসি আসে।'

'তোর সম্পর্কে যেসব শুনি সেগুলো কি সত্যি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কি শোন?'

অরু চুপ করে রইল। তিথি বলল, 'মুখে আনতে লজ্জা লাগছে, তাই না? তোমার কি আমার সঙ্গে ঘুমুতে এখন ঘেন্না লাগছে? ঘেন্না লাগলে মায়ের সঙ্গে ঘুমাও।'

'যা শুনছি সবই তাহলে সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি।'

'বলতে তোর লজ্জা লাগল না?'

'না।'

'আমি হলে গলায় দড়ি দিয়ে মরে যেতাম।'

'না মরতে না। এই যে এত যন্ত্রণার মাঝ দিয়ে তুমি যাচ্ছ তুমি কি গলায় দড়ি দিয়েছ? দাও নি। বাঁচার চেষ্টা করছ। করছ না?'

অরু ক্ষীণ গলায় বলল, 'বাচ্চা দুটার জন্যে বেঁচে আছি। নয়ত কবেই...'

তিথি আবার হেসে উঠল। অরু বলল, 'হাসিস না।'

'আচ্ছা যাও হাসব না। তুমিও ঘুমাবার চেষ্টা কর।'

'ঘুম আসছে না।'

'আমার কাছে ঘুমের অষুধ আছে, খাবে? মাঝে-মাঝে আমি খাই। দুটা আস্ত বোতল আছে একেকটাতে বত্রিশটা করে ট্যাবলেট—এর পনেরটা খেলেই ঘুম হবে খুবই আনন্দের। খাবে আপা?'

অরু কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'ঠাট্টা করছিস তিথি? আমার এই অবস্থায় তুই ঠাট্টা করতে পারিস?'

'হ্যাঁ পারি। আমি যে কি পরিমাণ বদলে গেছি তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

'তুই আমাকে ফিরে যেতে বলছিস?'

'বলছি।'

'একটা ব্যাপার শুধু তোকে বলি তার পরেও যদি তোর মনে হয় আমার চলে যাওয়াই ভালো, আমি চলে যাব।'

'বেশ তো বল।'

অরু কিছু বলল না, চুপ করে রইল। তিথি বলল, 'বলতে যদি তোমার খারাপ লাগে তাহলে বলার দরকার নেই।'

'খারাপ লাগবে না, তুই শোন—কোনো-একজনকে বলা দরকার। কাকে বলব বল? আমার বলার লোক নেই।'

অরু খানিকক্ষণের জন্যে থামল। তারপর নিচু গলায় বলতে লাগল, 'তোর দুলাভাই যে খুব নামাজি মানুষ তা তো তুই জানিস? পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, তাহাজ্জুত পড়ে। রোজ ভোরবেলা আধঘন্টা কুরআন শরীফ পড়ে।

রাতের বেলা সে কখনো স্বামী-স্ত্রীর ঐ ব্যাপারটায় যাবে না। কারণ তাতে তার শরীর অপবিত্র হবে। গোসল করতে হবে, নয়ত ফজরের নামাজ হবে না। কাজেই সে ফজরের নামাজ শেষ করে কুরআন শরীফ পড়া শেষ করে আমার ঘুম ভাঙাবে। দিনের পর দিন এই যন্ত্রণা। শারীরিক সম্পর্কের মধ্যে কি প্রেম-ভালবাসা থাকতে নেই। তুই কি আমার যন্ত্রণা বুঝতে পারছিস তিথি?'

'পারছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরো শুনবি?'

'না।'

তিথি দু'হাতে বোনকে জড়িয়ে ধরল। দু'জন দীর্ঘ সময় বসে রইল চুপচাপ। এক সময় অরু বলল, 'বাচ্চা দুটাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব নারে তিথি। আমি কাল সকালে চলে যাব।'

তিথি কিছু বলল না। অনেকদিন পর তার কান্না পাচ্ছে, অনেক অনেক দিন পর।

১৫

ফরিদা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'কে?'

দরজার পাশ থেকে কে যেন সরে গেল। ফরিদা বললেন, 'ভেতরে এস অজন্তা।' অজন্তা ভয়ে-ভয়ে ভেতরে ঢুকল। তার গায়ে স্কুলের পোশাক, হাতে বই-খাতা এবং পানির ফ্লাস্ক। ফরিদা বললেন, 'স্কুলে যাচ্ছ?' অজন্তা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মাকে সে খুব ভয় পায়।

'তুমি আরেকটু কাছে আস তো। তোমাকে ভালো করে দেখি।'

অজন্তা পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল। ফরিদা বললেন, 'তুমি আগের চেয়ে একটু লম্বা হয়েছ তাই না?'

'হুঁ।'

'কত লম্বা হয়েছ জান সেটা? মেপেছ কখনো?'

'না।'

'তাহলে বুঝলে কী করে লম্বা হয়েছ?'

'জামাটা ছোট হয়েছে।'

'তাই তো, জামা ছোট হয়েছে। আজ তোমার বাবাকে বলবে কাপড় কিনে যেন দরজির দোকানে দিয়ে আসে।'

'আচ্ছা।'

'তুমি কি স্কুলে যাবার আগে রোজই আমার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাক?'

অজন্তা জবাব দিল না। মাথা নিচু করে ফেলল।

'আমি বেঁচে আছি কিনা তাই দেখ, ঠিক না?'

অজন্তা কথা বলল না, মাথাও তুলল না। তার খুব অস্বস্তি লাগছে।

মাকে কেন জানি একই সঙ্গে ভয় লাগে এবং ভালো লাগে। ফরিদা বললেন, 'আমি আরো মাসখানিক বেঁচে থাকব।'

অজন্তা এবার চোখ তুলে তাকাল। তার চোখে স্পষ্ট শংকার ছায়া। ফরিদা বললেন, 'তোমাকে আগেভাগে বললাম যাতে মনে মনে তৈরি হতে পার। এখন যাও।'

অজন্তা দরজা পর্যন্ত যেতেই ফরিদা বললেন, 'তোমার বাবাকে বলবে আজ যেন সে তোমাকে স্কুলে দিয়ে বাসায় চলে আসে। তার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে। বলবে মনে করে। আর নিচে খটখট শব্দ হচ্ছে কিসের দেখ তো। শব্দ আমার সহ্য হয় না, তবু সবাই মিলে এত শব্দ করে।' ফরিদা চোখ বন্ধ করে ক্লান্ত শ্বাস ফেললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দবির সাহেবের খুব অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। ফরিদা তাকে কী বলতে চায় এটা তিনি ঠিক আঁচ করতে পারছেন না। তিনি মেয়েকে কয়েকবারই জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কি বলেছে জরুরি কথা?'

অজন্তা বলল, 'হুঁ।'

'কী এমন জরুরি কথা তা তো বুঝলাম না।'

অজন্তা বলল, 'বাবা তুমি কি মাকে ভয় পাও?'

দবির সাহেব লজ্জা পেয়ে গেলেন। ভয় পান না এত বড় মিথ্যা মেয়েকে সরাসরি বলতে পারেন না। তার এই মেয়ে খুব বুদ্ধিমতী হয়েছে।

অজন্তাকে স্কুলে নামিয়ে চিন্তিত মুখে দবির সাহেব বাসার দিকে রওনা হলেন। তাঁর কেবলি মনে হতে লাগল, ফরিদা নিশ্চয়ই তিথির কথা তুলবে।

তিথি প্রসঙ্গে ফরিদা এখন পর্যন্ত তাঁকে কিছুই বলে নি। যদিও তিনি নিজ থেকে হড়বড় করে অনেক কিছু বলেছেন। ফরিদা চোখ বড়-বড় করে শুনেছে। কিছুই বলে নি। এটা ফরিদার স্বভাব। কোনো-একটা ঘটনা ঘটে যাবার অনেক দিন পর ফরিদা সেই প্রসঙ্গে কথা বলবে। মনে হয় দীর্ঘদিন সে ঘটনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। এক সময় স্থির সিদ্ধান্তে আসে। তখন কথা বলে। আজো কি সে কোনো সিদ্ধান্তে এসেছে?

'আসব ফরিদা!'

ফরিদা হেসে ফেলে বললেন, 'আমার ঘরে আসতে তো আগে কখনো অনুমতি নিতে না। আজ নিচ্ছ কেন? এস, বস।' দবির উদ্দিন শুকনো গলায় বললেন, 'তোমার শরীর কেমন?'

'ভালোই। খুবই ভালো।'

দবির উদ্দিন চিন্তিত মুখে ফরিদাকে লক্ষ করলেন—আজ তাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। চোখে-মুখে অস্বাভাবিক এক উজ্জ্বলতা। ফরিদা বললেন, 'আমি আর মাসখানিক আছি।'

'কী বললে বুঝলাম না।'

'আমি আর মাসখানিক তোমাকে বিরক্ত করব, তারপর তোমার মুক্তি।'

দবির উদ্দিন অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'কি যে তুমি বল।'

ফরিদা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'এখন পর্যন্ত আমি কি কখনো আজেবাজে কথা কিছু বলেছি?'

দবির উদ্দিন হ্যাঁ-না কিছু বলতে পারলেন না। ফরিদা মৃদু হাসলেন। পর মুহূর্তেই হাসি গিলে ফেলে বললেন, 'কী করে বুঝলাম এক মাস আছি তা তো জিজ্ঞেস করলে না।'

'কী করে বুঝলে?'

"আমার দুই বান্ধবীর কথা তোমাকে বলেছি না? কাল শেষ রাতে তারা আমার ঘরে এসেছিল। এসে বসল আমার পায়ের কাছে। তখন রাত চারটা দশ। আমার মনে আছে, ওরা ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে আমি ঘড়ি দেখলাম। ওরা বলল, 'ফরিদা তোকে ছাড়া আমাদের কেমন জানি একলা-একলা লাগে। তুই চলে আয়। আমরা তোকে নিতে এসেছি।' আমি বললাম, আমার নিজেরো এখানে থাকতে আর ভালো লাগছে না। তোরা এসেছিস ভালোই হয়েছে। তবে এখানকার কাজকর্ম গুছিয়ে তারপর যাব। তোরা এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাস পরে আয়। তারা বলল, 'আচ্ছা।"

দবির উদ্দিন বললেন, 'এইসব হচ্ছে স্বপ্ন। স্বপ্নে মানুষ কত কিছু দেখে, স্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামানো ঠিক না।'

'তুমি সব সময় বাজে কথা বল। আমি কী বলছি শোন—এটা স্বপ্ন না।'

'আচ্ছা বেশ, স্বপ্ন না।'

'আমি আমার মেয়েটার জন্যে চিন্তা করি। আমি মারা যাবার পর সে খুব কষ্টে পড়বে।'

'কষ্টে পড়বে না। ওকে আমি কী পরিমাণ ভালবাসি এটা তুমি জান না।'

'জানি। জানব না কেন! তুমি অজন্তার নামে এই বাড়িটা লিখে দাও। দলিল-টলিল করবে মিউটেশন করবে। সব ঝামেলা এক মাসের মধ্যে শেষ করবে।'

'তার কোনো দরকার আছে?'

'না থাকলে বলছি কেন?'

'তুমি যা চাও তাই হবে।'

ফরিদা চোখ বন্ধ করে ফেললেন। এতক্ষণ এক নাগাড়ে কথা বলে তিনি সম্ভবত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। চোখ মেললেন অনেকক্ষণ পরে। দবির উদ্দিন বললেন, 'আমি কি এখন চলে যাব? জরুরি কিছু কাজ ছিল।'

'আর খানিকক্ষণ বস। তোমাকে আরো একটা কথা বলা প্রয়োজন। আজই বলে ফেলি।'

'বল।'

'তিথিকে নিয়ে তুমি যে বের হয়েছিলে এতে আমি রাগ করি নি। মানুষ ফেরেশতা নয়। তুমি দিনের পর দিন একা কাটিয়েছ। শরীরের একটা দাবি তো আছেই। আমি কিছু মনে করি নি।'

'তিথির সঙ্গে কথা বলা ছাড়া আমি...'

'জানি। তবে কথা বলার বাইরে কিছু হলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। এই ব্যাপারটা আমার নিজেরই দেখা উচিত ছিল। দেখতে পারি নি।'

দবির উদ্দিন ক্ষীণ গলায় বললেন, 'এই প্রসঙ্গটা থাক।'

'থাকবে কেন? লজ্জা পাচ্ছ?'

'হুঁ।'

'লজ্জার কিছু নেই। তুমি তাকে নিয়ে বের হতে যদি লজ্জা না পাও কথা বললে লজ্জা পাবে কেন? তাছাড়া তোমাকে লজ্জা দেবার জন্যেও বলছি না। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা উচিত তাই আলোচনা করছি।'

'বেশ আলোচনা কর।'

দবির উদ্দিন মাথা নিচু করে ফেললেন, ফরিদা এই দৃশ্য দেখে কেন জানি হেসে ফেললেন।

'তুমি কি আমাকে পাশ ফিরিয়ে দিবে? এখন আর নিজে-নিজে পাশ ফিরতে পারি না।'

দবির উদ্দিন স্ত্রীকে পাশ ফিরিয়ে দিলেন। ফরিদা বললেন, 'তুমি যখন লজ্জা পাচ্ছ তখন ঐ প্রসঙ্গ থাক। তোমাকে লজ্জা দিতে ইচ্ছা করছে না। বরং অন্য একটা প্রসঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলি।'

'বল।'

'আমি সংসারের খরচ থেকে কিছু টাকা আলাদা করে রাখতাম এটা তুমি নিশ্চয়ই জান?'

'জানি।'

'পরশু হিসাব করলাম। আমার ধারণা ছিল অনেক টাকা হয়েছে। আসলে অনেক হয় নি। অল্পই জমেছে—'

'তোমার টাকার দরকার থাকলে বল আমি তোমাকে দিচ্ছি।'

'কথা শেষ করার আগেই তুমি কথা বল কেন? বড় বিরক্ত লাগে। যা বলছিলাম শোন, আমি পরশুদিন দেখি মাত্র এগার হাজার তিন শ' তেত্রিশ টাকা জমেছে। এই টাকাটা দিয়ে কী করা যায় বল তো?'

'কী করতে চাও?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারলে কি তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম।'

'অজন্তাকে দিয়ে দাও।'

'না! ওকে যা দেবার তুমিই দেবে, আমি এই টাকাটা তিথিকে দিতে চাই।'

দবির উদ্দিন এই কথায় তেমন বিস্মিত হলেন না। তাঁর কেন যেন মনে হচ্ছিল ফরিদা এই কাজটিই করবে। তিনি বললেন, 'ও তোমার টাকা নেবে না।'

'কেন নেবে না?'

'তা জানি না। তবে সে যে নেবে না—এইটুকু জানি।'

'আমারও তাই ধারণা। তবে ও যেন নেয় সেই ব্যবস্থা সহজেই করা যায়।'

'কীভাবে?'

'আমি মরবার পর তুমি যদি তাকে বল টাকাটা আমি তার জন্যে রেখে গেছি, তাহলে সে একটা সমস্যায় পড়বে। জীবিত মানুষের কথা আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি মৃত মানুষের কথা পারি না। তাছাড়া আমি তাকে একটা চিঠিও লিখে রেখে যাব। তুমি খুব দামি কিছু কাগজ কিনে এনো তো।'

'দামি কাগজ লাগবে কেন?'

'শেষ চিঠিটা দামি কাগজে লিখতে ইচ্ছা করছে।'

'বেশ, আনব দামি কাগজ। এখন তাহলে উঠি?'

'না, আরেকটু বস।'

ফরিদা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন। দবির উদ্দিন অস্বস্তি বোধ করছেন। তাঁর কাছে ফরিদার দৃষ্টি খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। তার চোখ তো এত উজ্জ্বল কখনো ছিল না। ফরিদা বললেন, 'চিঠিটা লিখব কী করে বল তো? আমি তো হাতই নাড়তে পারি না।'

'আমি লিখে দেব।'

ফরিদা হাসলেন। প্রথমে মৃদু স্বরে, পরক্ষণেই সেই হাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। দবির উদ্দিন হাসির কারণটা ধরতে পারলেন না। তার কাছে মনে হচ্ছে এই হাসি স্বাভাবিক মানুষের হাসি না—একজন অসুস্থ মানুষের হাসি।

ফরিদা বললেন, 'তুমি আমার হাতটা একটু ধর তো, দেখি কীভাবে হাত ধর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী বললে?'

'আমার হাতটা একটু ধর।'

দবির উদ্দিন, ফরিদার হাতে হাত রাখলেন। রোগশীর্ণ পাণ্ডুর হাত। নীল শিরাগুলো পর্যন্ত ফুটে রয়েছে। ফরিদা অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'কারণে অকারণে তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, তুমি কিছু মনে করো না।'

ফরিদার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

১৬

টুকু অরুকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছে।

যাচ্ছে বাসে। অরু বসার জায়গা পেয়েছে। টুকু তার পাশেই হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে। অরু বলল, 'টুকু তুই আমার কোলে বোস।'

টুকু খুব লজ্জা পেল। কারো কোলে বসে যাবার বয়স কি আছে? তার বয়স বাড়ছে— এই কথাটা কারোরই মনে থাকে না। টুকুর প্যান্টের পকেটে স্টার সিগারেটের প্যাকেটে তিনটা সিগারেট পর্যন্ত আছে। এই খবর জানতে পারলে আপার নিশ্চয়ই খুব মন খারাপ হবে।

দাউদকান্দিতে পৌঁছাবার পর টুকু বসার জায়গা পেল। অরুর পাশের বৃদ্ধা নেমে গেছেন। অরু বলল, 'তুই জানালার পাশে বসবি টুকু?'

'না।'

'আয় না বোস, সুন্দর দেখতে-দেখতে যাবি।'

'তুমি দেখতে-দেখতে যাও।'

আপার দিকে তাকাতে টুকুর বড় ভালো লাগছে। ফিরে যাবার আনন্দে আপার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে আছে, কেমন ছটফট করছে—আনন্দ ধরে রাখতে পারছে না।

অরু নিচু গলায় বলল, 'টুকু তোর কি মনে হয়, আমাদের দেখলে তোর দুলাভাই রাগারাগি করবে?'

'জানি না আপা।'

'কিছু তো করবেই। পুরুষ মানুষের এম্নিতেই রাগ বেশি থাকে। তোকে হয়ত কিছু বকাঝকা দিবে, তুই কিছুই মনে করিস না।'

'আমি কিছু মনে করি না।'

'মনে না করাই ভালো। এত কিছু মনে পুষে রাখলে সংসার চলে না।'

'কথা বলো না আপা। সবাই শুনছে।'

অরু চুপ করে গেল, কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ থাকতে পারল না। ফিসফিস করে বলল, 'সুমন আমাকে দেখলে কী করবে আন্দাজ কর তো টুকু?'

টুকু জবাব দিল না। অরু বলল, 'প্রথম এরকম ভান করবে যে আমাকে চিনতে পারছে না। ওর এই স্বভাব। তার বাবা একবার তিন দিনের জন্যে বাইরে গিয়েছিল, ফিরে আসার পর সুমন এমন ভাব করেছে যেন বাবাকে চেনে না অথচ ঠিকই চিনেছে। রিমন আবার ঠিক তার উল্টো। শব্দ পেলেই ঝাঁপ দিয়ে কোলে পড়বে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপা চুপচাপ বস তো।'

'রিমনের শার্টটা ছোটই হয় কিনা কে জানে। সুমনের জন্যে একটা পাঞ্জাবি কিনেছি আর রিমনের জন্যে শার্ট। একটু বড় কেনার দরকার ছিল। ওদের কাপড়গুলো তুই দেখেছিস?'

'না।'

'দেখবি?'

'এখন দেখব না আপা। আর তুমি এত কথা বলছ কেন?'

'কেউ তো আর শুনতে পারছে না, ফিসফিস করে বলছি।'

'চুপচাপ বসে থাক আপা, ঘুমুবার চেষ্টা কর।'

'দূর বোকা, বাসে কেউ ঘুমায়?'

তারা বাড়িতে পৌঁছল সন্ধ্যার ঠিক আগে–আগে। আব্দুল মতিনের সঙ্গে দেখা হল বাংলাঘরের সামনে। সে মাগরেবের নামাজের জন্যে অজু করছিল। মতিন কড়া গলায় বলল, 'কে?'

টুকু বলল, 'দুলাভাই আমরা।'

'আমরা। আমরাটা আবার কে?'

'আপাকে নিয়ে এসেছি দুলাভাই।'

'কে আনতে বলেছে?'

অরু নিচু গলায় বলল, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে–দাঁড়িয়ে বকাবকি করছ কেন? ঘরে যাই তারপর...'

'এ দেখি ফড়ফড় করে কথাও বলে।'

টুকু বিস্মিত গলায় বলল, 'এইসব কী বলছেন দুলাভাই?'

আব্দুল মতিন খেঁকিয়ে উঠল, 'চামচিকা দেখি আমাকে ধমক দেয়। দূর হ হারামজাদা।'

টুকু হতভম্ব হয়ে গেল। হৈচৈ শুনে লোকজন জড়ো হয়েছে। ভেতর থেকে অরুর এক মামাশ্বশুর বের হয়েছেন। তিনি কোনো কথা বললেন না। সুমন তার গলা জড়িয়ে ধরে আছে এবং ভীত চোখে তাকাচ্ছে তার বাবার দিকে। অরু অসহায় ভঙ্গিতে ছেলের দিকে এগিয়ে গেল। আব্দুল মতিন চেঁচিয়ে উঠল, 'এই কোথায় যাস তুই, খবর্দার।'

অরুর চোখে পানি এসে গেছে, সে গুছিয়ে কিছু চিন্তা করতে পারছে না। কি করবে সে? ছুটে গিয়ে তার স্বামীর পায়ে উপুড় হয়ে পড়বে। কিন্তু এত লোকজন চারদিকে জড়ো হচ্ছে—আহা, যদি কেউ না থাকত। অরু ফোঁপাতে–ফোঁপাতে বলল, 'তুমি এ রকম করছ কেন?'

'চুপ। চুপ।'

বয়স্ক অপরিচিত এক ভদ্রলোক বললেন, 'ভিতরে নিয়া যান। যা হওনের হইছে।' আব্দুল মতিন কঠিন গলায় বলল,'যেটা জানেন না সেটা নিয়া কথা বলবেন না। এর ছোট বোন বেশ্যাবৃত্তি করে—এটা জানেন?'

অরু জলভরা চোখে টুকুর দিকে তাকিয়ে বলল,'চল, চলে যাই।'

টুকু বলল, 'চল।'

অরু তার ছেলের দিকে তাকাল। সুমনের চোখে অপরিচিতের দৃষ্টি। যেন মাকে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিনতে পারছে না।

টুকু, বোনের হাত ধরল। কোমল গলায় বলল, 'চল আপা।' এতগুলো মানুষ তাদের চারপাশে—কেউ কিছুই বলল না।

রাত দু'টায় ঢাকা যাওয়ার একটা ট্রেন আছে। তারা স্টেশনে বসে রইল। টুকু ভেবেছিল আপা পুরোপুরি ভেঙে পড়বে। দেখা গেল অরু বেশ শক্তই আছে। টুকু বলল, 'কিছু খাবে আপা?'

অরু বলল, 'টাকা আছে?'

'আছে কিছু।'

'টিকিট কাটার তো টাকা লাগবে। ঐ টাকা আছে?'

'আমার টিকিট লাগবে না। তোমার টিকিট কাটব।'

'তাহলে কিছু কিনে আন। খুব ক্ষিধে লেগেছে।'

'পরোটা ভাজি আনব আপা?'

'আন।'

টুকু পরোটা, আলুভাজি আর কলা নিয়ে এল। অরু বেশ আগ্রহ করেই খেল। তার সত্যি-সত্যিই খুব ক্ষিধে পেয়েছিল।

'আপা।'

'কি রে?'

'আমার কী মনে হচ্ছে জান? আমার মনে হচ্ছে—ওরা আমাদের খোঁজে স্টেশনে আসবে। বাড়িতে মুরুব্বি আছে, তারা যখন শুনবে তখন...'

অরু সহজ গলায় বলল, 'কেউ আসবে না। টুকু, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। কী করি বল তো? কয়েক রাত ঘুম হয় নি এখন ঘুমে একেবারে চোখ জড়িয়ে আসছে।'

'মেয়েদের ওয়েটিং রুমে বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমাও। চল যাই।'

'চল।'

লম্বা কাঠের বেঞ্চিতে অরু কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। মাথার নিচে হ্যান্ড ব্যাগ। শোবার সঙ্গে-সঙ্গে সে ঘুমিয়ে পড়ল। টুকু সারাক্ষণই বোনের পাশে বসে রইল। এক সময় দেখল ঘুমের মধ্যে অরু ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত টুকুর প্রথম গল্পে এই দৃশ্যটি ছিল। চমৎকার একটি গল্প, যদিও বেশিরভাগ মানুষই এই গল্প পড়ল না। পত্রিকা সাহিত্য সম্পাদক কী মনে করে জানি টুকুকে একটি চিঠি লিখলেন। সেই চিঠিতে অনেকখানি উচ্ছ্বাস ছিল। সাহিত্য সম্পাদকরা কখনো এই জাতীয় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন না

বাড়ি ফিরেও অরু তেমন কোনো আবেগ বা উচ্ছ্বাস দেখাল না। মনে হল জীবনের কঠিন বাস্তবকে সে বেশ সহজভাবেই গ্রহণ করেছে। একবারও নিজের বাচ্চা দুটির কথা বলল না। তিথিকে বলল, 'তুই কি আমার জন্যে কোনো চাকরি-টাকরি জোগাড় করে দিতে পারবি?'

তিথি বলল, 'আমি চাকরি কোথায় পাব আপা?'

অরু নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তাও তো ঠিক। যে কোনো ধরনের চাকরি হলেই হয়। আয়ার কাজও করতে পারি। আজকাল তো শুনেছি বড়লোকদের বাড়িতে বেতন দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়া রাখে।'

'আমি এইসব খোঁজ রাখি না আপা।'

'পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দিলে লাভ হবে?'

'জানি না আপা।'

'তোর তো অনেকের সঙ্গে জানাশোনা। সবাইকে যদি বলে-টলে রাখিস…'

'আমার সঙ্গে কারোর কোনো জানাশোনা নেই, এইসব নিয়ে আমাকে বিরক্ত করো না তো আপা।'

'আচ্ছা আর বিরক্ত করব না।'

দিন পনের পরে আব্দুল মতিনের পক্ষ থেকে উকিলের চিঠি এসে উপস্থিত হল। সেই চিঠির বক্তব্য হচ্ছে—আব্দুল মতিন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্ষম হচ্ছে না। কারণ তার স্ত্রী নষ্ট চরিত্রের অধিকারী। আব্দুল মতিন স্ত্রীর চরিত্র সংশোধনের অনেক চেষ্টা করেও সফলকাম হয় নি। স্ত্রীর কারণে সে সামাজিকভাবে অপদস্ত হয়েছে। মানুষের সামনে মুখ দেখাতে পারছে না। কাজেই সে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের এবং দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে তার স্ত্রী শাহানা বেগম ওরফে অরুকে ইসলামী বিধি মোতাবেক তালাক দিচ্ছে।

এই চিঠিতেও অরুর কোনো ভাবান্তর হল না। মনে হল সে আগে থেকেই জানত এ ধরনের একটি চিঠি আসবে। মিনু খুব কান্নাকাটি করতে লাগলেন।

জালালুদ্দিন গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কান্নাকাটি করে লাভ নেই, সবই কপালের লিখন। শুধু বংশের উপর একটা দাগ পড়ে গেল—এটাই আফসোসের কথা। এত বড় বংশ।'

হীরু খুব চেঁচামেটি করতে লাগল, 'হারামজাদা ভেবেছে কী, হারামজাদাকে আমি হাইকোর্টে নিয়ে তুলব। জেলের ভাত খাওয়াব। জেলের মোটা ভাত পেটে পড়লে বুঝবে 'লাইফ' কাকে বলে। এম্নি-এম্নি ছাড়ব আমি সেই পাত্রই না। কাস্টডি মামলা করব। সুমন, রিমন থাকবে তার মার সাথে।'

অরু বলল, 'চেঁচাস না তো—চুপ কর।'

'চুপ করব কেন? কাস্টডি মামলা করলে বাপ-বাপ করে সুমন, রিমনকে দিয়ে যাবে।'

'ওদের এখানে দিয়ে গেলে লাভ কি হবে? খাওয়াব কী? যেখানে আছে, ভালোই আছে। তুই খামোখা চিৎকার করিস না।'

'তোমার নিজের বাচ্চাদের জন্যে তোমার হার্টে কোনো 'লাভ' নেই?'

'না।'

'বল কী!'

'এত গাধা তুই কী করে হলি, বল তো হীরু?'

'গাধা?'

'হ্যাঁ গাধা। যত দিন যাচ্ছে তুই ততই গাধা হচ্ছিস।'

হীরু মন খারাপ করে বেরিয়ে গেল। মেয়েছেলের মতিগতি বোঝা খুব মুশকিল। ভালো বললে মন্দ বোঝে। কি অদ্ভুত একটা জাত আল্লাহতালা সৃষ্টি করেছেন। এই জাতের মুখের দিকে তাকানও উচিত না। নিমকহারাম জাত।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারী জাতির ওপর হীরুর ভক্তি-শ্রদ্ধা কোনোকালেই বেশি ছিল না। ইদানীং নারী জাতিকে সে সহ্যই করতে পারছে না। কারণ এ্যানার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এ্যানার মা হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে মেয়ে বিয়ের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। শেষ পর্যন্ত যে ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে ঠিকঠাক হয়েছে সে ডাক্তার। প্রাইভেট ক্লিনিকে চাকরি করে। চেহারাও ভালো। অপছন্দ করার মতো কিছু তার মধ্যে নেই। হীরু খোঁজ নিয়ে জেনেছে ইতোমধ্যে এ্যানা দু'দিন সেই ডাক্তারের সঙ্গে চাইনিজ খেতে গিয়েছে।

হীরু পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, লজ্জার মাথা খেয়ে পীর সাহেবকে ব্যাপারটা বলেছে। পীর সাহেব হাসিমুখে বলেছেন, 'চিন্তার কিছু নাইরে ব্যাটা। চিন্তার কিছু নাই। সবই আল্লাহর হুকুম।'

হীরু বিনীতভাবে বলেছে, 'আল্লাহর হুকুমটা কী সেটা যদি একটু জেনে দেন। বড় অশান্তিতে আছি।'

পীর সাহেব অভয় দেয়া স্বরে বললেন, 'তোর চিন্তার কিছু নাই।'

হীরু এই প্রথম পীর সাহেবের কথায় বিশেষ ভরসা পেল না। ডাক্তার ছেলে, চেহারা ভালো, বয়স অল্প, নারায়ণগঞ্জে বাড়ি আছে—এই ছেলেকে ফেলে এ্যানা আসবে তার কাছে। গাধা টাইপ মেয়ে হলেও একটা কথা ছিল। এ্যানার মতো বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে কি কখনো এই কাজ করবে?'

ডাক্তার ছেলেটিকে একটা উড়ো চিঠি পাঠানোর চিন্তা হীরুর মাথায় এসেছিল। সেই উদ্দেশ্যে অনেক ঝামেলা করে নারায়ণগঞ্জের ঠিকানাও জোগাড় করেছিল। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে চিঠির একটা খসড়াও দাঁড় করিয়েছিল—

ডাক্তার সাহেব,

সালাম পর সমাচার এই যে, পরম্পরায় শুনিতে পাইলাম এ্যানা নাম্নী জনৈকার সহিত আপনার বিবাহ। এক্ষণে আপনাকে জানাইতেছি যে, এই মেয়েটির চরিত্র উত্তম নয়। পাড়ার যে কোনো ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেই ইহা জানিতে পারিবেন। চরিত্র দোষ ছাড়াও এই মেয়েটির মেজাজ অত্যন্ত উগ্র। বিবাহ করিবার আগে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিবেন। তাহা যদি না করেন তাহা হইলে আপনার বাকি জীবন ছারখার হইয়া যাইবে।

ইতি-

আপনার জনৈক বন্ধু।

শেষ পর্যন্ত চিঠিটা হীরু পাঠাতে পারল না। এ্যানা সম্পর্কে আজেবাজে কথা লিখতে ইচ্ছা করল না। একটা ভালো মেয়ের নামে বদনাম দেয়াটা ঠিক না। তারচে বরং ছেলেটার নামে কিছু বদনাম এ্যানার কানে উঠিয়ে দিয়ে দেখা যেতে পারে। অনেক চেষ্টায় সেই সুযোগ পাওয়া গেল। বাস স্টপে এ্যানাকে একা পাওয়া গেল। হীরু হাসি মুখে এগিয়ে গেল।

'কী খবর এ্যানা?'

এ্যানা সহজ ভঙ্গিতে বলল, 'কোন্ খবরটা জানতে চান?'

'বিয়ে হচ্ছে শুনলাম।'

'ঠিকই শুনেছেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ডেট হয়ে গেছে না-কি?'

'এখনো হয় নি তবে শিগগিরই হবে।'

'ব্যাপারটা নিয়ে একটা সেকেন্ড থট দাও। বিয়ে দু'একদিনের ব্যাপার না। সারা জীবনের ব্যাপার। শেষে আফসোসের সীমা থাকবে না।'

এ্যানা হাসি-হাসি মুখে বলল, 'ছেলের চরিত্র খুব খারাপ তাই না?'

হীরু খানিকটা হকচকিয়ে গেল। যে কথা তার নিজের বলার কথা সেই কথা এ্যানা বলে ফেলায় গুছিয়ে রাখা কথাবার্তা সব এলোমেলো হয়ে গেল।

এ্যানা বলল, 'আপনি কি ভেবেছেন ছেলেটার চরিত্র খারাপ শোনামাত্র আমি বিয়ে ভেঙে দেব?'

'কবে নাগাদ হবে বিয়েটা?'

'বললাম তো এখনো ডেট হয় নি। ডেট হলে আপনাকে জানাব।'

'তোমার রেজাল্ট কবে হবে?'

'রেজাল্ট তো গত সপ্তাহেই হল। আপনার পীর সাহেবের খবর ছাড়া আপনি দেখি আর কোনো খবরই রাখেন না।'

'পাস করেছ?'

'হ্যাঁ। ফার্স্ট ডিভিসন, চারটা লেটার।'

'ঠাট্টা করছ?'

'ঠাট্ট করব কেন? আপনি কি আমার দুলাভাই?'

হীরু এর উত্তরে কী বলবে ভেবে পেল না। কথাবার্তা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাও ভালো দেখায় না। অথচ কোনো কথাই মনে আসছে না।

'কোন্ কলেজে ভর্তি হবে?'

'জানি না। ও যেখানে ভর্তি করায়।'

'কী পড়বে?'

'আইএসসি পাস করে ডাক্তারী পড়ব। স্বামী-স্ত্রী দু'জন ডাক্তার হলে খুব ভালো হয়।'

হীরু মনে-মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। মনটা ক্রমেই বেশি খারাপ যাচ্ছে। এই মেয়ে জাতটা বড় অদ্ভুত। কী বললে পুরুষ মানুষের মন ভালো হয় সেটা যেমন জানে আবার কী বললে পুরুষ মানুষদের মাথা খারাপ হয়ে যায় সেটাও জানে।

বাস এসে গেল। এ্যানা বাসের দিকে এগুতে-এগুতে অবলীলায় বলল, 'বিয়েতে আসবেন কিন্তু। রাগ করে বাসায় বসে থাকবেন না।'

এ্যানা বাসে উঠে গেল।

হীরু হতভম্ব হয়ে লক্ষ করল তার চোখে পানি এসে গেছে। কি লজ্জার কথা! সে একজন পুরুষ মানুষ আর তার চোখে কি-না পানি? সম্ভবত এটা কেয়ামতের নিশানা। পীর সাহেব একবার বলেছিলেন, "কেয়ামত যত কাছে আসবে উল্টাপাল্টা ব্যাপার ততই বেশি হতে থাকবে। মেয়েছেলে হবে পুরুষের মতো তাদের দাড়ি-গোঁফ গজাবে, হায়েজ-নেফাস হবে বন্ধ। আর পুরুষ হবে মেয়েদের মতো। পুরুষদের দাড়ি উঠবে না। প্রতি মাসে কয়েক দিন তাদের লিঙ্গ দিয়ে দূষিত রক্ত বের হবে। ওহ্ আল্লাহতালার কী খুদরত। বলেন—ইয়া নবী সালাম আলায় কা..."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭

অনেকদিন পর তিথি, নাসিমুদ্দিনের কাছে এসেছে। নাসিম দরজা খুলে অবাক, 'আরে তুমি?'

তিথি নিচু গলায় বলল, 'কেমন আছেন নাসিম ভাই? শরীর এমন কাহিল লাগছে কেন?'

'ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো হয়েছিল। প্রতি বছর শীতের শুরুতে এরকম হয়। জ্বরজ্বারি। এবার খুব বেশি হয়েছে। এস ভেতরে এস।'

তিথি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'ভাবি বাসায় নেই?'

'না, বাপের বাড়ি গেছে। ছেলেপুলে হবে।'

'আবার?'

নাসিম লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, 'তুমি অনেকদিন আস না দেখে ভাবলাম তোমার সমস্যার সমাধান হয়েছে। বিয়ে-শাদি করে সংসার পেতেছ। এ রকম হয়। চিরকাল তো আর খারাপ যায় না।'

'কারোর-কারোর আবার যায়।'

'তোমাকে দেখে মনটাই খারাপ হয়ে গেল। মেয়েদের এই কষ্ট আমি সহ্য করতে পারি না—আর আমিই কি-না এর দালালি করি।'

'কেন করেন?'

'অভাব, বুঝলে তিথি—অভাব। প্রথম যখন এই রকম দালালি করলাম তখন মনের অবস্থাটা কী হয়েছে শোন—তিন শ' টাকা পেয়েছি। টাকাটা বাসায় নিয়ে আসলাম। রাত তখন এগারটা, ঝুম বৃষ্টির মধ্যে...'

'বৃষ্টির মধ্যে কি?'

'বাদ দাও। ঐ সব বলে কী হবে। আমি এই লাইন ছেড়ে দেব তিথি। মিরপুরে একটা দোকান নিচ্ছি—টেইলারিং শপ।'

'দরজির কাজ আপনি জানেন?'

'না জানি না। কারিগর রাখব। নিজে শিখে নিব।'

'ভালোই তো। কিন্তু আমাদের মতো মেয়েদের কী অবস্থা হবে? আমরা তো সেই পথে-পথেই ঘুরব। আপনার মতো একজন ভালো মানুষ পাশে থাকলে মনে সাহস থাকে।'

'ভালোমানুষ। আমি ভালোমানুষ? এই কথা না বলে স্যান্ডেল খুলে তুমি আমার গায়ে একটা বাড়ি দিলে না কেন? তাহলেও তো কষ্ট কম পেতাম। চা খাবে?'

'না।'

'খাও একটু চা। তোমার উপলক্ষে আমিও এক ফোঁটা খাই।'

'রান্নাবান্না নিজেই করেন?'

'হ্যাঁ। চারটা ডালভাত খাবে আমার সাথে?'

'জ্বি-না।'

নাসিম রান্নাঘরে গিয়ে গ্যাসের চুলায় কেতলি বসিয়ে দিল। তিথি পেছনে পেছনে গেল। নাসিম বলল, 'তুমি কি কাজের সন্ধানে এসেছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হুঁ।'

'একটা কাজ হাতে আছে। কোরিয়া থেকে তিন জনের একটা টিম এসেছে। জয়েন্ট ভেনচারে বাংলাদেশে ইনডাস্ট্রি খুলবে। ওদের খুশি করবার জন্যে বাংলাদেশি পার্টনাররা উঠে পড়ে লেগেছে। ওদের তিন জনের জন্যে তারা তিন জন বান্ধবী চায়। এরা তাদের সাথে ঘুরবে। রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার এইসব জায়াগায় যাবে, চার–পাঁচদিনের ব্যাপার। তুমি যাবে?'

তিথি জবাব দিল না।

নাসিম বলল, 'টাকা–পয়সা ভালোই পাবে। ওদের সঙ্গে ঘুরলে মনটাও হয়ত ভালো থাকবে।'

তিথি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'মন ভালো থাকবে?'

'এম্নি বললাম তিথি। কথার কথা। নাও চা নাও।'

তিথি নিঃশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল। নাসিম বলল, 'তুমি যদি যেতে চাও তাহলে ১১ তারিখের মধ্যে জানাবে। ওরা ১২ তারিখে রওনা হবে।'

'টাকা কেমন দেবে জানেন?'

'না। হাজার পাঁচেক তো পাবেই।'

'আজ তাহলে উঠি নাসিম ভাই?'

'এস তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি, যাবে কোথায়? বাসায় তো?'

'হ্যাঁ।'

'চল।'

নাসিমুদ্দিন তাকে বাসে উঠিয়ে দিল। জোর করে হাতে এক শ' টাকার একটা নোট গুঁজে দিল। বাস ছেড়ে না–দেয়া পর্যন্ত বাস স্টপে দাঁড়িয়ে রইল।

জালালুদ্দিন সাহেব খুবই আদরের সঙ্গে বললেন, 'জনাব আপনার নাম এবং পরিচয়?' ভদ্রলোক বললেন, 'আমার নাম দবির উদ্দিন। আগেও একবার এসেছিলাম। আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

'কিছুই মনে থাকে না ভাই সাহেব। চোখে না দেখলে মনে থাকবে কীভাবে বলেন? দৃষ্টিশক্তি নেই। সামান্য চিকিৎসায় আরাম হয়। সেটাই কেউ করাচ্ছে না। বসুন ভাই।'

'আমি আপনার মেয়ের কাছে এসেছিলাম, তিথি।'

'তিথি বাসায় নেই। এসে পড়বে। একটু বসেন। সুখ–দুঃখের কথা বলি, আপনের দেশ কোথায়?'

দবির উদ্দিন তাঁর দেশ কোথায় সেই প্রসঙ্গে গেলেন না। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন।

'আপনার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট এনেছিলাম।'

'সত্যি?'

'জ্বি, এই নিন।'

সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিয়ে আনন্দ ও বিস্ময়ে জালালুদ্দিন স্তব্ধ হয়ে গেলেন। পৃথিবীতে এখনো এত ভালো মানুষ আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভাই সাহেব বড়ই খুশি হলাম। বসুন একটু চায়ের কথা বলে আসি। দিবে কী না বলতে পারছি না আপনি। বন্ধু মানুষ, আপনাকে বলতে বাধা নেই—এই সংসারে আমি কুকুর-বিড়ালের অধম। বিড়াল যদি একবার ম্যাও করে—তার সামনে একটা কাঁটা ফেলে দেয়। আমার বেলায় তাও না।'

জালালুদ্দিন সাহেব চায়ের কোনো ব্যবস্থা করতে পারলেন না। মিনু চায়ের কথা শুনে এমন এক ধমক দিলেন যে জালালুদ্দিন সাহেবের মনে হল সংসারে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। এরচে রাস্তায় ভিক্ষা করা এবং রাতে কমলাপুর রেল স্টেশনে শুয়ে থাকা অনেক ভালো। শেষ পর্যন্ত হয়ত তাই করতে হবে। এমন বিশিষ্ট একজন মেহমান অথচ তাকে এক কাপ চা খাওয়ানো যাচ্ছে না। এরচে আফসোসের ব্যাপার আর কি হতে পারে?'

'ভাই সাহেব, নিজগুণে ক্ষমা করবেন। চা খাওয়াতে পারলাম না।'

'ঐ নিয়ে চিন্তা করবেন না। তিথি কখন আসবে বলে আপনার মনে হয়?'

'কিছুই বলতে পারছি না ভাই সাহেব। এই সংসারের কোনো নিয়ম-কানুন নাই। যার যখন ইচ্ছা আসে। যখন ইচ্ছা যায়। সরাইখানারও কিছু নিয়ম-কানুন থাকে এই বাড়ির তাও নাই।'

'আমার খুবই জরুরি কাজ আছে আমাকে চলে যেতে হবে। আমি আপনার কাছে কি একটা প্যাকেট রেখে যাব—তিথিকে দেবার জন্যে।'

'রেখে যান।'

'আপনার মনে থাকবে তো? ভুলে যাবেন না তো আবার?'

'জ্বি-না ভুলব না।'

'প্যাকেটের ভেতর একটা জরুরি চিঠিও আছে।'

'আমি দিয়ে দেব। আপনি চিন্তা করবেন না। আসা মাত্র দিয়ে দেব।'

'আজ তাহলে উঠি?'

'কোন্ মুখে আর আপনাকে বসতে বলি? এক কাপ চা পর্যন্ত দিতে পারলাম না। বড়ই শরমিন্দা হয়েছি ভাই সাহেব। নিজগুণে ক্ষমা করবেন।'

দবির উদ্দিনের চিঠিটি দীর্ঘ এবং সুন্দর করে লেখা। চিঠি পড়লেই বোঝা যায় ভদ্রলোক বেশ সময় নিয়ে লিখেছেন। ঠিকঠাক করেছেন। একটা রাফ কপি করবার পর আবার ফেয়ার কপি করা হয়েছে—কারণ চিঠিতে কোনোরকম কাটাকুটি নেই।

তিথি খুব আগ্রহ নিয়ে চিঠিটা পড়ল। অনেকদিন পর কেউ তাকে চিঠি লিখল। তাও এমন গুছিয়ে লেখা চিঠি।

প্রিয় তিথি,

একটা দুঃসংবাদ দিয়ে চিঠি শুরু করছি। আমার স্ত্রী ফরিদা মারা গেছে। এই মাসের ১৮ তারিখে। সৌভাগ্যক্রমে মৃত্যুর সময় আমি তার পাশে ছিলাম। সে আমাকে বলল, 'তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। মনে কোনো রাগ রেখো না। তার মৃত্যু খুব সহজ হয় নি। নিঃশ্বাসের কষ্ট শুরু হল। এই কষ্ট চোখে দেখা যায় না। এই প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যেও সে হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'কিছুক্ষণের মধ্যেই সব কষ্ট শেষ হবে ভাবতেই আনন্দ লাগছে।'

ফরিদা তোমার জন্যে কিছু টাকা রেখে গেছে। আশা করি মৃত মানুষের প্রতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্মান দেখিয়ে টাকাটা তুমি গ্রহণ করবে। টাকার পরিমাণ তেমন কিছু না তবে প্রতিটি টাকাই ফরিদার। সে কোনো-এক বিচিত্র কারণে তোমাকে পছন্দ করেছে। ফরিদার ঘৃণা এবং ভালবাসা দুইই খুব তীব্র।

ফরিদার মৃত্যুর পর বুঝলাম তাকে আমি কী পরিমাণ ভালবাসতাম। আজ আমার দুঃখ ও বেদনার কোনো সীমা নেই।

অজন্তা খুব কষ্ট পাচ্ছে। তবু এই কষ্টের মধ্যেও আমার কষ্টটা তার বুকে বাজছে। সে তার নিজের মতো করে আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছে। এই দৃশ্যটিও মধুর।

তিথি এই মধুর দৃশ্যটি কি তুমি এসে দেখে যাবে? যদি এই দৃশ্য তোমার ভালো লাগে তাহলে তুমি এসে যোগ দাও আমাদের সঙ্গে। তোমার শুরুর জীবনটা কষ্টের ছিল, শেষেরটা মধুর হতে ক্ষতি কি? এস ধরে নেই যে, আমাদের কারোর কোনো অতীত ছিল না। যা আমাদের আছে তা হচ্ছে বর্তমান।

তিথি, এককালে আমি খুব গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারতাম। আমি খুব চেষ্টা করছি এই চিঠিটিও গুছিয়ে লিখতে। পারছি না। তবে মনে মনে অপূর্ব একটি চিঠি তোমার কাছে এই মুহূর্তে লিখছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই চিঠি কোনো না কোনোভাবে তোমার কাছে পৌঁছবে।

তিথির চোখ ভিজে উঠল। সে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে মনে মনে ভাবল, আশ্চর্য এখনো আমার চোখে পানি আসে।

'তিথি!'

তিথি দেখল হীরু দরজা ধরে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। যেন কোনো কারণে অসম্ভব ভয় পেয়েছে। তিথি শুকনো গলায় বলল, 'কি ব্যাপার?'

'একটু বাইরে আয়।'

'যা বলার এখানে বললেই হয়।'

'না, একটু বাইরে আয়।'

তিথি উঠানে এসে দাঁড়াল। হীরু নিচু গলায় বলল, 'সর্বনাশ হয়েছেরে তিথি। ভেরি বিগ প্রবলেম।'

'প্রবলেমটা কি?'

'এ্যানা চলে এসেছে?'

'এ্যানা চলে এসেছে মানে? এ্যানাটা কে?'

'বলেছিলাম না একটা মেয়ের কথা, আমার সঙ্গে ইয়ে আছে। আজ সকালেই তার গায়ে হলুদ হয়েছে। আর এখন এই সন্ধ্যাবেলায় কি গ্রেট ঝামেলা, এক কাপড়ে চলে এসেছে।'

'চলে এসেছে মানে? তোর কাছে কী ব্যাপার?'

'আহ্ কি যন্ত্রণা—আমাদের মধ্যে একটা Love চলছে না। এখন করি কী বল?'

'মেয়েটা কোথায়?'

'বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কি যে প্রবলেমে পড়লাম। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়াই তো ভালো। কী বলিস তিথি?'

তিথি বিস্মিত হয়ে বাইরে এসে দেখল, কাঁঠাল গাছের অন্ধকারে হলুদ শাড়ি পরা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিথি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'কে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ্যানা সহজ গলায় বলল, 'আপা আমি এ্যানা।'

'তুমি এইসব কী পাগলামি করছ? বাসায় যাও। চল আমি তোমাকে দিয়ে আসি।'

'বাসায় ফিরে যাবার জন্যে তো আসি নি আপা।'

'তুমি বিরাট বড় একটা ভুল করছ এ্যানা।'

'জানি আপা।'

'আমার তো মনে হয় না তুমি জান। আমার ভাইকে আমি খুব ভালো করে চিনি। ওর জন্যে তুমি এত বড় ডিসিশান নিতে পার না।'

হীরু শুকনো মুখে বলল, 'তিথি 'রাইট' কথা বলছে। ভেরি রাইট এবং ওয়াইজ কথা।'

এ্যানা বিরক্ত মুখে বলল, 'তোমাকে কত বার বলেছি—কথার মধ্যে–মধ্যে বিশ্রী ভাবে ইংরেজি বলবে না।'

এই প্রথম এ্যানা হীরুকে 'তুমি' করে বলল। হীরুর বুক কেমন ধড়ফড় করতে লাগল। চোখ পানিতে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। এই মেয়েটার জন্যে কিছু করতে ইচ্ছা করছে। কী করা যায়? মেয়েটাকে খুশি করবার জন্যে সে অনেক কিছু করতে পারে। হাসিমুখে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ডান হাতটা কেটে পানিতে ফেলে দিতে পারে।

তিথি বলল, 'এখনো সময় আছে এ্যানা। এখনো সময় আছে।'

এ্যানা মিষ্টি করে হাসল। মেয়েটা দেখতে তত সুন্দর না। কিন্তু তার হাসিটি বড়ই স্নিগ্ধ। তিথি বলল, 'এখন যে কত রকম ঝামেলা হবে তুমি কল্পনাও করতে পারছ না। তোমার বাবা পুলিশে খবর দেবেন। পুলিশ আসবে, তোমাকে এবং হীরুকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে।' এ্যানা বলল, 'এইসব কিছুই হবে না আপা। আমি বাসায় না বলে তো আসি নি। বলেই এসেছি। সবাই জানে আমি কোথায়। কেউ কোনো ঝামেলা করবে না। কারণ আমি তাদের এমন একটা কথা বলে এসেছি...'

কথা শেষ না করেই এ্যানা হাসল। তিথি বলল, 'কী কথা বলে এসেছ?'

'এটা আপা বলা যাবে না।'

'এস ঘরে এস।'

এ্যানা জালালুদ্দিন সাহেবের পা ছুঁয়ে সালাম করল। জালালুদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কে?'

এ্যানা বলল, 'বাবা আমার নাম এ্যানা। আমি আপনার একজন মেয়ে।'

জালালুদ্দিন হকচকিয়ে গেলেন। কি ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে বললেন, 'মা আপনার শরীর কেমন?'

এ্যানা বলল, 'আমার শরীর ভালো।'

মিনুকে সালাম করতে যেতেই মিনু বললেন, 'খবর্দার তুমি আমার পায়ে হাত দিও না।'

এ্যানা সহজ গলায় বলল, 'আমার সঙ্গে এমন কঠিন করে কথা বললে তো হবে না মা। আমি এই বাড়িতে থাকব। আমাদের তো মিলেমিশে থাকতে হবে। হবে না?'

রাত সাড়ে দশটায় কাজী এনে বিয়ে পড়ানো হল। এ্যানার বাবাকে খবর দেয়া হল। আশ্চর্যের ব্যাপার—তিনি বিয়েতে এলেন। হীরু যখন তাঁকে সালাম করল তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হীরুকে একটা আঙটি এবং দু'শ' টাকা দিলেন।

টাকাটা পাওয়ায় হীরুর খুব লাভ হল। তার হাতে একটা পয়সা ছিল না। কেন জানি তার মনে হল এ্যানা খুব পয়মন্ত মেয়ে। এইবার সংসারের হাল ফিরবে।

১৮

হীরুর খুব ইচ্ছা ছিল তার চায়ের দোকানের নাম রাখবে "এ্যানা টি স্টল"। এ্যানার কারণে তা হল না।

এ্যানা কঠিন গলায় বলল, 'ফাজলামি করবে না তো। ফাজলামি করলে চড় খাবে।'

হীরু অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলল, 'চড় খাব মানে? এটা কী ধরনের কথা! ওয়াইফ হয়ে হাসবেন্ডকে চড় দেয়ার কথা বলছ। 'সান' কি আজ পূর্বদিকে 'রাইজ' করল?'

'হ্যাঁ, করল। চায়ের দোকানের কোনো নাম লাগবে না।'

'একটা দোকান দেব তার নাম থাকবে না?'

'না। পাঁচ পয়সা দামের দোকান তার আবার নাম।'

'পাঁচ পয়সা দামের দোকান মানে? নগদ চার হাজার সাত শ' টাকা নিজের পকেট থেকে দিলাম।'

'নিজের পকেট থেকে তুমি একটা পয়সাও দাও নি। তিথি আপা টাকাটা দিয়েছে।'

'একই হল।'

'না একই হয় নি। এখন যাও—যথেষ্ট বকবক করেছ।'

হীরু মন খারাপ করে বের হয়ে এল। তার এখন সত্যি-সত্যি মনে হচ্ছে এই মেয়েকে বিয়ে করে 'গ্রেট' ভুল করা হয়েছে। এই মেয়ে তার জীবনটা ভাজা-ভাজা করে ফেলবে। দিনরাত ঝগড়া করবে। ঘরের চালে কাক-পক্ষী বসতে দেবে না।

মিনুর সঙ্গে এ্যানার বড় রকমের একটা ঝগড়া হয়ে গেল তিন দিন না পেরুবার আগেই। এ্যানা রান্নাঘরে ভাত বসিয়েছে। মিনু বললেন, 'কি করছ?'

'ভাত বসিয়েছি।'

'তোমাকে ভাত বসাতে বলেছি?'

'না, বলেন নি। বলতে হবে কেন? আপনার কি ধারণা আমি ভাত রাঁধতে জানি না?'

মিনু স্তম্ভিত গলায় বললেন, 'এ রকম করে কথা বলা তোমাকে কে শিখিয়েছে?'

'কেউ শেখায় নি। ভাত বসিয়েছি তা নিয়ে আপনিই বা এত হৈচৈ করছেন কেন?'

মিনু চাপা গলায় বললেন, 'তুমি তো ভয়ংকর বদ মেয়ে।'

এ্যানা সহজ স্বরে বলল, 'আমি বদ মেয়ে না। আপনার ছেলেটা বদ। আপনার ছেলের ভাগ্য ভালো যে আমি তাকে বিয়ে করেছি।'

মেয়েটির গালে প্রচণ্ড একটা বড় চড় কষিয়ে দেবার ইচ্ছা মিনু অনেক কষ্টে দমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন। নতুন বউয়ের গায়ে এত তাড়াতাড়ি হাত তোলা ঠিক হবে না। তাছাড়া ছেলের বউকে শায়েস্তা করতে হয় ছেলেকে দিয়ে। তিনিও তাই করবেন।

জালালুদ্দিন এ্যানাকে বেশ পছন্দ করলেন। তেজী মেয়ে। এই সংসারের জন্যে এ রকম তেজী মেয়ে দরকার। মেয়েটির সঙ্গে খাতির রাখলে ভবিষ্যতে সুবিধা হবে—এই ধারণা নিয়ে তিনি ভাব জমানোর প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। মধুর স্বরে যখন-তখন ডাকেন—'মা এ্যানা, একটু শুনে যাও তো।' এ্যানা সঙ্গে-সঙ্গে এসে পুরুষালি গলায় বলে, 'কী জন্যে ডাকছেন?'

'এম্নি ডাকছি মা। এম্নি। গল্প করি।'

'কী গল্প করবেন?'

'সুখ-দুঃখের গল্প।'

'গল্প শুনতে আমার ভালো লাগে না। চা খেতে চাইলে বলুন চা এনে দিচ্ছি।'

'আচ্ছা দাও, তাই দাও। চোখ দু'টা যাওয়ায় একেবারে অচল হয়ে পড়েছি। চিকিৎসাও হচ্ছে না।'

'চিকিৎসা হচ্ছে না কেন?'

'কে করাবে চিকিৎসা?'

'কেন—আপনার ছেলে করাবে?'

'আমার ছেলে আমার চিকিৎসা করাবে?'

'আপনার ছেলে আপনার চিকিৎসা করাবে না তো বাইরের মানুষে চিকিৎসা করাবে?'

'এই সংসারের মানুষ তুমি চিন না মা। এই সংসারের মানুষগুলো কেমন তোমাকে বলি...'

জালালুদ্দিন বিমলানন্দ ভোগ করছেন। সংসারের মানুষ চিনিয়ে দেবার দায়িত্ব খুব সহজ দায়িত্ব নয়। মনোযোগী শ্রোতার সঙ্গে দার্শনিক কথাবার্তা বলতে তার ভালো লাগে। এই মেয়েটার মনোযোগী শ্রোতা হবার সম্ভাবনা আছে।

'সংসারে মানুষ থাকে তিন রকমের—অগ্নি-মানুষ, মাটি-মানুষ আর জল-মানুষ। অমানুষও থাকে তিন পদের...' জালালুদ্দিনের হঠাৎ সন্দেহ হল সামনে কেউ নেই। মানুষ কয় প্রকার ও কি কি এই প্রসঙ্গ বন্ধ রেখে মৃদু স্বরে ডাকলেন, 'মা কোথায় গো? মা কোথায়?' মার জবাব পাওয়া গেল না। মা চা বানাতে গেছে। শ্বশুরের দার্শনিক কথাবার্তায় তার কোনো আগ্রহ নেই।

'বাবা চা নিন।'

জালালুদ্দিন গম্ভীর মুখে হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিলেন। চায়ে চুমুক দিলেন—চমৎকার চা, কিন্তু তার গম্ভীর মুখভঙ্গির বদল হল না। এ্যানাকে তিনি বুঝতে পারছেন না। কাউকে বুঝতে না পারলে অস্বস্তি লেগে থাকে। কে জানে এই মেয়েটা ঘর ভাঙানি মেয়ে কি-না। ঘর যদি ভেঙে দেয় তাহলে তিনি যাবেন কোথায়? তার এই বয়সে, শরীরের এই অবস্থায় একটি শক্ত আশ্রয় প্রয়োজন। চা তার কাছে বিস্বাদ মনে হল।

হীরুর ইচ্ছা ছিল তার চায়ের দোকানের প্রথম চা খাওয়াবে পীর সাহেবকে। তাঁকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে-পায়ে ধরে নিতে আসবে। এতে দোকানের একটা পাবলিসিটিও হবে। এত বড় পীর এসে চা খেয়ে গিয়েছে কম কথা না। পীর সাহেব আসতে রাজি হলেন না। তবে চায়ের বিশাল কেতলিতে ফুঁ দিয়ে দিলেন। বললেন, 'এতেই কাজ হবে।' হীরু বিশেষ ভরসা পেল না।

জুন মাসের তিন তারিখ ভোর ছ'টায় তার চায়ের দোকান চালু হল। চা, পরোটা, সবজি ভাজি এবং ডাল এই তিন আইটেম। পরোটা, ভাজি এবং ডালের জন্য এক জন কারিগর রাখা হল। কারিগরের নাম—মজনু মিয়া। কারিগরের দেশ ফরিদপুর। বয়স পঞ্চাশ। ছোটখাটো মানুষ, কথা বলে ফিসফিস করে এবং সেই সব কথার বেশিরভাগই বোঝা যায় না। কারিগরের বাঁ হাতটা অচল। সেই অচল হাত শুকিয়ে দড়ির মতো হয়ে আছে। শরীরের অনাবশ্যক অঙ্গ হিসেবে হাতটা কাঁধের সঙ্গে ঝুলতে থাকে। একটি সচল হাত কারিগর মজনু মিয়ার জন্যে যথেষ্ট। এই হাতে দ্রুতগতিতে সে পরোটা ভাজে। সেই দৃশ্য মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো দৃশ্য।

মজনু মিয়া নামকরা কারিগর। তাকে নিয়ে যে ক'টা রেস্টুরেন্ট শুরু হয়েছে সব ক'টা টিকে গেছে। রমরমা বিজনেস করছে। মজনু মিয়ার নিয়ম হল—কোনো রেস্টুরেন্ট যখন টিকে যায় তখন সে সরে পড়ে। রেস্টুরেন্ট বড় হওয়া মানে নতুন-নতুন কারিগরের নিযুক্তি। নতুনদের সঙ্গে তার বনে না। সে কাজ করতে চায় একা। কাজের সময় সে কারো দিকে তাকায় না, কথা বলে না, হ্যাঁ-হুঁ পর্যন্ত না। কাজের সময় সে শুধু ভাবে। ভাবে নিজের একটা রেস্টুরেন্ট হয়েছে। গমগম করছে রেস্টুরেন্ট। কাস্টমার আসছে যাচ্ছে। পরোটা ভেজে সে কূল পাচ্ছে না। এই স্বপ্ন সে গত ত্রিশ বছর ধরে দেখছে। আজ সেই স্বপ্নকে বাস্তব করার মতো ক্ষমতা তার আছে। ত্রিশ বছর সে কম টাকা জমায় নি। টাকা না জমিয়েই বা কী করবে? টাকা খরচের তার জায়গা কোথায়? আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই। থাকার আলাদা ঘর এই জীবনে করা হয় নি। যে রেস্টুরেন্টে কাজ করেছে সেই রেস্টুরেন্টের বেঞ্চিতেই রাত কাটিয়েছে। নিজের একটি ঘরের প্রয়োজন সে ত্রিশ বছর আগেও বোধ করে নি। আজো করে না।

রেস্টুরেন্ট চালুর দিনে হীরু অসম্ভব উত্তেজনা বোধ করল। তার মনে হচ্ছে কানের পাশ দিয়ে ভোঁ-ভোঁ করে গরম হাওয়া বের হচ্ছে। এই গরম হাওয়া শরীরের ভেতরই তৈরি হচ্ছে কিন্তু বের হচ্ছে কোন পথে তা সে ধরতে পারছে না। বুকে হৃৎপিণ্ড বেশ শব্দ করেই লাফাচ্ছে। তার হার্টের কোনো অসুখ আছে কি-না কে জানে। সম্ভবত আছে। আগে ধরা পড়ে নি। এখন ধরা পড়ছে। পীর সাহেব বলে দিয়েছেন, প্রতিদিন দোকান খোলার আগে তিনবার সুরা ফাতেহা এবং তিনবার দরুদ শরীফ পড়তে। লজ্জার ব্যাপার হচ্ছে হীরুর কোনো দরুদ শরীফ মুখস্থ নেই। ভেবেছিল একটা নামাজ শিক্ষা এনে রাখবে। নামাজ শিক্ষায় সব দোয়া-দরুদ বাংলায় লেখা থাকে। দেখে-দেখে তিনবার পড়ে ফেললেই হবে। কিন্তু নানান ঝামেলায় নামাজ শিক্ষা কেনা হয় নি। বিরাট খুঁত রয়ে গেল। হীরু খুবই বিষণ্ন বোধ করল। তার বিষণ্নভাব দীর্ঘস্থায়ী হল না। প্রথম দিনেই রেস্টুরেন্ট জমে গেল। কারিগর মজনু মিয়ার ভাজি এবং পরোটা দুইই অতি চমৎকার হল। ভাজির রঙ লালাভ, একটু টকটক এবং প্রচণ্ড ঝাল। শুধু খেতেই ইচ্ছে করে। মজনু মিয়া কিছু-একটা দিয়েছে সেখানে—কী কে জানে। হীরুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হল ভাজি রান্নার গোপন কৌশল শিখে রাখা দরকার। না শিখে রাখলে পরে সমস্যা হবে। মজনু মিয়া যদি দোকান ছেড়ে যায় তাহলে সে একেবারে পথে বসবে। তার রেস্টুরেন্টে তখন কেউ থুথু ফেলতেও আসবে না।

টুকু অরুকে নিয়ে বের হয়েছে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কিছুই বলছে না। কয়েকবার জিজ্ঞেস করেও অরু কোনো জবাব পায় নি। টুকু শুধু বলেছে, 'চল না যাই।'

অরু সুতির একটা শাড়ি পরেছে। সাধারণ শাড়ি, কিন্তু কোনো বিচিত্র কারণে এই সাধারণ শাড়িটি তাকে খুব মানিয়ে গেছে। তাকে দেখাচ্ছে কিশোরী একটি মেয়ের মতো। যে মেয়ের চোখে পৃথিবী তার রহস্য ও আনন্দের জানালা একটি একটি করে খুলতে শুরু করেছে।

টুকু বলল, 'এইখানে একটু দাঁড়াও আপা।' একতলা সাদা রঙের দালানের সামনে অরু দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির সামনের জায়গাটা ফুলের গাছে ভর্তি। নিকেলের চশমা পরা বৃদ্ধ এক জন ভদ্রলোক বাগানে কাজ করছেন। অরু বলল, 'এটা কার বাড়ি?'

'ওসমান সাহেবের বাড়ি।'

'এই বাড়িতে কি?'

'আছে একটা ব্যাপার। তুমি দাঁড়াও। আমি উনার সঙ্গে কথা বলে আসি।'

'ব্যাপারটা কি তুই আমাকে বলবি না?'

'একটা চাকরির ব্যাপার। তোমার একটা চাকরি হয় কি-না দেখি।'

'তুই আমার চাকরি জোগাড় করে দিবি?'

'না, আমি দেব কিভাবে? বজলু ভাই চেষ্টা-চরিত্র করছেন।'

'বজলু ভাইটা কে?'

'তুমি চিনবে না, গ্রিন বয়েজ ক্লাবের সেক্রেটারি। বজলু ভাইয়ের এখানে থাকার কথা। দাঁড়াও, আমি খোঁজ নিয়ে আসি। বজলু ভাই এসে চলে গেলেন কি-না কে জানে।'

অরু দাঁড়িয়ে রইল। সুন্দর একটা বাড়ির গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার এক ধরনের লজ্জা আছে। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার মানে—এই সুন্দর বাড়ির ভেতরে ঢোকার অনুমতি তার নেই। সে বাইরের এক জন। অরু দেখল বুড়ো ভদ্রলোক নিজের মনে কাজ করছেন। টুকু হাত কচলে-কচলে কী-সব বলছে। টুকুর ভঙ্গি বিনীত প্রার্থনার ভঙ্গি। অভাব দুঃখ দুর্দশার কথা বলছে বোধ হয়। অরুর খুব লজ্জা লাগছে। কি আশ্চর্য, ভদ্রলোক একবার মুখ তুলে তাকাচ্ছেনও না। কী হয় একবার তাকালে? একটা মানুষ নিশ্চয়ই বাগানের গাছগুলোর চেয়েও তুচ্ছ না।

টুকু ফিরে এল। তার মুখ লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেছে। ছোট-ছোট নিঃশ্বাস ফেলছে। কী কথা হয়েছে কে জানে। অরু বলল, 'চল যাই।'

টুকু বলল, 'আচ্ছা চল শুধু শুধু আসলাম।' অরু বলল, 'তোকে অপমান করে নি তো?'

'আরে না। অপমান করবে কি। খুব যারা বড় মানুষ তারা কাউকে অপমান করে না। তারা খুব মিষ্টি-মিষ্টি করে কথা বলে। অভাবী মানুষদের কথা শুনলে আবেগে আপ্লুত হয়ে যায়। তখনি আমার রাগ লাগে। অসম্ভব রাগ লাগে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোকে দেখে কিন্তু মনে হয় না তোর শরীরে রাগ আছে। তোর চেহারাটা কেমন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা।'

টুকু হঠাৎ গলার স্বর খাদে নামিয়ে ফেলে বলল, 'তুমি কোনোরকম চিন্তা করবে না আপা, বজলু ভাই একটা ব্যবস্থা করবেই। খুব ছোটাছুটি করছে।'

'তোর বজলু ভাইয়ের হাতে বুঝি অনেক চাকরি?'

'না। বজলু ভাই আমাদের মতোই গরিব মানুষ। তবে অন্য গরিবের জন্যে খুব ছোটাছুটি করতে পারে।'

'কেন ছোটাছুটি করে?'

'জানি না। ছোটাছুটি করতে বোধ হয় ভালো লাগে।'

'একটা রিকশা নে টুকু, আর হাঁটতে পারছি না। আমার কাছে টাকা আছে।'

টুকু রিকশা নিল। অরু বলল, 'ফেরার পথে হীরুর রেস্টুরেন্ট দেখে যাই। চল।'

টুকুর রেস্টুরেন্টে যাবার কোনো ইচ্ছা নেই। সে ক'দিন ধরেই হীরুকে এড়িয়ে চলছে। কারণ হীরু চায় টুকু ক্যাশে এসে বসুক। হীরু হচ্ছে দোকানের মালিক, তাকে তো সারাক্ষণ ক্যাশ বাক্স নিয়ে বসে থাকলে চলে না। ক্যাশে বসবে টুকু। সে হবে ম্যানেজার। রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার। খুব সহজ ব্যাপার তো না। এই বাজারে ম্যানেজারি পাওয়া আর বাঘের দুধ পাওয়া এক কথা। টুকু রাজি হয় না। তার ভালো লাগে পথে-পথে ঘুরতে।

হীরু ক্যাশে বসে ছিল। টুকুদের নামতে দেখে অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেল। এই প্রথম নিজের লোক রেস্টুরেন্ট দেখতে আসছে। এ্যানা বা তিথি এখনো আসে নি। বাসায় কারো মনে হচ্ছে কোনো আগ্রহ নেই। যাক তবু দু'জন এল।

অরু বলল, 'হীরু তোর কাজকর্ম দেখতে এলাম। বাহ্ সুন্দর তো।' হীরুর মনটা ভালো হয়ে গেল। চারদিকে সবুজ কাগজ সেঁটে দোকানটাকে সে মন্দ সাজায় নি।

টেবিলে ধবধবে সাদা ওয়াল ক্লথ। তিন দিকের দেয়ালে ক্যালেন্ডার থেকে সুন্দর-সুন্দর ছবি কেটে বসানো হয়েছে। তার সীমিত সাধ্যে যতটুকু সম্ভব সে করেছে। হীরু বলল, 'গরিব মানুষের রেস্টুরেন্ট আপা। দেখার কিছু নেই। কেবিনে চলে যাও। কেবিনে বসে চা খাও। এই—এক নম্বর কেবিনে দু'টা চা দে। কাপ গরম পানি দিয়ে ধুয়ে আনবি।'

'কেবিনও আছে না-কি?'

'থাকবে না! কি বল তুমি! মেয়েছেলের জন্যে দু'টি কেবিন। এক নম্বর কেবিন আর দু'নম্বর কেবিন।'

'চা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না?'

'পরোটা-ভাজি আর ডাল আছে। আগামী সপ্তাহ থেকে দুপুরে তেহারি হবে—ফুল দশ, হাফ প্লেট ছ'টাকা। তেহারির সঙ্গে সালাদ ফ্রি।'

অরু এবং টুকু চা খেল। কেবিন অরুর খুব পছন্দ হল। পর্দা টেনে দিলেই নিজেদের ছোট্ট আলাদা একটা জগৎ। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলল তার যদি সত্যি কোনোদিন চাকরি-টাকরি হয় তাহলে সে প্রায়ই কোনো বন্ধু-বান্ধব জোগাড় করে এই রেস্টুরেন্টের কেবিনে বসে চা খেতে খেতে গল্প করবে। সুখ-দুঃখের একান্ত কিছু গল্প।

অরুরা চলে যাবার সময় হীরু বলল, 'চায়ের দাম দিয়ে যাও আপা। ফ্রি'র কোনো কারবারই নেই। আত্মীয়-স্বজন সবার নগদ পয়সা দিতে হবে। রাগ কর বা না কর—এটা হল ব্যবসা।'

অরু বলল, 'কত দিতে হবে রে?'

'দু'টাকা।' অরু হাসিমুখে দু'টাকা বের করল।

হীরুর সময় এত ব্যস্ততায় কাটছে যে এ্যানার সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করারও সময় পাচ্ছে না। অফিস-আদালত ছুটির দিনে বন্ধ থাকে কিন্তু রেস্টুরেন্ট ছুটির দিনে সকাল-সকাল খুলতে হয়, বন্ধ করতে হয় গভীর রাতে। অবশ্যি রাত যতই হোক এ্যানা তার জন্য অপেক্ষা করে। কড়কড়া ঠাণ্ডা ভাত খেতে হয় না। হীরু বাসায় পা দেয়া মাত্র এ্যানা সব কিছু গরম করতে বসে। এক জন তার জন্যে না খেয়ে অপেক্ষা করছে এটা ভাবতেও ভালো লাগে।

রাতে পাশাপাশি ঘুমুতে গিয়ে হীরুর প্রায়ই মনে হয় সবটাই বোধ হয় কল্পনা। তার মতো একটা ছেলেকে এ্যানা বিয়ে করবে কেন? এ্যানা নিশ্চয়ই অন্য কাউকে বিয়ে করে মহাসুখে আছে। তার পাশে যে শুয়ে আছে সে ধরা-ছোঁয়ার কেউ না। কল্পনার একজন মানুষ। হীরু খুব দীর্ঘ একটা স্বপ্ন দেখে চলছে। একদিন স্বপ্ন কেটে যাবে। সে দেখবে তার পাশে কেউ নেই। পকেটে দু'টা ডেম্প সিগারেট, একটা দেয়াশলাইয়ের বাক্স এবং ন্যাতন্যাতে ময়লা কয়েকটা নোট নিয়ে সে রাস্তায় হাঁটছে। ঘুমুতে যাবার আগে হীরুর খুব ইচ্ছা করে এ্যানার সঙ্গে আবেগ এবং ভালবাসার কিছু কথা বলতে। রেস্টুরেন্টের কথা না, সংসারের কথা না, অন্যরকম কিছু কথা। যা বলতে হয় অস্বাভাবিক নরম গলায়। যা বলার সময় গলার স্বর কেঁপে যায়, বুকের গভীরে সুখের মতো কিছু ব্যথা বোধ হয়। হীরু এসব কথা কখনো বলতে পারে না। বলতে গেলেই এ্যানা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'চুপ কর তো। এই সব কথা কোত্থেকে শিখলে। ছিঃ।' হীরু আহত হয়ে বলে, 'ছিঃর কি আছে?'

'ঘুমাও। সিনেমা-সিনেমা কথা আমার অসহ্য লাগে।'

হীরুর চোখে পানি আসার উপক্রম হয়। চোখের পানি আটকাতে তার খুব বেগ পেতে হয়। এ্যানা এই ফাঁকে সংসারের কথা নিয়ে আসে। এইসব কথা শুনতে হীরুর একেবারে ভালো লাগে না। তবু সে মন দিয়ে শোনে। এ্যানার সঙ্গে কথা বলারও আলাদা আনন্দ আছে। এই মেয়েটি একান্তই তার, অন্য কারোর নয়। গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে তারা দু'জন কথা বলছে—এও তো এক পরম বিস্ময়। তার মতো ক'জন মানুষের এই সৌভাগ্য হয়? হীরু ভয়ে ভয়ে এ্যানার গায়ে হাত রাখে। সারাক্ষণই তার মনে হয় এই বুঝি এ্যানা তার হাত সরিয়ে দিল। এ্যানা হাত সরায় না। এও কি কম আনন্দের ব্যাপার? এ্যানা ঘুমঘুম গলায় বলে, 'তিথি আপা সারাদিন কোথায়-কোথায় ঘোরে বল তো?'

'জানি না।'

'কারো সঙ্গে কথাও বলে না। চুপচাপ থাকে।'

'একেক জনের একেক স্বভাব।'

'তিথি আপাকে নিয়ে অনেক আজেবাজে কথা শুনি—এসব কি সত্যি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না।'

'টুকু যে কিছু করে না, পড়াশুনা না, কিছু না—রাতদিন ঘুরাফিরা। তোমরা কিছু বল না কেন?'

'বললেও শোনে না।'

'বলে দেখেছ কখনো?'

হীরুর ঘুম পায়। সে কোনো উত্তর দেয় না। এ্যানা শান্তভঙ্গিতে বলে, 'তুমি হচ্ছ সংসারের বড়। তোমাকেই তো সব দেখতে হবে।'

'দেখাদেখি করে কিছু হয় না—সব ভাগ্য।'

'আমার কলেজে ভর্তির ব্যাপারেও তো তুমি কিছু বলছ না।'

হীরুর ঘুম কেটে যায়। সে শংকিত গলায় বলে, 'তুমি কলেজে পড়বে না-কি?'

'পড়ব না—পড়ব না কেন?'

'মেয়েছেলের পড়াশোনার কোনো দরকার নেই। শুধু-শুধু সময় নষ্ট আর পয়সা নষ্ট।'

'এইসব বাজে কথা তোমাকে কে শিখিয়েছে?'

'শেখানোর কি আছে? সবাই তো জানে।'

'আজেবাজে কথা আর আমার সামনে বলবে না।'

'আচ্ছা।'

'গা থেকে হাত সরাও। হাত সরিয়ে ঘুমাও।'

একবার ঘুম কেটে গেলে হীরুর আর সহজে ঘুম আসতে চায় না। সে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। এ বাড়িতে গভীর রাত পর্যন্ত আরো অনেকেই জাগে। জাগেন মিনু, প্রায় রাতেই তাঁর এক ফোঁটা ঘুম আসে না। জাগে তিথি ও অরু। দু'জন এক খাটে ঘুমায়। দু'জনই জানে অন্যজন জেগে আছে তবু একজন অন্যজনকে তা জানায় না। শুধু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমান জালালুদ্দিন। আজকাল রাতে তার ভালো ঘুম হয়। এক ঘুমে রাত শেষ করে দেন। ঘুমের মধ্যে নানান রকম স্বপ্ন দেখেন। চোখে দেখতে পান না বলেই বোধ হয় রাতের স্বপ্নগুলোর জন্যে মনে মনে অপেক্ষা করে থাকেন। তাঁর কাছে স্বপ্নের মানুষগুলোকে বাস্তবের মানুষদের চাইতেও অনেক বেশি সুন্দর মনে হয়।

১৯

জুন মাসের মাঝামাঝি অরুর চাকরি হয়ে গেল। ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে পোস্টিং। একটি বিদেশি এনজিওর অস্থায়ী চাকরি। চাকরির মেয়াদ তিন থেকে চার মাস। একুশ শ' টাকা বেতন। খাওয়া-থাকা ফ্রী। হালুয়াঘাটে গারো ছেলেমেয়েদের জন্যে স্কুল করা হয়েছে। সেই স্কুলে টিচার। অঙ্ক, বাংলা, ইংরেজির সঙ্গে-সঙ্গে হাতের কাজ সেলাই এসব শেখাতে হবে।

টুকু বলল, 'আপা আজ দিনের মধ্যে ওদের জানাতে হবে তুমি যাবে কী যাবে না। যদি যাও তাহলে আজই ঢাকার হেড অফিসে জয়েন করবে। আজ থেকেই তোমার বেতন শুরু হবে। তুমি যাবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বুঝতে পারছি না।'

টুকু বিরক্ত হয়ে বলল, 'সবই তো বুঝিয়ে বললাম, আর কী বুঝতে পারছ না?'

'চাকরি করতে পারব কী পারব না—এইটাই বুঝছি না। আমাকে দিয়ে কি এইসব হবে?'

'অন্য মেয়েরা কিভাবে করে?'

'আমি কি অন্য মেয়েদের মতো?'

'কেন, তুমি আলাদা কিভাবে?'

'তুই বুঝতে পারছিস না। বাসা থেকে ওরা ছাড়বে কেন? এত দূরে চাকরি, ঢাকায় হলেও একটা কথা ছিল।'

'তুমি তাহলে চাকরি নেবে না?'

'নেব না তো বলি নি, ভাবছি।'

'যা ভাবাভাবির ঘন্টাখানিকের মধ্যে ভেবে নাও। বাসার কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। বাসার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?'

'টেম্পোরারি চাকরি। চার মাস পর ছাড়িয়ে দেবে।'

'চার মাসের অভিজ্ঞতা হল না, এই অভিজ্ঞতা তখন কাজে লাগবে। এইটা দেখিয়ে অন্য চাকরি জোগাড় করব।'

'কাউকে কিছু বলব না?'

'না।'

'তুই বলছিস সত্যি-সত্যি আমার চাকরি হয়ে গেছে? আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'তুমি মনস্থির কর আপা। কী করবে ভেবে ফেল। অনেক কষ্টে এই চাকরি পাওয়া গেছে।'

'চল যাই। চাকরি করব কী করব না যেতে যেতে ঠিক করব।'

অরু ভেবেছিল বিরাট কোনো অফিস হবে। দেখা গেল সে রকম কিছু না। ধানমণ্ডিতে একতলার ছোট্ট বাড়ি। বসার ঘর বেতের সোফা দিয়ে সাজানো। বসার ঘরে শিশুদের হাসিমুখের বড়-বড় কিছু পোস্টার। প্রতিটি পোস্টারের নিচে লেখা—এই শিশুটি যুদ্ধ চায় না সে আনন্দে বাঁচতে চায়। বসার ঘরে আরো কয়েক জন মহিলা বসে আছেন। টুকু অরুকে তাদের পাশে বসিয়ে রেখে চলে গেল। ভেতরে খবর দেয়া হয়েছে। যথাসময়ে ডাক পড়বে। যে ভদ্রলোক কথা বলবেন তার নাম ডঃ রবার্ট গোরিং। ফিলসফির অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে এই সংস্থার প্রধান। অরু বলল, 'আমি তো ইংরেজি বলতে পারি না, উনার সঙ্গে কথা বলব কী করে?'

'উনি বাংলা জানেন। তোমার চেয়ে ভালো বাংলা বলেন।'

অরু অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ঘন্টাখানিক বসে থাকার পরও তার ডাক পড়ল না। অরুর ধারণা হল ভদ্রলোক হয়ত তার কথা ভুলেই গেছেন। তার কি উচিত চলে যাওয়া? না-কি তার উচিত যাবার আগে ভদ্রলোকের সঙ্গে নিজেই যেচে গিয়ে কথা বলা?

'মিস শাহানা বেগম কি আপনার নাম?'

অরু শূন্যদৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। শাহানা বেগম তারই নাম। এই নামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ কখনো ডাকে না। সবাই অরু ডাকে। এই বিদেশির মুখে শাহানা নামটা কী রকম অচেনা লাগছে। আর এ রকম একজন বিদেশি এত সুন্দর করে বাংলা বলছে কীভাবে?

'আপনার নাম কি মিস শাহানা?'

'জ্বি।'

'আমি এতক্ষণ আপনাকে বসিয়ে রেখেছি সেই কারণে আপনি কি আমার উপর রাগ হয়েছেন?'

'জ্বি–না আমি রাগ করি নি। রাগ করব কেন?'

'আপনি কি আমার বাংলা বুঝতে পারছেন?'

'পারছি। আপনার খুব সুন্দর বাংলা।'

'আসুন আমার ঘরে আসুন।'

অরু অবাক হয়ে লক্ষ করল শুরুর অস্বস্তির কিছুই এখন আর তার নেই। গাঢ় নীল রঙের চকচকে হাওয়াই শার্ট পরা এই বিদেশিকে তার ভালো লাগছে। দূরের কেউ বলে মনে হচ্ছে না। এ রকম মনে হবার কারণ কি? সে চমৎকার বাংলা বলছে—এটাই কি একমাত্র কারণ? না–কি তার গলার স্বরের আন্তরিক ভাব অরুকে আকৃষ্ট করেছে? না–কি ভদ্রলোকের মাথাভর্তি সোনালি চুল? চুলগুলো হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছা করে।'

'মিস শাহানা।'

'জ্বি।'

'আপনার তাহলে এই ধারণা হয়েছে যে আমি ভালো বাংলা বলি?'

'জ্বি।'

'আপনার ধারণা যথাযথ নয়। প্রায়ই আমি ক্রিয়াপদগুলো এলোমেলো করে ফেলি। তাছাড়া আপনাদের বাংলা ভাষার কিছু–কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা আমি এখনো বুঝতে পারি না। আমার কাছে খুবই অদ্ভুত মনে হয়।'

'কী বৈশিষ্ট্য?'

'যেমন ধরুন 'দেখা' শব্দটির মানে হচ্ছে To see. চোখ দিয়ে দেখা। অথচ আপনারা নানানভাবে শব্দটি ব্যবহার করেন—গানটা শুনে দেখি। মিষ্টিটা খেয়ে দেখি। একটু বসে দেখি। গান শোনা, মিষ্টি খাওয়া বা বসার সঙ্গে চোখের কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনারা 'দেখা' শব্দটা ব্যবহার করছেন।

অরু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এভাবে সে কখনো ভাবে নি। সত্যি তো মজার ব্যাপার!

'তারপর মিস শাহানা বেগম, বাংলা ভাষা নিয়ে গবেষণা এখন স্থগিত। অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলি—চাকরিটি কি আপনার পছন্দ হয়েছে?'

'জ্বি, হয়েছে।'

'পছন্দ হবার মতো তেমন কিছু নয়, তবু খারাপ লাগবে না, জায়গাটা খুব সুন্দর। তাছাড়া যাদের সঙ্গে আপনি কাজ করবেন তাদের আপনার ভালো লাগবে। আপনি কাজ করবেন শিশুদের নিয়ে। শিশুদের মতো সুন্দর আর কিছু তো হয় না। তাই না?'

'জ্বি অবশ্যই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখন বাজছে একটা পাঁচ। চা খাবার সময় নয় তবু যদি আপনি আমার সঙ্গে চা খান আমি খুশি হব। লাঞ্চ খেতে বলতে পারছি না কারণ আমার লাঞ্চের একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

অরু চা খেল। পটে করে চা নিয়ে এসেছিল। ভদ্রলোক অরুকে লজ্জায় ফেলে নিজেই চা বানিয়ে এগিয়ে দিলেন। এটা হয়ত ওদের সাধারণ ভদ্রতা। অথচ কি সুন্দর এই ভদ্রতা।

'আমি আপনার অতীত ইতিহাস সবই শুনেছি। আমরা আমাদের কাজের জন্যে আপনার মতো মেয়েদের খুঁজে বের করি। আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, আপনার মতো মহিলারা সুযোগ পেলেই তাদের অসাধারণ কর্মদক্ষতা দেখানোর চেষ্টা করেন, প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, তারা তুচ্ছ নন।'

ভদ্রলোক গাড়ি করে অরুকে বাসায় পাঠালেন। গাড়িতে উঠবার সময়ও একটা কাণ্ড হল, তিনি নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন। বললেন, 'আপনি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে হালুয়াঘাট যেতে পারেন। আমি আগামী সপ্তাহে বাই রোডে যাব। আর বাই রোডে যেতে না চাইলে ট্রেনে করে চলে যাবেন। আপনার থাকা-খাওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা করে রাখবার জন্য আমি মেসেজ পাঠিয়ে দেব।'

অরু বলল, 'আমি আপনার সঙ্গেই যাব।' বলেই তার মনে হল সে অন্যায় কোনো কথা বলছে। এ রকম কথা তার বলা উচিত হয় নি। ভদ্রলোক কিছু মনে করলেন কি-না কে জানে। কিছু মনে করলে খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।

অরু ভেবেছিল তার ঢাকার বাইরে চাকরি করতে যাওয়ার খবরে খুব হৈচৈ হবে। দেখা গেল কোনো রকম হৈচৈ হল না। মিনু বললেন, 'যা ইচ্ছা কর। আমি কাউকেই কিছু বলব না।' জালালুদ্দিন বললেন, 'অধ্যাপনা অতি উত্তম ধর্ম। পৃথিবীর সবচে বড় দান হচ্ছে বিদ্যা দান। তাছাড়া বেতন ভালো। মনে হচ্ছে খৃস্টান করে ফেলবে। ঐদিকে নজর রাখবি। এই বংশের কেউ খৃস্টান হয়ে গেলে লজ্জার সীমা থাকবে না।' শুধু তিথি আপত্তি করল। নরম গলায় বলল, 'এদের সম্পর্কে নানান রকম গুজব আছে আপা। মেয়েদের নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করে। ওদের সম্পর্কটা অনেক খোলামেলা, ওরা এটাকে বড় কিছুও মনে করে না।'

'তুই কী বলছিস আমি যাব না?'

'তা বলছি না। এখানে থেকেই বা তুমি কী করবে। শুধু বলছি যে, সাবধানে থাকবে।'

নিতান্ত কাকতালীয় একটা ব্যাপার ঘটল অরুর হালুয়াঘাট রওনা হবার ঠিক আগের দিন—একটি রেজিস্ট্রি চিঠি এসে উপস্থিত। প্রাপক শাহানা বেগম। প্রেরক আব্দুল মতিন। খাম খুলে দেখা গেল বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র। ধুপচাঁচা গ্রামের মৌলানা আবু বকর সাহেবের তৃতীয়া কন্যা মোসাম্মত নূরুন নাহার বেগম (লাইলীর) সহিত কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের জনাব আব্দুল কুদ্দস সাহেবের প্রথম পুত্র আব্দুল মতিনের শুভ বিবাহ। বিবাহ অনুষ্ঠানে সবান্ধব উপস্থিত থাকার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে। অরুকে আহত করবার জন্যেই চিঠি পাঠানো। তবে অরু আহত হল কি-না বোঝা গেল না। তার চেহারায় মনের অবস্থার কোনো ছাপ পড়ল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরু হালুয়াঘাট পৌছে কোনো খবর দিল না। তিথি পরপর দুটি চিঠি লিখল—সেই চিঠিরও জবাব এল না। এক মাসের মাথায় টুকু চিন্তিত হয়ে ধানমণ্ডির বাসায় খোঁজ নিতে গেল। ডঃ গোরিং অফিসেই ছিলেন। তিনি সব শুনে চিন্তিতমুখে বললেন, 'চিঠির জবাব দিচ্ছেন না কেন তা তো বুঝতে পারছি না। তার সঙ্গে গত সপ্তাহেই দেখা হয়েছে। সে বেশ ভালো আছে—এইটুকু বলতে পারি।'

'চিঠি কি হাতে পৌছোচ্ছে না?'

'না পৌছানোর কোনো কারণ নেই। তাছাড়া তোমাদের চিঠি না পেলেও তো সে তার খোঁজ দেবে। দেবে না?'

'দেওয়ার তো কথা।'

'আমার কী মনে হয় জান—সে নিজেকে আড়াল করে ফেলতে চেষ্টা করছে। পরিচিত জগৎ থেকে লুকিয়ে পড়তে চাইছে। তোমাদের বাংলাদেশি মেয়েরা সামাজিক অমর্যাদার ব্যাপারে খুব সেনসেটিভ। তুমি বরং প্রিপেড টেলিগ্রাম করে দাও। তারপরে যদি জবাব না আসে নিজেই চলে যাও। হালুয়াঘাট এমন কিছু দূরের জায়গা নয়।'

প্রিপেড টেলিগ্রামের জবাব এল। অরু জানিয়েছে—সে ভালো আছে। তার কিছুদিন পর টুকুর কাছে দুই লাইনের চিঠি এল।

টুকু,

আমি ভালো আছি। কাজ শুরু করেছি। আমাকে নিয়ে শুধু শুধু কেউ যেন দুশ্চিন্তা না করে।

ইতি—অরু আপা।

অরুর সঙ্গে তার পরিবারের এই হচ্ছে শেষ যোগাযোগ। এই পরিবারের সদস্যরা অরুর আর কোনো খোঁজ পায় নি। টুকু এবং গ্রিন বয়েজ ক্লাবের সেক্রেটারি বজলুর রহমান খুঁজে বের করার অনেক চেষ্টা করল তেমন কিছু জানা গেল না। এই এনজিও কাজকর্ম গুটিয়ে স্বদেশে চলে গেছে। এখানকার কেউ তেমন কিছু বলতে পারে না। ডঃ গেরিং একজন বাঙালি মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে দেশের বাইরে চলে গেছেন—এইটুকু জানা গেল। তবে সেই একজন অরু কি-না তা কেউ নিশ্চিত হয়ে বলতে পারল না। নিউইয়র্ক এনজিওর হেড অফিসে যোগাযোগ করেও কিছু জানা গেল না। হেড অফিস জানাল ডঃ গোরিং এখন আর তাদের সঙ্গে কর্মরত নয়। কাজেই তারা তাঁর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে কিছু বলতে পারছে না।

শুধু হীরুর পীর সাহেব হীরুর কান্নাকাটিতে গলে গিয়ে জ্বিনের মারফত খবর এনে দিলেন—অরু ভালোই আছে। তার একটি কন্যাসন্তান হয়েছে। মাতা কন্যা সুখেই আছে। পীর সাহেবের কোনো কথাই হীরু অবিশ্বাস করে না। এইটা করল। ক্ষীণ স্বরে বলল, 'কী বললেন স্যার? কন্যাসন্তান হয়েছে?'

'হ্যাঁ বাবা হয়েছে। জ্বিনের মারফত খবর পেয়েছি।'

'জ্বিন কোনো ভুল করে নি তো? মানে মিসটেক। মানুষ যেমন ভুল করতে পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্বিনও নিশ্চয়ই পারে।'

'তুমি এখন যাও হীরু।'

'অন্য একটা জ্বিনকে দিয়ে যদি স্যার একটু ট্রাই করেন—মানে আমরা খুব কষ্টে আছি।'

'তুমি বিদেয় হও তো।'

হীরু মুখ কালো করে চলে এল। এই প্রথম পীরের আস্তানা থেকে বের হয়ে সে মনে-মনে বলল, 'শালা ফাটকাবাজ।'

২০

তিথি অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছে—হাঁটতে তার ভালো লাগছে। আকাশ ঘন নীল। ঝলমল করছে। রোদে শিশুদের গায়ের ওম। এমন সময় হাঁটতে ভালো লাগারই কথা। তিথির কোনো গন্তব্য নেই। একটা ফুলওয়ালীর কাছ থেকে সে ফুল কিনল। এক জন ভদ্রলোক তার কাছে জানতে চাইলেন, দিলু রোড কোন্ দিকে? সে ভদ্রলোককে খুব ভালো করে দিলু রোডে যাবার পথ বলে দিল। ভদ্রলোক কৃতজ্ঞ চোখে চলে যাচ্ছেন। সে হাঁটছে। বড় ভালো লাগছে হাঁটতে।

একেকটা দিন এ রকম হয়, হাঁটতে ভালো লাগে। বিশেষ করে যখন গন্তব্য বলে কিছু থাকে না। যাবার কোনো বিশেষ জায়গা না থাকার মানেই হচ্ছে সব জায়গায় যাওয়া যায়।

তিথি বিকেলের দিকে নিতান্ত ক্লান্ত ও বিরক্ত হবার পরই নাসিমুদ্দিনকে দেখতে গেল। সে অনেকদিন ধরে হাসপাতালে পড়ে আছে। তাকে দেখতে যাওয়া হয় না। বিশেষ কোথাও যেতে তিথির ইচ্ছা করে না। নাসিমুদ্দিন যদি রাস্তায় থাকত বেশ হত। অনেকবার দেখা হত।

নাসিম বত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের বারান্দায় পড়ে আছে। তিথিকে দেখে উজ্জ্বল চোখে তাকাল, 'এস তিথি এস। একমাত্র তুমিই আস। আর কেউ আসে না। আমার স্ত্রীও আসে না।'

'আপনি কেমন আছেন?'

'ভালো না। পায়ে কী যেন হয়েছে—কেউ কিছু বলেও না। পা না-কি কেটে বাদ দিতে হবে। পাপে ধরেছে, বুঝলে তিথি পাপ। এই জীবনটা মহাপাপ করতে করতে কাটালাম।'

'খুব ব্যথা হয়?'

'আমার কথা বাদ দাও। তুমি কেমন আছ?'

'ভালো আছি।'

'তোমার ভাইয়ের ব্যবসা না-কি ভালো হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে সহ্য করে তো। একবার টাকা-পয়সার মুখ দেখলে পুরোনো কথা কেউ মনে রাখে না। তোমার ভাই কি তোমাকে হাতখরচ দেয়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দেয়।'

'ভালো। খুব ভালো। শুনে খুশি হলাম। তোমার মুখ এমন শুকনো লাগছে কেন তিথি? কিছু খাবে? একটা কলা খাও। এরা হাসপাতাল থেকে কলা ডিম এইসব দেয়, খেতে পারি না। তুমি কলাটা খাও।'

তিথি বিনা বাক্যব্যয়ে কলা খেল। তার ক্ষিধে পেয়েছে। আসলেই সারাদিন কোনো খাওয়া হয় নি।

'তিথি।'

'জ্বি।'

'তোমার যে একটা বোন কোথায় চলে গিয়েছিল তাকে কি পাওয়া গেছে?'

'জ্বি না।'

'ঢাকা শহর হল অদ্ভুত শহর। এই শহর হঠাৎ মানুষ গিলে খেয়ে ফেলে। আর খোঁজ পাওয়া যায় না।'

'আমি উঠি?'

'না–না বস। আর একটু বস। কেউ আসে না। তুমি মাঝে–মধ্যে আস ভালো লাগে। পাপের শাস্তি হচ্ছে। মহাপাপ করেছিলাম।'

'আপনি কোনো পাপ করেন নি। আপনি না থাকলে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতাম? আপনার কাছে আমার অনেক ঋণ।'

'এইটা ভুল কথা বললে তিথি। খুব ভুল কথা। আমাদের কারোর কাছে কারোর কোনো ঋণ নাই।'

'যাই এখন?'

'বস। আরেকটু বস।'

তিথি বসে। তার তো যাবারো তেমন জায়গা নেই। বসে থাকতেই বা অসুবিধা কি? রাত বাড়ে। ক্যানসারে আক্রান্ত মানুষটার মাথার কাছে তিথি বসে থাকে। এক সময় নাসিম বলে—এখন চলে যাও। রাত হচ্ছে।' তিথি বলে, 'আরেকটু বসি। কোনো অসুবিধা নেই।'

জালালুদ্দিনের চোখের অপারেশন হল প্রাইভেট ক্লিনিকে। হীরু দরাজ গলায় বলল, 'ফাদার–মাদারের জন্যে টাকা খরচ করব না তো কোন্ শালার জন্যে করব? টাকা–পয়সা হচ্ছে আমার কাছে তেজপাতা।' অপারেশনের পর ডাক্তার চোখে হলুদ আলো ফেলে বললেন, 'কিছু দেখতে পাচ্ছেন, ক'টা আঙুল বলুন তো?'

'পরিষ্কার বলতে পারছি না। মনে হচ্ছে তিনটা।'

'তার মানে কিছু দেখছেন না।'

'কে বলল দেখছি না? পরিষ্কার দেখছি। আপনার আঙুল হচ্ছে দু'টা—ঠিক না? 'ডাক্তারের মুখ বিমর্ষ হয়ে যায়, কিন্তু জালালুদ্দিন বড়ই আনন্দ বোধ করেন। এতগুলো টাকা শুধু তার জন্যই খরচ হচ্ছে—এটা কি কম কথা? দরকার হলে আরো খরচ হবে। হীরু তো বলেছে—টাকা পয়সা তার কাছে তেজপাতা। এ হচ্ছে তার শ্রেষ্ঠ সন্তান। শুরুতে বুঝতে পারেন নি। শুরুতে আসলে কিছুই বোঝা যায় না। "মর্নিং শোজ দ্য ডে।" কথাটাই ভুল। দেখা যায় সকালে ঝলমলে আলো দুপুর হলেই চারদিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধকার করে ঝড়।

এসব কথা সব বদলে ফেলা দরকার। কোমলমতি শিশুদের ভুল কথা শেখানো হচ্ছে। উচিত না। কাজটা খুবই অনুচিত হচ্ছে।

'ও বাবা হীরু।'

'জ্বি।'

'চোখটা তো মনে হয় সেরেই গেল। ডাক্তারের হাতের আঙুলগুলো পরিষ্কার দেখলাম। গুনতে পারলাম না। দেখা এক জিনিস আর গুনা এক জিনিস। ঠিক কি-না বাবা বল।'

'তা তো ঠিকই। এখন চল বাড়ি যাই।'

'আরো কয়েকটা দিন থাকি। এদের আদর-যত্ন অসাধারণ। একটা নার্স আছে, নাম রুচিতা। ভাবছি এই মেয়েটাকে ধর্ম মেয়ে বানিয়ে ফেলব। অসাধারণ একটা মেয়ে।'

পহেলা শ্রাবণ হীরু নতুন বাড়িতে উঠল। সেই উপলক্ষে কাঙালি ভোজ হল। মিলাদ হল। বাড়ি বিশাল কিছু না, তবে ভবিষ্যতে বড় হবে। তিনতলা ফাউন্ডেশন। নতুন বাড়িতে ঢুকে আনন্দে ঘুমুতে পারেন না জালালুদ্দিন। ঘন-ঘন এ্যানাকে ডাকেন।

'ও বৌমা। বৌমা।'

এ্যানার হাতে শতেক কাজ। তবু সব বিরক্তি মুছে পাশে দাঁড়ায়। জালালুদ্দিন ধরা গলায় বললেন, 'সব তোমার জন্যে হচ্ছে গো মা—সবই তোমার জন্যে। তোমার একটা ছবি বড় করে বাঁধিয়ে আমার ঘরে সাজিয়ে রাখ তো মা।'

'সাজিয়ে রাখলে কী হবে? আপনি তো আর দেখতে পারবেন না?'

'আমি না পারলাম। অন্যে দেখবে। যেই আসবে তাকেই বলব, এই দেখ গো সবই আমার বৌমার ভাগ্যে হল। এই হচ্ছে আমার বৌমা।'

'আপনি বড় বেশি কথা বলেন। কথা কম বলবেন। চা খেতে চাইলে বলেন চা এনে দিচ্ছি।'

'একটু কফি দাও। কফির কাছে চা দাঁড়ায় না গো মা। কফির মজাই অন্য।'

এ্যানা কফি আনতে যায়। আপন মনে কথা বলেন জালালুদ্দিন। নিজের মনে কথা বলতে তার বড় ভালো লাগে। জীবনটা বড়ই মধুর মনে হয়। বড়ই সুখের বলে বোধ হয়। গুনগুন করে আজকাল গানও গান—ওগো দয়াময়। বড় দয়া তোমার মনে ওগো দয়াময়—সবই তাঁর স্বরচিত গান। তিনি যে একজন স্বভাবকবি এই তথ্য আগে জানা ছিল না। হীরুর বেশ কিছু কর্মচারীও এই বাড়িতে থাকে। তাদের সাথেও তার বড় মধুর সম্পর্ক। জীবন কি? জীবনের অর্থ কি? এসব গূঢ় কথা তিনি তাদের বলেন। খুব আগ্রহ নিয়ে বলেন—'ভাগ্য—সবই ভাগ্য। এই জিনিসটা তোমরা খেয়াল রাখবা। আজ যে রাজা কাল সে পথের ফকির। এর কারণ কি? এর কারণ ভাগ্য কি...'

তিনি সবাইকে ভাগ্য কী তা ব্যাখা করেন। সবাই মন দিয়ে শোনে। আশ্চর্যের ব্যাপার মন দিয়ে শোনে টুকু। টুকু কেন এত আগ্রহ নিয়ে বাবার কথা শোনে তা জালালুদ্দিনও ঠিক বুঝতে পারেন না।

টুকুর ঘুরে বেড়ানোর স্বভাব আরো বেড়েছে। মাঝে-মাঝে মাসের পর মাস তার কোনোরকম খোঁজ পাওয়া যায় না। তারপর হঠাৎ একদিন মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে উদয় হয়। হীরু ভীষণ বিরক্ত হয়, 'আমার আপন ভাই ঘরে আর আমার কি-না তিন হাজার টাকা বেতন দিয়ে ম্যানেজার রাখতে হয়। আফসোস। বড়ই আফসোস। এখন আমার দরকার নিজের লোক।'

হীরুর নিজের লোকের অভাবে সত্যি-সত্যি অসুবিধা হয়। অনেক টাকার লেন-দেন সব একা সামলাতে হয়। মাথার ঠিক থাকে না। টুকু লেখালেখির চেষ্টা করে। তার খুব ইচ্ছা করে নিজেদের জীবনের কথাটাই সুন্দর করে লিখে ফেলতে। দুঃখ, বেদনা ও গ্লানির মহান সংগীতকে স্পর্শ করতে ইচ্ছা করে। পারে না। তবে মনে হয় পারবে। একদিন না একদিন জনম জনমের গল্প বের হয়ে আসবে।

হীরু নিজেদের ব্যবহারের জন্যে রিকন্ডিসান্ড টয়োটা স্টারলেট একটা কিনেছে। সেই গাড়িতে রোজ জালালুদ্দিন সাহেব খানিকক্ষণ হাওয়া খান। রোজ খানিকটা ফ্রেশ অক্সিজেন না নিলে তার না-কি রাতে ভালো ঘুম হয় না।

এই পরিবারের এক জন মাত্র মানুষ রাতে এক ফোঁটা ঘুমুতে পারেন না। তিনি মিনু। চোখ মেলে তিনি সারারাত তিথির পাশে শুয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে একটা হাত রাখেন তিথির গায়ে। তিথি সেই হাত সরিয়ে দিয়ে কঠিন গলায় বলে, 'গায়ে হাত দিও না মা।'

'এত আদর করে গায়ে হাত রাখি তুই এমন করিস কেন মা?'

তিথি কঠিন গলায় বলে, 'গায়ে হাত দিলেই মনে হয় পুরুষ মানুষের হাত। কেমন গা ঘিনঘিন করে।'

'মা-রে তুই শুধু আমাকে শাস্তি দিচ্ছিস কেন?'

'আমি কাউকে শাস্তি দিচ্ছি না মা।'

'এত শখ করে হীরু গাড়ি কিনেছে একবার চড়ে দেখবি না?'

'চড়ব। কালই চড়ব। এখন ঘুমাও।' মিনু ঘুমুতে চান। ঘুমুতে পারেন না। রাত বাড়ে।

২১

এক সন্ধ্যায় মনজুর সাহেব হীরুদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। রমরমা দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হন। তিনি মেয়ে বিয়ে দিচ্ছেন। সেই বিয়ের দাওয়াতের কার্ড নিয়ে এসেছেন। চারদিকের কায়দা-কানুন দেখে হকচকিয়ে গেছেন। তিথি বের হয়ে বলল, 'কেমন আছেন চাচা?' তিনি হকচকিয়ে গেলেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'ভালো আছি। আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছ মা?' তিথি তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? ঐ যে অভাবের সময় টাকার জন্যে যেতাম। আপনি এত আদর করতেন। মনে আছে?' মনজুর সাহেব কিছু বলেন না। মুখ শক্ত করে বসে থাকেন।

'মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন বুঝি?'

'হুঁ।'

'বড় মেয়ে না ছোট মেয়ে?'

'ছোট মেয়ে। যেও কিন্তু।'

AMARBOI.COM

'যাব। অবশ্যই যাব। আপনার কাছ থেকে আদর খেয়ে আসব। আপনার আদরের কথা সব সময় আমার মনে হয়।'

'উঠি তিথি।'

'না, না আপনি কেন উঠবেন। আমি আপনাকে চা বানিয়ে খাওয়াব। আপনার মনে আছে চাচা আপনি একদিন হালুয়া বানিয়ে চামুচে করে আমাকে খাইয়েছেন। মনে আছে, না মনে নেই?'

মনজুর সাহেব বড়ই অস্বস্তি বোধ করেন। তার অস্বস্তি দেখে গভীর করুণায় তিথির মন হঠাৎ কেমন যেন ভরে যায়। হঠাৎ মনে হয় কী দোষ এই লোকটার? কোনো দোষই তো নেই।

অরুর চিঠি এসেছে। সে চিঠি লিখেছে নিউ জার্সি থেকে। "সে ভালো আছে। সুখে আছে। স্বামীর সঙ্গে আছে।" এই হচ্ছে চিঠির বক্তব্য। স্বামী কে? সে কোথায় আছে সেই সব কিছুই নেই। বড়ই সংক্ষিপ্ত চিঠি। শুধু চিঠির এক কোণায় লেখা—তিথি, তোকে রোজ স্বপ্নে দেখি। তিথি তোর কী হয়েছে রে?'

তিথির কী হয়েছে সে নিজেও জানে না। সে শুধু জানে যে হাঁটতে ভালো লাগে। মতিঝিল থেকে টিপু সুলতান রোড, সেখান থেকে গেণ্ডারিয়া। গেণ্ডারিয়া থেকে সূত্রাপুর। এত ভালো লাগে কেন হাঁটতে? শুধু মাঝে মাঝে হঠাৎ মেঘে মেঘে আকাশ যখন কালো হয়ে যায় যখন চক্রাকারে আকাশে সোনালি ডানার চিল উড়তে থাকে তখন কেন জানি সব ছেড়েছুঁড়ে ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। এমন কোনো ঘর যে ঘরে দু'বাহু বাড়িয়ে কেউ একজন অপেক্ষা করে আছে। যে ঘরে পা দেয়া মাত্র বলবে—মেঘলা দিনে কোথায়–কোথায় ঘুরছিলে বল তো? তিথি হাসবে। সেই মানুষটা কোমল অথচ রাগী গলায় বলবে, 'হাসবে না তো। হাসির কোনো ব্যাপার না। দেখ না কেমন ঝড় শুরু হল। এই দিনে কেউ বাইরে থাকে?' তিথি বলবে, 'হোক ঝড়। এস না আমরা খানিকক্ষণ ভিজি।'

'তুমি কি পাগল হলে তিথি?'

'হ্যাঁ পাগল হয়েছি। এস তো।'

তিথি মানুষটাকে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজবে। লোকটি যতই রাগ করবে সে ততই মজা পাবে। কিন্তু তিথির জন্যে তেমন কেউ অপেক্ষা করে নেই, কোনোদিন করবেও না। তার জন্যে অপেক্ষা করবে বিশাল আকাশ। যে আকাশ সবার জন্যেই অপেক্ষা করে আবার কারো জন্যেই করে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~